Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No. CSS 57	Condition Brittle
Title Rāmdhanu (রামধনু)	Colour B & W (text) Coloured illustrations
Periodicity Monthly / irregular	Size 16 x 20 cm (W x L)
Editor(s) Biswoswar Bhattacharya [V.1-V.2 - 1334-36 b.s. (1927-29)] Manoranjan Bhattacharya [V.3-12 : 1336-1345 b.s. (1929-38)] Kshitindranarayan Bhattacharya [V.12-62 : 1345-95 b.s (1938-88)]	Place(s) of Publication Calcutta : 16 Townsend Road, Bhabanipur.
	Volumes in Record Vol. 1 – 46 : 1334 – 1380 b.s. [1927 – 73] Vol. 49 – 62 : 1383 – 1395 b.s. [1976 – 88] (irregular issues)

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

প্রথম বর্ষ

মাঘ ১৩৩৪—পৌষ ১৩৩৫ (১৯২৮ সাল)

১৬নং, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত

রামধনু (মাঘ ১৩৩৪—পৌষ ১৩৩৫)

বিষয়-সূচী

বিষয় (বর্ণানুক্রমে)	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অদ্ভুতত্ত্ব ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম-আর-এ-এস্	... ৪৮০
অগস্ত্যের কীর্ত্তি ...	... " " "	... ২৩২
অদ্ভুত বেজী ...	... " " "	... ৫৫২
অরুণ-আলো ...	শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন, এম-এ ...	৪৪,৯৫ ১৪৬, ১৮১, ২৫০, ৩০০, ৩৪৬, ৩৮৯
I (আই) মানে কি ?	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী ...	... ৫৭০
আঘাত ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	... ৩৬৩
আপন ও পর ...	শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ (কবিশেখর)	... ২২
আবোল তাবোল ...	শ্রীমাঠব্য	... ৪২
আশ্চর্য্য পোষাক ...	শ্রী——	... ২৬১
আশ্রমে ...	শ্রীমতী শান্তিলতা সেনগুপ্তা ...	... ৫৬৯
ইন্দুরের বুদ্ধি ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্	... ৫৯১
ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মার্কণ্ডেয় ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্	... ৫৪
উদ্গমন কথা ...	শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি-এল ...	... ৩২২
এ দিকে একটু কঁ্যাচ্ আর ওদিকে একটু ঘঁাচ্	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ	... ১৭৩
এ যুগের কামান ...	... ...	... ৩৯৭
এ যুগের দধীচি ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৫৩১
ওনোরের মুস্কিল ...	শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল ...	... ২৯৪
ওস্তাদ বাজিয়ে ...	শ্রীসুধাংশু কুমার বসু ...	... ৬০৩
কইক্রু কোলের কথা ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্	... ৩৮১
কা[illegible]চার ...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার্-এট্-ল্	... ৩৩
কামারের ছেলে দেশের কর্ত্তা	... ...	... ৫৮২
কেন ?	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	... ১১৩
কেন ?	... ...	... ৫৫৭
ক্রিকেট খেলোয়াড় ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ	... ২৭৬
খনির আলো ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৩৪০
খোকা ও দিদি ...	শ্রীসুশীলচন্দ্র গুহ খাসনবীস, এম-এ	... ৫১৮
খোকা-খুকুর গান ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	... ৪৭৮

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
খোকার প্রতি ...	শ্রীমতী নিরুপমা সরকার ...	... ২২১
খোকার সাধ ...	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ	... ২৪৯
গরুড়ের ক্ষুধা ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম-আর-এ-এস্	... ১০৯
গ্যাস্ লাইটের জন্মকথা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৩৮৪
ঘুম-ভাঙ্গান ছড়া ...	শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী ...	... ৬০১
চাঁদের আবাহন ...	শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য ...	... ১২৭
চানাচুর ...	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী ...	... ৬০২
চা'লের দর ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	... ২০৭
চিন্‌তে পার ? ...	শ্রীবিকাশ দত্ত ...	... ৫৩৯
চীনের ছাত্রসমাজ ...	শ্রীবিমল সেন ...	... ৩৫১
চোর ধরা ...	শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৫৮৫
ছল্‌মে চাচা ...	শ্রীবিকাশ দত্ত ...	... ৫৮৯
জলপ্লাবন (পৌরাণিক গল্প)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ,এম-আর-এ-এস্	... ২৯০
জলের দোল (কবিতা)	শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	... ৪৩৫
জানোয়ার কি নিরেট বোকা ?	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৩১৬
জানোয়ারের মুখে ...	শ্রীমতী চারুলতা দেবী ...	... ২২৬
জীব-জন্তুর অদ্ভুত ক্ষমতা	... ...	... ৬১৬
জীব জন্তুর আত্মরক্ষা ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ১০৪
টাকার বিপদ্ ...	অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম-এ,বি-এল	৫০৩
ঠক বাছাই ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ	... ৩৭৭
তরল বাতাস ...	শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ,বি-এল,বি-এস্-সি	২৩,৬১
তুরস্ক ও মুস্তাফা কেমাল পাশা	... ...	... ৫৬০
দর্পচূর্ণ ...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ...	... ৬২১
দিনে-দুপুরে ...	শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল ...	... ৩৩৬
দৃষ্টিলাভ ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ	... ৪৬৮
ধাঁধার উত্তর। ...	... ...	১০১, ১৫৩, ২০৬, ২৫৬, ৩০৮
" ...	... ...	৩৬০, ৪১১, ৪৬৫, ৫২৭, ৫৮০, ৬৩২
ধুন্ধুমার রাজার কথা ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্	... ৩৩১

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
নব-বর্ষের গান ...	শ্রীবিকাশ দত্ত ...	... ১৫৬
নব্যযুগের যাদুকর ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ২৬৮
নারদের নিমন্ত্রণ ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	... ১৫
নাকে খৎ ...	শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ, এম্-এ, ...	... ৫৭১
নূতন ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্, এম-আর-এ-এস্	... ১৫৫
নূতন ধাঁধাঁ ...	... ...	৫০, ১০১, ১৫৩, ২০৫, ২৫৬, ৩০৮
” ...	... ...	৩৬০, ৪১১, ৪৬৫ ৫২৭, ৫৮০, ৬৩২
নেপোলিয়নের এল্‌বা-ত্যাগ	শ্রীবিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল	... ২৮৫
পণ ...	শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত, বি-এ ...	... ৩৪৫
পদ্মরাগ ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ	...
” ...	... ...	৩৫৬, ৪০২, ৪২৭, ৫৭৫, ৬২৩
পল্লীমায়ের অন্দরে ...	শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত ...	... ৩৭৬
পর্য্যটকের পস্তানি ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	... ৫২৯
পানকৌড়ি ...	শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ...	... ২৫৯
পাল্টা জবাব ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ	... ২৩৯
পার্লামেন্টের কথা ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ	.. ১২৮
পালোয়ানের মত পালোয়ান	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ	... ৪৫৩
পুস্তক-পরিচয় ...	.. ..	... ৬২৮
পূজা ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, ...	... ৪৬৭
পূজার গল্প ...	শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল ...	... ৪৯১
পেটুকের ভূগোল ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	... ৪১৩
প্রজাপতি ও ঘুড়ি ..	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	... ৩১১
ফটোগ্রাফের কথা ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	.. ১৫৭
ফাগুন দিনে ...	শ্রীগোপিকাকান্ত দে বি-এ ...	... ৯৪
ফিরতি-বরাত ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ ...	... ২২২
ফুল-কুঁড়ি ...	শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত ...	... ৫৫১
বর্ম্মার কথা ...	অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ...	
” ...	... ...	৪৮, ৯০, ১১৫
বলির পূজো ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ ...	... ৩১২

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বাঙ্গালী পালোয়ান ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ	... ৬
বাঙ্গালী পালোয়ান ভূপেশচন্দ্র	... ...	... ৩৫৬
বারগণনা ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস	... ২৯৭
বাল্য-স্মৃতি ...	শ্রীগোপিকাকান্ত দে, বি-এ ...	... ৩০৫
বায়স্কোপ ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ২১৩
বাংলা দেশের কথা ...	রায় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট্	... ২০৯
বিদ্যুৎ রাজ ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৬০৪
বিত্তু-চরিত ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ,	... ৫১৯
বীরবলের গল্প ...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বার-এট-ল	... ৪৮৫
বীরনারী ...	... ...	... ৫০০
বুদ্ধির বাহাদুরী ...	অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম-এ, বি-এল্	... ৫৪০
বেলাশেষের গান ...	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ (কবিশেখর)	... ১৮৫
বৈজ্ঞানিকের চক্ষু ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৪৭১
বৃত্র-বধ ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস	... ১৬৫
ব্যাঙের জন্ম ...	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম্-এ ...	... ৫০১
ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম-আর-এ-এস	... ৩৭১
ব্রাহ্মণ ও বক ...	”	... ৪১৫
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক	... ...	৫৬৮, ৬০১
ভূস্বর্গের দৃশ্য ...	... ...	... ৫৬৮
ভুয়োদর্শ ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	... ৩২৮
ভৈরব-শঙ্করী ...	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ, বি-এল	... ১৭
মজার খেলা ...	... ...	... ১৫২
মণ্টুর দুর্ভোগ ...	ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল,	... ৬৬
মন্দির ও মসজিদ্ ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	... ১৭৯
মাসের নাম ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল, এম-আর-এ-এস	... ৭৯
মুক্তি ...	শ্রীপ্রভাতকুমার শর্ম্মা ...	... ৪৫৯
মুখ চোরা ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম-এ	... ১১৮
রং তামাসা ...	... ...	... ১৪৯, ২০২
রামধনু ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল, এম-আর-এ-এস	... ১

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
রামধনু ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	... ৫১
রামধনু ...	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ (কবিশেখর)	... ৫৩
রামধনু ...	শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ...	... ২৮৪
রামধনুর কথা ...	সম্পাদক	... ২
লর্ড সিংহ ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ	... ১৮৭
শনিবার ! শনিবার ! ...	শ্রীমাঠব্য	... ৪৮৩
শনিবারের বারবেলা ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ	... ৮২
শরৎ-ভোরে ...	শ্রীবিকাশ দত্ত ...	... ৪৪১
শান্তিবুড়ী ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ...	... ৫৮১
শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ	অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি-আর-এস	২৮, ৫৭
শিবের গান ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস	... ১০৩
শিশু সাঁতারু ...	... ...	... ৪৯৯
শিশু-স্বর্গ ...	শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ (কবিশেখর)	... ২৫৪
"শিয়রে জাগে কার আঁখিরে"	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ	... ৫৯৬
সর্দ্দারীর বিপদ্ ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৪৪৩
সব চেয়ে বড় রেল-ইঞ্জিন	... ...	... ৫০৮
সন্দেশ		৪৯, ১০০, ১৫০, ২০৩, ২৫৫, ৩০৭ ৩৫৯, ৪০৮, ৪৬৩, ৫০৯, ৫৭৩, ৬২৯
সংস্কারক ...	শ্রীরসোদর শর্ম্মা ...	... ৭৬
সাবধানী বুড়ো ...	শ্রীমাঠব্য	... ৪০১
সাবেক আমলের গাড়ী	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৪৬৩
সুমেরু ...	শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি, বি-ই এস	... ১৬৯
সেকালকার মস্ত বীর	... ...	৪৩৭, ৫১২
সেপাই রাজা ...	অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম্-এ, বি-এল্	... ৬০৯
সেকালের কথা ...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	১৩৫, ১৯৪
হাসির গল্প ...	শ্রীঅমলেন্দু সরকার ...	... ৬০২
হীরার কথা ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	... ৪২২
হোলির গান ...	শ্রীবিকাশ দত্ত	... ১৪৪
ক্ষমা	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, (কবিশেখর)	... ৪৯০

রামধনু (মাঘ ১৩৩৪—পৌষ ১৩৩৫)

চিত্র-সূচি

মাঘ

	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
১।	সরস্বতী (রঙ্গীন)	
২।	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা	৬
৩।	এই হাতীটার ওজন ১১৫ মণ, রাজেন্দ্রনাথ চট্টগ্রামে ইহাকে বুকে তুলিয়াছিলেন	১১
৪।	রাজেন্দ্রনাথের শিষ্য বিষ্ণুচরণ হাতের পেশী ফুলাইতেছে	১২
৫।	রাজেন্দ্রনাথের আর একজন শিষ্য কেশবচন্দ্র	১৩
৬।	রাজেন্দ্রনাথের শিষ্য শ্রীমান্ সত্যপদ	১৪
৭।	দেবর্ষি নারদ	১৬
৮।	কোথায় শীত ? গরমে দেখি আমার ঘাম ছুট্‌চে	১৮
৯।	চোখের নিমেষে তুজনে ঘুরে তুদিকে ছিট্‌কে পড়লো	২১
১০।	ভ্যাকুয়াম্ ফ্লাস্ক	২৬
১১।	তরল বাতাসে ঘরের ভিতরে মেঘ	২৭
১২।	বরফের উপর তরল বাতাস ফুটিতেছে	২৭
১৩।	শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ	২৮
১৪।	নবাব কুদরৎ উল্লা খাঁ, সোফার উপর	৩৪
১৫।	নবাব বাহাদুর, আবদুল ও অসভ্য লোক	৩৮
১৬।	আবোল-তাবোল	৪৩
১৭।	ওমা, একটা পোকা দেখে এত ভয় পেলে, ছি ! ছি !	৪৭
১৮।	বর্ম্মার একটী দৃশ্য—দূরে প্যাগোডা দেখা যাইতেছে	৪৮

ফাল্গুন

	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
১৯।	মা ও ছেলে (রঙ্গীন)	
২০।	ইন্দ্রদ্যুম্ন, মার্কণ্ডেয়, উলুক, বক ও কচ্ছপ	৫৬
২১।	গুরুগোবিন্দ—এক হাতে বন্দুক, অপর হাতে ধনুক, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ...	৬০
২২।	প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ট্রিপ্‌লার সাহেব তরল বাতাস লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন	৬৫
২৩।	মণ্টু রতনকে জল থেকে টেনে তুল্‌ছে	৬৮
২৪।	দ্বারোয়ান মণ্টুর কাণ ধরে তাকে টেনে তুল্‌ছে	৭৩
২৫।	রতনের মা তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ছেন	৭৫
২৬।	ঠ্যাং তুলি শূন্যে, গোণে শুধু কড়িকাঠ	৭৭
২৭।	নাতি-নাতিনী লইয়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার	৮০
২৮।	গণ্‌শার সমস্ত শরীরটার মাপ লইতে আরম্ভ করিল	৮৬
২৯।	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১

ছবির নাম	পৃষ্ঠা
৩০। আনন্দ প্যাগোডা	৯২
৩১। সোয়েডাগন প্যাগোডা	৯৩
৩২। বর্ম্মায় হাতীকে কাঠ টানিবার কাজে লাগান হইয়াছে	৯৪
৩৩। পোকাটা ক্রমেই বড় হতে লাগল	৯৯
চৈত্র	
৩৪। দিদির আদর (রঙ্গীন)	
৩৫। সেকালের বিকট জানোয়ার	১০৫
৩৬। শুধু গাছের ডাল···না আর কিছু?	১০৬
৩৭। জীবজন্তুর আত্মরক্ষা	১০৭
৩৮। গজ-কচ্ছপকে নখে ধরিয়া রাখিলেন, আর ডালটা ধরিয়া রাখিলেন ঠোঁটে	১১১
৩৯। কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১১৪
৪০। মঘ্-লা-প ওয়েম্বলিতে চিন সঙ্ খেলিতেছে	১১৬
৪১। সন্তোশ দেখিল বিপদ্‌টা আরও বাড়িয়া গিয়াছে	১২০
৪২। টি পট আছে, তবে তাহাতে চা তৈরী হয় না, সুজি থাকে ...	১২২
৪৩। বলতো, বাপু, চাকরের ঘরের দিকে যাচ্ছিলে কেন?	১২৫
৪৪। টেম্‌স্ নদীর ধারে পার্লামেন্টের বাড়ী	১২৯
৪৫। পার্লামেন্টের ভিতরে সভ্যেরা রাজকার্য্য আলোচনা করিতেছেন ...	১৩১
৪৬। ছ'ফুট লম্বা পিঁপড়ে···মানুষ তাড়াতে সুরু করে	১৩৭
৪৭। হরিণী এসে তাকে মিষ্টি দুধ খাইয়ে সুখী হয়	১৪৮
৪৮। মাটীর তলায় বাগান	১৫২
বৈশাখ	
৪৯। খোকার খেলা (রঙ্গীন)	
৫০। ক্যামেরার ভিতর ছবি উঠিয়াছে	১৫৯
৫১। চাঁদের আসল চেহারা	১৬৩
৫২। দুইটা ছবি, এক জায়গায় এক ক্যামেরায় তোলা; শুধু লেন্স্ বদলান হইয়াছে বলিয়া ছবি দুইটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে	১৬৪
৫৩। মুনি···যোগাসনে বসিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন	১৬৭
৫৪। বৃত্রকে কোনমতে বজ্র মারিয়া ইন্দ্র সরোবরের মধ্যে লুকাইতেছেন ...	১৬৯
৫৫। সুমেরুতে কিরূপ বরফ তাহা এই ছবিখানা হইতে একটু আন্দাজ করিতে পারিবে	১৭১
৫৬। "যদি আমার ঠ্যাং হয়"	১৭৪
৫৭। "একটু রাম-কামানোর দরকার"	১৭৭
৫৮। অরুণের নৌকা সেই মহা-তপস্বীর পায়ের কাছে এসে থেমে রইল ...	১৮৩
৫৯। শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	১৮৬
৬০। লর্ড সিংহ	১৮৮
৬১। পিঁপড়েদের এরোপ্লেন আক্রমণ	১৯৫

ছবির নাম	পৃষ্ঠা
৬২। বন্দুকের গুলি বুদ্‌বুদের ভিতর দিয়া যাইতেছে	২০৩
জ্যৈষ্ঠ	
৬৩। বুদ্‌বুদ (রঙ্গীন)	
৬৪। রায় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট্	২১০
৬৫। বায়স্কোপ	২১৪
৬৬। বায়স্কোপের ছবি তুলিবার ক্যামেরা	২১৬
৬৭। বায়স্কোপের ফিল্ম তুলিবার একটী স্থান। কলকব্জা, তার, আলো প্রভৃতিতে ভর্ত্তি; এই সবের সাহায্যে, এখানে এক সঙ্গে পাশাপাশি দিনের ও রাতের ছবি তোলা হয়	২১৭
৬৮। ফাঁকিবাজ অভিনেতা—দেওয়াল বাহিয়া উঠিতেছে ...	২২০
৬৯। মাঝ-পথে এর সাথে ওর দেখা	২২৫
৭০। "লোহার ব্যবধান" না থাকিলে পশুরাজ কি প্রকারের চীজ! ...	২২৭
৭১। গণ্ডার মহাশয়ের রাগের একটু নমুনা	২৩০
৭২। বুনো মহিষের রাগ, সাহেবকে স্বর্গের দিকে পাঠাইতেছে	২৩১
৭৩। অগস্ত্য সাগর শুষিতেছেন	২৩৪
৭৪। গাছের ছাল আর হরিণের চামড়া পরিয়া পতিসেবা করিতে লাগিলেন ...	২৩৬
৭৫। সাপের পাঁচ-পা দেখিয়াছে নাকি?	২৪০
৭৬। আমরা···বলিয়া উঠিলাম "বাঃ রে বাঃ, ছিল বৈকি"।	২৪৩
৭৭। কি ধুরন্ধর ছেলে বাবা!	২৪৮
আষাঢ়	
৭৮। ভক্তের ভগবান্ (রঙ্গীন)	
৭৯। দ্বারোয়ানের নিকট আরজী পৌঁছিল	২৬২
৮০। মন্ত্রীর মাথা ঘুরিয়া গেল	২৬৪
৮১। রাজা চারিঘোড়ার গাড়ীতে মিছিলে বাহির হইলেন	২৬৭
৮২। এডিসন্	২৬৮
৮৩। ডাক্তার গ্রেস, The Grand Old Man of cricket	২৭৮
৮৪। বাংলার লাট সাহেব, স্যার ষ্টান্‌লি জ্যাক্‌সন্	২৭৯
৮৫। ভারত-গৌরব রণজিৎ সিংহ (নোয়ানগরের জাম সাহেব)	২৮০
৮৬। প্রসিদ্ধ ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ হব্‌স্	২৮২
৮৭। রোড্‌স্ বাঁ হাতে বল দিতেছেন	২৮৩
৮৮। "সম্রাট্! সম্রাট্!!"	২৮৯
৮৯। ঐ ফাঁস মাছের শিংএর উপর ছাড়িয়া দিলেন	২৯৩
৯০। গোঁফ জোড়াটা চুমরে নিয়ে বল্‌লে "চাকরী?—বহুৎ"	২৯৫
৯১। বার-গণনা	২৯৯
৯২। অরুণের দিকে ছুটে আস্‌চে	৩০১

ছবির নাম — পৃষ্ঠা

৯৩। নূতন ধাঁধা ... ৩১০

শ্রাবণ

৯৪। মনসা দেবী (রঙ্গীন)
৯৫। সামনে দাঁড়িয়ে সেই দেবতারই মূর্ত্তি ... ৩১৫
৯৬। সাহেব ফটো তুলিতে বসিয়াছেন ... ৩১৭
৯৭। সকালে বিকালে একটু বায়ু সেবন ... ৩১৭
৯৮। ছুরী আর কাঁটা-চামচ না হইলে ভয়ানক অসুবিধা হয় ... ৩১৮
৯৯। টেরিয়ার কুকুর দুইটী খোঁড়া কুকুরকে হাসপাতালে যাইবার জন্য বুঝাইতেছে ৩২১
১০০। এক বৎসর গেলে নিঃশ্বাস ছাড়িত ... ৩৩২
১০১। মধুকৈটভ-বধে ভগবান্ বিষ্ণু ... ৩৩৪
১০২। রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন ... ৩৩৫
১০৩। কি বলল্যাঃ! য়্যা, বদ্দোমানে বাড়ী? ... ৩৩৮
১০৪। বিজ্ঞানবীর সার হামফ্রী ডেভি ... ৩৪১
১০৫। আলো নিভাও, আলো নিভাও ... ৩৪৪
১০৬। অমনি দলে দলে লাখে লাখে পশু-পাখী তাদিকে ঘিরে ফেল্‌ল ... ৩৪৬
১০৭। বাঙ্গালী পালোয়ান ভূপেশচন্দ্র ... ৩৫৬
১০৮। পাখীদের পাঠশালা ... ৩৫৯

ভাদ্র

১০৯। চেয়ে আছে জগৎ সতৃষ্ণ! ইত্যাদি
১১০। সাইকেলের সঙ্গে চালককে দৌড়াইতে হইত ... ৩৬৮
১১১। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের একটু অংশ ... ৩৬৯
১১২। শীতকালে শ্রীনগরে কেমন দেখায়? ... ৩৬৯
১১৩। ডাল হ্রদের একাংশ }
১১৪। গুলমার্গের একটী দৃশ্য } ৩৭০
১১৫। পাখী বেচারা...প্রাণ ছাড়িয়া দিল ... ৩৭১
১১৬। ধর্ম্মব্যাধ...কসাইখানায় বসিয়া মাংস বেচিতে ব্যস্ত ... ৩৭৪
১১৭। আলোর সন্ধানে ... ৩৮৫
১১৮। উঃ, কি প্রভেদ, ... ৩৯৪
১১৯। ক্রমে এমন প্রকাণ্ড মানুষ মারা কল করা হইয়াছে ... ৩৯৮
১২০। দোষ দিও না আমায় কোন ... ৪০১
১২১। সুপ্রভার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল ... ৪০৩
১২২। পুরা টাকাটাই যখন তাহারা দিবে...ফিরাইয়া দিতে যাইবে কেন? ... ৪০৬
১২৩। প্রকৃতির খেয়াল ... ৪০৯

ছবির নাম — পৃষ্ঠা

আশ্বিন,

১২৩। কালীয়দমন (রঙ্গিন)
১২৪। আর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত ... ৪১৬
১২৫। হাড় কয়েকখানি মাত্র পাইলেন ... ৪২১
১২৬। দক্ষিণ আফ্রিকায় একটী জায়গা—এখানে অসংখ্য হীরা পাওয়া যায় ... ৪২৪
১২৭। একেবারে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন ... ৪৩০
১২৮। ঘরে ঢুকিল দিবেন্দ্র, সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ... ৪৩৩
১২৯। আলেক্‌জান্দার ... ৪৩৮
১৩০। খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল ... ৪৪৭
১৩১। পিছনে কাহার পায়ের শব্দ না? ... ৪৫১
১৩২। সন্ন্যাসীর বেশে শ্যামাকান্ত ... ৪৫৪
১৩৩। সোঽহং স্বামিরূপে শ্যামাকান্ত ... ৪৫৬
১৩৪। ভীম-ভবানী ... ৪৫৭
১৩৫। গোবর ... ৪৫৮
১৩৬। গামা (বাঁদিকে) ও তাহার ভাই ইমামবক্স ... ৪৫৮

কার্ত্তিক,

১৩৭। "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে" (রঙ্গিন)
১৩৮। রামধনুর পরিচালকগণ ও কয়েকটি বন্ধু (পূর্ণ এক পৃষ্ঠা)
১৩৯। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত—(১৫ বছর আগেকার ছবি) ... ৪৬৯
১৪০। একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাহির করিলেন ... ৪৭২
১৪১। শামুকের (গুগ্‌লির) দাঁত ... ৪৭৫
১৪২। মাছির চোখ ... ৪৭৬
১৪৩। মাছির মত চোখ হইলে কেমন দেখাইত ... ৪৭৭
১৪৪। মুনির আশ্রম ... ৪৮০
১৪৫। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪৮৫
১৪৬। এক নিগ্রোর দলের সঙ্গে কি ভীষণ মারামারি ... ৪৯৫
১৪৭। মাঝপথে একখানা বাঁশকে নুইয়ে ধরে ... ৪৯৭
১৪৮। শিশু-সাঁতারু শ্রীমান্ বলাইদাস সরকার ... ৪৯৯
১৪৯। বীর নারী ... ৫০০
১৫০। জানোয়ারের ভদ্রতা-জ্ঞান ... ৫০৯
১৫১। মাছের বড়শী বাওয়া ... ৫১০
১৫২। হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল ... ৫২১
১৫৩। আঁৎকাইয়া উঠিয়া হাত দশেক সরিয়া গেলেন ... ৫২৩
১৫৪। "ওকি কথা? ওতে আমার বড় ভয় করে।" ... ৫২৬

ছবির নাম — পৃষ্ঠা

অগ্রহায়ণ

১৫৫। দার্জ্জিলিংএর পথে (রঙ্গিন)
১৫৬। ইহার নাম সিম্প্‌সন্ ৫৩৩
১৫৭। শিলি ৫৩৪
১৫৮। প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল ৫৩৭
১৫৯। পাঁচ দিন চার রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া ৫৩৭
১৬০। পঞ্চাশ জন ছাত্র একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—“আমি আমি!” ৫৩৮
১৬১। এমন সময় সেখানে আসিয়া হাজির হইল, এক বেজী ৫৫৩
১৬২। সেই ছাতুর উপর আমি লুটোপুটি খাইতে লাগিলাম ৫৫৭
১৬৩। গাজী মুস্তাফা কেমাল পাশা ৫৬১
১৬৪। ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক ৫৬৮
১৬৫। “ওরে! কে আছিস্ রে! আমায় নিয়ে গেল রে! ৫৭২
১৬৬। চুম্বকের শক্তি ৫৭৩
১৬৭। আজকালকার কাগজের কল ৫৭৪
১৬৮। হুকাকাশি ঘরে ঢুকিয়াই দরজায় খিল লাগাইয়া দিলেন ৫৭৬
১৬৯। তা’ হতেই পারে না ৫৭৯

পৌষ

পৃষ্ঠা

১৭০। “ঝলিতেছে জল, তরল অনল, (রঙ্গিণ)
গলিয়া পড়িছে অম্বর-তল।” ৫৮০
১৭১। কামারের ছেলে হার্বার্ট হুবার ৫৮২
১৭২। বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে তারা আস্‌ছিল ৫৮৭
১৭৩। হস্তী লুফি, দেখরে গুপি ৫৯০
১৭৪। গর্ত্তের মধ্যে থাকে এক ইন্দুর—গাছের উপর থাকে এক বিড়াল ... ৫৯২
১৭৫। জালটা কাটিয়া দিল ৫৯৫
১৭৬। এই দেবি-মূর্ত্তির নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্ ৫৯৭
১৭৭। মাইকেল্ ফ্যারাডে ৬০৫
১৭৮। রয়াল সোসাইটিতে ফ্যারাডের ঘর ৬০৮
১৭৯। ডিটেক্‌টিভ্ কুকুর চোরের সন্ধানে বাহির হইয়াছে ৬১৭
১৮০। পাখীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে ৬১৯
১৮১। গাছ চাপা না পড়িলে হয় ৬২০
১৮২। দুজনের মুখই রীতিমত গম্ভীর ৬২৪
১৮৩। প্রাণপণে···ছুটিয়া পালাইতেছে ৬২৭
১৮৪। ৺লালা লাজপৎ রায় ৬২৯

রামধনু—

আসিছ বঙ্গে, হাসিছে রঙ্গে
সবে মিলি মহানন্দে,
জীবন প্রভাতে রামধনু, মাগো,
পদযুগ তব বন্দে।

১ম বর্ষ | মাঘ, ১৩৩৪ | ১ম সংখ্যা

রামধনু

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল, এম্, আর, এ, এস্)

এই যে আমি **রামধনু!**
ভানুর সোণার কণায় ঝরা—
সাতটি রং-এ চিত্র করা—
এমন ধারা কার তনু ?
এবার শিশুর আবাসে
ছড়িয়ে দিতে জ্ঞানের কিরণ,
প্রাণের আলো—হাসির হিরণ,
উঠ্‌ছি নূতন আকাশে।

অঙ্গ আমার তাঁর অনু—
যিনি ভানুর আলোর খনি—
তোমার আমার মাথার মণি।
এই যে আমি রামধনু।

রামধনুর কথা

(সম্পাদক)

"When Science from Creation's face
Enchantment's veil withdraws,
What lovely visions yield their place
To cold material laws."

কথাটা ইংরাজকবি টমাস্ ক্যাম্বেলের। কবিরা ভাবের ঘোরে অনেক কথাই লেখেন। এখানে কবির আক্ষেপ এই যে যাহা (রামধনু) কল্পনার নেত্রে এত সুন্দর, এত মনোরম, বিজ্ঞান তাহাকে কয়েকটা সাদামাঠা নিয়মের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

কিন্তু আক্ষেপটা কি ঠিক ? কবির ভাবের আবেশ যেমন সুন্দর, বিজ্ঞানের নিয়মগুলিও তেমনি মনোরম। এখানে কবি যে ভাবের আবেশে বাধা পাইয়াছেন তাহার উৎপত্তি বাইবেলের একটা কাহিনী হইতে। কাহিনীটী এইরূপ ঃ—

সৃষ্টির কিছুকাল পরে ভগবান্ দেখিলেন যে পৃথিবী পাপে টলমল করিতেছে। দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন—এ সব দুষ্ট জীব আর রাখিব না। মানুষের মধ্যে বেশ ধার্ম্মিক ছিলেন নোয়া। ভগবান্ নোয়াকে বলিলেন "পৃথিবী জলে ভাসিয়া যাইবে, তুমি এমন একখানা জাহাজ তৈয়ারি কর যাহাতে তোমার সন্তানসন্ততি ও বংশরক্ষার জন্য যোড়ায় যোড়ায় পৃথিবীর সব রকম জীবজন্তু

লইয়া তুমি বাস করিতে পার।" নোয়া তাঁহার আদেশ মত এক তেতালা জাহাজ গড়িয়া ফেলিলেন—জাহাজখানি ৩০০ হাত লম্বা, ৫০ হাত চওড়া আর ৩০ হাত উঁচু। নোয়া নিজের পুত্র, তিন পুত্রবধূ আর যোড়ায় যোড়ায় জীবজন্তু লইয়া সেই জাহাজে চড়িলেন। কয়েকদিন পরেই বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ৪০ দিন ৪০ রাত বেদম বৃষ্টি—পৃথিবী সেই বৃষ্টির জলে ১৫০ দিন পর্য্যন্ত ডুবিয়া রহিল। নোয়ার তেতালা জাহাজে যাহারা ছিল তাহারা বাঁচিয়া গেল, আর কেহই বাঁচিল না। ভগবান্ তখন বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নোয়াকে জাহাজ হইতে নামিতে বলিলেন—আরও বলিলেন "আমি আর এ ভাবে জীবজন্তু নষ্ট করিব না, যখন মেঘ উঠিবে তখন আমার ধনুও আকাশে উঠিবে ; ঐ ধনু দেখিলেই তোমরা বুঝিবে আর জলে ভাসিয়া যাইবার ভয় নাই, আমারও মনে পড়িবে আমি অভয় দিয়াছি।" সেই হইতে আকাশে নানাবর্ণে চিত্রিত ঐ ধনু ঝড়বৃষ্টির পর ভগবানের অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। বাইবেলে ও অন্যান্য অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায় সেকালে ভগবান্ ভক্তের সহিত কথা কহিতেন। অনেক ভক্তের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ভক্তের উপর ভগবানের এ দয়াটুকু এখনও রহিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে ভগবানের এই ধনুককে চলিত কথায় রামধনু বলে ; পূর্ব্ববঙ্গে বলে 'রামের হাতের ধনুক'—সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার নাম ইন্দ্রধনু। রাম ছিলেন আদর্শ রাজা, অদ্বিতীয় বীর—তিনি ভগবানের অবতার ছিলেন বলিয়া এদেশে বিশ্বাস। সুতরাং তাঁহার ধনুক বলিলে ভগবানের ধনুকই বলা হইল। ইন্দ্রও দেবতাদের রাজা, মেঘ তাঁহার বাহন, সুতরাং তাঁহার ধনুও দৈব ধনু।

কবিরা রামধনুর মধ্যে এই দৈবভাব দেখিতেই ভাল বাসেন। এই ভাবের মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে ? কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ লিখিয়াছেন "রামধনু দেখিলেই আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া ওঠে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখনও এইরূপ ছিল, আমি এখন বড় এখনও সেইভাব, আমি বুড়া হইয়া গেলেও যেন এই ভাবই থাকে, না থাকিলে যেন আমার মৃত্যু হয়।"

এখন দেখা যাউক, বিজ্ঞান রামধনুর যে ব্যাখ্যা করে তাহার মধ্যে মনোহারিত্ব কিরূপ ? বিজ্ঞানের মতে সূর্য্যের যে সাদা কিরণ তাহা বাস্তবিক ৭টী বর্ণ মিশিয়া হইয়াছে—সে ৭টী বর্ণ বেগুণে, গাঢ় নীল, আকাশের মত নীল, সবুজ, হরিদ্রা, কমলা রং, লাল। কোন ত্রিকোণ কাচখণ্ড (prism) সূর্য্যকিরণের উপর ধরিলে ঐ কিরণ বিভক্ত হইয়া এই বর্ণগুলি পৃথক্ ভাবে দেখা দেয়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এই কাচখণ্ডেরই মত। সূর্য্যের কিরণ উহার উপর পড়িয়া ৭ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়, সেই ৭ খণ্ডই রামধনুর ৭টী রং। তবে কথা হইতেছে, এই রংগুলি সোজাভাবে দেখা না দিয়া ধনুকের মত বাঁকা হইয়া দেখা দেয় কেন ? এটাও বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় নিয়ম। ধনুক কতটা গোল হইবে তাহা নির্ভর করে সূর্য্যের থাকিবার স্থানের উপর। তোমরা যখন আলোকবিজ্ঞান পড়িবে তখন এ সকল ভালরূপ বুঝিতে পারিবে ও দেখিবে বিজ্ঞানের মধ্যেও কতটা সৌন্দর্য্য আছে।

এইরূপে যে সূর্য্যের কিরণ বৃষ্টির উপর পড়িয়া রামধনুর সৃষ্টি করে সে ত ভগবানেরই লীলা, তাঁহারই বিচিত্র বিধান। বিজ্ঞানের নিয়ম তাঁহারই নিয়ম—রামধনু তাঁহারই ধনু। যে অবস্থায় রামধনুর সৃষ্টি হয় সে অবস্থায় বেশী বৃষ্টি হইতে পারে না—জলপ্লাবনের ভয় থাকে না। সুতরাং বাইবেলের কথাটা একেবারে নিরর্থক নয়।

এ'ত গেল কবির কথা, ধর্ম্মগ্রন্থের কথা, সত্যিকার রামধনুর কথা। আমাদের **রামধনুর** সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি ? সম্পর্ক বেশ আছে। আকাশের রামধনু দেখায় সূর্য্যের কিরণ, আমাদের 'রামধনু' দেখাইবে "জ্ঞানের কিরণ।" জ্ঞান রামধনুর মতই বিচিত্র, রামধনুর মতই মনোরম। রামধনুতে যেমন সূর্য্যের কিরণ নানাবর্ণে বিভক্ত, বিদ্যার শুভ্রজ্যোতিরও সেইরূপ নানা বিভাগ। মোটামুটী বলিতে গেলে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস ও জীবনী, বিশ্বের নানা বিবরণ, অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র। প্রত্যেক বিভাগের অবশ্য অনেক উপবিভাগ আছে।

সাহিত্য—বেগুণে রং এর মতই সুন্দর, বিবাহে প্রীতি-উপহারের কবিতার বেলা এই রংই আগে মনে পড়ে।

বিজ্ঞান—ইহার নূতন নূতন আবিষ্কার ঘোর রক্তবর্ণের মত চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়।

গণিত—অনেক কষিয়া পিষিয়া খাঁটি সত্য বাহির করিতে হয়, নীল গাছ হইতে তাহার গাঢ় রং বাহির করার মত।

ইতিহাস ও জীবনী—পুরাতন হইলেও নিত্য নূতন—সবুজ বর্ণের কথা সহজেই মনে আসে।

বিশ্বের বিবরণ—ইহাতে নীল আকাশ, নীল সমুদ্র ইত্যাদির কথাই বেশী।

অর্থশাস্ত্র—ভারতযুদ্ধে কর্ণধার পীতবাস শ্রীকৃষ্ণ এই শাস্ত্রে খুব প্রাজ্ঞ ছিলেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র—কমলালেবুর মত, খোসা শক্ত হইলেও ভিতরে সরস।

এক রং অনেক সময়ে তাহার পাশের রংএর সঙ্গে মিশিয়া যায়। সাহিত্য-বিজ্ঞানাদিরও ঐ কথা। কোন কোন সময়ে একটা বিষয় ইতিহাসের মধ্যে কি সাহিত্যের মধ্যে কি বিজ্ঞানের মধ্যে ফেলিতে হইবে তাহা ঠিক করা কঠিন হয়, কারণ সকলটারই কিছু কিছু হয়ত সেই বিষয়টীতে আছে। সময় সময় আকাশে রামধনু ওঠে কিন্তু তাহার সব কটী রং একসঙ্গে ভালরূপ ফুটিয়া ওঠে না। সেটা নির্ভর করে সূর্য্যের ও বৃষ্টির অবস্থার উপর। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহাই।

মোট কথা আমরা রামধনুর নানা বর্ণের মত জ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখা লইয়া প্রতিমাসে হাজির হইতে ইচ্ছা করি। তাই আমাদের কাগজের নাম রাখা হইয়াছে **রামধনু**।

বাঙ্গালী পালোয়ান *

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্, এ)

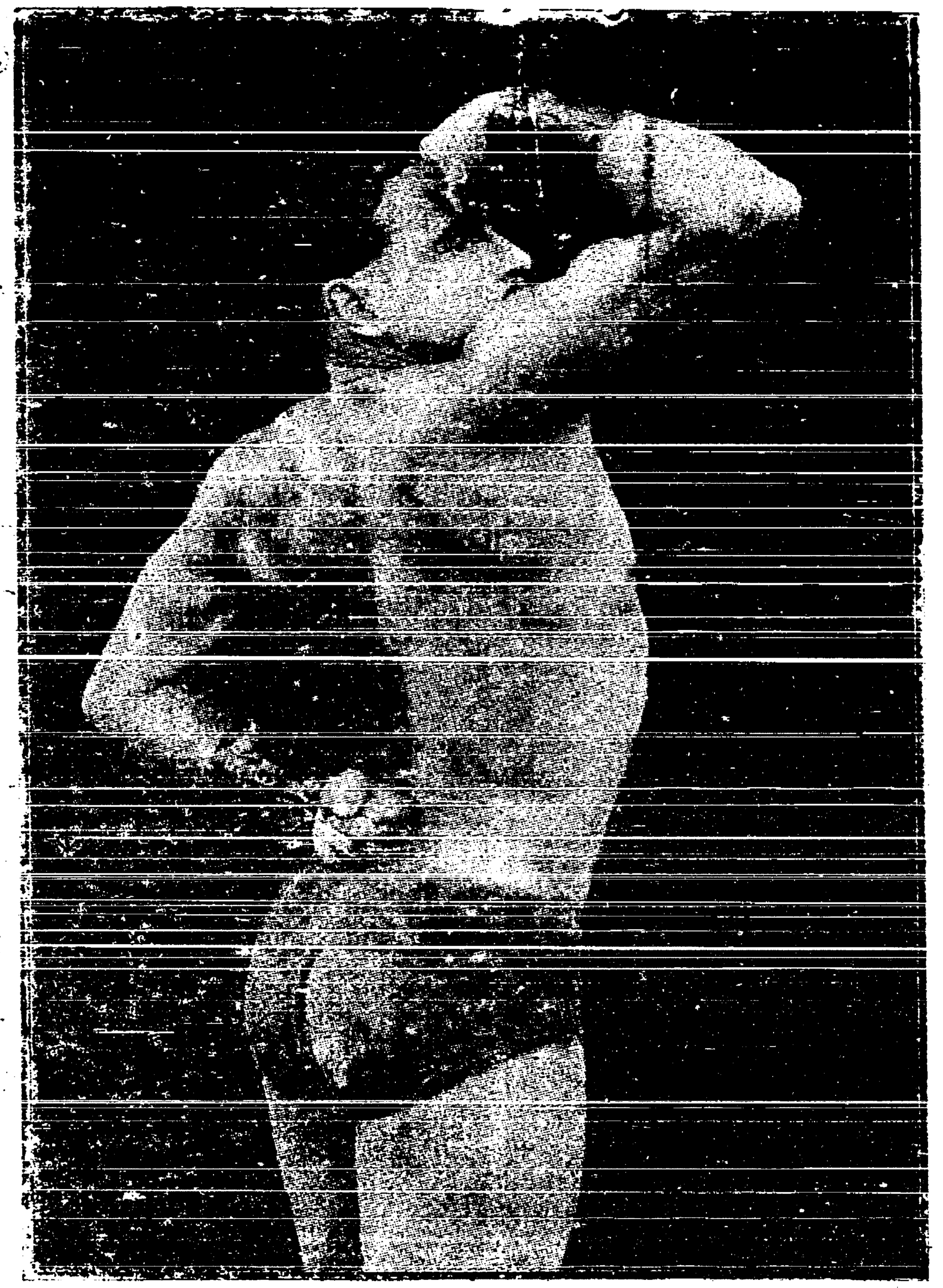

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গুহঠাকুর্তা

তোমাদের মধ্যে যাহারা কলিকাতায় থাক তাহারা হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে আজকাল অনেক সময়ে বাঙ্গালীর ছেলেরা চলন্ত মোটর গাড়ী থামাইয়া দিতেছে। সেদিন খবরের কাগজে দেখিতেছিলাম বাংলার কোন একটা সহরে বছর পনের বয়সের একটী বালক একখানা চল্‌তি মোটর গাড়ী থামাইয়া সহর শুদ্ধ লোককে একেবারে অবাক্ করিয়া দিয়াছে। আমাদের ছোট বেলায় কিন্তু এটা বড় একটা দেখা যাইত না। মনে পড়ে আমাদের স্কুলে পড়ার সময় একবার রামমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার মোটর টানার কসরৎটা দেখাইয়াছিলেন। আর কি রক্ষা আছে? আমাদের হোস্টেলে দিন নাই রাত নাই, প্রত্যেক ঘরেই কেবল এক কথা—রামমূর্ত্তি আর

* এই রচনার প্রত্যেকটী ঘটনা রাজেন্দ্রনাথের নিজের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছি।

মোটর গাড়ী। শেষে ব্যাপারটা এতদূর গড়াইল যে একদিন হোষ্টেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জুতা নীচে রাখিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া দেখিয়া গেলেন যে আমরা সন্ধ্যার পর বই খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছি, না রামমূর্ত্তিকে দিয়া ঘরে ঘরে মোটর গাড়ী টানাইতেছি। আজকালকার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টরা কিন্তু জুতা পায় দিয়া শব্দ করিয়াই উপরে উঠেন। তাঁহাদের ছাত্রেরা তো এরূপ ব্যাপার নিয়া আজকাল আর কোলাহল করে না—তাহারা যে নিজেরাই মোটর গাড়ী থামাইতে শিখিতেছে!

তোমরা নিশ্চয় ভাবিতেছ—এটা সম্ভব হইল কি করিয়া? বাঙ্গালীর ছেলেদের আবার মালকোছা মারিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার সুমতি কে দিল? সেই কথাই আজ তোমাদিগকে বলিব।

উপরে যে একজন পালোয়ানকে দেখিতেছ ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা। বরিশাল জেলায় বানরিপাড়া নামে একটা মস্ত গ্রাম আছে—সেখানকার গুহঠাকুরতারা মস্ত বংশ, গোটা বাংলা জোড়া তাঁহাদের নাম। নিজে বড় বংশের ছেলে, আবার নজরটাও সেই রকমই উঁচু। রাজেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে তাঁহার শরীরে যে ভীমের মত জোর ইহা লইয়া যদি তিনি সারা ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া কেবল মোটর টানিয়া ও বুকের উপর হাতী লইয়া বেড়ান, তাহা হইলে টাকা পয়সা হয়তো রোজগার করিবেন যথেষ্ট কিন্তু দেশের তাহাতে কি উপকার হইবে? তাহার বদলে যদি বাংলা দেশের স্থানে স্থানে তাঁহারই মত কতকগুলি পালোয়ান তৈরি করিয়া দেন তাহা হইলে একটা কাজের মত কাজ করা হইবে। তাই রাজেন্দ্রনাথ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে তাঁহার সারা জীবনে অন্ততঃ একশ জন ছেলেকে এমনি করিয়া গড়িয়া দিবেন যে যে কোন দেশের পালোয়ানের সহিত যেন তাহাদের তুলনা চলিতে পারে। এই কাজই আজকাল তিনি করিতেছেন।

ছোট বেলায় রাজেন্দ্রনাথের গায়ের জোর যত না ছিল মনের জোর ছিল তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী। একবার তাঁহাকে বলিলেই হইত "অমুক কাজটা তুমি পারিবে না—অসম্ভব।" অসম্ভব? আর যায় কোথায়? রাজেন্দ্রনাথ রুখিয়া

যাইতেন—সেই যে সেই কাজের পিছনে লাগিলেন, তাহাকে সারা না করা পর্য্যন্ত আর অন্য কথা নাই—তুই দিন হউক, তুই মাস হউক, তুই বৎসর হউক সে কাজ করিবেনই করিবেন। নেপোলিয়ন যে বলিতেন "অসম্ভব? অসম্ভব আবার কি—ও নামের কোন জিনিষ নাই।" এও অনেকটা সেই রকমই আর কি। যেই একবার অসম্ভব কাজ সম্ভব হইয়া গেল অমনি আর রাজেন্দ্রনাথকে পায় কে? তাঁহার মনের জোর দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল; দ্বিগুণ অসম্ভব আর একটা কাজ তিনি ধরিয়া বসিলেন। সমবয়সীরা ভাবিতেন এবার ছোক্‌রা নিতান্তই মারা গেল দেখিতেছি, কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজেন্দ্র দেখাইয়া দিতেন যে তিনি নিজে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের মিথ্যা ধারণাটাই মাঠে মারা গিয়াছে। সেই সময় তিনি বরিশালে সূর্য্যকান্ত গুহঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম কসরৎ শিখিতেছিলেন। সূর্য্যবাবু নিজেতো মস্ত পালোয়ান ছিলেনই, তাহার উপর তিনি আবার ছিলেন বিখ্যাত বাঙ্গালী বীর শ্যামাকান্তের বন্ধু। শ্যামাকান্তের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ—সেই অদ্ভুত মানুষটি যিনি সোজা গিয়া টাট্‌কা-ধরা বুনো বাঘের খাঁচার মধ্যে খালি হাতে ঢুকিতেন এবং তাহার পর অনায়াসে সেই হিংস্র জীবটাকে কাবু করিয়া ফেলিতেন। শ্যামাকান্ত আরও একটা ভয়ানক কাজ করিতেন। বুকের উপর তিনি ভারী ভারী বিশাল পাথর চাপাইতেন—মাথা ও পা থাকিত উঁচুতে, শরীরটা ঝুলিত শূন্যে। বালক রাজেন্দ্রনাথ ছোট বয়স হইতেই এই সকল কথা শুনিতেন আর মনে মনে স্বপ্ন দেখিতেন আহা তিনি যদি বুকের উপর ঐ রকম ভার লইতে পারিতেন! সূর্য্যকান্তের আখড়ায় একটা সাতমণ ওজনের পাথর ছিল; কোন কোন পালোয়ান কখনও কখনও সেটাকে বুকে তুলিতেন। বালক রাজেন্দ্রনাথের মাথায় একদিন খেয়াল চাপিল ঐ পাথরটা বুকে তুলিতে হইবে। কিন্তু সূর্য্যবাবুর অনুমতি তো চাই; গেলেন ছুটিয়া তাঁহার কাছে। সূর্য্যবাবু তো সব কথা শুনিয়া অবাক্—ছোক্‌রা বলে কি? ক্ষেপিয়া গেল নাকি? কিছুতেই রাজী হইবেন না, কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের জেদের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিবে

কতক্ষণ? শেষটায় নিতান্ত ভয়ে ভয়ে তিনি রাজী হইলেন; মনে মনে মতলবটা রহিল এই, যে একটু বেগতিক দেখিলেই পাথরটাকে নিজে ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিবেন।

রাজেন্দ্রনাথের বুকের উপর পাথরটা চাপান হইল, কিন্তু হরি হরি, বালক ত দমে না বরং যাহারা চারিপাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল তাহাদিগকে পাথরের উপর চড়িয়া বসিতে ইসারা করে দেখি! তাই তো, ছেলেটার বুকখানা লোহা দিয়া গড়া নাকি! সকলে অবাক্!

বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ ও জিলাস্কুলের মধ্যে ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা হইতেছে; সহর ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া জুটিয়াছে সেইখানে। নানারকম খেলা হইতেছে, এমন সময় দেখা গেল অনেক লোক মিলিয়া ১টা ১৪।১৫ মণ ওজনের রোলার টানিয়া আনিতেছে। সকলেই মনে করিল বোধ হয় একটা নূতন রকমের খেলা দেখান হইবে, মাটিটা বোধহয় একটু পালিস্ করা দরকার, তাই রোলার আসিতেছে। কিন্তু ওকি! রাজেন্দ্রনাথ গিয়া ওখানে শুইয়া পড়িল কেন? ঐ রোলারটা উহার বুকে চাপাইবে নাকি! তবেই হইয়াছে আর কি! হায়রে হায়, সারাদিনের আনন্দটা বোধ হয় আজ প্রাণিহত্যার বিষাদে পরিণত হয়! সহরশুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, কিন্তু চৌদ্দ পনের জন লোক যখন বাঁশ দিয়া রোলারটাকে তুলিয়া বাস্তবিকই রাজেন্দ্রনাথের বুকের উপর চাপাইয়া দিল তখন ভয়ে অতগুলি লোক আর কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিল না। তারপর যখন দেখা গেল শুধু রোলার চাপাইয়াই ব্যাপারটী থামিল না, উপরন্তু তাহার উপর অনেকগুলি লোকও গিয়া চাপিয়া বসিল তখন সেই বিশাল জনতা বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কসরৎ দেখাইয়া যখন ডাকাত ছেলেটী গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া জনতাকে অভিনন্দন করিল তখন হাজার হাজার লোক হাততালি ও জয়ধ্বনিতে সমস্ত মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিল।

একবার যখন রোলার বুকে নেওয়া আরম্ভ হইল তখন আর রাজেন্দ্রনাথকে পায় কে? ক্রমাগত তিনি রোলারের ওজন বাড়াইয়া চলিলেন। শেষে একদিন কলিকাতায় আসিয়া একটা সার্কাসে ১১০ মণ ওজনের একটা রোলার বুকে

চাপাইয়া সমস্ত কলিকাতা সহরটাকে তাক্ লাগাইয়া দিলেন। বাঙ্গলাময় রাজেন্দ্র-নাথের নাম বাহির হইয়া গেল।

রাসিয়ান স্যাণ্ডো ক্রোমার আসিয়াছেন কলিকাতায় খেলা দেখাইতে। একটা আড়াই ইঞ্চি চওড়া আধ ইঞ্চি পুরু লোহার ডাণ্ডাকে তিনি কেবল হাতের মোচড় দিয়া বাঁকাইয়া গোল করিলেন। দেখিয়া সকলের মুখে আর কথাটী নাই। এরূপ কাণ্ড যে কেহ করিতে পারে তাহাও বোধ হয় লোকে না দেখিলে বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ। সকলের সহিত রাজেন্দ্রনাথও ব্যাপারটা দেখিলেন। অমনি তাঁহার ভিতরের দৈত্যটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "কি ? একজন লোক এ কাজটা করিল, আর আমি পারিব না!" সেইদিনই বাজার হইতে লোহার ডাণ্ডা কিনিয়া আনিয়া অভ্যাস আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং কিছুদিন পরেই এক সভা লোকের মধ্যে ক্রোমারের মত মাপেরই একটা লোহার ডাণ্ডাকে হাতে জড়াইয়া কেন্নো বা কেড়াকে টোকা মারিলে সে যেমন কুণ্ডলী পাকায়, ঠিক সেইরকম কুণ্ডলী পাকান অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়া দিলেন।

একবার রাজেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল বুকের উপর হাতী উঠাইতে হইবে। বুকের উপর হাতী লওয়া যে কতখানি বিপদের কাজ তা তোমরা সকলেই বুঝিতে পার। হাতী মহাশয় যদি বুক হইতে নামিতে রাজি না হন, তাহা হইলেই মুস্কিল, কেননা অতবড় একটা জানোয়ারকে মানুষে আর কতক্ষণ বুকে রাখিতে পারে ? এইজন্য পালোয়ানেরা প্রায়ই সার্কাসের শিক্ষিত হাতী বুকে উঠান। রাজেন্দ্রনাথ বলিলেন "সার্কাসের হাতী টাতী না, এমনি সাধারণ হাতী বুকে উঠাইতে হইবে, তাহা না হইলে আর বাহাদুরী কি" ? চট্টগ্রাম সহরে একটা হাতী উঠান হইবে ঠিক হইল। হাতীটার মেজাজখানা একেবারে ফরমাস দিয়া গড়া। রাজেন্দ্রনাথের বুকের উপর একখানা তক্তা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উপর দিয়া সে একরকম ছুটিয়াই চলিয়া গেল। একবার গিয়াও সাধ মেটে নাই, আরও একবার আসিতেছিল, মাহুত বহু চেষ্টায় থামাইয়া রাখে। ১৯২৬ সনে রাজেন্দ্রনাথ নোয়াখালি সহরে দেওপাড়ার ঠাকুরদের হাতী বুকে উঠান। সে কি হাতী!

ঐরাবতের ছোট ভাই বলিলেই হয়। প্রায় ফুট্ নয়েক উঁচু। ইহা হইতেও বড় হাতী রাজেন্দ্রনাথ বুকে লইয়াছিলেন গত বৎসর চট্টগ্রামেই। সেই হাতীটার ছবি এখানে দেওয়া হইল, হাতীর সম্মুখে যিনি দাঁড়াইয়া তিনিই রাজেন্দ্রনাথ। হাতীটার ওজন ১১৫ মণ, এত বড় হাতী আর কেহ কোথাও বুকে লইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

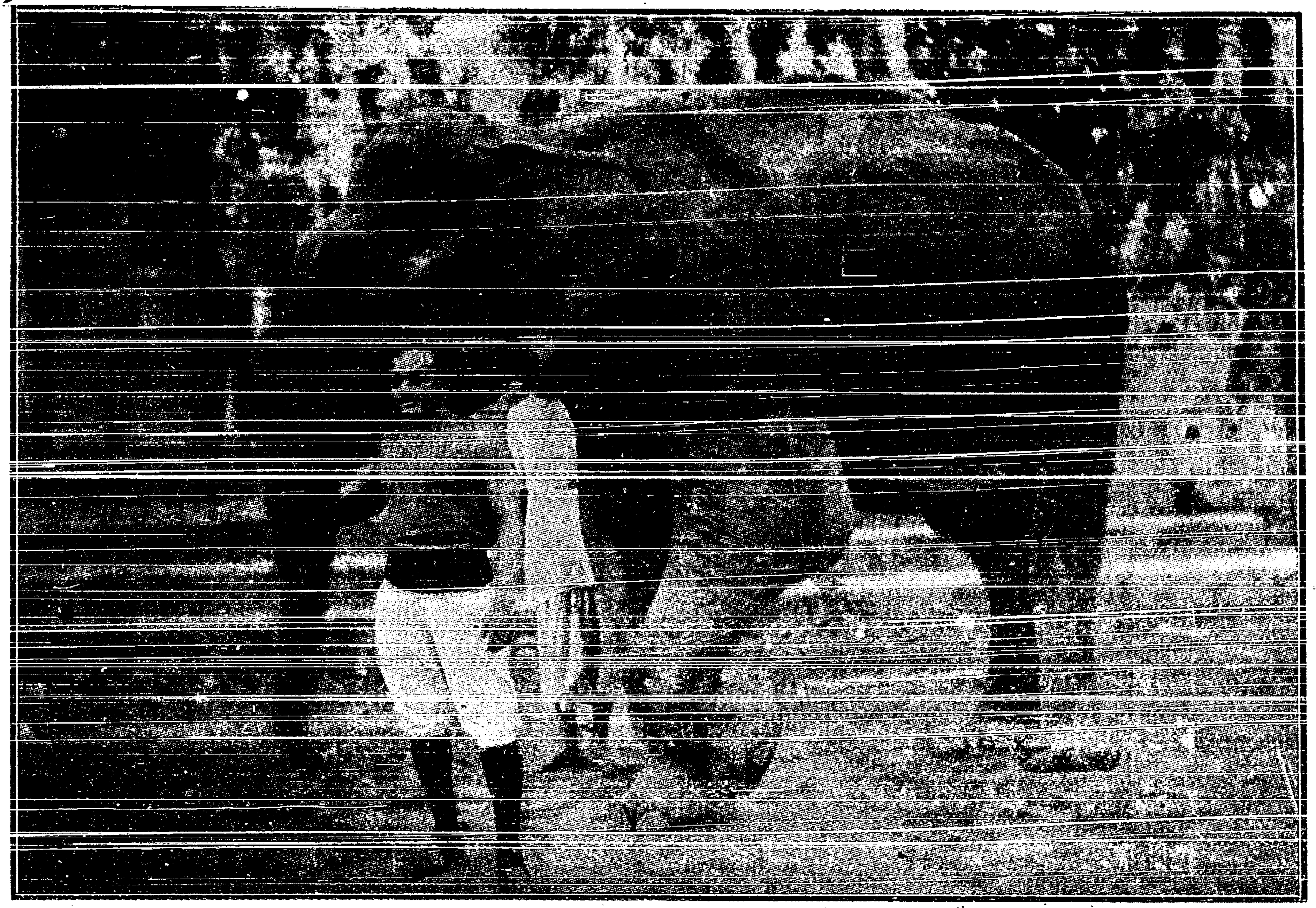

এই হাতীটার ওজন ১১৫ মণ, রাজেন্দ্রনাথ চট্টগ্রামে ইহাকে বুকে তুলিয়াছিলেন:

মোটর গাড়ী লইয়াও রাজেন্দ্রনাথ নানারকম কসরৎ দেখাইতে পারেন। খান দুই মোটর গাড়ী অনায়াসে টানিয়া রাখেন। মাঝে মাঝে আবার তিনি শুইয়া পড়েন আর তাঁহার শরীরের যেখান দিয়া খুসী লোকে মোটরগাড়ী চালাইয়া দেয়।

গাড়ীখানা তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চসিয়া গেলে তিনি উঠিয়া মুখখানা এমনি করেন যেন মনে হয় তাঁহার শরীরটা ধরিয়া গিয়াছিল, মোটর চলিয়া যাওয়ায় বেশ একটু ডলাই মলাইয়ের কাজ হইল।

রাজেন্দ্রনাথ যে বাংলায় একদল বীর তৈয়ারী করিতেছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের গুরুরই উপযুক্ত শিষ্য। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী রাজেন্দ্র-নাথের একজন প্রধান শিষ্য। আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, গোপাল বাবুও তখন সেই কলেজের ছাত্র। তিনি তখন সমস্ত কলেজটার গর্বের সামগ্রী। দিব্যি নাদুস্ নুদুস্ চেহারাখানা। স্বভাবখানা যেমন মিষ্টি, মুখের হাসিটীও তেমনি মিষ্টি, কলেজের ছেলেবুড়ো সকলেরই ছিলেন তিনি "গোপালদা"। হঠাৎ দেখিলে বুঝিবার উপায়ই ছিল না যে এই নিরীহ নাদুস্ নুদুস্ 'দাদা'টী মাত্র তিনখানা মোটর গাড়ী থামাইয়া রাখিতে পারেন।

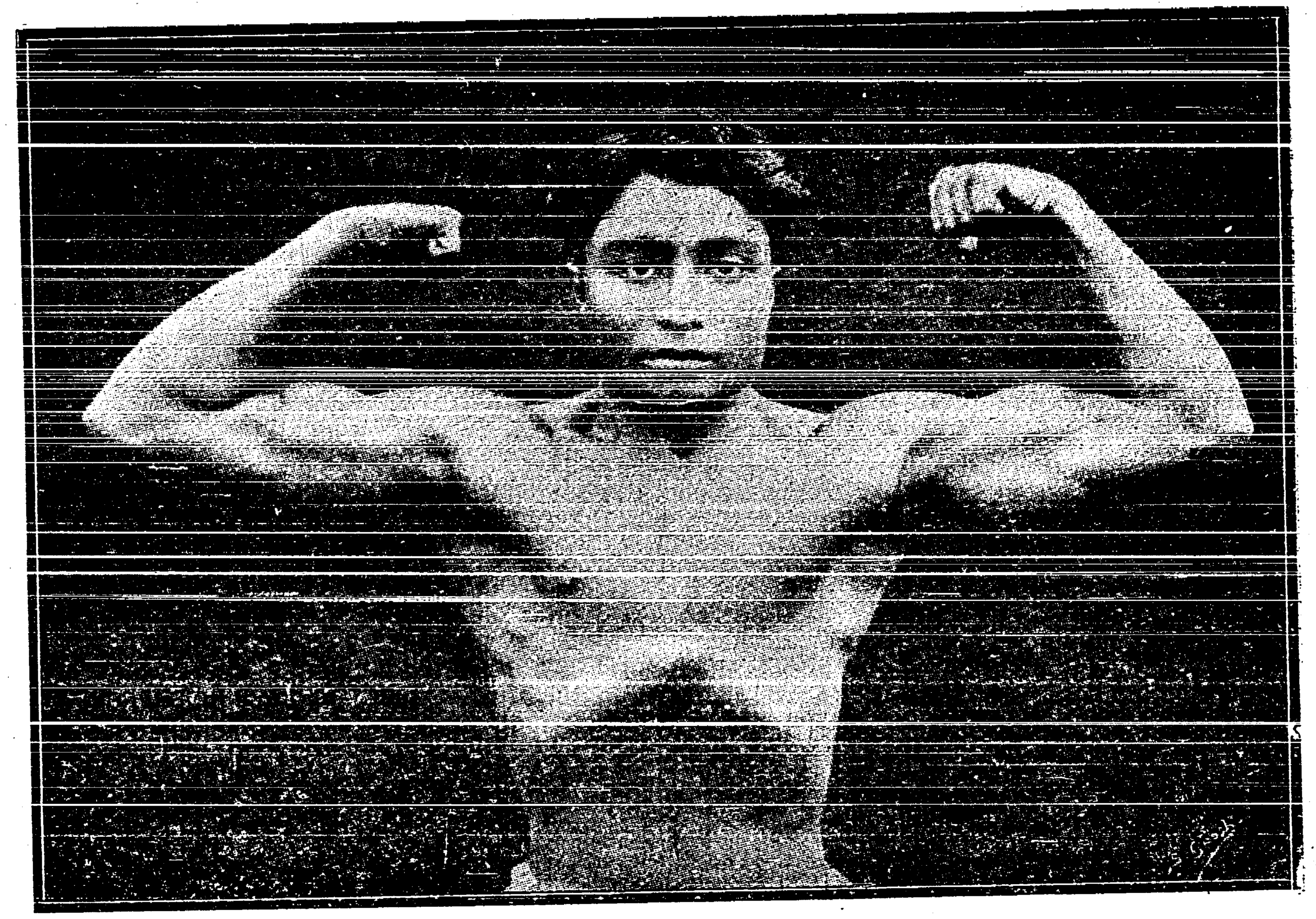

রাজেন্দ্রনাথের শিষ্য বিষ্ণুচরণ হাতের পেশী ফুলাইতেছে

ছবিতে দেখ রাজেন্দ্রনাথের আর একজন শিষ্য কেমন মনের সুখে হাতের পেশীগুলি ফুলাইতেছে, ইহার নাম বিষ্ণুচরণ ঘোষ। তোমরা muscle controller বি,সি, ঘোষের নাম হয়ত কেহ কেহ শুনিয়াছ ; বিষ্ণুচরণই বি, সি, ঘোষ। শরীরের প্রত্যেকটী মাংসপেশী (muscle) এ আলাদা করিয়া নাচাইতে পারে ; বিষ্ণুকেও আমি জানি তাহার ছেলে বেলা হইতে। ছেলে বেলায় ইহার চেহারা ছিল বেজায় রোগাটে, আর গায়েও জোর বলিয়া কোন জিনিষই ছিল না, খেলার সাথীরা "শ্রী বিষ্ণু" বলিয়া ক্ষেপাইত আর বিষ্ণু ভীষণ রাগিয়া যাইত। আজকাল কিন্তু ইহাকে আর কেহ ক্ষেপাইতে সাহস করে না, গায়ে যে জোর !

ঐ দেখ রাজেন্দ্রনাথের আর একজন শিষ্য বুকের উপর হাত দুইটী ভাঁজ করিয়া কেমন বীরের মত দাঁড়াইয়া আছে ; ভাবটা যেন "লড়িবে তো এক-বারটী কাছে এসো না ?" কাছে গেলে কিন্তু আর রক্ষা নাই, কেননা এই লোকটির শরীরখানা লোহা দিয়া গড়া বলি-লেই হয়। ইহার নাম কেশবচন্দ্র সেন, গায়ে অসুরের মত জোর। ভূপেশচন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নামে রাজেন্দ্রনাথের আরও এমন দুইটি শিষ্য আছেন যাঁহাদের মানুষ না বলিয়া দৈত্য বলিলেই

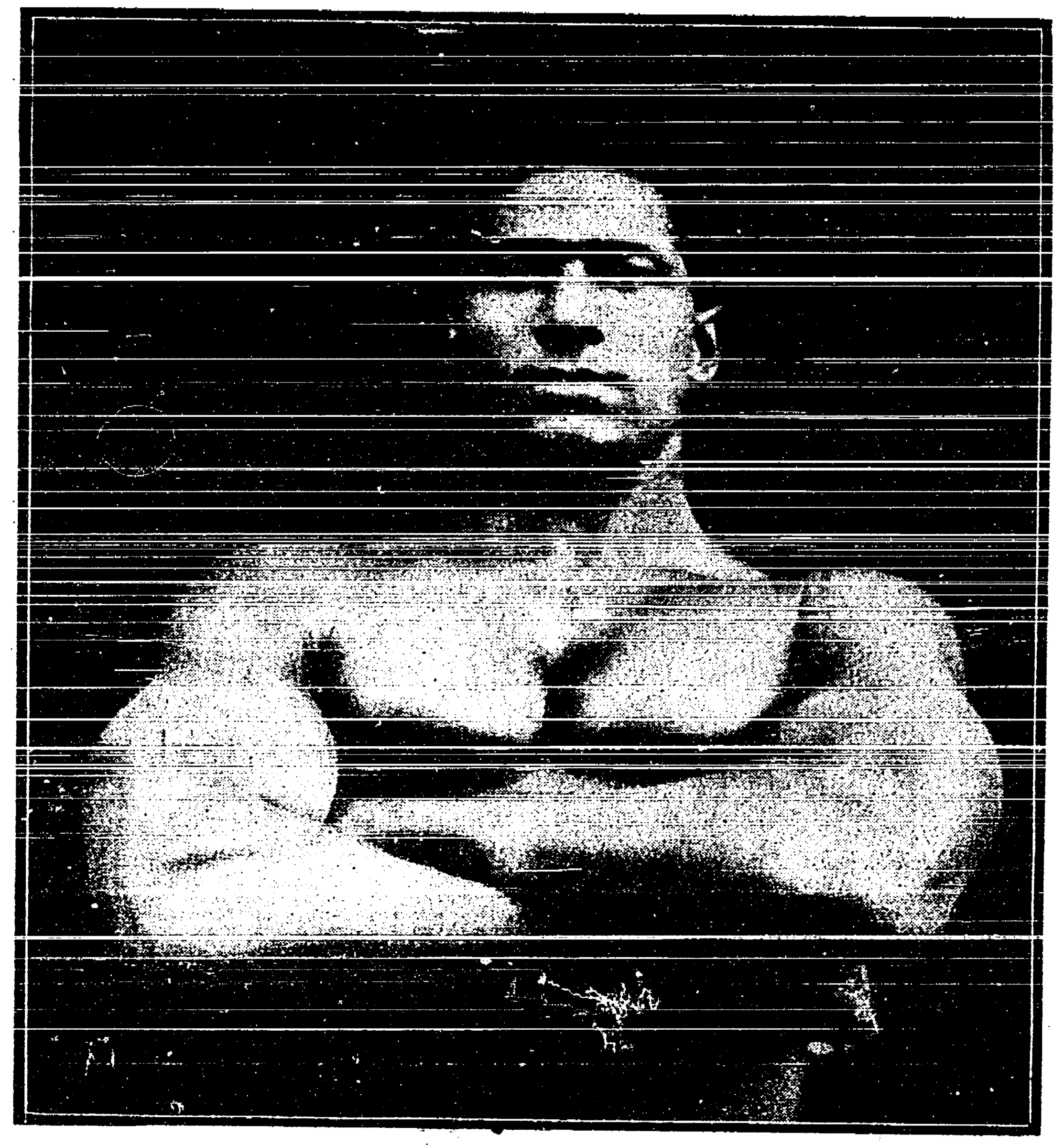

রাজেন্দ্রনাথের আর একজন শিষ্য কেশবচন্দ্র

হয়। ইঁহারা সকলেই অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারেন। একজন তো আমার চোখের সামনেই একটা লোহার ডাণ্ডাকে হাতে জড়াইয়া জিলাপীর মত পাক দিতে আরম্ভ করিলেন।

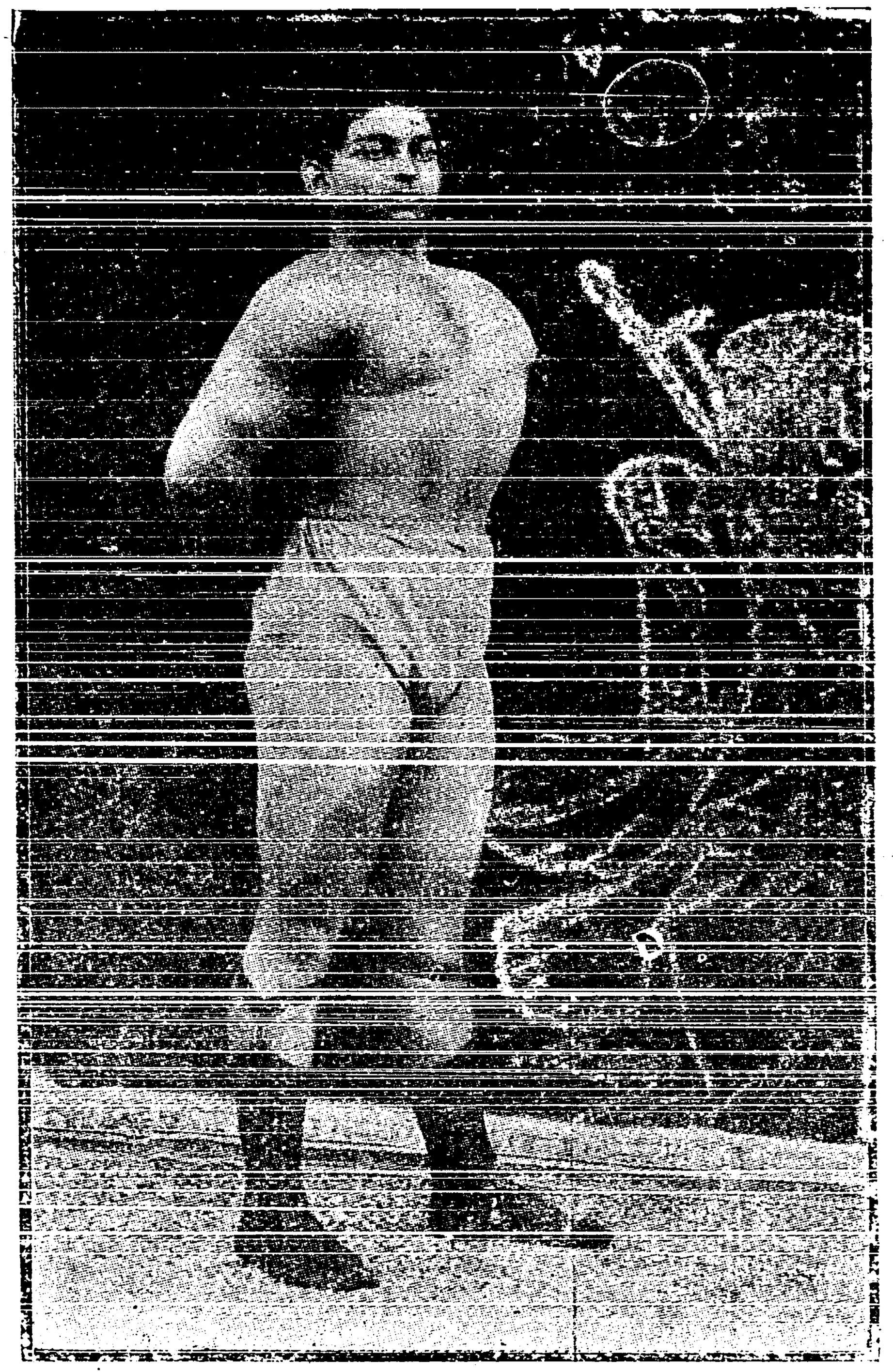

রাজেন্দ্রনাথের শিষ্য শ্রীমান্ সত্যপদ।

ছবিতে রাজেন্দ্রনাথের আর একজন শিষ্যের চেহারা দেখ। ইহার নাম শ্রীমান্ সত্যপদ ভট্টাচার্য্য, বয়স মাত্র উনিশ বৎসর, কিন্তু উনিশ বছরের ছেলের চেহারাখানা একবার দেখিয়াছ! ভারী জিনিষ তুলিতে (weight lifting) সত্যপদ বেজায় মজবুত। এ আমার ছাত্র (কলেজের)।

রাজেন্দ্রনাথের শিষ্যেরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত যুবক। প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি খুব ভাল করিয়া পাশ করিয়াছেন। বিদ্যা-উপার্জ্জন আর শক্তি-উপার্জ্জন দুইটাই যে একত্র বেশ চলিতে পারে ইঁহারা তাহা দেখাইতেছেন।

বাংলার ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল করিবার জন্য যে All Bengal Physical Association হইয়াছে রাজেন্দ্রনাথ তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সভাপতি আর স্যার সুরেন্দ্র নাথের ভাই ক্যাপ্টেন্ জিতেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক। ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ এককালে বাংলার

একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন। এখন বয়স হইয়াছে, কিন্তু এই বয়সেও অসাধারণ উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গিয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিটি কলেজ ও হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষা দেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন শীঘ্রই তিনি তাঁহার সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। তাঁহার তৈরি ১০০ জন ছাত্র যদি প্রত্যেকে অন্ততঃ দশ জন করিয়াও ছাত্র তৈরি করেন, তাহা হইলে খুব শীঘ্রই বাংলা দেশে ১০০০ জন পালোয়ানের সৃষ্টি হইবে। যে দেশে হাজারজন লোক চল্‌তি মোটর গাড়ী থামাইয়া রাখিতে পারে সে দেশের লোককে আর কেহ দুর্ব্বল বলিতে সাহস করিবে না।

নারদের-নিমন্ত্রণ*

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

নারদের নিমন্ত্রণ হে
বসন্তের ওই হাওয়ার মত,
সব দ্বারে ডাক দিয়ে যায়
টহলে গান গাহার মত।
শোনো সে মত কিসের—
হেমন্তে ধানের শিষের,
মাঘেতে কুম্ভমেলায়
প্রয়াগে ঠিক নাওয়ার মত।

২

অমৃতের ভোজে যেমন
বিশ্বজনে ডাকে সাধক,
মূষিকে ডাক্‌লে যেমন
হ্যামেলিনের বাঁশী বাদক।
চাতকে ফটিক জলে
আসিতে যেমন বলে,
প্রভাতে পদ্মদীঘির
লক্ষ ফুলের চাওয়ার মত।

* দেবতা প্রভৃতির ব্যাপারে নারদ নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইতেন এইরূপ প্রবাদ—খুব বড়দরের নিমন্ত্রণ—সম্পাদক।

শিখীরে যেমন ডাকে
নবঘনের গুরু গুরু,
অলিরে যেমন ডাকে
পরিমলের ভুরু ভুরু।
নীলাম্বু যেমন ডাকে
মথিতে আবার তাকে,
নিদাঘে পথের পাশে
বটের ঘন ছায়ার মত।

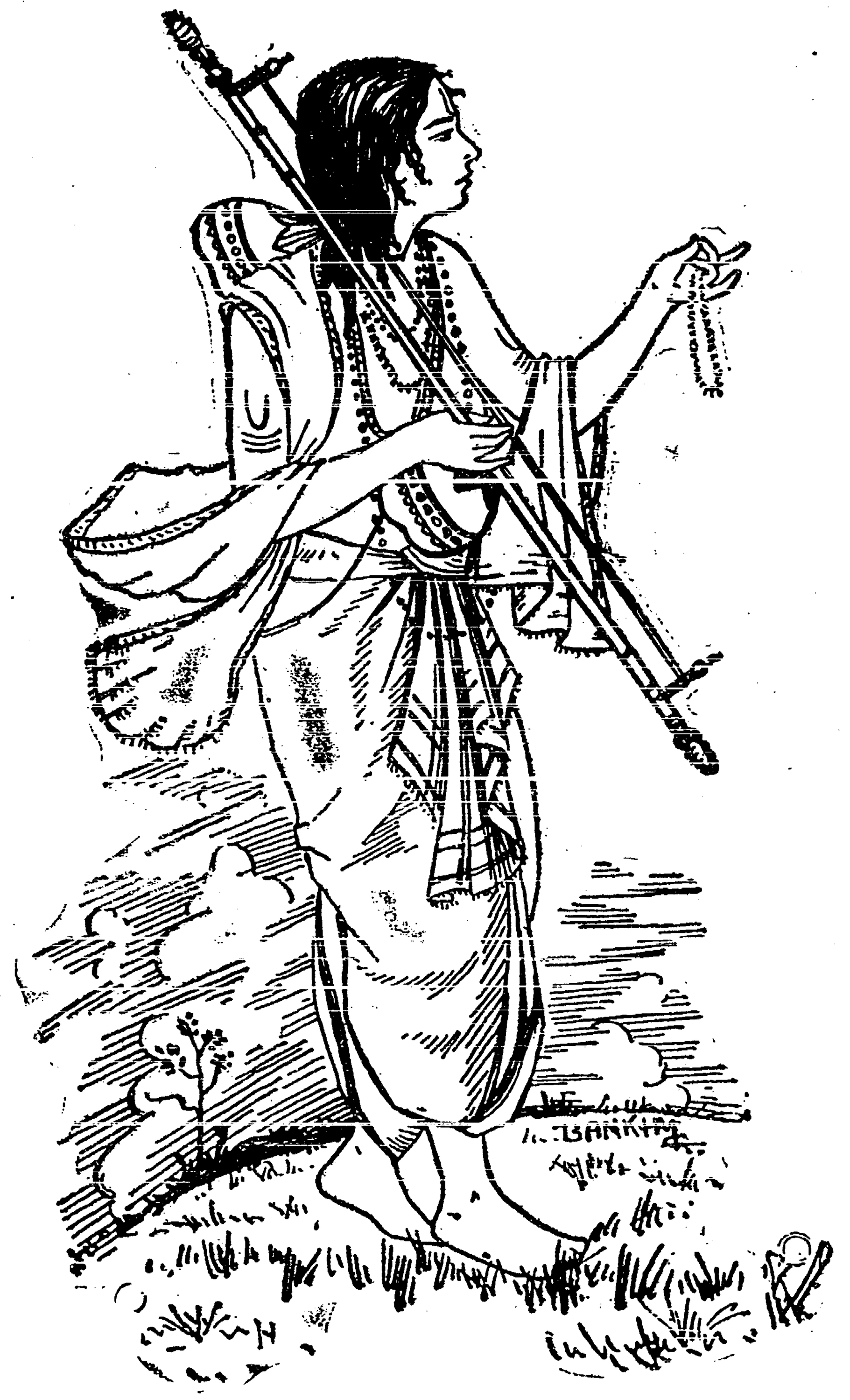

দেবর্ষি নারদ

ভৈরব শঙ্করী

(শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক)

এক চাষা ছিল, তার নাম ভৈরব। তার বৌ-এর নাম ছিল শঙ্করী। কোন্ ছেলেবেলায় দুজনের বিয়ে হয়েছে—কিন্তু একদিনের তরেও মনের মিল হয়নি। কি ক'রে হবে? এ যেটা বল্‌বে সাদা ও সেটা বল্‌বে কালো—আবার ও যেটা বল্‌বে মিষ্টি এ সেটা বল্‌বে তেতো।

গাঁয়ের সব লোকই বল্‌তো 'বরং আদায় কাঁচকলায় মিশবে তবু ভৈরব শঙ্করীতে নয়। ওরা যেন সাপ আর নেউল, কাক আর ফিঙে। কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া। ওদের ঝগড়ায় কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

চেহারাও ছিল দুজনের উল্টো। ভৈরব ছিল সাড়ে চার হাত লম্বা, কিন্তু তালপাতার সেপাই। আর শঙ্করী ছিল মাত্র আড়াই হাত লম্বা কিন্তু ঘেরে যেন একটা দুম্বো তাকিয়া।

একদিন ভৈরব বল্‌লে, 'ও শঙ্করী, একটু আগুন জাল্ না, বড্ড শীত পড়েছে যে,'—শঙ্করী হাত নেড়ে মুখ ভেংচে বল্‌লে—'তোর মুখে আগুন জাল্‌বো-–কোথায় শীত? গরমে দেখি আমার ঘাম ছুটচে।' খানিকক্ষণ পরে আবার শঙ্করী বল্‌লে—'কাল হাট থেকে একটা ছাঁচিকুমড়ো আনিস, মিঠ্‌কুমড়োর চেয়ে সে ঢের ভালো।' অমনি ভৈরব তার একমাথা ঝাঁকড়া চুল নেড়ে গোঁপ ফুলিয়ে বল্‌লে—'আরে দূর দূর—ছাঁচিকুমড়ো কি আবার একটা তরকারি—মিঠ্‌কুমড়ো হচ্চে তরকারীর রাজা—অমৃত বল্লেও চলে।'

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়; দুজনে প্রায় বুড়ো হয়ে এলো, তবু মিল আর দুজনের হলো না। বরং গরমিল এতই বেড়ে উঠ্‌লো যে ভৈরব যদি পূব দিকে মাথা ক'রে শোয়, ত শঙ্করী শোয় পশ্চিম দিকে মাথা ক'রে। শঙ্করী জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে জড় ক'রে রেখেচে—নিজে ফেল্‌বে বলে, কিন্তু ভৈরব যদি

কোথায় শীত ? গরমে দেখি আমার ঘাম ছুটচে

তা ফেলে দিয়ে এলো তাহলে শঙ্করী তা আবার কূলোয় করে তুলে নিয়ে এসে বলবে 'লক্ষ্মীছাড়া আর কাকে বলে ? ঘরের জিনিষ ফেলতে পারলে বাঁচেন— জানেন না যে দরকারের সময় কুটো গাছটাও কাজে লাগে।' গাঁয়ের লোকেরা

ত হেসে কুটিপাটি। তারা হাস্‌তে হাস্‌তে বলে—'ওরা যদি একসঙ্গেও মরে, ওদের এক চিতেয় পোড়ানো হবে না। চিতেয় শুয়েও দুজনে ঝগড়া করবে। হয়ত এ বল্‌বে তোর পুড়তে বেশী কাঠ লাগবে—ও বল্‌বে তোর পুড়তে।

একদিন ভোর বেলা ভৈরব ঘুম থেকে উঠেই শঙ্করীর গা ঠেলা দিয়ে বল্‌লে—'ও শঙ্করী, ওঠ্ না আর কি দুপুর বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোবি ?' শঙ্করী চোখ রগড়ে হাই তুলে বল্‌লে—'আমার ইচ্ছে আমি ঘুমোবো। রাত না পোয়াতেই ঠেলে তুলচেন। কি করবো এখন জেগে ?' 'বটে, তবে জাগিস্‌নি, ও পাড়ার মুন্সী বাবুরা কলকাতা থেকে যে তেলের কল এনেছে তাতে আমাদের সরষেগুলো বিনে পয়সায় পিষে দেবে বলেছিল। তা বেশ, কাজ নেই পিষিয়ে—তুই কলু-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ঘানিতে ভাঙ্গিয়ে আনিস্—পূরো পয়সাও নেবে, খোলও নেবে, অথচ তেলও বেরোবে কম।'

এবার শঙ্করী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বল্‌লে—'তা আমায় কি করতে হবে তাই বল্‌না।'

'কি আর কর্‌তে হবে ? গরুর গাড়ীতে বস্তা চারেক সরষে তুলে—দুজনে ঠেলতে ঠেলতে ওপাড়ায় নিয়ে যাবো—হেলে গরু দুটোর অসুখ করেছে কিনা।'

'তা এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বকর বকর না ক'রে, সরষেগুলো বস্তাবন্দী করলে ত পারতিস্, গরুর গাড়ী টেনে বের করলে ত পার্‌তিস্—। তোর কি সে সব খেয়াল আছে ? তুই যে আসল কুঁড়ে।'

'কুঁড়ে আমি না তুই ? তুই সরষেগুলো কূলোয় করে ঝেড়েছিস্ ? চালুনীতে করে চেলেছিস্ ?—অত খেলে আর অত মোটা হলে কি মানুষ কুঁড়ে না হয়ে যায় ?'

ঘণ্টাখানেক ঝগড়াঝাটির পর দুজনে ত গরুর গাড়ী নিয়ে উত্তর পাড়ায় রওনা হলে। ভৈরব জোয়ালে বুক বাধিয়ে টান্‌ছিল, শঙ্করী পিছন হতে ঠেল্‌ছিল। কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল দুজনেরই খুব, কেননা পথটা নীচু থেকে উঁচুতে উঠেচে

শঙ্করী চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—‘তুই ত মোটেই টান্‌ছিস্‌ না। আমার ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে প্রাণ বেরিয়ে গেল।’

ভৈরব গর্জ্জন করে বল্‌লে—‘আমিই টানছিনা বটে! একটু ঠেল্‌বার নাম নেই—উল্‌টে আমার ঘাড়ে দোষ। আমার মনে হচ্চে তুই এক একবার পিছন দিকেও টান্‌ছিস্‌।’

যাই হোক্‌ এমনি করে সারাটা পথ বেয়ে তুজনে মুন্সী বাবুদের তেলের কলের সাম্‌নে গিয়ে হাজির। তখন সেখানে কেউই ছিল না। কাদের যেন তেল ভাঙ্গা হচ্ছিল, কল পুরোদমে চল্‌ছিল।

কলের একটা মস্ত বড় চাকা ইঞ্জিনের জোরে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছিল। ভৈরব বল্‌লে ‘দেখ্‌ শঙ্করী দেখ্‌—চাকাটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরচে’ শঙ্করী চোখ পাকিয়ে বল্‌লে—‘কি বলছিস্‌ তুই! চাকা দেখি ঘুরচে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।’ ভৈরব রাগে ঘাড় বেঁকিয়ে বল্‌লে—‘তুই ত আচ্ছা একগুঁয়ে দেখছি—চোখের সাম্‌নে দেখেও মানবি না!’ শঙ্করী হাঁড়িচাঁচা গলায় ব’লে উঠ্‌লো—“তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্‌, না হয় মিথ্যে কথা বল্‌ছিস্‌।”

মিথ্যে কথা তুজনের একজনেও বলছিল না। ব্যাপার হয়েছিল এই যে ভৈরব দেখ্‌ছিল চাকার মাথার দিকটা, শঙ্করী দেখ্‌ছিল তলার দিকটা।

যাই হোক্‌ রাগের মাথায় ভৈরব আর শঙ্করী তুজনেই তুজনকে টানতে টানতে চাকার সামনে গিয়ে বল্‌লে—‘দেখ্‌ কোন্‌ দিকে যাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছিস্‌?’

‘এই ত স্পষ্ট বাঁদিক দিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে’ বলেই ভৈরব ধরলে চাকার উপরটা, আর ‘স্পষ্ট ডান দিক থেকে বাঁদিকে যাচ্ছে’ বলে শঙ্করী ধরলে চাকার তলাটা। ব্যস্‌, আর যায় কোথায়? চোখের নিমিষে তুজনে ঘুরে তুদিকে ছিট্‌কে পড়লো।

ভৈরব মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে—‘উঃ’

শঙ্করী কোমরে হাত দিয়ে বল্‌লে—‘উঃ’

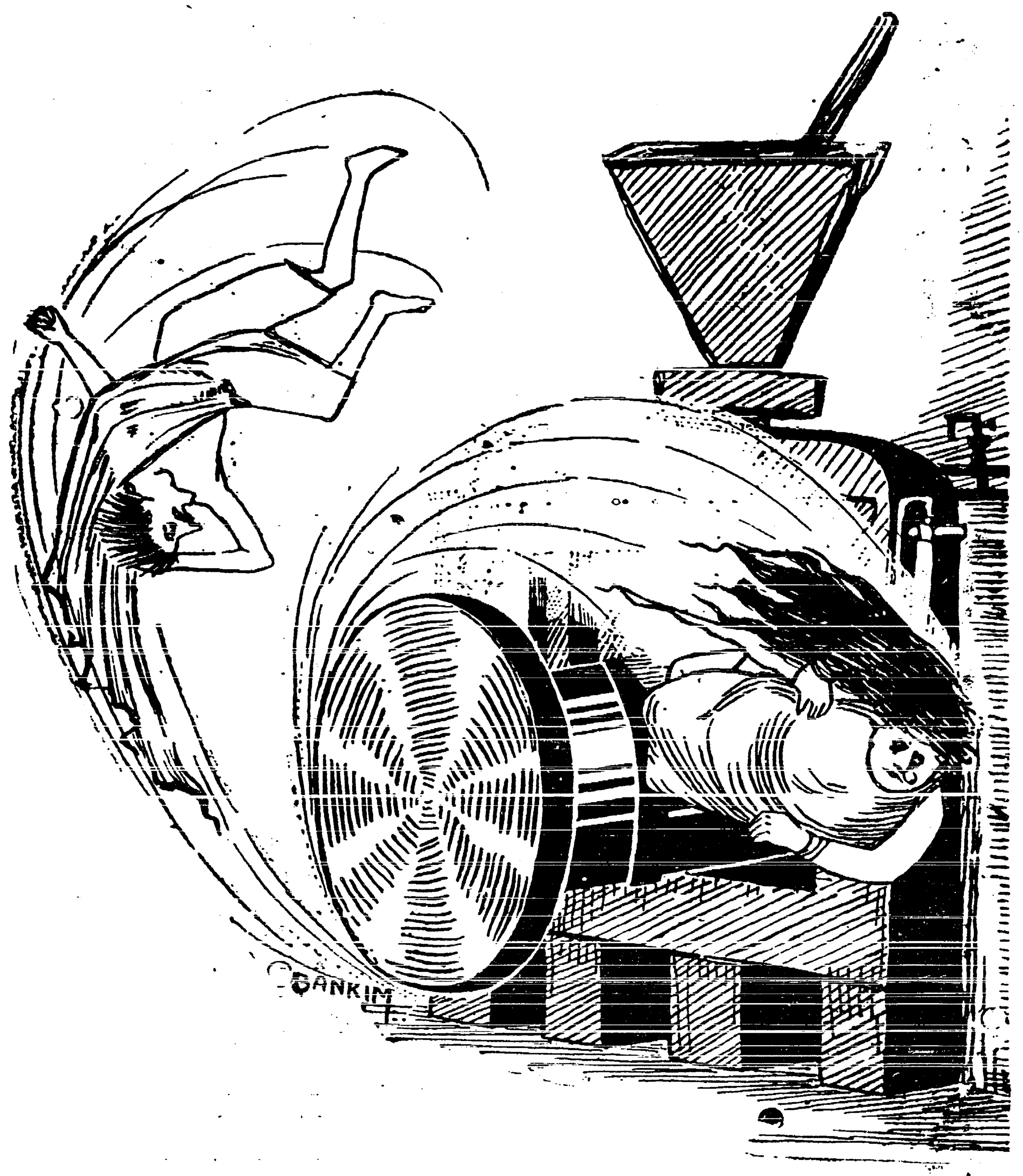

চোখের নিমিষে তুজনে ঘুরে তুদিকে ছিট্‌কে পড়লো

ভৈরব কাতরাতে কাতরাতে বল্‌লে—‘বড্ড লেগেছে রে—বড্ড লেগেছে।’

শঙ্করীও গোঙরাতে গোঙরাতে বল্‌লে—‘বড্ড লেগেছে।’ জীবনে এই প্রথম তুজনের কথার মিল হলো। ভৈরব বল্‌লে—‘গলাটা শুকিয়ে গেছে শঙ্করী, একটু জল আন্‌তে পারিস্‌? শঙ্করী বল্‌লে—‘আমারো বড্ড তেস্টা, একটু জল পেলে খাই।’ আবার তুজনের কথা মিলে গেলো।

একবার কথার মিল হ'লে দুবার মিল হয়, দুবার মিল হ'লে চারবার মিল হতেও কষ্ট হয় না। কাজেই সেদিন থেকে দেখা গেল—ভৈরব শঙ্করীর ক্রমেই কথার মিল হচ্ছে। শেষে একমাসের মধ্যে দুজনের মধ্যে এমন মিল আর এমন ভাব হয়ে গেল, যে গাঁয়ের লোক দেখে অবাক্।

আপন ও পর

(শ্রীকালিদাস রায় বি, এ—কবিশেখর)

কোকিল উল্লাসে গাহিয়া মধুমাসে
পুলকি' তুলে কত মুকুল প্রাণ,
আপন সন্তানে পালিতে নাহি জানে
পোষিতে বায়সীরে করে সে দান।
নিখিল চিত নিতি ভুষিছে কবিগীতি
ইতর জনেও সে বিতরে সুধা,
অন্ন জুটে না'ক দৈন্য টুটে না'ক
ভিক্ষা বিনা তার মেটেনা ক্ষুধা।
যে জন দীপহাতে অন্ধকার রাতে
সবার আগে আগে হাঁটিয়া যায়,
দেখায় কতজনে সুপথ ঘনবনে
সে নিজে আঁধিয়ারে আঘাত পায়।
ভূখারী অপহৃত ভিখারী দীন শত
ধনীর দানে করে দৈন্য দূর,
ধনীর হৃদিখানি পাতিয়া রয় পাণি,
বাসনা আশা তার বেদনাতুর।

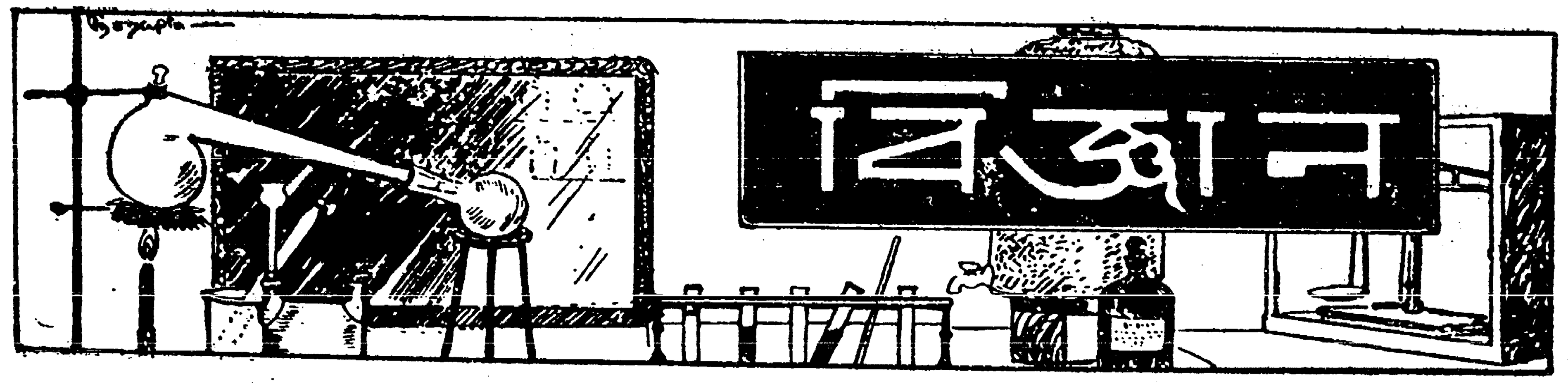

তরল বাতাস

(শ্রীহরিপদ বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল-বি এস্ সি)

মণ্টুকে তাহার ভাই বোনরা মিলিয়া ক্ষেপাইয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বেচারার তেমন দোষ নাই। কোথা হইতে সে শুনিয়া আসিয়াছে যে তেমন করিয়া ঠাণ্ডা করিলে বাতাসের মত অনেক ধোঁয়াটে জিনিষকেও নাকি জলের মত তরল করা যায়। কথাটা সত্যি কিনা সেদিন দুপুর বেলা তাই সে পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিল; ছোড়দার ফুটবল হইতে ব্লাডারটা খুলিয়া ফুঁ দিয়া খানিকটা বাতাস সে ভরিয়া লইয়াছিল। এমন কি লজেঞ্জুস কিনিবার পয়সা দিয়া খানিকটা বরফও কিনিয়া আনিয়াছিল; তারপর সেই বরফের মধ্যে বাতাস ভরা ব্লাডারটা ডুবাইয়া একটা পাখা দিয়া হাওয়া করিতে করিতে কতক্ষণে ব্লাডারের ভিতরের বাতাসটুকু তরল হইবে তাহারই অপেক্ষায় সে বসিয়া আছে, এমন সময় কখন যে তাহার ছোড়দা আসিয়া ব্যাপারটা জানিয়া লইয়া বাড়ী শুদ্ধু সকলকে আনিয়া জড় করিয়াছে; তাহার পরেই সকলে মিলিয়া ক্ষেপাইতে ক্ষেপাইতে বেচারাকে প্রায় কাঁদ কাঁদ করিয়া ফেলিয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা "বাহবা বুদ্ধি, বাতাসকে বুঝি আবার গলান যায়!"

গোলমাল শুনিয়া পাশের ঘর হইতে মণ্টুর বড়দা ছুটিয়া আসিল। সে কলেজে পড়ে। তাহাকে দেখিয়া মণ্টু আরও ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্যাপারটা শুনিয়া তাহার বড়দা মোটেই হাসিল না, বরঞ্চ তাহার ছোড়দাকেই ধমক লাগাইয়া দিল—"নিজেরা না জেনেই পণ্ডিত," "নারে মণ্টু,

বাতাসকে গলান যায় বৈকি, তবে অবশ্যি অত সহজ ভাবে নয়," তারপরেই পাশের ঘর হইতে একখানা বাঁধান মোটা বই আনিয়া মণ্টুর ছোড়দার সম্মুখে ধরিল "বড় যে হাসছিলি, বিশ্বেস না হয় ত' ছাখ্"। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল সত্যিই ত' বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "Liquid air" অর্থাৎ তরল বাতাস।

বাস্তবিক এই কথাটা যদি বছর পঞ্চাশেক আগে আমাদের ঠাকুর্দ্দাদের কাছে বলা হইত তাহা হইলে তাঁহারা যে শুধু ঘোর অবিশ্বাসে নাক বাঁকাইতেন তাহাই নহে, কথাটা যে তুলিত তাহার মাথা ঠিক আছে কিনা সে সন্দেহও হয়ত করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের স্বভাবই এই যে সে সমস্ত জিনিষকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভগবানের হাতে গড়া কাজের উপর টেক্কা মারিবে। আজ এই বিজ্ঞানের সাহায্যেই পণ্ডিতরা শুধু যে বাতাসকে জমাইয়া তরল করিতেছেন তাহা নয়, সেই তরল বাতাসকেও আবার আরও জমাইয়া বরফের মত শক্ত বাতাসে পরিণত করিতেছেন। অধিকন্তু সেই তরল বাতাসকে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবসার মধ্যেও ঢুকাইতে ছাড়েন নাই।

কিন্তু এই যে এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক জয়, ইহার জন্য মানুষকে মাথাও কম ঘামাইতে হয় নাই। কোন জিনিষকে জমাইতে গেলে ঠাণ্ডা করা দরকার। বাতাসকেও জমাইয়া তরল করিতে গেলে তাহাকে উপযুক্ত রকম ঠাণ্ডা করিতে হইবে। কিন্তু এই ঠাণ্ডা করা ব্যাপারটা যদি আমাদের মণ্টুর মত অত সহজ ভাবে হইতে পারিত তাহা হইলে কোন ভাবনাই ছিল না।—কিন্তু দুঃখের বিষয় গোল বাধিল ঐখানেই। যে ঠাণ্ডাটার দরকার তাহার ধারণা করাই কঠিন। তোমরা অনেকে হয়ত উত্তর মেরুর দারুণ শীতের কথা শুনিয়াছ—যেখানে সমুদ্র শুদ্ধ্ শীতে জমিয়া বরফ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সে রকম শীতও বাতাসকে জমাইবার পক্ষে কিছুই নয়।

পণ্ডিতরা কিন্তু অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নন, জোঁকের কামড়ের মত তাঁহারা গোঁ ধরিয়া রহিলেন—বছরের পর বছর নানা উপায় ভাবিতে লাগিলেন, পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলিল। শেষে কিন্তু তাঁহারাই জিতিলেন। উপায় বাহির হইল।

কোন জিনিষকে খুব বেশী চাপের নীচে রাখিয়া যদি হঠাৎ সহজ ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঠাণ্ডার সৃষ্টি হয়। ইহা একটা বড় বৈজ্ঞানিক সত্য। আর যদি আগেকার উত্তাপটা খুব কম হয় তাহা হইলে ঠাণ্ডার পরিমাণ আর ও বেশী হইবে। লিণ্ডে নামক এক জার্ম্মান পণ্ডিত এবং হ্যাম্প্‌সন্ নামক এক ইংরাজ পণ্ডিত ভাবিলেন—আচ্ছা এই রকম ভাবে বাতাসকে জমান যায় না কি? যে কথা সেই কাজ। তাঁহারা এই সত্যের সাহায্য লইয়া দুই কল আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তারপর সেই কলে একদিন সত্য সত্যই বাতাস ঠাণ্ডায় জমিয়া তরল হইয়া দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকের একটা বড় স্বপ্ন সফল হইল।

বাতাস ত' জমিয়া তরল হইল; এখন বিপদ হইল ইহাকে রাখিবার জায়গা লইয়া। কোথায় ইহাকে রাখা যায়? যে পাত্রে রাখিবে তাহার উত্তাপেই যে আবার যাহা ছিল তাহাই হইয়া যাইবে, কেননা এক কেট্‌লী জল জ্বলন্ত উনানের উপর রাখিয়া যদি বলা যায় যে উহাকে উড়িয়া বাষ্প হইতে দিব না তাহা হইলে কথাটা শুনিতে যেমন হয়, তরল বাতাসকে সাধারণ পাত্রে রাখিব অথচ উড়িয়া বায়বীয় অবস্থায় যাইতে দিবনা বলিলেও সেই রকমই হইল। তরল বাতাসের উত্তাপের তুলনায় একটা সাধারণ পাত্র অগ্নিকুণ্ডের চেয়েও ভয়ানক।

পণ্ডিতেরা বলিলেন—বাতাস জমাইয়া তরল করা গেল আর উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তাহা রাখা চলিবে না—সে কি হয়? আবার পণ্ডিতেরা ভাবিতে বসিয়া গেলেন। শেষে ডেওয়ার নামক এক বৈজ্ঞানিক একটা অতি সহজ উপায়ে এমন একটা পাত্র বাহির করিলেন যাহার ভিতরে কিছু রাখিলে বাহির হইতে ঠাণ্ডা কিম্বা তাপ কিছুই উহার ভিতরে ঢুকিতে পারে না। তিনি ইহার নাম দিলেন "ভ্যাকুয়াম্ ফ্লাস্ক্।" ভ্যাকুয়াম্ মানে ফাঁকা, 'ফ্লাস্ক্' এক রকম পাত্র। ব্যাপারটী কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়—তিনি একটা পাত্রের একটার জায়গায় দুইটা দেওয়াল করিয়া দিলেন। আর তাহাদের মাঝখানের বাতাসটা পাম্প করিয়া একেবারে ফাঁকা করিয়া ফেলিলেন। ফাঁকা থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া তাপ কিম্বা ঠাণ্ডা কিছুই

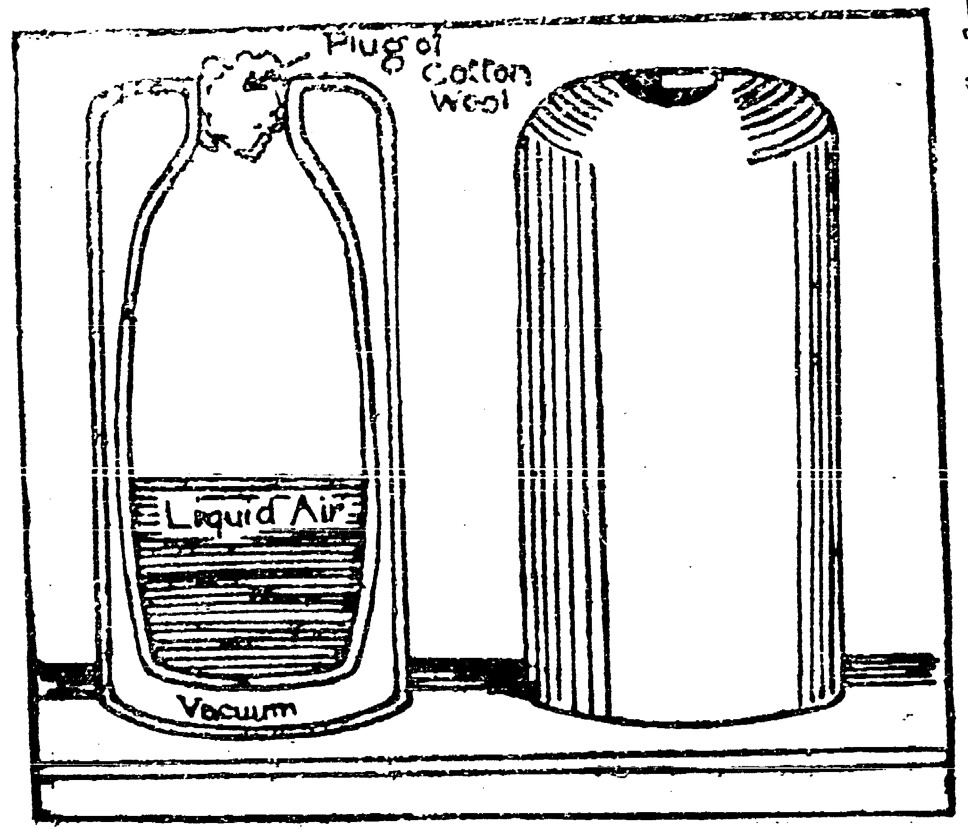

ভ্যাকুয়াম্ ফ্লাস্ক

ঢুকিতে পারে না। তাহার উপর আবার তিনি পাত্রটীর বাহিরের দিকটা রূপার মত ঝক্‌ঝকে করিয়া দিলেন। কেন ও রকম করিলেন বলত ? আয়নার উপর আলো পড়িলে কি হয় দেখিয়াছ কি ? সমস্ত আলোই আয়নার উপর পড়িয়া ঠিক্‌রাইয়া ফিরিয়া যায়। ডেওয়ারও ঠিক তাহাই চাহিয়া ছিলেন।

এই রকম পাত্র আবিষ্কারের পর হইতেই তরল বাতাস রাখা খুব সহজ হইয়া দাঁড়াইল। শুধু রাখা নহে, আজ এই রকম পাত্রে ভরিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া জাহাজে করিয়া তরল বাতাসকে হাজার হাজার মাইল দূরে চালান দেওয়া হইতেছে।

ভারী অদ্ভুত ব্যাপার না ? একদিকে দারুণ শীতল বাতাস আর তাহার ইঞ্চি খানেক দূরে তাহার তুলনায় আগুনের সমুদ্র, অথচ মাঝখানটা ফাঁকা থাকায় ভিতরের ঠাণ্ডা বাতাস দিব্যি গা বাঁচাইয়া রহিয়াছে। হয়ত এমন একদিন আসিবে যখন পৃথিবীর সমস্ত কয়লা ফুরাইয়া যাইবে, তখন এই রকম পাত্র কি রকম কাজে লাগিবে বল দেখি। একবার খাবার গরম করিয়া ভ্যাকুয়াম্ ফ্লাস্কে ভরিয়া রাখিয়া দাও, বাস্ সপ্তাহের পর সপ্তাহ আর কোন ভাবনা নাই। আবার এমনও হইতে পারে যে হয়ত তখন মানুষ বাহিরের শীত গ্রীষ্ম হইতে গা বাঁচাইবার জন্য বাড়ী করিবার সময় একটার জায়গায় দুইটা দেওয়াল করিয়া তাহাদের মাঝখানটার বাতাস পাম্প করিয়া একেবারে ফাঁকা করিয়া রাখিবে। তারপর বাহিরে বরফই পড়ুক আর আগুনের বৃষ্টিই হউক্ ভিতরে দিব্যি আরাম। তখনও দেখিব বিজ্ঞানই ভগবানের বিধানের উপর হাত বাড়াইয়াছে কিন্তু সেও ভগবানেরই বিধানে।

তরল বাতাস কথাটা শুনিতে যেমন মজার ইহার প্রকৃতিও তেমনি মজার। দেখিতে কিন্তু ইহা অনেকটা জলের মত, তাই বলিয়া জলের মত ভাবে যদি ইহাকে ব্যবহার করিতে যাও, তাহা হইলেই বিপদ্। খানিকটা তরল বাতাস যদি মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহার দারুণ শীতলতা আশে পাশের বাতাসের মধ্যে যে সব বাষ্প আছে সমস্ত জমাইয়া মেঘের মত করিয়া মাটিতে গড়াইতে থাকিবে। ছবিতে দেখ এক ভদ্র লোক কেমন করিয়া তরল বাতাস ছাড়িয়া দিয়া ঘরের ভিতরেই মেঘের স্থষ্টি করিয়াছেন। আবার দেখ একটা কেট্‌লীর ভিতর তরল বাতাস ভরিয়া তাহাকে বরফের উপর বসাইয়া দিব্যি ফুটান হইতেছে। আমরা যেমন উনানের উপর চায়ের জল ফুটাইয়া লই সেই রকম আর কি। তরল বাতাসের কাছে বরফও জলন্ত চুল্লীর মত গরম; কাজেই ব্যাপারটা এত সহজে ঘটিতেছে। এখন ভাবিয়া দেখ বরফের বদলে যদি সত্য সত্যই জলন্ত উনানের উপর ঐ রকম এক কেট্‌লী তরল বাতাস চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কি হইবে ? (ক্রমশঃ)

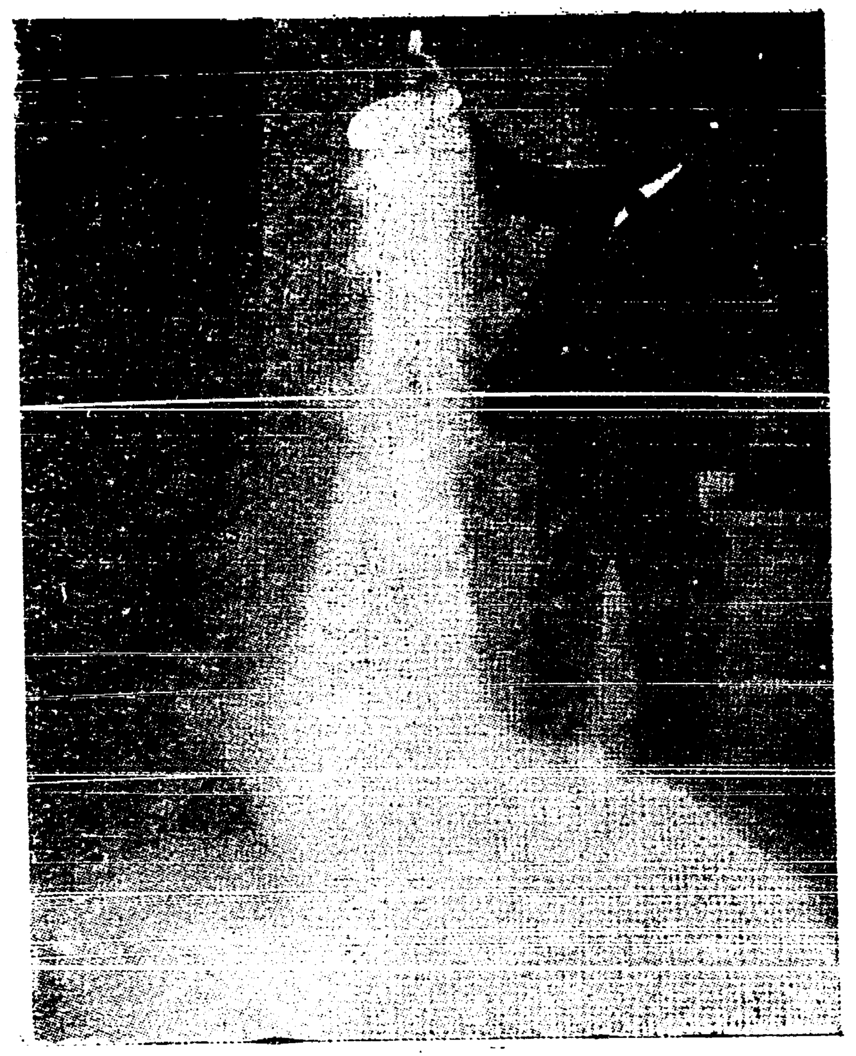
তরল বাতাসে ঘরের ভিতরে মেঘ

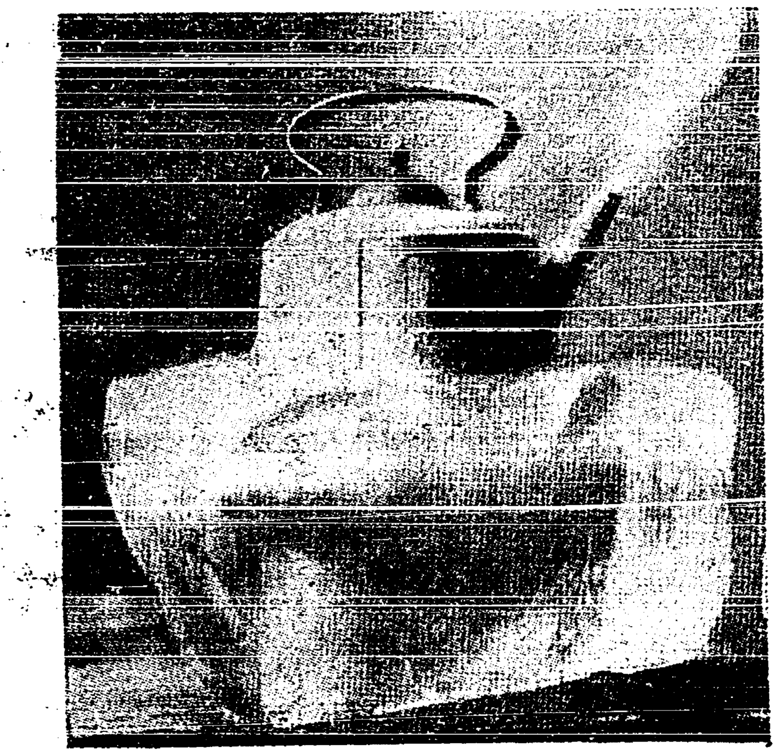
বরফের উপর তরল বাতাস ফুটিতেছে

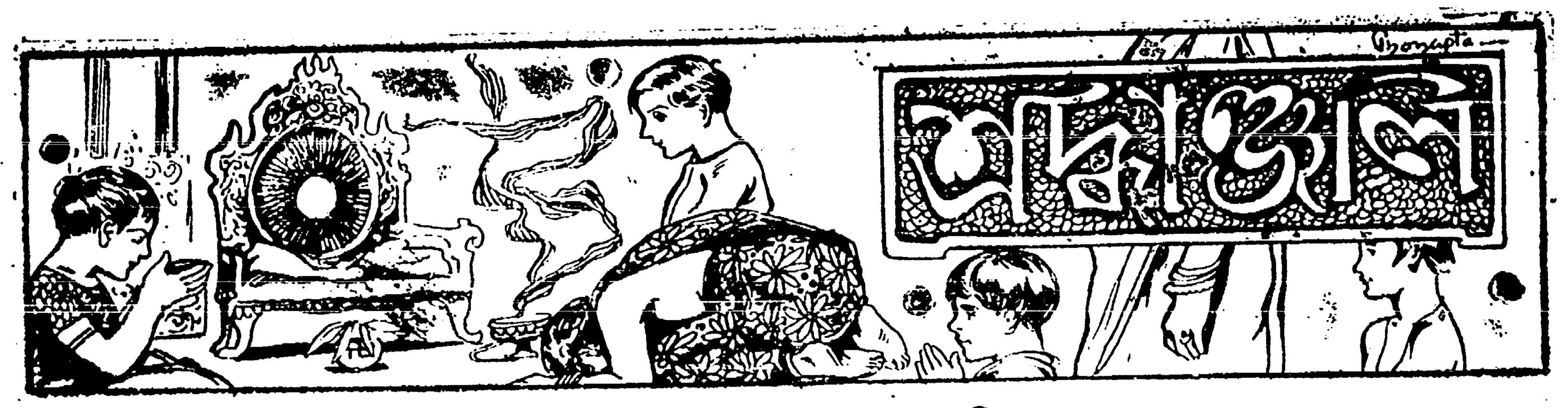

শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ।

(অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম্, এ—পি, আর্, এস্)

মায়ের নামের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাতৃভূমির নাম করিয়া থাকি ; কিন্তু দেশকে যথার্থ ভাল-বাসিতে হইলে মানুষ হওয়া দরকার, দেশের বা দশের কাজে উপ-যুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। তাই আমা-দের দেশে যাঁহারা মানুষ হওয়ার নূতন নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের প্রণম্য ; আমরা যেন তাঁহাদের চিরদিন মনে রাখি এবং তাঁহাদের উপ-দেশ মত মানুষ হইতে শিখি। হাজার চেষ্টা-তেও একজন মানুষ গড়া কত মুস্কিল,

শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ

গুরুগোবিন্দ এমন কতশত মানুষকে—একটা জাতিকে—মানুষ হওয়ার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, নূতন করিয়া একটা জাতি গড়িয়াছেন, সেইজন্য আমরা তাঁহার কথা কিছু বলিতে চাই।

গুরুগোবিন্দের পিতার নাম তেগ বাহাদুর। তিনিও শিখদের গুরু ছিলেন ; তাই নানাস্থানে ঘুরিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইত, যে সকল শিখ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়াছিল তাহাদের কাছে গিয়া ধর্ম্মবিষয়ে উৎসাহ দিতে হইত। প্রয়াগ, কাশীধাম, গয়া হইয়া তিনি পাটনাতে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন ; জয়পুরের রাজা রামসিংহ, কামরূপ অভিযানে যাত্রা করিবার সময়, জীবন্ত আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাঁহাকে সঙ্গে রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইলে তেগ বাহাদুরকে পরিজন পাটনাতে রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে হয়। তেগ বাহাদুর যখন সুদূর কামরূপে তখন তাঁহার পুত্র গোবিন্দ রায়ের জন্ম—১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আড়াই শত বৎসরেরও পূর্ব্বে। পিতার ইচ্ছামত পুত্রের নাম গোবিন্দ রাখা হইল।

ছেলেবেলায় গোবিন্দ নিতান্ত শান্তশিষ্ট ভালমানুষ ছিলেন না, বড় দুরন্ত ছিলেন। দুইদল ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে মারামারি বাধাইয়া দিয়া মজা দেখা তাঁহার কাজ ছিল। প্রত্যহ ব্যায়াম ও অস্ত্রচর্চ্চা তাঁহার ধরা বাঁধা, অন্য কোনও বালক তাঁহার কাছে আসিলে তাহাকেও নানারূপ অস্ত্রক্রীড়া শিখাইতেন ; তীরধনুক তাঁহার অতি প্রিয়বস্তু ছিল। শস্ত্র ও শাস্ত্র, উভয় বিদ্যাই তিনি চর্চ্চা করিতেন। ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। শৈশব হইতেই তাঁহার আকৃতি এত সুন্দর ও সুদর্শন ছিল যে সকলেরই তাহা চোখে পড়িত।

গোবিন্দ একটু বড় হইলে তাঁহার পিতা, স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য পরিজন পাটনায় রাখিয়া ভগবানের নাম প্রচার করিবার জন্য দেশে ফিরিয়া যান ; গোবিন্দ পিতাকে বড় ভালবাসিতেন, প্রথম দিন সঙ্গ ছাড়েন নাই, কাজেই সেদিন গুরু তেগ বাহাদুরকে অতি ধীরে ধীরে হাঁটিতে হইয়াছিল—পাটনা সহরের সীমা

ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। তেগ বাহাদুর পাটনা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার নিরাপদে পৌঁছান সংবাদ না পাইয়া গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত হন এবং মাকে নিয়া পাঞ্জাব রওনা হইবেন এমন সময়ে পিতার নিকট হইতেও যাইবার অনুমতি আসে। তখনও বাঙ্গলা দেশে শিখ ছিল, ঢাকার শিখেরা বিখ্যাত কারিকর দিয়া তৈয়ারী করিয়া সোণার কাজকরা একখানি পাল্‌কী এই সময় গুরুপুত্রের জন্য পাঠাইয়া দেয়।

তেগ বাহাদুর তাঁহার জন্মভূমি পাঞ্জাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এইভাবে কাজ করা বেশীদিন চলিল না, অত্যাচারিতের আর্ত্তনাদ তাঁহার কাণে গিয়া পৌঁছিল। আরঙ্গজেব ভাবিয়াছিলেন, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়া লইবেন, তাহা হইলে ভারতে সকলেই মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা ভয় পাইয়া তেগ বাহাদুরের নিকটে আশ্রয় লয়; তাহাদের কথা শুনিয়া তেগ বাহাদুর যখন কি করা উচিত ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, তখন শিশুপুত্র গোবিন্দ তাঁহার কাছে আব্‌দার করিয়া তাঁহার চিন্তার কথা জানিতে চাহেন। তেগ বাহাদুর বলেন—তুরুকদের অত্যাচারে সংসার ছারখার হইয়া গেল, যদি কেহ অকাতরে পরের জন্য প্রাণ দিতে পারে তবে এ অত্যাচার দূর হয়। গোবিন্দ বলেন—বাবা, তুমিই ত আছ, তোমার মত সাহসী কে, তোমার মত অন্য সকলকে ভালবাসিতে কে পারে? তেগ বাহাদুরের মনে হইল, শিশুর মুখে ইহা ভগবানেরই আদেশ; সেই অনুসারে তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া পণ্ডিতদিগকে জানাইলেন, তাঁহারা যেন দিল্লীশ্বরকে বলেন—তেগ বাহাদুর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সকলেই মুসলমান হইবে, কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না। সম্রাটের কাণে এই কথা গেলে তিনি শিখগুরুকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, তেগ উত্তর দিলেন—তিনি বর্ষার পর স্বয়ং গিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইবেন। তেগ বাহাদুর পাঁচ জন সঙ্গী ছাড়া আর সকলকে বিদায় দিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু পথে আগ্রার নিকটে মুসলমান কোতোয়াল তাঁহাকে বন্দী করে। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া আরঙ্গজেব

অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু প্রলোভনে ও ভয় দেখাইয়া কিছুতেই তেগ বাহাদুরকে টলাইতে পারা গেল না, তিনি ধর্ম্মত্যাগে সম্মত হইলেন না। সম্রাট্ তাঁহাকে অলৌকিক কিছু দেখাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন—আমার মৃত্যুর পর অলৌকিক ঘটনা সকলেই দেখিতে পাইবে, জীবিত দশায় নয়। তাঁহার প্রাণদণ্ড-বিধান হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্রকে লিখিয়া পাঠান,—

শক্তি নাহি, বন্দী আমি, নাই আমার আশ্রয়;
নানক বলে—আশা এখন প্রভুর চরণদ্বয়।
... ...
সহায় বন্ধু কেউ ত নাহি, এখন আমি একা;
নানক বলে, বিপদে পথ—প্রভুর চরণ দেখা।

গোবিন্দ এই উত্তর পাঠান—

শক্তি আছে; বাঁধন কোথা? আশ্রয় কোথা মাগো?
নানক, সবই তোমার নিজের হাতে; নিজেই নিজেরে রাখো।

গোবিন্দের এই শ্লোকটি শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবে আছে।

অত্যাচারিতের রক্ষার জন্য, অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য তেগ বাহাদুর প্রাণ দিলেন; মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার উষ্ণীষে লেখা আছে—শির দিয়া তো শের নেহি দিয়া—মাথা দিলাম কিন্তু মান দিলাম না। গুরুর এই আত্মবিসর্জ্জন শিখসম্প্রদায়ে মন্ত্রের মত কাজ করিল। পিতার মৃত্যুর সময় গোবিন্দের বয়স ৯ বৎসর মাত্র। আর সকলে বিপদে কাতর হইল, গোবিন্দ স্থির রহিলেন, সকলকে সান্ত্বনা দিলেন,—গুরু তেগ বাহাদুরের মত মরণে শোক করিবার কিছু নাই; পর-বৎসর—অর্থাৎ দশবৎসর মাত্র বয়সে—গোবিন্দ গুরুর আসনে বসিলেন।

প্রথম হইতে গুরুগোবিন্দ অস্ত্রচর্চ্চার দিকে মন দিলেন; সকল শিখকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইবে, সকলকে অস্ত্র ধরিতে হইবে, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তিনি সৈন্যদল গঠন করিতে লাগিলেন। এই সব নূতন আয়োজন ও ব্যবস্থা দেখিয়া অনেক শিখ ভয় পাইল, গুরুর মাতার নিকট গিয়া জানাইল—

নূতন ধর্ম্মের প্রচার অবশ্য চাই, কিন্তু আমরা চাষাভূষা লোক, অস্ত্রশস্ত্র দিয়া করিব কি? আমরা কি রাজ্য বিস্তার করিব? রাজ্য আমরা চাহি না, সুতরাং এ সব হাঙ্গামেও কাজ নাই, ইহাতে অনর্থক গোলযোগের সৃষ্টি হইবে মাত্র। কিন্তু কোনও আপত্তিই গুরু শুনিলেন না, বলিলেন—"আমি ভগবানের আদেশ পাইয়াছি আর কাহারও কথা শুনিতে পারি না। ভয় কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না, এই সব বাধা আমি মানিব না। অন্যের রাজ্য কাড়িতে চাই না, রাজ্যে আমার লোভ নাই, কিন্তু যে অত্যাচারী, যে দুষ্ট, তাহাকে শাসন করাও গুরুর কাজ। আত্মরক্ষা পরম ধর্ম্ম—সকলেরই তাহাতে অধিকার আছে।" সুতরাং আয়োজন চলিতে লাগিল; এদিকে নিকটে পাহাড়ে ও অন্যত্র যে সব ছোট ছোট রাজা রাজত্ব করিত তাহারা সহজেই গুরুকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লইল। লক্ষ্যবেধে গুরুর অসাধারণ শক্তি ও দক্ষতা, শারীরিক বল, বুদ্ধি, সাহস ও প্রভাব সকলেরই জানা ছিল; দুই একজন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ায়, গুরুর শক্তি ও সাহস যে অসাধারণ এবং শিখ জাতি যে নূতন প্রাণ পাইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হইল।

গুরুগোবিন্দ এই সময়ে খালসা সম্প্রদায় গড়িতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে যাহারা বিলাসী তাহারা নানারূপ সোণারূপার গহনা পরিত; তাঁহার উপদেশে ও ইচ্ছায় সোণারূপা গিয়া লোহার বালা আসিল, এখনও শিখেরা সেই লোহার বালা পরে—উহা বিলাসিতা বর্জনের চিহ্ন। সকল শিখকেই কয়েকটি নিয়ম মানিতে হইল—শারীরিক ব্যায়াম করিতে হইবে, আঁটসাট পোষাক চাই—সুতরাং সকলকেই জাঙ্গিয়া পরিতে হইবে। কেশ-সংস্কার বিলাসের এক উপকরণ—কেশ রাখিতে হইবে, তবে সে কেশ পরিষ্কার রাখাও দরকার, সুতরাং চিরুণী সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। আর একটী বস্তু সহচর হইয়া উঠিল—কৃপাণ; সর্ব্বদা আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র থাকিতে হইবে। এই পাঁচটী বস্তু শিখদের সর্ব্বদা রাখা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল। কোনও প্রকারে তাম্রকূট সেবন নিষিদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ)

কাজির বিচার

(শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্-ল)

পুরাকালে পারস্য দেশের কোনও গ্রামে একজন অতি ধনবান ওমরাহ্ বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল নবাব কুদরৎউল্লা খাঁ। তিনি ছিলেন সেই গ্রাম এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। প্রকাণ্ড পাঁচমহল প্রাসাদে তিনি বাস করিতেন। প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে এত গোলাপ ফুটিত যে তাহার সৌরভে চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমোদিত থাকিত। নবাব বাহাদুর প্রত্যহ গোলাপ জলে স্নান করিতেন।

নবাব বাহাদুরের তখন যৌবন কাল; বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হয় নাই; কিন্তু নিত্য কালিয়া পোলাও ও নানাবিধ শিরনী (মিষ্টান্ন) আহার করিয়া তাঁহার দেহটি অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িয়াছিল। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি আবলুশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত, লাল মখ্মল মণ্ডিত এক সোফায় শয়ন করিয়া কাটাইতেন। শয়ন করিয়া, সোণার ফর্সিতে তামাকু সেবন করিতে করিতে তিনি কিছুক্ষণ বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; অবশিষ্ট সময় নিদ্রায় অথবা মোসাহেবগণের খোস গল্প শ্রবণ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। কেবল বিকালে একবার তাঞ্জামে চড়িয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন।

গ্রামের বাহিরে বলিলেই হয়, নদীর নিকট একস্থানে একটি ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরে আবদুল নামক একজন গরীব লোক বাস করিত। রাস্তা হইতে এই কুটীরখানি বেশী দূরে নহে;—মাঝে খানিকটা পতিত জমি মাত্র। কুটীরের উভয় পার্শ্বে এবং পশ্চাতে নদীতীর অবধি শরবন। আবদুল প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া, একখানি ছুরি হাতে করিয়া এই শরবন মধ্যে প্রবেশ করিত;—এবং বেশ পাকাপাকা শরগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাটিয়া, বোঝা বাঁধিয়া তার কুটীরের সম্মুখে আনিয়া ফেলিত। ধারালো ছুরীর সাহায্যে শরের ছালগুলি ছাড়াইয়া তাহা দিয়া সারাদিন বসিয়া কুলা, ডালা, পাখা, ছোট ছোট বাক্স ইত্যাদি নানা দ্রব্য বয়ন

করিত। বাজারে বা গৃহস্থ বাড়ী গিয়া, সেই সব বিক্রয় করিত—ইহাই তাহার উপজীবিকা।

নবাব কুদরৎউল্লা খাঁ সোফার উপর

নবাব বাহাদুর বিকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইলে, প্রায়ই তাঁহার তাঞ্জাম

আবদুলের কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাইত। তিনি দেখিতেন, সারাদিনের পরিশ্রমের পর, আবদুল কোন দিন কুটীরের বাহিরে বসিয়া অন্নপাক করিতেছে, কোনও দিন দেখিতেন, বৃহৎ শানকীতে লাল মোটা চাউলের এক রাশি ভাত ঢালিয়া, যৎসামান্য ব্যঞ্জন অথবা কেবলমাত্র লবণ সহযোগে পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। কোনও দিন বা দেখিতেন, তাহার খাওয়া হইয়া গিয়াছে, ধূলা মাটীর উপর ছেঁড়া চেটাই বিছাইয়া, গ্রীষ্মের ফুরফুরে হাওয়ায় আবদুল গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দেখিয়া দেখিয়া, নবাব বাহাদুরের মনটা ঈর্ষায় জ্বলিয়া যাইত।

তিনি ভাবিতেন, "উঃ—হতভাগার কি স্পর্দ্ধা! উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী চাউলের পোলাও, তাহাই আধপোয়ার বেশী আমি খাইতে পারি না;—বাবুর্চ্চিরা প্রত্যহ ৮।১০ প্রকারের মাংস রন্ধন করিয়া দেয়, কোনওটা একটু চাখিয়া দেখি মাত্র—মুখে রুচে না—খাই না,—কোনওটার দুই চারি টুকরা খাই; একদিন দুই চামচ বেশী খাইলেই বদহজম হয়! আর ঐ শয়তান, শুধু খানিকটা নুন বা খানিকটা কুমড়ার ঘ্যাঁট দিয়া, সের খানেক বুকড়ি চাউলের অন্ন গোগ্রাসে গিলিতেছে! রেশমের গদি তোষকের উপর শুইয়া থাকি, ভৃত্যেরা দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গোলাপজলে ভিজানো পাখায় আমায় হাওয়া করে, তবু আমার ঘুম আসে না, অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত আমি জাগিয়া কেবল এ পাশ ও পাশ করি! আর, ও কিনা ধুলার উপর চেটাই পাতিয়া এমন ঘুমায় যে আমার তাঞ্জাম বাহকগণের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পায় না,—উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় সেলাম করে না! উঃ, অসহ্য!"

গ্রীষ্মকাল! সমস্ত শরবন পাকিয়া শুকাইয়া উঠিয়াছে। একদিন রাগের মাথায় নবাব বাহাদুর ভৃত্যগণকে হুকুম দিলেন, "দে—ওর শরবনে আগুন লাগাইয়া দে।"

শুধু শরবন পুড়িল না;—সেই আগুনে আবদুলের কুটীর খানিও ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

নবাবের এইরূপ অত্যাচারে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়া, আবদুল রাজধানীতে গিয়া, প্রধান কাজির নিকট নবাবের নামে নালিশ করিয়া দিল।

২

কাজি সাহেব উভয় পক্ষের সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিলেন। কূট প্রশ্ন করিয়া, আবদুলের উপর নবাব সাহেবের রাগের যথার্থ কারণও তিনি অবগত হইলেন।

বিচার-শেষে কাজি সাহেব রায় প্রকাশ করিলেন। ফরিয়াদীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন :—

"আবদুল, তুই অতি অভদ্র ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিস। এত বড় তোর গোস্তাকী যে নবাব সাহেবের দৃষ্টিপথে বসিয়া তুই কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত মারিস্! এমন ঘুমাস্ যে তাঞ্জামবাহকগণের উচ্চ চীৎকারেও তোর ঘুম ভাঙ্গে না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাব সাহেবকে সেলাম করিস্ না! এই অপরাধে, আমি তোর এক-বৎসরকাল দ্বীপান্তরের দণ্ডবিধান করিলাম।"

আদেশ শুনিয়া, নবাব বাহাদুরের মুখে হাসি আর ধরে না! তাঁহার মোসাহেবগণ সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মোবারক্! মোবারক্!—হাঁ, সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার যদি বলিতে হয় তবে ইহাকেই বলা যায়। ধন্য কাজি সাহেবের শিক্ষা, ধন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধন্য তাঁহার সমদর্শিতা!"

এই উচ্চ প্রশংসাবাদ শ্রবণেও কাজি সাহেবের মুখখানি গম্ভীর। ইহার পর তিনি বলিলেন :—

"আর শুন, নবাব সাহেব। তুমি বড়লোক, জমিদার,—আর গরীব আবদুল খাটিয়া খুটিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ করে! সামান্য অপরাধে তুমি এই গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়াছ; ইহা নিতান্ত অন্যায়, অধর্ম্ম ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছে। অতএব তোমার প্রতি আমার দণ্ডাজ্ঞা যে, তুমিও একবৎসরকাল দ্বীপান্তরের শাস্তিভোগ করিবে।"

বলিয়া কাজি সাহেব, এজলাস ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

আদেশ শুনিয়া, নবাব বাহাদুরের মুখ খানি শুকাইয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে "অ্যাঁ? অ্যাঁ?" বলিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মোসাহেব-গণ হতভম্ভ হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

এই রায়ের বিরুদ্ধে, বাদশাহের নিকট নবাব বাহাদুর আপীল করিলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না।

কয়েক দিন পরে, আবদুল ও নবাব সাহেব উভয়কে রাজকীয় জাহাজে উঠানো হইল। সমুদ্র পারে, একটি দ্বীপে গভীর রাত্রে উভয়কে নামাইয়া দিয়া, কাপ্তেন জাহাজ লইয়া ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, "বৎসর অতীত হইলে, তোমরা উভয়েই এইখানে অপেক্ষা করিও, আমি আবার আসিয়া তোমাদের তুলিয়া লইয়া যাইব।"

৩

এই দ্বীপে যাহারা বাস করিত, তাহারা সভ্যজগতের কোনও সংবাদই রাখিত না, কোনও সভ্যজাতির ভাষা অবগত ছিল না, বনের ফল মূল আহরণ করিয়া কিংবা পশু শিকার করিয়া তাহার মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত এবং পশুচর্ম্মই ছিল তাহাদের বস্ত্র। প্রাতে উঠিয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া এই দুইটী নবাগত অতিথিকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই সংবাদ ক্রমে তাহাদের বস্তিতে গিয়া পৌঁছিলে, বহুসংখ্যক নর-নারী ও বালক বালিকা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের দেখিতে আসিল। তাহারা নিজ ভাষায় এই দুইজনকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নবাব ও আবদুল তাহাদের একটা কথাও বুঝিতে না পারিয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল! কেহ কেহ বলিল, "এ উৎপাত কোথা হইতে আসিয়া জুটিল! না জানি ইহারা কবে আমাদের কি অনিষ্ট করে, ইহাদের মারিয়া ফেলাই উচিত।" কেহ বলিল, "না না, আমরা এত লোক, ইহারা দুইজনে আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারে? মারিয়া ফেলা উচিত নহে।" আবার কেহ বা বলিল, "আমাদের সর্দ্দার আসুন, তিনি যেমন বলিবেন, সেইরূপ ব্যবস্থাই করা যাইবে।"

নবাব বাহাদুর দুঃখে ও অপমানে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। আবদুল হাত দুটী যোড় করিয়া, কাতর নয়নে, ইঙ্গিতে তাহাদের দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল।

সর্দ্দার মহাশয় অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া পৌঁছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেছে বুঝিতে পারিয়া, আবদুল গিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

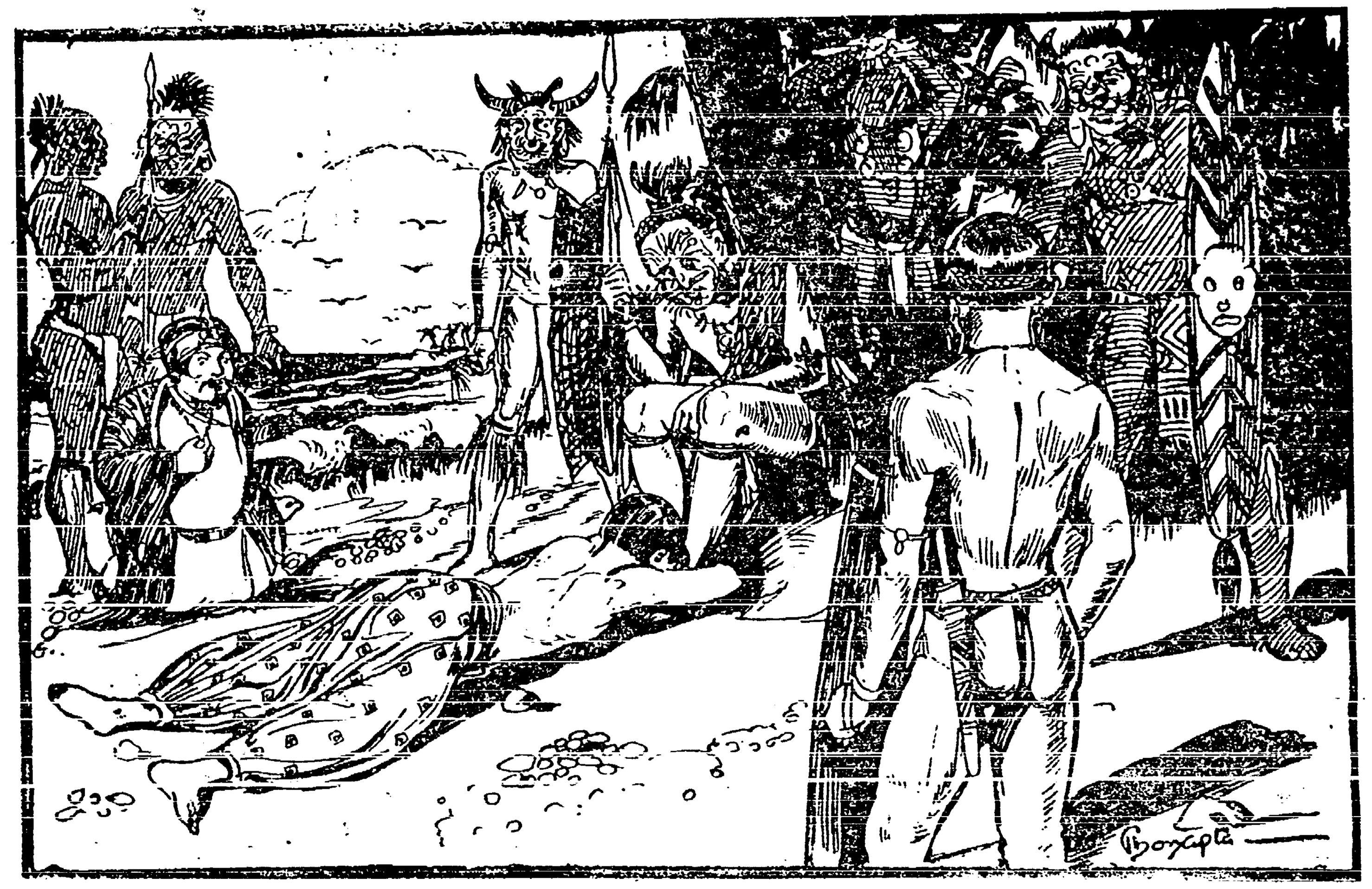

নবাব বাহাদুর, আবদুল ও অসভ্য লোক

অনেকেই তাঁহাকে পরামর্শ দিল, ইহাদের হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু সর্দ্দার এ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন, "মিছামিছি মনুষ্য হত্যা করিয়া কি হইবে? বরং ইহাদের দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারে। চল, ইহাদের বস্তির ভিতর লইয়া চল। ইহাদের কাজ দেওয়া যাইবে,—খাটিবে খাইবে।"

বস্তির ভিতর লইয়া গিয়া, সর্দ্দারের লোকেরা দুইখানি কুড়ুল আনিয়া ইহাদের হাতে দিয়া, দুইটা শুক্‌না গাছ দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিল, "এই গাছ দুইটী তোমরা কাটিয়া ফেল, কাজ শেষ হইলে তবে খাইতে দিব।"—বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আবদুল কুড়ুলখানা লইয়া, গাছের গোড়ায় ফপাফপ্ কোপ বসাইতে

লাগিল। তাহার দেহে বিপুল শক্তি—এ সকল কার্য্যে সে বিলক্ষণ অভ্যস্ত। সারাদিনে গাছটাকে ভূমিসাৎ করিয়া শাখাগুলাও একে একে কাটিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিল।

নবাব বাহাদুর প্রাণের দায়ে, কুড়ুলখানি উঠাইয়া গাছে কোপ্ দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু একটা কোপও গাছের গুঁড়িতে ভাল করিয়া বসিল না। দশ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দরদর ধারায় ঘাম ছুটিল; হাত ব্যথা হইয়া গেল, তিনি কুড়ুল ফেলিয়া, বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, আবার সুরু করিলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ কুড়ুল চালাইতে পারিলেন না। ক্রমে দিবা অবসান হইল।

সর্দ্দারের লোকেরা আসিয়া আবদুলের কার্য্য দেখিয়া খুব খুসী হইল। তাহার পিঠ থাবড়াইয়া সেই খুসী প্রকাশ করিল। নবাবের গাছটা অর্দ্ধেকও কাটা হয় নাই দেখিয়া রাগিয়া তাঁহাকে এক লাথি মারিয়া বলিল, "তুই পাজি কোনও কর্ম্মের নোস্! কেবল ভুঁড়িই সার।"

আবদুলকে তাহারা আদর করিয়া কতকগুলি ফল, ও খানিকটা মাংস খাইতে দিল। নবাবকে গোটা কতক নিকৃষ্ট ফল মাত্র খাইতে দিল, মাংস মোটেই দিল না।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। আবদুলকে তাহারা যে কার্য্যে লাগায়, তাহা যতই পরিশ্রমসাধ্য হউক না কেন, আবদুল তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন করে। নবাবকে যে কার্য্যই দেয়, কোনটাই তিনি সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। ফলে, আবদুলের খুব আদর হইল। সে ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ঘরে থাকিতে পায়। নবাবকে খাইতে দেয় অন্য সকলের উচ্ছিষ্ট—কদন্ন। পেটের জ্বালায় নবাব তাহাই খাইয়া কোনও মতে জীবনধারণ করেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিলে পর, নবাব বাহাদুরের শরীরে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তিনি এখন আর সেরূপ স্থূলকায় নাই। তাঁহার চর্ব্বি গলিয়া ভুঁড়ি ধ্বসিয়া, দেহের আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে। খাইবার সময় উপস্থিত

হইলে, ক্ষুধায় তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। রাত্রে কুঁড়ে ঘরে চেটাইয়ের উপর শয়ন করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন—এবং প্রায়ই এক ঘুমে তাঁহার রাত কাটিয়া যায়। প্রভাতে উঠিয়া দেহে নূতন বল অনুভব করেন, এবং এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াও কাতর হইয়া পড়েন না। এতদিনে ইহাদের ভাষাও তিনি কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছেন। আবদুলও শিখিয়াছে।

৪

এই অসভ্যগণের একজনের একটী বালক পুত্র আবদুলের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আবদুল যখন কাজ করিত, তখন সে প্রায়ই তাহার কাছে কাছে থাকিয়া খেলা করিত;—কার্য্য শেষ হইলে, আবদুল তাহাকে কোলে বা কাঁধে তুলিয়া বেড়াইতে যাইত। সেই দ্বীপে নানা জাতীয় শর গাছ ছিল—কোনটার ছাল শাদা ধবধবে, কোনটার পীতবর্ণ, কোনটার বা টকটকে লাল। আবদুল একদিন অবসর সময়ে বসিয়া, নানা বর্ণের শরকাঠি হইতে ছাল ছাড়াইতে লাগিল। ছেলেটী জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি হইবে আবদুল ?"

আবদুল বলিল, "তোর জন্য একটা মজার জিনিষ তৈরী করিয়া দিব।"

পরদিন কার্য্যশেষে আবদুল বসিয়া সেই শরের ছালগুলি দিয়া, বালকের জন্য একটি টুপী বুনিয়া দিল। সেই টুপী মাথায় দিয়া বালক ত আনন্দেই আট-খানা!—সে নাচিতে নাচিতে গিয়া তাহার জনক জননীকে উহা দেখাইল।

সেই সুন্দর টুপী দেখিয়া, অসভ্যগণের মনে সেইরূপ টুপী পরিবার জন্য অত্যন্ত লোভ জন্মিল। তাহারা আবদুলকে কাঠ কাটা, মাটী খোঁড়া প্রভৃতি কার্য্য হইতে অবসর দিয়া বলিল, "তুমি কেবল সারাদিন বিভিন্ন মাপের এইরূপ টুপী প্রস্তুত কর—আমাদের সকলের জন্যই এইরূপ টুপী চাই। অবশ্য সর্দ্দার মহাশয় ও তাঁহার পুত্র পরিবারগণের টুপীগুলিই প্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে।"

ইহার পর হইতে আবদুল কেবল টুপীই বুনিতে লাগিল। তাহার হাতের কাজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অসভ্যগণ অত্যন্ত প্রীত হইল। বাসের জন্য তাহাকে ভাল ঘর দিল, এবং খাদ্য দ্রব্যাদিও ভাল ভাল দিতে লাগিল।

নবাব বাহাদুর সেই কাঠ কাটা এবং মাটী খোঁড়ার কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার দেহে এখন বিলক্ষণ বলসঞ্চয় হইয়াছে—দেহ নীরোগ,—ভাগ্য-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও, মন এখন বেশ প্রফুল্ল থাকে। আবদুলের প্রতি এখন আর তাঁহার মনে কিছুমাত্র ঈর্ষা বা বিদ্বেষ নাই—তাহার সহিত বন্ধুভাবেই মিশিয়া থাকেন। আবদুলও তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে, এবং নিজের ভাল খাবার গুলির ভাগ দেয়।

বৎসর অতীত হইল। পারস্য রাজ্যের জাহাজ আবার এই দ্বীপে আসিয়া লাগিল। কাপ্তেন নামিয়া আসিয়া, নবাবকে এবং আবদুলকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

৫

যথাসময়ে জাহাজ গিয়া পারস্য দেশে পৌছিল। রাজাদেশে, আবদুল ও নবাব উভয়কেই সেই কাজি সাহেবের নিকট উপস্থিত করা হইল। তখনও উভয়েরই বন্দী-বেশ।

কাজি সাহেব নবাব বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অলস ও অকর্ম্মণ্য ধনী ব্যক্তির সহিত, দরিদ্র ও শ্রমশীল লোকের পার্থক্য কি, তাহা আপনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি ?"

নবাব বলিলেন, "করিয়াছি, মহাশয়।"

"এখন আপনার ক্ষুধা কিরূপ হয় ?"

"বিলক্ষণ হয়।"

"আর নিদ্রা ?"

"অতি সুনিদ্রা হয়—রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায় তাহা জানিতেও পারি না।"

"ইহার কারণ কি, তাহাও বোধ হয় আপনি উপলব্ধি করিয়াছেন ?"

"ইহার কারণ,—মিতাহার ও শ্রমশীলতা।"

কাজি সাহেব বলিলেন, "উত্তম কথা। এখন আপনি নিজগৃহে গমন

করিতে পারেন। দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া যে শিক্ষালাভ করিয়া আসিলেন, তাহা যেন আর ভুলিবেন না। আর এক কথা। আপনি অতি অন্যায়পূর্ব্বক এই গরীবের ঘর দুয়ার ও জীবিকার একমাত্র উপায়, ইহার শরের ক্ষেত জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ঘর দুয়ার নিজব্যয়ে আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ আপনি উহাকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিবেন। এই সর্ত্তে আপনি সম্মত হইলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিব, আপনি গৃহে যাইতে পারিবেন।”

নবাব বাহাদুর তৎক্ষণাৎ কাজি সাহেবের আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, বন্ধুভাবে আবদুলের হস্ত ধারণ করিয়া, আদালত-গৃহ-হইতে বহির্গত হইলেন।

আবোল-তাবোল

(শ্রীমাঠব্য)

কবিতার ছন্দে টক্ টক্ গন্ধ
পাও যদি, জেনো তবে নাকটা ই মন্দ;
কি দিয়েছি কবিতায় যদি সেটা জান্‌তে,
সেরা ব'লে তবে তারে আলবৎ মান্‌তে।
দেড় পোয়া ছাড়পোকা পিষে নিয়ে জাঁতাতে,
তিন ভরি দুই পল জল ভরা হাতাতে
দিয়েছি যে বেশ করে নিজ হাতে বিছিয়ে,
আতরের গন্ধতো তাই গেল পিছিয়ে!

যদি শোন কবিতায় রস নাই মিষ্টি,
বুঝ্‌বে যে রসনাটা তারি অনাছিষ্টি।
মোমছাল, নিমছাল, সিমছাল, চিরতা
ক' চামচ দিতে হয় বলে দেছে নীরো তা'।

তুলে নিছি তিন ফোঁটা থালা মাঝে চিতিয়ে,
আধ্ ফোঁটা গরমিলে সব যেতো তিতিয়ে।
সেজ্'দাদা চেখে বলে, আরে আরে তাইতো,
মোম্‌বাতি ভাজেতে ও এত গুড় নাইতো!

এইবার বলি শোন কি দিয়েছি রূপতা',
—আরে ছি ছি কোথা লাগে জহরৎ মুক্তা।
চোখ দেছে জাপানীরা, নাক্ দেছে চীনারা,
(নিই নাই, রং দিতে চেয়েছিল সিঙাড়া)।
একদিন সাথে নিয়ে ঝাঁকা-মাথা মুটিয়া
গোঁফ্ জোড়া দিয়ে গেল সনাতন ভুটিয়া।
কেঁদে বলে পম্ব "সবি দিলি বাছারে,
দেখ্নারে রংখানা পাস্ কিনা কাছাড়ে"।
হেসে বলে নিগ্রো "আরে ভায়া ভেবোনা
তুমি চাও চাম্ড়াটা সেটা আর দেবোনা ?"
কি খাসারে! কি খাসারে! চাম্ড়ার বর্ণ!
দেখে শুনে কাল মুখে ফিরে গেল স্বর্ণ।

হারাধন শর্ম্মা, বাড়ী তার কেশরে,
কবিতাটা প'ড়ে বলে "ওরে ওরে দেশে'রে,
রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে ও ঝলকে
লেখা তোর তোলা র'বে ত্রিশূলের ফলকে"।

অরুণ—আলো

[ছোটদের বড়গল্প]

(শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন, এম-এ)

(১)

অরুণ ডাক্লে—"ও আলো!" আলো উত্তর দিল—"কি মামা ?"
অরুণ বল্লে—"এস, আমরা একটী স্বর্গ গড়ি।"

(২)

অরুণ আলোর মামা কিনা, তাই আলো হ'ল অরুণের ভাগ্নী। ভাগ্নী

ছোট, মামা বড়। দুজনে খুবই ভাব,—এবং শুধু ভাব নয়, দুজনে খুবই বন্ধুত্ব। তারা মনের সুখে লাফায়, ঝাঁপায়, খেলা করে, পড়ে, লেখে, ছবিও আঁকে। আর যখন মাথার ভেতরে বড্ড বেশী দুষ্টুমি আসে, তখন দৌড়দৌড়ি আরম্ভ করে। দুজনে খুবই বন্ধু কিনা, তাই অনেক সময় দুজনের মধ্যে খুবই ঝগড়া হয়,—তাতে আলো কাঁদে, অরুণ কাঁদায়। তার পরেই আবার ভাব,—দুজনে ফের একসাথে হট্টগোল বাধায়। যখন তারা হাঁফিয়ে ওঠে, তখন তাদের মুখ রাঙ্গা হ'য়ে একাকার! তখন তাদিকে ভারী সুন্দর দেখায়,—এ ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসে, খুবই হাসে,—এই রকমে দিন যায়।

এই রকমে দিন যায়, মাস যায়, অনেক দিন যায়।

অরুণ-আলোর বন্ধুত্বের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়্ল। ছোট্ট মামার আর ছোট্ট ভাগ্নীর কথা দৈত্যরাও বোধ হয় শুন্ল,—শুনে তারা কি ভাব্ল তার আমি কি জানি ? ছোট্ট মামা আর ছোট্ট ভাগ্নীর বন্ধুত্বের কথা নানা-দেশের রাজারাও শুন্লেন,—মন্ত্রীরাও শুন্লেন,—সদাগর, কোটাল সবাই শুন্লেন। স্বর্গের দেবতারা আর অপ্সরারাও এই বন্ধুদের দিকে চেয়ে হাস্লেন। যত সব বড় বড় কবি তাঁরা কবিতা লিখে ফেল্লেন।

অরুণ ডাক্লে—ও আলো!

আলো—কি মামা ?

অরুণ—এস আমরা একটী স্বর্গ গড়ি।

আলো ত অবাক্! স্বর্গ আছে আকাশের মাঝে, তারার দেশে, পরীর দেশে—সে স্বর্গ—আবার গড়া যায় নাকি ? আলো অরুণের মুখের পানে চাইল,—বেশ ভাল ক'রে চাইল। অরুণের মুখ গম্ভীর। মামার মুখ দেখেই ভাগ্নী বুঝ্ল,—হাঁ, স্বর্গ-গড়া হবেই হবে। তাই আলো আস্তে আস্তে বল্লে—"বেশ, মামা,—সেইটেই বেশ হবে—। স্বর্গটাই বরঞ্চ তৈয়ারী করা যাক্।"

আলো এ কথা বল্লে বটে, কিন্তু তার মনে সন্দেহ বেশ রকমই রয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল—"কিন্তু, মামা, স্বর্গের সব জিনিসপত্র কোথায় পাব ?"

অরুণের উত্তর শুনে আলো আরও অবাক্ হল,—কারণ অরুণ বল্‌লে—"যা যা চাই, সবই হবে। প্রথমে চাই ভগবান্—তিনি ত সব স্থানেই আছেন। আর চাই ঐরাবত হাতী, আর ইন্দ্র, কিছু অপ্সরা, পারিজাত ফুল, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক-কিছু—এই ত ? সে হবে !"

আলোর সন্দেহটা অনেকখানি কমে গেল,—আর তার মনের ভিতরটায় আনন্দ হ'ল প্রচুর, কারণ সে বারংবার দেখেচে যে মামার অসাধ্য কিছুই নাই। যাক্, এতদিনে একটা আমোদের মত আমোদ করা যাবে !

কথাবার্ত্তার পর দুজনে কাজে লেগে গেল। আলোর সুখের অন্ত নাই,—তার মুখখানা পদ্মফুলের মত হাসচে,—আর অরুণ ? অরুণ কাজের লোক,—তাই সে গম্ভীর হ'য়ে ভাবচে, আর এটা ওটা ব্যবস্থা করচে।

তখন সন্ধ্যাকাল। স্বর্গ নির্ম্মাণের কাজে মামা-ভাগ্নী বড়ই ব্যতিব্যস্ত। তার উপর আবার তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে। দুজনেরই ঘুম পাচ্চে। দুজনেই ভাবচে,—"এবার ঘুমিয়ে পড়ি।—সকালে উঠে,—হাঁ, সকালে—বুঝ্‌ছিস্ ? সকালে—ওমা, ও, ওটা কি ? কি !!"

তাইত ! ওটা কি ? মস্ত বড় ভীষণ ভয়ানক কি যেন একটা কাছে আস্‌চে ! তার চারটে পা, দুটো চোখ,—আরও কত কি !

দুজনেই ভয়ে জড়সড়। আলো অরুণের অত্যন্ত কাছে ঘেসে একেবারে চোখবুজে চুপ ! অরুণ সাহস ক'রে চোখ খুলেই রইল বটে,—কিন্তু তার মনটা কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠ্‌ল। মাকে ডাকবে কিনা সেটাও স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ল না। বর্ষাকালে আকাশের মেঘগুলোর গম্ভীর মুখ দেখে তোমরা যেমন ঠিকই বুঝ্‌তে পারো যে বৃষ্টি হবে, তেম্‌নি সে সময়ে অরুণের মুখ দেখ্‌লেই তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌তে যে সে এক্ষুনি কেঁদে ফেল্‌বে।

ও ! কি মহাবিপদ ! কি করা যায় ! কি হবে !

ঠিক এই সময়ে অরুণের মা এসে ডাক্‌লেন—"ওরে ও অলি, ও আলো তোরা ঘুমুচ্চিস্ নাকি ? খাবিনে ?"

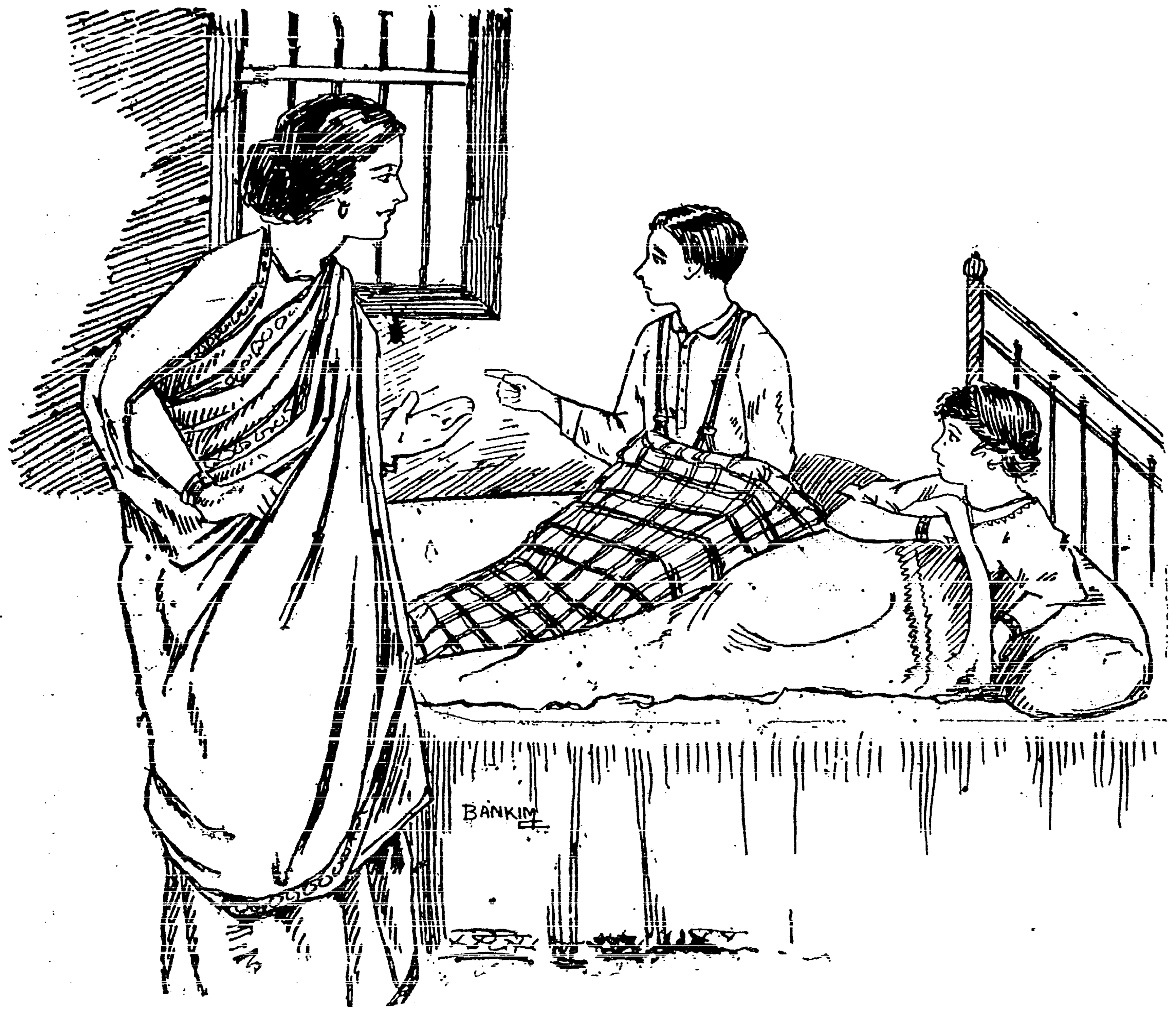

ওমা, একটা পোকা দেখে এত ভয় পেলে, ছি ! ছি !

তোমরা যত বড় বিপদেই পড় না কেন, মা তোমাদের রক্ষা কর্ব্বেনই কর্ব্বেন। তাই মাকে দেবী বলা হয়।

মায়ের গলা শুনে অরুণের সাহস এল, দিদিমার গলা শুনে আলোর সাহস এল। আলো চোখ বুজেই কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—"দিদিমা,—ওই যে !" অরুণ লজ্জায় কাঁদ্‌লে না,—শুধু জোরে জোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মা বল্‌লেন "কিরে, কি দেখাচ্ছিস্ ? কই, দেখি, ওমা, একটা পোকা দেখে এত ভয় পেলি, ছি, ছি, অলি, তুমি এত বোকা ! এটা যে পোকারে, এই ছাখ্‌ না।" (ক্রমশঃ)

বর্ম্মার কথা

অধ্যাপক—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বর্ম্মা নামটা একালের হইলেও দেশটা প্রাচীন। বৌদ্ধগ্রন্থের বর্ণনায় বর্ম্মার নাম স্ুবর্ণভূমি। সেই সোণার দেশের কথা আজ তোমাদের কিছু বলিব। বর্ম্মার সব নদী-তেই যদিও কিছু কিছু সোণা পাওয়া যায়, তবুও সেই সোণা বেচিয়া বর্ম্মার ধনরত্ন নয়। বর্ম্মার রত্ন তার প্যাগোডা (মন্দির) বা "ফয়া" গুলি, হাসিমুখ নরনারী, গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী (ফুঙ্গি) ও সন্ন্যাসিনী ; বর্ম্মার ধন-ভাণ্ডার দক্ষিণ বর্ম্মার উর্ব্বর ক্ষেত্র, উত্তর বর্ম্মার তেল, মনির খনি ও বন। বর্ম্মা দেশ প্রধানতঃ সরলতা ও আনন্দের দেশ ; জীবনে দুঃখ কষ্ট তো আছেই কিন্তু তার হাসির আলোকই বর্ম্মানরা খোঁজে, তাই লক্ষ্মীর বাহন পেঁচার মুখের বদলে লক্ষ্মীর নিজের হাসির ছটা বর্ম্মানদের মুখে চোখে দেখা যায়।

বর্ম্মার একটী দৃশ্য—দূরে প্যাগেডা দেখা যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার স্থানাভাবে পৌরাণিক গল্প দেওয়া হইল না, আগামী বারে যাইবে।

অদ্ভুত ভাষা

ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জে গঞ্জ বলিয়া এক জাতীয় লোক বাস করে। তাহাদের ভাষা বড়
অদ্ভুত। তাহারা এমনি কোনও কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। কাহাকেও কিছু বলিতে
হইলে নানারকম ভাবে শিষ দিতে থাকে। ঐ শিষই তাহাদের ভাষা। একবার কোন
ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মুখে আমাদের মত কথা শুনিয়া নাকি ইহাদের একজন দুই মাসের
জন্য একেবারে কালা হইয়া গিয়াছিল। এই জাতি আস্তে আস্তে পৃথিবী হইতে লোপ
পাইতেছে।

লম্বা নাম

আমাদের ছেলেবেলায় পরিচিত একটী মেয়ের নাম মনে পড়ে—"সুহাসিনী সুবাসিনী
সুললিত লবঙ্গলতা শতদলবাসিনী"। নামটি এত লম্বা যে বেচারাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে
একটু মুস্কিলে পড়িয়া যাইত। কিন্তু লিভারপুলের এক ধোপা তাহার মেয়ের যে নাম রাখিয়াছে
তাহা কাহাকেও বলিতে হইলে বোধ হয় কয়েকদিনেই মেয়েটির মুখের দফা সারা হইবে।
নামটি এই—এনা বার্থা সিসিলিয়া ডায়না এমিলি ফ্যানি গার্টুড হাইপেসিয়া ইনেজ জেন কেটী
লুইসা মড্‌নোরা ওফেলিয়া কুইন্স্‌ রেবেকা ষ্টারকী টেরেসা ইউলিসিস্‌ ভেনাস্‌ উইনিফ্রেড্‌
জেনোফোন এটি জেনো পেপার। ইংরাজীর A হইতে Z পর্য্যন্ত সবগুলি অক্ষরই ইহার
মধ্যে আছে।

জাহাজ দ্বীপ

কিছুদিন হইল ড্রেক প্রণালীতে এক মজার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। একদল শিকারী
বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে একটি দ্বীপ দেখিতে পায়। ডাঙ্গা দেখিয়া রাত্রি কাটাইবার জন্য
সেখানে তাঁবু খাটাইয়া তাহারা দিব্যি ঘুম দিয়াছে, পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দ্বীপ হইতে
বাহির হইতে গিয়া ত অবাক! ওমা এ কোথায় আসিল, এ যে সাতমাইল দূরের বিখ্যাত
নোমাডিক বন। পরে জানা গেল যে, যে সময় তাহারা দিব্যি আরামে ঘুমাইতেছিল সেই সময়
দ্বীপটি ভাসিয়া সাত মাইল সরিয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্য ছবি

বিলাতের এক ছবির মেলায় একখানা আশ্চর্য্য ছবি চুরি গিয়াছে। ছবিখানি যিনি ফটো-
গ্রাফী আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার—ড্রেস্‌ডেনের প্রোফেসর গোল্ড্‌বার্গের আঁকা। ছবিখানি
এত ছোট যে ঐ রকম শ'খানেক ছবি পাশাপাশি দাঁড় করাইলেও একটি আলপিনের
মাথার উপর রাখা যায়। সাধারণ চোখে ছবিটি অবশ্য দেখা যায় না, খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ

দিয়া দেখিতে হয়। যে যন্ত্রে কোন একটা জিনিষকে একলক্ষ ৬০ হাজার গুণ বড় দেখায় তাহাতেই ছবিটিকে একখানা ডাকটিকেটের মত দেখায়।

চিত্রকরের দেশ

নরওয়ের ষ্টকহলম্ সহরের একধারে পাহাড়ের উপর খুব সুন্দর একটি পল্লী আছে,—তাহার নাম সোডারমাগ্। জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এত চমৎকার, যে সেখানকার কর্ত্তারা ঠিক করিয়াছেন যে, দোকান পাট, কলকারখানা দিয়া যাহাতে জায়গাটার ভগবানের দেওয়া সৌন্দর্য্যটুকু না নষ্ট হয় তাহা করিতে হইবে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে চিত্রকর ছাড়া আর কাহাকেও সেখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না। চিত্রকরই ও জায়গার আদর সব চেয়ে ভাল বুঝিবে, তাই উহা হইবে শুধু চিত্রকরের দেশ।

নূতন ধাঁধা *

(১)

ত্রি অক্ষরে নাম মোর ছাড়ি শেষ তার
যুড়িয়া আকার তাহে করিয়ো আহার।
মাঝটুকু দিয়া বাদ পাইবে যাহারে,
ইংরাজীর বর্ণ মাঝে খুঁজি' নিও তারে।
মাথা গেলে কিবা থাকে জেনে নিয়ে কিনো;
আমারে লভিলে তুমি খুসী হবে জেনো।

(২)

নীচে ভারতবর্ষের ১৭টি সহরের নাম লুকান আছে। খুঁজিয়া বাহির কর ত'—

কোথাও কেহ নাই শুধু খোকা শীতে শাল ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে কম্বল পাতিয়া লাবণ্য, অসীম, লাটু, টেঁপু, রীণা, বীণা, দিব্যি আরামে ঘুম লাগাইয়া দিল, মেজদা আসিয়া বলিলেন না বাপু না, ভাল বিপদ্, গাড়োয়ান বেটার হাতে গাঁজার কলিকা, তাহাকে কি আনা যায় বলে আ,—গ্রাম কি এখানে? যাব যদি ৫ টাকা দেও—ঘর ভরা টাকা কিনা? ভয় দেখালাম আর'ও ঢের গাড়ী পাব, না হয় হেঁটে যাব, তবু কি আসে?

যাক্ গোশকট করিয়া চলিলাম, সে কি গাড়ী, না আছে কপাট না আছে গদী, মেজদাকে বলিলাম 'মারা যাবে,' মেজদা বলিল মরি বাঁচি তোর কি? শেষে তাহাতে চড়িয়াই বহু গলি ঘুঁজি ঘুরিয়া বাড়ী আসা গেল।

---

* যাঁহারা ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন আগামী সংখ্যায় তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবে। কেবল মাত্র গ্রাহক গ্রাহিকারাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

মা ও ছেলে।

১ম বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩৪ { ২য় সংখ্যা

রামধনু

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

রামধনু আমি শুধু
রামধনু ভাই,
জলভরা চোখে আমি
হাস্য ফুটাই।
নীলিমার কোল জুড়ি
পুলকের ফুলঝুরি,
নভ হাসি কান্নায়
পান্না গড়াই।

অরুণের সাতরঙা
অশ্বের রথ,
আমারি রঙিন বুকে
খুঁজে পায় পথ।

ব্যোমবুকে আনি ধীরে
কি ময়ূরপঙ্খীরে,
রূপে আমি অরূপের
মাঝে দিই ঠাঁই।

রামধনু—নাই তবু
হেমমৃগে আশ,
করি নাই বালি-বধ,
দশানন-নাশ।

সুষমার শরজালে
জিনিয়াছি এ নিখিলে,
নবঘন রূপ হেরি
সাথে সাথে ধাই।

আকাশের ঘননীল
অশোকের বন,
মেঘ না এ, জানকীর
উচাটন মন।

রঙ্গীন আমি আশা
করি সেথা যাওয়া আসা,
স্নেহধারে নিতি তাঁর
নবপ্রাণ পাই।

রামধনু—আমি জল-
কণিকার গড়,
শিখিপাখা দিয়ে রচা
পরীদের ঘর।

অমৃতের উৎসবে
কচি হিয়া ডাকি নভে,
কচি হাতে সোহাগের
রাখী বেঁধে যাই।

(২)

(শ্রীকালিদাস রায়)

রামধনু আজ নেইক সঘন গগন-কোণে,
আজ সে ফুটে আজ সে লুটে বনে বনে।
আজ জাগেনা বাদল সভার মাদল শুনে,
শাখায় পাখায় ছড়িয়ে গেছে আজ ফাগুনে।
ময়ূরে আজ নাচায় না সে গিরির চূড়ে,
পিকেরে আজ গাওয়ায় রঙীন মধুর সুরে।
বর্ণে আজি নয়ন শুধু ভুলায় না সে,
গন্ধে সে আজ মাৎ ক'রে দেয় বন-বাতাসে।
ঝিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে কচি পাতায়,
অস্তরবির কিরণমালায় নেশায় মাতায়।
রামধনু আজ নেইক সঘন গগন-কোণে,
হোলীর লীলায় মাতে সে আজ গৃহাঙ্গণে।

জাগেনা রামধনু কেবল গগন-কোণে,
জাগে সে যে শিল্পী কবির রসিক মনে।
জাগে সে যে রঙবেরঙের পাখীর গায়ে,
জাগে সে যে প্রেমিক জনের আঁখির ছায়ে।

জাগে সে যে মণির আভায়, ফণীর ফণায়,
জাগে সে যে ঝরণাতে লাখ সলিল-কণায়,
জাগে সে যে মেরু-প্রভায় মরুর বুকে,
সাতটী সুরে জাগে সে যে গায়ন-মুখে।
ছন্দে জাগে কবির খাতার পাতে পাতে,
লক্ষ্মীমায়ের পায়ের রঙীন আলপনাতে।
জাগে সে যে শিশুর অমল ধবল মনে,
কল্পনারি ক্ষেত্রে তাহার স্বপন বোনে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মার্কণ্ডেয়

[মহাভারত হইতে]

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য)

মহারাজ যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হারিবার পর অনেক দিন কাম্যক বনে কাটাইয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন চারি ভাই, স্ত্রী দ্রৌপদী আর পুরোহিত ধৌম্য। বনে তাঁহারা মুনি-ঋষির মত থাকিতেন, মুনিঋষির সহিত নানারকমের আলাপ করিতেন। ক্রমে বৃদ্ধ মুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহাদের সহিত জুটিয়া গেলেন। বৃদ্ধ আর তখন যান কোথায় ? প্রশ্নের পর প্রশ্ন, বেচারি ত অস্থির। একদিন ভাই কটী ও পুরোহিত ঠাকুর মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, ঠাকুর, আপনার চেয়েও বুড়ো কি কেউ আছে ?" মার্কণ্ডেয় তাহার উত্তরে তাঁহার নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলিতে লাগিলেন ঃ—

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পুণ্য কমিয়া গেলে তিনি একদিন স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখুন ঠাকুর, আমার কীর্ত্তির কথা ত লোপ পাইয়াছে, আপনি কি আমাকে সাবেক কথা মনে করাইয়া দিতে পারেন ?"

আমি বলিলাম "আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াই, নিজে যাহা করিব মনে করি তাহাই ভুলিয়া যাই, তারপর না খাওয়া না দাওয়া, মনে পড়িলেও

কাজ করার শক্তি শরীরে থাকে না, আপনাকে আমি এই জ্ঞান কেমন করিয়া দিব ?"

ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, আপনার চেয়ে বেশী বয়সের কেউ আছে কি ?"

আমি কহিলাম "হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক উলূক আছে, সে আমার চেয়ে বেশী বয়সের, আপনার সাবেক কথা বলিয়া দিলেও দিতে পারে ; কিন্তু হিমালয় যে অনেক দূর ; ইচ্ছা হয় চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

তখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়া সাজিয়া আমাকে বহিয়া নিয়া একেবারে হিমালয়ে সেই পেঁচার কাছে হাজির। তিনি পেঁচাকে বলিলেন "উলূক ! তুমি কি আমাকে সাবেক কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পার ?"

উলূক একটু ভাবিয়া বলিল "না মশায়, এ আমার কাজ নয়।"

রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"উলূক, তোমার চেয়ে প্রাচীন আর কেহ আছে ?"

উলূক বলিল "ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে, সেখানে এক বক থাকে, তার নাম নাড়ীজঙ্ঘ, সে আমার চেয়ে প্রাচীন।"

তখন চলিলাম আমরা তিনজন সেই বকের অনুসন্ধানে। বকের দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "নাড়ীজঙ্ঘ, তুমি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে চেন ?"

বক খানিক ভাবিয়া বলিল "কই, না, আমি ত তাঁকে চিনিনা।"

তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা, তোমার চেয়ে বেশী দিনকার কে আছে ?"

বক বলিল "এই সরোবরে এক বৃদ্ধ কচ্ছপ আছে, তার নাম অকূপার, সে আমার চেয়ে বেশী দিনকার।"

বক আমাদিগকে অকূপারের কাছে নিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল "আমরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তুমি একবার আমাদের কাছে এস।"

কচ্ছপ উঠিয়া আসিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "অকূপার, তুমি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে চেন ?"

এই কথা শুনিয়া সে কাঁপিতে লাগিল এবং চক্ষু জলে ছলছল করিয়া বলিল—"তা আর চিনি না? ইনি কত কত যাগযজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন, ইনি যজ্ঞে যে সকল গরু দান করিয়াছিলেন তাহাদের ক্ষুরে মাটি উঠিয়া গিয়াই ত এই সরোবরের সৃষ্টি,—এতকাল আমি যে এই সরোবরেই পড়িয়া আছি।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন, মার্কণ্ডেয়, উলূক, বক ও কচ্ছপ

কচ্ছপের কথা যেমন শেষ হইল অমনি দেবলোক হইতে রাজার জন্য রথ নামিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হইল—'মহারাজ, তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি চলিয়া আইস, সুকীর্ত্তির ফল ভোগ কর; যতদিন স্বর্গে মর্ত্তে মানুষের কীর্ত্তির কথা প্রচলিত থাকে ততদিনই তাহাকে প্রকৃত পুরুষ বলিয়া ধরা যায়। যাহার অকীর্ত্তি তাহাকে বাস করিতে হয় নিকৃষ্ট লোকে। অতএব লোকের উচিত পাপকর্ম্মে ইচ্ছা না করা, ধর্ম্মপথে চলা, সর্ব্বদা সচ্চরিত্র থাকা।"

রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি আগে এই বৃদ্ধদুটীকে স্বস্থানে রাখিয়া আসি, পরে রথে চড়িব, তুমি একটু বিলম্ব কর"। রাজা তখন আমাকে ও উলূককে যথাস্থানে রাখিয়া সেই দেবরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

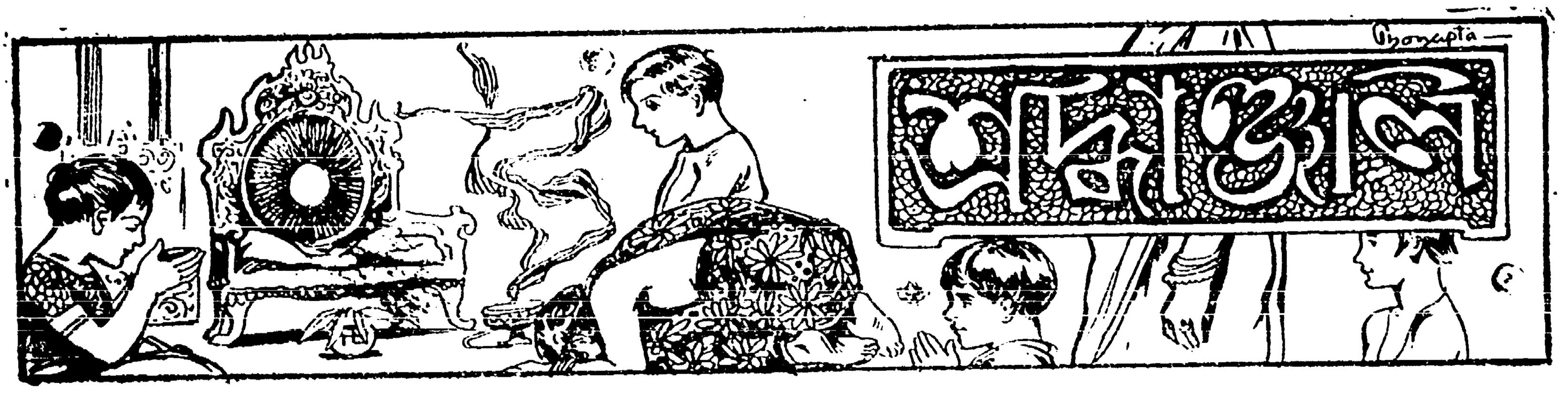

শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ।

(অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম, এ—পি, আর, এস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেকে বলিয়াছিলেন, বাবা নানক সর্ব্বদাই অহিংসার কথা বলিয়াছেন, সুতরাং শিখের পক্ষে মারামারি কাটাকাটি সঙ্গত নয়; কিন্তু গুরুগোবিন্দ বলেন—যুগধর্ম্মে সকল শিখকেই অস্ত্র রাখিতে হইবে ও প্রয়োজনমত তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে, আত্মরক্ষা ধর্ম্মের অঙ্গ। তিনি তরবারিকে ভগবানের আসনে বসাইয়া বলিয়াছিলেন—

নমি তোমায় ভক্তিভরে, পবিত্র তরবারি,
আশিষ্ কর, কর্ম্মে যেন সফল হতে পারি।

শিখদের এই দশম গুরু কখনও বিপদে অধীর বা তাড়াহুড়া করিয়া একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই; কোনও বড় কাজ করিতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা লইয়া বহুদিন থাকিতে হয়, সে কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি তাঁহার "কথা ও কাহিনী"র এক কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—কবিতাটির নাম "গুরুগোবিন্দ"।

এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি,'
অনিমেষ চোখে পূর্ব্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।
এখনো বিহার কল্প-জগতে,
অরণ্য রাজধানী।

এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে' বসে' শোনা
আপন মর্ম্মবাণী।

গুরুগোবিন্দ যে বাঁচিয়া থাকিতেই মস্ত বড় এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন তাহাও নয়, শিখ জাতিকে নূতন মন্ত্র দিয়া গড়িয়া তোলাই হইল তাঁহার সব চেয়ে বড় কাজ ; অর্থাৎ তিনি বাহিরের বস্তু তেমন বড় করিয়া দেখেন নাই, বাহিরের ঐশ্বর্য্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, তাঁহার চেষ্টা ছিল মানুষ গড়িবার দিকে।

মোগল সম্রাটের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বাধিল ; প্রতিবেশী পাহাড়িয়া রাজাদের পরামর্শে আরঙ্গজেব তাঁহাকে বারবার দিল্লীতে আসিতে বলিলেন, কিন্তু সুচতুর গুরুগোবিন্দ তাহাতে সম্মত হন নাই ; সম্রাটের কথা অমান্য করার অজুহাতে মোগল সৈন্য তাঁহাকে বার বার আক্রমণ করে, শিখের রক্তে পৃথিবী বহুবার রঞ্জিত হয়, কিন্তু শিখের এই নূতন শক্তি ও নূতন সাহস হিন্দুমুসলমান উভয়কেই বিস্মিত করিল। এমনও দিন গিয়াছে যখন গুরুকে একা ফিরিতে হইয়াছে, শত্রু তাঁহার পিছনে। একবার তাঁহার অনুমতি লইয়া দুই পুত্র পর পর শত্রুদের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অনেককে মারিয়া শেষে নিজেদের প্রাণও সমরানলে আহুতি দেয়। তাঁহার অন্য দুই ছেলে,—একটির বয়স নয় বৎসর, অন্যটির বয়স সাত বৎসর,—মোগলের হাতে পড়ে ; তাহাদিগকে বলা হয় যে তোমরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তোমাদের অনেক ভাল হইবে, নতুবা তোমাদিগকে কাটিয়া ফেলা হইবে। তাহারা পিতার মান রাখিল, লোভ ও ভয় দুইই ব্যর্থ হইল ; ধর্ম্মত্যাগের কথায় তাহারা একবাক্যে অস্বীকার করিল। তাহাদের যখন বধ করা হয় তখন গুরুগোবিন্দ অল্প দুইচারিজন শিখ লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিলেন, মোগল সৈন্য তাঁহার পিছনে ফিরিতেছিল। এইভাবে নিরাশ্রয় অবস্থায় একদিন শত্রু-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক অনুচরকে রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিতে হয় ; সঙ্গে অবশিষ্ট মাত্র পাঁচজন শিখ ছিল। তখন গুরু তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন—

"আমার পরে অন্য কাহাকেও গুরু করার প্রয়োজন নাই ; যে গুরু সেই খাল্‌সা, যে খাল্‌সা সেই গুরু। যেখানে পাঁচজন শিখ থাকিবে, একত্র হইবে, সেখানেই আমাকে পাইবে, সেখানেই গুরু থাকিবেন। খাল্‌সা রহিল, গ্রন্থসাহেব রহিলেন—আমার পর অন্য গুরুতে তোমাদের প্রয়োজন নাই।" তাই গুরুগোবিন্দই শিখ-ধর্ম্মের শেষ গুরু।

মোগলের আক্রমণ ক্ষীণ হইয়া আসিলে গুরুগোবিন্দ ধর্ম্মপ্রচার ও শিখ-দিগকে ধর্ম্মবিষয়ে উৎসাহ দানের জন্য দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন ; তিনি যখন হায়দ্রাবাদ রাজ্যে তখন একজন পাঠান তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে—গুরু তাহার পিতাকে (কেহ কেহ বলেন, পিতামহকে) নিহত করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিশোধ। এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'তে 'শেষ শিক্ষা' নামে একটি সুন্দর কবিতা আছে। কবিতায় আছে, গুরু তাহাকে নিজের ছেলের মত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন ; তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণপ্রায় হইলে সে যখন বিদায় চাহিল তখন গোবিন্দ আদর করিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।" তারপর একদিন নির্জনে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমার পিতার ঋণ শোধ না করিয়া তাহাকে মারিয়াছিলাম,

"আজ আসিয়াছে দিন
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোল তলবার,—পিতৃঘাতকেরে বধি'
উষ্ণ রক্ত উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।"

পাঠান গুরুর উপকার ও স্নেহ মনে করিয়া কিছুতেই প্রতিশোধ নিতে পারিল না। কিন্তু একদিন খেলায় বসিয়া খেলার ঝোঁকে ও গুরুর উপহাসে আত্মহারা হইয়া পাঠান গোবিন্দের বুকে ছুরি বসাইয়া দিল, গুরু হাসিয়া বলিলেন—

"এতদিনে হ'ল তোর বোধ
কি করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ!"

ইহাই গুরুর শিষ্যকে শেষ শিক্ষা দান।

আহত স্থানে প্রলেপ ও অন্য ঔষধ দিয়া তাঁহাকে অনেকটা সুস্থ করা হইয়াছিল, কিন্তু ধনুকে ছিলা পরাইতে গিয়া ক্ষতস্থান হইতে আবার যে রক্ত পড়িতে আরম্ভ করে তাহা আর কোনও উপায়েই বন্ধ করা গেল না। মরিবার পূর্ব্বেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—খালসাই এখন হইতে শিখ সম্প্রাদায়ের গুরু হইল; যে আমাকে দেখিতে চায় সে গ্রন্থসাহেবের মধ্যেই আমার দেখা পাইবে। তাঁহার চিতা সাজান হইলে এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে ধনুক লইয়া তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। অন্য সব শিষ্যকে বিদায় দিয়া তাঁহার ভক্ত শিষ্য ভাইসন্তোষসিংহকে শেষ কথা বলিয়া গেলেন—"আমার রন্ধনশালা যেন সকলের জন্য মুক্ত থাকে, সকলের যেন তাহাতে প্রবেশ-অধিকার থাকে; আর—আমার নামে কেহ যেন কোনও মন্দির নির্ম্মাণ না করে।" মরিবার পূর্ব্বে তিনি এই মর্ম্মে একটি কবিতা পাঠ করেন—

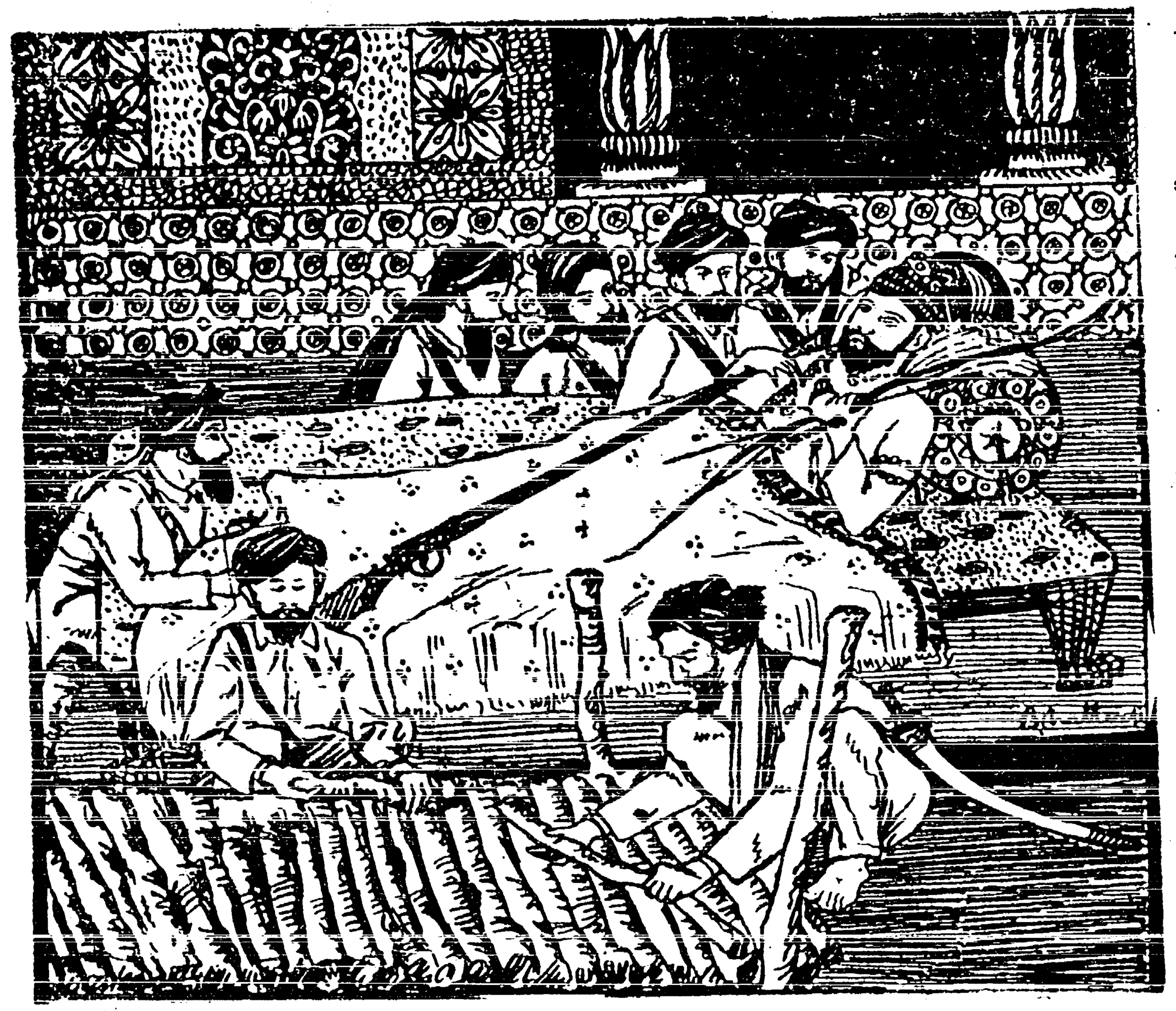
গুরু গোবিন্দ—এক হাতে বন্দুক, অপর হাতে ধনুক, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

"বিজয়, অস্ত্র, অতিথ্ ভোজন—সদাই সাবধান"
পেয়েছিল দশম গুরু, নানকজীর দান।

আরঙ্গজেব যে বৎসর মারা যান তার পর বৎসরেই অর্থাৎ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে

গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হয়। তাঁহার মন্ত্র শিখসম্প্রাদায়ে কি ভাবে কাজ করিয়াছে তাহা একটু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাহসে, যুদ্ধবিদ্যার প্রতি অনুরাগে, সতর্কতায় এবং আতিথেয়তায় আজও শিখেরা পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রণী—গুরুগোবিন্দের শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই।

তরল বাতাস

(শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এস্-সি, বি-এল্)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

এক কেটলী তরল বাতাসকে বরফের উপর চাপাইয়া দিলে কি হয় তাহা আগেই বলিয়াছি, এখন ভাব, বরফের বদলে যদি ঐ কেটলীটাকে একটা জ্বলন্ত উনানের উপর বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে। বাতাস ত ঝড়ের বেগে উড়িয়া বাহির হইবেই, তাহার উপর যদি উড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জল ঐ কেট্‌লীর ভিতর ঢালিয়া দেওয়া যায় তবে সেই জলও সঙ্গে সঙ্গে জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। ব্যাপারটা দেখিতে কি রকম অদ্ভুত বুঝিতেছ ত? বরফ আগুনে গলিয়া জল হয় বলিয়াই আমরা জানি, কিন্তু এখানে দেখিব জ্বলন্ত আগুনের উপর জলই জমিয়া বরফ হইতেছে।

আরও কয়েকটা মজার কাণ্ড বলিতেছি; এক টুকরা মাংসকে তরল বাতাসে ডুবাইয়া দেখা গিয়াছে, উহা এত শক্ত হইয়া যায় যে হামানদিস্তা দিয়া উহাকে অনায়াসে গুঁড়া করা চলে। ভাল দামী ইস্পাত যাহা এমনি আগুনে পুড়িতে চাহে না তাহাকেও তরল বাতাসে ডুবাইয়া আগুনে ধরিলে কাগজের মত সহজ ভাবে পুড়াইয়া ফেলা যায়। তরল পারা তোমরা হয়ত দেখিয়াছ; একবার এক ভদ্রলোক একটা ছোট কাগজের বাক্সে খানিকটা তরল পারা ভরিয়া উহাতে একটা হাতল লাগাইয়া তরল বাতাসের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। একটু পরেই তুলিয়া দেখেন পারা জমিয়া লোহার মত শক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ পারার হাতুড়ী দিয়া তিনি অনেক শক্ত কাঠের মধ্যে বড় বড় পেরেক ঠুকিয়া দিয়াছেন।

কাঁচা ফল, তাজা ফুল, সীসা, রবার প্রভৃতি সমস্ত জিনিষই তরল বাতাসে ডুবাইলে বদলাইয়া এমন শক্ত হইয়া যায় যে তাহাদের অনায়াসে হাতুড়ী দিয়া ছাতু করিয়া দেওয়া চলে। ঐ রকম বাতাসের ভিতর কেহ আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিতে পার কি? কি হইবে বলত? প্রথমে হাত অসাড় হইয়া যাইবে, একটু পরেই দেখিবে শীতে হাতের মাংস একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। গরমেই যে শুধু আঙ্গুল পোড়ে তাহা নয়, তেমন ঠাণ্ডাতেও পুড়িয়া যাইতে পারে।

আবার প্রকাণ্ড এক পাত্র জলের মধ্যে যদি কয়েক ফোঁটা তরল বাতাস ছিটাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলি যেখানে পড়িবে তাহার আশেপাশের জলকে জমাইয়া বরফ করিতে একটুও দেরী করিবে না। আর যতক্ষণ না বাতাসটুকু উড়িয়া যায় ততক্ষণ দেখা যাইবে ছোট ছোট বরফের নৌকা দিব্যি আরামে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ইহা হইতে আমরা পৃথিবীর বাহিরটা কি রকম ঠাণ্ডা তাহার একটু আন্দাজ করিতে পারি। আমাদের পৃথিবীর উপর যে বাতাস আছে উহা অনেক মাইল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া থাকিয়া গরম জামার মত পৃথিবীটাকে বাহিরের শীত হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মাটী হইতে যতই উপরে উঠিবে বাতাস ততই হাল্কা হইবে, আর শীতও ততই বাড়িতে থাকিবে। অনেকে মনে করেন বাতাসের রাজ্যের বাহিরের জায়গায় ঠাণ্ডাটা অনেকটা তরল বাতাসেরই মত। সে রাজ্যে তোমরা কেহ যদি যাইতে পার তবে দেখিবে যাহা যাহা লইয়া গিয়াছ সব জমিয়া বদলাইয়া গিয়াছে। 'দেখিবে" বলিলাম বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় দেখিবার আগে তোমরা শুদ্ধ জমিয়া যাইবে। আবার সে রাজ্যের কেহ যদি কোন রকমে আমাদের পৃথিবীতে আসিতে পারে তাহা হইলে তাহার অবস্থা হইবে কড়াইএর উপর ভাজা মাছের মত। আর যদি সে কোন উপায়ে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিতে পারে তবে নিজের দেশে গিয়া নিশ্চয়ই গল্প করিবে "বাপ্‌রে, পৃথিবীটা একটা আগুনের গোলা ভিন্ন আর কিছুই না"।

এই ত' গেল তরল বাতাসের গুণের কথা। এখন কথা হইতেছে ইহাকে

কি কাজে লাগান যায়? বছরের পর বছর ধরিয়া এই যে মাথার এবং টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া জিনিষটা তৈয়ার হইল ইহা কি শুধু কতকগুলি মজার কাণ্ড দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে? বৈজ্ঞানিকরা অত বোকা নহেন, তাঁহারা প্রকৃতিকে শুধু জয়ই করেন না, তাহাকে দিয়া যথাসাধ্য খাটাইয়া লইতেও ছাড়েন না। তরল বাতাসকেও তাঁহারা ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। মানুষের নানা কাজে ইহাকেও লাগাইয়া দিয়াছেন।

তোমরা কেহ কেহ হয় ত' দাদাদের কাছে শুনিয়াছ যে বাতাসে দুই রকম গ্যাস্ আছে—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। আমরা যে নিঃশ্বাস লই তাহা এই অক্সিজেন গ্যাস্। এই গ্যাসটা মানুষের ভয়ানক দরকারী জিনিষ, শুধু নিঃশ্বাস লইতে নয়, নানা রকম বৈজ্ঞানিক ব্যবসায় হাজার হাজার মণ অক্সিজেনের দরকার। পণ্ডিতেরা আজকাল খুব সহজ ভাবে তরল বাতাস হইতে অক্সিজেন যোগাড় করিতেছেন।

আমেরিকার ডাক্তাররাও তাঁহাদের নিজেদের ব্যবসার মধ্যে ইহাকে যথাসম্ভব ঢুকাইতে ছাড়েন নাই; অনেক জায়গায় ভাল ভাল ফলও পাইয়াছেন।

আর এক রকম ব্যবহারের কথা বলিব। তরল হইতে বায়বীয় অবস্থায় বদলাইলে সব জিনিষই আয়তনে বাড়িয়া যায়। ইহা একটা খুব বড় বৈজ্ঞানিক সত্য। যে বাতাস তরল অবস্থায় ১ফুট লম্বা, ১ফুট চওড়া ও ১ফুট উচুঁ একটা পাত্র জুড়িয়া থাকে সেই বাতাসকেই যদি বায়বীয় অবস্থায় বদলান যায় তবে তাহাকে জায়গা দিতে ৭৫০ ফুট লম্বা, ৭৫০ ফুট চওড়া এবং ৭৫০ ফুট উচুঁ একটা পাত্রের দরকার হইবে। এই বিরাট আয়তনের বাতাস যদি আগেকার সেই ছোট্ট পাত্রটির মধ্যে বদ্ধ থাকে তবে তাহার গায় কি ভয়ানক চাপ পড়িবে তাহা সহজেই বুঝিতে পার। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ঐ রকম পাত্রের প্রত্যেক ১ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি চওড়া জায়গার উপর ১২৬ মণ ওজন চাপাইয়া দিলে যেমন চাপ পড়ে, সেই রকম চাপ পড়িবে। আবার যদি উহাকে তেমন ভাবে গরম করা যায়, তবে

ঐ চাপকে সহজেই ২৮০ হইতে ৮৪০ মণের সমান চাপে পরিবর্ত্তিত করা যাইবে। এই ধরণের চাপ পড়িলে কি রকম অবস্থা হয় তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি,— একবার এক সাহেব একটা লোহার নলের মধ্যে খানিকটা তরল বাতাস ভরিয়া দুইমুখ ভাল করিয়া আঁটিয়া দেন; খানিকক্ষণ পরেই সাধারণ তাপে ভিতরের বাতাস তরল হইতে বায়বীয় অবস্থায় বদ্‌লাইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দারুণ চাপে নলটিকে এমন ভাবে ফাটাইয়া দিয়া বাহির হইল যে বোমা ফাটিবার মত আওয়াজে কাণে তালা ত' লাগিলই, সঙ্গে সঙ্গে নলের ভাঙ্গা টুকরাগুলিও শত শত হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল।

এই যে দারুণ শক্তি ইহাকে বৈজ্ঞানিকেরা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। নানারকম বড় বড় এঞ্জিন চালাইবার কাজে ইহাকে লাগাইতে তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে তরল বাতাসের দারুণ শীতলতা আশে পাশের বাতাসের মধ্যে যে সব বাষ্প থাকে সব জমাইয়া বরফ করিয়া ফেলে, আর সেই সব কলকব্জার মুখে জমিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। আরও কতকগুলি ঝঞ্ঝাট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; পণ্ডিতেরা এগুলি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন।

বাতাসকে তরল অবস্থায় বেশ নিরীহ বলিয়া মনে হয় কিন্তু তেমন জিনিষের সঙ্গে মিশিলে ইহা যে কি রকম ভয়ানক কাণ্ড করিয়া বসিতে পারে সে সম্বন্ধে এবার কিছু বলিব।

আমেরিকার এক মস্ত বৈজ্ঞানিক ট্রিপলার সাহেব একবার খানিকটা তেলে ভিজান তূলাকে তরল বাতাসে চুবাইয়া লইয়া একটা ছোট দুইমুখ খোলা নলের ভিতর পূরিয়া দেন। সেই নলটিকে আবার ঠিক ঐ রকম দুইমুখ খোলা আর একটা বড় নলের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া তূলাটুকুকে জ্বালাইয়া দিতেই কামানের মত আওয়াজ করিয়া ছোট নলটি ত চুরমার হইয়া গেলই, বড় নলটিতেও একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত হইয়া গেল। সামান্য তূলার সহিত মিশিয়া তরল বাতাস কি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাইতে পারে দেখ।

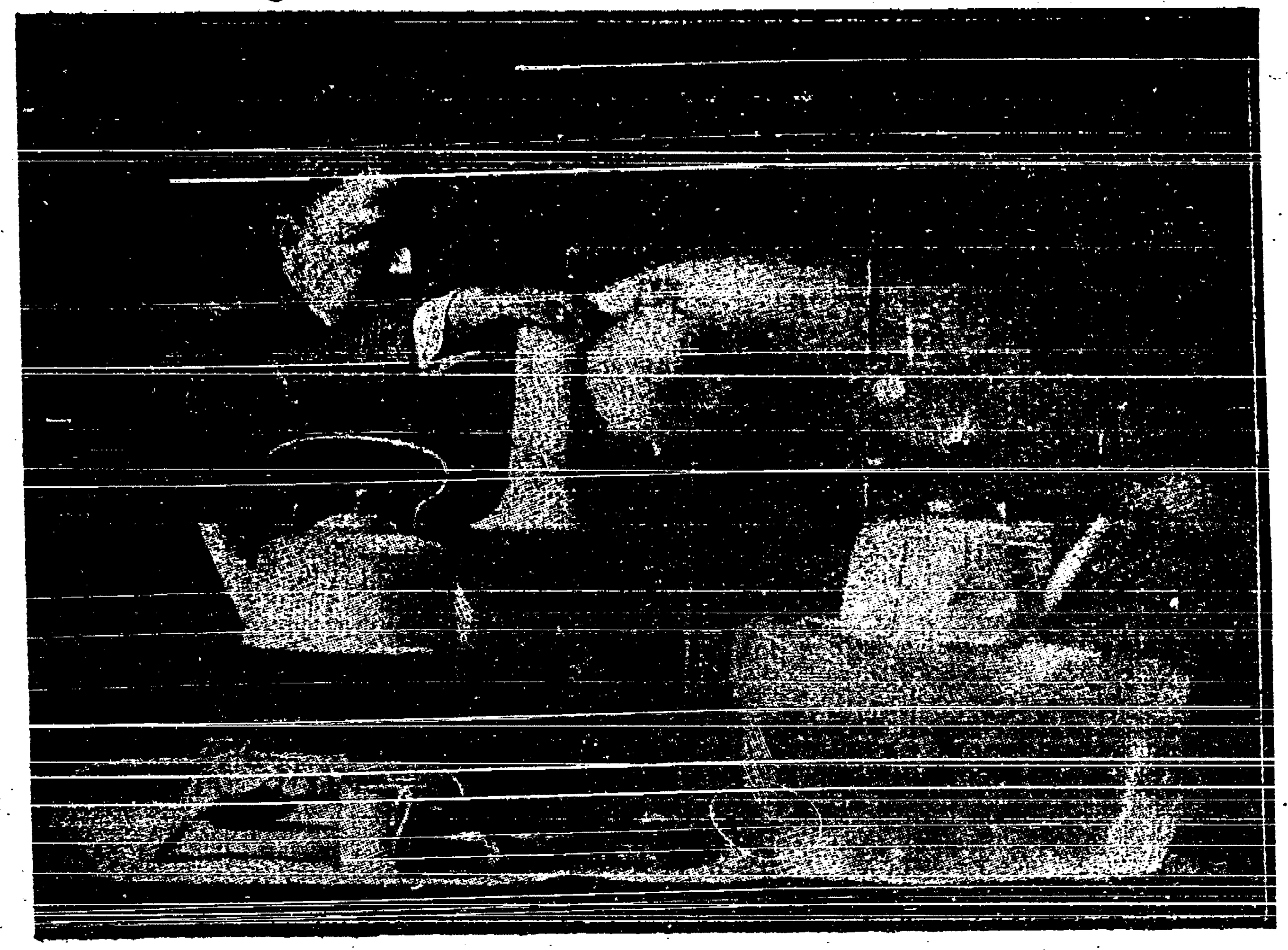

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ট্রিপলার সাহেব তরল বাতাস লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন।

এই ব্যাপারটাকেও জার্ম্মানীর পণ্ডিতেরা ছাড়িয়া দিতে চাহেন নাই। কেমন করিয়া বলিতেছি। কয়লার খনিতে কি দিয়া কয়লার পাহাড় ভাঙ্গা হয় তাহা তোমরা জান কি? ডিনামাইটের নাম তোমরা কেহ কেহ হয়ত শুনিয়া থাকিবে। ডিনামাইট বড় ভয়ানক জিনিষ, ডিনামাইটকে যদি জ্বালাইয়া দেওয়া যায় তবে উহা তুমুল শব্দে ফাটিয়া যায়, আর এমনি ভাবে ফাটে যে তাহাতে পাহাড় পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে পারে। এই ডিনামাইট দিয়াই সাধারণতঃ কয়লার পাহাড় ফাটান হয়; কিন্তু ডিনামাইট বড় বিপদের জিনিষ—একবার যদি সময় মত না ফাটিল তাহা হইলেই মুস্কিল; উহাকে সরাইতে যাওয়া আর বাঘের মুখে মাথা ঢুকাইয়া দেওয়া প্রায় একই কথা। বছর বছর এই রকম গণ্ডগোলে কয়লার খনিতে হাজার হাজার কুলী মারা যাইত।

তাই আজকাল জার্ম্মেনীর অনেক জায়গায় ডিনামাইটের বদলে তূলার সঙ্গে

কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া তরল বাতাসে ডুবাইয়া লইয়া কাজ করা হইতেছে। ইহাতেও আগুন লাগাইলে ডিনামাইটের মত ভীষণ শব্দে বড় বড় কয়লার পাহাড় উড়িয়া যাইবে। কিন্তু এখানে বিপদের ভয় অনেক কম। কোন রকমে যদি সময় মত জিনিষটা না ফাটিল তবে একটু পরেই যখন তরল বাতাসটুকু উড়িয়া যাইবে তখনই সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেল; কেননা তখন পড়িয়া থাকে শুধু তূলা আর কয়লার গুঁড়া।

তরল বাতাসের আর একটা গুণের কথা বলিব, ইহা অনেক জিনিষকে বছরের পর বছর জমাইয়া রাখিতে পারে, আবার যখন সেই জমান জিনিষ উপযুক্ত ভাবে গরম করিয়া লওয়া যায় তখন দেখা যায় উহা ঠিক আগেকার মতই আছে। ব্যাপারটা হয় অতিরিক্ত ঠাণ্ডাটার জন্য। সাইবেরিয়ার মত দারুণ ঠাণ্ডা দেশেও দেখা গিয়াছে—সেকালের বড় বড় জানোয়ার বরফের নীচে চাপা পড়িয়া শুধু জমিয়া রহিয়াছে—কিন্তু আর কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিলাতী লোকেরা সর্ব্বভুক্—কোন জিনিষই খাইতে ছাড়েনা। এই সব জানোয়ারও তাহারা খাইয়া দেখিয়াছে—কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোনও অসুখের কথা শোনা যায় নাই।

যাহা আমরা এতদিন স্বপ্ন বলিয়া জানিতাম বিজ্ঞানের হাতে পড়িয়া সেগুলি দিনের পর দিন পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে; তরল বাতাসকে লইয়া পণ্ডিতরা আরও কত রকম কাণ্ড করিতেছেন—তোমরা বড় হইয়া যদি কেহ বিজ্ঞান পড় তবে সমস্তই জানিতে পারিবে।

মণ্টুর দুর্ভোগ

(ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্-এ, ডি-এল্)

সব ছোট ছেলের মত রতন জানতো যে বড়'রা কিছু বোঝে না। আর নাই বা ভাববে কেন? বড়'রা লজেঞ্জুস্, নতুন গুড়ের টানা, টক্‌কুল, তেঁতুলের আচার প্রভৃতি কোনও জিনিষেরই রস বোঝে না, তাই ছোটরা যদি চুরি চামারী ক'রে এই সব গুলো খেতে যায় তবে কি কাণ্ডই তারা করে। তা' ছাড়া বড়'রা

দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি, মাটিকাদায় মাখামাখি কিছু করে না—কিছু বোঝে না কিনা। কেবল চুপচাপ ক'রে বসে কাজ করে, গল্প করে, না হয় পড়ে। আর সেও কি গল্প! কি পড়া! তার মধ্যে না আছে একটা রাজপুত্রের গল্প না আছে রাক্ষসের কথা!

বড়'দের অত্যাচার তবু এমনি যে ছোট'রা যে মন খুলে একটু আনন্দ ক'রবে তার পথ নেই। রতন—বড়লোকের ছেলে, সে বাড়ী থেকে বেরুলেই তার পিছু পিছু দরোয়ান ছোটে। আর সে কেবল তাকে আটকে রাখে, বলে এখানে যেও না, ওখানে যেওনা, এটা ক'রো না, ওটা ক'রো না। তাতে রতন অনেকদিন মার কাছে গিয়ে নালিশ ক'রেছে, কিন্তু মা শুধু তাকে কোলে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেয়েছেন, দ্বারোয়ানকে কিছু বলেন নি।

কাজেই রতন কি আর করে! সবার চক্ষু এড়িয়ে মাঝে মাঝে পালিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর তার খোঁজ ক'রতে বেরোয় সবাই, ধ'রেও আনে; তবু যে এক আধ ঘণ্টা সে ছুটি পায় তার বিমল আনন্দ ঠিক চুরি ক'রে খাওয়া তেঁতুলের আচারের মত।

সেদিন কিন্তু সে বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিল। ফস্ ক'রে বাড়ীর পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে বাগানের গাছের ছায়ায় ছায়ায় গিয়ে সে ক্রমে গিয়ে পড়লো অনেক দূরে—একটা খালের ধারে। তখন ভরা বর্ষা—খালটা দিয়ে স্রোত যা বইছিল ভয়ানক। সাঁ সাঁ শব্দে জল ছুটে চ'লেছে, একটা কিছু তার ভিতর পড়লেই একেবারে বাঁই ক'রে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রতনের আনন্দ দেখে কে? সে খড় কুটো কাগজ কাটি যা কুড়িয়ে পেল এনে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো সেই জলের ভিতর আর বোঁ বোঁ ক'রে সে গুলো ছুটে যেতে লাগলো। দেখে রতন হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগলো। অনেকক্ষণ এমনি আনন্দ ক'রতে ক'রতে একবার—হঠাৎ পা হ'ড়কে পড়বি তো পড় একেবারে সেই জলের ভিতর।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যে কাণ্ডকারখানা ঘটে গেল তা রতন ভাল ক'রে

টেরই পেল না। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল,—একরাশ জল খেয়ে সে দেখতে দেখতে অজ্ঞান হ'য়ে গেল। ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝবার সময় হ'ল না।

তখন সেখানে কেউ ছিল না, শুধু হাত বিশেক দূরে একটা কালো ছেলে, বছর চৌদ্দ বয়সের, ব'সে ছিপে মাছ ধরছিল।

রতনকে প'ড়তে দেখেই ছেলেটা ঝুপ ক'রে তার সামনেই সেই মার মুখো জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তার প্রাণের মায়া করলে না। এই সময়ে ঝপ্‌ঝপ্‌ ক'রে খানিকটা বৃষ্টি নামলো কিন্তু ছেলেটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। জোর টানে রতনের দেহটাকে তখনই তার হাতের গোড়ায় এনে ফেললে।

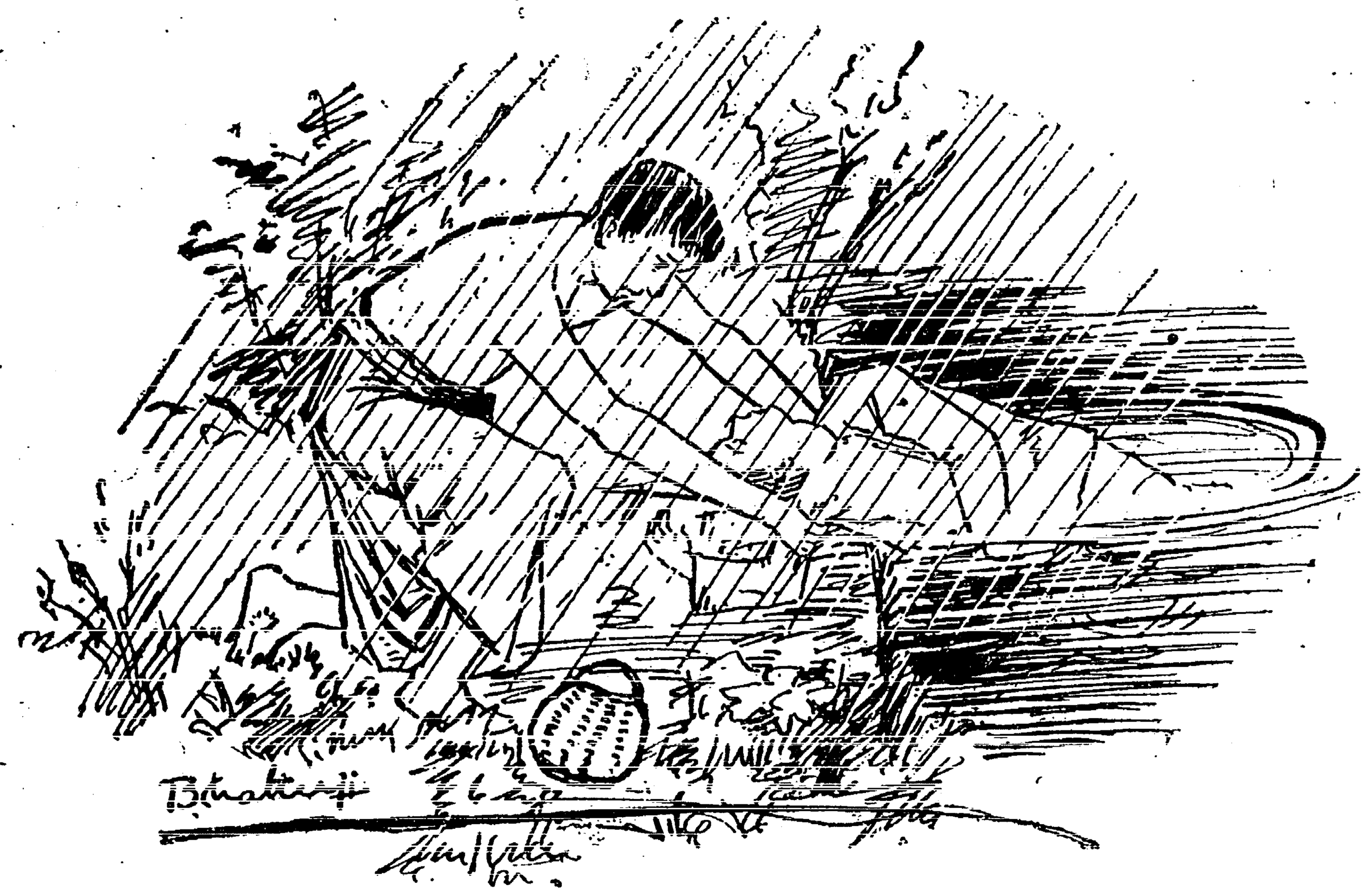

মণ্টু রতনকে জল থেকে টেনে তুলছে

ছোকরা তাকে আঁকড়ে ধ'রে অনেকক্ষণ স্রোতের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে তাকে ডাঙ্গায় তুল্‌লে।

তখন রতন অজ্ঞান। তার কাপড় চোপড় একদম ভিজে গেছে—আর কতক ছিঁড়ে গেছে।

খাড়া পাড় বেয়ে রতনকে টেনে তুলতে, সেই ঝাঁকুনিতে তার পেট থেকে অনেকটা জল বে'রিয়ে গেল, আর একটুখানি পরে সে হঠাৎ জোরে নিঃশ্বাস টেনে চোখ মেলে চাইলে।

ছেলেটি রতনের সব কাপড় চোপড় ছাড়িয়ে শুকিয়ে দিলে, ততক্ষণ তাকে প'রতে দিলে তার বাড়ী থেকে এনে একখানা ছেঁড়া কাপড়। রতনের শীত ক'রছিল, ছেলেটা বাড়ী থেকে একখানা কাঁথা এনে তার গায়ে দিলে আর কতক গুলো শুকনো পাতা জড় ক'রে একটা আগুন জ্বেলে দিলে।

রতন যে জলে পড়ে গেছে এ কথাটা যাতে তার বাড়ীতে কেউ জানতে না পারে এজন্য সে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। তাই সে সেই ময়লা কাঁথা ও ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে সেইখানেই প'ড়ে রইল তার কাপড় শুকোনো পর্য্যন্ত। ততক্ষণ ব'সে সে ছেলেটার সঙ্গে আলাপ ক'রলে।

ছেলেটির নাম মণ্টু। তার বাপ মা আছে কিন্তু তারা বড় গরীব। তাই মণ্টু স্কুলে পড়তে পায় না। সে বাড়ীতেই এর ওর কাছে চেষ্টা ক'রে এক আধটুকু পড়ে। আর কিছু সে করে না। মাঝে মাঝে খাল ধারে মাছ ধরে আর বাড়ীর কাজকর্ম্ম করে। রতন বল্লে, "বাঃ বেশ তো মজা তোমার তা হ'লে। তোমার মাষ্টার আসে না, স্কুলে যেতে হয় না—কেউ জোর ক'রে পড়তে বসায় না—খুব মজা—না?"

মণ্টু বিষণ্ণভাবে বল্লে "না ভাই, এতে কিছু মজা নেই। আমি যে পড়তে পাই নে এতে আমার যত দুঃখ এত দুঃখ কিছুতে নাই।"

রতন হেসে বল্লে "বা রে, তুমি যে ঠিক বড়দের মত—কিচ্ছু বোঝ না! আচ্ছা প'ড়তে যদি এত চাও তবে তোমার বাবাকে বল্লেই পার, তিনি স্কুলে দিতে পারেন। তাতে কতই বা খরচ—মাসে দু তিন টাকা বই তো নয়।"

ম্লান হাসি হেসে মণ্টু বল্লে "দু তিন টাকা কি কম হ'ল? কোথায় পাব দু তিন টাকা ভাই?" তার চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠলো।

রতনের বড় দুঃখ হ'ল। সে বল্লে, আমি দেব ভাই তোমায় তিন টাকা মাসে।"

বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে মণ্টু বল্লে, "না ভাই, সে আমি নেব না।"

"কেন ? আমার তো অনেক টাকা আছে, চাইলেই আমি পাই। আমি দেব, তুমি নেবে না কেন ?"

"সে অনেক কথা ভাই, শুনে কাজ নেই।"

কাপড় চোপড় শুকোলে রতন তাই প'রে চলে গেল। যাবার আগে ব'লে গেল কাল আবার মণ্টুর সঙ্গে দেখা ক'রবে।

রতন ভেবেছিল মণ্টুর কথা মাকে বলবে, তা হ'লে মা তাকে ডেকে এনে খুব পুরস্কার দেবেন। যেন তার মনের কথা আঁচ ক'রেই মণ্টু বল্লে, "দেখ ভাই, আজকের কথা কাউকে ব'লো না যেন। তুমি জলে পড়ে গিয়েছিলে শুনলে তোমার বাবা মা বড় রাগ করবেন, আর হয়তো তোমাকে বেরুতে দেবেন না। তা ছাড়া আমাকে বকবেন।"

এর পর রতন প্রায়ই পালিয়ে ছুটে আসতো মণ্টুর কাছে। দু একদিন তার বাড়ীতেও যেতো, কিন্তু মণ্টু তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইতো না বড়। সে যে কত গরীব সেটা রতন জানতে পারে এটা তার ইচ্ছে ছিল না।

কিন্তু রতন জেনে ফেল্লে সব। মণ্টুর বাবার অবস্থা আগে বেশ ভাল ছিল, কিন্তু মদ খেয়ে খেয়ে তিনি এখন এমনি বিপন্ন হ'য়ে পড়েছেন। মণ্টুর মা কোনও মতে কষ্টে স্বষ্টে সংসার চালায়।

মণ্টু স্কুলে ভাল ছেলে ছিল, কিন্তু পয়সার অভাবে তার স্কুল ছাড়তে হ'ল। তখন তার মা অনেক কান্নাকাটি করলেন। শেষে নিজে আধপেটা খেয়ে ছেলেকে স্কুলে পড়াবার জন্য কিছু পয়সা বাঁচালেন। পাঁচটা টাকা হাতে হ'তেই তিনি মণ্টুকে খাইয়ে দাইয়ে স্কুলে পাঠাবার জোগাড় করলেন। এমন সময় মণ্টুর বাবা এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "স্কুলে পাঠাচ্ছ ছেলে বড়, টাকা পাবে কোথা ?"

মণ্টু আহ্লাদ ক'রে তার হাতের টাকা দেখিয়ে বল্লে "এই যে টাকা বাবা !"

অমনি টাকা কটা ছোঁ" মেরে নিয়ে তার বাবা চল্লো মদের দোকানে। আর তার মা ব'সে কাঁদতে লাগলো।

মণ্টুকে একজন ভদ্রলোক বড্ড ভালবাসতেন, তিনি তাকে একদিন একটা

টাকা দিয়েছিলেন। মণ্টু এনে মার কাছে দিয়েছিল। মার টাকাটা নিতে বড় লজ্জা হল, তাঁর কান্না পেল, তবু টাকাটা তুলে রাখলেন। তার বাবা কেমন ক'রে খবরটা পেয়ে এসে সেই টাকা চাইলেন। মা দিলেন না। তাতে তাঁকে এমন মারতে লাগলেন যে মণ্টু ছুটে গিয়ে টাকাটা এনে দিল। সেই থেকে মণ্টু কারো কাছ থেকে কোনও টাকা পয়সা নেয় না।

এ সব খবর রতন পেতো অন্য লোকের কাছে। যতই সে শুনতো ততই তার প্রাণটা মণ্টুর জন্য কেঁদে উঠতো। কিন্তু মণ্টু যখন এসব কথা কিছু বলে না, তখন তার কাছে এ সম্বন্ধে কথা কইতে রতনের লজ্জা বোধ হ'ত। আর সে টাকা পয়সা যখন নেবে না তখন কি ক'রে যে তার কিছু করা যায় রতন ভেবে পেতো না।

সে যা পারতো করতো। সে বইটই অনেক এনে দিত, মণ্টু তা পেয়ে খুব আহ্লাদ করতো। তা ছাড়া প্রায়ই পকেটে ক'রে খাবার জিনিষ কিছু এনে তাকে দিত। তা ছাড়া পেন্‌সিল, কলম, কাগজ রবার কত কি এনে সে মণ্টুদের বাড়ীতে ফেলে রেখে যেতো।

রতন এমন পালিয়ে প্রায় যায়। তাই সে যখন মণ্টুর কাছে যেতো তখন কেউ জানতে পারতো না। ফিরে এলে সে খুব বকুনি খেতো, তা' সে গ্রাহ্য ক'রত না। তার ভারি ইচ্ছা হ'ত একদিন মার কাছে মণ্টুর কথাটা বলে। কিন্তু মা কি বলবেন না বুঝতে পেরে সে কিছু বলে নি। বড়'রা প্রায়ই কিছু বোঝে না। তাদের সব ভাল মন্দ'র বিচার ভারী অদ্ভুত। বিশেষ, রতনকে মা অনেকদিন ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইতে বারণ করেছিলেন, ওতে নাকি বড় খারাপ হয়। তাই সে দশ পাঁচ ভেবে মাকে কিছু বলে নি।

শীতের সময় একদিন রতন এসে দেখলে মণ্টু তার ধুতির আঁচলখানা গায় জড়িয়ে শীতে কাঁপছে। ভয়ানক শীত তখন। রতনের বড় দুঃখ হ'ল। সে তার নতুন শালখানা দিয়ে মণ্টুকে জড়িয়ে ধ'রলে। তরপর দুজনে অনেকক্ষণ

এমনি ব'সে থেকে গল্পসল্প ক'রলে। রতনদের বাড়ীতে সেদিন অনেক পিঠে হ'য়েছিল। রতন পকেট থেকে সব পিঠে বের ক'রে মণ্টুকে খাওয়ালে। ফিরবার সময় রতন শালখানা মণ্টুর গায় রেখেই দে ছুট।

মণ্টু তাকে ধ'রে বল্লে "এই শাল নিয়ে যাও।"

রতন বল্লে "না মণ্টু দা' ওখানা তোমার জন্যই আমি কিনেছি, ওখানা তোমার।"

"না না, সে হবে না বলছি। তোমার মা বাবাকে লুকিয়ে তুমি আমায় শাল দিলে আমি নেবো কেন ?"

রতন বল্লে, "মাকে বলেছি, মাই তোমাকে দিতে ব'লেছেন।" ব'লেই রতন মণ্টুর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল।

রতন মিথ্যা বলেছিল—সে মাকে বলে নি। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। গায়ের কাপড় সে এমন কত হারিয়েছে, তার জন্য কেউ কোনও দিন কিছু বলে নি তাকে।

সেদিন কিন্তু তার নতুন শালখানা হারাণ নিয়ে বাড়ীতে অনেক কথা হ'য়ে গেল।

পরের দিন রতন আর মণ্টু দুজনে খালের ধারে একটা ঝোপের আড়ালে ব'সে গলা ধরাধরি ক'রে গল্প করছিল, আর মণ্টু রতনের দেওয়া একটা আপেল কামড়ে খাচ্ছিল—এমন সময় ভয়ানক কাণ্ড হ'য়ে গেল।

সেদিন রতন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার পরই তার মাষ্টার বিনোদ বাবু এসে তার বাবাকে বল্লেন,—"দেখুন, রতনের উপর একটু নজর রাখবেন, ও বড় খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছে। কাল সকালে ওকে দেখলাম হরেন মাতালের ছেলেটার সঙ্গে গলাগলি হ'য়ে বেড়াচ্ছে। সে ছেলেটা বয়াটে,লেখাপড়া করে না, খালি হৈ হৈ ক'রে বেড়ায়। তার সঙ্গে রতনকে মিশতে দেবেন না।"

রতনের বাবা ক্ষেপে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে রতনের খোঁজ করলেন—দেখা গেল রতন বাড়ী নেই। চারিদিকে অমনি লোক ছুটলো।

দ্বারোয়ান মহাবীর সিং এসে আবিস্কার ক'রে ফেল্লে বাবু বসে মণ্টুর সঙ্গে গলাগলি হয়ে গল্প করছে।

সে অমনি মণ্টুর কান ধ'রে তাকে টেনে তুল্লে আর দুই ধাক্কা মেরে তাকে দূরে ফেলে দিলে। মণ্টু চোখের জল মুছতে মুছতে চ'লে গেল।

দ্বারোয়ান মণ্টুর কান ধ'রে তাকে টেনে তুলছে

রতন ভয়ানক রেগে মহাবীর সিংকে গালাগালি দিলে, তাকে মারলে, কিন্তু মহাবীর সিং হাসতে হাসতে তাকে তোল্লা ক'রে বাড়ী নিয়ে গেল।

বাড়ীতে বাবা তাকে খুব খানিকটা বকলেন। রাগে ফুলতে ফুলতে কাঁদতে কাঁদতে সে চললো মায়ের কাছে।

দ্বারোয়ানের নামে অনেকদিন অনেক নালিশ করেছে রতন—কোনও ফল হয়নি। তার কথা কেউ গ্রাহ্য করে না। বড়'রা তো কখনও ছোটদের কথা বোঝে না। তবু সে আজ স্থির করলো মাকে ব'লে মহাবীর সিংকে শাস্তি দেওয়াবে তবে ছাড়বে।

মা প্রথমে রতনকে মিষ্টি কথা ব'লে আদর ক'রে ভোলাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রতন ছিটকে তফাতে গিয়ে বল্লে, "ওসব কিছু আমি

শুনবো না, মহাবীর সিংকে যদি জবাব না দেও তবে আমি আর এ বাড়ীর ভাত খাব না।"

"কেন? কি করেছে সে? একটা বদ্ ছোকরা তোমাকে বইয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছে তার কাণ ম'লে দিয়েছে। বেশ ক'রেছে।"

"বদ্ ছোকরা! বটে! সেই বদ্ ছোকরা সে দিন না থাকলে তোমার এই ছেলেটিকে দেখতে হ'ত না। সে না বাঁচালে ছ মাস আগে আমি পেট ফুলে মরে' থাক্‌তাম।"

"ষাট, ষাট, ও কথা বলতে নেই। কেন, সে কি করেছিল?"

তখন রতন সেদিন মণ্টু নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মৃত্যুমুখ থেকে তাকে কেমন ক'রে বাঁচিয়েছিল তা বিস্তার ক'রে বল্লে। শুনে মা শিউরে উঠে তাকে বুকে টেনে নিয়ে চুমো খেলেন।

"তা তুই এতদিন এ কথা বলিস নি কেন?"

"সে বারণ ক'রেছিল তাই।"

তারপর রতন মণ্টুর চরিত্র, তার পরিবারের অবস্থা, তার দুঃখ কষ্ট, মহানুভবতা প্রভৃতির বিষয় যা জানতো তা ব'লে গেল। শুনে তার মার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো।

মা শেষে বল্লেন, "আহা, বাছার তো বড় কষ্ট! এতদিন তুই যদি বল্‌তিস্ তবে আমি তার সব দুঃখ দূর করে দিতাম।" "সে যে ব'লতে বারণ করেছিল। তা ছাড়া সে তো টাকা পয়সা নেয় না।" শেষে মা বল্লেন, তুই আজ বিকেলে মহাবীরের সঙ্গে গিয়ে তাকে আমার কাছে ডেকে আনিস্।"

"না, আমি মহাবীরের সঙ্গে কিছুতে যাব না, ওকে জবাব দিতে হ'বে।"

"আচ্ছা না হয় ভুবনের সঙ্গে যাস, আমি ব'লে দেবো' খন।"

রতন তখন খুসী হয়ে খাওয়া দাওয়া করলে, আর তারপর ছুটে গেল ভুবনকে ডাকুতে বাইরে।

বাইরে গিয়ে সে যা দেখলে তাতে তার চক্ষু স্থির হ'য়ে গেল।

রতনকে কতকটা বকুনি দিয়ে তার বাবার রাগ পড়ে নি। তিনি তখনই মহাবীরকে আবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মণ্টুকে ধ'রে আনতে। মহাবীর গিয়ে তাকে বাজার থেকে ধ'রে আন্‌লে। তখন তার গায় রতনের দেওয়া শালখানা ছিল। শালখানা মহাবীর তার গা থেকে ছিনিয়ে নিলে আর মণ্টুকে ধ'রে হিড় হিড় ক'রে নিয়ে এলো কর্ত্তার কাছে।

একে তো ছেলেকে নষ্ট করবার অপরাধ, তার উপর তার শাল চুরী! রতনের বাবা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে মণ্টুকে যা নয় তাই বলে গাল দিতে লাগলেন আর মহাবীরকে হুকুম দিলেন তাকে ধ'রে জুতো পেটা ক'র্‌তে।

এই ব্যাপারের কতকটা দেখেই রতন ছুটে বাড়ীর ভেতর মার কাছে কেঁদে পড়লো আর তাঁকে টেনে বাইরে নিয়ে এলো।

মহাবীর তখন মণ্টুকে কাণ ধ'রে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। রতনের মা তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তার মাথার উপর চুমো খেলেন। মহাবীর সরে' দাঁড়াল।

রতনের বাবা কাণ্ড দেখে অবাক্।

মা তখন তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বল্লেন, আর রতনকে কিছু না জিজ্ঞেস ক'রে মণ্টুকে এমনি শাস্তি দেবার জন্য রতনের বাবাকে একটু বক্‌লেন।

রতনের মা তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরছেন।

তারপর রতনের মা মণ্টুকে বুকের কাছে ধ'রে উপরে নিয়ে গেলেন।

মণ্টু ভয়ানক কাঁদছিল। দেখে রতনের মার চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়তে লাগলো। তিনি অনেক আদর ক'রে মণ্টুকে শান্ত করলেন। রতনের বাবাও এসে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

মণ্টুকে তাঁরা ধরলেন এই বাড়ীতে থেকে রতনের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করতে। মণ্টু বল্লে তার মার তাহ'লে কষ্ট আরও বেশী হবে—সে তা পারবে না। কাজেই সে ফিরে গেল।

কিন্তু রতনের বাবা তাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। তার বাড়ীতে রোজ সিধে যেতে লাগলো; তাদের সেবার জন্য কাপড় চোপড় গেল।

এই সব দেখে শুনে মণ্টুর বাবারও মতি গতি ফিরে গেল। তিনিও মদ ছেড়ে আবার কাজ কর্ম্ম আরম্ভ ক'রলেন।

সংস্কারক

(শ্রীরসোদর শর্ম্মা)

ছুঁচোমুখো বেচুরাম মুখে তার মাখানো
চিমনীর কালী সদা, হাসি নাই কখনো।
খাওয়া নাই, নাওয়া নাই বসে বসে দিন রাত
ঠ্যাং তুলি শূন্যে, গোণে শুধু কড়িকাঠ।
গাল ভরা কড়া দাড়ী ছাইয়াছে উকুনে,
মাকরের জাল বোনা নাসিকার দু'কোণে;
দিনে দিনে খোঁচা গোঁফ পড়িতেছে ঝুলিয়া
হুঁশ নাই, দেখে নাক' তবু মুখ তুলিয়া।

সবে বলে, "বেচুরাম আহা আহা করকি ?
'শরীরমাদ্যম্'—তার চেয়ে বড় কি ?

ভেবে ভেবে মগজে লাগে যদি ঠাণ্ডা
ঘিলু যাবে পচে যে, কোথা রবে প্রাণটা ?
তার চেয়ে মাথা খাও, মাখ দেখি তালুতে
বেশ করে চটকে কাঁচকলা আলুতে;

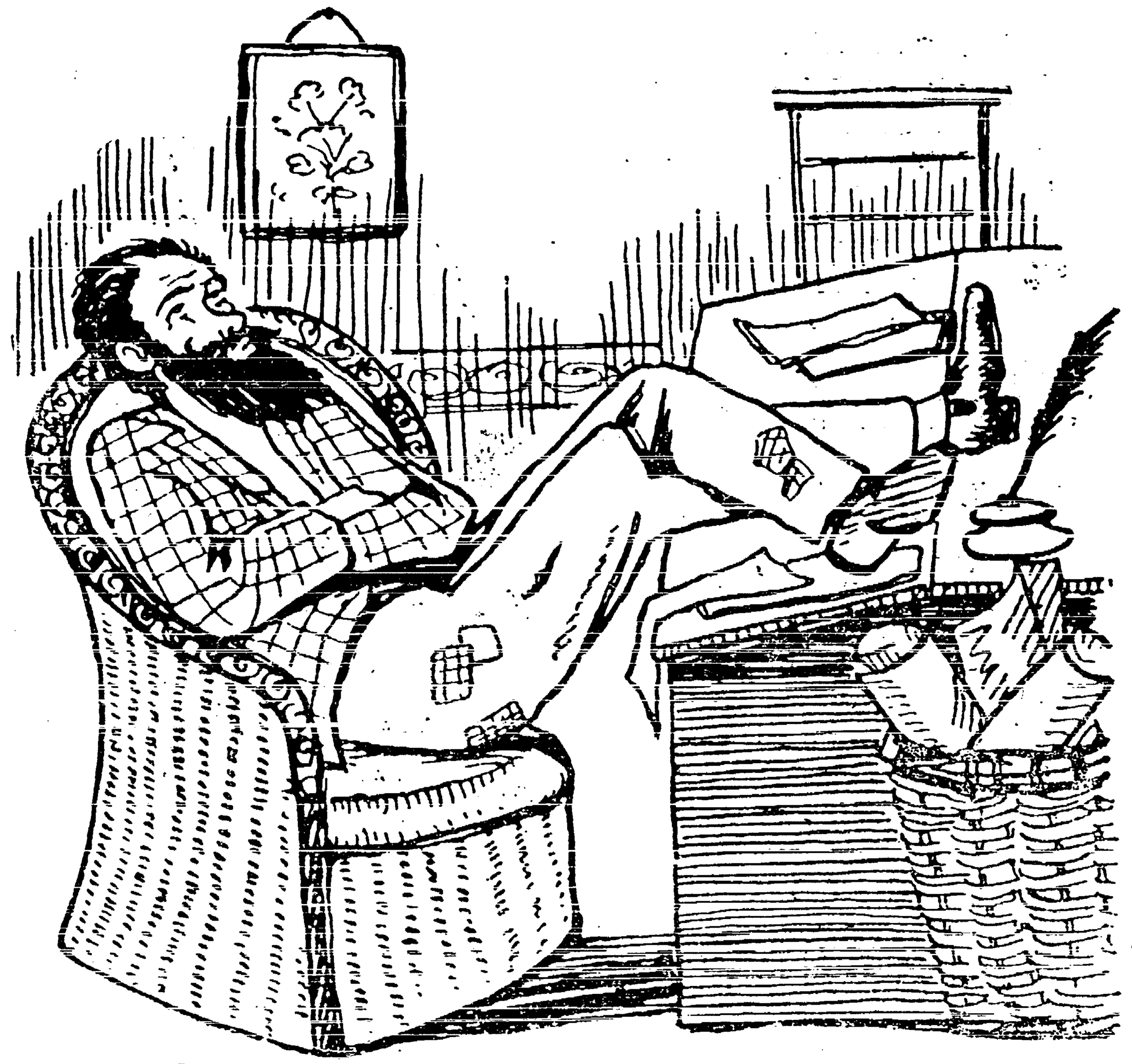

ঠ্যাং তুলি শূন্যে, গোণে শুধু কড়িকাঠ

ঘিলু হ'য়ে যাবে সাফ্, মনে দাগ রবে না,
ফুর্ত্তিসে গাবে গান, সারে গামা—তবে না ?
শুনে বেচু রেগে যায়, "কেন কর পাঁঠামি ?
বোঝ না ত' কিচ্ছুই, জান শুধু জ্যাঠামি।
ছারেখারে গেল সব, অপচয় সারাদিন
তবু সব দেয় ঘুম নাকে ঢেলে কেরোসিন।

দেখ গিয়া একবার বিলাতে কি জাপানে
কি রকম কড়াকড়ি, জানিয়াছি গোপনে।
ফেলে নাক কুটাগাছা সব রাখে কুড়িয়ে
নৈলে যে কোতোয়াল মাথা দেবে গুঁড়িয়ে।

ছেঁড়া চটী, ভাঙ্গা কাচ আর যত পচামাল
জড় করে বেশ ক'রে মিশাইয়া দেয় জ্বাল ;
একসাথে মামলেট্ টয়লেট্ হয় হে,
হাসি নয়, ঠাট্টা না, ঝুটাবাৎ নয় এ।

আমাদেরি দেশ শুধু পিছে পড়ে রবে কি ?
বেচুরাম থাকতে, লোকে তবে কবে কি ?
কয়লার দাম রোজ উঠিতেছে উর্দ্ধে
দুইদিনে শর্ম্মা, পারে তারে রুখ্‌তে।
তোমাদের মত যত দেখিতেছি পষ্ট
গোবরেতে ভরা মাথা শুধু হয় নষ্ট ;
কোন মতে বার করে' শুখাইলে তাহারে
এতবড় প্রবলেম্ মিটে যায় আহা রে !

জামা নাই, ছেলে বুড়ো কাঁপে শীতে খালি গায় ;
বাবুদের দুবেলাই ফেলা চাই দাড়ী হায় !
শোন যদি মোর কথা, রাখ দাড়ী ভরমাস
দেখে নিয়ো কম্বল কত দেই ফরমাস।

ছোট ছেলে কাঁদলে, জান শুধু চটিতে
কেন বাপু, জলটুকু ধরগে না ঘটিতে।
ফুটাইলে পাবে নুন খেয়ে লোকে বাঁচবে।
তাতো নয়, রেগে খালি ঘরময় নাচবে।

গ্রীষ্মের খর রোদে গায় যদি ঝরে ঘাম
ফেল'না তা হবে রং, চড়া ক'রে দিয়ো দাম।
আর যদি করা যায় এ্যাসিডের কারবার
তার সাথে পিঁপড়ের কত হবে দরকার।"

সবে বলে "বেচুরাম, ভাবিস্‌নে মাথা খাস্,
আমাদেরি ভেবে ভেবে তুই যদি মারা যাস্,
তোর শোকে আমরা যে কেঁদে হব সারারে
আইডিয়া এত তোর মাঠে যাবে মারারে।"
শুনে বেচু ক্ষেপে খুন ভেংচিয়ে তেড়ে যায় ;
বেনো বনে মুক্তা ! কে জানিত হায় হায় !
যত সব জানোয়ার, নিজেরা ত ভাবে না
সে ক্ষমতা আছে যার, তারে ও তা দেবেনা।
বলে "যদি ভাল চাস্ ঘর থেকে নামরে
ফের মুখ খুলেছ কি, নেবো নাক কামড়ে।"

মাসের নাম

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

প্রায় সকল দেশের মানুষেই প্রচীনকালে চাঁদ দেখিয়া দিনের, মাসের ও বছরের হিসাব করিত ; কোন জাতির লোকেরা পূর্ণিমার দিন মাসের শেষ ধরিত আবার কোন জাতির লোকেরা বা অমাবস্যার দিন মাসের শেষ ধরিত। ভারতের উত্তর ভাগে চলিত ছিল পূর্ণিমান্ত মাস অর্থাৎ পূর্ণিমায় মাসের শেষ হইত আর দক্ষিণ ভাগে চলিত ছিল অমান্ত মাস অর্থাৎ অমাবস্যায় মাস শেষ হইত। এখনও সে গণনায় মাস ধরা চলিত আছে। হিন্দুদের মধ্যে পূর্ণিমান্ত মাস ধরিয়া

পৈতা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি হয়। পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি ধরিয়া এদেশে প্রাচীনকালে দিনের গণনা হইত,—রবি, সোম, মঙ্গল; প্রভৃতি নাম ধরিয়া হইত না। রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত বারের নাম গণনা করা কবে এদেশে সুরু হইল, সেকথা পরে এক সময়ে বলিব।

নাতিনাতিনী লইয়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

এদেশে কেমন করিয়া চাঁদ দেখিয়া গোড়ায় বছর গণনা ও মাস গণনা হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। প্রথমে যে সময়ে এই গণনা হইয়াছিল তখন চাঁদের নাম ছিল সোম; এই সোমের পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় মাসের পরিমাণ হইত বলিয়া সোমের নাম হইয়াছিল 'মাস'। যাহা দিয়া মাপ করা যায় এই অর্থে মা ধাতু ধরিয়া "মাস" কথার সৃষ্টি হইয়াছিল। চাঁদের অর্থাৎ সোমের নাম হইয়াছিল মাস, আবার এক পূর্ণিমার পরদিন হইতে আর এক পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত সময়ের নামও হইয়াছিল মাস। সে যুগে "চন্দ্র" শব্দ ছিল না, কিন্তু "শ্চন্দ্র" শব্দ ছিল, আর শ্চন্দ্র অর্থে ছিল তাহাই যাহা ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল। এই অর্থ ধরিয়া তখন মাসের শুক্লপক্ষের নাম ছিল শ্চন্দ্র মাস। শ্চন্দ্র কথা ভাঙ্গিয়া পরে হইল চন্দ্র আর ঐ শব্দটা মাস শব্দের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিয়া কেমন করিয়া পরে "চন্দ্রমস্" নামে নূতন শব্দ হইল ও চন্দ্রমা ও চাঁদ কথা হইল, সে খট্‌খটে কথা এখন বলিবার প্রয়োজন নাই।

এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় গণনা করিতে গেলে কোন গোল নাই বটে কিন্তু আলাদা আলাদা করিয়া মাস ধরিয়া ঠিক করিয়া রাখা শক্ত; কারণ, কোন্ মাসের চাঁদ কি ভাবে ঠিক চিনিয়া রাখিয়া অন্য মাসের চাঁদ হইতে তাহাকে আলাদা করিয়া চেনা যায়, তাহাই হইল কথা। দীর্ঘ রাস্তা চলিবার সময়, কত পথ চলা গেল তাহা ঠিক রাখিবার জন্য কাঠ বা পাথর পুঁতিয়া তাহাদের গায়ে এক, দুই প্রভৃতি দাগিয়া দিলে যেমন এক মাইল, দুই মাইল প্রভৃতি ধরা যায়, সেই রকম একটা কৌশল করিয়া এক মাসের চাঁদ হইতে অন্য মাসের চাঁদ আলাদা করা হইয়াছিল। সে কৌশলটা এই! ধর, এক মাসের পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় চাঁদ যেখানে ছিল সেখানে চাঁদের কাছাকাছি একজোড়া নক্ষত্র দেখা গেল; সেই নক্ষত্র হইল যেন আকাশে খোঁটা পোতা। এই একজোড়া নক্ষত্রের নাম দেওয়া গেল অশ্বিনী আর সেই নামের হিসাবে মাসের নাম দেওয়া গেল আশ্বিন। তাহার পরের মাসের পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় চাঁদের কাছাকাছি দেখা গেল অনেকগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র; সেই নক্ষত্রপুঞ্জের নাম দেওয়া গেল কৃত্তিকা আর সেই নামের দরুণ মাসের নাম হইল কার্ত্তিক। এই রকম পূর্ণিমার দিনে চাঁদের কাছাকাছি নক্ষত্রের নামে মাস দিতে দিতে দেখা দেল যে বারটা মাস পূর্ণ হইলেই ঠিক আবার গোড়াকার অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ পাওয়া যায়। তাহা হইলে ঠিক বার মাসে এক বৎসর পাওয়া গেল, আর নক্ষত্র দিয়া সকল মাসের নাম পাওয়া গেল। কোন্ নক্ষত্রটির নামে কি মাস তাহা বলিতেছি।

অশ্বিনীর নামে আশ্বিন, কৃত্তিকার নামে কার্ত্তিক, মৃগশিরার নামে মার্গশির; এখন মার্গশিরের নাম বাঙ্গলা দেশে অগ্রাণ বা অগ্রহায়ণ হইল কেন, তাহা পরে এক সময়ে বলিব। তাহার পর পূষা নক্ষত্রের নামে পৌষ, মঘার নামে মাঘ, ফল্গুনীর নামে ফাল্গুন, চিত্রার নামে চৈত্র, বিশাখার নামে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠার নামে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ার নামে আষাঢ়, শ্রবণার নামে শ্রাবণ, আর ভদ্রা বা ভাদ্রপদের নামে ভাদ্র। যদি তোমাদের একজন শিক্ষক সাত-আট মাস ধরিয়া সন্ধ্যার সময়ে তোমাদিগকে চাঁদের পথের তারাগুলিকে চিনাইয়া দেন, তবে তোমরা কোন বই না

পড়িয়াই সাতাশটি নক্ষত্র চিনিতে পারিবে আর তাহা ছাড়া নিজে নিজে অনেক বিদ্যালাভ করিবার কৌশল ধরিতে পারিবে।

যে যুগে এদেশে বেদরচনা হইয়াছিল, সত্য সত্যই সে যুগে আশ্বিন মাস হইতে বছর গণনা প্রচলিত ছিল। তোমরা জান যে শ্রাবণমাস ও ভাদ্রমাস খুব বর্ষার সময় ; এই বর্ষার শেষে অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শেষে বছর খতম্ হইত বলিয়া "বর্ষা"র নামেই বর্ষ বা বৎসর এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস ধরিয়া শরৎকালের গণনা ছিল ও ঋতুর হিসাবে শরতের প্রথম মাস বা আশ্বিন মাসের নাম ছিল ঈশ ও কার্ত্তিক মাসে অনেক শস্য হইত বলিয়া কার্ত্তিকের নাম ছিল উর্জ্জ। ঈশ—অর্থ হইল, যে প্রথম চালায়, অর্থাৎ যে চালক আর উর্জ্জ মানে হইল—যে বল দেয় বা বলে পুষ্ট। খুব সম্ভব, এই রকম ঋতু ধরিয়া অন্য মাস গুলিরও যোড়ায় যোড়ায় নাম ছিল। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি নাম ত ছিলই, তাহা ছাড়া এগুলি ছিল ঋতুর হিসাবে। নামের মানে দিতে গেলে প্রবন্ধটা খটমট হইতে পারে ও পড়িতে ভাল না লাগিতে পারে ; সেই জন্য ঋতুর হিসাবে মাসের নামগুলি কেবল লিখিয়া দিলাম।

হেমন্ত ঋতুর দুই মাসের নাম হইয়াছিল সহ ও সহস্য,—শীত ঋতুর দুই মাসের নাম তপঃ ও তপস্য, বসন্ত ঋতুর অর্থাৎ মধু ঋতুর দুইমাসের নাম—মধু (চৈত্র) ও মাধব (বৈশাখ), গ্রীষ্ম ঋতুর দুইমাসের নাম শুক্র (জ্যৈষ্ঠ) ও শুচি (আষাঢ়), বর্ষার দুইমাসের নাম নভঃ ও নভস্য।

শনিবারের বারবেলা

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্-এ)

গণ্‌শা বেচারীকে বড় বেশী দোষ দেওয়া যায় না। তাহার চেহারাটা না হয় একটু মোটাই, কিন্তু তাই বলিয়া ক্লাশের বোর্ডের উপর অমন করিয়া তাহার চেহারাটা আঁকিয়া দেওয়া কি উচিত হইয়াছে ? সে না হয় সেই দিনই স্কুলে ভর্ত্তি

হইয়াছে, কিন্তু এমন তো নয় যে তাহাকে কেউ চেনে না ! অনেকেই তো তাহার পাড়ারই ছেলে ! তবে তাহাকে লইয়া এরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ কেন রে বাপু ! সারা টিফিনের সময়টা ধরিয়া সে যেন সমস্ত স্কুলটা নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। "আচ্ছা, দাঁড়াও না, পরশু দিন সকালেই মামা আস্‌ছেন, তখন সব্বাইকে দেখে নেব !" গৌরগোপাল ছেলেটা নিতান্তই ভালমানুষ, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে তোর মামা এলে কি হবে ?"

"কেন, তিনি গুণে বলে দেবেন কে ঐ ছবি এঁকেছে ! তারপর দেখা যাবে হেড্ মাষ্টারের বেতই শক্ত না তোদের পিঠই শক্ত !"

"ওঃ তোর মামা বুঝি জ্যোতিষী !"

গণ্‌শা যে এবার খুব আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বেশ বুঝিলাম। বলিল—"মামার নাম জানিস্ নে, রামগতি জ্যোতিষার্ণবের নাম জানিস্ নে ! এঃ, তুই দেখছি একেবারেই জংলী ! সেবার যে জাপানে অত বড় ভূমিকম্পটা হয়ে গেল, সে তো মামা আগেই টের পেয়েছিলেন ! টোকিয়োতে তাঁর বন্ধু পোকামারুকে টেলিগ্রামও করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কি জানিস্, সেদিন যে মঘা নক্ষত্র, সেটা মামার খেয়ালেই আসে নি। কাজেই ফল হোলো না। পোকামারু টোকিয়ো ছেড়ে সেদিন গিয়েছিল য়োকোহামায় তার চীনে বন্ধু ফ্যাচাং ব্যাঙের বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্নে ! ফিরে যখন এলো, তখন গোটা সহরটা ধ্বসে' পড়ে গেছে ! কত দুঃখু করে মামাকে চিঠি লিখলে ! গত বছরও ঠিক এম্নি ব্যাপার ! কাবেরীতে বন্যা হবে জেনে মামা ভেঙ্কট বেকুবংকে চিঠি লিখে দিলেন। এবার মঘা নয়, অশ্লেষা ; ডাকঘরের গোলমালে চিঠি গিয়ে পৌঁছুতে পারলো না ! বেকুবং কত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আন্‌লো,—ইংল্যাণ্ড্ থেকে ফক্স্ এল, আয়ার্ল্যাণ্ড্ থেকে বুল্ এল, স্কটল্যাণ্ড্ থেকে পিগ্ এলো, এমন কি জার্ম্মাণী আর রাশিয়া থেকে প্‌স্‌টেসস্‌ম্যান্ন্ আর ফস্কি নস্কি পর্য্যন্ত এসে জুটল। কিন্তু কিচ্ছুই করতে পারল না !"

আমরা দম্ বন্ধ করিয়া গণ্‌শার সমস্ত কথাগুলি যেন গিলিতে লাগিলাম

তাই তো, এ মামা আসিলে তো দেখিতেছি আর রক্ষা নাই; ঠিক গুণিয়া বলিয়া দিবে বোর্ডে কে ছবি আঁকিয়াছে! আমাদের মনের ভাবটা গণ্শা বোধ হয় বুঝিতে পারিল, চারিদিকে তাকাইয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "খু—বভয় পেয়েছিস্ বুঝি! আচ্ছা যা, যা, এবারকার মত মাপ করলাম, আ—র যেন এমন না হয়।" আমরা যেন বাঁচিয়া গেলাম, মনে মনে বলিলাম, আবার যাইব ছবি আঁকিতে, যে বাঁচাটা বাঁচিয়া গিয়াছি! ওঃ!

এতক্ষণ দেখি নাই যে একপাশে বসিয়া রামপদ ও গোপাল খুব হাসিতেছে। বড় রাগ হইল, তাই একজন গিয়া বলিলাম "বড় যে দাঁত বের ক'রে হাসছিস্, যদি গণ্শা দেখতে পেত?

রামপদ বলিল "ঠিক বলেছিস্, গণ্শা যে সে লোক নয়, অত বড় মামার ভাগ্নে! ওর বন্ধুরাও নিশ্চয়ই কাবেরী নদীর কাছাকাছি কোন জায়গায় থাকে—এই ধর্ যেমন কিষ্কিন্ধ্যা!

ক্রমে কিন্তু গোপালদের দলের সঙ্গেও গণ্শার বনিবনা হইয়া আসিতে লাগিল। কেবল একবার সেই হাঁচির ব্যাপারটা লইয়াই যা একটু সামান্য গোলমাল হইয়াছিল। অঙ্কের পরীক্ষার দিন, গণ্শা যেই অঙ্ক কষিতে যাইবে, অমনি গোপাল বিষম জোরে হাঁচিয়া ফেলিল। তা, ইহাতে কিন্তু গোপালকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সে কি জানে যে গণ্শা ঠিক ঐ সময়েই আঁক্ কষিতে আরম্ভ করিবে? কিন্তু থার্ড্ মাষ্টার যে দিন একটা মস্ত শূন্য দিয়া গণ্শার খাতা খানা ফিরাইয়া দিলেন সেদিন গণ্শার রাগ দেখে কে? বাড়ী যাইবার সময়, সারাটা পথ ধরিয়া সে গোপালকে এমনি ধমকাইল যে বেচারা আর কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিল না। দেখ দেখি কাণ্ডখানা! তাহার পাওয়ার কথা ৯৯, না হয় সামান্য কিছু কাটিয়া কুটিয়া ৯০ই হইত, কিন্তু শূন্য হয় কি বলিয়া? নিশ্চয় এ গোপালের সেই হাঁচির ফল!

কিন্তু সব চেয়ে বেশী নাকাল করিল গণ্শা আমাদিগকে সেবার স্পোর্ট্‌সের দিনে। থার্ড্ ক্লাশের সাথে আমাদের টাগ্-অব্-ওয়ার হওয়ার কথা; গণ্শাও

দড়ি টানিবে ঠিক ছিল, কিন্তু বিষ্যুৎবারের বার বেলা বলিয়া ছোকড়া আর আসিয়া পৌঁছিলনা। কাজেই গণ্শার জায়গায় একজন রোগামত ছেলে লইয়াই আমরা গিয়া দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু দাঁড়াইতে আর হইল না; থার্ড ক্লাশের ছেলেরা আমাদিগকে একেবারে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। রাগে, দুঃখে ও অপমানে আমাদের চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল, ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া গণ্শাকে দুইহাতে চড়াইয়া আসি। অবনী তো এক রকম কাঁদিয়াই ফেলিল, বার বার বলিতে লাগিল "আস্তো কুষ্মাণ্ডটা, এ্যাক্কেকালে চাল্‌কোমড়।"

এই ঘটনার দিন দুই পরে, একদিন বিকালবেলা গণ্শাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছি, এমন সময় দেখি কিনা গণ্শার পড়ার ঘরে, রামপদ, গোপাল, যতীন, গণ্শা—সকলে মিলিয়া বেদম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। প্রথমটা ভাবিলাম, নিশ্চয়, সেদিনকার সেই টাগ্-অব্-ওয়ারের ব্যাপার নিয়া সকলে গণ্শাকে ধম্‌কাইতেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, নাঃ, সে সব ব্যাপার চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে, এখন হইতেছে বড় বড় পালোয়ানদের কথা—গোবর ও গামায় কুস্তি হইলে কে জিতিবে, রামমূর্ত্তির গায়ে বেশী জোর না রাজেন গুহঠাকুরতার গায়ে বেশী জোর,—এই সব কথা। হঠাৎ রামপদ বলিয়া উঠিল "তোরা যাই বলিস, গণ্শা বড় হ'লে গোবর টোবরের চাইতে ও বড় পালোয়ান হবে; দেখেছিস্ একবার ওর বুকের ছাতিখানা!"

গোপাল বলিল, "আরে তাইতো, দাঁড়া, ওর গায়ের মাপটা নিয়ে রাখি, বড় বড় পালোয়ানদের মাপের সাথে মিলিয়ে দেখা যাবে।" কথাটা বলিয়াই গোপাল তাহার ট্যাঁক্ হইতে একটা ছোট্ট মাপের ফিতা বাহির করিয়া গণ্শার সমস্ত শরীরটার মাপ লইতে আরম্ভ করিল। মাপের ফল দেখিয়া গণ্শা তো ভারী খুসী! তাড়াতাড়ি একখানা কাগজে মাপটা টুকিয়া লইল—বুক—৩৫ ইঞ্চি, পেট—৩৬ ইঞ্চি গলা—১৩ ইঞ্চি ইত্যাদি। লেখা শেষ করিয়া অমনি কাগজখানা ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিল। কাচারীর মাঠে খেলা দেখিতে যাইব কিনা, তাই আমরাও উঠিয়া পড়িলাম।

পরের দিন ছিল রবিবার। রামপদ ও যতীন আসিবে বলিয়াছিল, কাজেই খাওয়া দাওয়ার পর আমিও গিয়া গণ্শাদের বাড়ীতেই জুটিলাম। 'যোগতত্ত্ব

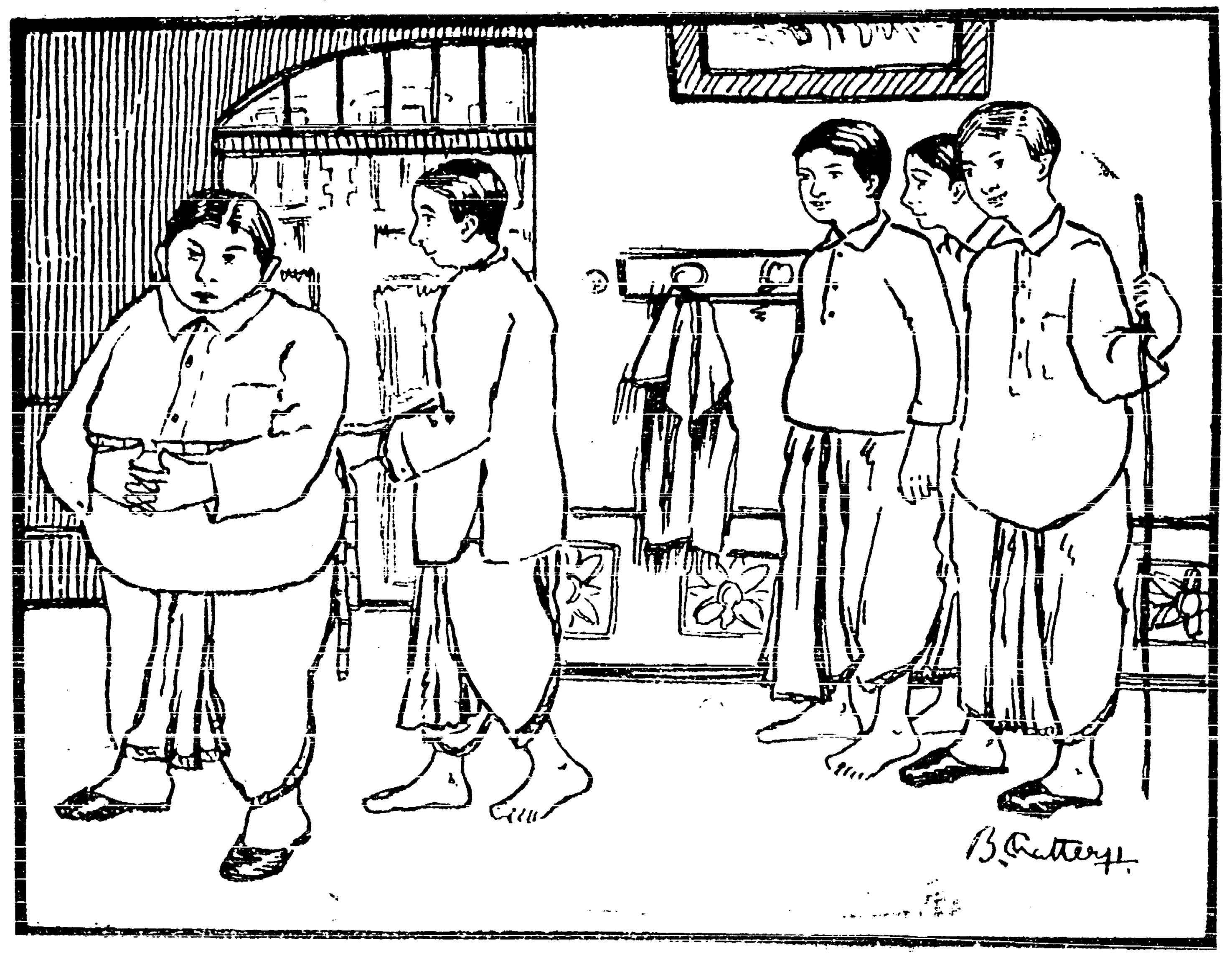

গণ্শার সমস্ত শরীরটার মাপ লইতে আরম্ভ করিল।

বারিধি' না কি একখানা জান বই খুলিয়া গণ্শা তখন ভারী মনোযোগের সহিত তাহার বাংলা মানে গুলি পড়িতেছিল। একটু পরেই রামপদ আর যতীন আসিয়া জুটিল। রামপদ গণ্শার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল "হ্যাঁরে গণ্শা, তোকে এমন রোগা রোগা ঠেক্‌ছে কেন রে? অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?"

গণ্শা বলিল—"কেনরে অসুখ করবে কেন, বেশ তো আছি!

"উঁহু, কেমন যেন রোগা রোগা ঠেক্‌ছে,—ও কিরে যতীন, তুই আবার মুখটাকে অমন প্যাঁচার মত করছিস্ কেন?"

"মস্ত ভুল হ'য়ে গেছেরে! কাল শনিবারের বারবেলায় গোপালকে গণ্শার গা'টা মাপ্‌তে দেওয়া ভাল হয়নি—ও আবার সেই শ্মশানখোলার সন্ন্যাসীটার কাছে যেতে সুরু করেছে কি না" সন্ন্যাসীদের জানিস্‌তো, যদি একবার ভাবে যে কারুর অনিষ্ট করবে, তাহ'লে আর রক্ষে নেই। ওদের শিষ্যকে কি কখনো, শনি-মঙ্গল বারে গা মাপতে দিতে আছে?

"বলিস্ কিরে" বলিয়া রামপদ যেন একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিল। গণ্শার দিকে তাকাইয়া দেখি তাহার মুখখানা একেবারে কাগজের মত শাদা হইয়া গিয়াছে, পাদুইটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। কোন মতে বাড়ীর ভিতর হইতে সে একটা মাপের ফিতা লইয়া আসিল। ড্রয়ারটা খুলিয়া আগেকার দিনের সেই মাপের কাগজটা বাহির করিয়া বলিল "রামপদ মাপটা একবার মিলিয়ে দেখ না, ঠিক আছে কি না।"

রামপদ মাপ নিতে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে আমাদের তো চক্ষুস্থির! পেট এক ইঞ্চি কমিয়া গিয়াছে, গলা, বুক, সমস্ত মাপই কম কম, এমন কি হাতের কব্জীটা পর্য্যন্ত।

"সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!" বলিয়া রামপদ একেবারে বসিয়া পড়িল। গণ্শার দিকে তাকাইয়া দেখি বেচারা বুঝি আর নাই, এইবারই বুঝি বা কাঁদিয়া ফেলে।

যতীন বলিয়া যাইতে লাগিল 'গোপ্‌লা কি সোজা ছেলে! কতরকম যোগযাগ তুক্‌তাক্ ও যে জানে তার আর ঠিকানাই নেই। তোর মনে আছে রামপদ, সেই যে সেবার ও বেলে হাঁসের রোষ্ট খাবার নেমতন্ন করলো, সে তো এম্‌নি করেই হাঁসটাকে মার্‌লে। হাঁসটা ছিল বাছের সেখের, তাকে চুপি চুপি বলতেই সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁস দিয়ে গেল!

গণ্শা চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। রামপদ বলিল "কিন্তু, গোপ্‌লা এত লোক থাক্‌তে গণ্শার সাথে লাগতে গেল কেন?"

"আচ্ছা বোকা তো তুই, এটাও বুঝতে পাচ্ছিস্ নে। অঙ্কের মেডেলটার

লোভে রে। দেখলি না সেবার হেঁচে ফেলে এমনি সব ভেস্তে দিল যে গণ্‌শার যেখানে পাওয়ার কথা নিরেনব্বুই, সেখানে পেলে গোল্লা ; এবারও তো পরীক্ষা আসছে কি না, সেটা তো এক রকম করে বন্ধ করা চাই ! এটা ও বেশ জানে যে গণ্‌শা থাক্‌তে আর ওর কপালে ফাষ্ট হওয়া নেই ! লক্ষ্মীছাড়া হিংসুটে কোথাকার !

গণ্‌শা এইবার তাহার ডান হাত দিয়া, বাঁ হাতের কব্জীটা মাপিয়া বলিল "কই, রিষ্ট্‌ তো কমেনি, বরাবর এমনি করে হাতের মাপে যতটা হোতো, ঠিক তাইতো আছে !

উত্তর দিল যতীন, বলিল "তাইতো রে রামপদ, গণ্‌শার গায়ের মাপ কমার সাথে সাথে, বুদ্ধিও কম্‌তে সুরু করলো দেখছি। হাঁরে, তুই এই সামান্য কথাটা বুঝতে পাচ্ছিস্‌ না যে তোর হাতের আঙ্গুলগুলোও যে ছোট হ'য়ে গেছে ?

এইবার গণ্‌শা একেবারে ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভারী মায়া হইল। অনেক কষ্টে বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া সকলে গণ্‌শাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পরদিন গণ্‌শার সহিত আমার আর দেখা হইল না, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যাহা শোনা গেল তাহাতেই বেশ বুঝিয়া লইলাম যে বেচারার কষ্ট যতদূর হইবার তাহা হইতেছে। সারারাত্রি সে নাকি ঘুমায় নাই, কেবল শোবার ঘরময় পাইচারি করিয়াই রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়াছে। পরদিন ভোরবেলায় চা খাওয়ার সময় হাত কাঁপিয়া গরম চা'ভরা কাপটা পড়িয়া যাওয়ায় হাঁটুতে মস্ত ফোস্কা পড়িয়াছে। নার্ভাস্‌ উইক্‌নেস্‌ (স্নায়বিক দুর্ব্বলতা) মনে করিয়া বাড়ীর লোকে তাহার চা খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অথচ আমরা জানি, একদিন চা না খাইলে গণ্‌শা মাথার যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে। দুধ জিনিষটা গণ্‌শা দু'চক্ষে দেখিতে পারে না। নার্ভাস্‌ উইক্‌নেস্‌ মনে করিয়া বাড়ীর লোকেরা তাহাকে সেই বিশ্রী জিনিষটা দুইবারের জায়গায় রোজ চারবার

করিয়া খাওয়াইতেছে। হায় রে বেচারা গণ্‌শা, কেন তুই শনিবারের বারবেলায় গা মাপাইতে গেলি ?

দিন দুই পরের ঘটনা। যতীনদের বাড়ীতে আমরা বসিয়া—খুব গল্প চলিতেছে, ঠিক এমনি সময়ে গণ্‌শা একেবারে ঝড়ের মত আমাদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখি সে গণ্‌শা বলিয়া চেনার আর উপায়ই নাই। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—চোখ বসিয়া গিয়াছে—এ যেন আর এক গণ্‌শা ! গণ্‌শা ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁরে যতীন তুই দৈববাণী মানিস্‌ ?"

"আল্‌বৎ মানি। কেনরে কোন দৈববাণী হয়েছে নাকি ?

"হ্যাঁ হয়েছেই তো এ দুদিন স্কুল ছুটী হলেই আমি খানিকক্ষণ গিয়ে টিফিনের ঘরটায় বসে থাকি, তাতো তোরা দেখেছিস্‌ই। আজ গিয়ে দেখি, কে এক ছোক্‌ড়া চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বেদম নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। কোন দিন ছোঁড়াকে দেখিনি। কি করি, আর তো চেয়ার নাই, কাঠের একটা বাক্স ছিল, সেটাকেই টেনে দরজার কাছে এনে ছোকড়ার দিকে পেছন ফিরে বস্‌লাম। ভগবান্‌কে ডাক্‌ছি, ঠিক এম্‌নি সময় দৈববাণী হল **"ভক্ত পরাণ !"**

যতীন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "ঠিক কথা ?"

গণ্‌শা বলিল "একেবারে ঠিক ! আমি ফিরে দেখি সেই ছেলেটা ঠিক তেমনি নাক ডাকাচ্ছে। কাজেই সে কোন কথা বল্‌তেই পারে না। আর তা ছাড়া সেই বা আমার মনের ভাব জানবে কি করে ? তাকে কখনো আমি চোখে পর্য্যন্ত দেখিনি !

"যাঃ, আর তোর কোন ভয় নেই। দৈববাণীর মানে হচ্ছে—ভক্ত, পরাণ ঠাকুরের কাছে যাও। মালোপাড়ার পরাণ ঠাকুরই এ সবের শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে কিনা ! আচ্ছা তুই যা, রামপদ গিয়ে তোকে রাত্রে শান্তিজল দিয়ে আসবে, তুই সেটা খেয়ে ফেলিস্‌। কালই আবার তোর শরীর যেমনটী ছিল, ঠিক তেমনটিই হবে।"

পরদিন আমরা গণ্‌শাদের বাড়ী গিয়া দেখি সে মনের আহ্লাদে একেবারে

গান জুড়িয়া দিয়াছে। যতীন বলিল "এই যে শরীর তোফা সেরে গেছে দেখছি ! এদিকে আয়, মেপে দেখাচ্ছি।" যতীন তাহার সেই ছোট ফিতাটা দিয়া গণ্‌শার মাপ লইল। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, ফল দাঁড়াইয়াছে পেট—৩৬ ইঞ্চি বুক—৩৫ ইঞ্চি, গলা—১৩ ইঞ্চি ইত্যাদি ! ওঃ শান্তিজলের কি অদ্ভুত গুণ !!!

কিন্তু চাহিয়া দেখি গণ্‌শা একদৃষ্টে ফিতাটার মাথার দিকে তাকাইয়া আছে। মুহূর্ত্তমধ্যে ফিতাটা সে যতীনের হাত হইতে কাড়িয়া লইল ; দেখিল ফিতার মাথায় ১ ইঞ্চি কাটা, ২ ইঞ্চি হইতে লেখা আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা তখন জলের মত সোজা হইয়া গেল। ফিতার মাপ যে ঠিক মাপ হইতে এক ইঞ্চি করিয়া কেন বেশী হইয়াছে তাহা এইবার বুঝিলাম। ইহাও বুঝিলাম যে গণ্‌শার বাড়াবাড়ির জন্য যতীন, রামপদ, গোপাল প্রভৃতি মিলিয়া তাহাকে এই শিক্ষাটা দিল। দৈববাণী প্রভৃতি ওদেরই চক্রান্তের ফল। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কেন রে বাপু ! বেচারাকে তিন দিন ধরিয়া কি দুর্ভোগটাই না ভুগিতে হইল !

গণ্‌শা ঠিক করিয়াছিল যতীন, রামপদ ও গোপালের সহিত সে আর এ জীবনে কথাই বলিবে না। শেষে আমরাই বহু কষ্টে মধ্যস্থ হইয়া গোলমালটা মিটাইয়া দিই।

বর্ম্মার কথা

(অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

বর্ম্মাকে ইংরাজীতে প্যাগোডার দেশ বলা হয়। রেঙ্গুনে জাহাজ ভিড়িবার আগেই দেখা যায় প্যাগোডার 'আগুনের শিখার মত' চূড়াগুলি। আর সহরে, গ্রামে যেখানেই যাওয়া যায় "ফয়া"র কপিলাবস্তুর ত্যাগীরাজপুত্রটীর প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি ও ফুল, ধূপ ও মোমবাতি লইয়া পূজারত বর্ম্মান নরনারীর সাক্ষাৎ মিলিবেই। আমাদের হিন্দুমন্দিরে দক্ষিণা, পাণ্ডা ও নিয়মের বেড়াজাল ভক্তিকে সঙ্কুচিত

করে, কিন্তু বর্ম্মায় ফয়াগুলিতে ভক্তি ও সাধ্যমত ফুল-প্রদীপের অর্ঘ্য ছাড়া কেহ কিছু জানে না। বর্ম্মার সাধারণ লোকের কাছে বুদ্ধ 'ভগবান্‌,' করুণার মূর্ত্তি,

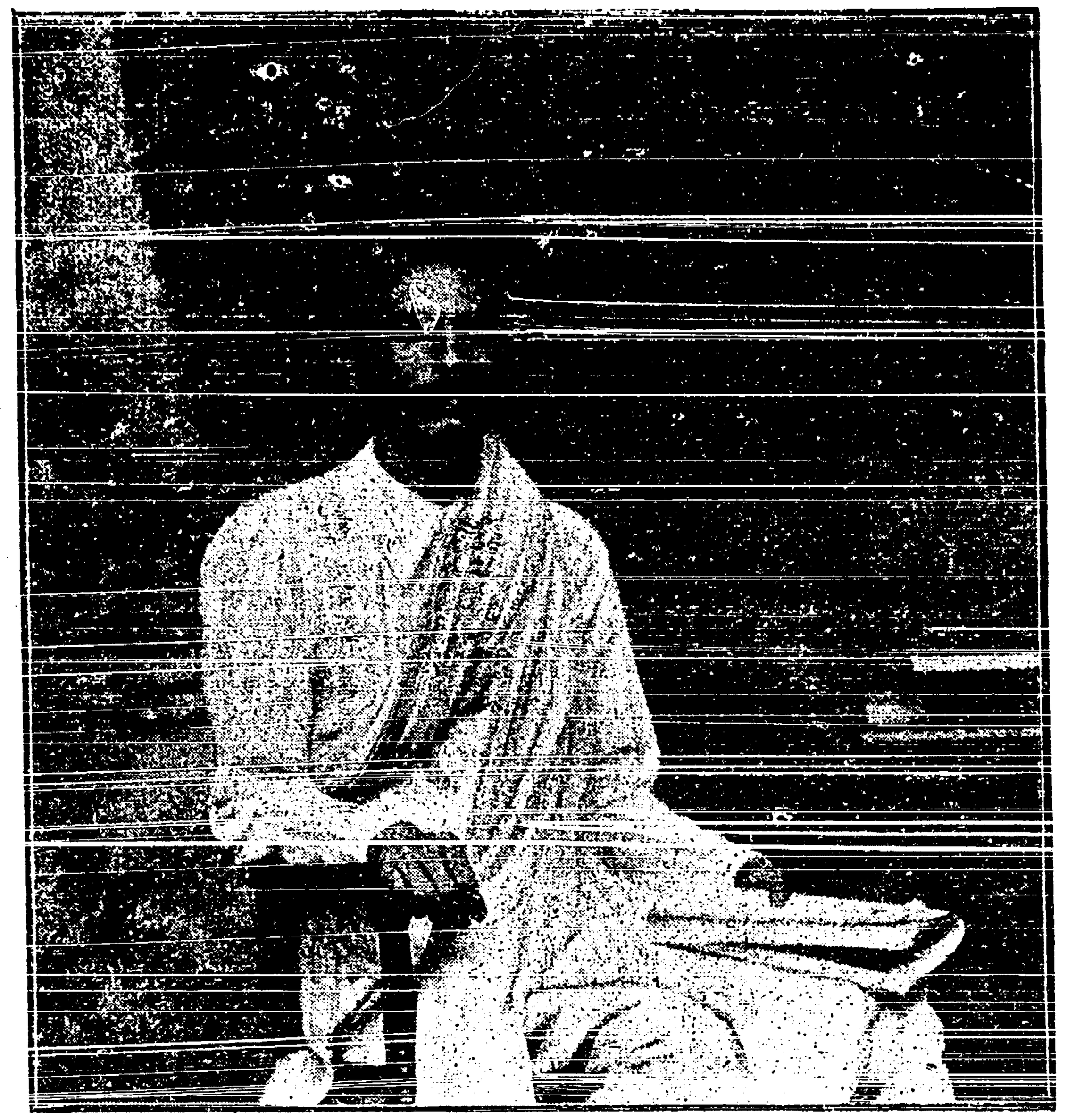

অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন কোন উপকথায় বুদ্ধকে বর্ম্মার ছেলে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে এককালে বুদ্ধের সকল চিহ্ন ও লেখা তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের বাহিরে সেই ধর্ম্ম ভারতের আদর্শ লইয়াই নূতন আকাশের তলে নূতন বেশে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাই 'আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে তার'—

শুধু কি ধর্ম্ম ? কত জিনিষ যে বর্ম্মানরা আমাদের এই ভারত হইতে লইয়াছিল তাহা শুনিলে তোমরা নিশ্চয় আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। বর্ম্মানরা চেহারায় চীনা জাপানীর সামিল কিন্তু ধাতে তাহারা পুরাদস্তুর ভারতীয়। তাহাদের গল্প উপকথা, আইন কানুন এমন কি লেখার ধরণটী পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে লওয়া। এমন যে বর্ম্মার প্যাগোডা তাহারও মূলে আছে ভারতীয় শিল্পীরই কলাকুশলতা। আনন্দ প্যাগোডার যে ছবি দেখিতেছ তা উত্তর বর্ম্মার প্যাগান সহরে অবস্থিত। এককালে প্যাগান ছিল রাজধানী, আজ তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ

দাঁড়াইয়া আছে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া জাতীয় শিল্পীর হাতের গড়া বা অনুপ্রেরণার সৃষ্টি শত শত আকাশ ছোঁয়া প্যাগোডার ধ্বংসাবশেষ। রেঙ্গুণের সোয়ে ডাগন প্যাগোডার চেহারা কিন্তু অন্যরকমের, ভারতীয় মন্দিরের ধরণের নয়। সোয়ে ডাগন ও ঐ ধরণের অন্যান্য প্যাগোডাগুলি তৈয়ার হইয়াছে সিংহলের প্যাগোডার অনুকরণে। অবশ্য সিংহলের প্যাগোডাও কিছু সে দেশের নিজের

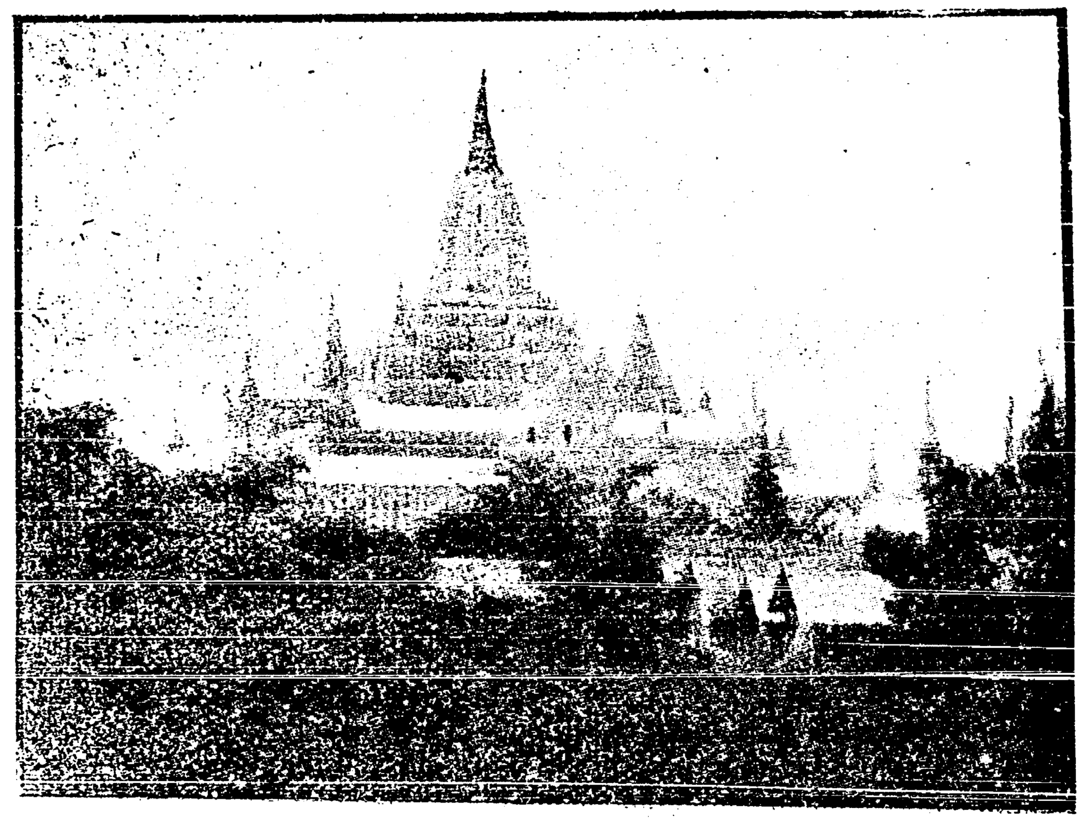

আনন্দ প্যাগোডা

সম্পত্তি নয়—তাহাও এদেশ হইতেই লওয়া। অশোকের ছেলে মহেন্দ্র প্রথমে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই ধর্ম্মের আলোই শেষে গিয়া বর্ম্মায় ছড়াইয়া পড়ে। শোনা যায় রেঙ্গুণের জগদ্বিখ্যাত এই সোয়ে ডাগন প্যাগোডাটীর নীচে বুদ্ধদেবের আটটী চুল, সোণা, রূপা, প্রবাল প্রভৃতি রক্ষিত আছে। সব প্যাগোডারই নীচে নাকি এরূপ কিছু না কিছু বুদ্ধদেবের চিহ্ন আছে।

বর্ম্মার কাঠের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুলি প্যাগোডা-গায়ে। বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলিকে কাঠের উপর খোদাই করিয়া যে সুন্দর রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য লেখায় বলা যায় না। সোয়ে ডাগনের তোরণ দ্বারের ছবিতে প্যাগোডার সুন্দর গঠনসজ্জার পরিচয় পাইবে। তোরণদ্বারে যে দুইটি বিরাট জীব বসিয়া আছে, তাহারা দ্বারপাল,—প্রতি প্যাগোডার সঙ্গে একটি পুকুর

থাকে সেখানে অহিংসা ধর্ম্মানুসারে মাছ, কাছিম প্রভৃতি পালিত হয়, বলা বাহুল্য উহাদের কেহ খাইতে পারে না।

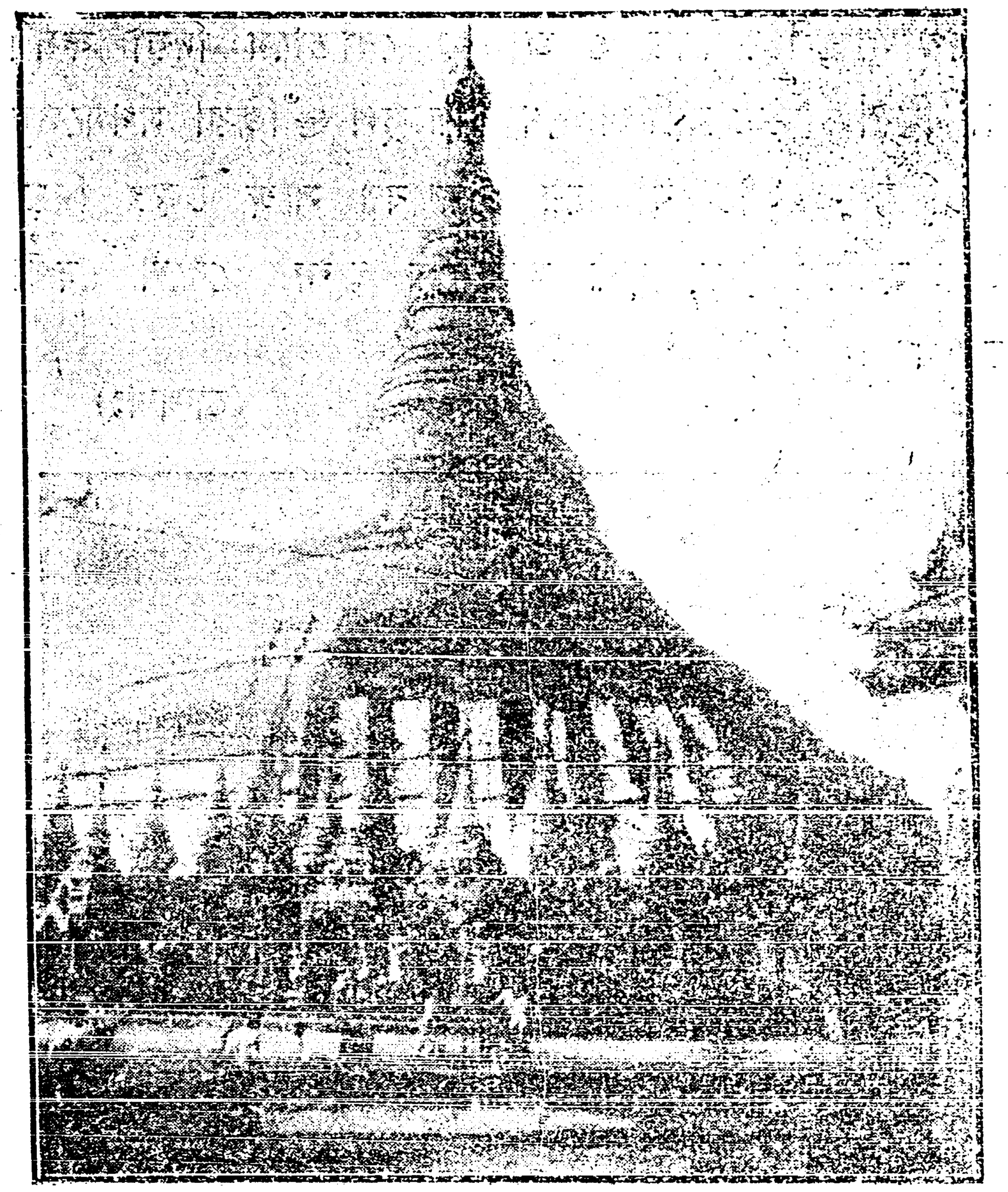

সোয়েডাগন প্যাগোডা

কিন্তু প্যাগোডা গুলি শুধু ধর্ম্ম মন্দির নয়, আমাদের দেশে যেমন পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী, টোল আর পাঠশালা ছিল বর্ম্মার প্রতি প্যাগোডার সঙ্গে এখন ও শিশুদের বিদ্যালয় আছে। বর্ম্মা-ভাষা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সামান্য কিছু ছেলেমেয়ে সকলকেই শিখিতে হয়, তাই বর্ম্মার লোকেরা ভারতবর্ষে শতকরা সব-চেয়ে বেশী লিখিতে পড়িতে পারে। প্রতি বর্ম্মান মেয়ে ও পুরুষকে কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্যের জীবন যাপন করিতে হয়, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের ভিতর যেমন উপনয়ন সংস্কার হয় ইহা সেই ধরণের রীতি; কাজেই ভিক্ষাপাত্র হাতে, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী—নানা বয়সের—সর্ব্বদাই ব্রহ্মদেশে দেখা যায়, সে বড় নয়ন জুড়ান দৃশ্য!

বর্ম্মানরা খুব অতিথি-পরায়ণ। 'দিন আনি দিন খাই,' কাজে গল্পে-হাসিতে দিন কাটে, মাথায় গঙবঙ, পরণে লুঙ্গি, গায়ে এঙ্গি, পায়ে কানা, মুখে চুরুট দিয়া

আত্মীয় বন্ধু-মহলে টহল দিতে পারি আর ফয়ার বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করিয়া পাপমুক্ত থাকিতে পারি—এর চেয়ে বেশী বর্ম্মান পুরুষরা চায় না। সোণার মল পায়ে, মণি ও পাথরের গহনা খোপায়, চিরুণীতে ও জামার বোতামে দিয়া ফর্সা মুখকে চন্দন গুঁড়া বা 'তানাখা' দিয়া চর্চ্চিত করিয়া, খোপায় ফুল গুঁজিয়া মখমলের ফানা টানিতে টানিতে পথ চলিতে, হাট বাজারে পুরুষের সঙ্গে টক্কর দিয়া তাহাদের উপর টেক্কা দিতে এবং হাসি ঠাট্টায়, বুদ্ধ অর্চ্চনায় সুন্দর বেশে দেখা দিবার ইচ্ছা সকল বর্ম্মা মেয়ের।

(ক্রমশঃ)

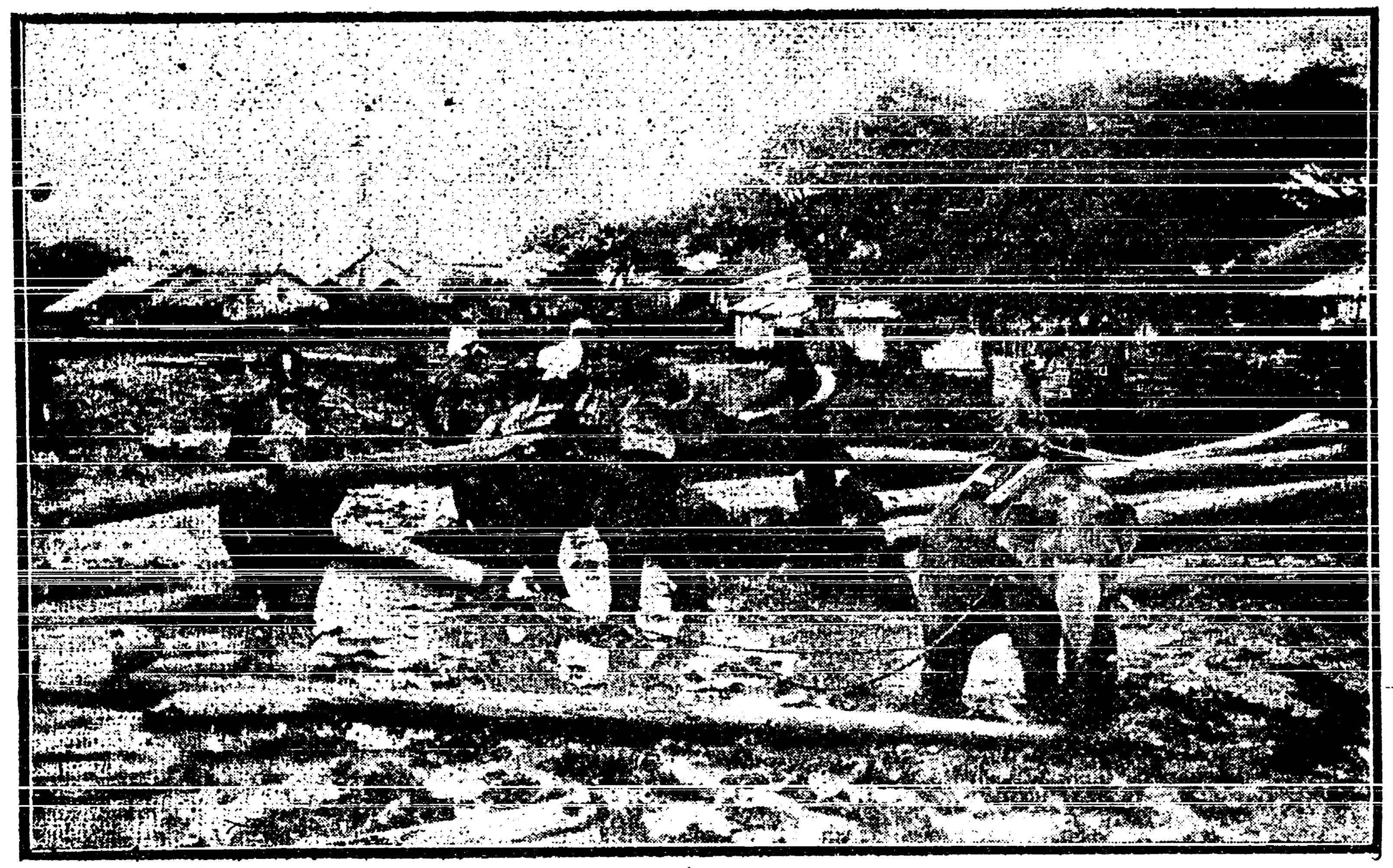

বর্ম্মায় হাতীকে কাঠ টানিবার কাজে লাগান হইয়াছে

ফাগুন দিনে

(শ্রীগোপিকা কান্ত দে,বি-এ)

হিমভরা দিনগুলি আর নাহি রে,
এলরে ফাগুন আজি আয় বাহিরে;

কাননে তরুর গায় লেগেছে মলয় বায়
হাসিছে প্রভাত-রবি দেখ্ চাহিরে
আয় তোরা আয় বাহিয়ে।
কনক-চাঁপার দলে কত না হাসি!
ভ্রমর বিলায় কত চুমার রাশি,
গুন্ গুন্ রবে তা'রা পুলকেতে মাতোয়ারা;
ফাগুন আবার এলো ভয় নাহি রে,
আয় সবে আয় বাহিরে।
আমের মুকুল ফুটি' কানন ভরা
বিলায় সুবাস-মধু পাগল করা,
অশোক পালশ কত ফুলভারে অবনত,
প্রকৃতির মুখভরা দেখ্ হাসিরে
ঘর ছাড়ি' আয় বাহিরে।
অসীমের কোলে ওই পিক্ পাপিয়া,
আকাশ-আগুন গানে যায় ভাসিয়া;
আজি এ ধরার মাঝে সকলি নবীন সাজে,
সবাই উঠিল জাগি' ঘুম ত্যাগি'রে
আয় ছুটে আয় বাহিরে।

—*—

অরুণ আলো

(ছোটদের বড় গল্প,—পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(শ্রীপ্রবোধ রঞ্জন সেন এম্-এ,)

তাই নাকি? তাই ত! ছি, ছি,—লজ্জার কথা, লজ্জার কথা! কিন্তু এমন হল কেন? খুবই ঘুম পেয়েছিল কিনা, তাই মামা ভাগীতে মিলে এই ভুলটা ক'রে ফেললে। আলো এবার হেসে কুটি কুটি,—সে হুড়মুড় ক'রে অরুণের

গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, আর হাস্‌তে লাগ্‌ল। তখনও আলোর চোখে কান্নার জল,—তবুও সে হাসে, হাসে, আর বলে—

"বলি, ও মামা, তুমি মস্ত বড় একটা বীর, তুমি এত্‌ত বড় একটা বীর।"

এদিকে ব্যাপার দেখে মাও হেসে অস্থির !

রাগে লজ্জায় অপমানে অরুণ রৌদ্রের মত রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল,—আস্তে আস্তে শুধু বল্‌ল—"শোন আলো, তুমি যে আমাকে এত রাগাচ্চ, এতে আমি খুবই রাগচি। বেশ, এবার আমি একাই স্বর্গ গড়ব,—আর তোমায় একটুও ভাগ দেব না,—বুঝলে ?

আলো ভয়ে চুপ কর্‌তে চেষ্টা করচে, কিন্তু পারে না যে ! মাঝে মাঝে ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে দেয়, আবার হাসি থামাতে চায়, কিন্তু পারে না।

এদিকে ব্যাপার দেখে মা আরও হাস্‌চেন।

অরুণ রাগে লজ্জায় অপমানে ক্ষোভে আগুনের মত রাঙ্গা হ'য়ে বল্‌ল—

"শোন, আলো আমি সেই রাক্ষসটাকে মারবার জন্যে যুদ্ধ—"

আলো কিন্তু হেসে হেসে আলুথালু,—সে বাধা দিয়ে কেবলই বলে—

"হ্যাঁ, মামা, তুমি মস্ত বড় একটা বীর, তুমি এত্‌ত বড় একটা বীর।"

এদিকে মার হাসিও থামে না।

রাগে লজ্জায় অপমানে, ক্ষোভে অবহেলায়, অরুণ সূর্য্যের মত রাঙ্গা আর তপ্ত হ'য়ে উঠলো তার সব চাইতে বেশী রাগ হ'ল ওই পোকাটার উপর। পোকাটাই তো সকল লজ্জার গোড়া,—ওটার জন্যই ত এত কাণ্ড, এত লজ্জা। অরুণ রাগে গস্ গস্ ক'রে ছুটে পোকাটার কাছে গিয়ে সেটাকে এক লাথিতে মেরে ফেল্‌লে !

মা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"অলি, অলি, ওরে থাম্—

আলো ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল—"মামা, ও মামা, আহা হা।

কিন্তু অরুণ থাম্‌লে না। সে পোকাটাকে মেরে ফেল্‌ল। পোকা বেচারা একেবারে নির্দ্দোষ, তবু অরুণ পোকাটাকে মার্‌লে। পোকা বেচারা একেবারে কিছুই জান্‌ত না, তবু অরুণ পোকাটাকে মারলে।

অরুণ যেই সেই ছোট্ট শান্ত নিষ্পাপ পোকাকে মেরেছে, অম্‌নি হা হা ক'রে প্রচণ্ড ঝড় বইল, হি হি ক'রে বাতাসে বাতাসে চিৎকার উঠল, ঝপ্ ঝপ্ ক'রে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, গুরুম্ গুরুম্ ক'রে বাজ ডাক্‌ল,—বিদ্যুতে বিদ্যুতে চারিপাশের জমাট অন্ধকারের বুক চিরে হাহাকার উঠ্‌ল ;—তুমুল প্রলয়ের মত বিকট একটা আন্দোলন ঘট্‌ল !

এত হবেই ! জীবহত্যা যে মহাপাপ ! মা শিউরে উঠলেন্—আলো কাঁদল !

মা বল্‌লেন্—"অরুণ, তুমি খুবই অন্যায় করেচ। আর কখনও এমন ক'রে পোকা মারবে না, কেমন ?"

অরুণের গোঁ তখনও যায় নি,—সে বল্‌লে—"পোকা মেরেচি, বেশ করেচি, খুব করেচি, আরও মার্‌ব—চল্ আলো আমরা স্বর্গ বানাইগে, আয়।"

দেখ দেখি অরুণের ব্যবহার ;—একে ত সে পোকা মেরেচে, তার উপরে আবার মাকে এ ভাবে অমান্য কর্‌চে। মা বল্‌লেন—"অরুণ, তুমি কিছুতেই স্বর্গ গড়্‌তে পারবে না। কারণ তুমি মহা অন্যায় করেচ। যারা অন্যায় করে, তারা কি স্বর্গ বানাতে পারে ?"

তবু অরুণের মন ফির্‌ল না। সে জিদ্ ক'রে বল্‌ল—"বেশ মা, তুমি দেখবে, আমার স্বর্গ হবেই হবে। তখন তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। পোকা মেরেচি তাতে হয়েচে কি ? ভারী ত একটা পোকা !"

দেখ্‌লে অরুণের ব্যবহার ! আচ্ছা, দেখা যাক্, কি হয়।

রাত্রি হয়েচে। সুন্দর ধবধবে বিছানার উপর আলো ঘুমোচ্চে, যেন সাদা মেঘের ভিতর চাঁদ ঘুমিয়ে পড়েচে। পাশে অরুণ শুয়ে আছে,—তার চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু,—তবুও সে জেগে রয়েচে। কারণ, সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে আগে স্বর্গ গড়বার ফন্দি ফিকির ভেবেচিন্তে তবে ঘুমোবে,—তার আগে নয়। কিন্তু তার চোখ মাঝে মাঝে বন্ধ হ'য়ে আস্‌চে, তার খুবই ঘুম পাচ্চে।

হঠাৎ যেন তার কানের কাছে কে গান গাইল—"বিন্ বিন্ বিন্ বিন্ বিবিন্ ঝুঝ—বিন্ ঝুঝা—বিন্ বিন্ বিবিন্।" এ কি, কে গায় ?

অরুণ ভাল ক'রে কান পেতে শুন্‌তে চেস্টা কর্‌ল। না, না, এত নয়, কে যেন কথা বল্‌চে ; অরুণ আরও ভাল করে কান দিল।

কে যেন ডাক্‌চে—"বিন্ বিন্ হো অরুণ।" অরুণ পরিস্কার শু ল,—স্পষ্ট শুন্‌ল। কে যেন আবার বল্‌চে—"অরুণ আমার দিকে চাও দেখি—হাঁ, চাও,—বিন্ বিন্ হুঝ ভন্ বিবিন্।"

অরুণ অবাক্ ! একটু একটু ভয়ও করচে, আর যেন কেমন মজাও লাগ্‌চে।

অরুণ বল্‌ল—কে তুমি, তুমি কোথায় ? কে যেন উত্তর দিল—"এই যে আমি, তোমার নাকের কাছে ? বিছানার উপর।" অ্যাঁ, এত কাছে ? কি ব্যাপার ! অরুণ কি কর্‌বে তাই ভাব্‌চে। শেষে খুব সাহস ক'রে খুঁজে সে কি দেখ্‌ল। তোমরা শুন্‌বে ? তবে শোন।

অরুণ দেখ্‌ল,—বেশ স্পষ্ট দেখ্‌ল,—যে সেই পোকাটা আবার জীবন্ত হ'য়ে বিছানার উপরে এসে উঠেচে, আর কথা কইচে !

পোকা বল্‌লে—অরুণ, তুমি আমায় মেরেছ।

অরুণ—বেশ করেচি, আবার মেরে ফেল্‌ব, এক্ষুনি পালাও।

পোকা—তোমার বেশ সাহস আছে,অরুণ এতে আমি খুসী হলুম্। কিন্তু তবু মনে রাখবে যে তুমি আমায় মেরেচ। অরুণ বল্‌লে আচ্ছা, যাও, যাও, পালাও, আমি ঘুমুব। এর পরে যে সব অদ্ভুত ভয়ানক কাণ্ড ঘট্‌বে সে গুলির বিষয়ে ভাল করে বর্ণনা করতে আমি পেরে উঠব কি না, খুবই সন্দেহ। স্বয়ং বাল্মীকি মুনি, যিনি রামায়ণ লিখেছেন, যিনি রামচন্দ্র আর সীতার সুন্দর জীবন কথা লিখেছেন, সেই বাল্মীকি মুনি স্বয়ং যদি এ গল্প বল্‌তে আরম্ভ করতেন তবেই ন্যায্য হ'ত এবং চমৎকার হ'ত। আমি যতদূর পারি তোমাদের বল্‌চি।

সেই মুহূর্ত্তে অরুণ দেখ্‌ল—পোকাটা যেন খিল্ খিল্ ক'রে হাস্‌চে। অরুণ অত্যন্ত ভয়ে পোকাটার দিকে চেয়ে রইল। পোকাটা খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই ফু ফু ফু ক'রে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেল্‌চে, ততই তার ছোট্ট শরীরটা ক্রমে বড় হচ্চে। অরুণের চোখের সাম্‌নে পোকাটা ক্রমেই বড় হ'তে হ'তে প্রথমে ছুঁচোর

মত বড় হল,—তারপরে কাছিমের মত, তারপরে শেয়ালের মত, তারপর ভালুকের মত বড় হ'ল। তারপরই গণ্ডারের মত, তারপর হাতীর মত, তারপর বাড়ীর মত, তারপর জাহাজের মত,—বুঝলে কাণ্ডটা পোকাটা আরও বড় হ'য়েই চল্‌ল,—ক্রমে তার বিশ্রী শরীরটা অট্টালিকার মত বড় হল, তার পরেই পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড হল, তারপর পর্ব্বতের মত,—এবং তারপরে এদিক ওদিক ঊর্দ্ধ অধঃ আকাশ সমুদায় ব্যাপ্ত ক'রে সেই পোকাটা অত্যন্ত প্রকাণ্ড হিমালয়ের মত হ'য়ে উঠেছে। দূরে বহুদূরে নীল আকাশের গায়ে মেঘের ফাঁকে তার সাদা সাদা দাঁতগুলো বিকট আনন্দে হাস্‌চে। ভাবো দেখি, কি ভীষণ ! (ক্রমশঃ)

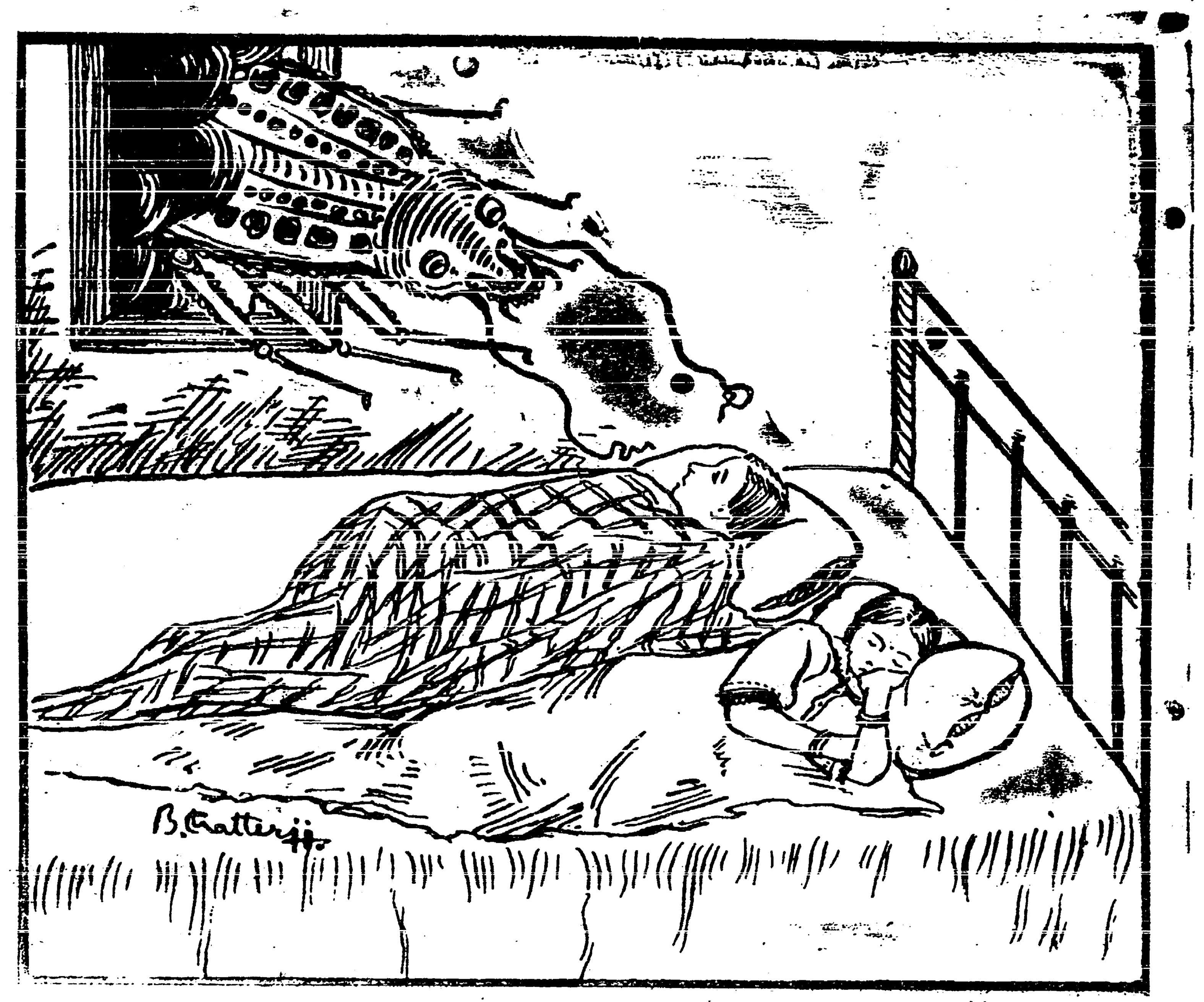

পোকাটা ক্রমেই বড় হতে লাগল

অন্ধদের লাইব্রেরী

অন্ধেরা চোখে দেখিতে না পাইলেও যে বই পড়িতে পারে তাহা হয় ত তোমরা কেহ কেহ জান। অবশ্য আমাদের মত কালীতে ছাপা বই তাহারা পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য অন্য রকম বই তৈয়ার করা হয়, অন্ধেরা হাত দিয়া উচুনীচু অক্ষর অনুভব করিয়া সেই সব বই পড়ে।

অক্সফোর্ডে এই রকম বইএর একটা লাইব্রেরী ছিল, সম্প্রতি লণ্ডনে সেগুলি এবং আরও অনেক নতুন বই লইয়া এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী হইয়াছে। ডাকঘরের কর্ত্তারাও একটা ভয়ানক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন; তাঁহারা এই সব বই যাহাতে অন্ধেরা ঘরে বসিয়া পড়িতে পারে সেইজন্য, এই ধরণের বই ডাকে পাঠাইবার খরচ খুব সস্তা করিয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ডের লাইব্রেরী হইতে এই লাইব্রেরীতে ১৭০০ বই পাঠান হইয়াছে।

বিচিত্র মাকড়সা

আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহারা মাকড়সা দেখিলে ভয়ে জড়সড় হইয়া যান। আমরা শুনিয়া হাসি, কিন্তু এমন মাকড়সাও আছে যাহাদের দেখিলে বুড়ারাও ভয় পাইয়া যাইবে।

মুঙ্গেরের কাছে এক রকম মাকড়সা আছে। তাহারা বারো হাত পর্য্যন্ত লম্বা জাল বুনিতে পারে।—জালগুলি আবার সবুজ রংএর।

সিংহলে এক রকম পাটকিলা রংএর মাকড়সা আছে। তাহারা টিকটিকি ধরিয়া খায়।

আকারে এবং গুণে ইহাদের চেয়েও সেরা আর এক রকম মাকড়সা আছে হিমালয়ে। টিকটিকিতে তাহাদের পোষায় না, তাই তাহারা জলযোগ করে পাখী ধরিয়া। ইহাদের কতক কালো কতক লাল। আকারে ও চেহারায় ইহারা অক্টোপাসেরই একটি ছোট সংস্করণ।

ঘড়ীর রাজা

তোমরা কতবড় ঘড়ী দেখিয়াছ বল ত? জারসী সহরে কলগেট কোম্পানীর একটি ঘড়ী আছে, যাহার আকার শুনিলে তোমরা তিন ইঞ্চি হাঁ করিয়া থাকিবে। ঘড়ীটি ৫০ফুট চওড়া। ইহার মিনিটের কাঁটাটা মাত্র ৩৮ ফুট লম্বা, ঘণ্টারটা কিছু ছোট ২৭ ফুট। দুইটি কাঁটা একত্র করিলে ওজন দাঁড়ায় ৩৮২৫ পাউণ্ড।

তোমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে, কে ইহাতে দম দেয়? অবশ্য মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়, কলের সাহায্যেই ইহাকে দম দিতে হয়।

মোটর চালকের বাহাদুরী

মিঃ ফ্যান্সিস্ বারটল্স্ নামে এক ভদ্রলোকের অধ্যবসায় অসাধারণ। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের নাম তোমরা সকলেই জান। এই ভদ্রলোকের একখানি মোটর গাড়ী আছে। সেই মোটর গাড়ী করিয়া তিনি সমস্ত অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশটা মাত্র ৭৫ বার চক্র দিয়াছেন। সম্প্রতি সেই মোটর লইয়া তিনি লণ্ডন চলিয়াছেন। আমাদের দেশে এই ধরণের লোক কয়জন আছে?

দীর্ঘজীবী

কিছুদিন আগে ফ্লোরিডায় সমুদ্রের ধারে একটা কচ্ছপ ধরা পড়িয়াছিল। তাহার পিঠে ইংরাজীতে ১৬১০ সনের একটা তারিখ খোদিত দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কচ্ছপটির বয়স ৩০০ বছরেরও বেশী। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায়ও একটি কচ্ছপ আছে—তাহার বয়সও ২৬০ বছর।

জার্ম্মেনীতে হিল্ডেশিমের গির্জ্জার এক অদ্ভুত গোলাপ গাছ আছে। তাহার বয়স হাজার বছরেরও বেশী, কিন্তু আজও তাহাতে দিব্যি ফুল ফোটে।

মানুষের মধ্যেও দীর্ঘজীবী মানুষ অনেক দেখা যায়। এখন পৃথিবীর মধ্যে যে সবচেয়ে বয়সে বড় তাহার বয়স ১৫১ বছর, বাড়ী তুরস্কদেশে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) আদর

(২) ১। কাশী, ২। ঢাকা, ৩। পাতিয়ালা, ৪। সীমলা, ৫। পুরী, ৬। আরা ৭। ঘুম, ৮। পুনা, ৯। নাভা, ১০। কলিকাতা, ১১। আগ্রা, ১২। দেওঘর, ১৩। পাবনা,

১৪। কটক, ১৫। পাটনা, ১৬। চিতোর, ১৭। হুগলি। ইহা ছাড়া অনেকে "কাকিনা"র নামও উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামও আমরা নির্ভুলের মধ্যে ধরিলাম।

উত্তর দাতাদের নাম

যাঁহাদের উত্তর নির্ভুল হইয়াছে—হরিমোহন, হেমন্ত, শরৎ, কালু, কমল, হংস, কালো, জিতেন, ভণ্ডুল, সুধাংশু (অভয় আশ্রম), সাধনা সেনগুপ্তা, কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী দত্ত, আশালেখা ও নিরুপমা দেবী, ইন্দু রায়, আর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, বলাইচাঁদ মিত্র, পুষ্পবতী দেবী, হিমাংশুকুমার নিয়োগী, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য।

যাঁহাদের ১মটি হইয়াছে, ২য়টি প্রায় ঠিক হইয়াছে—কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী সত্যসুন্দর ভট্টাচার্য্য, মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হৃষীকেশ, অন্নদা, প্রমোদ, হরিপদ, তারাপদ, সুশীল, চৈতন্য, মুকুল।

যাঁহাদের ১মটি হইয়াছে ২য়টির কতক হইয়াছে—বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, শৈলেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, রামরতি চক্রবর্ত্তী।

যাঁহারা ১টি ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন—কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, অবনীনাথ ব্যানার্জ্জী, শিবপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ চন্দ্র মুস্তোফী।

যাঁহাদের ২য়টি প্রায় ঠিক হইয়াছে—ধীরেন্দ্রনাথ, সৌরেন্দ্রনাথ, গৌরীশঙ্কর ও নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হাসি বসু, অরুণা দেবী, অমিয় কুমার বরাট, সন্তোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যাহাদের ২য়টির কতক হইয়াছে—লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী, প্রমথনাথ গিরি, সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রহমত উল্লা মিঞা।

নূতন ধাঁধা*

১। ১০টি পাখীকে এমন ৫টি সারিতে সাজাও যাহাতে প্রত্যেক সারিতে ৪টি করিয়া পাখী থাকে। ছবি আঁকিয়া দেখাও।

শ্রীহৃষীকেশ কুণ্ডু।

২। এক গয়লার গরু, মহিষ এবং ছাগল এই তিন রকম জন্তু মিলিয়া সবশুদ্ধ ২০টি জানোয়ার আছে। তাহার প্রত্যেক গরু তিন সের করিয়া, প্রত্যেক মহিষ ৫সের করিয়া এবং প্রত্যেক ছাগল এক পোয়া করিয়া দুধ দেয়। প্রত্যহ ২০টি জানোয়ার হইতে গয়লা ঠিক একমণ দুধ পায়। বলত তাহার গরুই বা কয়টি, মহিষই বা কয়টি এবং ছাগলই বা কয়টি আছে?

---

* ২০শে তারিখের মধ্যে ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে পারিলে আগামী সংখ্যায় নাম প্রকাশিত করা হইবে। কেবলমাত্র গ্রাহকরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩৪ { ৩য় সংখ্যা

শিবের গান

(ধান ভান্‌তে)

[শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার]

ধান ভান্‌তে ঢেঁকির পাড়ে তাল দিয়ে গাই শিবের গান;
ক্ষেতে খোলায় ঢেঁকির চালায় বাড়ান্ তিনি জীবের প্রাণ।

কুঁড়ায় পুষ্ট গরু-বাছুর, তুষে ঘুঁটায় আগুন পাই;
খুদের জাউএ তপ্ত ভাতে বাঁচিয়ে সবায় রাখুন সাঁই।

মুষলপাতের কচ্‌কচিতে পালায় দেশের সাত বালাই;
তাকে তাকে ফাঁকে ফাঁকে গড়ের মাঝে হাত চালাই।

ঢেঁকির পাড়ে আকাল তাড়াই, বাড়াই মোদের গায়ের বল;
শিবের গানে নাচ্‌রে ঢেঁকি, বাজ্‌রে দেখি পায়ের মল।

ঢেঁকির কলে সোনা ফলে, যায়রে দুখের লেশ তুড়ে ;
শিশুরা সব দুধে ভাতে বাড়ে সারা দেশ জুড়ে।

জীবজন্তুর আত্মরক্ষা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

সংস্কৃতে সেই যে একটা কথা আছে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—কথাটা খুবই সত্যি। সংসারের নিয়মই এই যে বড়রা ফাঁক পাইলে ছোটদের উপর উপদ্রব করিবেই। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভাইবোনদের ভিতর সব চেয়ে ছোট তাহারাই জান কথাটা কতদূর ঠিক। বড় ভাইবোনদের হুকুম ত রাত দিন লাগিয়া আছেই, তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে তাহাদের হাতের কীলটা চড়টা হইতেও নিস্কৃতি নাই। পশু-পক্ষীদের মধ্যেও দেখিবে নিরীহ শান্ত শিষ্ট হওয়াটা যেন একটা মস্ত অপরাধ। যে প্রাণী যত নরম স্বভাবের সকলের আক্রোশটা যেন তাহার উপর তত বেশী। আর সে আক্রোশটার পরিচয় সব সময়েই যে কীল চড়ের মত হাল্কা ভাবে পাওয়া যায় তাহা নহে; অনেক সময় মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

হঠাৎ দেখিলে মনে হয় ভগবান্ কতকগুলি জানোয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন শুধু মুখ বুজিয়া মার খাইবার জন্য। কিন্তু বাস্তবিকই এ আশঙ্কাটা ভুল। প্রত্যেক জানোয়ারেরই আত্মরক্ষার কিছু না কিছু ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন।

নিরস্ত্রদের মধ্যে মানুষের কথা ছাড়িয়া দাও; বুদ্ধি থাকিলেত' আর কিছুরই দরকার হয় না, কিন্তু ওই জিনিষটার অভাব হইলেই একটু মুস্কিল, তখন আত্মরক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হয়। সেই বন্দোবস্তের কথাই আজ কিছু বলিব।

এমন অনেক জানোয়ার আছে যাহাদের শরীরটাকেই একটা ছোটখাটো দুর্গ বলা চলে। কচ্ছপের কথাই ধর না কেন, পিঠের উপর কত বড় একটা ঢাল। যখন দরকার হইল হাত পা গুটাইয়া ঢালের তলে ঢুকিলেই হইল—কাহারও সাধ্য নাই খুঁজিয়া বাহির করে। অনেক জলের পোকা আছে যাহারা এই রকম দুর্গের মধ্যে নিরাপদে বাস করে।

প্যাঙ্গোলিন বলিয়া এক রকম জানোয়ার আছে। তাহাদের সমস্ত গায় এক রকম চাকতি বসান থাকে—মাছের গায় যেমন আঁস লাগান থাকে অনেকটা সেই রকম। আঁসগুলি কিন্তু ভয়ানক শক্ত আর মজবুত। যদি কোনরকম বিপদ উপস্থিত হয় তবে সমস্ত শরীরটাকে ইহারা এমন গোল্লা পাকাইয়া ফেলে যে নাক মুখ চোখ খুঁজিয়া বাহির করাই দুষ্কর। সেই সময় ইহাদের গায়ের আঁসগুলিও খাড়া হইয়া উঠে—আর দেখিতে হয় বিকট। তাই বলিয়া জন্তুটি কিন্তু খুব নিরীহ, শুধু উই আর পিঁপড়ের উপর যা একটু ফষ্টিনষ্টি দেখাইতে পারে। এই ধরণের আঁস ও চাকতিধারী জানোয়ার সেকালে খুবই দেখা যাইত। ছবিতে দেখ প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার——পিঠের উপর খাড়া খাড়া খড়্গ, ল্যাজের উপর বড় বড় কাঁটা। কি বিকট চেহারা! তখনকার দিনে ভয়ানক ভয়ানক হিংস্র জন্তুর ত' আর অভাব ছিল না। কাজেই এই চেহারা দেখাইয়াই তাহাদের ফাঁকি দিতে হইত। অথচ চেহারার সাথে হয়ত এ জন্তুটির স্বভাবের কোন সামঞ্জস্যই নাই।

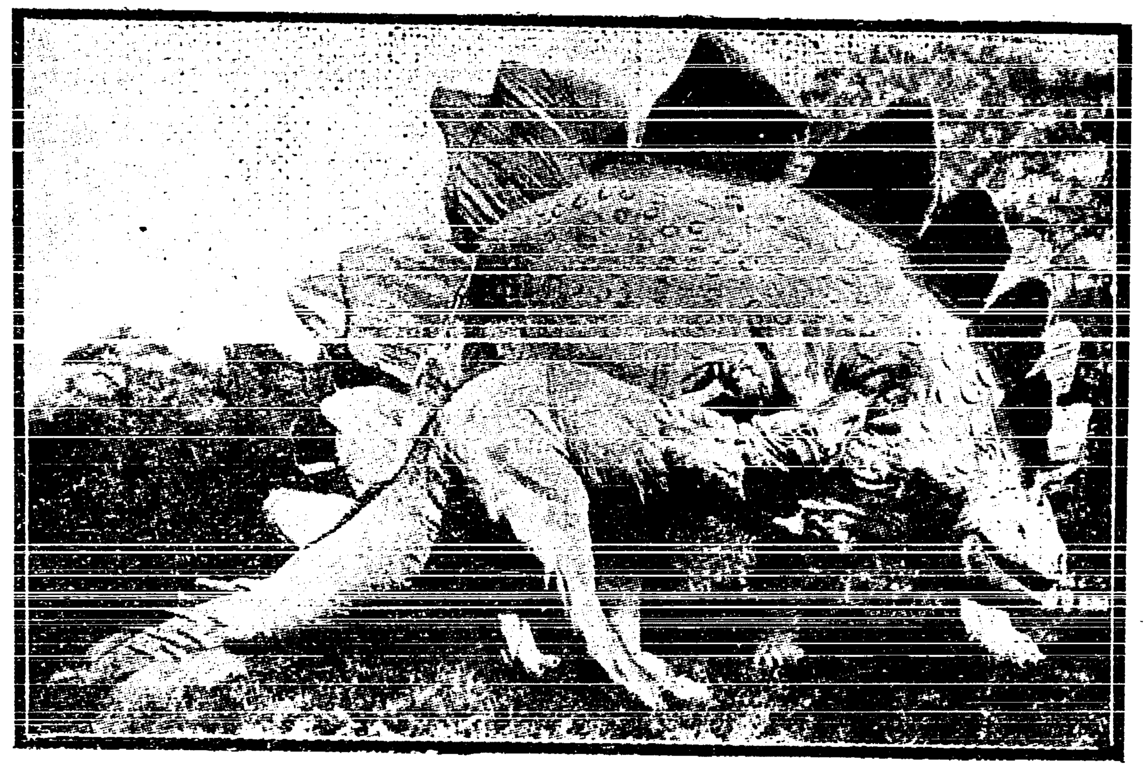

সেকালের বিকট জানোয়ার

শজারু তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। কি ভীরু তাহাদের স্বভাব, কিন্তু তাহাদের গায়ের কাঁটাগুলি দেখিয়াছ—কি ভয়ানক! একবার তাহার খোঁচা খাইলে কাহারও আর ধারে কাছে ঘেঁসিবারও সাহস হইবে না। কাঁটাওয়ালা জন্তু আরও অনেক আছে। অনেকের কাঁটা আবার শজারুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কিন্তু স্বভাব আরও ভীরু।

শিং, নখ, দাঁত, হুল এগুলির কথা ছাড়িয়া দাও, এগুলি ত' নিতান্ত সাধারণ জিনিষ, অনেক জানোয়ার আছে যাহাদের গায়ের রংই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। বহুরূপীর কথা শুনিয়াছ কি? বহুরূপী বড় অদ্ভুত জীব। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইহার গায়ের রং বদ্‌লাইয়া যায়। যখন যাহার উপর রহিয়াছে গায়ের রংও সেই রকম। এই দেখিলে সবুজ পাতার মত, একটু পরেই হয়ত গাছের ডালের মত শুঁটকাইয়া গেল; আবার খানিক পরেই হয়ত দেখিবে একেবারে তামাটে হইয়া গিয়াছে। তখন আর চিনিবার যোটি থাকিবে না।

অনেক পোকা আছে যাহাদের গায়ের রং—শুধু রং কেন আকৃতিও—একেবারে হুবহু গাছের ডালের মত। ইহারা অনায়াসে গাছের ডালের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া শত্রুপক্ষীয় পাখীদের ফাঁকি দিতে পারে। পাশের ছবিটা ভাল করিয়া লক্ষ্য কর দেখি। অনেকগুলি পাতাওয়ালা একটা ডাল দেখিতেছ ত'? কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিবে সবগুলি পাতা নয়। কয়েকটা প্রজাপতিও উহার মধ্যে লুকাইয়া আছে। ইহাদের খুঁজিয়া বাহির করা দস্তুর মত ওস্তাদের কাজ। আর এক রকম প্রজাপতি আছে,—দূর হইতে দেখিলে তাহাদের ঠিক পেঁচার মুখ বলিয়া মনে হয়। সে রকম চেহারা তোমাদের পক্ষে হয়ত খুবই আপত্তিকর, কিন্তু তাহাদের আত্মরক্ষার পক্ষে বেশ কাজে আসে।

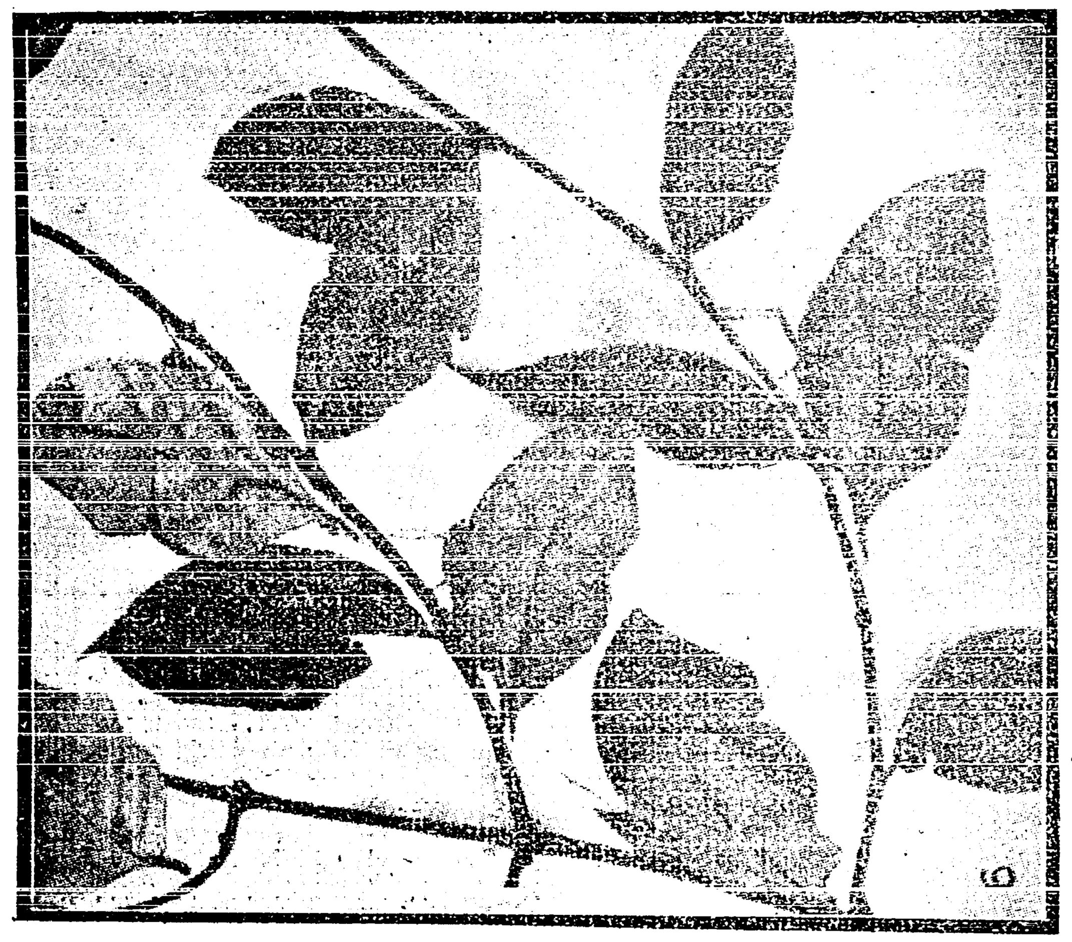

শুধু গাছের ডাল—না আর কিছু?

সমুদ্রের তলায় অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জানোয়ার থাকে। তাহাদের গায়ে নানা রকম রং বেরংএর কারিকুরি। সে সব কিন্তু সৌন্দর্য্যের চেয়ে আত্মরক্ষায় অনেক বেশী সাহায্য করে। সমুদ্রের তলায় অদ্ভুত অদ্ভুত রঙ্গীন সব বাগান আছে। এই রকম চিত্র বিচিত্র শরীর লইয়া সেই সব বাগানের মধ্যে অনায়াসে মিশিয়া থাকা যায়। কত ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র জলজীব আশে পাশে শিকারের আশায় ঘুরিয়া মরে, কিন্তু ভুলিয়াও মনে করে না চোখের সম্মুখেই এত বড় একটা ভোজের সামগ্রী পড়িয়া আছে। আবার দেখ পাশে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রংএর ২টি মাছের ছবি দেখিতেছ ও দুটি কিন্তু একই মাছ। রং বেরংএর চিত্র করা মাছটা ভয় পাইলেই গায়ের রং বদলাইয়া ঐ রকম কালো হইয়া যায়। তার পর শত্রুর চোখে অনায়াসে ধূলা দিয়া গভীর জলে সরিয়া পড়ে।

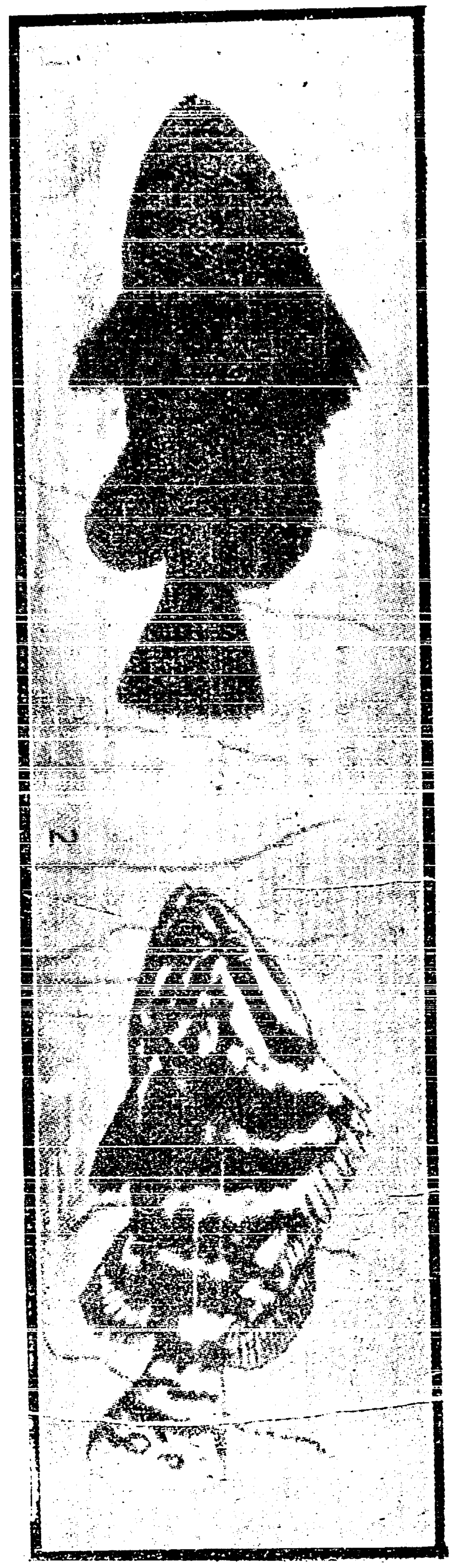

গরমের সময় মাছির উৎপাতে অস্থির হইতে হয়। কিন্তু কোন দিন কোনও মাছি ধরিতে পারিয়াছ কি? কেমন করিয়া পারিবে? মাছির মাথা ভরা প্রায় সমস্তটাই যে চোখ। পুরাণে সহস্রচক্ষু ইন্দ্রের কথা আছে না? সেই রকম আর কি। সে চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া সহজ কথা? আর এক রকম মাছ

আছে ; তাহারা সমুদ্রে থাকে, তাহাদের আবার চারিটা করিয়া চোখ। যখন জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায় তখন দুইটা থাকে জলের উপরে দুইটা থাকে জলের নীচে। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা কত সহজ হইয়া পড়ে বুঝিতেছ ত'? এক সঙ্গে জলের তলা আর উপর দুই দেখিয়া বেশ সমঝাইয়া চলা যায়।

আর এক ধরণের জানোয়ার আছে যাহাদের থাকিবার মধ্যে আছে শুধু চারিখানা ঠ্যাং। সেই যে একটা কথা আছে "যঃ পলায়তি স জীবতি—" সেই মন্ত্রই ইহাদের একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়।

জানোয়ারদের মত গাছ গাছড়ার মধ্যেও আত্মরক্ষার নানা বন্দোবস্ত থাকে। থাকিবেই ত', কেননা থাকিবার দরকার যে উহাদেরই বেশী। আমরা যে সব জানোয়ার দেখিয়া বলি—বাঃ কেমন শান্ত, নিরীহ, কোনও হিংসা নাই, শুধু নিরামিষ খাইয়াই আছে, গাছেরা তাহাদের কি চক্ষে দেখে বল দেখি? গাছের কাছে যে তাহারাই আসল ডাকাত।

বেশীর ভাগ গাছের কাঁটাই একমাত্র সম্বল। ফণীমনসা গাছ হয়ত' দেখিয়াছ। উহার পাতাগুলি হয়ত খুব সরস কিন্তু কাহার সাধ্য কাঁটা এড়াইয়া তাহা দিয়া মিষ্টিমুখ করিতে পারে? এই ধরণের আরও কত গাছ আছে। কোনটা দেখিতে হয়ত খুব সুন্দর—কিন্তু একবার গায়ে হাত দিলেই সৌন্দর্য্য বোধ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে। ছোট ছোট শুঁয়া চামড়ার মধ্যে বিঁধিয়া কাঁদাইয়া ছাড়িবে। অনেক সময় আবার ঐ কাঁটার মুখে বিষ মাখান থাকে। কাঁটা ফুটিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিষের জ্বালা আরম্ভ হয়। বিছুটি গাছ এই দলের একটি। আবার কোন কোন গাছ আছে তাহাদের পাতা কি ফল খাইলে মুখ গলা ফুলিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিবে। এ সমস্তই কিন্তু নিরামিষাশী প্রাণীদের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য।

আবার এক রকম গাছ আছে—দেখিতে এমন বীভৎস, যে চেহারা দেখিয়াই কেহ তাহার কাছে আগাইতে সাহস পাইবে না। ছোট ছেলেপেলেদের শুদ্ধু সে গাছের কাছে লইয়া গেলে হয়ত ভয়ে কাঁদিয়া দিবে। কিন্তু কেহ যদি সাহস

করিয়া কাছে যাইতে পারে তবেই গাছের সমস্ত জারিজুরি ধরা পড়িয়া যায়। গাছটী হয়ত খুবই নিরীহ ; শুধু চেহারাটা অমন করিয়া শত্রুকে দূর হইতে ফাঁকি দেয়।

এবার আর একটি গাছের কথা বলিয়া শেষ করিব। ইহার মত বুদ্ধিমান্ গাছ আর নাই। আমরা যেমন চোর তাড়াইবার জন্য কুকুর পুষি, ইহারাও তেমনি পোকার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাতার উপর আর এক রকম মাংসখোর পোকা পোষে। অন্য কোনও পোকা যদি গাছটির সহিত শত্রুতা করিতে আসে তবে এই পোকাগুলি প্রভুভক্তির মর্য্যাদা রাখিয়া তাহাদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

গরুড়ের ক্ষুধা

(মহাভারত হইতে)

এক সময় পাখীর রাজা গরুড় অমৃতের খোঁজে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। গরুড়ের শরীরে বেজায় জোর, পেটেও বেজায় ক্ষুধা। ক্ষুধার চোটে কতকগুলি নিষাদকেই (অর্থাৎ চণ্ডালকেই) পেটে পূরিয়া ফেলিলেন। সেই নিষাদগুলির সঙ্গে এক ব্রাহ্মণকেও পেটে পোরার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের শরীর তখন অন্য রকমের কিছু ছিল, গলা পর্য্যন্ত পৌছিতেই গরুড়ের ভীষণ ছট্‌ফটি উপস্থিত হইল। তখন "চাচা, আপনা বাঁচা"—তিনি কোনরূপে ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে রক্ষা পাইলেন।

এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার পিতা মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে দেখা। কশ্যপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, সকলে ভাল আছে ত? মর্ত্ত্যলোকে তোমার খাবার জিনিষ ভাল রকম যোটে ত?" গরুড় উত্তরে বলিলেন "ভাল আছে সবাই, কিন্তু পেট নিয়াই যত মুস্কিল। কতকগুলি নিষাদ খাইয়া ফেলিলাম, কিন্তু খিদে ত মেটে না, এখন খাই কি?"

কশ্যপ বলিলেন ঃ—

"আচ্ছা শোন, ঐ যে সরোবর দেখা যায়, উহা খুব পবিত্র, দেবতারাও উহার কথা জানেন। ঐ সরোবরে একটা হাতী আর একটা কচ্ছপ যুদ্ধে ব্যস্ত আছে। হাতীটা ছয় যোজন উঁচু, বার যোজন চওড়া; আর কাছিমটী উঁচুতে তিন যোজন, বেড়ে দশ যোজন। ইহাদের সাবেক বিবরণ জান? ঐ কচ্ছপ আগে এক মহর্ষি ছিল, নাম ছিল বিভাবসু, মেজাজটাও ছিল বিভাবসুর অর্থাৎ আগুনের মতই কড়া। আর ঐ হাতীটা ছিল তার ছোট ভাই, নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীকের একান্নে থাকা ভাল লাগিত না, সে সর্ব্বদাই বড় ভাইকে বলিত 'আমার ভাগে যাহা পড়ে আমাকে বাঁটরা করিয়া দাও।' বিভাবসু একদিন রাগিয়া উঠিয়া বলিল 'দেখ, অনেকেই মোহে পড়িয়া বাপের আমলের টাকা কড়ি ভাগ করিয়া নিতে চায় কিন্তু শেষে ধন পাইয়া মত্ত হইয়া পড়ে এবং ঝগড়াঝাঁটি আরম্ভ করে, শত্রুলোক মিত্রের মত ঘেঁসিয়া আসিয়া শেষে ঝগড়াটা ভাল করিয়াই জমাইয়া দেয়। এই জন্য ভাইদের মধ্যে ধনভাগ ভাল কাজ নয়, তোমাকে কতদিন বুঝাইলাম, তবু তুমি বারবার কেবল ঐ কথাই বলিবে। যখন তুমি আমার বারণ শুনিলে না, তখন তুমি বারণ (হাতী) হইয়া জন্মিবে। সুপ্রতীক এই শাপ শুনিয়া বড় ভাইকে বলিল 'তুমিও তাহা হইলে কাছিম হইবে।'

এই রকমে বড় ভাই হইল কচ্ছপ, আর ছোট ভাই হইল গজ। তারা ছিল ব্রাহ্মণ, হইল বাজে জন্তু; কিন্তু এইরূপ জন্তু হইয়াও সাবেক ঝগড়া ভুলিতে পারিল না। কচ্ছপ এই সরোবরে থাকে, গজও এখানে জল খাইতে আসে; ঐ দেখ ভয়ঙ্কর শরীরে জল কি রকম নাড়াচাড়া দিয়া হাতীটা কচ্ছপকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিতেছে, আবার কচ্ছপও তাহার মাথা তুলিয়া হাতীটাকে মারিয়া ফেলার কেমন চেষ্টা করিতেছে, তুমি যাও, উহাদিগকে খাইয়া ফেল; পেটের জ্বালা মিটাও।"

একে দারুণ ক্ষুধা, তাহার উপর পিতার আদেশ। গরুড়ের কি আর বিলম্ব সয়? গরুড় করিলেন কি, না এক নখে গজকে অন্য নখে কচ্ছপকে ধরিয়া তুলিয়া আকাশে উড়িলেন। তখন আর এক মুস্কিল বাধিল—কোথায় বসিয়া ইহাদিগকে

খাওয়া যায়? গরুড়ের মনে হইল অলম্ব-তীর্থে দেববৃক্ষের উপর বসিয়া এ কাজটা সারিয়া ফেলা যাইতে পারে। দেববৃক্ষগুলি সোণার, তাহাদের ভয় হইল গরুড় আসিয়া গজ-কচ্ছপ লইয়া বসিবে, আর তাহাদের ডালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। গাছগুলি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে গুলি কি যে সে গাছ! তাদের ফলগুলি সোণার, ডালগুলি প্রবালের আর সমুদ্রের জল আসিয়া সর্ব্বদা তাহাদের মূল ধোয়াইয়া দিতেছে। উহার মধ্যে একটা বটগাছ ছিল খুব লম্বা, সেই গাছটা গরুড়কে ডাকিয়া বলিল "পক্ষিরাজ, দেখ আমার এই শত যোজন লম্বা প্রকাণ্ড ডাল, তুমি ইহার উপর বসিয়া তোমার ভোজন ব্যাপারটা সার।" সেই ডালের উপর হাজার হাজার পাখী ছিল, কিন্তু গরুড় যে একাই ছিলেন এক পর্ব্বতের মত। তিনি বসিবামাত্র ডালটা ভাঙ্গিয়া গেল। ডালটা ভাঙ্গিলেই গরুড় তাহা ধরিয়া

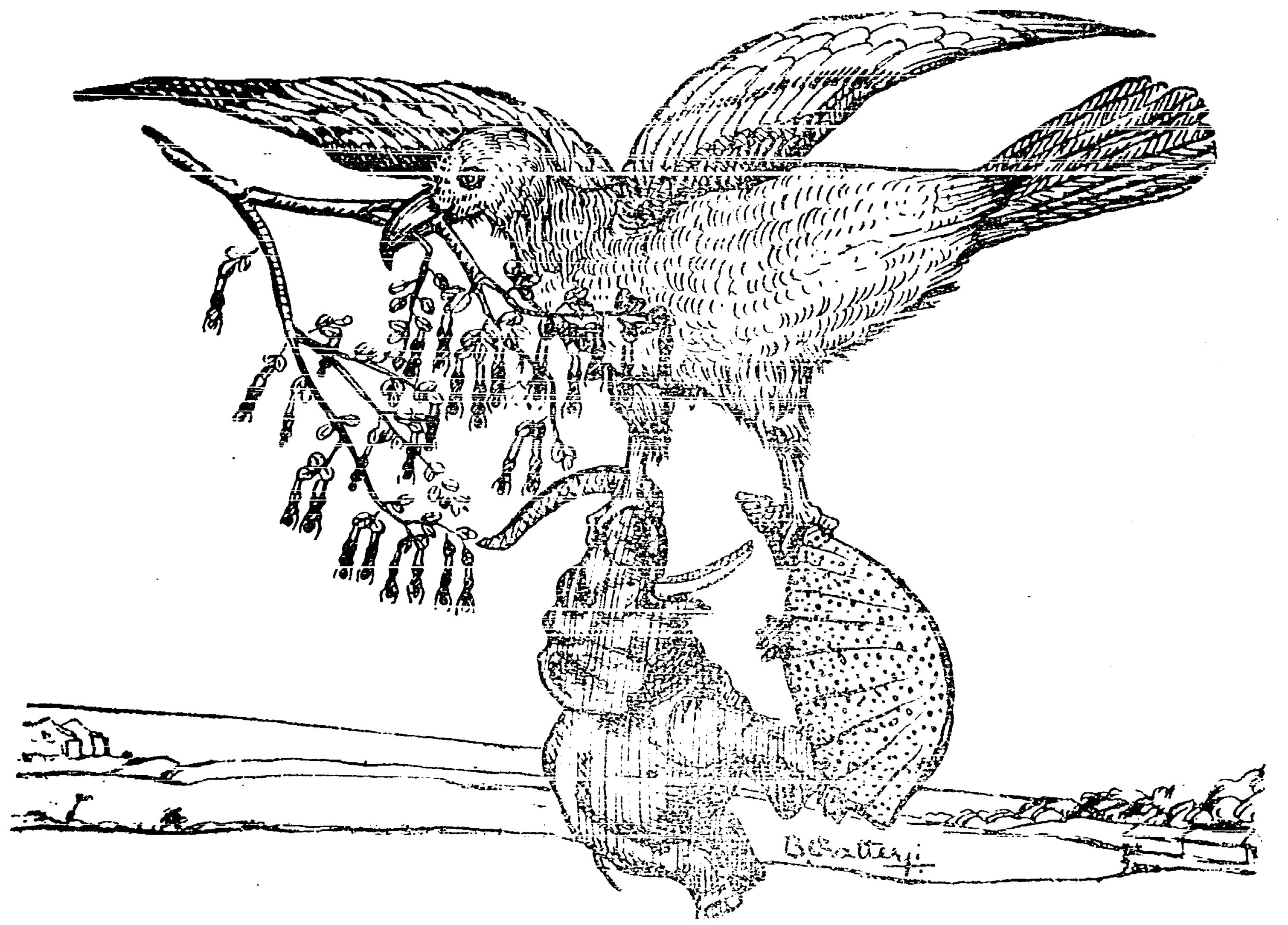

গজ-কচ্ছপকে নখে···ধরিয়া রাখিলেন, আর ডালটা ধরিয়া রাখিলেন ঠোঁটে

ফেলিলেন এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে ছোট ছোট অনেক

বালখিল্য ঋষি নীচের দিকে মাথা করিয়া সেই ডালে ঝুলিয়া থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। বালখিল্য মুনিরা কতবড় ছিলেন জান? এক একটী, এক বুড়া আঙ্গুলের আগাটার মত। গরুড়ের বড় ভয় হইল, ডালটা মাটিতে পড়িলেই ত এই ঋষিদিগের জীবন শেষ হইয়া যাইবে। তখন গরুড় সেই গজ ও কচ্ছপকে নখে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলেন, আর ডালটা ধরিয়া রাখিলেন ঠোঁটে। গরুড় উড়িয়া যাইতে লাগিলেন আর তাঁহার পাখার বাতাসে সমস্ত পর্ব্বত কাঁপিতে লাগিল।

গরুড় উড়িয়াই বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু বসিবার উপযুক্ত যায়গা আর কোথাও পান না! তিনি উড়িতে উড়িতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা কশ্যপ সেখানে তপস্যায় মগ্ন। কশ্যপ তাঁহার এই দুরন্ত শিশু পুত্রটীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপু, তুমি হঠাৎ কিছু করিয়া বসিও না; এই যে বালখিল্য মুনিগণকে দেখিতেছ ইঁহারা খান শুধু সূর্য্যের কিরণ, ইঁহাদিগের রাগ হইলে তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।" তখন কশ্যপ মুনি নিজেই বালখিল্য মুনিদিগকে তুষ্ট করার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন "ঠাকুর মহাশয়রা, দেখুন, গরুড় যে এই কার্য্য করিতেছে ইহা লোকের উপকারের জন্যই, আপনারা ইহার উপর একটু দয়া করুন।" কশ্যপের কথায় বালখিল্য মুনিরা সেই ডাল ছাড়িয়া দিয়া হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন।

গরুড় তখন কশ্যপ ঋষিকে বলিলেন "বাবা, আমি এত বড় ডালটা কোথায় ফেলি, আপনি একটা যায়গা দেখাইয়া দিন যেখানে মানুষ-জন নাই।" কশ্যপ মুনি গরুড়কে এক পর্ব্বত দেখাইয়া দিলেন,—সে পর্ব্বতে কোন মানুষ থাকে না, থাকে খালি বরফ। তখন গরুড় সেই গজ, কচ্ছপ ও ডালটা নিয়া ছুটিলেন সেই পর্ব্বতের দিকে। ডালটা এত মোটা যে একশ গরুর চামড়া দিয়া দড়ি বানাইলেও বান্ধা যায় না, বা ঘেরা যায় না। পর্ব্বতটা ছিল শত সহস্র যোজন দূরে, কিন্তু গরুড়ের ত গতি! তিনি ধাঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া ডালটা সেই পর্ব্বতের উপর ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার উড়িবার বাতাসে পর্ব্বতটা কাঁপিতে লাগিল, সেখানকার গাছগুলি

হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, পর্ব্বতের মনিকাঞ্চনময় চূড়াগুলি ফাটিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। এক গাছে অন্য গাছের ডালের ঘা লাগায় সোণার বর্ণ ফুলগুলি মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত দেখাইতে লাগিল। অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ নীচে পড়িয়া গেল; মাটিতে পড়িয়া সেগুলি যে খারাপ দেখাইল তা নয়, বেশ সুন্দরই দেখাইতে লাগিল। গরুড় সেই পর্ব্বতের চূড়ার উপর বসিয়া পড়িলেন আর মহাসুখে পিতার আদেশ পালন করিয়া পেটের জ্বালা মিটাইয়া লইলেন।

রামধনুর পাঠকগণ, তোমাদের যেন কখন গরুড়ের মত ক্ষুধা না হয়, আর ভাইতে ভাইতে গজকচ্ছপের মত এমন ঝগড়াও না বাধে।

কেন?

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

(এবার আম-মুকুলে গাছগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে কিন্তু কোকিল আসিতে বিলম্ব করিতেছে—এখনো তাহার কুহুরবে দিগন্ত মুখরিত হয় নাই।)

আমমুকুলের গন্ধে আকুল
আমায় বলনা,
কোকিল কেন এখনো হায়
হেতায় এলো না?
এমন বাতাস, গন্ধ এত,
কিছুই যেন সাজছে না ত,
ফিনফোটা এ উজল রাতি
লাগায় ছলনা!

২

এত পূজার সমারোহে
শঙ্খ সে কোথা?

কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক

তেমন করে দেবতা ডাকা
কাহার ক্ষমতা ?
বিবাহের এ আলোর রাশি,
কই নহবৎ শানাই বাঁশী,
আনন্দ গীত গন্ধ আলোর
কই সে একতা ?

৩

এমন সুধার মহোৎসবে,
চকোর না এলে,

মূল্য তাহার বুঝবে না কেউ,
যাবে বিফলে।
রত্ন মাণিক ছড়াছড়ি,
কই রে পাকা সে জহুরী ?
ঘ্রাণ যে আজি পায় নাক প্রাণ
গান না গাহিলে।

৪

মুকুল না এ—পদাবলী
মনোহরসাহী,
কোথায় রসিক-কণ্ঠ কোথা
শুনায় কে গাহি ?
মূকের মুখে ফুটায় ভাষা
ধন্য তাহার ভালবাসা,
কোথায় কোকিল—কবি সে তার
নেই যে তুলনা।

বর্ম্মার কথা

(অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।)

বর্ম্মানরা ঘরের বাইরে খুব পরিষ্কার ও সুন্দর। রেশম ও মণিমুক্তার, রংয়ের ঢেউ তুলিয়া তাহারা বর্ম্মার আকাশকে রঙীন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ঘরে তাহারা তত পরিষ্কার নয়। মেয়েরা যখন পথঘাটে চলাফেরা করেন,—চাই কি পুরুষের প্রায় সমস্ত কাজই করেন—তখন ঘরকন্নার লক্ষ্মীশ্রী সে দেশে যে আমাদের বাড়ীর মত থাকিতে পারে না ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মেয়েরা ঘর ধোয়া-মোছা, রান্নাবান্না লইয়া আছেন,

বাইরের জগৎকে তাঁহারা চেনেন না। বর্ম্মার মেয়েরা ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র। বাইরে তাঁহারা মুক্তা ছড়ান, ঘরে ঝিনুক জন্মে; বাহিরটা সুন্দর হয়, ভিতর-বাড়ীতে অনেক সময় আবর্জ্জনা জমে।

বিখ্যাত চিন-সঙ্ (বেতের ফাঁপা বল) খেলা বর্ম্মানদের জাতীয় খেলা। ইহা হাত ছাড়া অন্য অঙ্গ দিয়া খেলিতে হয়। যে বিখ্যাত খেলোয়াড় মঘ্-লা-প'র ছবি দেখিতেছ, ইনি একসঙ্গে ছয়টি চিন-সঙ্ বল লইয়া ওয়েম্ব্লী প্রদর্শনীতে খেলা দেখান। এ খেলা পুরুষেরা সকলেই খেলে। বর্ম্মানদের যেমন খেলায় মন, তেমনি গান-বাজনায়ও তাহারা প্রায় সকলেই উৎসাহী। বর্ম্মার সুন্দর 'পোয়ে' নাচ এবং দেশী বাজনা বাস্তবিকই একটা দেখিবার জিনিষ। প্রচুর আনন্দ বর্ম্মার লোকদের,—সে আনন্দ তাহাদের চেহারায়,পোষাকে,খেলায়, উৎসবে আর বিশেষ করিয়া তাহাদের গানে ও বাজনায় প্রকাশ পায়।

মঘ্-লা-প ওয়েম্ব্লীতে চিন সঙ্ খেলিতেছেন

বর্ম্মানরা যেমন সুন্দরকে ভালবাসে তেমনি সুন্দরের চেহারাও গড়ে ভিন্ন ভিন্ন কারুকলার ভিতর দিয়া। কাঠের কাজের কথা বলিয়াছি। বাঁশের উপর

প্রলেপ দিয়া Lacquerএর যে সব পাত্র প্রস্তুত হয়, তা জগতের সর্ব্বত্র আদৃত। চিত্রকলা প্রায় প্রত্যেক বর্ম্মানেরই কিছু না কিছু 'আসে,' তাই বাসন-আসন, ঝোলা-ঝুড়ি, পেট্‌রা-পট প্রভৃতিতে নানা সম্ভব অসম্ভব বিষয়ের ছবি আঁকা থাকে।

প্রকৃতি-রাণীর অজস্র দানে—পশ্চিম-দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে আরাকান ইয়োমা (পর্ব্বত-শ্রেণী) ও পূর্ব্বে সান উপত্যকা; পোপা পর্ব্বতে আগ্নেয়গিরি, ইরাবতীর পাহাড়ী পথে ভামো সহরের কাছে জলপ্রপাত, উত্তর ব্রহ্মের নোনা জমি, কাল'র দেবদারুবন, দক্ষিণ ব্রহ্মের ধানের ক্ষেত—বর্ম্মাকে ভারী চমৎকার করিয়া রাখিয়াছে। এই পাহাড় আর নদী দিয়া ভাগ করা দেশের নানা ভাগে নানা জাতি আছে। সাঁওতালদের মত অসভ্য কাচিন ও শান এবং আমাদের মত সভ্য বর্ম্মান ও কারেন একসাথে থাকায় গোটা বর্ম্মা দেশটায় নানা রকমের ভাষা ও নানা ধরণের পোষাক দেখিতে পাইবে। ধর্ম্মে অবশ্য বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধ কিন্তু জাতে ও ভাষায় তাহারা এক নয়।

রেঙ্গুন সহর সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। রেঙ্গুনের চারিধারে কয়েকটি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদ আছে। রেঙ্গুন সহরটা চারখানার গামছার মত সোজা সোজা রাস্তায় ভাগ করা। তেতালা চৌতালা কাঠের ও কতকগুলি ইটের বাড়ী, তা'তে না থাকে এমন জাত নাই। চীনা, ভারতের নানা প্রদেশের লোক, ইউরোপ ও আমেরিকার সবদেশের লোক, নানা বেশ, ভাষা ও ব্যবসা নিয়া রেঙ্গুনে যেন এক মানুষের চিড়িয়াখানা তৈয়ারী হইয়াছে। কলিকাতা বাংলার সহর বলিয়া চেনা যায়, কিন্তু রেঙ্গুনকে অনেক দেশের সহর বলিয়া ভুল হইতে পারে। মান্দ্রাজী কুরুঙ্গী রিক্সা টানে, চাটগাঁর মাঝি সাম্পান-নৌকা চালায়, চীনা মিস্ত্রী বাড়ী বানায়, হিন্দুস্থানী-পাঞ্জাবী ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর চালায়, ইউরোপীয় ব্যবসায়ী চাল, কেরোসিন-কাঠ জাহাজে করিয়া বিদেশে চালান দেয়।—আর বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী বাবুরা কেরাণীগিরি, মাষ্টারি ও ওকালতি করেন।

হাতী আমাদের দেশে সাজিয়া-গুজিয়া রাজা-নবাব নিয়া শোভাযাত্রায়

দেখা দেয় এবং বড় লোকেরা হাতীর পিঠে চড়িয়া বাঘ শিকার করেন, কিন্তু হাতী এখনও বর্ম্মার জঙ্গলে, কাঠের কারখানায় কাঠ টানিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে হাতীর কাজ যন্ত্র দিয়া করান যেমন সস্তা তেমনি সুবিধাজনক। কাজেই কয়েক বৎসর পরে এ দৃশ্য আর দেখা যাইবে না। ইনান্‌জঙ্, সিন্ধু প্রভৃতি উত্তর বর্ম্মার খনি হইতে তেল, মাটির নীচে বসান নলের ভিতর দিয়া সাড়ে তিনশ মাইল আসিয়া রেঙ্গুনের কাছে সিরিয়ামে এরোপ্লেনের তেল, মোটরের তেল, কেরোসিন, মোম প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়া দেশবিদেশে চালান হয়। মোগকে রুবি, নীলকান্তমণি প্রভৃতি তোলা হয়—তবে এখন আর এ ব্যবসায় লাভ নাই।

যদি তোমাদের নিয়া বৈঠক করিয়া 'মনসার ভাসান' গাইবার মত বর্ম্মার কথা, কথায়, ছবিতে দিনের পর দিন বলা যাইত তবেই বর্ম্মার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইত। সে যে এক মোহন, মধুর ইন্দ্রজালের দেশ! আশা করি তোমরা বড় হইয়া বর্ম্মার শুধু অন্তরের আনন্দ নয়, বাইরের রূপনয়—ভারতের সঙ্গে বর্ম্মার জ্ঞান ও কর্ম্মের দেনা-পাওনার ইতিহাস বাংলা ভাষাকে উপহার দিবে।

মুখচোরা

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্-এ)

ওকি! সন্তোষের আজ অত হাসির বহর কেন? তাও জাননা বুঝি? তাহাদের গোবরগণেশ জামাইবাবুটী এবার আচ্ছা নাকাল হইয়াছে। সন্তোষ আজ আর তাই কোন মতেই তাহার ফূর্ত্তিকে থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

তোমরা হয়তো এখানেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে, কেনরে বাপু, এমন কি নাকালটা হইল যে এত হাসি? সেই কথাই তো আজ তোমাদিগকে বলিব ঠিক করিয়াছি।

সন্তোষের জামাইবাবুটীর নাম সত্যেশ। বেচারার দোষের মধ্যে সে একটু লাজুক, আর একটু মুখচোরা! এটা যে ভয়ানক একটা দোষ, একথা অবশ্য আমি বলিতেছি না, কিন্তু এই দোষটার জন্য তাহাকে ছোট বেলা হইতে যে দুর্ভোগটা ভুগিয়া আসিতে হইতেছে, সেটাও কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত কম নয়। প্রথমেই ধর না কেন, তাহাকে হয়তো একটা নূতন লোকের সহিত আলাপ করিয়া আসিতে বলা হইল। তবেই হইয়াছে আর কি! সত্যেশের ঠিক মনে হইত, সকলে চক্রান্ত করিয়া বুঝি তাহাকে বাঘের খাঁচার মধ্যেই পাঠাইয়া দিল। এমনি মুখচোরা সে! তারপর স্কুলে পড়ার সময়কার কথাই ধর না কেন! এমন খাটিয়া খুটিয়া সে ক্লাশের পড়া তৈরী করিয়া যাইত, অথচ যদি কোন কারণে একটীবার ভড়্‌কাইয়া গেল, তাহা হইলেই দফা ঠাণ্ডা। কোন মতেই সে আর মুখ হইতে কথাটী পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারিত না। কাজেই বেচারীকে অনেক সময়, অকারণে সুড়্‌ সুড়্‌ করিয়া লাস্ট্‌ নামিয়া যাইতে হইত। এখন সত্যেশ বড় হইয়াছে, বি, এ ক্লাশে পড়ে, দুর্ভোগটাও তাহার তাই কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। কেননা কলেজেতো আর ওঠা নামা হয় না! স্বভাবটী কিন্তু তাহার তাই বলিয়া বদ্‌লাইয়াছে ভাবিও না। আগে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনিটীই আছে।

সেদিন কলেজ হইতে হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিতেই সত্যেশ দেখিল, সরদা' হইতে সন্তোষের মা চিঠি লিখিয়াছেন যে তাঁহার দাদা, অর্থাৎ কি না সত্যেশের মামাশ্বশুর কিছু দিন হইল কলিকাতায় বালীগঞ্জে গিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহাদের বাড়ীর কেহই তাহাকে দেখে নাই কিনা, তাই সত্যেশ যেন অতি অবশ্য তাঁহার বাড়ী একদিন বেড়াইতে যায়! চিঠি খানা পড়িয়াই সত্যেশের যেন কেমন কেমন করিতে লাগিল। তাইতো! ভাল এক ঝঞ্ঝাট আসিয়া জুটিল যাহোক্! কে এখন যায় বাপু নূতন লোকের সহিত আলাপ করিতে? একে নূতন লোক, তাহাতে আবার শ্বশুর বাড়ীর লোক। ব্যাপার খানা নিতান্তই সোজা কিনা!

সন্ধ্যার পর ময়দান হইতে বেড়াইয়া আসিয়া সত্যেশ দেখিল, বিপদটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সন্তোষের মামা নলিনী বাবু নিজেই তাহার হোষ্টেলে আসিয়াছিলেন, তাহার দেখা না পাওয়ায়, চাকরের কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া

গিয়াছেন ; তাহাতে লেখা আছে, সত্যেশ যেন তাহার সুবিধামত একদিন নিশ্চয় তাঁহার বাড়ীতে যায়। না গেলে তিনি আবার আসিবেন।

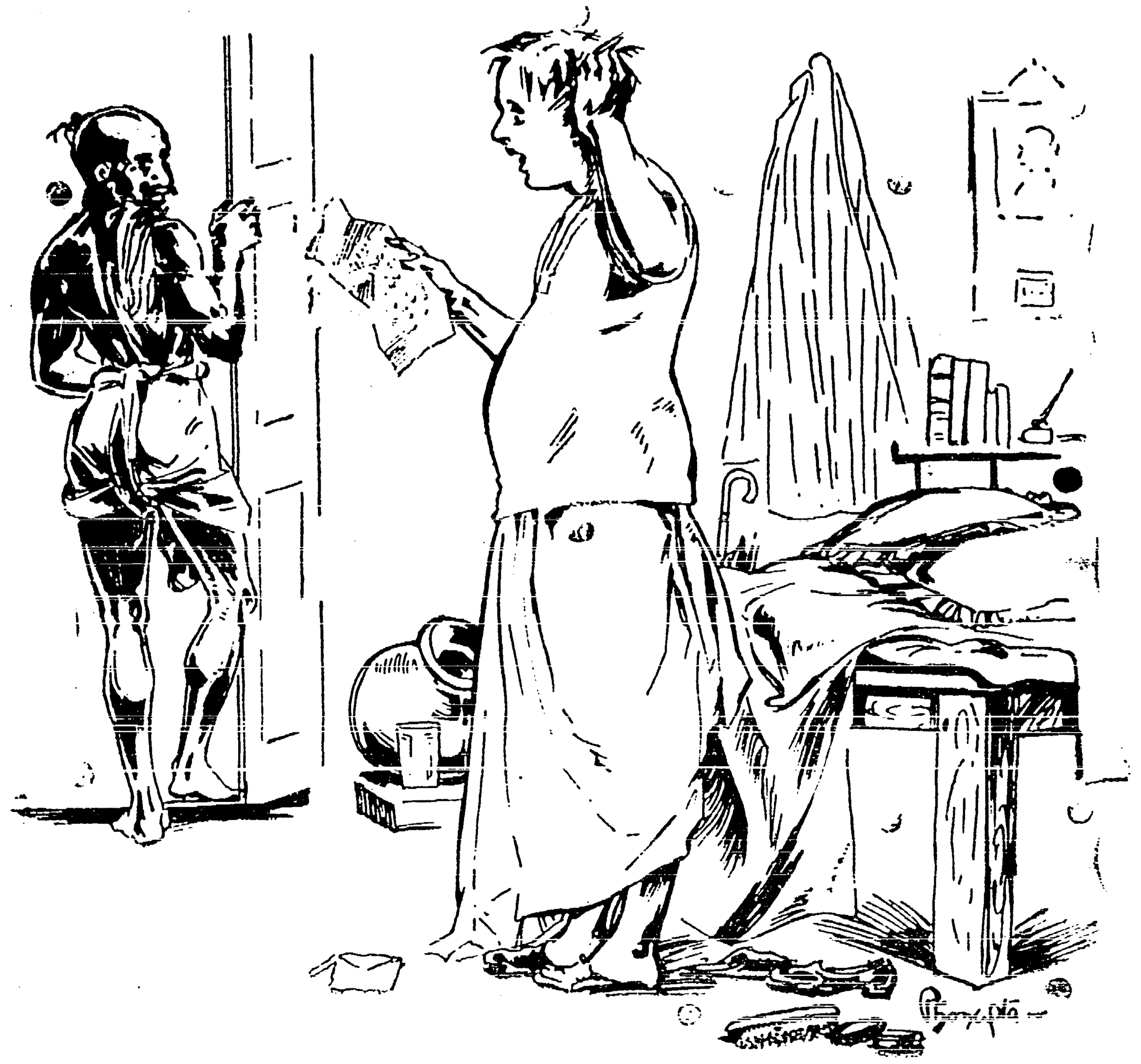

সত্যেশ দেখিল বিপদ্‌টা আরও বাড়িয়া গিয়াছে

সত্যেশের মনটা ভারী খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু না গেলেও আবার খারাপ দেখায় কিনা, তাই শেষটায় যাওয়াই ঠিক করিল।

বালীগঞ্জে আসিয়া বেচারা কিন্তু পড়িয়া গেল মহা মুস্কিলে। যে বাড়ীটা হওয়ার কথা, তাহার নম্বরের টিন খানা এমনি আব্‌ছা হইয়া গিয়াছে যে তাহা পড়া মানুষের কাজ নয়। দেখ দেখি, এমন সাজান গোছান কম্পাউণ্ড্‌ওয়ালা বাড়ীটা, নম্বরটা একটু পরিস্কার করিয়া লিখিতে কি হইয়াছিল ? সত্যেশ মহা ফাঁপরে পড়িল। তোমরা হইলে হয়তো সোজা ফটকের ভিতরে

ঢুকিয়া বাড়ীর নম্বরটা জিজ্ঞাসা করিতে। কিন্তু বেজায় মুখচোরা কিনা সে, কাজেই অতটা তাহার সাহসে কুলাইল না। কি জানি বাপু, যদি আর কাহারও বাড়ী হয়, তাহা হইলে বিষম লজ্জায় পড়িবে যে! বালীগঞ্জের রাস্তায় মানুষও বড় একটা থাকেনা যে তাহাদের কাছে গিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবে। আচ্ছা মুস্কিল! মিনিট চার পাঁচ ধরিয়া সে কেবল বাড়ীটার এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেই লাগিল। শেষে পকেটে হাত দিয়া দেখে নলিনীবাবুর চিঠিখানা সে হোষ্টেলেই ফেলিয়া আসিয়াছে। ভাবিল, কাল তো ছুটীই আছে, চিঠি খানার নম্বরটা ভাল করিয়া দেখিয়া কালই না হয় আর একবার আসা যাইবে, আজ থাক।

ফিরিবার সময় মনটা তাহার ভারী হাল্কা হইয়া গেল। ওঃ, কত বড় একটা বিপদ্ হইতে সে ছাড়া পাইয়াছে বলতো!

পরদিন সত্যেশ আবার বালীগঞ্জে গিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা গোটা দুই হইবে। এদিক্ ওদিক্ উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিল—সমস্ত বাড়ীখানা যেন একেবারে নিঝুম। বেচারা আবার মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল ; তাই তো, এই অসময়ে ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া হাঁক ডাক করাটা কেমন দেখায় ? তার চেয়ে, এই কাছেই তো ভবানীপুর, হিমাংশুদের বাড়ীতে গিয়াই একটু গল্প স্বল্প করিয়া আসা যাক্ না। তারপর, বিকালের দিক্ দিয়া আবার আসিলেই তো চলিবে। হ্যাঁ—সেই ঢের ভাল।

কিন্তু বিকালের দিক্ দিয়া বেচারার আর আসা ঘটিয়া উঠিল না, এমনই হিমাংশুদের বাড়ীতে গল্পে জমিয়া গেল সে।

(২)

রবিবার ভোর বেলা নলিনীবাবুর বাড়ীতে চায়ের বৈঠক বসিয়াছে। শচীন, সমীর, লীলা, বেলা প্রভৃতি মহা কলরব করিয়া আসরটাকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। মাঝখানে একটা গামলাতে করিয়া চা তৈরী হইতেছে, এবং মানুষে হাতা দিয়া যে রকম দুধ জ্বাল দেয় তাহাদের মা একটা বাটী দিয়া ঠিক তেমনিটি করিয়াই চায়ের সাথে চিনি মিশাইতেছেন। তাই বলিয়া ভাবিও না যে এ বাড়ীতে

টিপট্ নাই! টিপট্ আছে, তবে তাহাতে চা তৈরী হয় না, সুজি থাকে। নলিনী বাবুর স্ত্রী নাকি টিপটে চা তৈরী করিতে সুবিধা পান না। তা না হইলে শচীন তো

টি'পট আছে, তবে তাহাতে চা তৈরী হয় না, সুজি থাকে

চায়ের সকল রকম সরঞ্জামই কিনিয়া আনিয়াছিল। শুধু কি তাই? ছোট ছোট কাগজে চাল, ডাল, লঙ্কা, ফোড়ণ প্রভৃতি লিখিয়া ভাঁড়ার ঘরের প্রত্যেকটি টিনে ও কৌটায় সেগুলিকে সে লাগাইয়া পর্য্যন্ত দিয়াছিল। তখন কি সে জানে যে অমন একটা কাণ্ড ঘটিবে? কি কাণ্ড? সে এক মজার কথা। চায়ের লেবেল আঁটা জাগ্‌টাতে কখন যে কালোজিরা গিয়া ঢুকিয়াছে, এবং লবণ গিয়া যে কখন চিনির কৌটাটা দখল করিয়া বসিয়াছে তাহা কেহ জানিতেই পারে নাই। পরে যখন কালোজিরার চা লবণের সঙ্গে মিশিয়া টি পট্ হইতে সকলের কাপে পড়িল এবং প্রত্যেকে সেই চমৎকার জিনিষটা এক চুমুক খাইয়া দেখে যে সকলের মুখই প্যাঁচার মত হইয়া গিয়াছে (অবশ্য সত্য সত্যই প্যাঁচার মত হয় নাই, একটা উপমা দিলাম মাত্র) তখনই না ব্যাপারটা ধরা পড়ে! সেই হইতেই তো শচীনের মা তাহার সব ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিয়াছেন।

চা খাওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় ছেলেমেয়েদের বিমল কাকা ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। বয়সটা তাঁহার এমন কিছু বেশী নয়, এই বছর চব্বিশ পঁচিশ হইবে, কিন্তু চেহারা খানা তাঁহার যদি দেখিতে, তাহা হইলে নিশ্চয় মনে মনে ভাবিতে যে শর্ম্মারাম মহাভারতের ভীমসেনেরই ছোট ভাই। বিমল কাকা পৃথিবীতে জানিতেন মাত্র দুইটী জিনিষ—খাওয়া আর কুস্তি-কসরৎ। আধমণ ওজনের গোটাদুই মুগুর লইয়া যখন তিনি ভাজিতেন, তখন তাঁহার মুখ খানা দেখিয়া মনে হইত বুঝি তিনি ফলার করিতেছেন। ফলার করার সময়ও ঠিক সেই অবস্থা! ছিয়ানব্বুই খানা লুচি মানুষকে কখনো খাইতে শুনিয়াছ? বিমল কাকার কাছে কিন্তু তাহা নস্য বলিলেই চলে! সব রকমেই বৃকোদরের ছোট ভাই কি না! কোন একটা খাবার দেখিলেই তাঁহার মনে দারুণ ভাবের উদয় হইত, আরও পাঁচ রকম খাবারের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিয়া পড়িত। চায়ের কাপে চুমুক দিয়াই তিনি বলিলেন "বৌদি, আজ দ্বিজু বাবু আস্‌ছেন, তোফা রুই মাছের কালিয়া লাগিয়ে দেন তো—বেশ পাকা গোছের রুই!"

দ্বিজু বাবু, অর্থাৎ কিনা সন্তোষের বাবা দ্বিজেন বাবু, কি একটা জরুরী কাজে হঠাৎ আজ কলিকাতায় আসিবেন বলিয়া টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

তাঁহার বৌদিদি বলিলেন "কালিয়া তো খাবে, পরশু টালিগঞ্জে কি রকম ডাকাতি হয়েছে সে খবর রাখ? হ্যাঁ—এই ঘরের পাশের টালিগঞ্জেই। তিন চার দিন ধরে নাকি ডাকাতরা বাড়ীটার আশে পাশে ঘুরে সব সন্ধান দেখে নিয়েছিল। তারা সব্বাই নাকি আবার ভদ্রলোকের ছেলে! শচীন, পড় তো আবার কাগজ খানা!"

শচীন একখানা বাংলা খবরের কাগজ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল "গত পরশ্ব টালিগঞ্জ অঞ্চলে এক ধনী গৃহস্থের বাটীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে! প্রকাশ, ঘটনার পূর্ব্বে তিন চার দিন ধরিয়া তাহারা বাড়ীর চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। আরও প্রকাশ, অধিকাংশ ডাকাতই নাকি ভদ্রলোকের ছেলে।"

ঘটনাটা শুনিয়াই বিমল কাকা ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া গম্ভীর মুখে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেলেন, "হবে না, যত সব ভেতো বাঙ্গালীর দল, গায়ে নেই এক কড়ার জোর।"

(৩)

বিমলকাকা ও রকম গম্ভীর হইয়া কেন উঠিয়া গেলেন বলতো? সত্যেশ যে এই দুই দিন ধরিয়া তাঁহাদের বাড়ীর সামনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে সেটা তিনি ঠিক টের পাইয়াছেন। কিন্তু তখন তাঁহার মনে কোন রকম সন্দেহই হয় নাই। ভাবিয়াছেন, এমনি সাধারণ লোকই বুঝি। কিন্তু আজ ভোরবেলা খবরের কাগজের ওই ব্যাপারটা শুনিয়া তিনি ঠিক বুঝিয়া ফেলিলেন যে সত্যেশ সেই ডাকাত দলেরই লোক। তাহা না হইলে, কথা নাই, বার্ত্তা নাই, দিনরাত লোকের বাড়ীর সামনে ঘোরা কেন রে বাপু? নিশ্চয় সে বাড়ীটার খুঁটিনাটি সব দেখিয়া লইতেছে। আচ্ছা, আর একবার আসিলেই বাছাধন মজাটা টের পাইবেন। এ শর্ম্মার নাম বিমলকাকা, ঘুঁষির চোটে দেওয়ালকে দেওয়ালই ফাটাইয়া দেন, একটা ডাকাতের মাথা-ফাটান, কিই বা এমন শক্ত কাজ? হায়রে, তখন যদি কেহ বলিয়া দিত যে ডাকাতি করা সত্যেশের মৎলব নয়, শুধু মুখচোরা বলিয়াই সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে ওরকম করিতেছে!

বেলা গোটা তিনেকের সময় সত্যেশ আবার আসিয়া উপস্থিত। মিনিট দুই এদিক্ ওদিক্ করিয়া শেষে সাহস করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বেচারা কিন্তু দেখিতেও পায় নাই, কখন কোন্ দিক্ দিয়া বিমলকাকা আসিয়া তাহার পেছনে দাঁড়াইয়াছেন। বিমলকাকা একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া শেষে সত্যেশের ঘাড়ে হাত দিলেন। ফিরিয়া সত্যেশ দেখে একটী ছোট খাট দৈত্য চোখ দুটাকে আগুনের গোলার মত লাল করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। বেচারা বেজায় ভড়্‌কাইয়া গেল। বিমলকাকা মনে করিলেন, ডাকাত এবার ধরা পড়িয়া গিয়া বিষম ভয় পাইয়াছে। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া, সত্যেশের ঘাড় ধরিয়া একেবারে শূন্যে তুলিলেন এবং সঙ্গে

সঙ্গেই ভীষণ জোরে মাটীতে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিলেন। সত্যেশের মনে হইল, তাহার সমস্ত শরীরটা বুঝি একেবারে ছাতু হইয়া গেল! বেচারা কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শত চেষ্টাতেও মুখ দিয়া তাহার কোন কথাই বাহির হইল না, কেবল সে "আ—মি, আ—মি" করিতে লাগিল।

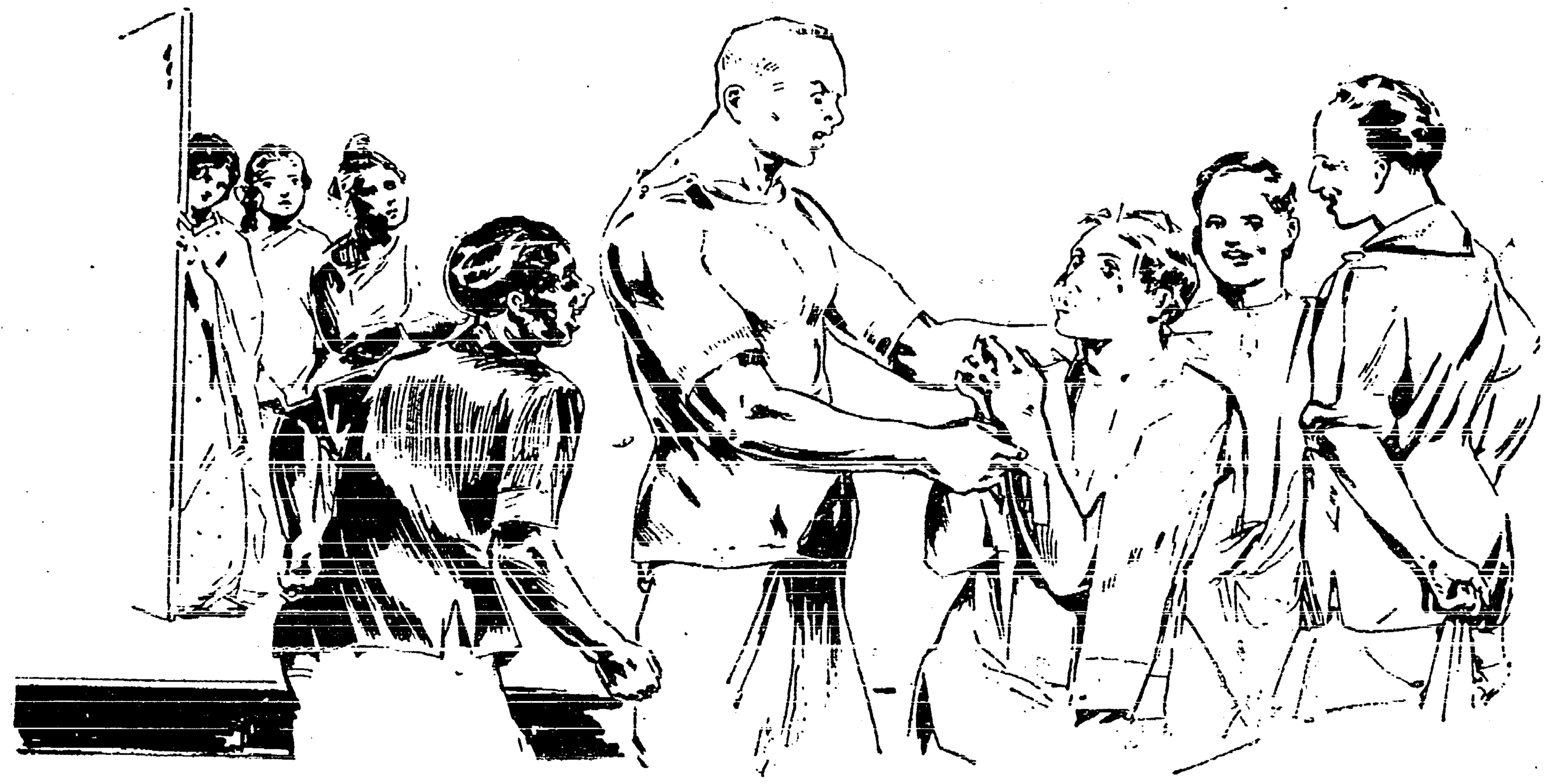

বলতো, বাপু, চাকরের ঘরের দিকে যাচ্ছিলে কেন?

এদিকে একটা গোলমাল পড়িয়া যাইতেই, বাড়ীর চাকর-ঠাকুর ছেলে বুড়া, শচীন সমীর, যে যেখানে ছিল সব বাহিরে ছুটিয়া আসিল। বিমলকাকা তখন সত্যেশকে কেবল আছাড়ের পর আছাড়ই দিতেছেন। শচীন আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি বিমলকাকা, কি হয়েছে?"

বিমলকাকা বলিলেন "টালিগঞ্জের সেই ডাকাত! এবার বালীগঞ্জে কেরামতি দেখাতে এসেছিলেন! বাছা তো জানেন না যে এখানে বিমলকাকার বাস!"

সত্যেশ বুঝাইয়া বলিতে যাইতেছিল সে ডাকাত নয়, জামাই, কিন্তু বিমলকাকা তাহাকে বিষম এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, "খবরদার, একটী বাজে কথা বলেছ কি দাঁতগুলি সব উপ্‌ড়ে ফেলব। এখন আমি যা বলি, তার ঠিক ঠিক জবাব দাও,

মিছে কথা বল্লে একেবারে পুঁতে ফেলবো। একটী মিছে কথা নয়—একটী বাজে কথা নয়! আচ্ছা, বলতো বাপু, চাকরের ঘরের দিকে যাচ্ছিলে কেন?

"আমি—আমি—ডাক্ দিতে…"

"ডাকাতিতে, হুঁ সে ঢের আগেই বুঝেছি! হাতের ও কাগজখানায় কি?"

"বাড়ীর ঠিকা—ঠিকা—ঠিকানা!"

"হুঁ, সঙ্গে সঙ্গে একখানা ম্যাপ্ও করে নিয়েছ বোধ হয়! কাকে দেখাবে এগুলো?"

"আমি—আমি—সরদা' থেকে…"

"সর্দ্দারকে? বটে?" বলিয়া বিমলকাকা সত্যেশের হাত ধরিয়া আবার এক বিষম ঝাঁকুনি দিলেন।

মুখবিকৃতি করিয়া ব্যথাটাকে হজম করিয়া সে কোনমতে বলিল "আমি—আমি—সত্যে—।" "শ" কাথাটা বেচারা আর উচ্চারণই করিতে পারিল না।

বিমলকাকা এবার রাগে একেবারে পাগলের মত হইয়া গেলেন। বলিলেন "তুমি সত্যে? তুমি মিথ্যায়, তুমি জোচ্চুরিতে, তুমি ধাপ্পাবাজীতে, তুমি ডাকাতিতে—আর একটু পরেই তুমি থাক্‌বে হাজতে!"

আর কোন কথা না বলিয়া তিনি তাহাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া সটান বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একেবারে দড়ি দিয়া বাঁধিতে স্বুরু করিয়া দিলেন। সত্যেশ আবার জান কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে এমনি একটী চড় পড়িল যে, কথা বলিবে কি, তাহার মনে হইল এখনি সে বুঝি মাথা ঘুরিয়া ফিট্ হইয়া পড়িয়া যাইবে। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া লীলা, বেলা ও তাহাদের মা ব্যাপারটা দেখিতেছিলেন আর তাহাদের কাঁপুনি আসিতেছিল। মা বলিতেছিলেন "ছি, ছি, ছি, ভদ্রলোকের ছেলে, এমন সুন্দর চেহারা, তার কিনা এই কাজ!"

এমন সময় বাহিরে একখানা গাড়ী থামার শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই বৈঠকখানা ঘরে সোজা আসিয়া ঢুকিলেন দ্বিজেনবাবু। ঘরে ঢুকিয়া তিনি তো

আর নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না! বার দুই চোখ কচ্‌লাইয়া যখন দেখিলেন ব্যাপারটা সত্যিই বটে, তখন তিনি খালি বলিলেন "এ কি সত্যেশ, এ কি কাণ্ড! সত্যেশের মনে হইল বুঝি সে এতগুলি লোকের সামনে কাঁদিয়াই ফেলে।

তারপর কি কাণ্ড হইল বলতো? বাড়ীময় একটা সোর গোল পড়িয়া গেল, জল, পাখা লইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। আর বিমলকাকা সত্যেশের পিঠে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন।

এইবার বুঝিলে সন্তোষ অত হাসিতেছিল কেন? আজকার চিঠিতে বেলা গোবরগণেশ সত্যেশের জাড়িজুড়ী সব ফাঁস করিয়া দিয়াছে। সন্তোষ ঠিক করিয়াছে এই পয়লা আষাঢ় সত্যেশের জন্মদিনে তাহাকে একখানা পার্শী শাড়ী উপহার দিবে। তাহার মত মুখচোরা লোকের নাকি মেয়েদের মত শাড়ী পরাই উচিত।

চাঁদের আবাহন

(শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য)

নীল্ আকাশের কোল্ হ'তে আয় নামিয়া আয় না চাঁদ
কান্না তুলে' তোর তরে ছাখ্ ধরেছে বায়না 'চাঁদ'!
আস্‌বি না তুই আস্‌বি না?
চাঁদ্ কপালে মণির আমার টুক্‌কু দিয়ে হাস্‌বি না?

গাঙের নীরে রঙ্ গুলি ঢেউ ভাঙা রূপ্ রাঙিমায়,
নীলের কোলের রূপশিশু আয় আমাদের আঙিনায়
এই কপালে টুক্‌কু দে।
অরূপ-রতন মাণিকুটির এ হরিয়া সব দুঃখু নে!

নীলের বুকের সোণার চাঁদ, তোর কি সোণার বরণ টুক্ ;
আমার বুকেও সোণার চাঁদ, কর্‌রে তাহার হরণ দুখ্
সোণায় সোণা যা মিশে,—
মুগ্ধ সে-রূপ পাশটিতে দাঁড়িয়ে দেখি আমি সে !

আয় নামিয়া আয় রে চাঁদ, এই আঙিনায় আয় না রে ?
চাঁদের চোখের ঝর্‌ণা জল্ রচিবে তোর আয়না রে !
গাই বিয়ুলে দুধ্ দোব ;
ধান ভানিলে তোর লাগি চিকণ নরম ক্ষুদ্ থোব ?

মৃদুল হাওয়ায় ফুল দোদুল্ রঙ্ বেরঙের—বসন্ত'র
তার শোভাতে রঙ্ মায়ার জোছনা-রঙীন্ বসন তোর
শিশির ভেজা সবুজ ঘাস
কর্‌বে রচন্ শয়নটী তোর ! আয় পূরা এ অবুঝ্ আশ !

নীল্ আকাশের কোল হ'তে আয় নামিয়া আয় না চাঁদ !
কান্না তুলে তোর তরে' ছাখ্ ধরেছে বায়না 'চাঁদ' !
আস্‌বি না তুই আস্‌বি না ?
চাঁদ্-কপালে কোল-মাণিকের টুক্কু দিয়ে হাস্‌বি না ?

পার্লামেণ্টের কথা

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ গিয়া একদিন বিলাতের লণ্ডন সহরটায় উপস্থিত হও, তাহা হইলে টেম্‌স্ নদীর ধারে পরের পৃষ্ঠার ঐ বাড়ীটা দেখিতে পাইবে বাড়ীখানার উপর নজর পড়িতেই কিন্তু তোমার তাক্ লাগিয়া যাইবে, সামনে যাহাকে পাও, তাহাকে গিয়াই হয়তো জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে (ধরিয়া লওয়া

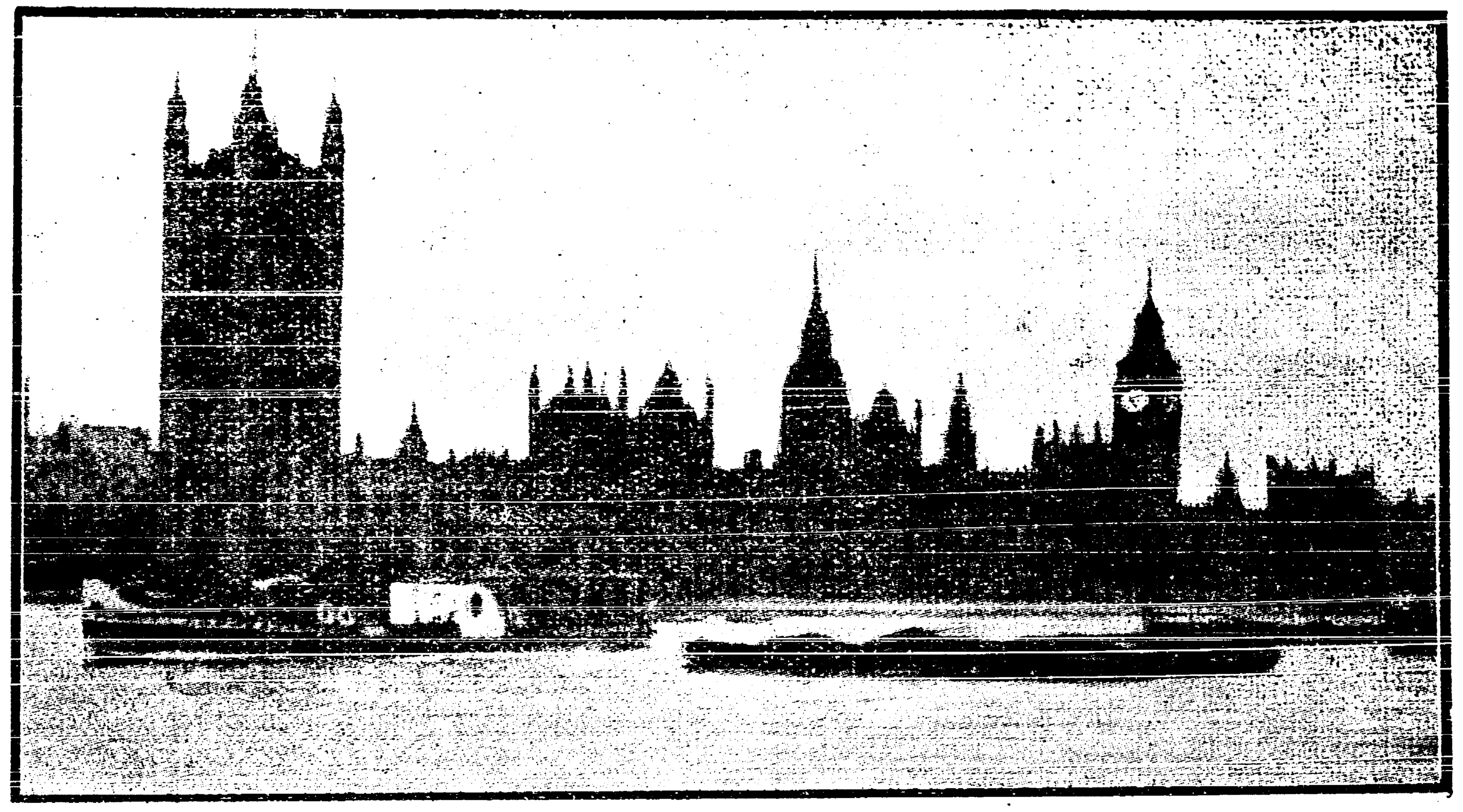

টেম্‌স্ নদীর ধারে পার্লামেণ্টের বাড়ী

হইল যেন তুমি ইংরাজীতে কথা বলিতে পার) "হ্যাঁগা সাহেব, তোমাদের ঐ বড় বাড়ীটায় কি হয় ?" সাহেব তোমার দিকে মিনিট খানেক তাকাইয়া বলিবে "তুমি এখানে নূতন আসিয়াছ বুঝি ? এটা যে আমাদের পার্লামেণ্ট !" একটু অপ্রস্তুত হইয়া তুমি তখন বলিবে "ওঃ, এইটাই পার্লামেণ্ট ?"

বাস্তবিকই 'পার্লামেণ্ট' কথাটা শোন নাই একথা বলিলে তোমরা হয়তো মনে মনে রাগই বা করিবে, কিন্তু যদি একটু ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, আচ্ছা বলতো পার্লামেণ্টের সাথে বিলাত দেশটার কি সম্পর্ক, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটা আর রাগের কথা থাকিবে না, দস্তুরমত ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইবে। নয় কি ?

সম্পর্কটা কিন্তু খুবই ঘনিষ্ঠ। আর তা ছাড়া, পার্লামেণ্টের সাথে সম্পর্কটা কি শুধু বিলাতেরই, আমাদের দেশের সাথে কি তার কোন সম্পর্কই

নাই ? আছে। শুধু 'আছে' বলিলেও খুব কমই বলা হইল ; আসলে আমাদের দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তাই হইল এই পার্লামেন্টের লোকেরা।

তোমাদের যদি গোড়াতেই জিজ্ঞাসা করি—বলতো, ইংল্যাণ্ডের রাজ্যশাসন করেন কে ? তোমরা অমনি উত্তর দিবে "কেন, সেখানকার রাজা—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ !" উত্তরটা কিন্তু ভুল হইল। রাজা সেখানে একজন নামে আছেন বটে, কিন্তু রাজ্যশাসন তিনি করেন না। সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন সে দেশের লোকেদের হাতে। যত কিছু কাজ আছে—তা সে আইন কানুন তৈরি করাই বল, চোর ডাকাতদের বিচার করা কিম্বা তাদের সাজা দেওয়াই বল, আর অন্য কোন দেশের সহিত লড়াই করার কথাই বল—সমস্তই করে সে দেশের লোকেরা। রাজা শুধু দূরে দাঁড়াইয়া দেখেন, কোন রকম ভুলচুক্ হইলে পর্য্যন্ত ওজর আপত্তি করিতে পারেন না।

দেশের লোকেরাই রাজ্যশাসন করে কথাটাতো বলিলাম, কিন্তু আসলে কাজটা চলে কি করিয়া ? ইংল্যাণ্ড্ দেশটাতো আর ছোট্ট একরত্তি নয়, যে যেখানে যে আছে রোজ আসিয়া জড় হইবে রাজ্যশাসন করিতে ! তাহা হইলেই হইয়াছিল আর কি ! প্রথমতঃ প্রায় চার কোটী লোক আসিয়া জুটিতে পারে এমন একখানা ঘর তো দূরের কথা, সহরও কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ অতগুলি লোক যে একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে পারে, এ কথা কেউ বলিলে অমনি বুঝিতে হইবে, সে লোকটা পাগল। তা হইলে কি করা হয় ? যে কাজটা করা হয়, সেটা কিন্তু বিশেষ কঠিন নয়। দেশের লোকদের বলা হয় "সকলে মিলিয়া হৈ চৈ করিলে তো সব কাজই নষ্ট হইয়া যাইবে ; তার চেয়ে বরং তোমাদের পছন্দ মত জন কয়েক লোক তোমরাই বাছিয়া দাও না, তারাই রাজ্যশাসন করুক ! যদি এমনই দেখ যে তোমরা যাহাদের ভাল লোক বলিয়া রাজ্যশাসন করিবার জন্য বাছিয়া দিলে, তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, বেশ, তাহাদের সরাইয়া সে-জায়গায় আবার নূতন করিয়া লোক বাছিয়া দাও,—ব্যস্ সব গণ্ডগোল মিটিয়া গেল। কয়েক বছর বাদে বাদেই তোমাদের এই রকম নূতন করিয়া লোক বাছিয়া দিবার অধিকার দেওয়া রহিল।

যাহাদের এই রকম করিয়া বাছিয়া দেওয়া হইল, তাহারাই হইল পার্লামেন্টের সভ্য, আর এই পার্লামেন্টের সভ্যরাই হইল দেশের কর্ত্তা।

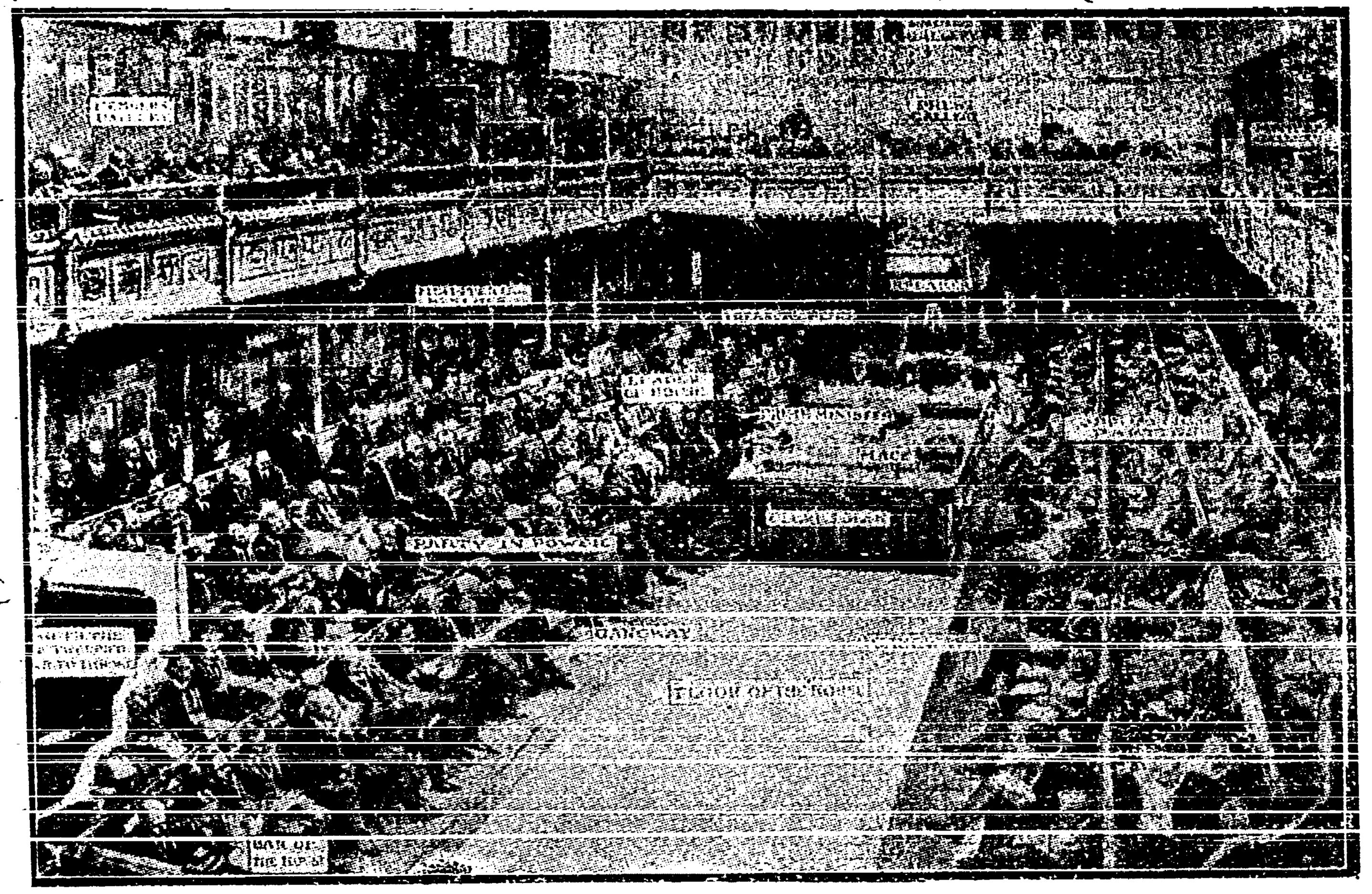

পার্লামেন্টের ভিতরে সভ্যেরা রাজকার্য্য আলোচনা করিতেছেন

পার্লামেন্টের এই সভ্য বাছাই করাকে বলা হয় "নির্ব্বাচন।" আমাদের সমস্ত বাংলা দেশটা যেমন সবসমেত সাতাশটা জেলায় ভাগ করা, ইংল্যাণ্ডেও ঠিক তেমনই অনেকগুলি ছোট ছোট জেলা আছে। ঠিক করা আছে, অমুক জেলা হইতে অতজন লোক বাছাই হইবে, আর বাছাই করিবে ঠিক সেই জেলারই লোক, অন্য কোন জেলার লোক নয়। তারপর যে ব্যাপারটা হয়, তা অনেকটা তোমাদের ক্লাশের 'মণিটার' বা ক্যাপ্টেন ঠিক্ করার মত। ধর, একটা জেলার নাম আছে ল্যাঙ্কাসায়ার্। হয় তো ঠিক আছে জেলাটা হইতে পাঁচজন পার্লামেন্টের সভ্য বাছিয়া দিতে হইবে। দেখা গেল, জন দশেক লোক আসিয়া উপস্থিত, প্রত্যেকেরই মনে মনে ইচ্ছাটা যে তাহাকেই সকলে বাছিয়া পাঠায়। তখন জেলার সমস্ত লোকের (অবশ্য ছেলেপিলেদের বাদ দিয়া) মত বা ভোট্ লওয়া হইল।

যে পাঁচজন লোকের পক্ষে বেশীর ভাগ লোক ভোট দিল, ঠিক হইল তাহারাই হইবে পার্লামেণ্টের সভ্য। পার্লামেণ্টে পাঠাইবার আগে সকলে তাহাদিগকে বলিয়া দিল—"দেখ বাপু, তোমাদের আমরা কি জন্য বাছিয়া পাঠাইতেছি জান? আমাদের বিশ্বাস, আমরা যেমনটী চাই, ঠিক তেমনটী করিয়াই তোমরা কাজকর্ম্ম করিবে। একথা তোমরা মনে রাখিও। যদি দেখি, ওখানে গিয়া তোমরা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছ, তবে কিন্তু, ভবিষ্যতে আর তোমাদের পাঠাইতেছি না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশ সম্‌ঝাইয়া চলিও।"

বুঝিলে এবার কি করিয়া দেশের লোক নিজেরাই রাজ্য চালায়? হাতে কলমে তাহারা নিজে বড় একটা কিছু করে না, সবই করে তাহাদের বাছা লোকেরা অর্থাৎ পার্লামেণ্টের সভ্যেরা। তাহারা শুধু তাহাদের বাছা প্রতিনিধিদের উপর কড়া নজর রাখে—দেখে তাহাদের কাজ ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে। মন্দ হইলেই মুস্কিল—সভ্যদের আর দ্বিতীয় বারটী পার্লামেণ্টে আসার সম্ভাবনা থাকিবে না।

এবার আর একটা কথা। পার্লামেণ্টের সভ্যদের সংখ্যা একেবারে নিতান্ত দুই এক জন মনে করিও না। সংখ্যায় তাহারা কয়েক শো। রাজ্যশাসনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজ যদি অতগুলি লোককে রোজ একত্র হইয়া করিতে হইত, ব্যাপারটা তবে কিন্তু নিতান্ত সোজা হইত না। একটা মস্ত হট্টগোল পড়িয়া যাইত, আর সেই হট্টগোলে যাইত সমস্ত কাজ ভণ্ডুল হইয়া। কাজেই সব চেয়ে যে কাজটা দরকারী, কেবল সেই কাজটাই পার্লামেণ্টের লোকেরা নিজেদের হাতে রাখিয়াছে। কি সে কাজটা বল দেখি? সেটা হইতেছে দেশের জন্য আইন কানুন তৈরী করা। আইনের ভাল মন্দের উপরই রাজ্যশাসনের ভাল মন্দ নির্ভর করে কিনা! সে কাজটা তাই সমস্ত সভ্যেরা নিজেরাই একত্র হইয়া সমাধা করে। তা' ছাড়া টাকাকড়ি কিভাবে খরচপত্র করা হইবে, সেটাও তাহারাই ঠিক করিয়া দেয়। পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্য হইতে অল্প কয়েক জনকে—এই ধর, বিশ পঁচিশ জনকে—বাছিয়া লইয়া একটা ছোট্ট সমিতি

তৈরি করা হয়, তাহাকে বলে ক্যাবিনেট্ বা মন্ত্রিসভা। আইন কানুন আর টাকাকড়ি ছাড়া আর যত কিছু কাজ, তা প্রায় সমস্তই করে এই মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট্।

ক্যাবিনেটের সভ্যদের কে বাছাই করে এইবার তোমাদের সেইকথা বলিব। সেটা বুঝাইতে হইলে একটু অন্য কথা পাড়িতে হইবে।

ইংল্যাণ্ডে তিনটা বড় বড় দল আছে। ইহাদের একটার নাম "কন্‌জার ভেটিব্" দল, একটার নাম "লেবার" দল, আর একটার নাম "লিবারেল্" দল। বিলাতের প্রত্যেক জেলায় জেলায়, এই তিনটা দলের লোকজন আছে। পাঁচ বছর বাদে বাদে যখন পার্লামেণ্টের সভ্য বাছাই বা 'নির্ব্বাচন' হয় তখন এই দলগুলি কি করে জান? প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বলিয়া বেড়ায় "মশায়রা আমাদের দলের লোকদের আপনারা বাছাই করিয়া পার্লামেণ্টে পাঠান; দেখিবেন, তাহারা আপনাদের কত সুখে রাখে। আপনারা যেমনটি চান, ঠিক তেমনটি করিয়া তারা দেশ শাসন করিবে। ও দুটা দল কি আবার একটা দল? ওদের দ্বারা কোন উপকার আশা করিবেন না! দোহাই মশায়রা আমাদের কথাটা রাখিবেন।" তারপর নির্ব্বাচন হইয়া গেলে হয়তো দেখা গেল পার্লামেণ্টের মোট ৬১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৪০০ জনকেই লোকেরা বাছিয়াছে কন্‌জারভেটিব দল হইতে! দেশের রাজা তখন কন্‌জারভেটিব দলের নেতাকে ডাকিয়া বলেন—"লোকে দেখিতেছি আপনার দলকেই ভারী পছন্দ করিতেছে। বেশ আপনিই আপনার পছন্দ মত 'ক্যাবিনেট্' তৈরী করিয়া রাজ্য শাসনের ভার নিন্।" কন্‌জারভেটিব্ দলের নেতা (ধরা হইল, যেন তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য হইয়াছেন) তখন পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্য হইতে তাঁহার নিজের দলের জন কুড়ি নামজাদা লোককে বাছিয়া লইয়া একটা ক্যাবিনেট্ গঠন করেন। ক্যাবিনেটের মধ্যে যাহাদের লওয়া হইবে তাহাদের সকলকেই বলা হইবে মন্ত্রী, আর তাহাদের নেতাটীকে বলা হইবে প্রধান মন্ত্রী। তারপর এই ক্যাবিনেট্ বা মন্ত্রি-সভাই দেশটাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিবে।

মন্ত্রি-সভা দেশটাকে শাসন করিবে বলিলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যেন তোমরা মনে করিয়া বসিও না যে মন্ত্রি-সভা পার্লামেণ্টেরও উপরে। তা নয়,

পার্লামেণ্ট সকলের উপরে। পার্লামেণ্ট (অর্থাৎ কিনা পালামেণ্টের বেশীর ভাগ সভ্য) ইচ্ছা করিলে, যখন খুসি মন্ত্রি-সভাকে তাহাদের কাজ হইতে বরখাস্ত করিতে পারে। কাজেই মন্ত্রি-সভা কখনো ভুলিয়াও পার্লামেণ্টকে চটায় না, সর্ব্বদা চেষ্টা করে কিসে পার্লামেণ্ট তাহাদের উপর খুসি থাকিবে। যদি কোন কারণে একবার পার্লামেণ্ট মন্ত্রি-সভার কোন কাজের নিন্দা করিয়া বলিয়া বসে "এঃ, তোমরা একেবারে অকর্ম্মণ্য" তাহা হইলেই দফা সারা! মন্ত্রিসভাকে মুখ চূণ করিয়া বিদায় লইতে হইবে। তারপর পুরান পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া পার্লামেণ্টের জন্য লোক বাছাই হইবে। ক্বচিৎ কখনো আবার সেই সভ্যরাই থাকে—অন্য আর একজন নেতা নূতন করিয়া মন্ত্রি-সভা তৈরি করেন।

দেখিলে ব্যাপারটা কেমন মজার? আসলে রাজ্য শাসন করিতেছে মন্ত্রি-সভা; পার্লামেণ্ট তাহার উপর কড়া নজর রাখিয়া দেখিতেছে, শাসনটা ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে। আবার পার্লামেণ্টের উপর নজর রাখিতেছে দেশের লোকেরা। ভারী মজার ব্যাপার নয় কি?

পার্লামেণ্টের দুইটা ভাগ আছে। একটার নাম হাউস্-অব-কমন্স্, আর একটার নাম হাউস্-অব-লর্ড্স্। এই দুইটী হাউস্কে একত্রে বলে পার্লামেণ্ট। আগে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে পার্লামেণ্টের সমস্ত সভ্যদেরই দেশের লোকেরা বাছিয়া দেয়। দেশের লোকেরা কিন্তু বাছে শুধু হাউস্-অব-কমন্সের সভ্যদের। হাউস্-অব-লর্ডসের সভ্যরা একবার পার্লামেণ্টে ঢুকিলে, যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন আর সেখান হইতে নড়ে না। বিলাতের যত লর্ড আছে সকলেই এই হাউস্-অব-লর্ড্সের সভ্য। হাউস্-অব-লর্ড্সের ক্ষমতা কিন্তু হাউস্-অব-কমন্সের তুলনায় কিছুই নয়। পার্লামেণ্ট বলিতে আমরা বুঝি সাধারণতঃ হাউস্-অব-কমন্সকেই। হাউস্-অব-কমন্সের মর্জ্জিকেই পার্লামেণ্টের মর্জ্জি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

তোমাদের হয় তো ধারণা যে আমাদের ভারতবর্ষের কর্ত্তা হইতেছেন বড়লাট। আসলে কিন্তু বড়লাটকে পার্লামেণ্টের সমস্ত হুকুম মানিয়া চলিতে হয়! কাজেই দেখিতেছ, পার্লামেণ্ট শুধু বিলাতেরই কর্ত্তা নয়, আমাদের দেশেরও কর্ত্তা।

সে কালের কথা *

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

সে অনেক কাল আগের কথা।

তখন সবই ছিল আশ্চর্য্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য্য উঠ্‌ত আর এমন মজা যে ঠিক রাত হবার আগেই সূর্য্য অস্ত যেত। দিনের বেলা তখন আলো থাকত আর রাত্তিরে হ'ত অন্ধকার।

পৃথিবীই ছিল তখন কি সুন্দর। মাটিতে নরম সবুজ ঘাস! হরেক রকম গাছে হরেক রকম রঙের ফুল আর রাত্তির বেলা আকাশে হাজার হাজার তারা—সে দেখতেই ছিল চমৎকার!

পাখীই ছিল তখন কত রকম। এক রকম পাখী ছিল তার নাম কাক। মিস্‌কালো অন্ধকারের মত তার রঙ্। আর তার গলার স্বর!—কেউ কেউ বলে তার গলার স্বর নাকি ভাল ছিল না। আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। যে কোকিল আজকাল আখছার আমাদের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তারি যদি স্বর এত ভাল হয় না জানি কাকের স্বর কি মিষ্টি ছিল! আর এই কোকিল নাকি সেই কাকেদের বাসাতেই গলা সাধ্‌তে শিখ্‌ত। সে কাক এখন আর পাওয়া যায় না, কেউ কেউ বলে উত্তর মেরুতে পৃথিবীর যে সব চেয়ে বড় চিড়িয়াখানা আছে সেখানে নাকি একটী কাক এখনও আছে। তার জোড়াটী মরে যাওয়ায় সেটিও নাকি ভারী মনের কষ্টে আছে—বেশী দিন আর বাঁচবে না। আর এক রকম পাখী ছিল তার নাম চড়ুই। সে পাখী লোকের ঘরে দোরে কড়িকাঠের ফাটলে বাসা বাঁধতো। ক্ষুদে ক্ষুদে পাখীগুলি নাকি মানুষের বাসের কাছে নইলে থাকত না।* মানুষের ফেলা ছড়ানো ক্ষুদ কুঁড়ো খেয়েই তারা থাকত।

* এখন হইতে কয়েক হাজার বছর পরের ছেলেদের উপযুক্ত একটা মনগড়া কাহিনী—সঃ

তোমরা ঘোড়া কেউ কেউ বোধ হয় দেখেছ। সে ঘোড়া তখন পথে ঘাটে গাড়ী টেনে লোক বয়ে বেড়াত। কুকুর ত তখন যেখানে সেখানে এখনকার চিতাবাঘের মত সস্তা ছিল। এখন যেমন লোকে চিতাবাঘ পোষে তখন তেমনি কুকুর পুষ্‌ত। আর এক রকম জানোয়ার ছিল—তার নাম বেড়াল। সে বেড়ালের কথা আমরা বেশী কিছু জানি না। সেকালের লোকেরা বেড়াল সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখে যায়নি। একটী বহু পুরাণো সেকালের পুঁথিতে বেড়ালকে বাঘের মাসী বলা হয়েছে। তাতে মনে হয় বেড়াল খুব প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। কিন্তু এতবড় জানোয়ার লোকে বাড়ীতে কি করে পুষ্‌ত তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। সরকারি পশুশালায় একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেড়াল সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে একটী বই লিখেছেন। সেই বই প্রকাশিত হ'লে বেড়াল সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা জানা যাবে। আরো এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার সেকালে ছিল যা চোখে দেখলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না—ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি কত নাম করব।

সব চেয়ে মজার কথা এই যে তখনকার পিঁপড়ে নাকি খুব বড় হলেও মানুষের কড়ে আঙ্গুলের চেয়ে বড় হ'ত না। সে পিঁপড়েও ছিল নানাজাতের। মানুষের ঘরে দোরে মাঠে গাছে নানা রকমের পিঁপড়ে তখন গর্ত্তের ভেতর বাসা বেঁধে থাকত। তাদের মধ্যে দুএক জাতের পিঁপড়ে মানুষকে কামড়ে একটু যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া তার কোন ক্ষতিই করতে পারত না। দল বেঁধে একসঙ্গে তারা তখন থেকেই থাকত বটে কিন্তু মানুষ তখন মোটেই ভাবতে পারেনি যে এই পিঁপড়ের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকার নিয়ে তাকে একদিন লড়াই করতে হবে। অনেকে তখন পিঁপড়ের ওপর দয়া ক'রে তাদের বস্তা বস্তা চিনি খেতে দিত।

আর বছরে দক্ষিণ আমেরিকায় পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা ভয়ানক হেরে গেছি একথা তোমরা সকলেই নিশ্চয় শুনেছ। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে তখন সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় নানাজাতের মানুষের বাস ছিল। মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেই ব্যস্ত, পিঁপড়েরা কি করছে না

করছে তা দেখবার কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি। খুব বেশী পিঁপড়ের উৎপাত হলে পিঁপড়ের গর্ত্তে খানিকটা বিষাক্ত এসিড ঢেলে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। ৭৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল জানা গেছে। তারপর থেকেই আন্দিজ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এই নূতন জাতের ছফুট লম্বা পিঁপড়ে

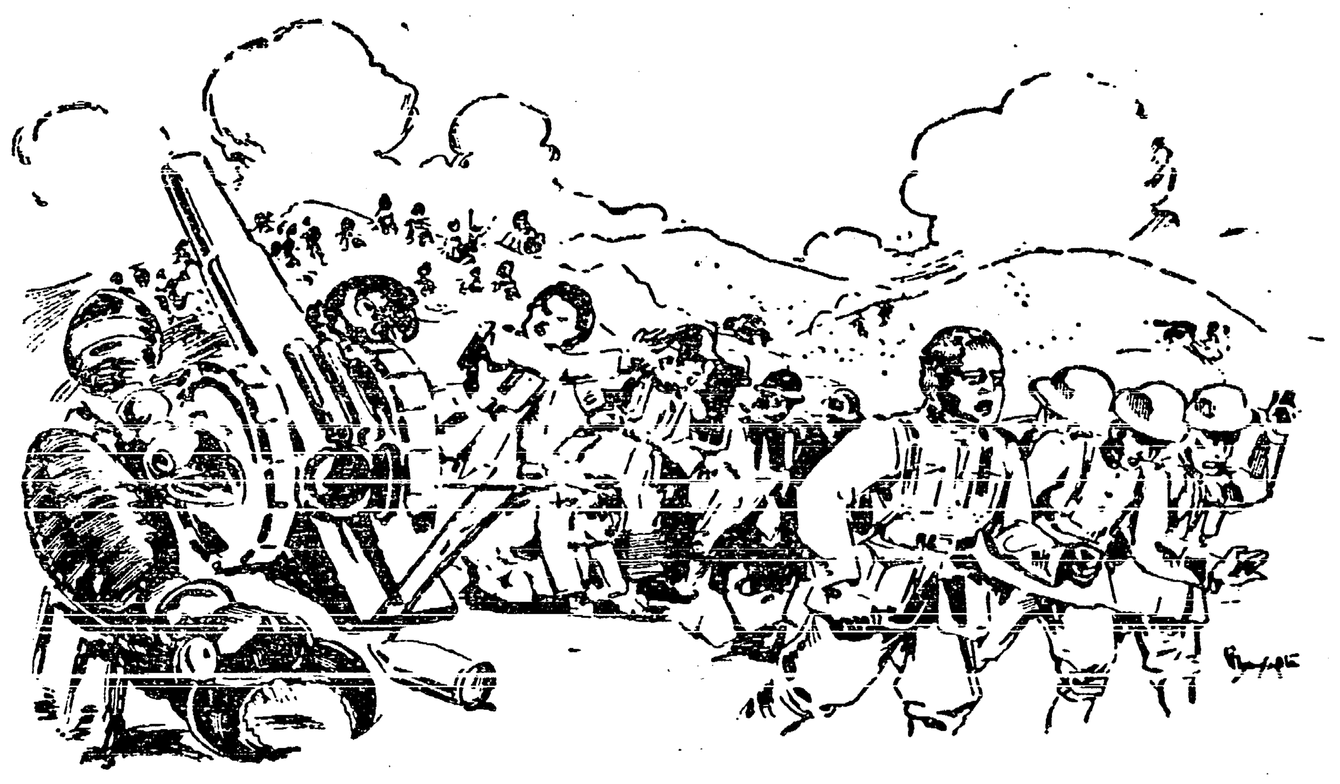

ছফুট লম্বা পিঁপড়ে ......মানুষ তাড়াতে সুরু করে

বেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মানুষ তাড়াতে সুরু করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এর আগে অনেক পর্য্যটক সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড় জঙ্গল ঘুরে বেরিয়েছে কিন্তু কেউ এ পিঁপড়ের কোন সন্ধান পায় নাই। ৬৭৫৭ সালে বিখ্যাত পর্য্যটক অশেষ রায় যখন দক্ষিণ আমেরিকার বনজঙ্গল ঘুরে এসে আন্দিজ পার্ব্বত্যপ্রদেশে একরকম অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেন তখন কাগজে কাগজে তাঁকে এমন উপহাস বিদ্রূপ করে যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য চুপ করে যেতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর শেষ ডায়েরীতে লিখে যান "আমি শপথ করে বলে যাচ্ছি আমি যে অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেছি তা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।"

ওই আন্দিজ পাহাড়ের কাছেই ৬৭০৩ সালে একদল জাপানী রূপার খনি

আবিষ্কার করে তাতে কাজ করতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর ৫ বৎসর পরে তাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। তোমরা বোধ হয় জান সে সময় এই ব্যাপার নিয়ে ভয়ানক হুলুস্থূল পড়ে যায়। অশেষ রায় যখন এই এক হাজার জাপানীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে এই অদ্ভুত জানোয়ারের কোন সংস্রব আছে বলেন তখন লোকে তাঁকে শুধু পাগলা গারদে পাঠাতে বাকী রেখেছিল। অশেষ রায় এই অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে যে সব কথা জানান তা বিস্ময়জনক। সেকালের লোকেরা এই অপরূপ কাহিনীকে আজগুবি বলেছিল বলে তাদের বেশী দোষও আমরা দিতে পারি না। অশেষ রায় বলেছিলেন সেবার দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন আমার কাফ্রী বন্ধু, পৃথিবীর বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিৎ মণ্ডুলা। আগের দিন আমরা মাসোর নদীর উৎসে পৌঁছাই। তারপর আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল আলাগাস হ্রদ।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা আমরা ক্লান্ত হ'য়ে সারাটার কাছে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের চারিপাশে আন্দিজের অসঙ্খ্য শাখাপ্রশাখা তাদের বিপুল দেহ নিয়ে ঘিরে ছিল। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নি। আমাদের পশ্চিমে ঠিক আমাদের পাহাড়ের নীচের উপত্যকার উপর তখন অস্তগামী সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে। উপত্যকাটি আয়তনে খুব ছোট। চারিধারে পাহাড় যেন বিশাল দেয়ালের মত ওইটুকু জমিকে ঘিরে আছে উপত্যকাটি আগাগোড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। শুধু এক জায়গায় ছোট একটি পার্ব্বত্য জলাশয় দেখা যাচ্ছিল।

আমি তখন আমাদের ছোট্ট তাঁবুটি রাত্রের জন্য খাটাবার বন্দোবস্ত করছি। মণ্ডুলা তাঁর সেদিনকার সংগৃহীত নূতন জাতের কীটগুলি বাক্সবন্দী করছিলেন। হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে মণ্ডুলা ডাকলেন 'শুনুন'।

খুঁটি পুততে পুততে চেয়ে দেখি তিনি নিবিষ্ট ভাবে নীচের উপত্যকায় দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্যাপার কি ?"

মণ্ডুলা শুধু ইসারায় তাঁর কাছে যেতে বল্লেন এবং তাঁর কাছে গেলে তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে নীচের পার্ব্বত্য জলাশয়টি দেখিয়ে বল্লেন—"দেখতে পাচ্ছেন ?"

জলাশয়ের ধারে কালোরঙের কি একটা জানোয়ারকে অস্পষ্ট ভাবে ঘুরতে ফিরতে দেখা যাচ্ছিল; বল্লাম—"ও আর এমন কি ? কোন জানোয়ার টানোয়ার হবে।"

মণ্ডুলা ঈষৎ হেসে বল্লেন—"জানোয়ার টানোয়ায় হবে তা আমিও বুঝেছি কিন্তু 'কোন্' জানোয়ার ? দক্ষিণ আমেরিকায় অত বড় কালো জানোয়ারের একটা নাম করুন দেখি ! আপনি দুর্বিবনটা একবার বার করুন।"

সূর্য্য এরিমধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়াল হয়ে গেছে। নীচে সমস্ত জলাশয়টির ধারে একটির পর একটি ক'রে দশটী ওই ধরণের কালো জানোয়ার এসে তখন জড় হয়েছে।

আমার হাত থেকে দুর্ব্বিনটা এক রকম কেড়ে নিয়েই মণ্ডুলা চোখে লাগালেন। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই দুর্ব্বিনটা নামিয়ে বল্লেন—"যাঃ সব মাটী হয়ে গেল।"

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই পাহাড়ের ওঠবার সময়ে কেমন করে ঠোকা লেগে দুর্ব্বিনের কাঁচ দুটী ভেঙে গেছে।

সূর্য্যের আলো তখন বিরল হয়ে এসেছে। তবু সেই আলোতেই আমাদের খালি চোখে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, গভীর অরণ্যের ভেতর থেকে প্রায় দুশত ওই অপরূপ জানোয়ার জলাশয়ের ধারে এসে জড় হয়েছে ! তাদের আকৃতি অদ্ভুত—সামনে ও পেছনে দুটী বড় বড় কালো ভাঁটাকে কে যেন একটি একটি খাটো কাঠিতে গেঁথে লম্বা লম্বা পায়ের ওপর সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের আকৃতি যত না অদ্ভুত তাদের আচরণ তার চেয়ে বেশী। দলবদ্ধ হ'য়ে অনেক জানোয়ার থাকে কিন্তু এমন অপরূপ শৃঙ্খলা কোন জানোয়ারের ভেতর আছে বলে শুনিনি।

তাদের এক সারে চলা ফেরা দাঁড়ানর সঙ্গে একমাত্র খুব শিক্ষিত সৈন্যের কুচকাওয়াজের তুলনা করা যায়।

যত তাদের গতিবিধি দেখছিলাম দুর্ব্বিনের কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় দুঃখ আমাদের তত বাড়ছিল। সন্ধ্যায় অন্ধকারে তারা শেষে একেবারে অরণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে আমরা বিমর্ষ ভাবে সে দিক থেকে চোখ ফেরালাম। সে দিন রাত্রে তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আমাদের আসতে চাইছিল না। মঞ্জুলা তাঁর বিছানায় অস্থির ভাবে খানিকক্ষণ এ পাশ ও পাশ করে বল্লেন—"আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বলুন ত? এমন অপরূপ জানোয়ার এতকাল এত পর্য্যটকের কারুর চোখে পড়েনি এটা কি বিশ্বাস করা যায়?"

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল! তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎ চমকে জেগে উঠে দেখি মঞ্জুলা উত্তেজিত ভাবে আমায় ঝাঁকি দিচ্ছেন। আমি চোখ খুলতেই তিনি বল্লেন 'শীগ্‌গীর বাইরে এসে দেখুন।' তখনও ঘুম কাটেনি, অর্দ্ধ জাগ্রৎ অবস্থায় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। মঞ্জুলা তখনও উত্তেজিত হয়েছিলেন, বল্লেন 'চেয়ে দেখুন' 'নীচে চেয়ে দেখুন'। নীচে চেয়ে দেখে সত্যই অবাক্ হয়ে গেলুম! অন্ধকারে সেই পার্ব্বত্য জলাশয়ের ধারে নানা জায়গায় অসঙ্খ্য আলো জ্বলছে। সে আলোয় আমাদের পাহাড় থেকে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না, শুধু অস্পষ্ট ভাবে ওই জানোয়ারদের নড়া চড়া একটু আধটু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে চেয়ে বসে রইলাম। এতবড় বিস্ময়জনক ব্যাপার বিশ্বাস করতে যেন আমাদের সাহস হচ্ছিল না।

ভোর হবার কিছু আগেই সমস্ত আলো নিবে গেল। আমরা কিন্তু সেখান থেকে উঠতে পারিনি। ভোরের আলোয় ওই জলাশয়ের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে প্রায় দশ বিঘা জমির জঙ্গল একেবারে সাফ্ হয়ে গেছে। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যে প্রকাণ্ড গাছগুলি সে স্থান অন্ধকার করে দাঁড়িয়েছিল তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

মঞ্জুলার উত্তেজনা তখনও শান্ত হয়নি। আমার হাতটা সাজোরে নাড়া দিয়ে তিনি বল্লেন "আমার কি মনে হয় জানেন, আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি তারা কীটজাতীয় প্রাণী!" এবার কিন্তু আমি না হেসে পারলাম না, বল্লাম, "কারণ আপনি কীট-তত্ত্ববিৎ?" মঞ্জুলা আমার পরিহাসে কান না দিয়ে বল্লেন "হ্যাঁ ভাই! কীটজাতীয় ছাড়া পৃথিবীর কোন প্রাণীর চারটার বেশী পা দেখেছেন?" কথাটা সত্য! আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি তাদের পা কতগুলি তা গুণতে না পারলেও চারের বেশী যে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মঞ্জুলা বলে যাচ্ছিলেন "তা ছাড়া আকৃতির কথা মনে রাখবেন।"

বল্লাম, "কিন্তু এত বড় কীট।"

মঞ্জুলা বল্লেন—'অসম্ভব ত নয়'। তারপর পূরা একটি সপ্তাহ আমরা সেই পাহাড়ে ওই অদ্ভুত প্রাণী দেখবার জন্য অপেক্ষা করি কিন্তু আর কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।"

অশেষ রায়ের বর্ণনা এইখানে শেষ হয়েছে। তারপর এক হাজার বৎসর এ প্রাণীর কথা কিছু শোনা যায় নি। অশেষ রায়ের ও মঞ্জুলার কথায় পৃথিবী শুদ্ধু লোক হাসলেও কেউ কেউ যে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য সেখানে যায় নি এমন নয়। কিন্তু আর কোন পর্য্যটকের চোখে কিছু পড়েনি। আমরা এখন অবশ্য বুঝতে পারি অশেষ রায় এই পিঁপড়েদেরই দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনার একটি-বর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এই পিঁপড়ের কথা যখন আমরা জানলাম তখন আর সময় নেই। ৫৯৭৮ সালে একেবারে বজ্রাঘাতের মত আচম্বিতে মানুষকে এই পিঁপড়ের আক্রমণ অভিভূত করে দেয়। আক্রমণের আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেউ এ কথা কল্পনাও করেনি। পিঁপড়েরা যে বহুদিন থেকে গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল তার প্রমাণ ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিমধারে দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত প্রধান নগর একদিনে ধ্বসে পড়ে। কতদিন আগে হতে পিঁপড়েরা এই নগরগুলা ফোঁপরা করে এসেছে কেউ বলতে পারে না। মানুষ মাটির ওপরেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। মাটির তলায়

কোন শত্রু তার সর্ব্বনাশের আয়োজন করছে এ কথা সে কেমন করে জানবে। ৫৯৭৮ সালের পয়লা ফাল্গুন রাত একটার সময় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডারের সমস্ত বড় বড় সহর হঠাৎ ভীষণ শব্দে ধ্বসে পড়ে, তখনও কেউ সন্দেহ করে নি এ কোন শত্রুর কাজ। বিরাট ভূমিকম্প ভেবেই মানুষ তখন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বসে পড়া নগরগুলির বিরাট বিশৃঙ্খলার ওপর যখন প্রভাত হল, তখন যে দৃশ্য প্রতি নগরের মুষ্টিমেয় জীবিত নগরবাসীদের চোখে পড়ল, তা ভয়ঙ্কর। প্রতি নগরের চারিধারে অসংখ্য পিপীলিকা-বাহিনী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েদের সে প্রথম আক্রমণে যে সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায় তার একটি মাত্র অধিবাসী রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি রায়োবামা নগরের ডন পেরিটো। নগরধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ লোক মারা পড়েছিল, যে কয়জন সকাল বেলা পর্য্যন্ত কোন রকমে জীবিত ছিল পিঁপড়েরা তাদের নির্ম্মমভাবে সংহার করে। মানুষ সেবার যুদ্ধের অবসর পর্য্যন্ত পায়নি—প্রস্তুতই তারা ছিল না। ডন পেরিটো কোন রকমে তাঁর এরোপ্লেনে চড়ে একেবারে মেক্সিকোতে পালিয়ে আসেন। এরোপ্লেনে চড়েও যে নিস্তার ছিল তা নয়। এমনি এরোপ্লেনে আরো অনেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পাখাওয়ালা পিঁপড়েরা আকাশে পর্য্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ডন পেরিটোর জীবনরক্ষা হয়েছিল শুধু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতে! অন্য সকলের মত প্রথম থেকেই এরোপ্লেনে লম্বা পাড়ি দেবার চেষ্টা না করে তিনি প্রথম শুধু ঊর্দ্ধে আরোহণ করবার চেষ্টা করেন। পিঁপড়েরা আট হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত তাঁকে তাড়া করে, কিন্তু আর বেশী তারা উঠ্‌তে পারে না বলেই তিনি রেহাই পান। পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনী পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়।

তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে পিঁপড়েরা কি ভাবে গায়না, ব্রেজিল, বলিভিয়া, আর্জেনটাউন রিপাবলিক দখল করে তার ইতিহাস তোমরা কিছু কিছু নিশ্চয়ই জান।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের পরেও দক্ষিণ

আমেরিকার অন্যান্য দেশ তেমন ভাবে সাবধান হয়নি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে প্রথম আক্রমণের পর দু বৎসর তাদের আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি। হঠাৎ দু বৎসর বাদে একদিন অমনি মধ্য রাত্রে ৫২ ডিগ্রী লঙ্গিচিউডের পশ্চিমের সমস্ত সহর ধ্বসে পড়ে। এই লঙ্গিচিউড ধরে পিঁপড়েদের আক্রমণ আর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এবারেও সেই আগের বারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। শুধু অরিনকো নদীর ধারে বলিভার নগরের লোকেরা আগে হ'তে সন্দেহ করে সহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে জড় হয়েছিল। তারাই কেবল যুদ্ধ করে মরবার সৌভাগ্য পেয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রথম পিঁপড়েদের অদ্ভুত অস্ত্রের ও তাদের যুদ্ধ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের শেষে কয়েকজন মাত্র বলিভার-নগরবাসী নদী দিয়ে মটর লঞ্চে আতলান্তিক সাগরে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের কাহিনী লিখে গেছেন।

পিঁপড়েরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে তাকে খুব ভয়ঙ্কর এক রকম বোমা বলা যেতে পারে। কিন্তু বোমা প্রয়োগ করার রীতিটাই সব চেয়ে অদ্ভুত। বলিভার নগরবাসীরা বলেন—"যখন তীর থেকে বহু উড়ন্ত পিঁপড়েকে গোল গোল এক রকম জিনিষ নিয়ে আমাদের দিকে উড়ে আসতে দেখি তখনই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। অনেক পিঁপড়ে এই ভাবে মারা পড়ে, কিন্তু দু একটা পিঁপড়ে সমস্ত গোলাগুলি এড়িয়েও আমাদের জাহাজ নৌকাতে এসে পড়ে। তাদের পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বোমা ফেটে জাহাজ নৌকা গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যেক বোমার সঙ্গে একটি করে পিঁপড়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়। দূর হতে নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভবনা তারা রাখে না।

পিঁপড়েদের দ্বিতীয় আক্রমণের পর সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে ওঠে। চীনের পিকিন্ সহরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলে কর্ত্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ, অসংখ্য এরোপ্লেন, অসংখ্য সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকার বাকী দেশগুলির অধিবাসীদের হয়ে যুদ্ধ করবার

জন্য পাঠান হয়। কিন্তু যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? পিঁপড়েদের আস্তানার কোন পাত্তাই কেউ পায় না। মাটির তলায় কোথা দিয়ে তাদের গতিবিধি সমস্ত আমেরিকা খুঁড়ে না ফেল্‌লে জানবার উপায় নাই। সৈন্যেরা দিনের পর দিন, ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে তন্ন তন্ন করে সমস্ত খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন হঠাৎ এক জায়গায় গভীর রাত্রে তাদের পায়ের তলায় মাটি ধ্বসে পড়ে। সকাল বেলা তাদের আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। এরোপ্লেনের দল ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার আকাশে বিচরণ করে বেড়ায়। পিঁপড়েদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। এরোপ্লেনগুলিরও কোনমতে আট হাজার ফিটের নীচে নামবার উপায় নাই, কোথা থেকে একশ এরোপ্লেনের জায়গায় হাজার হাজার উড়ন্ত পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করে।

(ক্রমশঃ)

হোলির গান

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

আবার এল হোলির খেলা
আবার এল দোল,
ঝুলোন দোলা ঝুলিয়ে ওরে
ঝুল্‌বি যদি ঝোল!

ঝুল্‌বি যদি আয়রে চলে
আয় ছেলেরা দলে দলে
আমোদ করে আজকে তোরা
জয়ধ্বনি তোল,—

আবার এল হোলির খেলা
আবার এল দোল।

মোদের হবে হোলির খেলা
বকুল তলাতেই;
কদমতলা কোথায় পাব'
কদমতলা নেই।

শ্যামের দোলা কদমতলে
আমরা ঝুলি বকুল তলে,
হ'ক না তাতে নাইরে ক্ষতি,
সে সব কথা ভোল;—

আবার এল হোলির খেলা
আবার এল দোল।

আজকে রে এই হোলির দিনে
পড়তে মানা ভাই,
সকাল থেকে হেথা সেথায়
ঘুরিস্‌ কী যে ছাই,

দিনটী ধ'রে মাখব রং,
না হয় রে ভাই হবো সং,
তাই বলি সব এখন হ'তে
আবীর নিয়ে গোল,

আবার এল হোলির খেলা
আবার এল দোল।

রং খেলা এ নয় রে শুধু,
রঙিয়ে তোলা মন
একঘেয়ে ভাই জীবনটা আর
চল্‌বে কতক্ষণ!

মনকে তাজা করতে ভাই
হর্‌রা হাসির চাইরে চাই,
মাতবি যদি আয়্ চলে আয়,
বাধাস্‌নে আর গোল ;—
আবার এল হোলির খেলা
আবার এল দোল।

অরুণ আলো

(শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

মোটের উপর মনে হল যেন হিমালয় পর্ব্বত একটা ভূতের মত চেহারা নিয়ে অরুণের দিকে তাকিয়ে ভয় দেখাচ্চে! উঃ!

অরুণ ভয়ে একেবারে কাঠের মত চুপ,—পাথরের মত স্তব্ধ!

ঠিক তক্ষুনি আর একটা ঘটনা ঘট্‌ল,—সেটা আরও ভয়ের, আরও দুঃখের, আরও যন্ত্রণার!

(৭)

অরুণ দেখ্‌ল—যে তার চারিপাশে অনেকগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আঙ্গুল!

অরুণ বুঝ্‌ল—যে এই ভয়ঙ্কর আঙ্গুলগুলো নিশ্চয়ই ওই পর্ব্বতের মত বিশাল ব্যাপারটার। অরুণ দেখ্‌ল—যে এই আঙ্গুল ঠিক সাপের মত বিশ্রী।

সে ভাব্‌ল—এইবার কেঁদে ফেলি! কিন্তু তবু লজ্জা করচে, কারণ, হাজার হোক্, এই সব কাণ্ডই ত সেই ক্ষুদ্র নগণ্য পোকাটার!

হায়, এর পরে যা ঘট্‌ল তাতে অরুণের কান্না হু হু ক'রে বেরিয়ে পড়্‌ল।

অরুণ দেখ্‌ল,—সেই আঙ্গুলের দল ঘুমন্ত আলোকে জড়িয়ে তুলে ধর্‌চে।

আলো কিন্তু কিছুই বুঝ্‌চে না,—আলোর মুখ খানা ঘুমের মধ্যে কেবল হাস্‌চে, ভারী মিষ্টি হাসি। আস্তে আস্তে সেই আঙ্গুলের দল আলোকে আকাশে তুল্‌তে আরম্ভ করচে। সুন্দরী রাজহংসী যে ভাবে জলস্রোতের উপর দিয়ে আনন্দে ভেসে যায়, ঠিক সেই ভাবে আলোও আকাশের ভিতর দিয়ে ভেসে ভেসে ক্রমেই উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অনেক, অনেক উপরে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট ছোট্ট পথ দিয়ে আলো ভেসে চলেচে,—ক্রমেই চলেচে আরও উপরে, আরও দূরে। সুন্দর একখানা মেঘের মত আলো ক্রমেই উপরে উড়্‌চে,—আরও উপরে উড়চে।—তারপর হঠাৎ যেন সেই উচ্চ আকাশের মধ্যে আলোর ঘুম ভাঙ্গ্‌ল, অরুণ স্পষ্ট দেখল, যেন আলো চোখ খুলে চাইছে। কিন্তু অরুণ কিছুতেই বুঝ্‌ল না যে আলো হাস্‌চে কি কাঁদচে। একটু পরেই সব মিলিয়ে গেল,—পর্ব্বত মিলিয়ে গেল, আকাশ মিলিয়ে গেল। দুর্দ্দান্ত পোকা মিলিয়ে গেল, এবং আলো সেই সঙ্গে কোথায় যে চলে গেল কে জানে?

অরুণ বুঝলে,—আর কাঁদবার সময় নেই, ভাব্‌বার সময় নেই, মাকে বল্‌বার সময় নেই। এই মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে উড়ে গিয়ে আলোকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। অরুণের ছোট্ট বুকখানা কান্নায় ভ'রে এল, কিন্তু সে কাঁদলে না। তার মুখখানা বিষাদে ম্লান হ'য়ে এল, কিন্তু সে দম্‌লে না। তীরের মত ছুটে অরুণ বেরিয়ে গেল—আলোকে খোঁজবার জন্যে। বীর রাজপুত্রের মত অরুণ গৃহ ছেড়ে পথে এল, পথ ছেড়ে বনে এল, বন পার হ'য়ে মহারণ্যে এল;—হাজার হাজার বিপদ আর ভয়কে তুচ্ছ ক'রে অরুণ ছুটে চল্‌ল আলোকে খুঁজ্‌তে।

(৮)

অরুণ চলেচে, চলেচে, চলেচে,—আর মাঝে মাঝে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌চে—
"ও আলো, আলো ও বন্ধু, ও ভাগ্নী!"

কিন্তু কই, আলো ত উত্তর দেয় না!

হঠাৎ কাণের কাছে যেন সেই পোকাটা বিন্ বিন্ ভন্ ভন্ ক'রে হাস্‌তে

থাকে, আর বল্‌তে থাকে—"কি অরুণ, আমায় মেরেছিলে কেন? এখন তোমার আলোই বা কোথায়? আর স্বর্গই বা কোথায়?

এত অপমানেও অরুণের তবু ভ্রূক্ষেপ নাই,—সে চলেচে, ক্রমাগতই চলেচে—আলোকে খুঁজ্‌তে।

অরুণের দুঃখ দেখে—গাছের পাতাগুলো ঝিরঝির ক'রে চোখের জল ফেলে, পাখীরা কেঁদে কেঁদে কত গান গায়, পশুরা অবাক্ হ'য় চেয়ে দেখে আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কষ্ট পায়। এমন কি স্বয়ং সূর্য্যও মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে কাঁদেন। কিন্তু আলোর কোনও খোঁজ নাই!

অরুণ চলে, চলে, ক্রমাগতই চলে। কখনও ক্লান্ত হ'য়ে ঝোপের পাশে পথের উপর ঘুমিয়ে পড়ে,—তখন যত পাখীরা এসে তার মুখের ভিতর ঠোঁট দিয়ে আম, জাম, লিচু, কলা, আঙ্গুর এবং আরও অনেক ফল খাইয়ে দেয়, আর হরিণী—এসে তাকে মিষ্টি দুধ খাইয়ে সুখী হয়;—অরুণ জান্‌তেও পারে না।

হরিণী এসে তাকে মিষ্টি দুধ খাইয়ে সুখী হয়

তারপর জেগে উঠে সে আবার বল্‌তে থাকে, আর কেঁদে কেঁদে ডাকে—

"ও আলো, আলো, ভাগ্নি!—তুমি কোথায়?"

কোনও উত্তর নাই! আকাশে বাতাসে সেই দুঃখভরা ডাক শাবকহারা পাখীর মত উড়ে বেড়ায়,—কোনও ফল হয় না।

অথচ কাণের কাছে সেই পোকাটা যেন ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রে হাসে আর বলে—

"কি অরুণ, আমায় হত্যা করেছিলে কেন? তোমার আলো কোথায়? তোমার স্বর্গ কোথায়?"

অরুণ শোনে, আর মৃদু মৃদু দুঃখের হাসি হাসে;—যেন বল্‌তে চায়—"বেশ, আমার দুঃখ আমি সইব, আমার ভাগ্নীকে আমি খুঁজে বার করব, তাতেই আমার সুখ। তুমি যতই লাঞ্ছনা কর, আমার মন কিছুতেই দমবে না।"

সাবাস অরুণ! এই ত চাই। (ক্রমশঃ)

রং তামাসা

জামাইবাবু আর তাঁহার শ্যালক খাইতে বসিয়াছে, শ্যালক আস্তে আস্তে দুধের বাটীটা থালার উপর তুলিয়া লইল। জামাইবাবু বলিলেন "থালার উপর দুধের বাটী তুল্লে কি হয় জান ত?

শ্যালক—কি হয়?

জামাইবাবু—মেয়ে অপাত্রে পড়ে;

শ্যালক—বাবার কিন্তু এ অভ্যাসটা বড্ড বেশী।

(২)

উমেশ বড় ভাই রমেশ ছোট ভাই। যতীন উমেশের বন্ধু।

উমেশ—আচ্ছা যতীন, রমেশের চেহারাটা একটু বোকাটে গোছের নয় কি?

যতীন—হ্যাঁ, কিন্তু একটা মজা দেখেছ, ওর চেহারাটা অবিকল তোমার মত। দেখ্‌লেই বোঝা যায় ও তোমার ছোট ভাই।

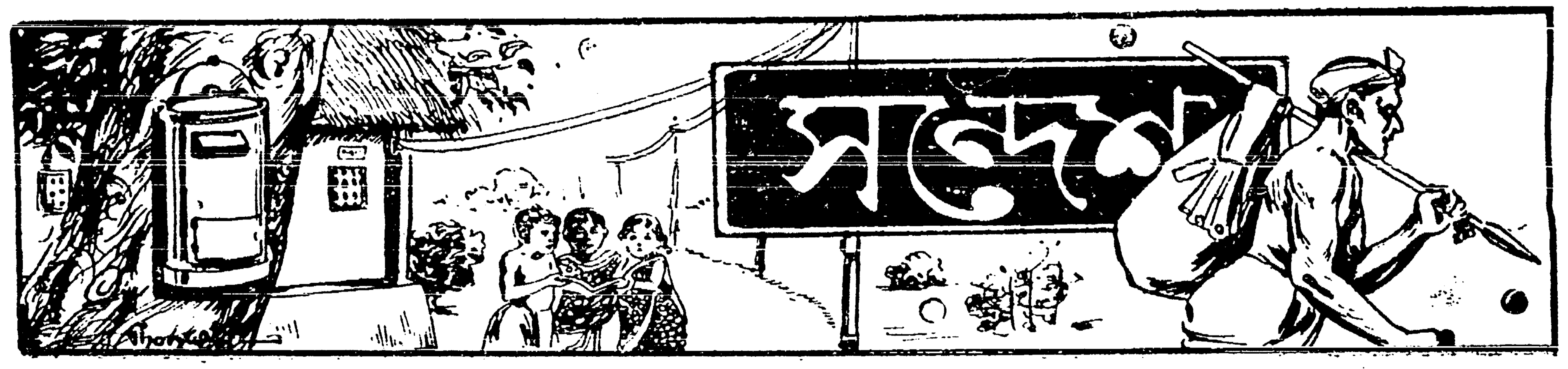

দুধের টুকরা

তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে সাইবেরিয়ার কোন কোন জায়গায় জমাট দুধ বরফের মত টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া বিক্রী করা হয়। কথাটা শুনিতে খুবই অদ্ভুত, কিন্তু তোমরা হয় ত অনেকে জান যে তেমন ঠাণ্ডায় অনেক কিছুই জমিয়া যাইতে পারে। দুধও যে জমিয়া বরফের মত শক্ত হইয়া যায় সেও ঐ ঠাণ্ডাটার জন্য। দেশটার শীত কি রকম তাহা হয় ত একটু আন্দাজ করিতে পারিতেছ।

সবচেয়ে বড় ফটোগ্রাফ

পৃথিবীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সব চেয়ে বড় হইতেছে একখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো। চওড়ায় ছবিখানি অবশ্য বেশী নয়, মাত্র ৫ ফুট কিন্তু লম্বায় ৪০ ফুট। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ ফটোগ্রাফ যদি এত বড় হয় তবে যে যন্ত্রে (ক্যামেরা) সে ছবি তোলা হইয়াছে সেটা না জানি কত বড়! সেটা কিন্তু খুব একটা কিছু নয়, ব্যাপারটা কি জান? পাশাপাশি ৫ খানা ছবি তুলিয়া সে গুলি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তারপর সেই জোড়া ছবিটাকে বড় (এনলার্জ্জ) করিতেই এই কাণ্ডের সৃষ্টি।

ডাক্তারের বাহাদুরী

কিছুদিন আগে কাগজে পড়িয়াছিলাম বিলাতে একটি ছোট ছেলে খেলিতে খেলিতে কতকগুলি সেফটিপিন মুখের মধ্যে পুরিয়া দেয়। সেফটিপিন গুলি গিয়া তাহার পেটের মধ্যে বিঁধিয়া থাকে। ডাক্তারও কিন্তু কম বাহাদুর নহেন। তিনি অদ্ভুত আলো দিয়া সেফটিপিনটা কোথায় আছে দেখিয়া লইলেন। তারপর খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিয়া মাথা ঘামাইয়া এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈয়ার করিয়া সেফটিপিন তুলিয়া তবে ছাড়িলেন।

বিলাতের ডাক্তারদের অদ্ভুত কেরামতির কথা আজ কাল প্রায়ই শোনা যায়। কয়েকটা নমুনা দিতেছি—ওয়াশিংটন সহরে এক রোগীর বুকের পাঁজরার হাড় খুলিয়া লইয়া নকল হাড় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটি এখন দিব্যি আরামে ঘুরিয়া বেড়ায়। লণ্ডনে সেদিন কয়েকটি ছেলেমেয়ের পায়ের হাড় ফেলিয়া দিয়া নূতন হাড় লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকায় শিকাগো বলিয়া যে সহর আছে সেখানকার একটি লোকের বুকে গুলি ঢুকিয়াছিল। ডাক্তার তাহার হৃৎপিণ্ড অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইয়া গুলি বাহির করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ড আবার যেখানে ছিল সেখানে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর একটী অদ্ভুত কাণ্ডের কথা বলিব। এক রোগীর গলায় অস্ত্র করা হইল, ফলে তাহার কথা বলিবার শক্তি চলিয়া গেল। বাহাদুর ডাক্তার কিন্তু দমিবার পাত্র নন। তিনি তাহার গলার মধ্যে নকল যন্ত্র বসাইয়া তাহাকে কথা বলাইয়া ছাড়িলেন, সে এখন দিব্যি কথা বলিতে পারে, তবে বেশী জোরে চেঁচাইতে পারে না।

অদ্ভুত ক্ষমতা

বছর ত্রিশেক আগে ডাক্তার আটবিলার নামে এক ভদ্রলোক একসঙ্গে না থামিয়া বার ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অতক্ষণ ধরিয়া শুনিবার ধৈর্য্যও বোধ হয় অনেকের ছিল না। আর এক ভদ্রলোকের কথা জানি—তাঁহার কি খেয়াল হইল, তিনি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিয়া পিয়ানো বাজাইতে বসিলেন। আর উঠিলেন ৪০ ঘণ্টা পরে। সেদিন কাগজে দেখিলাম এক কামার ক্রমাগত দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া না থামিয়া হাতুড়ী পিটিয়াছিল।

খাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ত' প্রায়ই শোনা যায়। আমাদের জানা শোনা একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকই ত সেবার নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে ৯৬ খানা লুচি খাইয়া উঠিয়া গেলেন।

কিছুদিন আগে কলিকাতার গঙ্গায় যে সাঁতারের বাজী হইয়াছিল তাহাতে একটী সাত বছরের বাঙ্গালীর ছেলে ১৩ মাইল সাঁতরাইয়া ছিল।

মাটীর তলায় বাগান

পর পৃষ্ঠায় যে বাগানটার ছবি দেখিতেছ ওটা কবেকার জান? পম্পিয়াই সহরের নাম হয়ত তোমরা শুনিয়াছ; ২ হাজার বছর আগে পম্পিয়াই একটা খুব নামকরা সহর ছিল। তারপর একদিন ভূমিকম্প আর আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত একসঙ্গে উঠিয়া সহরটাকে মাটির তলায় চাপা দেয়। ২ হাজার বছর পরে মাটী খুঁড়িয়া পুরাণো সহরটাকে বাহির করা হইয়াছে, এই

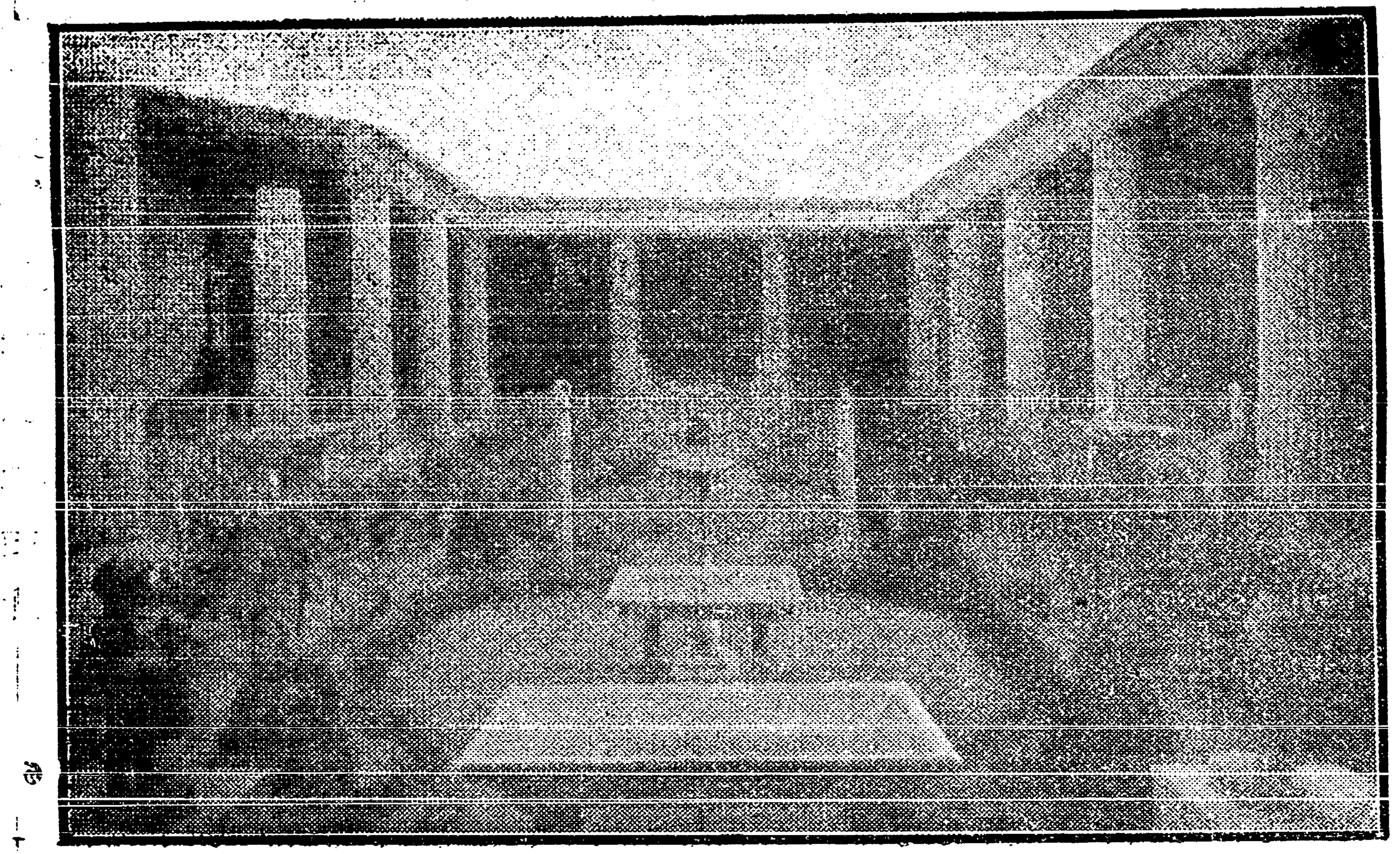

মাটীর তলায় বাগান

বাগানটিও বাহির হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ২ হাজার 'বছর মাটীর নীচে থাকিয়াও বাগানটার বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেকালে যেমনটি ছিল এখনও দেখিতে তেম্নিই।

মজার খেলা

আজ তোমাদের কয়েকটা মজার কাণ্ডের কথা বলিব। ঠিক মত করিতে পারিলে তাহা দেখাইয়া বন্ধুবান্ধবদের অনায়াসে তাক্ লাগাইয়া দিতে পার। প্রথমটা হইতেছে কাগজের পাত্রে করিয়া জল ফুটান, আসবাবের মধ্যে একটা কাগজের পাত্র চাই। কাগজের চৌকা টুপি বা ঠোঙ্গা হয়ত অনেকেই করিতে জান—না জানিলে পিন গুঁজিয়া বাটীর মত করিলেই চলিবে। যে কাগজে আমরা লিখি সে কাগজেই হইবে। এখন ঐ কাগজের পাত্রের দুই কিনারায় ফুটা করিয়া একটা সূতা বাঁধিয়া দাও, যাহাতে সূতাটা ধরিয়া পাত্রটা ঝুলাইয়া রাখা যায় (বাল্তি ধরিবার জন্য যেমন থাকে সেই রকম)। এইবার কাগজের পাত্রের ভিতর খুব সাবধানে জল ভরিতে হইবে, যাহাতে না ছিঁড়িয়া যায়। এখন একটা

মোমবাতি কি প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহার উপর পাত্রটি ধরিলেই হইল। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় কাগজ সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়া যাইবে। কিন্তু কাজে করিলে দেখিবে কাগজ ত পুড়িতেছে না, উহার ভিতরের জলটাই গরম হইতেছে। খানিক পরে দেখিবে কাগজের উপরেই জল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এবার আর একটা মজার কথা বলিব, একটা চৌকা পেষ্ট বোর্ড লও। মাপে একখানা পোষ্ট কার্ডের অর্দ্ধেক হইলে চলিবে। এখন কার্ডখানার ঠিক মাঝখানে একটা পাখীর খাঁচা আঁক, আর কার্ডের ঠিক উল্টা দিকে একটা পাখী আঁক। পাখীটা কিন্তু আঁকিতে হইবে খাঁচার ঠিক উল্টা করিয়া অর্থাৎ খাঁচার যে দিকটা উপরের দিক পাখীর সে দিকেই থাকিবে পা। এখন কার্ডের দুই পাশে দুইটা সূতা বাঁধিয়া দুই হাতে সেই সূতা দুটি ধরিয়া পাক দিতে থাক। কার্ডখানা খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিতে থাকিবে আর অবাক্ হইয়া দেখিবে পাখীটা খাঁচার মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে।

এই দুটা কাণ্ডই কিন্তু ঘটে বিজ্ঞানের ২টা খুব সাধারণ নিয়মের জন্য। বড় হইলে তোমরা কারণটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

নূতন ধাঁধাঁ

(১)

(ক) কোন্ ফল তুলিলে মৃত্যু হয়?

(খ) কোন্ রোগে মরিয়া স্বর্গে যাওয়া যায়

শ্রীমনোজিৎ বসু

(ক) কোন্ হ্রদে প্রাতঃকাল হয় না?

(খ) কোন্ জায়গার পথে সর্ব্বদাই জল থাকে?

(গ) কোন্ সহরের মানুষ সর্ব্বদাই গান করে?

(২)

রাম বাবু তাঁর দুই ছেলে যদু ও মধু প্রত্যেককে ২০টি করিয়া টাকা দিয়া বলিলেন ভাল ল্যাংড়া আম কিনিয়া আন। মধু চালাক ছেলে, সে তখনি বাড়ীর মোটর গাড়ী লইয়া জগুবাবুর বাজারে গেল এবং কিছু আম কিনিল; এমন সময় সে জানিতে পারিল যে বড়বাজার আর কলেজ ষ্ট্রীটে আম আরও সস্তা। কাজেই সে আবার সেই দুই বাজারে গিয়া বাকী টাকার আম কিনিল, বাড়ী গিয়া দেখে যদু ও ঐ তিন বাজার হইতে কিছু কিছু আম কিনিয়া

লইয়া গিয়াছে। রামবাবু দর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে যদু প্রত্যেক বাজার হইতে মধু অপেক্ষা টাকায় ২টা আম ঠকিয়া আসিয়াছে। বেচারা যদুকে সকলেই বকিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আম গুণিয়া দেখা গেল দুজনেই ২৬০টা করিয়া আম আনিয়াছে, বলত কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

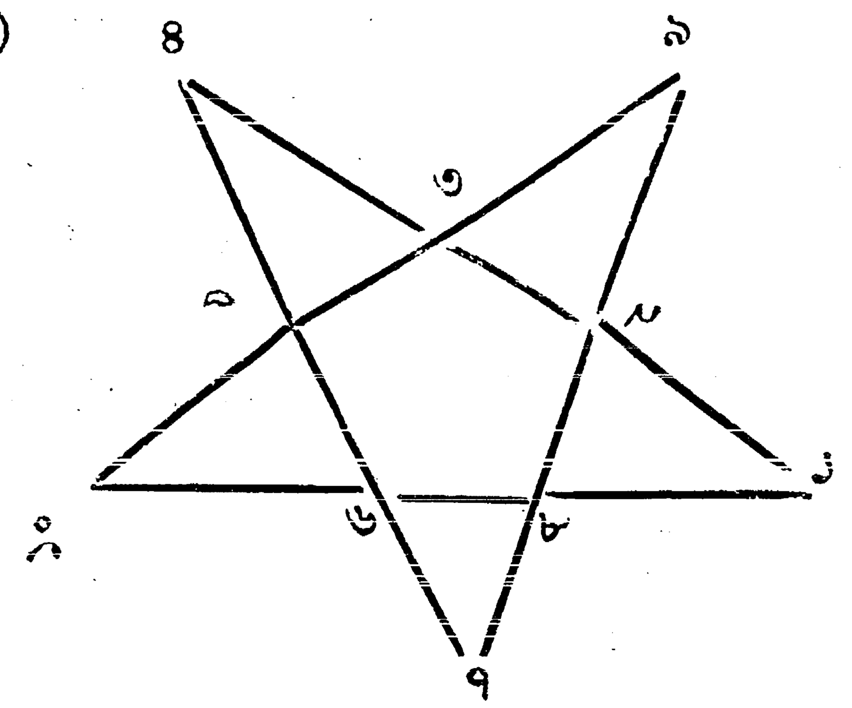

(২) গরু ১১টি, মহিষ ১টি, ছাগল ৮টি।

উত্তর দাতাদের নাম

যাঁহাদের ২টি হইয়াছে—

রামরতি চক্রবর্ত্তী ও নির্ম্মলারাণী দেবী, হিমাংশুকুমার নিয়োগী, নন্দরাণী দেবী, অরুণকুমার ঘোষ, প্রমোদচন্দ্র মুস্তোফী, সুষমাসুন্দরী দেবী, সনৎকুমার মজুমদার, শৈলেশচন্দ্র দাস, নিরুপমা দেবী, হিমাংশুকুমার মল্লিক, আর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, অবনীনাথ ব্যানার্জ্জী, সন্তোষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তটিনী রায়, অভয় আশ্রম লাইব্রেরীর পাঠকবর্গ, মনোজিৎ বসু, প্রমথনাথ গিরি, উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ, অমিয় কুমার বরাট, সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কল্যাণ, ব্রজেন, হরি, রবীন্, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, অজিতকুমার চৌধুরী, শিবপদ সেনগুপ্ত হাসি বসু, তারকদাস অধিকারী, সুধীরকুমার দত্ত, সত্যসুন্দর ভট্টাচার্য্য, ইন্দু রায় ভূপেশলাল সেন, কল্যাণী দত্ত, অনিলকৃষ্ণ মজুমদার, জ্যোতির্ম্ময় চক্রবর্ত্তী, সুধীররঞ্জন দাস, ইহা ছাড়া আর ৩ জন ২টি উত্তরই ঠিক দিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের চিঠিতে তাঁহাদের নাম পাওয়া গেল না।

যাঁহাদের ১টি হইয়াছে—

প্রমোদচন্দ্র রায়, ফনীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, কলম লক্ষ্মীকান্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, পুষ্পবতী দেবী, হৃষীকেশ কুণ্ডু, সদানন্দ সাহা, লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী ও কমলা দেবী, রহমত উল্লা মিঞা, বিজয়ভূষণ ও বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য, মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অর্ণবনাথ খাঁ।

খোকার-খেলা।

১ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৮ | ৪র্থ সংখ্যা

নূতন

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

ধূলায় লুটায় ঝরা পাতা, নূতন বোঁটায় ফোটে প্রাণ ;
বিদায় নিল অতীত বুড়া, এল শিশু **বর্ত্তমান**।
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ডাকে আনন্দে ;
বাতাস কহে—কুঞ্জ গেহে নূতনকে আজ আসন দে।
পুরাতনের অবসানে আজ নূতনের মহোৎসব ;
শিশুরা তাই আসছে সবাই, করছে সুখের কলরব।
আয়রে ছুটে দেশের শিশু, **নূতনকে** আজ বরণ কর্ ;
যাঁহার দেওয়া এই যে **নূতন**, তাঁকে তোরা স্মরণ কর্ !

নব বর্ষের গান

(শ্রীবিকাশচন্দ্র দত্ত)

এসেছে — বরষ ফিরে, তাইতে কিরে হরষ জাগে ?
হেসেছে — আকাশখানি কোন্ আলোকের পরশ রাগে ?
ধরণী সাজ্‌ল কিবা,
ঝলকি পড়ছে বিভা,
ফুটে ঐ — পারুল, বেলী, যুঁই, চামেলী ফুলের বাগে,
জু'টে ঐ — সবাই শুভ বরষটীরই পরশ মাগে।

বনেতে — উঠ্‌ল আবার হাজার পাখীর কল্-কাকলি,
মনেতে — ফুর্ত্তি নিয়ে আয় বাহিরে, শোন্ যা' বলি—
গগনে নূতন আলো
ভুলাল, দিল্ ভুলালো।
মরে যাই, — গুন্ গুনিয়ে রুনুরুনিয়ে গাইছে অলি—
ওরে তাই — কাজ ফেলে আজ আয় বাহিরে, শোন্ যা' বলি !

আজিকে — ঝাড়তে মনের আপদ বালাই, ময়লা মাটি
রাজি কে — বল্‌তো দেখি, বল্‌তো কে চাস্ সাজতে খাঁটি ?
ওরে তোর নবীন প্রাণে
ভ'রে নে নূতন গানে,
ভ'রে নে — হাস্য আমোদ সমান ক'রে সবাই বাঁটি',
ব'রে নে — আসল যে তায় অর্ঘ্যমালায় পরিপাটি।

গিয়েছে — অতীত চ'লে কাজের শেষে নিজেই হেসে,
দিয়েছে — অনেক কিছু মোদের যে ভাই ভাল' বেসে,

ভকতি অর্ঘ্যদানে
তাহাকে পূজরে প্রাণে,
প্রবীণও — নবীন সাথে পূজ্য যে রে সকল দেশে—
রঙিন ও — প্রাণের মাঝে ভুলিস্‌নে তা' সর্ব্বনেশে !

চাহি আজ — গড়্‌তে মোদের জীবনগুলি নূতন ক'রে,
নাহি লাজ — ভয় ভাবনা—রইবে কেন বল্‌না ওরে ?
হ'লেও ক্ষুদ্র অতি
ধরমে রাখবো মতি,
ভয়েরি — মূর্ত্তি দেখে পিছিয়ে কেন পড়্‌ব' স'রে ?
জয়েরি — জীবন হ'বে—যুঝ্‌লে পরে মনের জোরে।

ফটোগ্রাফের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

এমন এক সময় ছিল যখন ছবি তোলা ছিল এক মহা হাঙ্গামা। খরচের দিক দিয়া ত' বটেই, অন্যান্য দিক দিয়াও গোলমাল কম ছিল না। তোমার ছবি চাই ? খুঁজিয়া আন কে ভাল ছবি আঁকিতে জানে। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যতক্ষণ না ছবি আঁকা শেষ হয় ততক্ষণ তাহার সম্মুখে চুপটি করিয়া বসিয়া থাক। তাহার উপর চিত্রকরটি যদি তেমন পাকা না হন তবে এত করিয়াও যে ছবি হইবে, তাহা হয়তো তোমার ছবি বলিয়া বোঝাই যাইবে না।

এখন কিন্তু সে সব বালাই নাই। ছবি চাই ? পাড়ায় ফটোগ্রাফের ছড়াছড়ি। একজনকে খবর দিলেই হইল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে তাহার অদ্ভুত বাক্সটি লইয়া হাজির হইবে। তুমি শুধু সাজিয়া গুজিয়া মিনিট খানেকের জন্য বসিলেই হইবে। আর কোনও গোলমাল নাই। পর দিনই হয়তো টাট্‌কা ছবি আসিয়া

হাজির হইল একেবারে হুবহু তোমার মত। তোমার নয় একথা বলিবার যোটি নাই।

আচ্ছা, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন চমৎকার ছবি কেমন করিয়া হয় তাহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা করে নাকি? সেই কথাই আজ বলিব।

ফটোগ্রাফারের ঐ যে কালো বাক্সের মত ভুতুড়ে ক্যামেরাটি উহা দেখিয়াই হয়ত তোমরা ভড়কাইয়া যাও। বাপুরে, না জানি উহার মধ্যে কি সব সাংঘাতিক জিনিষ লুকান আছে! কিন্তু বাস্তবিকই উহার মধ্যে ভয় পাইবার কিছুই নাই, একটু চেষ্টা করিলে হয়তো তোমরা নিজেরাই উহার কলকব্জাগুলি বুঝিতে পারিবে।

এইখানে একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল। আয়নার উপর আলো পড়িলে কি হয় তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ, তোমরা হয়ত মনে কর শুধু ঐ রকম চকচকে জিনিষের উপর আলো পড়িলেই সে আলো ঠিকরাইয়া আসে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে; আমাদের চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছ, সব জিনিষের উপরেই যখন আলো আসিয়া পড়ে তখন সে আলোর কিছু না কিছু ঠিকরাইয়া আসিবেই। সাদা কিংবা চকচকে জিনিষের উপর হইতে আসে সব চেয়ে বেশী, কালো হইতে আসে সব চেয়ে কম। আমাদের চোখের মধ্যে যে মণি আছে তাহার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—আমরা যখন কোন জিনিষের দিকে তাকাই, তখন সেই জিনিষ হইতে যে আলো ঠিকরাইয়া আসিতেছে তাহা আমাদের ঐ মণির উপর পড়ে। আর তাহার ফলে আমাদের চোখের ভিতরে ঠিক সেই জিনিষটার একটা হুবহু উল্টা ছায়া পড়ে। ছায়া কেন পড়ে? যে জিনিষটার দিকে তাকাইতেছি তাহার সবটা ত এক রকম নয়, কাজেই কোন অংশ হইতে বেশী আলো আসিতেছে, কোন অংশ হইতে আসিতেছে কম। আর ছায়াটা ত' আর কিছু না—কোথাও কম আলো কোথাও বেশী আলো পড়িলেই ছায়ার সৃষ্টি হয়। এখন চোখের মধ্যে যেখানে ছায়া পড়ে, তাহার সহিত আমাদের মগজের যোগ আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছায়াটা কি বুঝিয়া লইতে পারি।

ক্যামেরার বন্দোবস্তও ঠিক চোখের মত। উহাকে একটা নকল চোখ বলিলেও বোধ হয় কিছু মাত্র ভুল হয় না।

নীচের ছবিটা দেখ—একটা ক্যামেরার ভিতরটা দেখান হইয়াছে। এক

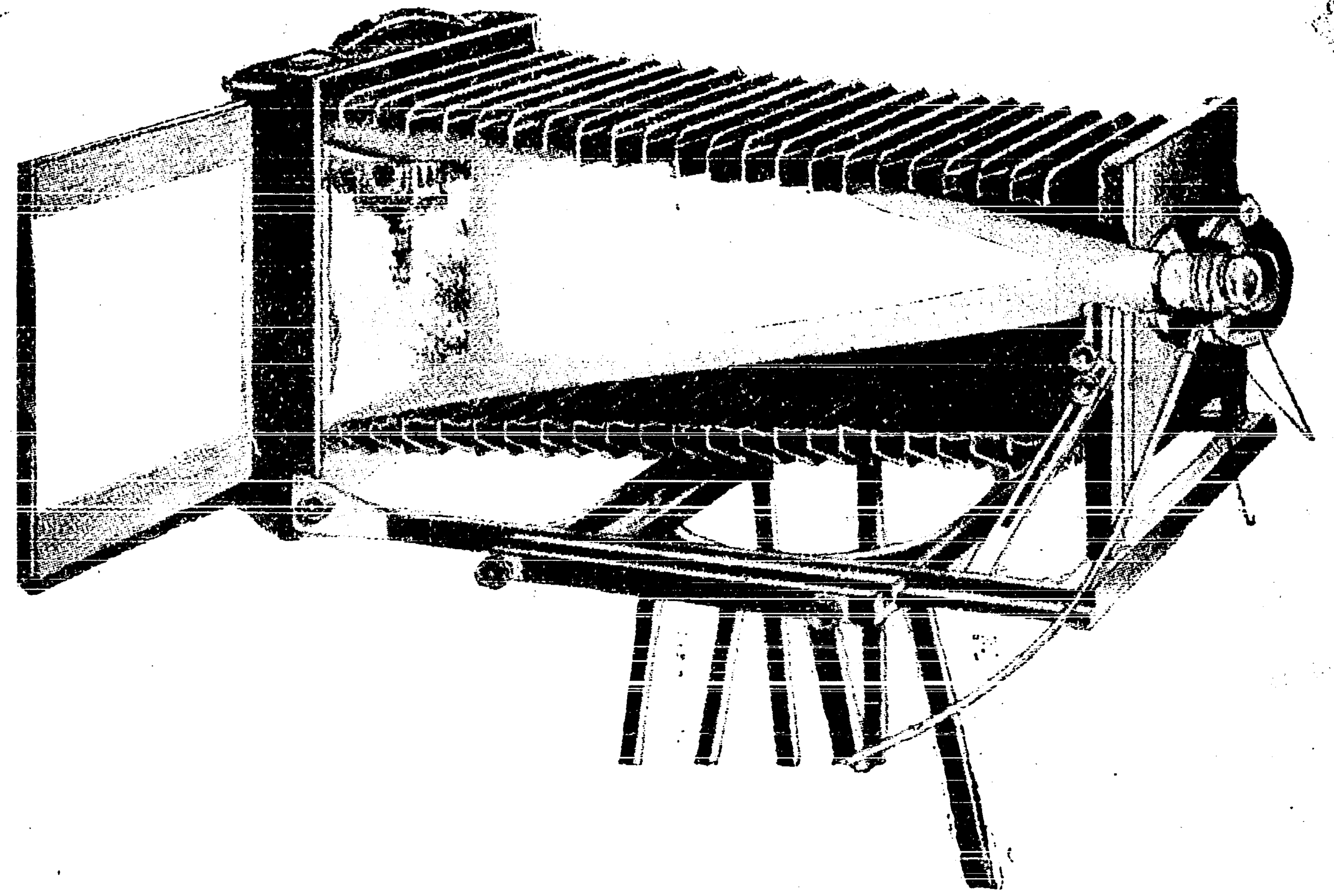

ক্যামেরার ভিতর ছবি উঠিয়াছে

ধারে ঐ যে একটা কাচের পর্দার মত দেখিতেছ ওইটাই মণির কাজ করে, উহাকে বলে লেন্স। যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহাকে লেন্সের সম্মুখে বসাইয়া দাও। তাহার উপর যে আলো পড়িবে তাহা ঠিকরাইয়া আসিয়া পড়িবে লেন্সের উপর, আর তার ফলে পিছনে একটা পর্দার উপর কেমন সুন্দর উল্টা ছায়া পড়িয়াছে দেখ, ঠিক যেমন চোখের ভিতরে পড়ে। এখানে একটা বাড়ীর ছবি তোলা হইতেছে। মানুষের ছবিও এই রকমেই তুলিবে।

লেন্সখানির ভিতর দিয়া আলো আসা ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। ক্যামেরার ভিতরে যাহাতে আর কোন দিক হইতে আলো যাইতে না

পারে সে জন্য উহাকে কালো করা হইয়াছে। আর ঐ যে হার্ম্মোনিয়ামের বেলোর মত দেখিতেছ ওগুলি আর কিছুই নয় ক্যামেরাটিকে ইচ্ছা মত ছোট বড় করিবার জন্য, কেননা পিছনের পর্দ্দাটীকে ঠিক এমন জায়গায় বসাইতে হইবে যেখানে ছায়াটি উঠিবে সব চেয়ে স্পষ্ট আর পরিষ্কার।

এই ত' গেল ক্যামেরার কলকব্জা, এখন ছায়াটিকে এমন একটা কিছুর উপর উঠাইতে পারিলেই হইবে যেখানে উহা স্থায়ী ভাবে আঁকা হইয়া যায়। দেখা যাক আমাদের ফটোগ্রাফার কি করে।

ওকি, কালো রংএর আর একটা বাক্স বাহির করিল কেন? উহার মধ্যেই বুঝি প্লেট যাহার উপর ছবি উঠিবে। তারপর? ওকি, এবার দেখি একটা কালো কাপড়ে মুড়ি দিয়াছে পাছে হাতের প্লেটগুলিতে একটু আলো লাগে—ওগুলি কি ননীর পুতুল নাকি! বাঃ বাঃ এত সাবধান! এইবার আস্তে আস্তে যে পর্দ্দার উপর ছায়া পড়িয়াছিল তাহার জায়গায় প্লেটটি বসাইয়া দিল—লেন্সখানা কিন্তু তখনও ভাল করিয়া বন্ধ করা আছে। এক মিনিট সব চুপ। তারপর শব্দ হইল "রেডি", ফস্ করিয়া এক সেকেণ্ডের জন্য লেন্সের মুখ খুলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বাস্, ছবি তোলা হইয়া গিয়াছে।

এই যে এক সেকেণ্ড সময়, ইহার মধ্যে কিন্তু অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। যে প্লেটের উপর ছবি তোলা হইল উহার উপর একটা ভারী মজার জিনিষ মাখান ছিল, উহাকে বলে সিলভার্ ব্রোমাইড্। রূপা আর ব্রোমিন এই দুইটা জিনিষ দিয়া উহা তৈরী করা হয়। এখন এই জিনিষটা এমনি অদ্ভুত যে, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও উহার গায়ে আলো লাগে তবে যেখানে যেখানে আলো পড়িবে সেই সব জায়গা একেবারে বদলাইয়া যাইবে। তাই ফটোগ্রাফার প্লেট বাহির করিবার সময় অত সাবধান হইয়াছিল—কেননা দৈবাৎ কোন দিক হইতে একটু আলো লাগিলেই সমস্ত মেহনৎ মাটী হইয়া যাইত। কালো বাক্সে রাখিলেই নিশ্চিন্ত—কেননা সেখানে ত আর আলো বাবাজীর ঢুকিবার কোন উপায় নাই। এখন যাহা বলিতেছিলাম বলি। পর্দ্দার জায়গায় প্লেট বসাইয়া লেন্সের মুখ

খুলিয়া দিতেই যে ছায়া পর্দ্দার উপর পড়িয়াছিল তাহা পড়িল প্লেটখানার উপর। আর সিলভার ব্রোমাইডের উপর আলো পড়িলে কি হয় বলিয়াছি, কোথাও বেশী আলো কোথাও কম আলো পড়িয়া সেই ছবিখানিই গাঁথা হইয়া গেল। তখনও কিন্তু কিছু বুঝিবার যো নাই।

ফটোগ্রাফারের কাজ কিন্তু এখনও অনেক বাকী। এইবার তাহাকে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকিতে হইবে। সেখানে কাজের সুবিধার জন্য সামান্য একটু লাল আলো থাকিতে পারে। লাল আলো বেশী ক্ষতি করিতে পারে না। এইবার ছবির ছাপওয়ালা প্লেটখানিকে বাহির করিয়া তাহার উপর জলের মত কি একটা ঢালিয়া দেওয়া হইল। আস্তে আস্তে কতকগুলি কালো কালো রেখা দেখা যাইতেছে—আরও কতকগুলি। এগুলি একটু কম গাঢ়। এবার কি মানুষের মুখ? বড় অস্পষ্ট। প্লেটখানিকে জলে ধুইয়া লও ত'। আর একটা তরল জিনিষে ডুবাইতে হইবে? আচ্ছা, এবার কি হইল—নেগেটীভ অর্থাৎ উল্টা? দেখি?

ওমা! এ কি, সব দেখি উল্টাইয়া গিয়াছে। যাহা ছিল সাদা তাহা হইয়াছে কালো, যাহা ছিল কালো তাহা হইয়াছে সাদা। কি বিশ্রী! সাদা ধুতী একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। আর কালো জুতা কালো জামা একেবারে সাদা, বাঃ চুল গুলও দেখি আশী বছরের বুড়ার মত সাদা!

ফটোগ্রাফার কাজ করুক, ততক্ষণ আমরা কি হইল বুঝিয়া লই। সিলভার ব্রোমাইডে আলো পড়িলে বদলাইয়া যায় বলিয়াছি, বদলানো মানে ব্রোমিনটুকু রূপা হইতে আলগা হইয়া যায়। কিন্তু সেটাত' আর পক্ষীরাজ ঘোড়া নয় যে আপনা আপনি উড়িয়া যাইবে, কাজেই সেটাকে সরাইবার একটা বন্দোবস্ত ফটোগ্রাফারকেই করিতে হয়। প্রথমে যে জিনিষটা ঢালা হয় উহাকে বলে ডেভালাপার। যেই উহা ঢালা হইল অমনি ব্রোমিন উহার সহিত মিলিয়া তাহার পুরাণো বন্ধু রূপাকে ছাড়িয়া গেল। কিন্তু একেবারে গেল কি? কোথাও বেশী গিয়াছে, কোন কোন জায়গায় হয় ত একেবারেই যায় নাই! কিছু কিছু সিলভার ব্রোমাইড় হয়ত এখনও লাগিয়া আছে। এতদূর করিয়া এখন যদি

আলো লাগিয়া সব নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কি রকম মুস্কিল ভাব দেখি। তাই নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আর একটা তরল জিনিষে ডুবান হয়। এবার আর কোনও ভাবনা নাই। সবটুকু ব্রোমিনই এবার চলিয়া গিয়াছে—পড়িয়া আছে শুধু রূপা—ছবির আলো-ছায়া অনুযায়ী কম আর বেশী।

এইবার প্রিণ্ট করিবার পালা, অর্থাৎ নেগেটিভখানা হইতে ছবি লইয়া কাগজের উপর তুলিতে হইবে। নেগেটিভখানা ত' আর সত্যি সত্যি ছবি হইল না। ব্যপারটা কিন্তু অনেকটা আগের মত। একখানা ফ্রেমের ভিতর নেগেটিভখানা পূরিয়া তাহার পিছনে একখানা কাগজ বসাইতে হইবে। কাগজ বলিলাম বটে কিন্তু যে কাগজে আমরা লিখি সে কাগজে অবশ্য কিছুই হইবে না। প্রিণ্ট করিবার জন্য আলাদা কাগজ তৈরী হয়। উহার গায়ে ঠিক সিলভার ব্রোমাইড গোছের আর একটা জিনিষ মাখান থাকে, আলো লাগিলে উহাও সিলভার ব্রোমাইডের মত বদলাইয়া যায়, তবে অত তাড়াতাড়ি নয়। এইবার সম্মুখে একটা উজ্জ্বল আলো বসাইয়া দেওয়া হইল। সে আলো নেগেটিভের ভিতর দিয়া কাগজের উপর পড়িল। আর নেগেটিভের উপর যে ছাপ পড়িয়াছিল তাহাও সঙ্গে সঙ্গে কাগজের উপর আঁকা হইয়া গেল।

এখন আর প্লেটের কোনও দরকার নাই। কাগজটিকে লইয়া ঠিক আগের মত তরল জিনিষের মধ্যে ডুবাইতে হইবে। তারপর ধুইয়া শুখাইলেই দেখা যাইবে ভিতর হইতে ম্যাজিকের মত চমৎকার ছবি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে জিনিষটার ঠিক একটী খাঁটি ছবি। আর একটা মজা দেখিবে নেগেটিভে যাহা যাহা উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছিল সেগুলি আবার ঠিক হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া হইল বলত? প্লেটের যেখানটা ছিল সাদা সেখানটা দিয়া আলো ঢুকিয়াছে বেশী—কাজেই কাগজেরও সে জায়গাটায় বেশী আলো পড়িয়া বেশী কালো হইয়া গিয়াছে। কাজেই শেষে সবই গিয়া দাঁড়াইল ঠিক যেমনটী ছিল তেমনি। আর এই যে এত কাণ্ড ঘটিল সবটারই মূলে কিন্তু ঐ আলো-ছায়া। ফটোগ্রাফী কথাটার মানেও "আলোর লেখা।"

আজকাল ফটোগ্রাফীর কত উন্নতি হইতেছে শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবে। ক্যামেরার লেন্সের জায়গায় দূরবীণের লেন্স বসাইয়া গ্রহ নক্ষত্রের ছবি তোলা হইতেছে। চাঁদকে তোমরা দূর হইতে কত সুন্দরই না মনে কর, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের মুখের তুলনা করিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাও। কিন্তু চাঁদের আসল চেহারা দেখিয়াছ? ছবিতে দেখ শুধু পাষাণের আর পাহাড়ের স্তূপ, কোথাও রসকসের বংশও নাই। আবার দেখ একই জায়গা হইতে একই ক্যামেরার

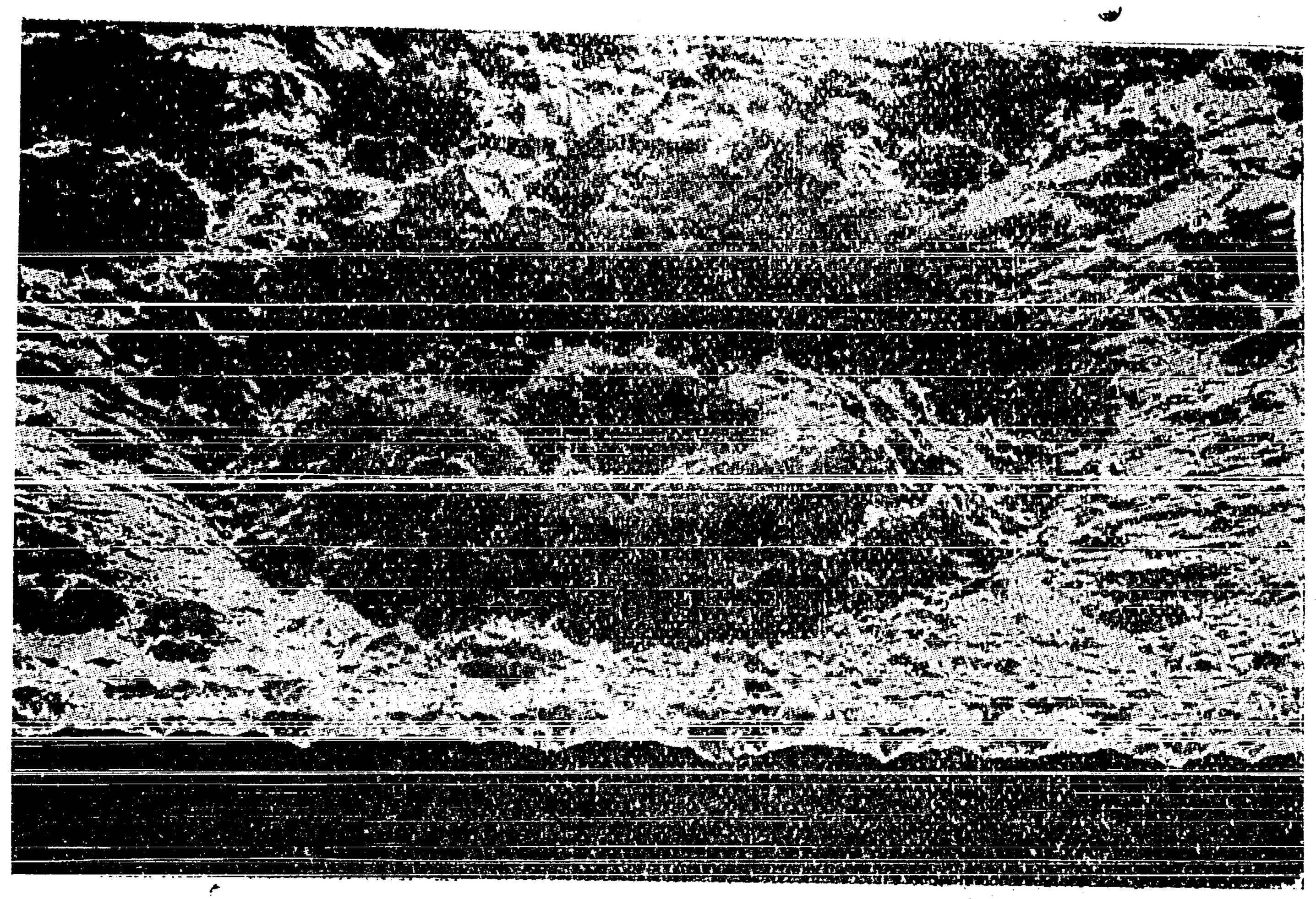

চাঁদের আসল চেহারা

শুধু লেন্স বদলাইলে একই জিনিষের কেমন বিভিন্ন ছবি ওঠে। নীচে যে দুইটি ছবি পাশাপাশি দেখিতেছ তাহার কথাই বলিতেছি। একটীতে মূর্ত্তি আছে কিনা বুঝাই যায় না আর একটীতে মূর্ত্তির প্রত্যেকটী অংশ সুন্দরভাবে উঠিয়াছে। জলের তলের কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কত মজার মজার দৃশ্য—যাহা লোকে কল্পনায়ও আনিতে পারে না, তাহা ক্যামেরার কৃপায় আমাদের কাছে আজ আর

নূতন বলিয়া মনে হয় না। এই যে বায়োস্কোপ ইহাও ত ফটোগ্রাফীই, কত তাড়াতাড়ি যে সে ছবি তোলা হয় তাহা ভাবিলেও তাক্ লাগিয়া যায়। সে কথা তোমাদের আর এক দিন বলিব।

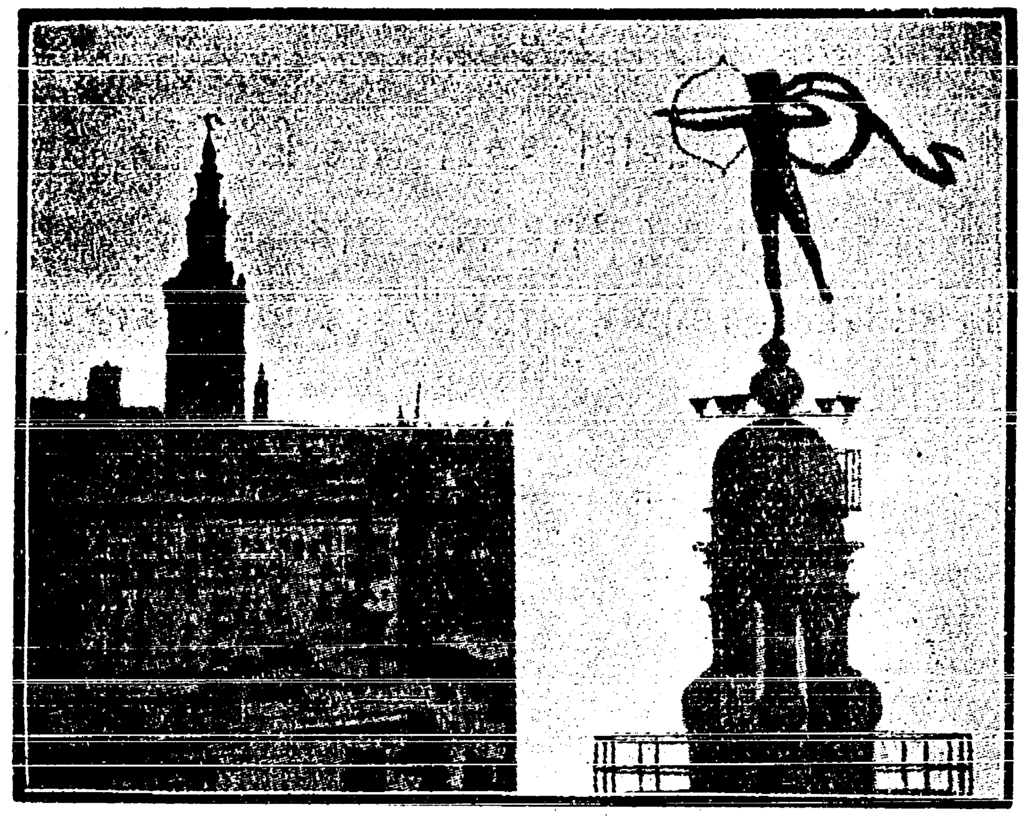

দুইটা ছবিই এক জায়গায় এক ক্যামেরায় তোলা ; শুধু লেন্স্ বদলান হইয়াছে বলিয়া ছবি দুইটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে

শুধু কি তাড়াতাড়ি ছবি তোলা—এত খুঁটিনাটী জিনষ যাহা আমাদের চোখেও ধরা পড়ে না তেমন তেমন ক্যামেরায় তাহাও উঠিতে দেখা গিয়াছে। একবার এক ভদ্রলোক ছবি তুলিলেন, ফটো আসিলেই কিন্তু দেখা গেল তাঁহার সমস্ত শরীরে বসন্তের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল কিন্তু ছবি তুলিবার সময় কেহই টের পায় নাই।

যুদ্ধের সময় এই ক্যামেরা কত কাজে লাগিয়াছে। এয়ারোপ্লেনে চড়িয়া দূর হইতে শত্রু-শিবিরের ব্যাপার জানিয়া লইতে এমন ওস্তাদ আর নাই।

একবার কতকগুলি শিখান পায়রার গলায় ক্যামেরা বাঁধিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ক্যামেরার মধ্যে এমন বন্দোবস্ত রহিল যে আধঘণ্টা পর পর তাহাতে আপনিই ছবি উঠিবে। পায়রা গিয়া শত্রুদের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল শত্রুদের অনেক গোপনীয় জিনিষ ক্যামেরার মধ্যে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

বৃত্রবধ

(পৌরাণিক)

সেকালে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক লড়াই বাধিত। অসুরেরা ছিল দেবতাদেরই জাত ভাই। সমুদ্র-মন্থন দেবতারা এবং অসুরেরা মিলিয়া করিয়াছিল, শেষে বিষ্ণু অসুরদের ফাঁকি দিয়া দেবতাদিগকে অমৃত খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। মুনিঋষিদের সঙ্গেও সেকালে দেবতাদের খুব ভাব ছিল।

দেবতাদের রাজা ছিলেন ইন্দ্র। তাঁহার স্ত্রী শচীদেবী ছিলেন পুলোমনামক এক দানব বা অসুরের কন্যা। ইন্দ্র ও বৃত্র উভয়েরই উৎপত্তি মহর্ষি কশ্যপ হইতে। কশ্যপমুনি বিবাহ করিয়াছিলেন অনেক—তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি স্বর্গ, মর্ত্ত ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

কালেয় নামক একদল অসুর ছিল, বৃত্র ছিল তাহাদের রাজা। বৃত্র তাহাদের সঙ্গে লইয়া স্বর্গরাজ্য ওলট্‌পালট করিতে আরম্ভ করিল। দেবতাদের সাধ্য কি যে বৃত্রের সঙ্গে আঁটিয়া উঠেন! তাঁহারা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কোথায় থাকিল তাঁহাদের স্বর্গ, আর কোথায় রহিল তাঁহাদের নন্দনবন! তাঁহারা বৃত্রের ভয়ে যে যেখানে পারিলেন দে ছুট্।

এখন দেবতারা স্বর্গ পালন না করিলে যে, স্বর্গই বৃথা। তাঁহারা চিন্তা করিয়া ইন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন ব্রহ্মার নিকট। হাত জোড় করিয়া ব্রহ্মার অনেক স্তব স্তুতি করিলেন। ব্রহ্মা স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমরা কেন আসিয়াছ তাহা আমি বুঝিয়াছি, বৃত্রাসুর কিসে মরিবে তাহা বলি, শোন ; পৃথিবীতে দধীচি নামে একজন খুব ভাল ধার্ম্মিক ঋষি আছেন। তোমরা গিয়া তাঁহার নিকট বর চাও। তিনি যখন খুসী হইয়া বর দিতে চাহিবেন, তখন তোমরা বলিবে আপনি সকলের উপকারের জন্য আপনার শরীরের হাড়গুলি দিন। তখন তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া নিজের অস্থি দিয়া দিবেন। তোমরা সেই হাড়

দিয়া বজ্র প্রস্তুত করিবে। সেই বজ্রের মুখ থাকিবে ৬টা আর শব্দ হইবে ভীষণ। ইন্দ্র যেন সেই বজ্রদ্বারা বৃত্রকে মারিয়া ফেলেন। যাও, আমি যেমন বলিলাম, শীঘ্র সেইরূপ কর।”

দেবতারা ব্রহ্মার বর পাইয়া চলিলেন দধীচি মুনির আশ্রমের দিকে। সরস্বতী নদী পার হইয়া তাঁহারা সেই আশ্রমে চলিলেন। সরস্বতী তখন খুব বড় নদী ছিল, তাহার ওপারে ছিল দধীচি মুনির আশ্রম। সে কি সুন্দর তপোবন! কত সুন্দর গাছপালা, কত সুন্দর লতাকুঞ্জ সেখানে। দেবতারা দেখিলেন কত ভ্রমর গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে, কত কোকিল কুহুধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, কত হস্তী ও হস্তিনী সরোবরে খেলা করিতেছে। পর্ব্বতের গুহার মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ঘোর গর্জ্জন করিতেছে, আবার এদিকে কত গোমহিষ চরিয়া বেড়াইতেছে। গোমহিষ হইল সিংহ ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য কিন্তু মুনির এতই প্রতাপ সে সাধ্য কি হিংস্র জন্তুগুলার যে গোমহিষের গায়ে থাবা মারিতে পারে! দধীচি মুনির তপোবনে থাকিয়া তাহাদের সে কথা মনেই আসিত না।

দেবতারা দেখিলেন, মুনির আশ্রমের শোভা স্বর্গের মত আর মুনির তেজ সূর্য্যের মত। শরীরের কি জ্যোতিঃ! দেবতারা তাঁর পায়ের উপরে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর দেবতাদের প্রয়োজনের কথা উঠিল। তাঁহারা একেবারে বৃত্রাসুরকে মারিবার জন্য মুনির অস্থি চাহিয়া বসিলেন। মুনি দেবতাদের কথা শুনিয়া মোটেই বিরক্ত হইলেন না, তাঁহাদের উপকার করিতে পারিবেন ভাবিয়া খুব খুসীই হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমি প্রাণ দিয়াও আপনাদের উপকার করিব। আপনারা যে বর চাহিয়াছেন নিশ্চয়ই তাহা দিব।” মুনি এই কথা বলিয়া যোগাসনে বসিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন দেবতারা তাঁহার হাড়গুলি লইয়া চলিলেন বিশ্বকর্ম্মার নিকট। বিশ্বকর্ম্মার নিকট গিয়া বলিলেন, “এই হাড়গুলি দিয়া আমাদিগকে বজ্র বানাইয়া দিতে হইবে। সেই বজ্রে বৃত্রাসুর মরিবে”। বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন দেবতাদের কারিকর। তিনি খুব যত্ন করিয়া সেই হাড় দিয়া বজ্র প্রস্তুত করিলেন। সেই বজ্রের কি

ভীষণ চেহারা আর কি ভীষণ জ্যোতিঃ! বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, “এই নিন আপনার বজ্র, এবার অসুরদের মারিয়া নির্ব্বিবাদে স্বর্গরাজ্য ভোগ করুন”।

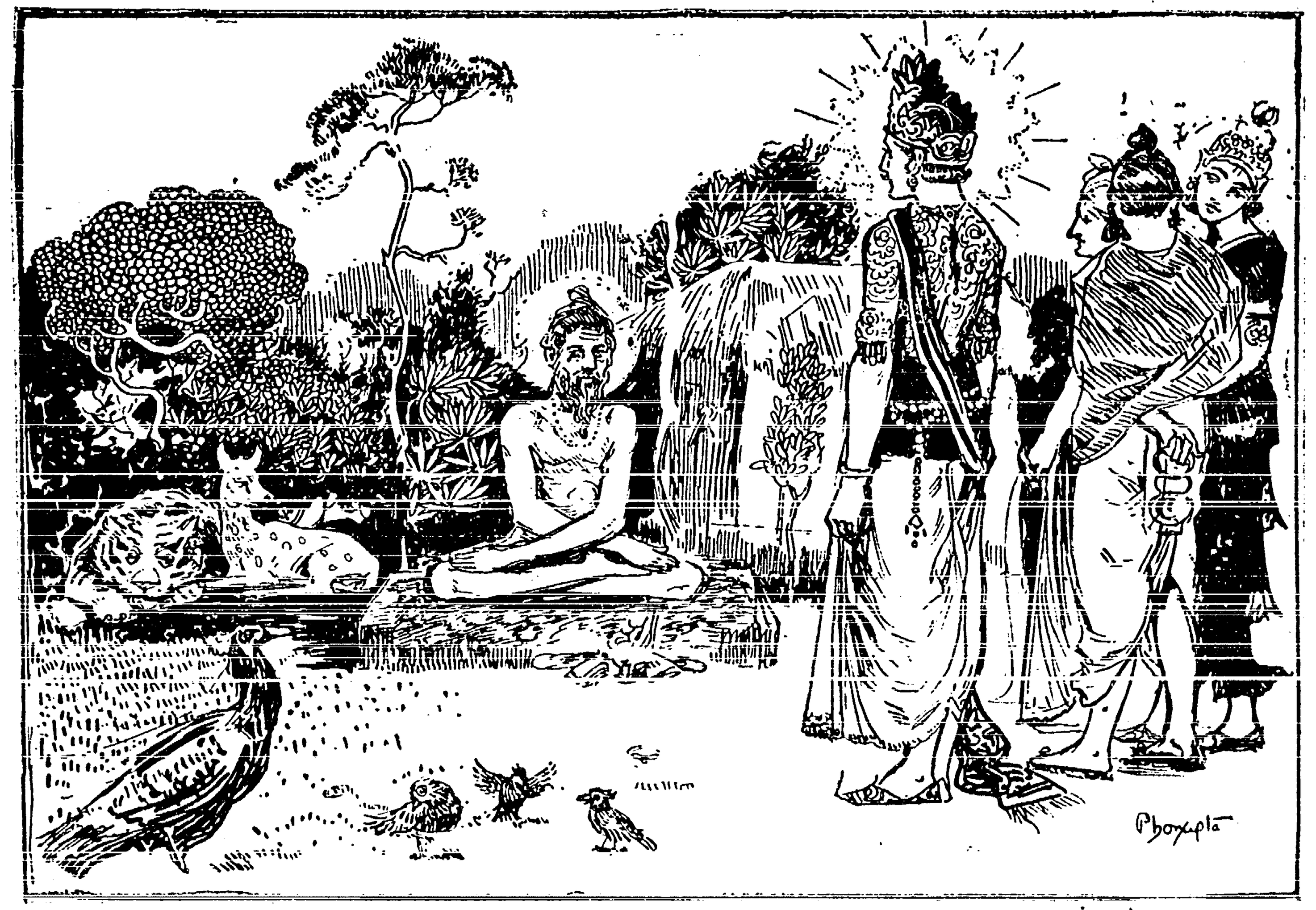

মুনি…যোগাসনে বসিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইন্দ্র খুব খুসী হইয়া বজ্র হাতে করিয়া চলিলেন। তিনি বৃত্রকে মারিবার জন্য যাত্রা করিলেন। আর যত বলবান্ দেবতা তাঁহারা সাজিয়া সঙ্গে চলিলেন। বৃত্র তখন তাহার দলবল লইয়া স্বর্গমর্ত্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার অনুচর কালেয় অসুরগণ অস্ত্রশস্ত্র হাতে করিয়া পাহাড়ের মত বৃত্রের চরিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

তখন দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের আবার ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। খড়্গের ঘায়ে ঠন্ঠনা শব্দ উঠিতে লাগিল। বীরদিগের মাথা কাটা যাইতে লাগিল এবং পাকা তালের মত ডুম্ ডুম্ করিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। কালেয় দানবেরা

সোণার কবচ পরিয়া ভয়ানক অস্ত্র লইয়া দেবতাদিগকে তাড়া দিল। সাধ্য কি দেবতাদের যে সে তাড়া সহ্য করিতে পারেন! তাঁহারা ভয়ে যে যেখানে পারিলেন, যুদ্ধ ছাড়িয়া তো চম্পট। ইন্দ্র ভয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে তিনি উঠিয়া নারায়ণের কাছে গিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। নারায়ণ ইন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে নিজের তেজ দিয়া তাঁহার বল বাড়াইয়া দিলেন। দেবতারা ও ব্রহ্মর্ষিরা যখন দেখিলেন যে, নারায়ণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেন, তখন তাঁহারাও নিজ নিজ তেজ ধরিয়া আবার যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ইন্দ্র তখন এই দলবল লইয়া আবার ছুটিলেন বৃত্রকে মারিবার জন্য।

বৃত্রাসুর আবার ইন্দ্রকে দলবলে আসিতে দেখিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার সেই গর্জ্জনে স্বর্গ, মর্ত্ত, আকাশ সব কাঁপিতে লাগিল। ইন্দ্র মনের কষ্টে ও ভয়ে তাড়াতাড়ি সেই বজ্র ছাড়িয়া দিলেন। এ যে সেই মহামুনি দধীচির হাড়ে নির্ম্মিত বজ্র! বৃত্র ইহার তেজ সহ্য করিতে পারিল না। প্রহার খাইয়া সে একেবারে টিপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গলায় ছিল সোণার হার, বোধ হইল যেন বিষ্ণু মন্দর পর্ব্বত ফেলিয়া দিলেন। বৃত্র তো বজ্রের চোটে আর প্রাণ রাখিতে পারিল না। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার যে ঘটিয়াছে ইন্দ্রের নিজেরই তাহা হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। বজ্র ছাড়িয়াও ইন্দ্রের কাঁপুনি থামে না। তিনি ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য এক সরোবরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আর সব দেবতারা কিন্তু দেখিলেন যে বৃত্র মরিয়াছে। তাঁহারা তখন ইন্দ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন আর বাকী যত সব অসুর ছিল, তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের দফারফা করিতে লাগিয়া গেলেন।

বৃত্র মরিল বটে কিন্তু তাহার দলবল—সেই কালেয় অসুরগণ—দেবতাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িল না; তাহারা ঢুকিয়া পড়িল সমুদ্রের মধ্যে যেখানে দেবতারা তাহাদের কিছু করিতে পারিবেন না। তাহারা সমুদ্রে গিয়া পরামর্শ করিল যে, দেবতাদের এই স্বর্গ মর্ত্ত নষ্ট করিতে হইবে। আগে মারিতে হইবে বড় বড় ধার্ম্মিক লোককে, বাজে লোককে মারিতে শেষে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। দেবতারা

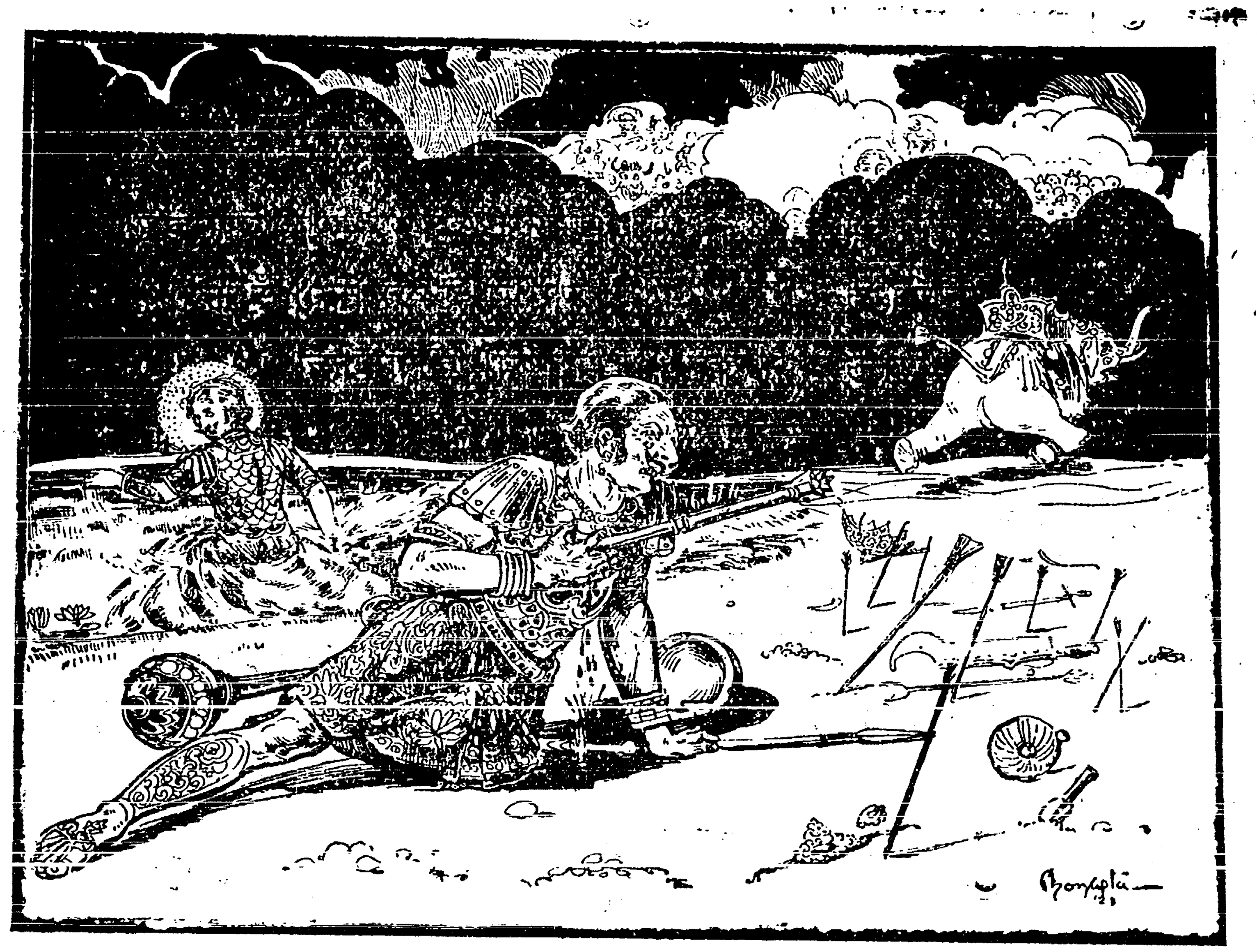

বৃত্রকে কোনমতে বজ্র মারিয়া ইন্দ্র সরোবরের মধ্যে লুকাইতেছেন

শেষে অগস্ত্য মুনির সাহায্যে বৃত্রাসুরের সেই দলবলকেও মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

সুমেরু

(শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি, বি-ই-এস্)

তোমরা ভূগোলের বইতে পড়িয়াছ, পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু একেবারে গোল নয়; উত্তরে দক্ষিণে কিছু চাপা—অনেকটা কমলা লেবুর মত। ঠিক কমলা লেবুর মত অতটা চাপাও নয়। একটা নরম বলকে দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া একটু চাপ দিলে যেমন উপর ও তলা দুই-ই একটু চ্যাপ্টা হইয়া যায়,

সেই রকম। এই চ্যাপ্টা দুই দিকের উত্তর দিকের ঠিক মধ্যভাগকে বলা হয় সুমেরু বা উত্তর মেরু, আর দক্ষিণদিকের মধ্যভাগকে বলে কুমেরু বা দক্ষিণমেরু।

সুমেরুতে অত্যন্ত শীত। সেখানে সমুদ্রের জল সর্ব্বদাই বরফে ঢাকা থাকে; সেই বরফ জলে ভাসিতে থাকে এবং তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া বেড়ান যায়, এমন কি গাড়ী পর্য্যন্ত চালান যায়। তোমরা গ্রীষ্মকালে একটু বরফ পাইলে কত আনন্দিত হও! কিন্তু সুমেরুতে গেলে দেখিবে, সেখানকার চারিদিকেই শুধু বরফ, ডাঙ্গায় বরফ—মাটী দেখিবার জো নাই, জলেও ভাসিতেছে বরফই। জল পাইতে হইলে হয় ঐ বরফ গলাইয়া লইতে হইবে, নয়তো যদি কোন কারণে খানিকটা বরফের খণ্ড ফাটিয়া যায়, তবেই যা একটু জল দেখা দিবে। বরফ দিয়া সেখানে ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত তৈরি করা যায়—পুতুলের থাকার জন্য নয়, মানুষের থাকার জন্য।

তোমরা যদি সুমেরুতে যাও অনেক মজার মজার ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা খুব ভোরে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ওঠ, তাহারা বোধহয় দেখিয়াছ যে সূর্য্যোদয়ের ঠিক আগে পূর্ব্বদিকের আকাশ অতি সুন্দর রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়। তাহাকে 'অরুণোদয়' বলে। পুরাণে আছে অরুণ সূর্য্যের সারথি, কাজেই সূর্য্য ওঠার আগে তাহার ওঠা চাই-ই। ইহাকে উষাও বলে। যাহারা না দেখিয়াছ, তাহারা যদি খুব ভোরে ওঠ তবে এই দৃশ্য দেখিতে পাইবে। দেখিবে, আকাশের পূর্ব্বদিকে কে যেন সুন্দর সিন্দুর লেপিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে এই চমৎকার দৃশ্যটী সাধারণতঃ একঘণ্টা ধরিয়া থাকে, এবং কেবল একদিকেই দেখা যায়। কিন্তু সুমেরুতে ইহা হইতেও সুন্দর উষা দেড় মাস পর্য্যন্ত থাকে এবং এক এক সময়ে এক এক দিক লাল রঙে রাঙিয়া ওঠে। উষার লাল রং এই ভাবে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হওয়ার পর সূর্য্য ওঠে। আরও একটা মজার ব্যাপার এই যে আমাদের দেশে সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়, কিন্তু সুমেরুতে সূর্য্য উদিত হয় ঠিক দক্ষিণ দিকে। আমাদের দেশে

সূর্য্য সাধারণতঃ ১২ ঘণ্টা পরে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু সুমেরুতে সূর্য্য একবার উদিত হইলে আর শীঘ্র অস্ত যাইতে চায় না। সূর্য্য উদিত হইয়া চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে, এবং স্ক্রুর প্যাঁচের মত ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে। এই ভাবে তিন মাস পর্য্যন্ত ক্রমে উপরে উঠিলে তাহার উপরে ওঠা শেষ হয়। আমাদের দেশে বেলা ৮টার সময় সূর্য্য যতটা উপরে ওঠে, সুমেরুতে ৩ মাস ধরিয়া ক্রমাগত উপরে উঠিয়া সূর্য্য ততটা উপরে ওঠে। ইহার উপরে আর কখনও ওঠে না। তখন আবার ক্রমে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে নামিতে থাকে এবং ৩ মাস পরে আবার সেই দক্ষিণদিকে অস্ত যায়। এইরূপে ৬ মাসে সুমেরুতে একটী দিন হয়। আমাদের দেশে সূর্য্য অস্ত গেলে পশ্চিমদিক কেমন সুন্দর লালরঙ্গে রাঙিয়া উঠে তাহা [তোমরা] অনেকেই দেখিয়াছ। এই সময়কে

সুমেরুতে কিরূপ বরফ তাহা এই ছবিখানা হইতে একটু আন্দাজ করিতে পারিবে।

গোধূলি বলে। সাধারণতঃ ইহা ঘণ্টা খানেক ধরিয়া থাকে। কিন্তু সুমেরুতে এই গোধূলি দেড়মাস থাকে এবং ক্রমে চারিদিক্ একে একে সুন্দর রক্তিমায় রঞ্জিত হয়। পরে ৩ মাস পর্য্যন্ত রাত্রি থাকে এবং সুমেরু প্রদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন

হয়। তাহার পরে আবার উষা আরম্ভ হয়। এই ভাবে সুমেরু প্রদেশে ৬ মাস দিন এবং ৬ মাস রাত্রি থাকে।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যে ৬ মাস সুমেরুতে রাত্রি থাকে ঐ সময়ে সেখানকার লোকেরা কাজকর্ম্ম বা চলাফেরা করে কেমন করিয়া ? ভগবানের এত দয়া যে তিনি তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাত্রিতে সুমেরু প্রদেশের আকাশে একরূপ অতি সুন্দর বৈদ্যুতিক আলো দেখা যায়। ঐ আলো সাধারণতঃ একটু নীলাভাযুক্ত এবং দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। ঐ আলোকের নাম "অরোরা বোরিয়ালিস্"। ঐ আলো যদিও ক্ষীণ, তথাপি সাধারণ কাজকর্ম্ম উহাতেই বেশ একরকম চলিয়া যায়। এই আলো সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আর একদিন বলা যাইবে।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ চারিটী দিক—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম। ইহা ভিন্নও ঈশান, নৈঋত, বায়ু ও অগ্নি এই চারিটী দিক আছে। কিন্তু সুমেরু প্রদেশে এক দক্ষিণ দিক ভিন্ন আর কোন দিকই নাই। সুমেরুতে তুমি যে দিকে মুখ দিয়া দাঁড়াইবে তাহাই দক্ষিণদিক হইবে, এবং যে দিকেই রওনা হওনা কেন দক্ষিণদিকেই যাওয়া হইবে। আর একটা দিক অবশ্য আছে। তাহা উত্তর দিক। কিন্তু উত্তরদিকে যাইতে হইলে তোমাকে লাফ দিয়া সোজা উপরের দিকে উঠিতে হইবে। কেমন, খুব মজার জায়গা নয় কি ?

তোমাদের মাষ্টার মহাশয় দিক্ নির্ণয় করিবার দুটী উপায় তোমাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছেন, বোধ হয় মনে আছে। একটী হইতেছে এই যে সূর্য্য যে দিকে উদিত হয় তাহা পূর্ব্বদিক। পূর্ব্বদিকে ডান হাত করিয়া দাঁড়াইলে বাঁদিকে পশ্চিম, সম্মুখে উত্তর, পশ্চাতে দক্ষিণ দিক থাকিবে। আবার সূর্য্য যেদিকে অস্ত যায় তাহা পশ্চিমদিক। এই সহজ উপায়টী কিন্তু সুমেরুর বেলায় খাটিবে না। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুমেরুতে সূর্য্য ঠিক দক্ষিণদিকে উদিত হয় এবং যে স্থান হইতে উদিত হইয়াছে ৬ মাস পরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠিক সেই স্থানেই অস্ত যায়।

আর একটী উপায় তোমরা শিখিয়াছ যে কম্পাসের কাঁটা সর্ব্বদা উত্তর-দক্ষিণ-মুখী হইয়া থাকে। ঐ কাঁটাকে জোর করিয়া অন্যভাবে রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেও তাহা আবার ঠিক উত্তর-দক্ষিণ-মুখী হইবে। জাহাজের নাবিকেরা এই কম্পাস দিয়াই দিক নির্ণয় করে। তোমরা বোধ হয় সকলেই এইরূপ কম্পাস দেখিয়াছ। তোমরা যদি এইরূপ একটি কম্পাস দিয়া দিক নির্ণয় করিবার জন্য সুমেরুতে যাও, তবে দেখিবে, কম্পাসের কাঁটাটী ঠিক লম্বাভাবে একমুখ মাটির দিকে এবং অন্য মুখ আকাশের দিকে দিয়া আছে। জোর করিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেও আবার ঐরূপ লম্বাভাবে থাকিবে। সুতরাং এই উপায়ও এখানে ব্যর্থ হইবে অর্থাৎ সুমেরুতে দক্ষিণদিক ভিন্ন আর কোনও দিক নাই। কেবল সোজা উপরের দিককে উত্তর বলা যাইতে পারে। তোমরা ছোটকালে দশটী দিকের নাম মুখস্থ করিতে না পারিয়া এবং তাহা না দেখাইতে পারিয়া হয় ত মাষ্টার মহাশয়ের নিকট বকুনি খাইয়াছ। কিন্তু সুমেরুতে থাকিলে মাত্র দুইদিক অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ, ইহা শিখিয়াই রেহাই পাইতে।

এই মজার দেশের কথা শুনিয়া তোমাদের বোধ হয় একবার সুমেরুতে বেড়াইয়া আসিবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কিরূপে সেখানে যাওয়া যায় এবং কোথায় কি ভাবে থাকা যায়, কে কে সেখানে গিয়াছে বা যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছে তাহা তোমাদিগকে আর একদিন বলিব।

"এদিকে একটু ক্যাঁচ আর ওদিকে একটু ঘ্যাঁচ"

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি-এ)

এক যে শেয়াল তার ভারী দুঃখ—মানুষের চেয়ে তার বুদ্ধি শুদ্ধি কম নয়, আর সবাই বলেও তাকে পণ্ডিত, তবু কিনা তার বনে-জঙ্গলেই বাসা!

একদিন সে শেয়ালনীকে বল্‌লে—'হ্যাঁগা পণ্ডিতানী, যত আপদ-বালাই

তো এই চার ঠ্যাঙ্গেই! চারটে ঠ্যাঙ্গের বদলে যদি আমার দু ঠ্যাং হয়, তা হলেই তো আমি খাড়া হ'য়ে হাঁটতে পারি। আর তখন আমাকে মানুষ পণ্ডিতই বা না বলে কে?'

শেয়ালিনী বল্‌লে—'সে তো ঠিকই। আর, তা হ'লেই তো সহর গাঁয়ে আমরা থাক্‌তে পারি।'

কিন্তু মুস্কিল তো ঐ সামনের ঠ্যাং জোড়ায়ই! ও যে হাতও না, আবার পায়ের বেলাও বাড়তি ঠ্যাং! এটা শোধরাবার উপায় কি?—শেয়াল শেয়ালনী দু' জনেই ভেবে পায় না।

"যদি আমার দু'ঠ্যাং হয়......"

একদিন রাতে শেয়াল গেরস্থ-বাড়ী গিয়েছে; শোনে—ওপাড়ার নাপিত বুড়ো নাকি খুব সেয়ানা,—তার বুদ্ধির কাছে সবাই ঘা'ল! শেয়াল ভাব্‌লে—ব্যস! এই তো খোঁজ মিল্‌ল! কালই নাপিত বুড়োর কাছে যাওয়া যাক্—যদি যুক্তি মেলে!

পরদিন সকাল সকাল শেয়াল নাপিত-বুড়োর বাড়ী গিয়ে হাজির। সে দরজায় দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগ্‌ল—'ঠাকুদ্দা, ঠাকুদ্দা, ঘরে আছেন?'

ডাক শুনে' নাপিত বুড়ো বেরিয়ে আস্‌তেই শেয়াল বল্‌লে—'পেন্নাম হই, ঠাকুদ্দা!'

নাপিত-বুড়ো শেয়ালকে দেখে' বল্‌লে—'আরে, কে ও? শেয়াল পণ্ডিত যে! এস এস!...তারপর, কি মনে ক'রে, ভায়া?'

শেয়াল বল্‌লে——'এই—এ পথে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম—বুড়ো দাদামশাইর পায়ের ধূলোটা নে যাই; আর সেই সুযোগে দু-চারটে ধম্ম-কথাও শোনার সুবিধে হবে। এদেশে বিদ্যেবুদ্ধিতে ঠাকুদ্দার জুড়ি কে?'

একথা-সেকথার পর শেয়াল নাপিত-বুড়োকে বল্‌লে—'হ্যাঁগা ঠাকুদ্দা, আপনি তো আদ্যিকালের অনেক খবর রাখেন। সে কালে নাকি যে যা-খুসি তাই হ'তে পার্‌ত?—সত্যি নাকি?'

নাপিত-বুড়ো বল্‌লে—'সত্যি না তো কি! সেকালে কি আর তোমার আমার মত শেয়ালে মানুষে তফাৎ ছিল? ইচ্ছে হ'লেই মানুষ হ'তে পার্‌ত শেয়াল, আর শেয়াল হ'তে পার্‌ত মানুষ।'

শুনে' শেয়ালের মন আশায় নেচে উঠ্‌ল। সে ভাব্‌ল—আহা, অমন আদ্যিকালের কাণ্ড যদি এখনও ঘটে!...তা, নাপিত-বুড়ো সেয়ানা লোক, বিদ্যা-বুদ্ধিতে মস্ত পণ্ডিত, তার হয়তো এর হদিস জানা আছে।—এই-না ভেবে সে জিজ্ঞেস করলে—'আচ্ছা, ঠাকুদ্দা, এই যা-খুসি হওয়া কি এখনও চলে না?—শেয়াল কি এখন মানুষ হতে পারে না?'

শেয়াল সেয়ানা বটে; কিন্তু নাপিত-বুড়ো সেয়ানাগিরীতে তার ওপর টেক্কা দেয়। শেয়াল মানুষ হওয়ার কথা কেন বল্‌চে, তার আঁচ ক'রে নিতে দেরী হ'লো না। তাই সে মনে মনে হাস্‌তে লাগ্‌ল। মুখে বল্‌ল—'কেন চল্‌বে না, ভায়া? তবে যাকে তাকে দিয়ে চলেনা, বটে!...কেন, তোমার মানুষ হওয়ার ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে নাকি হে?'

শেয়াল মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে ই'য়ে ই'য়ে ক'রে জবাব দিল—'হ্যাঁ,—তা—ইচ্ছে কি আর হয় না, ঠাকুদ্দা! কিন্তু সাম্‌নের এই বাড়্‌তি ঠ্যাং জোড়া নিয়েই তো মুস্কিল!'

নাপিত-বুড়ো শেয়ালের কাঁধ চাপ্‌ড়িয়ে বল্‌ল—'আরে, এমন ইচ্ছের কথাটা মুখ ফুটে' বল্‌তে হয়! বাড়্‌তি ঠ্যাং আছে তো আছে, তার কম্‌তি ক'রে তোমাকে মানুষ ক'রে দিতে কতক্ষণ?'

শেয়াল ভারী খুসী হ'য়ে বল্‌ল—'হেঁ হেঁ—ঠাকুদ্দা, আপনি বুদ্ধিমন্ত ওস্তাদ লোক,—আপনার অসাধ্যি কি!'

শেয়াল মনে মনে ভাব্‌ল—যাক্‌, এতক্ষণে সত্যি সত্যিই একটা হদিস হ'লো! ভাগ্যিস্‌, ঠাকুদ্দার কাছে এয়েছিলুম।

নাপিত-বুড়ো ভাব্‌ল—রোস, বাছাধন! রোজ রোজ হাঁড়ি মেরে চম্পট দাও! এবার নরসুন্দরের হাতে পড়েচ! তোমার বাড়তি ঠ্যাং কি ক'রে কম্‌তি করতে হয়, আচ্ছা ক'রে দেখিয়ে দেবো'খন!

শেয়ালের তর সইছিল না। সে বল্‌লে—'ঠাকুদ্দা,—তবে—এই সামনের ঠ্যাং জোড়ার কথা যা বল্‌ছিলুম,—ওটা থাক্‌লে তো আর মানুষ হওয়া চলে না! এটার কি করা যায়?'

নাপিত-বুড়ো বল্‌ল—'না-ই বা করা যায় কি! দেখ, পণ্ডিত, আমি নাপিতের ব্যাটা, এই হাতে অনেক কাজ করেচি—লোকের গোঁফ কামিয়ে প্রজাপতি বানিয়ে দিয়েচি, দাড়ি কামিয়ে নুর ক'রে দিয়েচি, মাথা কামিয়ে কদমফুলী কেয়ারী তৈরী করেচি, আর তোমার দুখানা ঠ্যাং কামিয়ে এমন কিছু করতে পারব না যাতে তুমি মানুষ হও! আমাকে ভাব কিহে, পণ্ডিতের পো?'

শেয়াল তাড়াতাড়ি গড় ক'রে বল্‌ল—'সে আপনার দয়া, ঠাকুদ্দা!'

নাপিত-বুড়ো বল্‌ল—'হ্যাঁ, তবে একটা কথা আছে। ঠ্যাং কামানো কি না,—এটা ঠিক গোঁফ-কামানো দাড়ি-কামানো চুল-কামানোর মত নয়। কাজটা একটু বড় ধরণের, আর ব্যাপারটাও পণ্ডিতকে নিয়ে, কাজেই এতে একটু রাম-কামানোর দরকার।'

'রাম কামানো' কি, শেয়াল বুঝ্‌তে পারল না। বল্‌ল—'সে কি রকম?—কোনো বিপদ-আপদের ব্যাপার না তো?'

নাপিত বুড়ো বল্‌ল—'আরে রামো! একি ছেলেখেলা নাকি? বলি, রামছাগল দেখেচ তো হে?—বড় ছাগলকে যা বলে? আর, রাম দা-ও দেখেচ,—যা বড় দা-কে বলে? সেই রকম রাম-কামানোও হচ্ছে বড় কামানো। ওরকম কামানো যখন চলে, মনে হয় যেন ঠাণ্ডী বরফের পাংখা চল্‌চে। আর কাজটাও তো তেমন কঠিন নয়—শুধু এদিকে একটু ক্যাঁচ, আর ওদিকে একটু ঘ্যাঁচ!—ব্যস্‌, হয়ে গেল! একবার রামকামানো কামিয়েই দেখনা, ভায়া?—দেখ্‌বে মেম সায়েবের মত ধিন্‌ ধিন্‌ ক'রে কেমন উড়ন্ত নাচ চলে!'

"একটু রাম-কামানোর দরকার"

শুনে' শেয়াল আহ্লাদে আটখানা! সে বরাবরই সুধোতে লাগল—কাজটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির করা যায় কি না।

নাপিত-বুড়ো বল্‌ল—'কেন যাবে না? বলতো, এক্ষুণি ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু বাপু, একটা কথা। রাম-কামানো কাজটা একটু গোপন কাণ্ড—গুরুর মানা, যার তার সাম্‌নে কর্‌লে ফল ফলে না। তুমি চোখ দুটো একটু বুজে' থাক দেখি, আমি দু মিনিটে কাজ সাফাই ক'রে দিচ্ছি।'

নাপিত-বুড়োর কথামত শেয়াল চোখ বুজে' রইল। নাপিত-বুড়ো তার

ওপর আবার একখানা গামছা বেঁধে দিল! তারপর শেয়ালকে সাম্‌নের ঠ্যাং দুটো বাড়িয়ে দিতে বল্‌ল।

এর মধ্যে নাপিত-বুড়ো ক্ষুরখানাকে বেশ ক'রে শানিয়ে নিল। তারপর শেয়ালের ঠ্যাং দুটো ধ'রে চটাপট বসিয়ে দিল, কব্‌জীর এদিকে একটু ক্যাঁচ আর ওদিকে একটু ঘ্যাচ—এই না ক'রে ক্ষুরের দু' দু' পোঁচ! ক্ষুরের ধারে শেয়ালের ঠ্যাং কেটে প্রায় দু'ভাগ। বেদনায় শেয়াল হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল!

নাপিত-বুড়ো শেয়ালের চোখের বাঁধন খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল—'আরে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ! পণ্ডিত হ'য়ে তুমিও অসভ্য লোকের মত চ্যাঁচাচ্ছ? কি হ'য়েচে, তোমার? দেখ দেখি এবার হেঁটে—পেছনের দু'-ঠ্যাঙ্গে সোজা খাড়া হ'য়ে উঠে?'

শেয়াল দু'-পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে গেল।

নাপিত-বুড়ো বল্‌ল—'প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবেই তো। দু'চার বার চেষ্টা কর, অভ্যেস হ'য়ে গেলে আর কষ্ট কি? কিন্তু দাঁড়াবার সময় ল্যাজটাকে ঠ্যাঙ্গের ফাঁকে এ কি রকম রাখ্‌চ?—নিশানের মত খাড়া ক'রে ঠিক মাথার দিকে তুলে ধর—যেমন রাজা রাজড়া মানুষরা রাখে। তুমি মানুষ পণ্ডিত হ'তে চল্‌চ, সব রকমে মানুষের মত হওয়া চাই তো!'

একে তো সামনের ঠ্যাং খোঁড়া; তার ওপর ল্যাজ নীচু ক'রে রেখে তাল-সামলানের যে কাজ চল্‌ছিল, নিশানের মত ল্যাজটাকে খাড়া ক'রে ধ'রে শেয়ালের সে তাল রইল না। একবার ওঠে একবার পড়ে, আবার পড়ে আবার ওঠে—এই রকম ডিগ্‌বাজী খেতে লাগ্‌ল। কিন্তু মাটীতে পড়ে থাকাও দায়—কাটা ঘায়ে ধূলা মাটী লেগে যাতনার একশেষ!

সারাদিন এভাবে গেল। জ্বালাযন্ত্রণার মাঝেও শেয়ালের মনে হয়—গেরস্তর কুকুর না এসে পড়ে!

সন্ধ্যার সময় গেরস্তর কুকুর ঘরে ফিরতে দেখে—ও কি, জানোয়ার! দু'ঠ্যাং নেই বল্‌লেই হয়; আবার ধনুকের মত টং হ'য়ে আছে—একটা ল্যাজ, না কি ও?

গেরস্তর কুকুর ঠিক ঠাওর করতে না পেরে দূরে দাঁড়িয়ে ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ কর্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার পর বনে-জঙ্গলে রাজ্যের শেয়ালেরা ডাক সুরু করলে—হুক্কা হুয়া! জ্ঞাতি লোকের ডাক শুনেও শেয়াল কষ্টে সৃষ্টে মুখ গুজে রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ থাক্‌তে না থাক্‌তে হুক্—হুক্ করতে করতে হঠাৎ তারও গলা ফুটে' ডাক বেরুল—হুক্কা হুয়া!

এবার আর গেরস্তর কুকুরের মনে সন্দ রইল না। সে শেয়ালকে চিন্‌তে পেরে এক লাফে ছুটে' এসে তার ঘাড় কাম্‌ড়ে ধ'রল। তখন আর শেয়াল পণ্ডিতের নড়া চড়ার জো রইল না!

মন্দির ও মসজিদ

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ)

মন্দির মসজিদ বহুদিন পরিচয়,
সুগভীর রজনীতে চুপি চুপি কথা কয়।
বলে,—সখা হে সুহৃদ্, কি দারুণ লজ্জা,
দু'জনের লাগি দু'দলের রণসজ্জা।
ভাঙ্গিলে যে ভাঙ্গে নাক তারে ভাঙ্গা শক্ত,
ওরা করে কাটাকাটি গায়ে মেখে রক্ত।
ছায়া লয়ে দুই দলে রচে মিছে দ্বন্দ্ব,
গুটিপোকা সম করে নিজ পথ বন্ধ।

২

মন্দির উঁচু হলে করে এরা ভঙ্গ,
শিলা লয়ে করে তার নানাবিধ রঙ্গ।

দিতে এরা দেবে নাক ভগবানে মূর্ত্তি,
যেন তাঁর রক্ষক ভেবে করে স্ফূর্ত্তি।
মসজিদ ভাঙ্গে ওরা একটুকু নাহি বোধ,
ভাবে হবে মন্দির ভগ্নের প্রতিশোধ।
দরগায় বসাইয়া দেয় কেহ মহাবীর,
জানে নাক ভগবান একেবারে সবারির।

৩

এ দারুণ মূঢ়তার কি ভীষণ পরিণাম,
মসজিদ চটে যাবে শুনিলেই হরি নাম।
মন্দির হতমান তাজিয়ার বাগ্যে,
লজ্জা ত লাগে নাক মিছে কথা ছাঁদ্‌তে।
তাঁর নামে যেই ঠাঁই অভিষেক করা ভাই,
ভকতের আঁখিজলে যেই ঠাঁই গড়া ভাই,
যে মাটীতে লুটাইয়া সান্ত্বনা লভে প্রাণ,
এরা নিতি অবহেলে করে তারি অপমান।

৪

কেহ মোরা খেলাঘর কেহ মোরা অন্দর,
লীলা করে সব ঠাঁই সেই শিব সুন্দর।
আছি মোরা দাঁড়াইয়া বুকে ধরি তাঁরি নাম,
ধ্যান করি অবিরল সেইরূপ অভিরাম।
দুই বাঁশী দুই সুরে একজনে ডাকি ভাই,
দু'জনার দুটী ফুল একই পদে লভে ঠাঁই।
এ দুয়ের মাঝে এরা দিতে বাঁধ আগুয়ান,
ধর্ম্মের নামে করে ধর্ম্মেরি অপমান।

অরুণ-আলো

(ছোটদের বড় গল্প)

(শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম্, এ)

৯

কিন্তু আলো কোথায়? কোন অন্ধকার কারাগারে সে কাঁদ্‌চে? কোন দুর্দ্দান্ত দৈত্যের অত্যাচারে সে অপমান সইচে? কোন নির্জ্জন মরুভূমিতে সে একা একা সাহায্যের জন্য হাহাকার করচে? কে জানে?

অরুণ এই সব ভাবে, আর তার বুকের ভিতরে কান্নার বেদনা বাড়্‌তে থাকে। হায়রে, কে জানে আলো কোথায়?

১০

বিরাট্ অরণ্যের পথে পথে ছোট্ট একজন উন্মাদের মত অরুণ ছুটে চলেছে! বিহঙ্গদের ডেকে সে জিজ্ঞাসা করে—"ওরে পাখী, আলো কোথায়?"

পাখীরা কিছুই বলে না, কখনও বা বলে—জানি না, জানি না, জানি না।

"ওরে পশু, আলো কোথায়? তাকে দেখেছিস্? ও আকাশ, ও বাতাস, তোমরা জানো?"

না, তারাও জানে না।

অরুণ মেঘকে ডেকে বলে—'ওগো মেঘ, লক্ষ দেশে তোমার অবাধ গতি, লক্ষ দেশে তুমি আনন্দ কর। যদি কখনও আলোকে দেখ্‌তে পাও, আমায় জানিয়ো; আমি তোমায় দূত ক'রে সে দেশে পাঠাব,—ওগো মেঘ, আমায় জানিয়ো।'

মেঘ বলে—"হায় অরুণ, তার আগেই আমি তোমার দুঃখ দেখে কেঁদে গ'লে বৃষ্টি হ'য়ে যাব।"

জোৎস্না রাত্রে অরুণ বনের পথে ছুটে যায়, বিষাক্ত সাপগুলো ভয় পেয়ে

পথ ছেড়ে এদিক ওদিক ছুটে পালায়,—কিন্তু কামড়ায় না। রৌদ্রের মধ্যে অরুণ ছুটে চলেছে, বাঘ ভালুক হাঁক ঘাঁক করে, হালুম্ হালুম্ করে,—কিন্তু কাছে আসে না। অন্ধকার অমাবস্যারাত্রে ভূতেরা নাকিস্বরে ভয় দেখাবার ষড়্‌যন্ত্র করে, কিন্তু ভয় দেখায় না,—তার কারণ এই যে সত্যিই ত আর ভূত নেই।

অরণ্যে বা পর্ব্বতে, মরুভূমিতে বা সরোবরে—কোথাও আর খুঁজ্‌তে বাকি রইল না।

অবশেষে অরুণ এক মহাসমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছল। একখানা ভাঙ্গা নৌকা নিকটেই ভাস্‌চে। মহাসমুদ্র চুপটি ক'রে অরুণের দিকে চেয়ে রয়েছে, এবং নৌকাখানা হেলে দুলে অরুণকে যেন নিমন্ত্রণ কর্‌চে। ক্লান্ত দুঃখী অরুণ ধীরে ধীরে নৌকায় উঠে বস্‌ল,—তারপর নৌকা ছেড়ে দিল।

১১

মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে অরুণ ভেসে চলেচে। অকস্মাৎ সে সম্মুখে কি দেখ্‌ল, জানো?

মস্ত একটা ঢেউয়ের উপর একজন তপস্বী স্থির হ'য়ে ব'সে রয়েছেন,—তাঁর চোখে মুখে স্বর্গের হাসি, তাঁর দেহে স্বর্গের জ্যোতি, অন্তরে দিব্য আনন্দ।

অরুণ ভক্তিভরে প্রণাম কর্‌ল।

ভাল ক'রে দেখে দেখে অরুণ আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল;—য়্যা, এযে বিদ্যাসাগর মশায়। কি আশ্চর্য্য! কি আনন্দ!

যে বিদ্যাসাগর ম'শায়ের কথা সে কতবার নানা বইএ পড়েছে, যাঁর ছবি সে কতবার কত বইএ দেখেছে, আর মনে মনে কত কথা ভেবেছে,—সেই বিদ্যাসাগর মশায় কিনা আজ সশরীরে অরুণের চোখের সাম্‌নে ব'সে রয়েছেন, তপস্যা কর্‌চেন।

অরুণের নৌকা আপনা হ'তেই সেই মহাতপস্বীর পায়ের কাছে এসে থেমে রইল।

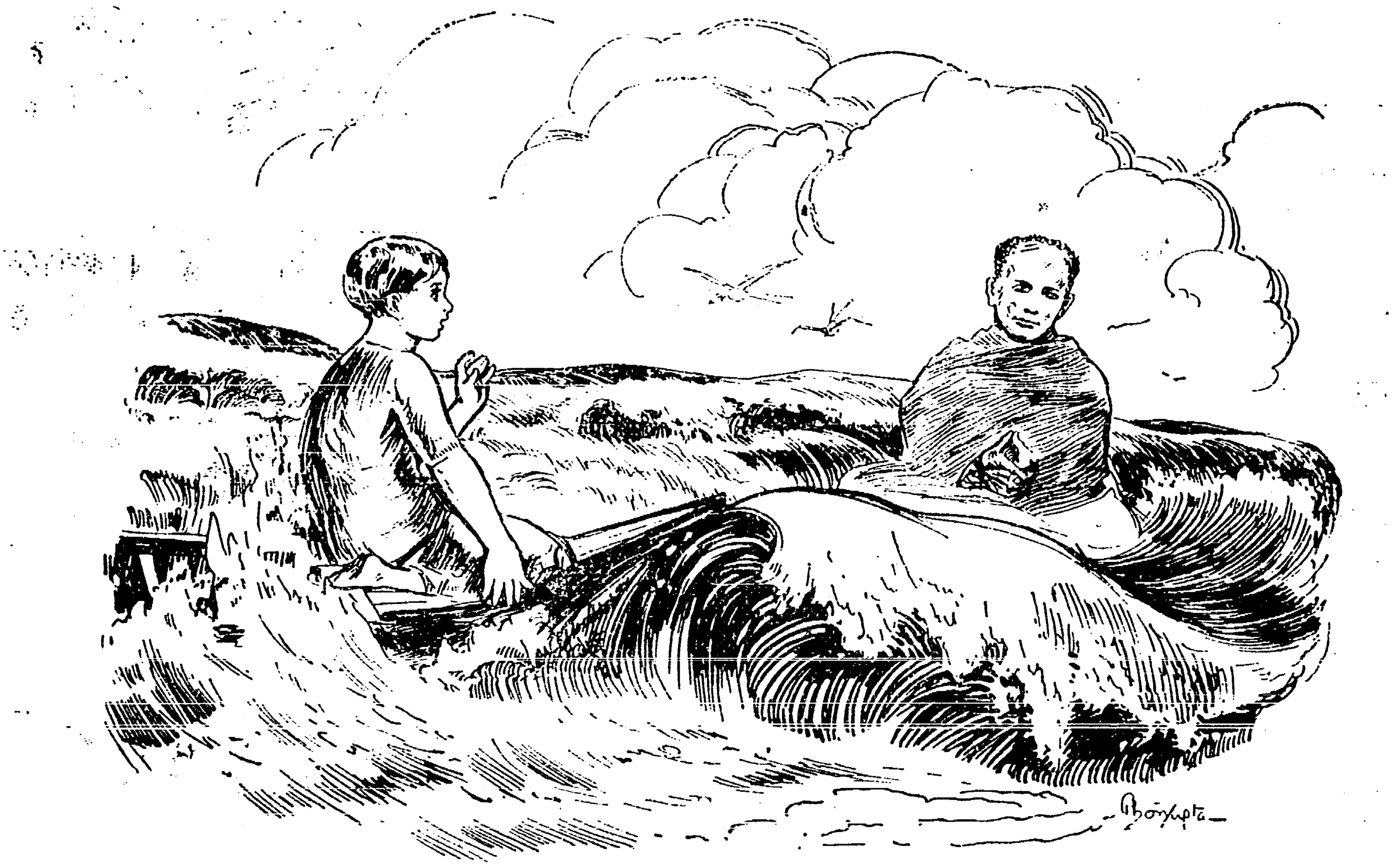

অরুণের নৌকা……সেই মহাতপস্বীর পায়ের কাছে এসে থেমে রইল।

বিদ্যাসাগর মশায় বল্‌লেন—ওহে বাপু, কে তুমি?

অরুণ সবিনয়ে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, আমি অরুণ। আমাকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন্ না, কিন্তু আমি আপনাকে খুবই ভাল ক'রে চিনি। একদিন আলো আপনার একখানা ছবি ছিঁড়ে ফেলেছিল—"

অরুণ আর বল্‌তে পার্‌লে না, আলোর কথা যেই মনে হ'ল অমনি সে হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল।

বিদ্যাসাগর মশায় যে শুধু বিদ্যার সাগর তা নয়, তিনি দয়ারও সাগর। অরুণের দুঃখ দেখে তিনি বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন,—বল্‌লেন—"তা বাছা, তুমি কাঁদ্‌চ কেন? কি হয়েচে?"

অরুণ কত চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না, কেবল কাঁদ্‌ল।

বিদ্যাসাগর মশায় বল্‌লেন—'দেখ, অরুণ, কাঁদ্‌তে নাই। কাঁদ্‌লে শক্তি কমে যায়, সাহস কমে যায়। যা হোক্‌, তোমায় আমি একটী দ্রব্য দিচ্ছি, এইটী নিয়ে চট্‌ ক'রে ফিরে যাও। আহা বাছা, কাঁদ কেন?'

এই কথা ব'লে এবং গভীর আশীর্ব্বাদ ক'রে সেই মহাসাগরের মাঝখানে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর অরুণকে একটী ক্ষুদ্র ফুল দিলেন! অরুণ সেই ফুলটী নিয়ে বিদ্যাসাগর মশায়কে প্রণাম ক'রে নৌকা ভাসিয়ে মনের সুখে ফিরে এল।

বিদ্যাসাগর মশায়ের দান! এ ফুলে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ রকমের উপকার হবেই হবে।

দেখা যাক্‌, কি হয়।

১২

বিদ্যাসাগর মশায়ের সেই ফুলটী হাতে ক'রে অরুণ মনের আনন্দে নৌকা থেকে যেই মাটীতে এসে নেমেছে, অম্‌নি সেই ফুল টুপ ক'রে হাত থেকে পড়ে গেল। প'ড়েই ফুল গেছে অদৃশ্য হ'য়ে।

আর সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—একটি ছোট্ট সুন্দর ফুরফুরে পরী! পরীটি অরুণের চাইতেও ছোট্ট এবং অসম্ভবরকম লাবণ্যময়ী। তার মেঘবরণ কেশ, দেবকন্যার বেশ, ফুলের মত মুখ, মনে অগাধ সুখ, তার চোখের চাহনিতে দুষ্টুমি আর ভালবাসা এক সাথে খেলা কর্‌চে।

পরী কিনা,—তাই এমন।

তার রূপের ছটায় চারিদিক হেসে উঠ্‌ল। অরুণ অবাক্‌ হ'য়ে তাকে দেখ্‌চে আর ভাব্‌চে,—ভাব্‌চে আর দেখ্‌চে, কোনই কুলকিনারা পাচ্ছে না।

অবশেষে অরুণ বল্‌লে—'তুমি বুঝি নিশ্চয়ই পরী;—কি বল?'

পরী হাসিমুখে বল্‌ল—'হাঁ, আমি পরী। তুমি আমায় বিয়ে কর্‌বে?'

অরুণ এখন আলোর খোঁজে হাহুতাশ ক'রে বেড়াচ্চে, আর দুষ্টু পরী কিনা ব'লে বস্‌ল,—"কি অরুণ, তুমি আমায় বিয়ে কর্‌বে?" কি অদ্ভুত! আরে, এটা কি বিবাহের কথা কইবার সময়!

সুতরাং অরুণের খুবই রাগ হ'ল। সে বেশ তীব্রস্বরে উত্তর দিল—

"না, আমি তোমায় বিয়ে করব না, কর্‌ব না, কর্‌ব না, কিছুতেই না।"

পরী হাসে আর বলে—'না, অরুণ, তুমি আমায় বিয়ে কর্‌বে, কর্‌বে, কর্‌বে, নিশ্চয়ই কর্‌বে।'

অরুণ। না।

পরী। হাঁ।

অরুণ। কিছুতেই না।

পরী। নিশ্চয়ই হাঁ।

অরুণ। না, না, না।

পরী। হাঁ, হাঁ, হাঁ।

এযে এক নূতন বিপদ! (ক্রমশঃ)

বেলা শেষের গান

(শ্রীকালিদাস রায়)

দিন ফুরালে শিশু যেমন
যায় ফিরে তার মায়ের কোলে,
তেমনি ক'রে খেলা ছেড়ে
তোর কাছে মা যাব চ'লে।
হাত দু'খানায় ধূলি মাখা
অঙ্গে খেলার চিহ্ন আঁকা,
ময়লা ধূলা দিবি মুছে
স্নেহাঞ্চলে ড'লে ড'লে।
ধমকানি তোর শোনার আগেই
ঠোঁট ফুলিয়ে ফেল্‌ব কেঁদে,

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর।

জানি মা, তুই শাসন ভু'লে
বসন ডোরে ফেল্‌বি বেঁধে।
খেল্‌না বাঁশী থাক্‌বে প'ড়ে,
নাম্‌বে স্বপন নয়ন ভ'রে,
খেলার কথা সকল ব্যথা
ভুল্‌ব মা তোর কোলের দোলে।

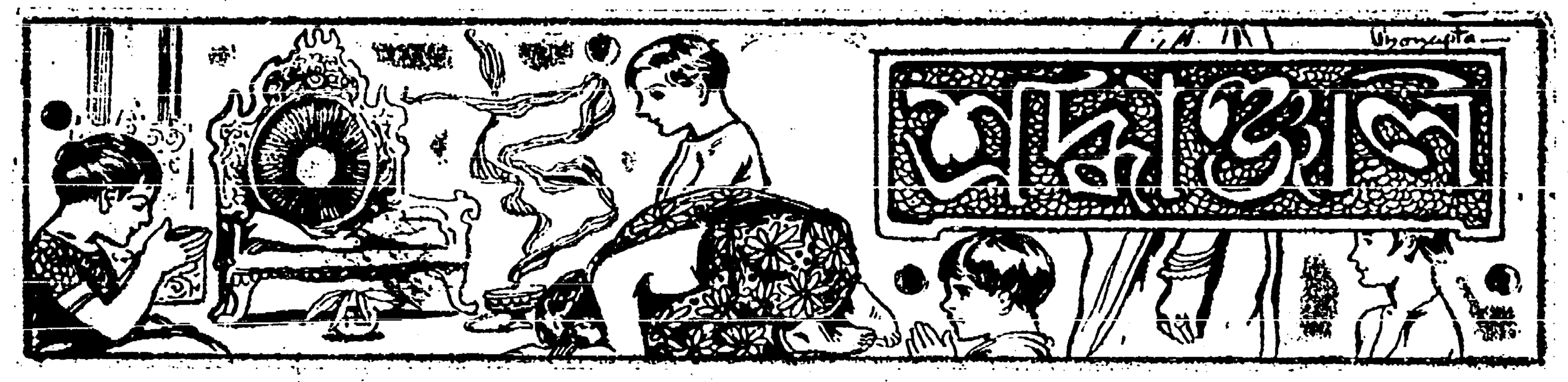

লর্ড সিংহ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ)

রামধনুর পাঠকপাঠিকাগণ, মাত্র অল্প কয়দিন হইল, তোমরা বাংলা দেশের একজন মস্ত লোককে হারাইয়াছ। কাহার কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিয়া লইয়াছ—বলিতেছি লর্ড সিংহের কথা।

সেই যে একটা কথা আছে না যে, "উদ্যোগী পুরুষসিংহেরাই লক্ষ্মীলাভ করে", সে কথাটা লর্ড সিংহ সম্বন্ধে খুব বেশী করিয়াই খাটে। কি-ই বা তিনি ছিলেন আর কি-ই বা তিনি হইয়াছিলেন! জীবনের প্রথম ভাগটায় তিনি ছিলেন এমনি সাধারণ অবস্থার লোক—সে অবস্থার লোক বাংলা দেশে অনেকই আছে। কিন্তু পরে যাহা হইলেন তাহার জুড়ি বাংলাদেশ তো দূরের কথা, গোটা ভারতবর্ষটা খুঁজিলেও আর একটী পাইবে না। এই যে সাধারণ অবস্থার লোক হইতে এত বড় হওয়া, এ সমস্তই কিন্তু হইয়াছিলেন তিনি কেবলমাত্র নিজের যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে।

লর্ড সিংহের পূরা নাম সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। তাঁহার বাড়ী ছিল বীরভূম জেলায়, রায়পুর নামে একটা গ্রামে। সেখানেই তিনি ১৮৬৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। খুব ছোটবেলাতেই তাঁহার বাবা মারা যান, কাজেই তাঁহাকে মানুষ করার ভার পড়িল তাঁহার মা ও বড় ভাইয়ের উপর। সত্যেন্দ্রকে তাঁহারা বীরভূমের জেলাস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছোট্ট ছেলেটী, বই বগলে দুইবেলা স্কুলে আনাগোনা করে, ভারী মিষ্টি ও শান্ত স্বভাব। কাজের বেলায় কিন্তু ভারী হুঁসিয়ার—পড়াশুনায় ভারী দুরন্ত। বয়সে অন্যান্য সহপাঠীদের চেয়ে

অনেকটা ছোট, মাথায় আরও ছোট, কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় সকলকেই পটাপট্ নীচে ফেলে। হেড্মাষ্টার শিব-বাবু তাই তাহাকে বেজায় ভালবাসেন—যে আসে তাহার কাছেই তাঁহার 'সতু'র গর্ব্ব করিয়া বেড়ান।

লর্ড সিংহ

এন্ট্রান্স্ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন চলিয়া আসিলেন কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবেন বলিয়া। ক্রমে এফ্-এ পরীক্ষাটাও বেশ ভাল করিয়াই পাশ করিলেন।

এইবার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন মনে মনে এক মৎলব আঁটিতে লাগিলেন—তাইতো, বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারীটা পাশ করিয়া আসিতে পারিলে তো বেশ হয়! নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন নামে তাঁহার এক দাদা এই সময়ে পড়িতেছিলেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে। দুই ভাই মিলিয়া রোজই যুক্তি আঁটেন। কিন্তু বিলাত যাইব বলিলেই তো আর যাওয়া হয় না—টাকা পাওয়া যাইবে কোথায়? ঠিক এই সময়ে নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন সাবালক হইয়া হাজার পাঁচেক টাকা পাইলেন। আর কি কথা আছে? কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, চুপি চুপি দুই ভাই গাঁট্‌রী বোচ্‌কা বাঁধিয়া

একেবারে বিলাতের জাহাজে গিয়া চাপিয়া বসিলেন। জাহাজ ছাড়িতেই ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গেল। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরা সেই পলাতক আসামী দুইটীকে পাক্‌ড়াও করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা ততক্ষণে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন।

সত্যেন্দ্র কাজের ছেলে, তাই বিলাতে গিয়া আবার বিপুল উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলেন। বিলাতে তো আর তিনি হুজুগে পড়িয়া আসেন নাই, যে কেবল্ হৈ চৈ করিয়া বেড়াইবেন! আসিয়াছেন ব্যারিষ্টারী পড়িতে, কাজেই পড়াশুনা না করিলে চলিবে কেন? এমনি মনোযোগের সহিত আইন পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন যে তাঁহার দস্তুরমত নামডাক পড়িয়া গেল—প্রত্যেক বছরই মোটা মোটা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। খালি আইন পড়িয়াও মন উঠে না, ল্যাটিন প্রভৃতি নানা রকম ভাষাও শিখিতে সুরু করিয়া দিলেন। এমনি কাজের উৎসাহ! ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা খুব ভাল ভাবে পাশ করিয়া ২৩ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠিক হইল কলিকাতার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবেন। হাইকোর্টে ওকালতী বা ব্যারিষ্টারী করায় কিন্তু অসুবিধা বিস্তর। প্রথমতঃ ধরিয়া লইতে হয়, যে কিছুদিন পর্য্যন্ত একটি পয়সাও রোজগার হইবে না। বাড়ী হইতে যে রোজ হাইকোর্টে আসিবে, সে গাড়ীভাড়াটাও হয়তো নিজের ট্যাঁক্ হইতেই দিতে হইবে, ওকালতীর রোজগারে কুলাইবে না। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও পড়িয়া গেলেন এই অসুবিধার মধ্যে। অমন আইনের জ্ঞান, অমন খাটিবার ক্ষমতা, অমন বক্তৃতা দিবার শক্তি, অথচ কোন মক্কেলই কাছে ঘেঁষে না। কাজেই রোজগারও হয় তথৈবচ। তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, দেখি যদি কিছুদিন পরে একটু আধটু সুবিধা হয়। কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং—মোকদ্দমা করিতে বড় কেউ একটা ডাকে না। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি আর টেঁকে না! তিনি ঠিক করিলেন, ঢের ব্যারিষ্টারী হইয়াছে, যাই এইবার দেখি একটা মুন্সেফি টুন্সেফি পাই কিনা। মুন্সেফির জন্য একখানা দরখাস্ত ঝাড়িয়া দিয়া গেলেন এক জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাইতে। জ্যোতিষী হাতখানা একটু নাড়িয়া চাড়িয়া

বলিলেন "কই বাপু, মুন্সেফী টুন্সেফী তো আপাততঃ তোমার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না!" মুখখানা কালো করিয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

ভগবানের বিশেষ দয়া যে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেবার মুন্সেফী পান নাই। পাইলে, আজ যে আমরা, বাঙ্গালীজাতি, লর্ড সিংহের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছি, তাহা আর করিতে পারিতাম না। কেননা মুন্সেফী চাকুরীতে ঢুকিলে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন তাঁহার প্রতিভা দেখাইবার সুবিধাই মোটে পাইতেন না।

কলিকাতায় যে সিটি কলেজ আছে, সেখানে তখন এফ-এ, বি-এ প্রভৃতির সহিত আইনও পড়ান হইত। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এই সিটি কলেজে আইন পড়াইবার জন্য একটা প্রোফেসারি জুটাইয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীও চলিতে লাগিল।

এইবার একটু একটু করিয়া হাইকোর্টে তাঁহার পশার হইতে লাগিল। হইবেই তো, কেননা ছাইয়ে আর আগুন কতদিন ঢাকা থাকিতে পারে? মনে কর, প্রথমে তিনি একটা মোকদ্দমা পাইলেন। এমনি ভাবে তখন তিনি সেই মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন, যে সকলেরই নজর পড়িল তাঁহার কাজের উপর। তাঁহার জেরায় পড়িয়া সাক্ষীসাবুদ একেবারে নাস্তানাবুদ হইতে লাগিল, বক্তৃতার তোড় দেখিয়া বিপক্ষ দল ভড়্‌কাইয়া গেল, তর্কের চোটে বিপক্ষের উকীল ব্যারিষ্টারেরা কোণঠেসা হইলেন, আর আইনের জ্ঞান দেখিয়া জজেরা পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া গেলেন। এমন লোককেই যদি ভবিষ্যতে লোকে মোকদ্দমা না দিবে, তো দিবে কাকে বল? যাকে তাকে দিয়া শেষে কি হারিয়া মরিবে? সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল "হ্যাঁ, হাইকোর্টে এতদিনে একজন ব্যারিষ্টার আসিয়াছে বটে; এ লোক ঠিক কয়েক বছরের মধ্যেই টপাটপ্ সব ব্যারিষ্টারকে ডিঙ্গাইয়া উপরে উঠিয়া যাইবে, তোমরা দেখিয়া লইও।" আসলে হইলও তাহাই! কয়েক বছর যাইতে না যাইতেই তিনি এতবড় ব্যারিষ্টার হইয়া উঠিলেন, যে গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে দ্বিতীয় সরকারী ব্যারিষ্টার করিয়া দিলেন। প্রত্যেক হাইকোর্টেই

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য দুইজন করিয়া ব্যারিষ্টার থাকে। বড়জনের নাম এড্‌ভোকেট্ জেনারেল, আর ছোটজনের নাম ষ্ট্যান্‌ডিং কাউন্সেল্। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ওরফে এস্, পি, সিংহ হইলেন এই ষ্ট্যান্‌ডিং কাউন্সেল্। দেশী ব্যারিষ্টারের মধ্যে ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এ কাজ পান। তাহার পর পাইলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন। ইহা ১৯০৪ সনের কথা; সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বয়স তখন প্রায় ৪০ বৎসর।

আরও দুই তিন বছর গেল; সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের নামডাক দেশময় আরও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হাইকোর্টের মধ্যে তিনি প্রধান ব্যারিষ্টার হইয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে (১৯০৬ সনে) এড্‌ভোকেট্ জেনারেলের পদ খালি হইল। গবর্ণমেণ্ট সেই কাজ দিলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে। ভারতবর্ষে যাহা এ পর্য্যন্ত কোথাও হয় নাই, তাহাই হইল। বাংলাদেশের এড্‌ভোকেট জেনারেল্ হইলেন একজন দেশী লোক।

কিন্তু এই ঘটনার তিন বছর পরে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এমন একটা পদ পাইলেন যে তাহার তুলনায় বাংলা দেশের এড্‌ভোকেট জেনারেলগিরিও ছোট। তোমরা জান, বড়লাট হইতেছেন আমাদের শাসনকর্ত্তা। শাসনের কাজ কিন্তু বড়লাট্ একা চালান না। জন আট দশ লোক লইয়া একটা ছোট্ট সমিতি আছে, তাহাকে বলে বড়লাটের শাসনপরিষৎ। এই শাসনপরিষদের সহিত একত্র হইয়াই বড়লাট্ কাজকর্ম্ম করেন। এই পরিষদের সভ্যদের মধ্যে খুব ভাল আইন জানা একজন লোকের দরকার, তাঁহাকে বলে আইন-সদস্য বা Law Member। গবর্ণমেণ্টের যতকিছু আইন কানুন করা দরকার, সমস্তই ঠিক করেন এই আইন-সদস্য। ভারতবর্ষের যিনি আসল শাসনকর্ত্তা, যিনি বড়লাটেরও উপরওয়ালা, সেই ভারতসচিব লর্ড মর্লি সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে ১৯০৯ সনে এই শাসনপরিষদের আইন-সদস্য নিযুক্ত করিলেন। একজন ভারতবর্ষের লোককে যে একেবারে শাসন পরিষদের সভ্য করা হইবে, তাহা এ দেশের কেহই আশা করেন নাই। কাজেই ভারতবর্ষময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অনেক ফিরিঙ্গি সাহেব লর্ড মর্লির উপর

দারুণ চটিয়া গেল—এত পাকা সাহেব ব্যারিষ্টার থাকিতে শেষে কিনা এতবড় ক্ষমতাটা দেওয়া হইল একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারকে—রামচন্দ্রঃ! বিলাতেও অনেকে ভ্রূ কুঁচকাইলেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কিন্তু কিছুদিন এই কাজ করিয়াই, চাকরীতে ইস্তফা দিয়া আবার ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিলেন। সকলে ভাবিল, তাইতো, লোকটা এতবড় ক্ষমতাওয়ালা কাজটা এত সহজে ছাড়িয়া দিল! অবশ্য টাকার দিক্ দিয়া তাঁহার কোন ক্ষতি হইল না, কেননা ব্যারিষ্টারিতে তিনি যাহা রোজগার করিতেন, শাসন পরিষদে তাহার সিকিও পাইতেন না। ব্যারিষ্টারিতে যশ যতদূর হইবার তাহা হইল। অনেকেরই ধারণা হইল, কলিকাতা হাইকোর্টে এতবড় ব্যারিষ্টার আর হয় নাই, এবং উকীল স্যার রাসবিহারী ঘোষকে বাদ দিলে, আইন ব্যবসায়ে এত নামও কেহ করিতে পারে নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি 'স্যার' উপাধি পাইলেন।

এইবার দেশের লোকের কাছে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন তাঁহার যোগ্য সম্মান পাইলেন। ১৯১৫ সনে মান্দ্রাজে যে কংগ্রেস হয়, সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে করা হইল তাহার সভাপতি।

১৯১৬ সনে আবার তিনি বাংলা দেশের এড্ভোকেট জেনারেল হইলেন।

যুদ্ধের সময় বিলাতে যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক সভা বসে। সেই সভায় যোগ দিবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন নিযুক্ত হইলেন। ইহার কিছু পরে যে বিরাট্ শান্তি-সভা বসে, তাহাতেও ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইলেন তিনিই। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের যশ এইবার বিলাতময় ছড়াইয়া পড়িল।

এই ব্যাপারের ঠিক পরেই সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এমনি কয়েকটী সম্মান লাভ করিলেন যে সমস্ত ভারতবর্ষটা একেবারে চম্‌কাইয়া উঠিল। এদেশের একজন লোক যে এতখানি খাতির পাইতে পারে, তাহা আশা করা তো দূরের কথা, আমরা চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। একটু আগেই তোমাদের বলিনাই যে আমাদের

দেশের আসল কর্ত্তা হইতেছেন ভারতসচিব? তিনি থাকেন বিলাতে। তাঁহাকে কাজ কর্ম্মে সাহায্য করার জন্য আবার সহকারী ভারতসচিব আছেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে করা হইল এই সহকারী সচিব। ভারতবর্ষের লোক অবাক্ হইয়া চোখ কচ্‌লাইতে লাগিল। কিন্তু চোখ কচ্‌লাইয়া চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার দ্বিগুণ অবাক্ হইয়া গেল। কেন? চাহিয়া দেখে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন একেবারে হইয়া গিয়াছেন **লর্ড** সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। 'লর্ড' উপাধি—যার চেয়ে বড় উপাধি ইংরাজরাজত্বে আর নাই, যাহা পাইলে হোমড়া চোমড়া ইংরাজেরা পর্য্যন্ত বর্ত্তাইয়া যায়,—তাহাই পাইল কিনা শেষে একজন বাঙ্গালী! এ যে কল্পনারও অতীত!

কিছুদিন বিলাতে কাজকর্ম্ম করিয়া লর্ড সিংহ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কি হইয়া জান? একেবারে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের লাট হইয়া। ভারতবর্ষের লোক, হইল কি না লাট্! সকলে ভাবিল, ইহার পর লর্ড সিংহ যে কোন পদই পাইতে পারেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হইবার নাই।

শরীর খারাপ হইয়া পড়ায় লর্ড সিংহ কিছুদিন লাটের কাজ করিয়া শেষে সে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। ইংরাজ রাজত্বে যে প্রিভি কাউন্সিল নামে সবচেয়ে বড় বিচারালয় আছে, গত কয়েক বছর হইতে তিনি তাহার একজন জজের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। মাঝখানে ছুটি লইয়া একবার বিলাত হইতে দেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, কিছুদিন পরেই আবার ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন বহরমপুরে সব শেষ হইয়া গেল। সেখানে গিয়াছিলেন তিনি তাঁহার ছেলের বাড়ীতে বেড়াইতে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে গিয়া শুইলেন, মধ্যরাত্রে হার্ট ফেল করিল। ভোরে উঠিয়া বাড়ীর সকলে দেখিল তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর বরাত নিতান্ত খারাপ। তাই, আমরা যাঁহাদের লইয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতাম, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই চলিয়া গেলেন। স্যার আশুতোষ গেলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গেলেন, স্যার সুরেন্দ্র নাথ গেলেন,

আর এইবার লর্ড সিংহও গেলেন। ইঁহাদের অভাব কতদিনে পূরিবে, আর পূরিবেই কিনা, তাহা কে বলিবে ?

সেকালের কথা

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

পিঁপড়েদের সঙ্গে এরোপ্লেন নিয়ে লড়াও শক্ত। একটাকে মারতে একশ'টা এসে ছেঁকে ধরে। সবচেয়ে মুস্কিল, তারা এরোপ্লেনের ঘূর্ণ্যমান পাখার সঙ্গে জড়িয়ে এরোপ্লেনকে অচল ক'রে মাটীতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মরে।

আট হাজার ফিট্ ওপর থেকে পিঁপড়েদের কোন সন্ধানও মেলে না।

এদিকে মাটির ওপর, বাকী সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা তখন প্রাণপণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যেখানে যে সহর ছিল, সমস্ত সহরের লোক সহরের বাইরে নতুন করে ঘর বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করলে। কখন্ যে কোন্ সহর ধ্বসে পড়ে তার ঠিক—কি—ই—পিঁপড়ে কবে থেকে কোন্ সহরের তলা ফোঁপরা করে রেখেছে, তা কে বলতে পারে ?

কিন্তু পিঁপড়েদের তৃতীয় ও শেষ আক্রমণ এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। হঠাৎ একদিন সমস্ত নতুন সহরের মাঝে সকাল থেকে মড়ক সুরু হয়ে গেল। সুস্থ, সবল মানুষ হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তারপর কয়েক মিনিট হাত পা খিঁচে মারা যায়। কাতারে কাতারে সকাল থেকে লোক মারা পড়তে থাকে অথচ ডাক্তার বৈজ্ঞানিকেরা রোগের স্বরূপই খুঁজে পান না। সারা পৃথিবী এ সংবাদ শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বড় বড় মাথা ঘেমে উঠ্‌ল, কিন্তু এ মড়কের কারণ বোঝা গেল না। একদিন এভাবে অর্দ্ধেক আমেরিকার লোক নিঃশেষ হয়ে যাবার পর, পরের দিন সকালে রোগের কারণ আবিষ্কার করলে কিন্তু বাহিয়া সহরের

একজন মুটে। সকালবেলা সহরের সৈনাধ্যক্ষ, শাসনকর্ত্তা আর তিনজন

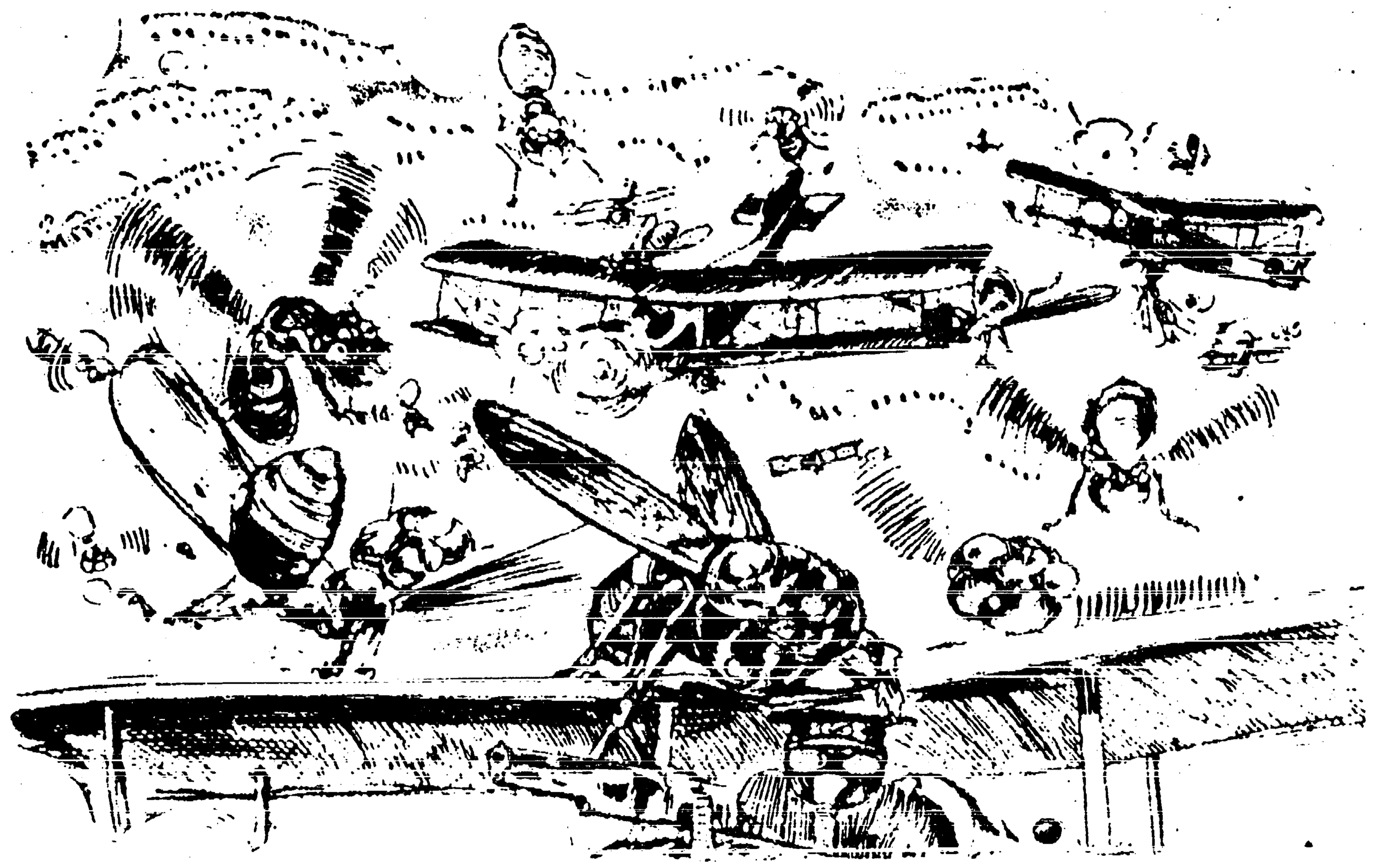

পিঁপড়েদের এরোপ্লেন আক্রমণ

বৈজ্ঞানিকের একটি গোপন সভা বসেছে। শাসনকর্ত্তা নিরুপায় হয়ে সহর ছেড়ে, আমেরিকা ছেড়ে, একেবারে জাহাজে করে এ ভয়ানক দেশ ছেড়ে যাবারই প্রস্তাব করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও সেনাপতিদের মধ্যে এই কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হচ্ছে—এমন ভাবে পিঁপড়েদের কাছে হার স্বীকার ক'রে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরাও ভাল বলে সৈনাধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্য সুরু করেছেন, এমন সময়ে হাঁফাতে হাঁফাতে তাঁদের সভার প্রহরীকে এক রকম বগল দাবাতে চেপে ধরে নিয়েই একটা বিশালকায় লোক ঘরের ভেতর এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। সভার সকলে ত স্তম্ভিত! লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—মাংসের একটা পাহাড় বল্লেই হয়। কিন্তু তার সমস্ত মুখে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে। সে মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় এই অজানা ভয়ঙ্কর রোগ তাকে প্রবল ভাবেই আক্রমণ করেচে। শেষ হবার তার আর দেরী নেই। সেই বিশাল বিরাট দেহ সেই ভীষণ রোগের

প্রভাবে এর মধ্যেই কাঁপ্‌তে সুরু করেছে। তার ভীষণ বাহুর চাপে প্রহরীটিরও তখন প্রাণান্ত হয়ে এসেছে। প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সেনাপতি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বাহুপাশ থেকে প্রহরীকে ছাড়িয়ে দিতে গেলেন। প্রহরী তখন চীৎকার করছে যন্ত্রণায়। কিন্তু সে বিশাল দেহের জোরের সঙ্গে কি পারা যায়! লোকটার তখন হাত পা খিঁচুনি সুরু হয়েছে। অনেক কষ্টে প্রহরীকে যখন সবাই মিলে মুক্ত করলেন তখন দেখা গেল তার একটা পাঁজরা একেবারে ভেঙ্গে গেছে! প্রহরী ত অনেক কষ্টে জানালে যে এই লোকটাকে সভায় ঢুক্‌তে মানা করতে গিয়েই তার এই দুর্দ্দশা এবং লোকটাকে সে চেনে, সে এই সহরেরই একজন মুটে তার নাম গুস্তাভ।

কেন তার সভায় ঢোকবার এত ব্যগ্রতা সে কথা তখন গুস্তাভকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণরূপ প্রবল হাত পা খিঁচুনি তখন তার সুরু হয়েছে। কয়েক মিনিট বাদেই সব শেষ হয়ে যাবে। সভার সকলে বিমর্ষ মুখে তারই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু' এক মিনিটের মধ্যেই গুস্তাভ মারা গেল, কিন্তু মারা যাবার আগে একটিবার চোখ খুলে সে উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে উঠেছিল—'জল খেওনা।' তারপর সব শেষ।

'জল খেয়োনা'! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সামনেও সেনাপতি হেসে ফেল্লেন। শাসনকর্ত্তা কাতর ভাবে মুখ ফেরালেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হঠাৎ একজন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। মুখ চোখ তাঁর অসাধারণ ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেনাপতির পিঠ হঠাৎ চাপড়ে দিয়ে তিনি বল্লেন, "আমরা কি গাধা!" সবাই ত অবাক্। শাসনকর্ত্তা বল্লেন 'আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে যান, কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটিবারও ত চোখের পাতা মোড়েন নি।" সবাই ভাবছিল বৈজ্ঞানিকও বোধহয় পাগল হয়ে গেলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পাগল হন নি। সেনাপতিকে দুহাতে ধরে তিনি বল্লেন "আপনি কাল থেকে এখন পর্য্যন্ত কি খেয়েছেন!—

ম্লান হেসে শাসনকর্ত্তা বল্লেন "খাবার কি সময় পেয়েছি—শুধু এক পেয়ালা দুধ।" কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বৈজ্ঞানিক বল্লেন "এবার বুঝেচেন?"

এতক্ষণে সকলেই বুঝেছিলেন। নানান্ কারণে, বিশেষতঃ এই ভয়ঙ্কর মড়ক নিবারণের উপায় চিন্তায়, তাঁদের কারুরই এই একদিন জল ত দূরের কথা, কিছু খাবারই সুযোগ হয় নি।

বৈজ্ঞানিক বল্লেন "যাকে আমরা নতুন রোগ ভাবছিলাম তা বিষের ফল মাত্র। সহরের জল বিষাক্ত হয়ে গেছে এবং কারা বিষাক্ত করেছে তা বোধ হয় আর বলতে হবে না।"

সমস্ত সহরে অবশ্য তখনই ঢেঁড়া পিটে দেওয়া হল এবং দক্ষিণ আমেরিকার সকল স্থানে তার ক'রে একথা জানিয়ে দেওয়া হ'ল। সত্যই সহরের জল বিষাক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক সহরের প্রধান ট্যাঙ্কের জল কি ভাবে কখন যে পিঁপড়েরা বিষাক্ত করে দিয়েছিল তা অবশ্য কেউ জানে না।

কোন রকমে এ যাত্রা মানুষ রক্ষা পেল বটে কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অর্দ্ধেক মানুষ কাবার হবার আগে নয়!

কিন্তু এ ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে সহরে সহরে সাড়া পড়ে গেল—পিঁপড়েরা আক্রমণ করতে আস্‌ছে। এবার যুদ্ধ মাটীর ওপরে সামনা সামনি। মানুষ এরই জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিল। মাটীর ওপর যুদ্ধ করতেই সে অভ্যস্ত। এ যুদ্ধের জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পিঁপড়েদের এই তৃতীয় আক্রমণের কাহিনী রায়ো ডি জানেইরোর বিখ্যাত লেখক সেনর সাবাটিনির লেখা থেকে আমরা পেয়েছি। তাঁর বিবরণই এখানে তুলে দিলাম।

সেনর সাবাটিনি লিখেছেন—"হঠাৎ গভীর রাত্রে সহরের পশ্চিম ধারের প্রাচীরের প্রহরীরা সংবাদ দিলে দূরে লাখ লাখ পিঁপড়ে এসে জড় হয়েছে। প্রস্তুত আমরা দিন রাতই থাকতাম। সুতরাং এ সংবাদে আমাদের বিচলিত হবার কিছু ছিল না। বরং এতদিন বাদে সামনা সামনি যুঝতে পাব বলে আমরা সমস্ত সৈন্যেরা উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের প্রাচীরের সমস্ত সার্চ্চলাইট তখন

রাত্রিকে দিন করে তুলেছে। সেনাপতির আদেশে অন্য সমস্ত দিকে কয়েকজন প্রহরী ও সৈন্য ছাড়া আমরা সকলে পশ্চিমে নগর-প্রাকারের বাইরে এসে জড় হলাম।

সেখানে যে দৃশ্য আমরা দেখলাম তা জীবনে ভোলবার নয়। অন্ধকার রাত্রি আমাদের অসংখ্য সার্চ্চলাইটের প্রখর আলোয় তিন মাইল পর্য্যন্ত একেবারে যেন পেছিয়ে গেছে। সেই আলোয় আমাদের সহর থেকে দু মাইল দূরে অসঙ্খ্য পিঁপড়ের বাহিনী কালো সমুদ্রের বন্যার মত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিঁপড়ের সারের পর পিঁপড়ের সার, যতদূর আলো পৌঁছোয় ততদূর পর্য্যন্ত শুধু পিঁপড়ের সমুদ্র।

সেনাপতির আদেশে আমাদের এক হাজার কামান গর্জ্জন করে উঠল। ঘন পিঁপড়ের সারের মধ্যে আমাদের কামানের গোলায় যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হল তা বর্ণনা করা যায় না। দিকে দিকে আমাদের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হয়েও কিন্তু পিঁপড়েরা থামল না। মরা পিঁপড়ের স্তূপের ওপর দিয়ে নতুন পিঁপড়ের দল তেমনি অগ্রসর হতে লাগ্‌ল।

পিঁপড়েরা আমাদের গোলার জবাব দেয় না, শুধু নিঃশব্দে অগ্রসর হয়। সেনাপতির আদেশে এবার আমরা অগ্রসর হলাম। প্রথমে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে একদল, তার পাছু পাছু আমাদের আটশত ট্যাঙ্ক। প্রাচীর থেকে সার্চ্চলাইট নাবিয়ে বড় বড় গাড়ীর ওপর তুলে সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

পিঁপড়েদের দিক থেকে তবু কোন জবাব নেই। শুধু তারা ধীরে ধীরে এগোয়। সেনাপতি আদেশ দিলেন "বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ো।" বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পিঁপড়েদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হল। সে গ্যাসে ও আমাদের ট্যাঙ্কগুলির মেশিনগানের গুলিতে লাখো লাখো পিঁপড়ে মারা গেল। যেদিকে বিষাক্ত গ্যাস ছোড়া হয় সেদিকে পিঁপড়ের সার যেন কে মুছে দেয়। শুধু মাটী কালো করে অসঙ্খ্য পিঁপড়ের মৃতদেহ পড়ে থাকে। আমাদের ট্যাঙ্ক গুলি সেই মরা পিঁপড়ের সার মাড়িয়ে অগ্রসর হয় আর তাদের মেশিন গানের

গুলিতে পিঁপড়ের দল ছারখার হয়ে যায়। পিঁপড়েদের এই দুরবস্থায় তখন আমরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। সহর থেকে ছেলে মেয়ে বুড়োরা পর্য্যন্ত তখন পিঁপড়েদের ধ্বংস দেখবার জন্যে প্রাচীরের বাইরে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েরা হঠাৎ যখন পেছু হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন তাদের অর্দ্ধেকের বেশী মারা পড়েছে। কিন্তু পেছুলে কি হবে? আমাদের ট্যাঙ্কগুলি তখন একেবারে তাদের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেই বিশালদেহ ট্যাঙ্কগুলির চাপেই যে কত পিঁপড়ে মারা গেল তার ঠিক নেই।

আমার তখন মনে হচ্ছিল, এতদিন আমরা মিথ্যাই ভয় পেয়েছি। হয়ত কোন উপায়ে তারা কিছু শক্তি অর্জ্জন করেছে; কিন্তু হাজার হলেও তারা কীট— সামান্য কীট মাত্র। মানুষের শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কৌশলের বিরুদ্ধে তারা লড়তে আসেই বা কোন্ সাহসে? তাদের এই দুর্দ্দশায় এখন কি করুণাই আমার হচ্ছিল! সেনাপতির আদেশে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাদের ভেতর গিয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধটা আমার একটা বীভৎস প্রহসনের মত লাগছিল। অসহায় পিঁপড়ের দলের ব্যর্থ পেছু হাঁটবার চেষ্টা দেখে আমার সত্যই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পেছু হাঁটতে হাঁটতেও তারা ছত্রভঙ্গ হয় নি।

এবার সেনাপতির আদেশে আমরা, পদাতিক দল, অগ্রসর হলাম। সেনাপতির আদেশ, একটি পিঁপড়েও যেন আজ না বাঁচে। কিন্তু খানিকদূর অগ্রসর হতে হতেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিঁপড়ের বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ পাঁচেক সার্চ্চলাইট্ জ্বলে উঠেছে। পিঁপড়েদেরও সার্চ্চলাইট থাকতে পারে, এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কি প্রয়োজন, ভেবে আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম। সার্চ্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চ্চলাইটের আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সবুজে রঙের। সেই তীব্র আলোর সরু জিহ্বা যেন তারা আমাদের আগের সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের সারের পর সার সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে সে আলো বুলিয়ে বুলিয়ে তারা ক্রমশঃ এগিয়ে আনছিল।

জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নীচু হয়ে বসে সেটা বেঁধে উঠেই আমি দেখি যে আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের মুখের ওপর দিয়ে, তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা নাড়া দিয়ে বল্লে, "সার্চ্চলাইটগুলো নিবে গেল কেন বলত ?"

আমি হেসে উঠ্‌লাম। "কানা হয়ে গেছ নাকি, সার্চ্চলাইট আবার কোথায় নিবল ? দিব্যি ত জ্বলছে।"

সে এবার ভীতকণ্ঠে বল্লে, "কই, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না !"

আমি তার পিঠ চাপড়ে বল্লাম, "ওই চড়া আলোয় চোখটায় একটু ধাঁধা লেগেছে। চোখটা একটু রগড়ে নেও।"

কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই আমাদের সামনের সার থেকে একজন চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল—"আমি যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না !"

আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা কাতরভাবে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "তবু যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনা ভাই, কি হবে ?"

বিদ্যুতের মত চকিতে, এ ব্যাপারের আসল অর্থ আমার মনে খেলে গেল। আমাদের সমস্ত বন্দুক, কামান স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমাদের ট্যাঙ্কগুলি নিঃশব্দ হয়ে গেছে, শুধু চারিদিক্ থেকে অসহায় সৈন্যদের চীৎকার, কলরব, বিলাপ তখন তুমুল হয়ে উঠেছে।

আতঙ্কে পেছনে ফিরে চীৎকার করে উঠলাম, "চোখ বন্ধ কর, চোখ বন্ধ কর, আলোর দিকে চেয়ো না।" কিন্তু চারিদিকের ভীত, অসহায় সৈন্যদের কলবর ছাপিয়ে সে ক্ষীণ স্বর কতদূর পৌঁছোয় আর ! পিঁপড়েরা তখন আমাদের সহরের প্রাচীরের কাছে সমবেত ছেলেমেয়ে বুড়োদের মুখের ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বৃথা চেষ্টা !

তারপর যে ভয়ঙ্কর বীভৎস ব্যাপার আরম্ভ হ'ল, তা বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। সেই অন্ধ অসহায় সৈন্যদের ওপর অসংখ্য পিঁপড়েরা হিংস্র যমদূতের মত ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল।

চীৎকার করে বল্লাম "পালাও পালাও"—কে পালাবে, কোথায় পালাবে ? অন্ধ সৈন্যের দল অসহায় ভাবে পালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই মাথা ঠোকাঠুকি করে মরতে লাগল এবং পিঁপড়ের দল সেই বিশৃঙ্খল জটলাকে নির্ম্মমভাবে সংহার করতে সুরু করলে। এই হতভাগ্য সৈন্যদের কোন রকমে বাঁচাবার উপায় না দেখে, অবশেষে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য ছুটতে হল। কিন্তু ছুটে পালানও সোজা নয়, পিঁপড়েরা তখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। একটা বিশাল কালো পিঁপড়ে আমার পিঠের জামাটা কামড়ে ধরেছিল। হাতাহাতি পিঁপড়েদের সঙ্গে এর আগে লড়তে হয়নি। শিশুর মত, সেই বিকট কীটকে দেখে, ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লাম। কিন্তু চীৎকার করবার সময় সে নয়,—পাশ থেকে আর একটা পিঁপড়ে তখন আমার পায়ে প্রচণ্ড কামড় দিয়ে চলেছে। সেটার মাথায় ছোরা বসিয়ে দিতেই চট্‌চটে একরকম রসে সমস্ত হাতটা ভিজে গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই পেছনের পিঁপড়েটার টানে একেবারে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। সমস্ত পিঠ্‌টা ওই রকম রসে ভিজে ওঠাতে বুঝলাম, পিছনের পিঁপড়েটাকে দেহের চাপে গেঁৎলেই পড়েছি। পিঁপড়েদের দেহগুলো আকারে বড় হলেও অত্যন্ত পল্‌কা ও মানুষের তুলনায় অত্যন্ত নরম, এই যা রক্ষা। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুট দিলাম—কোন্ দিকে তা মনে নেই।"—এইখানে সেনর সাবাটানির বর্ণনা শেষ হয়েছে।

রায়ো ডি জানেইরোর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে একমাত্র সেনর সাবাটিনি্ই রক্ষা পেয়েছিলেন। পিঁপড়েদের হাত কোন রকমে এড়িয়ে, সমুদ্রে পড়ে ছোট একটি ভেলার সাহায্যে, নিকটের একটি দ্বীপে উঠে তিনি সেবার প্রাণ বাঁচান। কয়েক বছর বাদে একটি চীনে জাহাজ তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

রায়ো ড়ি জানেইরোর সঙ্গে পিঁপড়েরা সেদিন দক্ষিণ আমেরিকার বাকী

সমস্ত সহরই আক্রমণ করে। সে আক্রমণে কোন সহর রক্ষা পায় নি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সেইদিনই মানুষের পাট ওঠে। তারপর আর মানুষ সেখানে পা দিতে পারে নি। গত বৎসর সে চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা কি ভীষণভাবে হেরে গেছি, সে খবর ত তোমরা সবাই জান।

এই পিঁপড়েদের দক্ষিণ আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস। মানুষ অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। সামান্য কীটের হাতে এই লাঞ্ছনার শোধ নেবার জন্য পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু শীগ্‌গির যে আমরা দক্ষিণ আমেরিকা ফিরে পাব তারও বড় আশা নেই, কারণ কি অদ্ভুত আলোয় তারা অমন করে মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তাই এখনও আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারেন নি।

রং তামাসা

মিত্তিরদের আড়াই বৎসরের খোকা বড়ই দুরন্ত, জিনিষপত্র আর বাড়ীতে রাখা যায় না! মিত্তিরদের বাড়ীর কর্ত্তা রামলোচন বাবু বসিয়া তামাক খাইতে-ছিলেন, হঠাৎ বড় খোকা ছুটিয়া আসিয়া কহিল "বাবা, বাবা, কি হবে, খোকা আমার দোয়াত ভেঙ্গে সমস্ত কালী খেয়ে ফেলেছে।" রামলোচন বাবু কহিলেন "বলিস্ কিরে, শীগ্‌গির আধ তা ব্লটীং পেপার এনে খাইয়ে দে'।"

ফটোগ্রাফারের বাহাদুরী

আজকাল ফটোগ্রাফীর আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে। এবারকার রামধনুতে "ফটোগ্রাফের কথা" প্রবন্ধে সে বিষয় তোমরা শুনিয়াছ। নীচের ছবিখানি দেখ। কিসের ছবি বলতো?

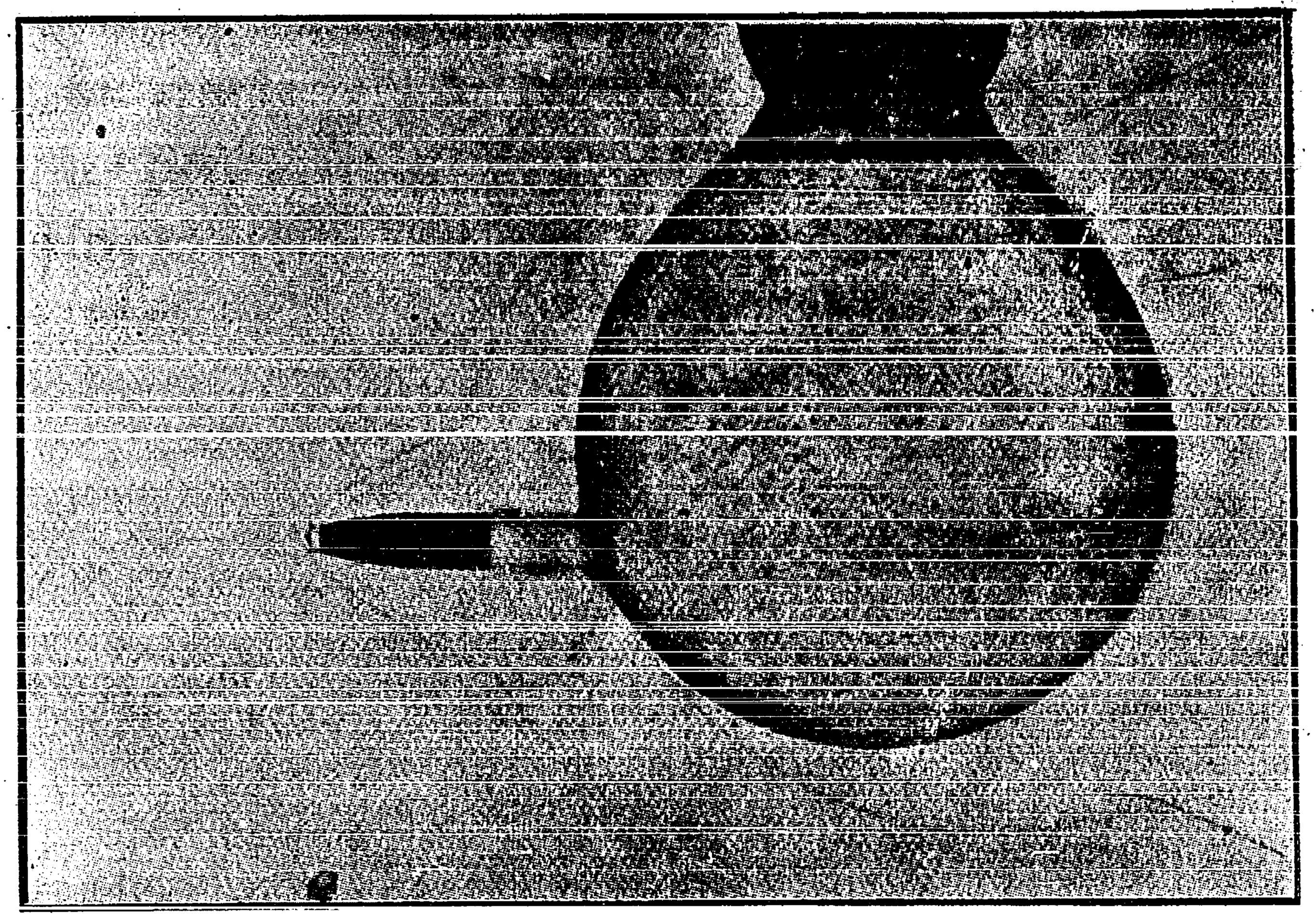

বন্দুকের গুলি বুদ্বুদের ভিতর দিয়া যাইতেছে।

একটা বন্দুকের গুলি একটা বুদ্বুদের ভিতর দিয়া যাইতেছে, তাহারই ছবি। এক একটা বুদ্বুদ কত অল্প সময়ের মধ্যে ফাটিয়া যায়! আর বন্দুকের গুলি যে কত জোরে যায় তাহার তো কথাই নাই। ফটোগ্রাফার কিন্তু ফটো তুলিতে তাহার চেয়েও কম সময় লইয়াছে।

কুকুরের বোর্ডিং

বিলাতী লোকেরা কুকুর পুষিতে বড় ভালবাসে: শুধু তাই নয়, কুকুর গুলিকে আরামে

রাখিবার জন্য নানা রকম অদ্ভুত কাণ্ডও করিয়া থাকে। ব্যাটারসি বলিয়া একটা জায়গায়, শুধু কুকুরের জন্যই একটা বোর্ডিং তৈরী করা হইয়াছে। গেল বছরে এখানে ৩৪ হাজারেরও উপর কুকুর রাখা হইয়াছিল।

মজার নিয়ম

পৃথিবীর নানা দেশের নিয়ম কানুন ঘাঁটিলে অনেক মজার মজার আইন দেখা যায়। কয়েকটা নমুনা দিতেছি। আমেরিকার নিউ জারসীতে রাত্রি ৮টার পরে কাহারও কুকুর চীৎকার করিলে, কুকুরের মালিককে প্রত্যেক বারের জন্য ৪ শিলিং করিয়া জরিমানা দিতে হয়। কোন কোন জায়গায় যে বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত, রাস্তায় মাদুর, বস্তা বা কাপড়ের ধূলা ঝাড়িলে জরিমানা দিতে হয়। জার্ম্মেণীর অনেক সহরেই নিয়ম আছে যে ঘরের ময়লা, ছাই, ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতি আলাদা করিয়া ফেলিতে হইবে—না হইলেই শাস্তি! ঐ সকল আবর্জ্জনাকে নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যবসার মধ্যে ঢুকাইবার জন্যই এই নিয়ম। আবার কোন কোন জায়গায় নিয়ম আছে যে ২টি ছোট ছেলেকে এক পাত্রের জলে স্নান করাইলে শাস্তি হইবে।

লস্ এঞ্জেলিসে ১৬ বছরের কম বয়সে নস্য লওয়া একটা মস্ত বড় অপরাধ।

বামনের বংশ

ম্যাট্রিলের এক থিয়েটারে নিকল বলিয়া একজন লোক অভিনয় করে। লম্বায় সে ৪০ ইঞ্চি উঁচু। তাহার স্ত্রীও জুটিয়াছে তেমনি—লম্বায় ৩৮ ইঞ্চি। সেও ঐ থিয়েটারেই কাজ করে। তাহাদের একটি ছেলে আছে—সে ঠিক বাপ মার মত হইয়াছে। এখন ছেলেটির ওজন দেড় সের!

এরা ত ভালই, কয়েক বছর আগে লুসি জ্যারেটা বলিয়া একজন মেমের কথা শুনিয়াছিলাম, সে ছিল ১৬ ইঞ্চি লম্বা। বেচারা কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে।

লম্বা চুল

রামধনুর অনেক পাঠিকাই বোধহয় তোমাদের লম্বা চুল লইয়া বেশ একটু গর্ব্ব বোধ কর। কিন্তু কুমারী সালফ্রিড্ সার্জ্জেন নামে একটি মেয়ের চুলের বহর শুনিলে, তোমাদের সে গর্ব্ব হয়ত' একটু দমিয়া যাইবে। এই মেয়েটির চুল দশ ফুট লম্বা। প্রত্যহ উহা ধোয়া, মোছা করিতে ও বাঁধিতেই নাকি তাহার ৫।৬ ঘণ্টা কাটিয়া যায়!

ফুলের রাণী

সুমিত্রা দ্বীপে এক আশ্চর্য্য রকমের ফুল দেখা যায়। তাহার এক একটা পাঁপড়ি ৬ হাতের চেয়েও বড় হয়। এত বড় ফুল পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

ছোট্ট বানর

ব্রেজিলের নাম হয়ত তোমরা শুনিয়া থাকিবে। সেখানকার এক জঙ্গলে এক রকম অদ্ভুত বানর ধরা পড়িয়াছে। ইহাদের জাতের মধ্যে কেহই ওজনে ৪ আউন্সের বেশী হয় না। কাজেই দেখিতে কতটুকু, নিশ্চয়ই আন্দাজ করিতে পার। এতটুকু বানর আর কোথাও নাই। এই বানরদের খাওয়াও তাহাদের চেহারারই মতন। খুব সামান্য ২।১টা ফল মূল খাইলেই ইহাদের পেট ভরিয়া যায়।

নূতন ধাঁধা

(১)

(ক) কোন্ দুয়ারে গেলে মোরা হরির দেখা পাই?
(খ) কোন্ হাটেতে লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করে ভাই?

শ্রীসুনন্দা দেবী।

(২)

(ক) কোন্ সহর সর্ব্বদাই বড় হয়?
(খ) কোন্ নদীকে সাগর বলে?
(গ) কোন্ নদীর কালো রং?

ভ্রম সংশোধন

এবারকার রামধনুর ১৬৩ পৃষ্ঠায় "চাঁদের আসল চেহারা" নামক ছবিটী উল্টা করিয়া ছাপা হইয়াছে। বইখানি ঘুরাইয়া উপরের দিকটা নীচে ধরিলেই আসল ছবিটা বোঝা যাইবে। চাঁদের গায়ে পাহাড়গুলিও স্পষ্ট দেখা যাইবে।

গত মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

(১)

(ক) পটল (খ) কাশী (গ) বৈকাল (ঘ) পাণিপথ (ঙ) মাইমেন সিং (Mymensing)

(২)

যদু, তিন বাজার হইতে যথাক্রমে টাকায় ১০টা দরে ২ টাকার, টাকায় ১২টা দরে ৬ টাকার, ও টাকায় ১৪টা দরে ১২ টাকার আম কিনিয়াছিল। মধু, ঐ কয় বাজার হইতে যথাক্রমে টাকায় ১২টা দরে ১২ টাকার, টাকায় ১৪টা দরে ৬ টাকার ও টাকায় ১৬টা দরে ২ টাকার আম কিনিয়াছিল।

উত্তর দাতাদের নাম

যাঁহাদের উত্তর নির্ভুল হইয়াছে—

সুনন্দা দেবী, অনিলকৃষ্ণ মজুমদার, কমলা, হংস, হরিমোহন, জিতেন, কালো, রামরতি চক্রবর্ত্তী ও নির্ম্মলা রাণীদেবী, বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য, বিজয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজনবালা দেবী, অরুণকুমার ঘোষ, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

যাঁহাদের ১টী ঠিক হইয়াছে, আর একটি প্রায় ঠিক হইয়াছে—

নন্দরাণী দেবী, ভূপেশলাল সেন, শিবপদ সেন, আশুতোষ চৌধুরী।

যাঁহাদের ১টী হইয়াছে, আর একটীর কতক হইয়াছে—

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রাধা তরুণ সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যাঁহাদের ১টী ধাঁধা ঠিক হইয়াছে—

মিলনমালা ঘোষ, হিমাংশুকুমার নিয়োগী, হৃষীকেশ, অন্নদা, প্রমোদ, সুশীল, হরিপদ, তারাপদ, চৈতন্য, মুকুন্দ, দুর্য্যোধন মালিয়ান।

যাঁহাদের ১টীর কতক হইয়াছে—

বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী, সুবোধ, সমর, রোহিণী, দুর্গাকান্ত, অজিতকুমার ঘোষ, কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়।

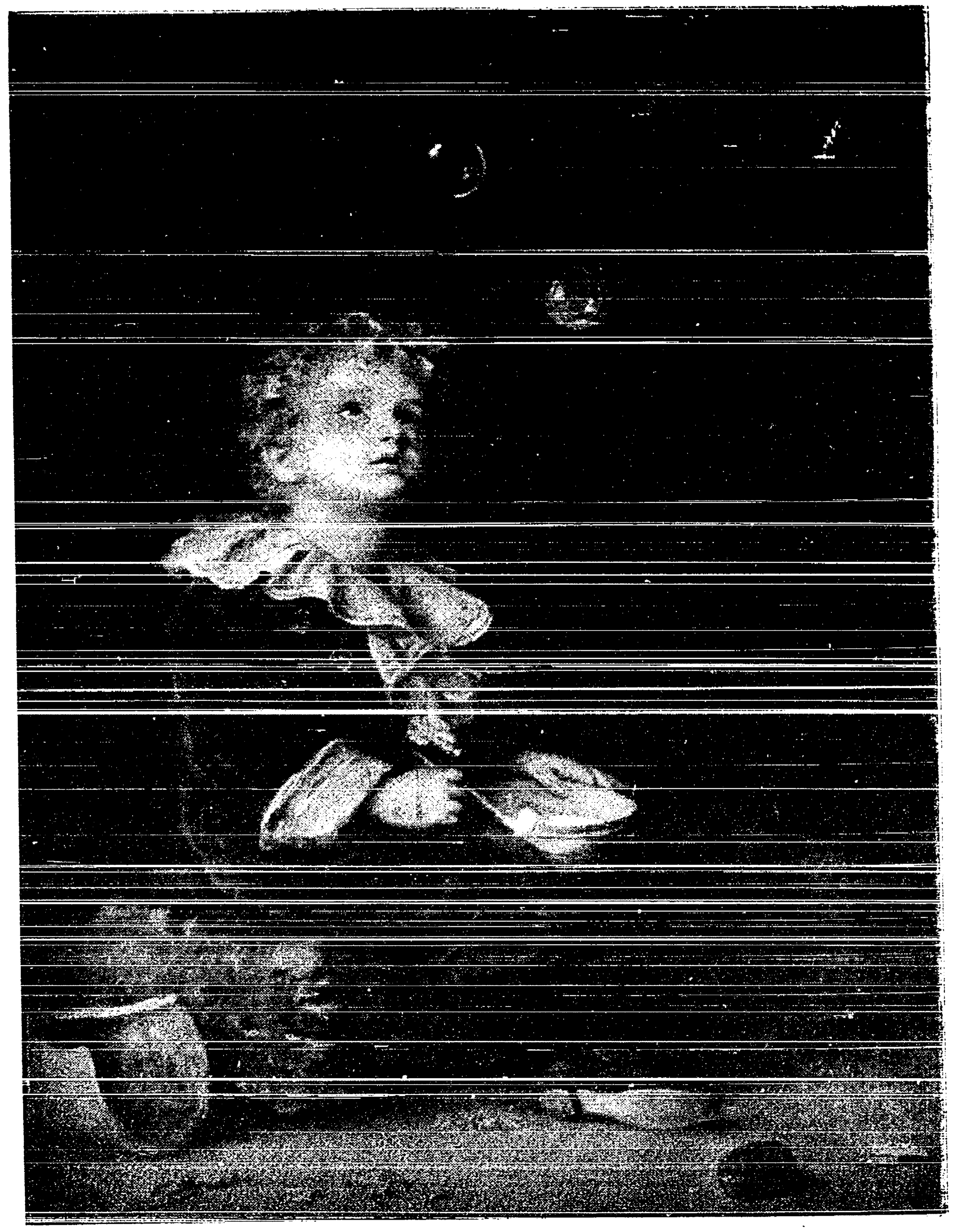

বুদ্ বুদ্

১ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ | ৫ম সংখ্যা

চা'লের দর

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি,-এ)

সায়েস্তা খাঁর আমলের এক ব্যবসাদার, হায়, মস্ত,
কিন্‌তে চাউল কল্‌কাতাতে এলেন চালে ত্রস্ত।
সস্তাতে লাখ কিস্তি পেয়ে বন্দি করে বস্তা,
পোস্তা থেকে রওনা হবেন সওদাটা বেশ সস্তা।
সে জানে ঠিক টঙ্কাতে চা'ল আটটী গোণা মণ ত' *
যতই কিনুক, হবে না ভাই, টাকার অনাটন ত'!

* তোমরা বোধ হয় জান যে সায়েস্তা খার আমলে বাংলা দেশে টাকায় আটমণ চাউল পাওয়া যাইত—সঃ

২

দশটী টাকা মণ হাঁকিল আড়ত-দারের ভৃত্য,
ঠাট্টা ভেবে হাস্য করে লোকটা সরস-চিত্ত।
ভাব্‌লে মনে, দেখছি এটা গাঁটকাটাদের রাজ্য,
'ক্রান্তি' অধিক দেবই না ক' যা দেছি তাই ন্যায্য।
টেলিফোনে খবর গেল—এ নয় গাঁজার আড্ডা,
এলো ছুটে লাল-পাগড়ী, আরমার্ড মটরকারটা।

৩

নৌকা তারা আট্‌কে দিলে, বল্লে মজা বাঃ রে,
টাকা দিয়ে জিনিষ নিলাম, কেয়ার করি কারে ?
ঠক্ ঠেঁটা মুই ঢের দেখেছি, বুঝি এ সব ধান্ধা,
ভেল্‌কী দেখে ভোক্‌ছানি খায় নয়ক' এ সে বান্দা।
পোস্তা বলে সস্তা-খেকো, এ নয় তোমার রাস্তা
চাল্ না নিয়ে তুঁষ নিয়ে যাও, একটী টাকা বস্তা।

৪

লোকটা ফাঁপর, ভাবছে একি, গ্যাছেই কলি উল্টে,
কুক্ষণেতে পার হয়েছি পদ্মা নদীর পুল্‌টে।
বৃদ্ধ জনেক বল্‌লে তারে, ব্যাপারটা কি বুঝছো,
কোন্ সময়ের জিনিষ তুমি কোন্ সময়ে খুঁজছো ?
দেখছো পোঁ পোঁ ট্রেণ ছুটেছে, মটর ছোটে সোঁ সোঁ,
ঘুরছে মাথায় উড়ো জাহাজ, ঘাবড়িয়োনা বসো।

৫

দেখছো কেমন জামার বহর, দেখছো কলার ইস্ত্রি,
দেখছো মাথায় টেরীর লহর, চল্‌ছে কলের মিস্ত্রি।

দেখছো সিগার, দেখছো সাবান, দেখছো 'চা' এর খেল্ কি ?
চাল বাড়িয়ে লাগিয়ে দিলে চালের দরে ভেল্কী।
তৈরী হবে চাউল বিনে অন্ন রাঁধার কলটা,
বন্ধু, তুমি সবুর কর, আকায় ফুটুক জলটা।

বাংলা দেশের কথা

(রায় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট্)

এই দেশে সেকালে খুব বড় বড় লোক জন্মেছিলেন। তোমরা হয়ত চৈতন্যের নাম শুনেছ ; কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন, জগদীশ, রূপ, সনাতন, জীব, কবিকর্ণপূর, নরোত্তম, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ লোকের নাম শোন নাই। বড় হয়ে যখন ইতিহাস পড়বে, তখন জানতে পারবে, এদেশে যেমন গঙ্গা সমস্ত সমতল ভূমিকে উর্ব্বর ক'রে বয়ে যাচ্ছেন, তেমনই বুদ্ধি বিদ্যা ও ধর্ম্মে অনেক প্রখর ব্যক্তি এ দেশকে উন্নতি ও গৌরব দিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের দু একটির কথা আজ তোমাদের বল্‌ব।

তোমরা হয়ত শুনে থাক্‌বে, এদেশে বল্লাল সেন নামে মস্ত বড় এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে লক্ষ্মণ সেনের সময়েই মুসলমানেরা এদেশে এসে দেশ অধিকার করেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের এক মন্ত্রীর নাম ছিল গোবর্দ্ধনাচার্য্য। তাঁর আরো অনেক মন্ত্রী ছিলেন, যথা হলায়ুধ, শরণ প্রভৃতি। কিন্তু গোবর্দ্ধনের সঙ্গে তাঁদের একটা তফাৎ ছিল। গোবর্দ্ধন এঁদের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। যখনকার কথা বল্‌ছি তখন এঁর বয়স ছিল ৮০। ইনি সন্ন্যাসীর চালে থাক্‌তেন ; এঁর মাথায় ছিল এক রাশ উস্কখুস্ক জটাবাঁধা চুল, পরণে ছিল গেরুয়া রংএর নেংটি এবং হাতে একটা লোহার দণ্ড। এই বেশে তিনি রাজসভায় একটা কুশাসনে বা ছোট কম্বলে পৃথক্ ভাবে বস্‌তেন। রাজসভার

সমস্ত লোক তাঁকে খুব সম্মান করত, কারণ তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়সে তো বড় ছিলেনই, তা ছাড়া তিনি একজন বড় কবি ছিলেন। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ নামক সংস্কৃত কীর্ত্তন-গ্রন্থে গোবর্দ্ধনের নাম আছে। জয়দেব ঐ কাব্যের প্রথম দিকে কয়েকজন সমসাময়িক কবির নাম করেছেন—ধোয়ী,

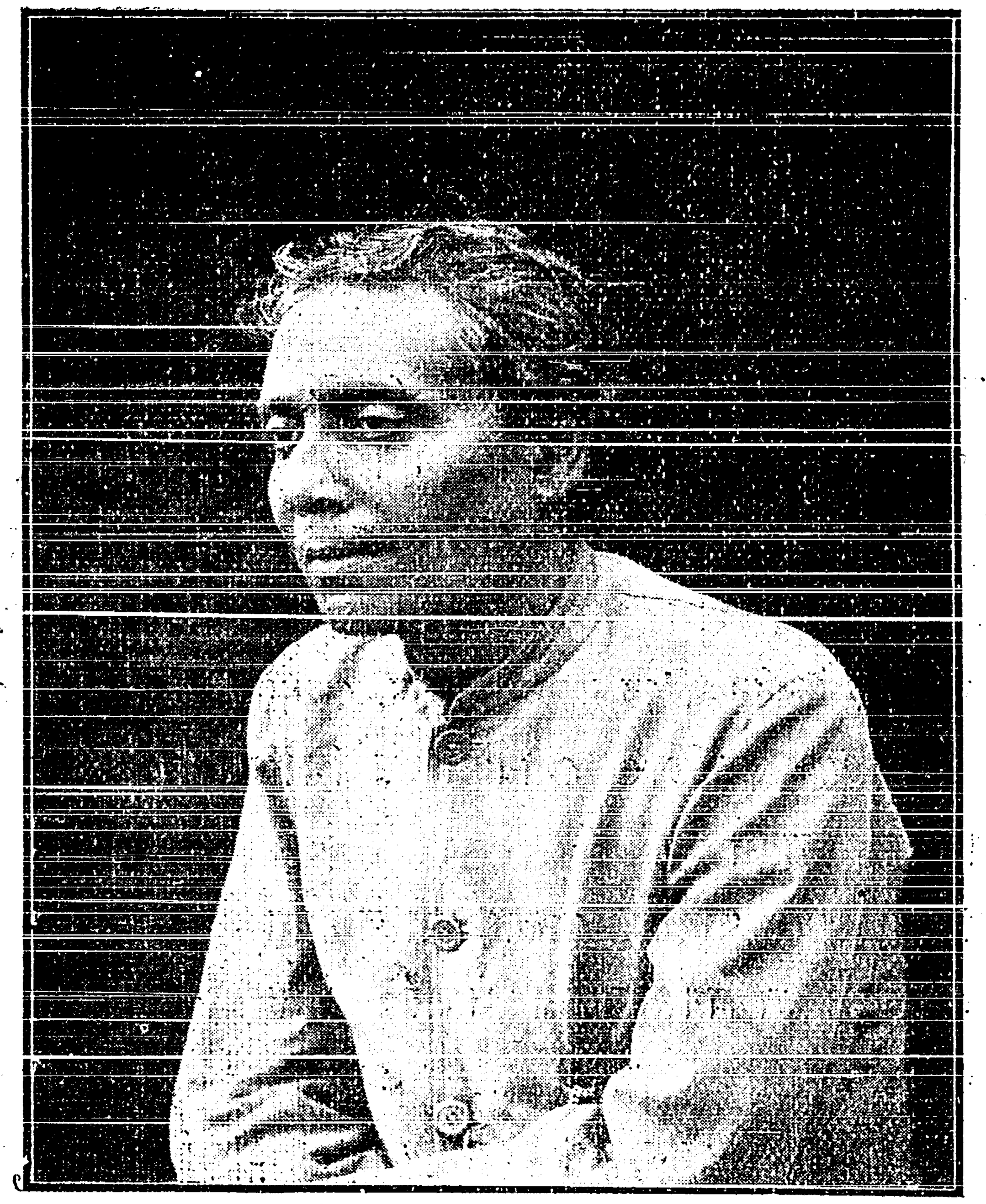

(রায় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট্)

গোবর্দ্ধন, শরণ ও উমাপতি। ধোয়ী ছিলেন মস্ত বড় লোক, জয়দেব তাঁকে "কবি-ক্ষমাপতি" বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। 'কবি-ক্ষমাপতি' অর্থ কবিভূপতি। এই শব্দটি দ্ব্যর্থবাচক; তিনি কবিশ্রেষ্ঠও ছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেনের অধীনে একজন

মিত্ররাজাও ছিলেন। 'ক্ষমাপতি'-শব্দযোগে এক ঢিলে দুটি লক্ষ্যে সন্ধান করেছেন। ধোয়ী একবার যা শুনতেন তাই তাঁর মুখস্ত হয়ে যেত। উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনের ঠাকুরদাদা বিজয় সেনের নির্ম্মিত মন্দিরের উপর তাঁর অনেক কথা লিখে গিয়েছেন। একে বলে 'বিজয় সেনের প্রশস্তি'। তোমরা যাদুঘরে গেলে সেটি দেখতে পাবে। শরণ খুব খটমট শব্দ দিয়ে তাড়াতাড়ি কবিতা লিখতে পারতেন।

লক্ষ্মণ সেনের এক শালা ছিল, সে ছিল বড়ই দুষ্ট। সে প্রজাদের প্রায়ই পীড়ণ করত। রাণীর ভাই, এজন্য সাহস করে কেউ কিছু বলতে পারত না; এজন্য তার আস্পর্দ্ধা খুব বেড়ে গিয়েছিল। একদিন মাধুরী নামে এক বেণের মেয়ে নদীতে স্নান করতে গেছে, অম্নি একটা ঝোপের পাশ হতে যেমন কোন বাঘ লাফ্ দিয়ে একটি ভেড়ার উপর পড়ে, তেমনই সহসা সে এসে মাধুরীর শাড়ী ধ'রে তাকে টানাটানি করতে থাকে। মাধুরী, এলো চুলে, ভিজে কাপড়ে ছুটে গিয়ে সোজাসুজি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের দরবারে উপস্থিত হয়। সে তার অপমানের কথা বলে রাজার কাছে সুবিচার চেয়ে, সেই দরবার ঘরে লুটোপুটি করে কাঁদতে থাকে। তার কান্নায়, তার কথায়, সভাস্থ সকলের অন্তঃকরণ গলে গেল এবং রাজাও খুব রেগে গিয়ে তার বিচার করতে আরম্ভ করলেন। রাজার আজ্ঞায় শ্যালক মহাশয়কে সেখানে উপস্থিত করার জন্য আর্দ্দালি চাপরাশি পাঠান হ'ল, এবং হলায়ুধ প্রভৃতি মন্ত্রীরা মাধুরীর বিবরণ আগাগোড়া ভাল করে শুনতে লাগলেন। এমন সময়ে মহারাণী বল্লভা অতি বেগে সেই দরবার-ঘরে প্রবেশ করলেন। রাগে তাঁর ঠোঁট দু'খানি কাঁপছিল, তাঁর পদ্মের মত দুটি চক্ষু রক্তবর্ণ হয়েছিল এবং তাঁর সোণার সূতায় গাঁথা আঁচলখানি মাটিতে লুটাচ্ছিল। তিনি কারও দিকে দৃক্পাত না করে, খুব জোরের সহিত বল্লেন "এখানে এমন কার বুকের পাটা যে আমার ভাইকে শাস্তি দেবে? এ কোথাকার একটা অসচ্চরিত্রা, হতভাগা মেয়ে, এখানে এসে আমার ভাইএর নামে যা' তা' বল্ছে, আর অমনি সব বিচারক বসে গেছেন তার বিচার করতে ?"

এমনই জোরের সাথে—এমনই রাগ দেখিয়ে, মহারাণী এই কয়েকটি কথা বল্‌লেন, যে অপরের কথা তো দূরে থাকুক, রাজা পর্য্যন্ত 'থ' হয়ে গেলেন। হলায়ুধ মন্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল এবং যাঁরা মাধুরীর প্রতি দয়া দেখাচ্ছিলেন, তাঁরা সকলে হতবুদ্ধি হয়ে মাথা হেঁট করে বসে পড়লেন।

এমন সময়ে আচার্য্য গোবর্দ্ধন তাঁর আসন থেকে উঠে এসে দণ্ডটি উদ্যত ক'রে রাণীকে মারবার জন্য অগ্রসর হ'লেন। রাগে তাঁর জটাজূট নড়ছিল, ঘন ঘন শ্বাস বইছিল এবং ওষ্ঠাধর কাঁপছিল। তিনি বললেন, "কে তুমি এখানে এসেছ, বিচার-কার্য্যে হানা দিতে? তোমাকে এখান থেকে আমি তাড়িয়ে দেব।" তারপর রাজা লক্ষ্মণ সেনের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন "মহারাজ, আপনি কোন্ সিংহাসনে বসেছেন তা' জানেন? এই সিংহাসনে এক সময়ে বসেছিলেন, মহারাজ রামপাল। তাঁর একমাত্র পুত্র কোন মেয়েকে অপমান করার দরুণ মহারাজ রামপাল তাকে শূলে দিয়েছিলেন; আপনি সেই সিংহাসনে বসে অন্যায় আচরণ করছেন? একটা স্ত্রীলোকের আস্ফালন দেখে মন্ত্রীরা ভয় পেয়ে গেছেন! ধিক্, আপনাকে! ধিক্ আপনার মন্ত্রীদের। আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার এই রাজ্য অল্প দিনের মধ্যে ধ্বংস পাবে—এতে পাপ ঢুকেছে।" বল্‌তে বল্‌তে আচার্য্যের চক্ষুর আগুন যেন নিবে গেল, বিদ্যুৎ চলে গেলে যেরূপ বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাঁর সেই চক্ষু হ'তে তেমনই ভাবে জল পড়তে লাগল। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদতে বল্‌লেন—"এই পাপ সভায় আর এক দিনও নয়। আমি আপনার রাজ্য ত্যাগ করে এই চল্‌লাম।" অভিমানের সঙ্গে যখন গোবর্দ্ধনাচার্য্য সেই রাজসভা ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন, তখন মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তাঁর স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে নেমে, ছুটে গিয়ে আচার্য্যের পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন এবং মাধুরীর সম্বন্ধে সুবিচার হবে এই অঙ্গীকার করে, আচার্য্যকে ফিরিয়ে আন্‌লেন।

তখন আচার্য্য গোবর্দ্ধনের মত এমনই সব সাধু এ দেশে বাস কর্‌তেন, যাঁরা ইচ্ছে করলে রাজবাড়ীর মত অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রে, শত শত দাস দাসী নিয়ে, পরম সুখে কালাতিপাত করতে পারতেন, কিন্তু যাঁরা ভিক্ষা করে খেতেন,

রাজার নিকট এক কপর্দ্দকেরও প্রত্যাশা করতেন না, যাঁরা অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না, সত্য বল্‌তে ভয় করতেন না, এবং রাজরাজড়ারা যাঁদের দেবতার মত পূজা করতেন।

বায়স্কোপ

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

জীবন্ত মানুষের মত ছবিও খায় দায়, ঘুরিয়া বেড়ায়, গাড়ী চড়ে, একথা শুনিলে আজকাল আর তোমরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইবে না! আজকাল যে ছোট বড় সব সহরেই বায়স্কোপের ছড়াছড়ি! কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি—বলদেখি ব্যাপারটা হয় কেমন করিয়া, তবে হয়ত অনেকেই চুপ করিয়া যাইবে। আজ সে সম্বন্ধেই কিছু বলিব!

গত মাসের 'রামধনু'তে তোমাদের ফটোগ্রাফের কথা বলিয়াছি। বায়স্কোপ ব্যাপারটা কিন্তু আর কিছুই নয়—কতকগুলি ফটো তাড়াতাড়ি পর পর দেখাইয়া গেলেই বায়স্কোপ হইল।

কথাটা একটু কেমন-কেমন ঠেকিল, না? আচ্ছা একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। বৃষ্টি পড়িবার সময় জলের ফোঁটাগুলি কেমন দেখায় বল দেখি—লম্বা লম্বা আঁচড়ের মত নয় কি? অথচ বৃষ্টির প্রত্যেকটি ফোঁটা কিন্তু অন্য একটি ফোঁটা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা; ফোঁটাগুলি এত তাড়াতাড়ি পড়ে যে উহাদের মাঝখানের ফাঁকটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। ইহা আমাদের চোখের একটা গুণ। মনে কর, আমাদের চোখের সম্মুখে একটা কিছু ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে সরাইয়া লওয়া হইল। কিন্তু মজা এই, যে সরাইয়া লইবার পরেও সামান্য একটু সময় ছবিটা আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া থাকে। কাজেই তখনও মনে হয় যে ছবিটা আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। এই সময়টা কিন্তু খুবই কম,

এক সেকেণ্ডেরও প্রায় ২৩ ভাগের এক ভাগ। এখন ঐ সময়টুকুর মধ্যেই যদি আর কোনও জিনিষ আমাদের চোখের সম্মুখে বসাইয়া দেওয়া যায়, তবে ফল কি হইবে সহজেই বুঝিতে পার। একটা ছবি চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই আর একটা আসিয়া জুটিবে। কাজেই দুটা একত্র মিশিয়া একই জিনিষ বলিয়া মনে হইবে। চোখের এই গুণ আছে বলিয়াই বায়স্কোপ সম্ভব হইয়াছে।

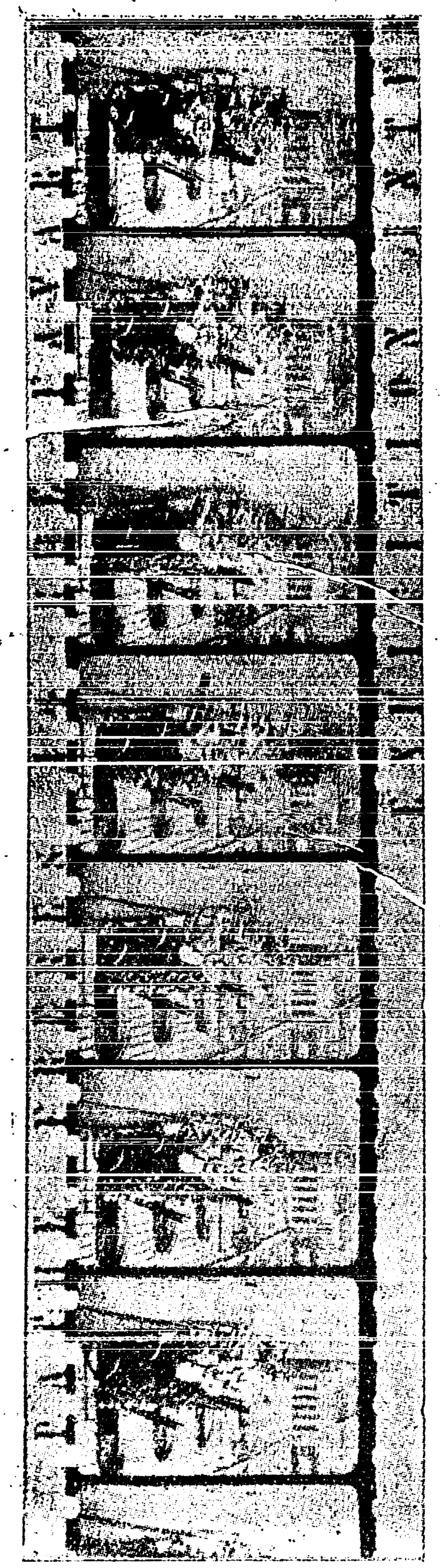

পাশে যে লম্বা ছবিটা দেখিতেছ, উহা একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য কর দেখি। কতকগুলি ডাকটিকিটের মত ছোট ছোট ছবি, পর পর সাজান রহিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে, সব গুলি বুঝি একই ছবি। কিন্তু একটু মন দিয়া দেখ দেখি। সবগুলির মধ্যেই একটা ঘোড়ার গাড়ী আছে বটে, কিন্তু সকলের উপরের ছবিটায় দেখ গাড়ী খানা দাঁড়াইয়া আছে। তার নীচের খানায় ঘোড়া চলিবার জন্য একটা পা তুলিয়াছে; তার পরেরটায় গাড়ী খানা একটু অগ্রসর হইয়াছে, তারপরে আর একটু। সকলের নীচে দেখ গাড়ীটা আগে যেখানে ছিল সেখানে আর নাই, অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে। এই ছবিগুলি কিন্তু আর কিছুই না, বায়স্কোপের কতকগুলি আসল ছবি তুলিয়া দিয়াছি মাত্র। এখন এই ছবিগুলি যদি খুব তাড়াতাড়ি

একটার পর একটা দেখান যায়, তবেই সবগুলি মিশিয়া মনে হইবে গাড়ীখানা চলিতেছে। ইহাই বায়স্কোপ দেখান'র কারসাজী। এবার দেখা যাক ছবি কেমন করিয়া তোলা হয়।

প্রথম যখন ফটোগ্রাফীর আবিষ্কার হয় তখন এক একখানা ছবি তুলিতে লাগিত ৫।৬ ঘণ্টারও বেশী। তারপর আস্তে আস্তে ছবি তোলার উন্নতি হইতে লাগিল। শেষে এমন এমন সব ক্যামেরা তৈরী হইল যাহাতে একটা ছবি তুলিতে এক সেকেণ্ডেরও অনেক কম সময় লাগে। এই রকম ক্যামেরায় যে সব ছবি উঠিতে লাগিল তাহা বড়ই অদ্ভুত। মনে কর, একটা ঘোড়া বেড়া টপ্‌কাইবার জন্য লাফ দিয়াছে, তুমি ঠিক সেই সময় তাহার একটা ফটো লইলে। ছবিতে উঠিল ঘোড়াটা যেন শূন্যের উপর রহিয়াছে।

তখন পণ্ডিতেরা দেখিলেন, ভারি মজা ত! চলিবার প্রত্যেকটি ভঙ্গীই যদি এমনি করিয়া ছবিতে তোলা যায়, তবে ঐ রকম খানকতক ছবি তুলিয়া জুড়িয়া দিলেই তো জীবন্ত ছবি দেখান যাইতে পারে!

তারপর চলন্ত ছবি তুলিবার প্রথম চেষ্টা করিলেন Muy bridge নামে এক ভদ্রলোক। তিনি করিলেন কি,—ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়া গোটা চব্বিশেক ক্যামেরা সাজাইয়া রাখিলেন। তারপর প্রত্যেকটির সঙ্গে একটা করিয়া সূতা এমন করিয়া বাঁধিয়া দিলেন যে ঘোড়াগুলি যখন দৌড়াইবে, তখন তাহাদের পায়ে সূতা লাগিয়া আপনা আপনি ক্যামেরার মধ্যে ছবি উঠিয়া যাইবে। এম্নি করিয়া প্রথম বায়স্কোপের ছবি উঠিল। কিন্তু এমন করিয়া আর কত বড় ছবি তোলা যায়? প্রত্যেকখানা ছবির জন্য যে একটা করিয়া ক্যামেরা চাই। তখন পণ্ডিতদের চেষ্টা হইল—নাঃ ও সব চলিবে না—একই ক্যামেরার মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে কিছুই হইবে না। অনেক চেষ্টার পর কিন্তু তাহাই হইল।

আজকাল কি করা হয় শুনিবে? সেলুলয়েড বলিয়া পাত্‌লা, অথচ কাচের মত এক রকম জিনিষ আছে। সেই সেলুলয়েড দিয়া হাজার হাজার ফুট লম্বা ফিতা তৈয়ারী করা হয়। ক্যামেরার মধ্যে প্লেটের বদলে এই ফিতা বসাইয়া

দেওয়া হয়। ছবি ইহার উপরেই উঠে। এক একটা ছবি উঠে, আর ফিতাটা আপনা আপনি এক এক ঘর সরিয়া যায়। ক্যামেরাগুলিও হয় তেম্নি। তুমি হাত পা নাড়িয়া অভিনয় করিয়া চলিলে—তোমার প্রত্যেকটা নড়িবার ভঙ্গী ক্যামেরা এক একটা আলাদা ছবিতে তুলিয়া লইবে। মনে কর, তুমি হাত দিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা চিঠি তুলিবে। প্রথমে তুমি হাত বাড়াইয়াছ এই রকম একটা ছবি উঠিল। তারপর হাতটা আর এক ইঞ্চি নামিয়াছে, তারপর আর একটু, এমনি করিয়া শেষে একটায় উঠিল চিঠিতে হাত দিয়াছ, আর একটায়—তুলিতেছ—আর একটায় আর একটু তুলিয়াছ, এই রকম আর কি। এজন্য অবশ্য তোমাকে যে ধীরে ধীরে কাজ করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই, কেননা এই রকম ক্যামেরায় সেকেণ্ডে ১০।১৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০০ ছবি পর্য্যন্ত তোলা যায়। তার পরের ব্যাপারটা আর কিছুই না, ছবিগুলিকে কলের সাহায্যে তর্ তর্ করিয়া (এক সেকেণ্ডের ৩২ ভাগের এক ভাগেরও কম সময়) পর পর দেখাইয়া গেলেই হইল। আর একটা কথা—আসল ফটোগুলি কিন্তু এক একখানা ডাকটিকিটের চেয়ে বড় নয়। অত ছোট ছবি তো আর এক সঙ্গে হাজার হাজার লোককে দেখান চলে না—তাহা হইলে তো হুড়াহুড়ি করিয়া কেহই দেখিতে পাইবে না। সে

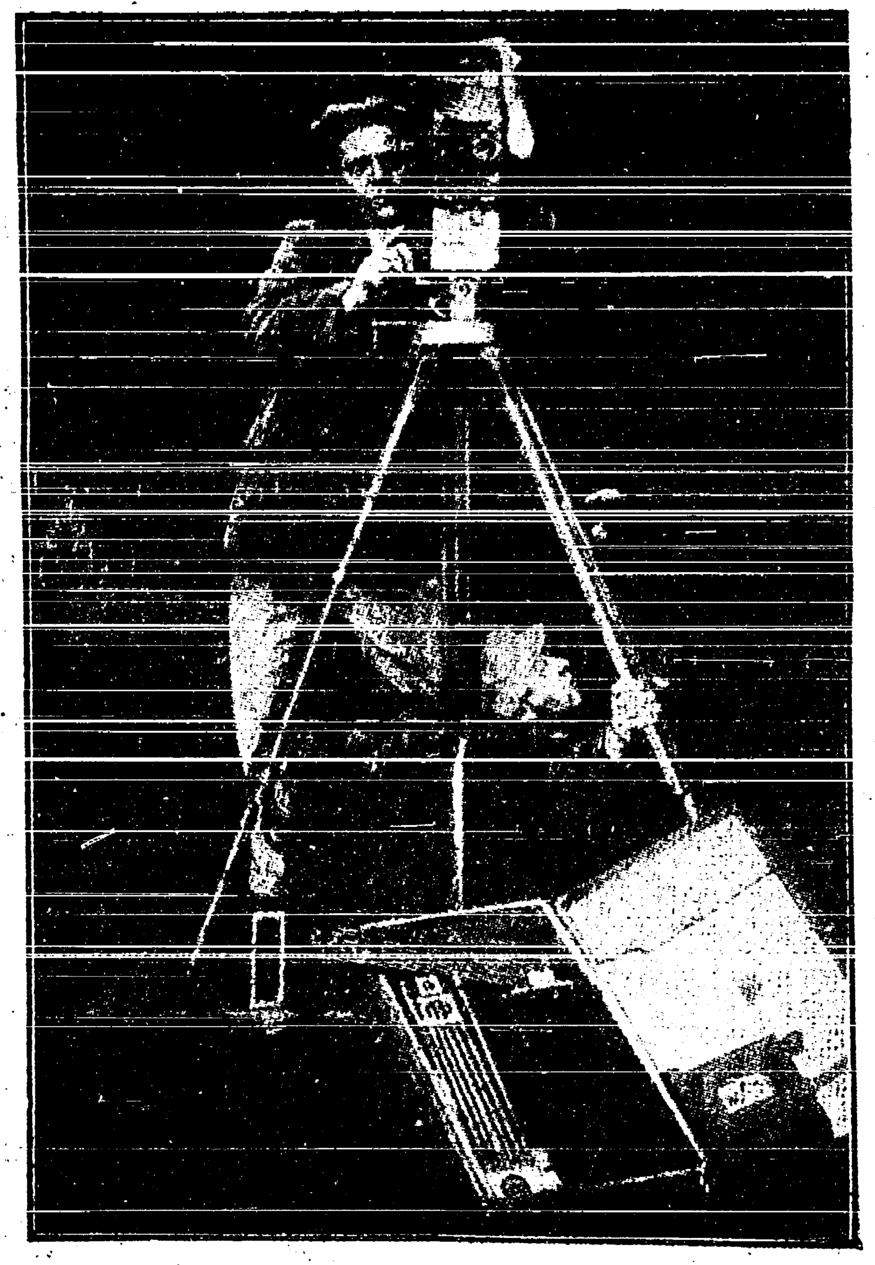

বায়স্কোপের ছবি তুলিবার ক্যামেরা

হাঙ্গামা মিটাইবার জন্য বিশেষ গোলমাল নাই। যন্ত্র ও আলোর সাহায্যে ছবিগুলিকে সত্যিকার মানুষের মত বড় করিয়া একটা পর্দ্দার উপর ফেলিলেই আপদ চুকিয়া গেল। তোমরা বায়স্কোপ দেখিবার সময় নিশ্চয়ই পিছন দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ—সকলের পিছন হইতে একটা আলো আসিয়া পর্দ্দার উপর ছবি ফেলিতেছে।

এই তো গেল চলন্ত ছবি তুলিবার কায়দা। কিন্তু ছবি তুলিতে আরও যে কত হাঙ্গামা আছে তাহার ঠিক নাই ; এবার সেগুলির কথা বলিব।

আজকাল যে সব ছবি দেখান হয়, সেগুলি প্রায়ই ভাল ভাল গল্প-উপন্যাসের ছবি। লোকে সেগুলিই বেশী পছন্দ করে। এ রকম এক একখানা গল্পের ছবি

বায়স্কোপের ফিল্ম তুলিবার একটা স্থান। কলকজা, তার, আলো প্রভৃতিতে ভর্ত্তি ; এইসবের সাহায্যে, এখানে এক সঙ্গে পাশাপাশি দিনের ও রাতের ছবি তোলা হয়।

তুলিতে কত খরচ পড়ে জান? কয়েক লাখ টাকা। এত টাকা কেন? যাহারা অভিনয় করে তাহাদের তো পারিশ্রমিক দিতেই হয়, তাহা ছাড়া কত আশ্চর্য্য

আশ্চর্য্য দৃশ্য যে নকল করিয়া দেখাইতে হয়, তাহার ঠিক নাই। মনে কর, গল্পের এক জায়গায় আছে যে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে, কিংবা ঝড়ে, একটা সহর কে সহরই ধ্বসিয়া পড়িল। লিখিতে যত সহজ, কাজের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা নেহাৎ সহজ নয়। অথচ না দেখাইলেও ছবিটা মাটী হইবে। এখন ইহার জন্য তোমাকে নকল সহর তৈরী করিতে হইবে—নকল বাড়ী, ঘর, গির্জ্জা, মন্দির, বাগান—একটা বড় সহরে যাহা কিছু থাকিতে পারে, সবই তৈরী করিতে হইবে। তারপর যে ভূমিকম্প বা ঝড়ে সহরটা ধ্বংস হইবে তাহাও নকল করিয়া দেখাইতে হইবে। অবশ্য এসব বাড়ীঘর যে ইট দিয়া তৈরী হয় তাহা নহে—হয়ত পেষ্টবোর্ড দিয়া তৈরী করা হইল, কিন্তু তাহাতেও কত হাজার হাজার টাকা যে খরচ পড়ে তাহা আন্দাজ করাও কঠিন! অথচ তোমাকে হয়ত সমস্তই ঝড়ে নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। এত টাকা খরচ করিয়া সব তৈরী হইল, আর এক মুহূর্ত্তেই সব ছাই হইয়া গেল। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ "বাপ্ রে! কত টাকা মাটী হইয়া গেল!" কিন্তু বায়স্কোপের মালিককে জিজ্ঞাসা কর—সে হয়ত হাসিয়া বলিয়া বসিবে "তা হইয়াছে, হইয়াছে তাতে আর কি?" ভাবনার বাস্তবিকই কিছু নাই, কেননা, এ রকম এক একখানা ছবি যখন বাজারে বাহির হইবে, তখন মালিকের রোজগারের টাকার কাছে খরচের টাকা, টাকা বলিয়াই মনে হইবে না। এক একখানা গল্পের ছবিতে যে কত লাখে লাখে টাকা পাওয়া যায়, তাহা শুনিলেও তাক্ লাগিয়া যায়।

বায়স্কোপের অনেক দৃশ্যই এই রকম নকলভাবে দেখান হয়। এজন্য বায়স্কোপ ওয়ালাদের সব রকম সরঞ্জাম তৈরী রাখিতে হয়। তাঁহাদের পোষাকের ঘরখানা যদি দেখিতে! পৃথিবীর এমন দেশ নাই যাহার পোষাক তাঁহারা যোগাড় করেন নাই! শুধু কি পোষাক? কত রকমারি জিনিষ তাঁহারা জড় করিয়া রাখিয়াছেন। কখন যে কোন্‌টার দরকার হইবে তাহার ত' ঠিক নাই! তোমরা এক্সিবিশন বা মেলা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এক একটা বায়স্কোপের গুদামের কাছে এই রকম কত এক্সিবিশন নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

অনেকসময় বায়স্কোপওয়ালারা এক একটা গ্রাম তৈয়ার করিয়া রাখেন,

সেখানে পাইবে না, এমন জিনিষ নাই। পাহাড়, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, বরফের দেশ, গভীর জঙ্গল প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সহর, ট্রাম, মোটর, জাহাজ, রেলগাড়ী সব সেখানে তৈরী থাকে। ব্যাপারটা কি রকম ভাব দেখি! সেই গ্রামে বসিয়াই তাঁহারা হিমালয়ের দৃশ্য, উত্তর মেরুর দৃশ্য, আফ্রিকার জঙ্গল, লণ্ডন সহর—সব জিনিষের ছবি তুলিয়া দিবেন। দু' হাজার বছর আগেকার ছবি, হাজার বছর আগেকার দৃশ্য, এসবও বাদ পড়িবে না।

আজকাল আবার সব সময়ে নকল জিনিষ দেখাইলে চলেনা। লোকে চায় আসল জিনিষের জীবন্ত ছবি দেখিতে। বায়স্কোপওয়ালারা সেদিকেও মোটেই পিছ-পা নন। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে প্রাণ হাতে করিয়া গিয়া তাঁহারা ভীষণ ভীষণ জানোয়ার আর অসভ্য মানুষ-খেকো লোকের ছবি তুলিয়াছেন; আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের, সময় গিয়া তাহারও ছবি লইয়াছেন, আবার ডুবুরির বেশে সমুদ্রের তলায় গিয়া, সেখানকার অদ্ভুত অদ্ভুত জীবন্ত দৃশ্যের ছবি তুলিতেও ছাড়েন নাই। এসবের জন্য অনেক সময় তাঁহাদিগকে যে শুধু বিপন্ন হইতে হইয়াছে তাহা নয়, সময় সময় প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হইয়াছে; কিন্তু তবুও তাঁহারা দমিবার পাত্র নন। একবার একজন অভিনেতা পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রে লাফ দিবার ছবি দেখাইবেন; ঠিক হইল, তিনি সমুদ্রের ধারে এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবেন, তাঁহার কয়েক হাত নীচে একটা মাচা বাঁধা থাকিবে। তিনি লাফ দিয়া মাচার উপর পড়িবেন—মাচাটা অবশ্য ছবিতে তোলা হইবে না। লোকে ছবি দেখিয়া ভাবিবে সত্য সত্যই বুঝি তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মাচাটা হয়ত ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই। অভিনেতা যেই ঝাঁপ দিয়াছেন, অমনি মাচা ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও প্রাণ হারাইলেন। এই রকম—বুনো জানোয়ারের সঙ্গে একত্র ছবি তুলিতে গিয়া, কিংবা কোন দুর্ঘটনা দেখাইতে গিয়া অনেক সময় দুর্ঘটনা সত্য সত্যই ঘটিয়া যায়। কিন্তু বায়স্কোপওয়ালারা তবুও বিপদের মধ্যে যাইতে ভয় পান না।

অবশ্য যেখানে অন্য রকম ভাবে কাজ হাঁসিল করা যায়, সেখানে তাঁহারা ফাঁকি দিয়া কাজ সারিতে খুবই পটু। মনে পড়ে, ছেলেবেলা একবার এক বায়স্কোপ

দেখিয়াছিলাম, আমেরিকার নিউ ইয়র্কের একখানা ছবি। ২০।২৫ তালা একখানা বাড়ী; একজন লোক দেয়াল বাহিয়া সেই ২৫ তালা উঠিতেছে। এই বুঝি হাত ফস্‌কাইল! নীচের দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া যায়। উঃ, যদি একবার পড়িয়া যায়! একেবারে ছাতু হইয়া যাইবে। দম বন্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম, "উঃ লোকটার কি সাহস!" এখন কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না—কায়দাটা যে জানিতে পারিয়াছি! নীচের ছবিখানা দেখিলেই

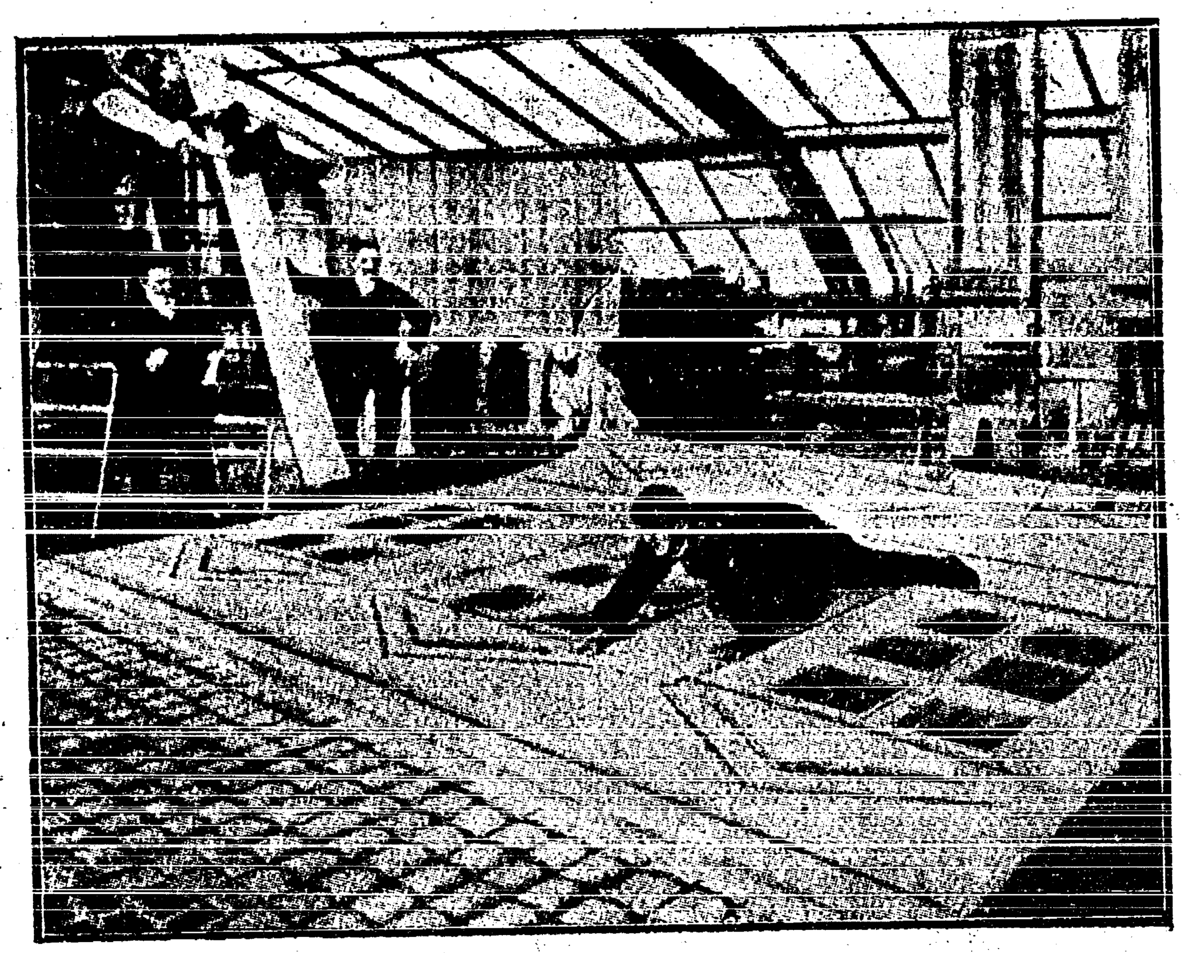

ফাঁকিবাজ অভিনেতা—দেয়াল বাহিয়া উঠিতেছে

ব্যাপারটা বুঝিবে। একজন লোক দেয়াল বাহিয়া উঠিতেছে, তাহারই ছবি। প্রকাণ্ড লম্বা নকল দেয়াল মাটিতে বিছান রহিয়াছে, আর লোকটা হামাগুড়ি দিয়া ঠিক যেন দেয়াল বাহিয়া উঠিতেছে, এই রকম ভাব দেখাইতেছে। একটা সিঁড়ির উপর উঠিয়া আর কয়েকজন উপর হইতে ছবি লইতেছে। বায়স্কোপ দেখাইবার সময় পর্দ্দার উপর ছবিখানা কাৎ করিয়া দেখাইলেই হইল। সকলে ভাবিবে "উঃ, লোকটার সাহস ত' কম নয়, দিব্যি খাড়া দেয়াল বাহিয়া উঠিয়া চলিয়াছে!"

এ রকম কায়দা আরও অনেক জায়গায় করা হয়। কখনও হয়ত ছবি তুলিবার মাঝখানে ক্যামেরা বন্ধ করিয়া লোকটাকে তুলিয়া, তাহার জায়গায় একটা পুতুল রাখিয়া দেওয়া হইল। তারপর সেই পুতুলের উপর দিয়া একখানা ট্রেন চলিয়া গেল আর তার ছবি লওয়া হইল। তারপর, ক্যামেরা বন্ধ করিয়া পুতুলের জায়গায় লোকটাকে শোয়াইয়া আবার ছবি তোলা হইবে। লোকটা হয়ত উঠিয়া মুখখানা এমন করিবে, যেন ট্রেনখানা এই মাত্র তাহার উপর দিয়াই চলিয়া গেল; তারপর নিতান্ত তাচ্ছীল্য ভাবে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে। তোমরা দেখিলে ভাবিবে, লোকটা মানুষ না আর কিছু! শরীরখানা কি লোহা দিয়া তৈরী? ট্রেন চাপা পড়িয়াও দিব্যি খাড়া হইয়া আছে!

বায়স্কোপে যে শুধু গল্প উপন্যাসই দেখান হয়, তাহা নয়। কত জানিবার কথা, নূতন নূতন খবর আজকাল বায়স্কোপের সাহায্যে জানান হয়। খবরের কাগজ পড়িয়া শুধু কাণেই শোনা যায়, কিন্তু বায়স্কোপের খবরে প্রত্যেকটী ঘটনা তোমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে—ঠিক যেমনটী ঘটিয়াছিল তেমনি। নানা রকম ব্যবসায়ে, শিক্ষায় আজকাল বায়স্কোপের বেজায় কদর।

রঙ্গিন ছবিও বায়স্কোপে তোলা হইতেছে। আবার বৈজ্ঞানিকেরা ছবিকে দিয়া কেবল হাত-পা নাড়াইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আজকাল তাঁহারা ছবিকে দিয়া কথাও বলাইতেছেন।

খোকার প্রতি

(শ্রীমতী নিরুপমা সরকার)

আয়রে খোকা, তোর কাণেতে
পরিয়ে দি' এই ফুল,
ছোট্ট দুটী কাণের পাশে,
নাচুক দোদুল্ দুল্!

তোর কপালে আয় এঁকে দি'
একটী ছোট টিপ্,
আকাশ-কোলে জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্
জ্বলুক তারা—দীপ।
নরম গালে আয়, নিবি আয়,
একটি মিঠে চুম্,
ছুটোছুটির মাঝে থাকি
একটুকু নিঝুম্!
আয়রে খোকা, তোর কাণেতে
পরিয়ে দি এই ফুল,
ব্যথার পাথার-মাঝে গড়ি'
স্বপন দেশের কূল।

ফিরতি বরাত

(শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ)

১

দুই বন্ধু—তা'র একজন মাকুন্দো আর একজন টেকো। মাকুন্দোর সারা মুখে গোঁপদাড়ির চিহ্নও নেই, কিন্তু মাথায় মস্ত বাবরী। টেকোর মাথা জোড়া টাক, কিন্তু গালে ইয়ে লম্বা চাপ্‌দাড়ি।

বেচারারা গরীব মানুষ,—কারু কাছে খাতির যত্ন নেই, পাড়া-পড়্‌শীরা উল্টো টিট্‌কারী দেয়!—মাকুন্দোকে দেখ্‌লে বলে 'অযাত্রা মাকুন্দো-চোপা; টেকোকে দেখলে ভঙ্গী কোরে টাক্‌টুক্ করে, নয়তো হাত তুলে' বক দেখায়!

টিট্‌কারীর জ্বালায় অস্থির হ'য়ে 'দুত্তোর' ব'লে দু'জনেই দেশ ছেড়ে চল্লো।

কিন্তু এ গেল এদিকে, ও গেল ও-দিকে। দেশ ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে দু'রাজার রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত।

মাকুন্দো যে-রাজ্যে গেল সেখানের লোকের বিশ্বাস, যার যত বড় বাব্‌রী সে তত বড় জোয়ান। সে রাজ্যের প্রায় সকলেরই মাথায় কিন্তু এক এক টাক—নানান্ টোট্‌কা-টাট্‌কী ঘ'সেও চুল হয় না। বাব্‌রীওলা মাকুন্দোকে দেখে' তাই তা'রা ভারী খুসি। সকলে আদর কোরে তা'কে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা বাবরীর বহর দেখে মাকুন্দোকে খাতির কোরে রাজপুরীতে রাখ্‌লেন।

এদিকে টেকো আবার যে-রাজ্যে গিয়েছে, সে-রাজ্যের চুল দাড়ির ওপর নজর নেই—যত নজর খালি টাকের ওপর। তাদের বিশ্বাস, যার যত বড় টাক, তার বুদ্ধি তত বেশী। এ রাজ্যের প্রায় সকলেরই মাথায় লম্বা লম্বা চুল—নানান্ টোট্‌কা-টাট্‌কী ঘ'সেও টাক পড়ে না। টেকোর মাথা-জোড়া টাক দেখে তাই তারা ভারী খুসি। সকলে আদর কোরে তা'কে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা টাকের বহর দেখে টেকোকে খাতির কোরে রাজপুরীতে রাখলেন।

২

মাকুন্দো যে রাজার রাজ্যে আছে, সে রাজার মাত্র একটী ছেলে। আর টেকো যে রাজার রাজ্যে আছে, তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। দু' রাজারই মনের সাধ—এ-রাজ্যের রাজপুত্রের সঙ্গে ও-রাজ্যের রাজকন্যার বিয়ে হয়। কিন্তু রাজকন্যার মনের নাগাল পাওয়া ভার! সে বলে—'রাজপুত্র হ'লেই তো হলো' না!—রাজ্যরাখার ক্ষমতাও তো চাই। আগে বলের পরীক্ষা হোক্, তবে তো বুঝি তালপাতার সেপায়ের রাজ্য নয়,—সত্যি-সত্যিই রাজা-রাজড়ার দেশ!

শুনে' রাজপুত্রেরও জেদ হ'লো—বটে! রাজকন্যা বলের পরীক্ষা চান্? ...ভালো, তবে আমরাও বুদ্ধির পরীক্ষা চাই। রাজকন্যা হ'লেই ত হ'লো না—বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে তো বুঝি সত্যি-সত্যিই রাজরাজড়ার মেয়ে!'

ছেলে-মেয়ের জেদে বুড়ো রাজারা গালে হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন—'এরা বলে কি!'

এ রাজ্যের লোকেরা বলে—'ভালো, বলুন না রাজকন্যা, তিনি কি রকম জোরের পরীক্ষা চান?'

ও-রাজ্যের লোকেরা বলে—'রাজপুত্রই বা বুদ্ধির পরীক্ষা কি চান; খুলে' বলুন!'

রাজকন্যা বল্লেন—'আমি রাজপুত্রের অপমান কর্ত্তে চাই না, তাঁর রাজ্যের যেই পারুন করুন দেখি,—আমি এক বোতল জল পাঠাচ্ছি, সে জল গুঁড়ো করে ফেরৎ দিন—দেখবো তাঁর রাজ্যে কত বড় পালোয়ান আছে!'

রাজপুত্রের লোকেরা বল্লো—'বেশ! আমরাও রাজকন্যার অপমান কর্ত্তে চাই না, ও-রাজ্যের যে-ই পারুন, পাঠিয়ে দিন তো—কাগজে মুড়ে' একটু আগুন, আর পাতায় ক'রে খানিকটা হাওয়া—দেখবো বুদ্ধি কত!'

শুনে দু'রাজ্যের লোকই ভাবে—'এ কি কথা!'

রাজপুত্রের দেশের লোকেরা বলে—'জলের আবার গুঁড়ো কি গা?'

রাজকন্যার দেশের লোকেরা বলে—'কাগজে মুড়ে' আগুন, আর, পাতায় কোরে হাওয়া চাই!—বলে কি গো?'

কিন্তু ব'সে থাক্‌লে তো চলবে না! পরীক্ষায় জিত তো চাই! কেউ-ই ভেবে পায় না কি করে!

উপায় না পেয়ে রাজপুত্রের দেশের লোকেরা মাকুন্দোকে ধ'রে পড়ল—'দাদা, তোমাকেই একটা উপায় কর্ত্তে হচ্ছে। জলের গুঁড়ো করা তো পালোয়ানের কাজ। তোমার মত পালোয়ান এ-দেশে আর কে আছে?'

মাকুন্দো বল্লো...'বহুৎ আচ্ছা! রাজকন্যার দেশে খবর পাঠাও—জলের গুঁড়ো নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

রাজকন্যার দেশের লোকেরা টেকোকে ধ'রে পড়্‌ল—'দাদা, তোমার মত বুদ্ধিমান এ-রাজ্যে আর কে?—দেশের মান-ইজ্জৎ তোমাকেই রাখ্‌তে হচ্ছে!'

টেকো বল্লো—'কুছ্‌ পরোয়া নেই!...রাজপুত্রের দেশে খবর পাঠাও—আগুন আর হাওয়া নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

৩

রাজপুত্রের দেশ হ'তে মাকুন্দো যাচ্ছে, আর রাজকন্যার দেশ হ'তে টেকো আস্‌ছে। দু'জনেই রাজারাজড়ার লোক—মাথায় এত্‌না-বড় পাগড়ী, আর গায়ে ঝক্‌ ঝক্‌ করে জরির পোষাক! মাঝ-পথে এর সাথে ওর দেখা। দেখে' দু'জনেই এক সময়ে চম্‌কে উঠ্‌ল—'কে রে?'

মাকুন্দো বল্লো—'বন্ধু নাকি হে?'

...মাঝ-পথে এর সাথে ওর দেখা

টেকো বল্লো—'তাইতো! মিতে যে!'

কথাবার্ত্তার পর দু'বন্ধু যে যার জিনিস বের কল্লে।

মাকুন্দো এক বোতল বরফের গুঁড়ো টেকোর হাতে দিয়ে বল্লো—'এই নাও, তোমাদের রাজকন্যার জিনিস।'

টেকো মাকুন্দোর হাতে দিল—একটা চীনে লণ্ঠন—তা'র ভেতর মোমের বাতি জ্বালানো; আর একখানা তালপাতার জাপানী পাখা—নাড়া দিলেই তা'তে হাওয়া খেলে!

এরা বলে-'তাইতো! এমন জোয়ান ছিল বোলেই তো মুখ-রক্ষা হ'লো!' ওরা বলে—'আরে! অমন টাক্-ও'লা মানুষ রাজ্যে ছিল বলেই তো পরীক্ষায় জিত হ'লো!' তখন চারদিকে মাকুন্দো আর টেকোর জয়-জয় কার!

…এর পর রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে আট্‌কায় কে?

বুড়ো রাজারা কিছুদিন বাদে মারা গেলেন। তখন রাজপুত্র হ'লেন দু'রাজ্যের রাজা, আর রাজকন্যা, দুরাজ্যের রাণী।

বুড়ো কোটাল আর বুড়ো মন্ত্রীও বেশীদিন আর বাঁচলেন না। তাঁদের পর মাকুন্দো হ'লো নতুন কোটাল, আর টেকো হ'লো নতুন মন্ত্রী।

নতুন কোটাল আর নতুন মন্ত্রী একদিন মহাসমারোহে নিজেদের দেশে গেল। দু'জনেরই মাথায় এত্তো-বড় পাগ্‌ড়ী, আর গায়ে ঝক্ ঝক্ করে জরির পোষাক। 'বড়মানুষ দেখে' তখন মাকুন্দো আর টেকোকে দেশের লোকের খাতির কত!

জানোয়ারের মুখে

(শ্রীমতী চারুলতা দেবী)

চিড়িয়াখানায় গিয়া সিংহ, বাঘের খাঁচার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রাগাইতে অনেকেই বেশ মজা অনুভব করে। বেচারারা শুধু দাঁত মুখ খিঁচাইয়া একটু নিষ্ফল গর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু তাহাদের মনের ভাবটা সহজেই

আন্দাজ করা যায়;—অর্থাৎ "মাঝের ঐ লোহার ব্যবধানটা না থাকিলে তোমাদের 'মজা দেখা' ভাল করিয়াই বাহির করিতাম।"

বাস্তবিক, মাঝের ঐ লোহার রেলিংটা না থাকিলে কি হইত তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে যদি একটু বেড়াইতে যাও তবে তোমাকে হামেশাই ঐ রকম ভীষণ ভীষণ জানোয়ারদের সঙ্গে মুখামুখি দাঁড়াইতে

"লোহার ব্যবধান" না থাকিলে পশুরাজ কি প্রকারের চীজ্!

হইবে। লোহার ব্যবধানটা সেখানে থাকিবে না। তুমি নিশ্চয়ই বলিবে "কাজ নাই বাপু, ওরকম চমৎকার জায়গায় বেড়াইতে গিয়া; তাহার চেয়ে ঘরে বসিয়া একটু গড়াইয়া লইলে আরাম পাওয়া যাইবে অনেক বেশী।" কিন্তু সকলের মত তো এক রকম নয়,—এমন অনেক লোক আছে যাহারা সখ করিয়া ঐ সব বিপদের মধ্যে যাইতেই ভালবাসে। বিপদকে জয় করাটাই তাহাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ।

এই অদ্ভুত খেয়ালের জন্য কতবার যে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছে সে

সব কথা, বড় বড় শিকারী ও ভ্রমণকারীদের লেখা বই পড়িলেই জানা যায়। তাহাদেরই কয়েকটি ঘটনা তোমাদের আজ বলিব।

সার্ এড্ওয়ার্ড্ ব্রাড্ফোর্ড্ নামে একজন বিখ্যাত শিকারী একবার বাঘের মুখে পড়িয়াছিলেন। ব্যাপারটা হইয়াছিল এই রকম—এড্ওয়ার্ড একবার একটা বাঘকে গুলী করেন; গুলী খাইয়া বাঘটা জখম হইল, কিন্তু মরিল না। এ রকম অবস্থাই হইল সব চেয়ে খারাপ। জখ্মী বাঘের মত ভয়ানক জীব আর নাই। এড্ওয়ার্ড বুঝিলেন বাঘটা তাঁহাকে বেশ একটু ভোগাইবে—তিনি বাঘটার গতিবিধির দিকে নজর রাখিলেন। হঠাৎ দেখেন বাঘটা নাই। বাঘটা কিন্তু পালায় নাই, কখন কোন্ ফাঁকে ঘুরিয়া ঠিক এডওয়ার্ডের পিছন দিকে একটা ঢিবির উপর গিয়া উঠিয়াছে। তারপর হঠাৎ সে এডওয়ার্ডের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। বিপদের উপর আবার বিপদ—বন্দুকটাও ঠিক সেই সময় একটা গাছে এমনভাবে আটকাইয়া গেল যে এডওয়ার্ড আর গুলি করিবার অবসরই পাইলেন না। বাঘ তাঁহার বাঁ হাত কামড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। এড্ওয়ার্ডের কিছুই করিবার ছিল না, রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই। কিন্তু তবু তিনি দমিলেন না, স্থির হইয়া উপায় ভাবিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁহাদের দলের একটী লোককে দেখা গেল। তখন সে বাঘটাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। এডওয়ার্ড বাঁচিলেন বটে, তবে তাঁহার একখানা হাত কাটিয়া ফেলিতে হইল। এডওয়ার্ড তাঁহার বইতে লিখিয়াছেন, যতক্ষণ বাঘটা তাঁহাকে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, ততক্ষণ তিনি একটুও যন্ত্রণা বোধ করেন নাই। তাঁহার সমস্ত মন তখন বাঁচিবার উপায় খুঁজিতেছিল—যন্ত্রণার কথা তাঁহার মনেও আসে নাই। লিভিংষ্টোন নামে আর এক বিখ্যাত শিকারীও একবার সিংহের কামড় খাইয়াছিলেন; তিনিও বলেন—যতক্ষণ সিংহ তাঁহাকে মুখে করিয়াছিল, ততক্ষণ তিনি কোনও যন্ত্রণা টের পান নাই। ইহা প্রকৃতির দয়া বলিয়া তিনি মনে করেন। ঐ অবস্থায় যদি যন্ত্রণার দিকে মন যায় তবে প্রাণ বাঁচাইবার চিন্তা করা সম্ভব হয় না।

দিনের বেলা সিংহের মুখে পড়াটাকে বড় বড় শিকারীরা বেশী ভয়ানক মনে

করেন না, কেননা ও রকম জায়গায় অনেকেই রক্ষা পাইয়াছেন। জানোয়ারদেরও মানুষের নামে একটা ভয় আছে, মানুষ দেখিলেই যে তাহারা আক্রমণ করিবে, তাহার কোনও মানে নাই। তবে, একবার যদি তাহারা জানিতে পারে যে মানুষ অত সহজে কাবু হয়, তাহা হইলেই মুস্কিল। তখন তাহারা বিনা কারণে, এমন কি, আহারে অরুচি থাকিলেও মানুষ দেখিলেই হত্যা করে। আফ্রিকার এক জায়গায় রেল-লাইন বসাইতে গিয়া, একবার সিংহের পেটে যত লোক গিয়াছিল, তত লোকক্ষয় বোধ হয় অনেক ছোট খাটো যুদ্ধেও হয় না। সারাদিন সতর্ক পাহারার ভিতর রেল-লাইনের কাজ চলিত; রাত্রে মিস্ত্রি-মজুরেরা তাঁবুতে ফিরিত। তখন সিংহের দল বাহির হইত। তাঁবুর লোকেরা প্রথমে তাহাদের বিকট গর্জ্জন শুনিতে পাইত, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সব চুপ চাপ। তার পরে হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে চীৎকার, তাড়া-হুড়া পড়িয়া যাইত। সিংহ আসিয়াছে, কিন্তু কোথায় সিংহ? কোন্ ফাঁকে যে সরিয়া পড়িয়াছে তাহা কেহই দেখে নাই। পরদিন সকাল বেলাই দেখা যাইত, একজন লোককে পাওয়া যাইতেছে না। এম্নি করিয়া সিংহের দল নয় মাস সেই শত শত সহস্র লোককে ফাঁকি দিয়া শিকার সংগ্রহ করিয়া গিয়াছে। তারপর একদিন দু'টী সিংহকে গুলি করা হইল। তারপর আর কোনও উপদ্রব নাই। এই দু'টী সিংহই এতদিন ধরিয়া তাঁবুশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া দিয়াছিল। নয়মাসে তাহারা রেলওয়ের কর্ম্মচারীই প্রায় ২৮ জনকে লইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া কুলী-মজুর যে কত লইয়াছিল, তাহার শেষ নাই।

তবে জানোয়ারদের হাত হইতে যে কত সময় শুধু বুদ্ধির বলে ফাঁকি দিয়া রক্ষা পাওয়া যায়, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। একবার এক শিকারীকে অতর্কিতভাবে সিংহে তাড়া করিল। বেচারা বন্দুকে গুলি ভরিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পাইল না। তখন সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ ফিরিয়া সিংহের দিকে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। তারপর চোখ পাকাইয়া বিকটভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। সিংহ বাবাজী কখনও মানুষের গলা শোনেন নাই, তিনি বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। শিকারী বুঝিল ওষুধ ধরিয়াছে। তখন সে

দুই হাত তুলিয়া আরও বিকট ভাবে চীৎকার জুড়িয়া দিল। এবার পশুরাজের যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও লোপ পাইল। তিনি বীরভাবে শিয়ালের মত পিছু ফিরিয়া লেজ গুটাইয়া ছুট দিলেন।

এ রকম ব্যাপার আরও অনেক ঘটিয়াছে। একবার একটি লোক এক পাল সিংহের মুখে পড়িল। তাহার কাছে না ছিল বন্দুক, না ছিল একটা ছুরী। থাকিবার মধ্যে ছিল শুধু একটা দূরবীণ। আর কোন উপায় না দেখিয়া সে করিল কি, চীৎকার করিয়া সেই দূরবীণটাই সিংহের পালে ছুঁড়িয়া মারিল। মানুষকে অস্ত্র ছুঁড়িতে দেখিলে যে কোন জানোয়ারই ভড়্‌কাইয়া যায়, অস্ত্রটা কোন্ জাতীয় তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার মত তাহাদের অবস্থা থাকে না। এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা হইল তাহাই। যেই দূরবীণ ছোঁড়া, অমনি সেই ভীষণ জানোয়ারের দল পিছু ফিরিয়া দৌড়।

গণ্ডার মহাশয়ের রাগের একটু নমুনা

বাঘ সিংহের কথাই এতক্ষণ বলিলাম। বন্য হাতী একবার চটিলে যে কি

রকম অবস্থা হয়, তাহা কল্পনায় আনিতেও ভয় হয়। বনে হাতীরা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হইয়া থাকে। অনেক সময় এক একটা হাতী দল-ছাড়া হইয়া যায়। সব সময়ে যে সে অন্য দলে ঢুকিতে পায়, তাহা নয়। তখন তাহার অবস্থা হয় পাগলের মত— আর তেমনি হিংস্র! একবার এই রকম একটা হাতী প্রায় ৫০ জন লোককে পায়ের তলায় পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। শেষে ৩০ জন ভাল ভাল শিকারী ত্রিশটি পোষা হাতীতে চড়িয়া বহুকষ্টে তাহাকে বধ করে। সহজে কি তাহাকে মারা যায়? পর পর আশীটা গুলি হজম করিয়া শেষে সেই বিরাট্ জানোয়ার হার স্বীকার করে।

বুনো মহিষের রাগ, সাহেবকে স্বর্গের দিকে পাঠাইতেছে।

গণ্ডারও ক্ষেপিলে বড় কম যায় না। তাহার সেই একটা শিং লইয়াই সে বড় বড় হাতীর সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়ায়। ২৩০ পৃষ্ঠার ছবিটায় দেখ, গণ্ডার শিকার করিতে গিয়া লোকগুলি কি বিপদেই না পড়িয়াছে! ইচ্ছা করিলেই গণ্ডার মহাশয় লোকগুলিকে চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া দিতে পারেন!

মহিষকে আমরা নিরীহ জীব বলিয়া মনে করি। রাস্তা দিয়া যখন মালবোঝাই গাড়ী-গুলি লইয়া মহিষেরা চলিতে থাকে এবং গাড়োয়ানের হাতের চাবুক আর ল্যাজ-মোড়া গুলি

নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে হজম করে, তখন মনেও হয় না যে এই মহিষই যখন বনে থাকে, তখন বাঘ সিংহের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করিতে ভয় পায় না। বুনো মহিষ ক্ষেপিলে কোনও হিংস্র জানোয়ারই তাহার কাছে লাগে না। তখন ইহাদের গায়েও যেমন অসম্ভব জোর দেখা যায়, মেজাজটাও হয় তেমনি বাদশাহী গোছের। ও পাতার ছবিতে দেখ একটা বুনো মহিষ একজন শিকারীকে শিংএ করিয়া আছ্‌ড়াইতেছে। ইহারা নিরামিষ খায়, অথচ প্রাণিবধ করিতে খুব পটু। আফ্রিকায় বুনো মহিষের উৎপাত বড় ভয়ানক। মাঝে মাঝে তাহারা দলবল শুদ্ধ এক একটা কাফ্রী পল্লীতে প্রবেশ করে, আর গ্রাম ছারখার করিয়া নিজেদের খেয়াল মিটাইয়া চলিয়া যায়।

অগস্ত্যের কীর্ত্তি

(মহাভারত হইতে)

তোমরা বৈশাখ মাসের 'রামধনু'তে পড়িয়াছ, বৃত্রবধের পর কালেয় অসুরেরা সমুদ্রের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল এবং স্বর্গ, মর্ত্ত নষ্ট করিয়া ফেলিবে স্থির করিল। তাহারা দিনের বেলায় সমুদ্রে লুকাইয়া থাকিত, রাত্রি হইলেই বাহির হইয়া মুনি-ঋষিদিগকে ধরিত আর খাইত। এইরূপে তাহারা বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমের ১৯৭ জনকে এবং চ্যবন ঋষির দলের ১০০ জনকে পেটে পূরিয়া ফেলিল। আর ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়া এক কুড়ি ব্রাহ্মণের দফা শেষ করিয়া দিল। কোথা হইতে যে তাহারা আসিত আর কোথায় চলিয়া যাইত, কেহ টেরই পাইত না। সকাল বেলা লোকে দেখিত মাটীতে ঋষিদের শরীরের খানিকটা পড়িয়া আছে, আর কোথাও কলসীভাঙ্গা কোথাও যজ্ঞের জিনিষপত্র ওলট্ পালট্। মানুষ বেদম মরিতে লাগিল। যাহারা মরিল না, তাহারা প্রাণের ভয়ে ছুটাছুটি করিয়া যে যেখানে পারিল লুকাইতে লাগিল। কে বা তখন দেবতাদের পূজা দেয় আর

কেইবা যাগযজ্ঞ করে? দেবতারা এ অত্যাচার আর কতদিন সহ্য করিবেন? অথচ তাঁহারা কিছু দেখিতেও পান না, আর ব্যাপারটা যে কি তাহা বুঝিতেও পারেন না। নিরুপায় হইয়া দেবতাদের রাজা ইন্দ্র নিজের দলবল লইয়া নারায়ণের কাছে চলিলেন। নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি জানি কে তোমাদের এই দুর্গতি করিতেছে। ইন্দ্র যে বৃত্রকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, এরা তাহারই দলের অসুর। দিনের বেলা সমুদ্রের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, রাত্রে বাহির হয় আর ঋষিদের মারে। যতদিন এরা সমুদ্রের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে, ততদিন তোমরা ইহাদের কিছুই করিতে পারিবে না। তোমরা দেখ, কেমন করিয়া সমুদ্রের জল শুষিয়া ফেলা যায়। কিন্তু সমুদ্রের জল শুষিয়া ফেলিতে পারে এমন লোক কে আছে? এক আছে মহামুনি অগস্ত্য।"

দেবতারা নারায়ণের কথা বেশ করিয়া শুনিয়া, গেলেন ব্রহ্মার নিকট। তাঁহার অনুমতি লইয়া শেষে তাঁহারা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে চলিলেন। অগস্ত্যের চারিদিকে কত মুনি-ঋষি! ইঁহারা নানারকমে অগস্ত্যের সেবা করিতেন। দেবতারাও অগস্ত্যের স্তব-স্তুতি করিয়া তাঁহার নিকট বর চাহিলেন। স্তব করিবার সময়, অগস্ত্য ঋষি যে এক সময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা হেঁট করাইয়া দিয়াছিলেন, সে কথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। এখানে কথা উঠিতে পারে, অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা হেঁট করাইয়া দিয়াছিলেন কেন? সে গল্পটাও তবে বলি। সূর্য্য ঠাকুর সকাল বেলা ওঠেন আর সন্ধ্যাবেলা অস্ত যান। উদয়ের সময় এবং অস্তের সময়, তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করেন, অর্থাৎ ঘুরিয়া যান; বিন্ধ্যপর্ব্বতের ইহাতে বড় হিংসা হইল। সূর্য্য সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করে আর আমাকে করিবে না? বিন্ধ্য সূর্য্যকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর, তুমি যেমন মেরুর চারিদিকে ঘোর, তেমনি আমারও চারিদিকে ঘুরিতে হইবে।" সূর্য্য ঠাকুর উত্তর দিলেন "আমি কি নিজের ইচ্ছায় ঘুরি? বিধাতা-পুরুষ আমাকে যে পথে ঘোরান সেই পথেই আমাকে ঘুরিতে হয়।" এ কথায় কিন্তু বিন্ধ্যের রাগ থামিল না; সে ভাবিল, এই চন্দ্রসূর্য্যের

পথ বন্ধ করিয়া দিব, তবে আমি বিন্ধ্য। সে ক্রমাগত উপর দিকে মাথাই তুলিতে লাগিল। দেবতারা তো ব্যাপার দেখিয়া বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন! তাঁহারা বিন্ধ্যের কাছে গেলেন! কত রকমে তাহাকে বুঝাইলেন। কিন্তু বিন্ধ্যের মাথায় তখন খুন চাপিয়াছে, সে কোন বুঝই বোঝে না। তখন দেবতারা ধরিলেন গিয়া অগস্ত্য মুনিকে। অগস্ত্য দেবতাদের কথায় সাজিয়া গুজিয়া দক্ষিণ দেশে চলিলেন। যাইবার সময় পথে বিন্ধ্যপর্ব্বতকে বলিলেন "দেখ্ বিন্ধ্য, আমি দক্ষিণ দেশে যাইতেছি, আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও; যত দিন আমি না ফিরি তত দিন এই ভাবেই থাকিও, আর মাথা বাড়াইও না।" বিন্ধ্যের সাহস হইল না এত বড় ঋষির কথা অমান্য করে। সে মাথা নোয়াইয়াই রহিল। অগস্ত্য যে গেলেন সেই গেলেন, আর ফিরিলেন না। * বিন্ধ্যও আর মাথা তুলিতে পারিল না।

অগস্ত্য সাগর শুষিতেছেন।

সে যাহা হউক, অগস্ত্য এবারও দেবতাদের স্তব শুনিয়া খুসী হইলেন এবং তাঁহাদের দুর্গতির কথা শুনিয়া উপকার করিতেও স্বীকার করিলেন। তিনি অনেক দেবতা ও ঋষিকে লইয়া চলিলেন সমুদ্রের দিকে। তারপর তিনি কি করিলেন? সমুদ্রের জলগুলি একেবারে সমস্ত গিলিয়া ফেলিলেন। অসুরেরা আর জলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা বাহির হইয়া পড়িল, আর দেবতাদের হাতে বেদম মার খাইয়া মরিতে লাগিল। অগস্ত্য মুনির জয়-জয়কারে চারিদিক্ ভরিয়া গেল। তাঁহার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অসুরদের মধ্যে যে কয়টা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা ভয়ে মাটীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

অগস্ত্যের আর এক কীর্ত্তি বাতাপিবিনাশ। অগস্ত্য অনেকদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। তাঁহার (মৃত) পূর্ব্ব-পুরুষেরা সে জন্য বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহারা অগস্ত্যকে জানাইলেন যে, সন্তান না হইলে তাঁহাদের উদ্ধার নাই। অগত্যা অগস্ত্য বিবাহের চেষ্টায় রহিলেন। কিন্তু তিনি তো যে সে মেয়ে বিবাহ করিরেন না, স্ত্রীটি তাঁহার উপযুক্ত হওয়া চাই। বিদর্ভ দেশের রাজকন্যা লোপামুদ্রা যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী ছিলেন। একশত দাসী সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিত, একশত কন্যা তাঁহার সখী ছিল, কিন্তু এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও তাঁহার নিজের স্বভাবটী ছিল চমৎকার। রাজা মহাচিন্তায় আছেন, কাহার হাতে এই কন্যারত্নকে ধরিয়া দিবেন এমন সময় একদিন অগস্ত্য ঋষি গিয়া লোপামুদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। রাজাতো ঋষির কথা শুনিয়া অবাক্! এমন মেয়েটীকে ঐ বনচারী ঋষির হাতে দিতে হইবে? অগস্ত্য আবার যে ভীষণ লোক, অস্বীকার করিলে হয়তো সকলকে শাপ দিয়া পোড়াইয়া দিয়া যাইবেন! রাজা মহা ভাবনায় পড়িয়া "হাঁ, না," কিছুই বলিতে পারিলেন না। অন্দরমহলে গিয়া রাণীর নিকট দুঃখের কথা জানাইলেন। ক্রমে কথাটা লোপামুদ্রার কাণে উঠিল! তিনি পিতার উভয়-সঙ্কট দেখিয়া সুবিধামত একসময়ে তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বাবা, আপনি অত ভাবিবেন না। দিন আমাকে ঐ ঋষির হাতে।"

রাজা তখন ঋষির সহিতই লোপামুদ্রার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর অগস্ত্য স্ত্রীকে বলিলেন "দেখ, তোমার এখন এই সব দামী পোষাক আর দামী অলঙ্কার

* প্রবাদ যে অগস্ত্য মাসের ১লা তারিখে দক্ষিণ-দেশে গিয়াছিলেন। ১লা তারিখে যাত্রা করিলে আর ফিরিবে না, এই ভয়ে এখনও এদেশে হিন্দুরা মাসের ১লা তারিখে কোথাও যাত্রা করে না। পঞ্জিকায় ইহাকে অগস্ত্যদোষ বলে।

মোটেই সাজেনা ; এগুলি ফেলিয়া দাও।" লোপামুদ্রা স্বামীর কথায় সব ফেলিয়া দিলেন এবং গাছের ছাল আর হরিণের চামড়া পরিয়া তাঁহার আশ্রমে গিয়া পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য তাঁহার সহিত কঠিন তপস্যায় ব্যাপৃত রহিলেন।

গাছের ছাল আর হরিণের চামড়া পরিয়া পতিসেবা করিতে লাগিলেন।

অনেকদিন এইরূপে চলিয়া গেল ; শেষে গৃহস্থালী করিতে গিয়া এক সময় লোপামুদ্রার ভাল কাপড় চোপড় ও টাকা-কড়ির ইচ্ছা হইয়া পড়িল। তিনি স্বামীকে বলিলেন "আমার এই সব জিনিষের ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি আনিয়া দিন। আপনি ইচ্ছা করিলেই পারেন।" অগস্ত্য তখন তপস্যার ক্ষয় করিয়া এই সব জিনিষ সংগ্রহ করিবেন না স্থির করিয়া, ভিক্ষায় বাহির হইলেন। প্রথমে গেলেন শ্রুতর্বা রাজার নিকট। রাজা তাঁহার দলবল সঙ্গে লইয়া মুনিকে খুব সম্মান ও যত্ন করিয়া বাড়ীতে আনিলেন। মুনি বলিলেন, "আমি ধনের জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনার যেমন শক্তি আমাকে সেইরূপ ধন দিন। কিন্তু আমাকে দিতে গিয়া যেন কাহারও হিংসা বা ক্ষতি না করেন!" রাজা এই কথা শুনিয়া মুনির নিকট নিজের আয়ের ও ব্যয়ের হিসাব দিলেন এবং বলিলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, ইহা হইতে নিন্।" অগস্ত্য দেখিলেন রাজার আয় ও ব্যয় সমান, তাঁহার নিকট হইতে কিছু নিলে কাহারও না কাহারও কষ্ট হইবেই। তখন

তিনি শ্রুতর্ব্বা রাজার নিকট হইতে কিছুই না নিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন আর এক রাজার নিকট।

এই রাজার নাম ব্রধ্নশ্ব। ব্রধ্নশ্ব রাজা তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া খুব সমাদর করিয়া লইয়া গেলেন এবং মুনির আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুনি ইঁহাকেও বলিলেন "আমরা ধনের জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি অন্যের হিংসা বা হানি না করিয়া যাহা পারেন দিন।" তখন ব্রধ্নশ্ব রাজাও নিজের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিলেন এবং বলিলেন "ইহার মধ্য হইতে আপনাদের যাহা ইচ্ছা নিন্।" অগস্ত্য দেখিলেন ইঁহারও আয় ও ব্যয় সমান, কাহাকেও কষ্ট না দিয়া ইঁহার নিকট হইতে কিছু নেওয়া চলে না। তখন তিনি এই দুই রাজাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু রাজার নিকট। ত্রসদস্যুও ইঁহাদিগকে খুব সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার আয়-ব্যয়ের হিসাব শুনিয়া অগস্ত্যমুনি দেখিলেন যে, ইঁহার নিকট হইতে অর্থ নিলেও অন্যের কষ্ট হইবে। তবে এখন উপায় ? লোপামুদ্রার প্রার্থনা পূরাইতে তো হইবে।

সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া দানবের রাজা ইল্বলের নিকট যাওয়া স্থির করিলেন। এই ইল্বলের ধন-দৌলত ছিল অনেক, কিন্তু সে ব্রাহ্মণের উপর ভারী খাপ্পা ছিল। তাহার এক ভাই ছিল—নাম বাতাপি। কোন ব্রাহ্মণ আসিলে বাতাপি ছাগল সাজিত আর ইল্বল তাহাকে কাটিয়া তাহার মাংস রাঁধিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে খাওয়াইত। তাহার পর সে বাতাপিকে ডাক দিত। তাহার ডাকের গুণে মরা লোক তাজা হইয়া বাহির হইত। বাতাপি ব্রাহ্মণের পেট চিরিয়া নিজমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিত, আর ব্রাহ্মণ মরিয়া যাইত। এই রকমে ইল্বল কত কত ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ করিয়াছিল! যাহা হউক, অগস্ত্য এবং তাঁহার সঙ্গের রাজারা আসিলে ইল্বল বাহিরে খুব ভাল ভাব দেখাইল। তাঁহাদিগকে আদর-যত্ন করিয়া বসাইল এবং খাবার আয়োজন করিতে চলিল। বাতাপি ছাগলের রূপ ধরিল, ইল্বল তাহাকে কাটিয়া মাংস রাঁধিল। রাজারা সব খবর রাখিতেন, তাঁহারা ভয়ে অস্থির হইলেন। মুনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ভয় কি ? আমি উহাকে খাইয়া ফেলিব।"

তারপর তিনি দানবের রাজার দেওয়া ভাল আসনে গিয়া বসিলেন। ইল্বল হাসিতে হাসিতে নিজেই তাঁহাকে পরিবেশন করিতে লাগিল। বাতাপির মাংস আসিলে, মুনি আস্তে আস্তে তাহার সবটাই পেটে পূরিলেন, কিছুই পাত্রে রাখিলেন না।

ভোজনব্যাপার তো হইয়া গেল। এইবার ইল্বল তাহার ভাইকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় বাতাপি ? এ কি আর যে সে ব্রাহ্মণের পেট ? অগস্ত্য বলিলেন "সে কোথা হইতে আসিবে ? আমি যে তাহাকে হজম করিয়া ফেলিয়াছি !"

ইল্বলের তখন আর দুঃখের সীমা রহিল না। কিন্তু এখন আর দুঃখ করিয়া কি হইবে ? বাতাপিকে তো আর অগস্ত্য মুনির উদর হইতে খালাস করিবার উপায় নাই, অগস্ত্যের কিছু করিবারও যো নাই। ইল্বল অগত্যা মুনিকে ও রাজাদিগকে জোড়হাত করিয়া বলিল "আপনারা কেন আসিয়াছেন ? আমাকে কি করিতে হইবে হুকুম দিন।"

অগস্ত্য বলিলেন, "দেখ অসুর, তোমার ধন-দৌলত বিস্তর ; এই রাজাদের তেমন নাই, আমারও প্রয়োজন ঘটিয়াছে ; অতএব তুমি অন্যের হিংসা না করিয়া যাহা পার আমাদিগকে দাও।"

ইল্বল অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ঠাকুর, বলুন দেখি আমি আপনাদিগকে কি দিব মনস্থ করিয়াছি ; যদি পারেন, তবে অবশ্যই তাহা দিব।" অগস্ত্য বলিলেন, "তুমি এই রাজাদের প্রত্যেককে দিবে দশ হাজার গরু আর দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ; আর আমাকে দিবে বিশ হাজার গরু, বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, সোণার রথ, আর বাতাসের মত চলিতে পারে এমন দুই ঘোড়া। সোণার রথ তো সামনেই আছে।" দানবরাজ সমস্ত শুনিয়া মোটেই খুসী হইল না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াছে, তাই সমস্তই রাজাদিগকে ও মুনিকে দিতে হইল ; শুধু দেওয়া নয়, মুনির আশ্রমে গিয়া সমস্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। রাজারা তখন অগস্ত্যের অনুমতি পাইয়া তাঁহাদের ভাগের গরু ও সোণা লইয়া নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেলেন।

লোপামুদ্রা ত' ভারী খুসী। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার এক পুত্র হইল। ছেলেটী কতদিন মায়ের পেটে ছিল জান ? সাত বৎসর !

পাল্‌টা জবাব

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

যে ব্যাপারটা লইয়া সেবার তারকের সহিত নিমাইয়ের ঝগড়া বাধিয়া গেল, সেটা কিন্তু নিতান্ত সামান্যই বলিতে হইবে। নিমাই এম্‌নি যে ছেলেটা খারাপ, তা নয়, কিন্তু অপরকে কথায় কথায় ঠাট্টা করা ছিল তার একটা প্রকাণ্ড দোষ। কোন প্রকারে কাহারও একটু ত্রুটী পাইলেই হইল, অমনি শ্রীমান্ নিমাইচন্দ্র তাহার দফাটী ঠাণ্ডা করিয়া, তবে নিজে ঠাণ্ডা হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া সে যে তারকেরও পিছনে লাগিতে সাহস করিবে, সেটা কিন্তু আমরাও মনে করি নাই। তারক,—ও বাবাঃ, ক্লাশের ফার্ষ্ট বয় সে, সারা স্কুল, এমন কি মাষ্টার মহলে পর্য্যন্ত তাহার নামডাক—তাকে লইয়া কি না রং তামাসা ! ভাবিতেও যে আমাদের কেমন করে !

ব্যাপারটা যা ঘটিল, তা' সংক্ষেপে এই। তারকের বাড়ী ছিল যশো'র জেলায়। এম্‌নি কথা-বার্ত্তায়, তাহার বড় একটা দেশী টান দেখিতাম না, কিন্তু রাগিয়া গেলেই তাহার কথার ধরণটা কেমন জান একটু বদ্‌লাইয়া যাইত। তারকের ছোট ভাই ভুবন আমাদের স্কুলেই নীচের ক্লাশে পড়িত, স্কুলেও আসা-যাওয়া করিত তারকের সাথেই। তা' না হইলে, ছেলে মানুষ, একলা যাতায়াত করিবে কি করিয়া ? চারিটা পর্য্যন্ত স্কুলে থাকিতে হইলে, মানুষের তো এমনই ক্ষিধা পায়, আর ক্ষিধা পাইলে, কার না রাগ হয় বল ? তারকের রোজই এই রকম ক্ষিধা পাইত, আর রাগ হইত ; কাজেই স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়, সে হাঁটিত বিষম জোরে। কিন্তু ভুবন তো হাজার হোক্, ছেলেমানুষ, সে কেন

পারিবে তাহার দাদার সহিত অত জোরে হাঁটিতে ? কাজেই, ভুবন পড়িয়া থাকিত ক্রমাগত পিছনে, আর তারক রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিত "তাড়াতাড়ি আট্, নইলি পরে, আচ্ছা করি পিট্টানি দিবানি !"

ব্যাপারটা জানিতাম সকলেই, কিন্তু ইহা লইয়া কেউ কোন দিন উচ্চবাচ্য করি নাই। নিমাই কিন্তু সেদিন সংস্কৃত ক্লাশে ফস্ করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। পড়া ছিল বালী-সুগ্রীব-কথা। রিডিং পড়িয়া মানে করিতে করিতে নিমাই বলিয়া ফেলিল "ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বালী, সুগ্রীবকে আচ্ছা করি পিট্টানি দিলানি !" আমরা তো শুনিয়া একেবারে 'থ' ! চাহিয়া দেখি, তারকের মুখচোখ লাল হইয়া গিয়াছে। মনে মনে বুঝিলাম, তারক ব্যাপারটাকে সহজে ছাড়িবেনা। বারবারই সারিয়া যাও, এবার শক্ত ঘানিতে পড়িয়াছ নিমাইচন্দ্র !

কথা'টা ঠিকই ধরিয়াছিলাম। বিকালে তারকদের বাড়ী গিয়া দেখি, সেখানে

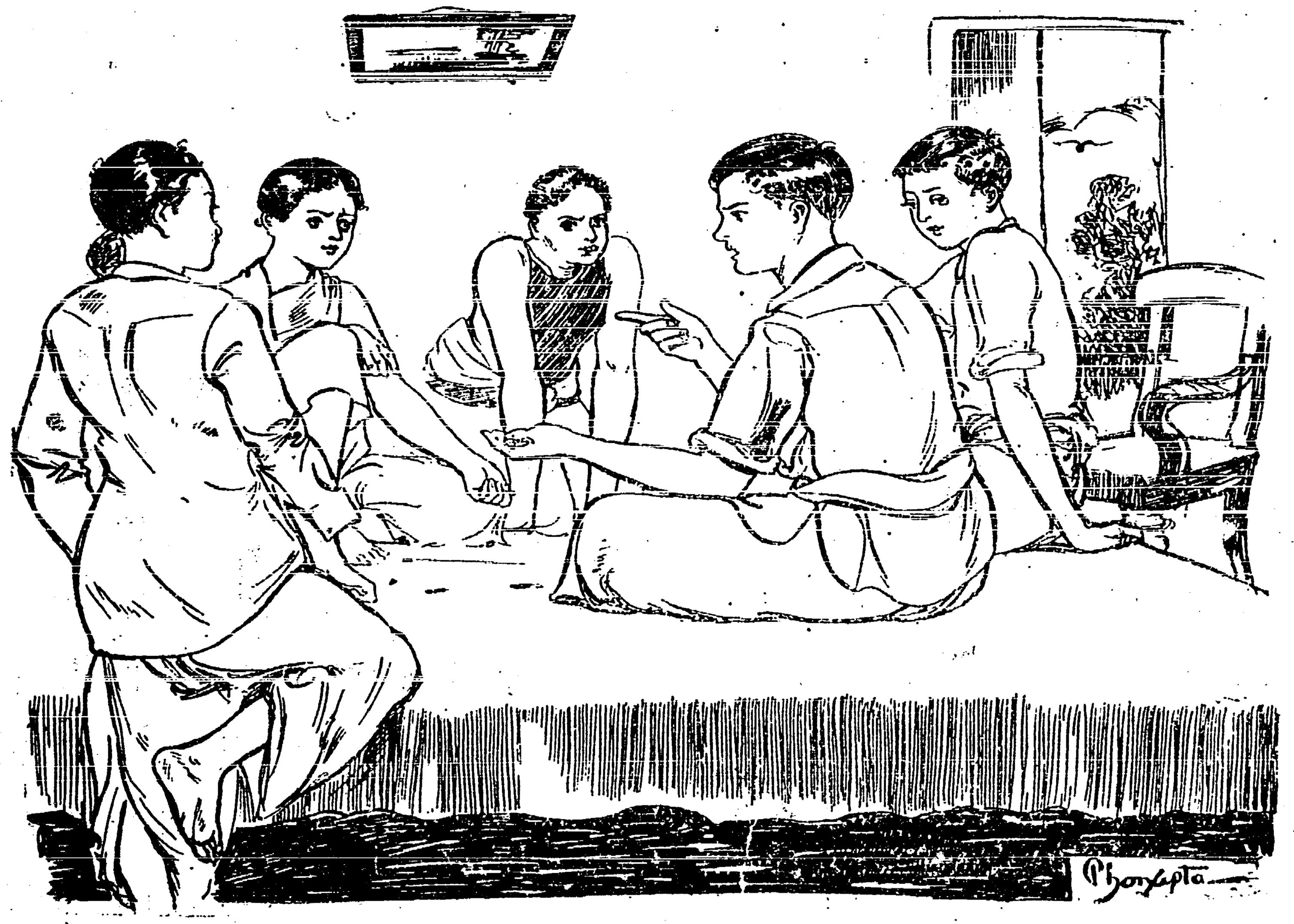

সাপের পাঁচ-পা দেখিয়াছে নাকি ?

দস্তুরমত সভা বসিয়া গিয়াছে। কী ! এত বড় স্পর্দ্ধা, নিমাই পাইয়াছে কি ? যখন তখন, যাহাকে তাহাকে অপদস্থ করিয়া বসিবে, সাপের পাঁচ-পা দেখিয়াছে নাকি ? রাগটা খালি তারকের একার নয়, অনেকেরই। ছোঁড়ার হাতে অনেকেই নাকাল হইয়াছে কি না ! গোবিন্দ বলিল, "আমার কথাটাই ধর্না কেন ! সবে নতুনই স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েছি, ছোঁড়া এসে আমাকে জিজ্ঞেসা কর্লে, 'হ্যাঁ হে, তুমি কি পড় ?' বেশ নরম-সরম ভাবে জবাব দিলাম 'পুস্তক পড়ি।' তাই শুনে একেবারে বত্রিশ পাটী দাঁত বের করে বল্লে 'ও হোঃ হোঃ, তাই নাকি, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি বস্ত্র পর'—আ-হা-হা, কি একটা হাসির কথাই না বল্লেন ছেলে, বস্ত্র মানে কাপড়, তা কি আর কেউ জানে ? তবু যদি ফি পরীক্ষাতেই তারকের চাইতে নীচে না হ'তেন !"

হরিদাস বলিল, "আরে, তুইতো তুই, ওর গুরু-লঘু-জ্ঞানটাই বা কোন্ আছে ? সে দিন বাজারের পথে ড্রইং মাষ্টারের সাথে দেখা। নমস্কার করতেই হেসে বল্লেন, 'তোমরা তো এবার সেকেণ্ড্ ক্লাশে উঠ্লে, কে কোন্ বিষয় এডিসন্যাল নেবে ?' আমরা কেউ বল্লাম, ম্যাথেমেটিক্স্ সান্স্ক্রিট্, কেউ বল্লাম, হিষ্ট্রি সান্স্ক্রিট্, আর ও ছোকড়া কিনা বলে বস্লে 'স্যার, আমি নেব ড্রইং আর ড্রিল্ !' ড্রইং মাষ্টার ঠাণ্ডা মানুষ, তাই কিছু বল্লেন না, হেড্ মাষ্টার হ'লে কাণটাকে টেনে আধ হাত লম্বা করে দিতেন !"

এই রকমের অত্যাচার আর মানুষে মুখ বুজিয়া সহ্য করে কি করিয়া ? তাই ঠিক হইল, নিমাইকে বেশ একটু ভাল ভাবেই জব্দ করিতে হইবে। কিন্তু, কি ভাবে জব্দ করা যায়, সেইতো হইল কথা ! গোবিন্দ বলিল, "একটা কাজ করা যাক্। একটা খড়ের লেজ তৈরি ক'রে, সেটাকে নিয়ে, আমাদের একজন ওর শোবার ঘরের খাটের নীচে লুকিয়ে থাক্। তারপর ও যেই ঘুমিয়ে পড়বে, অম্নি সেটাকে ওর কোমড়ের সাথে জড়িয়ে বেঁধে দিলেই দিব্যি মজা হবে ! পরদিন যখন ইস্কুলে যাবে, তখন ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত ওর লেজ দেখে হেসে মাটীতে গড়িয়ে পড়বে ; যেমন ও হনুমান্, তেম্নি তার উপযুক্ত সাজাটা হবে।

তারক বলিল "আরে, দূর, তা কি হয়, ও ভোরে উঠে নিজেই তো সব টের পেয়ে যাবে। আর যদিই বা, তা না টের পায়, ওর বাড়ীর লোকেরাইতো ধরে ফেল্‌বে! ও কি তাই নিয়ে স্কুলে যাবে ভেবেছিস্? গোবিন্দ বলিল "ও হোঃ, তাও তো বটে!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল "আচ্ছা, ও ঘুমিয়ে পড়লে ক্ষুর দিয়ে ওর মাথাটা কামিয়ে দিলে হয় না? নেড়া-মাথা নিয়েই স্কুলে যেতে নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পাবে!"

এবার জবাব দিল চিন্তাহরণ। বিরক্ত হইয়া বলিল "আরে, থুইয়া দে, খামাখা প্যাচাল পাড়স্ ক্যান্, মাথা কামানের কালে ও ট্যার্ পাইবো না? আমি কই, তারক, অরে ধইরা একদিন পিট্টি দ্যাওনের কাম!" তারক বলিল "না না না, সে সব নয়; ওর ধারণা ওর মত চালাক ত্বনিয়ায় আর নেই। ওকে একদিন সব্বার সামনে বোকা বানাতে হবে। আজ তোদের কারুর মাথাতেই ভাল ফন্দি টন্দি আস্‌ছেনা দেখছি—আজ থাক্, রাত্রিটা ভেবে চিন্তে দেখি, কাল যা হয়, ঠিক করা যাবে।"

২

সেই রাতটা ভাবিয়া চিন্তিয়া তারক এক তোফা ফন্দি বাহির করিয়া ফেলিল। মৎলবটা হইল এই ঃ—আমাদের স্কুলের ছাত্রদের একটা সভা ছিল; মাষ্টার মশায়দের সাথে সে সভার কোন সম্পর্কই ছিল না—ছাত্রেরাই ছিল তার সর্ব্বেসর্ব্বা। মাসের মধ্যে একবার করিয়া সেই সভা বসিত, আর আমরা সেখানে প্রবন্ধ পড়িতাম, বাংলায় বক্তৃতা দিতাম, তর্ক করিতাম, কত কি করিতাম! ঠিক হইল, নিমাইকে এই সভায় একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে বলা হইবে। থিয়েটার-রেসিটেশনে ছোকড়ার ভারী সখ, কাজেই রাজী না হইয়া আর যাইবে কোথায়? অপর ছেলেদের কিন্তু এদিকে জানাইয়া রাখা হইবে যে নিমাই সেদিন ইংরাজীতে একটা বক্তৃতা দিবে। তারপর বাছাধন যেম্নি গুটি গুটি কবিতা রেসিটেশন করিতে উঠিবেন, অমনি আমরা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিব "কই, তোমার না কথা ছিল আজ ইংরাজীতে বক্তৃতা দিবার?" বেচারা ভ্যাবাচাকা খাইয়া যাইবে। তখন

আমাদের আর কিছুই করিবার দরকার হইবে না, সেই দেড়শো ত্ব'শো ছেলেই ক্ষেপাইয়া, টিট্‌কারি দিয়া, উঠিতে বসিতে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া মারিবে। কেমন খাসা মৎলব খানা বল দেখি! আরে, তারক না হইলে কি হয়, অম্নি অম্নি কি আর ও ফি বার অঙ্কে পূরা নম্বর পায়! কেমন তুখাড় বুদ্ধি দেখ দেখি!

আমরা যেমনটী হইবে ভাবিয়াছিলাম, হইলও অবিকল তেমনটী!

নির্দ্দিষ্ট দিনে, নিমাই কবিতা বলিতে উঠিবার ঠিক আগটায়, তারক উঠিয়া বলিল "আজ সভায় নিমাইচরণ বসু 'পুস্তক পাঠের উপকারিতা' সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবে।" অমনি নিমাই বলিয়া উঠিল, "সে কি, বক্তৃতা দেবার কথা আবার কখন হলো? সে রকম তো কোন কথা ছিল না!"

আমরা সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, "বাঃ রে বাঃ, ছিল বৈ কি? গাঁজা

আমরা…বলিয়া উঠিলাম "বাঃ রে বাঃ, ছিল বৈকি!"

খেয়ে এসেছিস্ নাকি?"

অতটুকু ছেলে, ইংরাজীতে কেমন করিয়া বক্তৃতা দেয়, তাই শুনিতেই না ছাত্রের দল আসিয়াছিল! বক্তৃতা হইবে না শুনিয়া তাহারা গেল একদম্ ক্ষেপিয়া। কেউ সুরু করিল কুকুরের ডাক, কেউ সুরু করিল বিড়ালের ডাক, কেউ বা শুধু হাততালি দিয়াই নিমাইকে টিট্‌কারির চোটে অস্থির করিয়া তুলিল। আমাদের তখন যা ফূর্ত্তি! গোবিন্দ তো এক রকম নাচিতেই আরম্ভ করিয়া দিল।

ওদিকে চাহিয়া দেখি, নিমাইয়ের মুখ অপমানে, রাগে, একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "বেশ, তাই হবে, আমি ইংরাজীতেই বক্তৃতা দেব। তোমরা সব চুপ্ কর—"

একমুহূর্ত্তের মধ্যে অমনি সব চুপ্‌চাপ্—এমন চুপ্‌চাপ্ যে মনে হইল ছুঁচ্‌টী পড়িলেও বুঝি বা তাহার শব্দটা কাণে আসিবে। নিমাই বক্তৃতা আরম্ভ করিল, কিন্তু সবে তো সেকেণ্ড্ ক্লাশে উঠিয়াছে, সে কেন পারিবে অত বড় একটা কঠিন বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে! মিনিট্ খানেক এঁ্যা এঁ্যা করিয়া শেষে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

তখন ঘরে একেবারে তুমুলকাণ্ড বাধিয়া গেল। সেই যে পুরাণে আছে, যে মহাদেবের ভূতেরা গিয়া দক্ষরাজের যজ্ঞের জিনিষপত্র সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছিল, আমাদের স্কুলের ভূতেরাও (পণ্ডিত মশায় আমাদের সকলকেই 'ভূত' বলেন; বোধহয় ভূত মানেই স্কুলের ছাত্র!) তেমনি, টেবিল চেয়ার উল্‌টাইয়া একেবারে হুলুস্থূল কাণ্ড করিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিমাইয়ের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছিল,—দুঃখে নয়, রাগে। তার বয়স এই চোদ্দ বছর, এতটা বয়সেও, এতখানি অপমান এ পর্য্যন্ত কেউ তাকে করে নাই, বিশেষতঃ নীচের ক্লাশের ছেলেদের সাম্‌নে। চোখ দুটাকে আগুনের মত লাল করিয়া, আমাদের দিকে একবার তাকাইয়া সে বলিল "তোরা সব ভীরু, তোরা সব কাপুরুষ! ভেবেছিস্ আমাকে খুব একচোট্ জব্দ ক'রে নিলি! আরে গাধারা, একে জব্দ করা বলে না, একে বলে আড়াল থেকে ঢিল মারা। 'জব্দ করা' কাকে বলে, সে আর কয়েক দিন বাদেই টের পাবি—বেশী দিনও নয়, আজতো ২০শে মার্চ্চ,

এই পয়লা এপ্রিলেই বুঝবি। বলে কয়ে, সেদিন তোদের এপ্রিল-ফুল্ করবো।" কথা কয়টা বলিয়াই নিমাই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। আমরা সকলে তখন খুব একচোট্ হাসিয়া লইলাম। তারক বলিল, "দেখলি, ছোঁড়া ভাঙ্গবে, তবু মচ্‌কাবে না। তোরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি রে, দেখি, ও যে খুব জাঁকিয়ে দেমাক্ করে চলে গেল,—দেখি, ও পয়লা এপ্রিল কি করতে পারে আমাদের!

৩

পয়লা এপ্রিলের আগের দিন। ভোর বেলা নিমাই আসিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত। কি ব্যাপার, না কাল তাহারা ২৬।১ সেন পাড়ায় 'অবাক্, জলপান' অভিনয় করিবে, তাহারই নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। ছোকড়া চলিয়া গেলে মনে মনে হাসিলাম—নিমাইচন্দ্র, ভাব বুঝি যে দুনিয়ায় একা তুমিই চালাক? কাল যে এপ্রিল-ফুল করার মৎলব—সেটা যেন আর ধরিতে পারি নাই!—নুন দিয়া তো আর আমরা ভাত খাই না! বিকালের দিক্ দিয়া নিমাই আসিয়া আবার উপস্থিত। আমাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল "দেখ্, তোর সাথে চালাকি করাটা আর ভাল মনে করলাম না। থিয়েটার টিয়েটার কিন্তু আসলে সবই ফাঁকি! তারকদের ওপর আমার বেজায় রাগ—ওদের সব ক'টাকেই তাই কাল এপ্রিল-ফুল করবো ঠিক করেছি। যে ঠিকানাটা দিয়েছি সেটা হোলো একটা আস্তাবলের। তুই বুদ্ধিমান ছেলে, সব ধরে ফেলবি, তাই তোকে সব খুলে বল্লাম··· দেখিস্, ওদের যেন কিছু বলিস্ টলিস্ নে। কাল গোটা চারেকের সময়, হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে একবার ওদিক্ পানে যাস্—দেখিস্ সব গরুগুলোকে কি রকম বোকা বানাই।"

আমি বলিলাম, "এপ্রিল-ফুল যে করবি, তা আমি আগেই টের পেয়েছি।"

"তা আর পাবিনে? অঙ্কে ত্রিশ পাশ মার্ক্, তুই ফি বার একত্রিশ পাচ্ছিস, আর এই সামান্য কথাটা বুঝবিনে? ওরা কিন্তু তাই বলে, কিছুই টের পাবে না!

দেখ্, ঐ তারকটা এগ্‌জামিনে ফাষ্ট্ হয় বটে, কিন্তু, ওটার মাথার ভেতর কি আছে জানিস ?”

নিমাইয়ের কথাবার্ত্তায় আমি ক্রমেই ভারী খুসী হইয়া উঠিতেছিলাম, তাই, তাকেও একটু খুসী করা উচিত মনে করিয়া বলিলাম, “গোবর।”

সে বলিল “উঁহু, গোবরও কাজে লাগে, শুকোলে ঘুঁটে হয়, ওর মাথায় আছে খালি পচা গোবর, যা কোনই কাজে লাগে না। আর বাদবাকী যে গুলো, সে গুলোর মাথায় কিচ্ছুই নেই, একেবারে ফাঁপা—চাঁটি মার্‌লে ঠুং ঠুং করে বাজে। তোরই মাথায় যা একটু সোণারূপো আছে ; থাব্‌ড়া মারলে মোটেই ওরকম শব্দ হবেনা। দেখ্‌বি ?”—বলিয়া আমার মাথায় এমন জোরে দুই চড় মারিল, যে মনে হইল মাথাটা বুঝি একেবারে চুড়্‌মাড়্ হইয়া গেল। ভয়ানক রাগ হইল, কিন্তু তবুও নিমাই আমার অনেক প্রশংসা করিয়াছে, তাকে কড়া কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না—মনে কষ্ট পাইবে যে !

যাইবার সময় নিমাই বলিয়া গেল “এসব কথা কাউকে বলিস নে যেন, খবর্দ্দার !”

বলিলাম “আরে, না, না, সে ভয় নেই।” মনে করিলাম, আমি তো আর বোকা বনিব না, অপরে কেমন বোকা বনে একবার দেখিয়াই আসি না কেন ?

৪

পরদিন বেলা চারিটার সময় হাঁটিতে হাঁটিতে নিমাইয়ের সেই ২৬।১ সেন পাড়ার আস্তাবলে গিয়া হাজির হইলাম। গিয়া দেখি, তারকের দল সেখানে আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারী আশ্চর্য্য হইলাম। কি বোকারে, নিমাই যে এপ্রিল-ফুল করিবার মৎলব করিয়াছে, এই নিতান্ত মোটা কথাটাও ধরিতে পারিল না ? কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য হইলাম ছোঁড়াগুলির ব্যবহারে। দশবারটা ছেলে—মুখে কাহারও কথাটী নাই—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে—তারক শুদ্ধ। আ ম'লো যা, ছোঁড়াগুলো হাসে

কেন ? জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিরে, তোরা হাসছিস কেনরে, সিদ্ধি টিদ্ধি খেয়েছিস নাকি ?”

এতক্ষণ চলিতেছিল মুচ্‌কি হাসি, আমার কথায় এইবার সকলে সুরু করিয়া দিল একেবারে অট্টহাসি। ওঃ, সে কি হাসির তোড়, বুঝি বা ভূমিকম্পই হয় ! মনে বড় ভয় হইল, তাইতো, নিমাই কি শেষে সব কয়টাকে সিদ্ধির সরবৎ খাওয়াইয়া দিল নাকি ? আমাদের একটা চাকর দোলের দিন সিদ্ধি খাইয়া খুব একচোট হাসিয়াছিল ; তারপর ছুটিয়া গিয়া, আমাদের গরুর চারিটা ঠ্যাংএর মাঝখানে, ঠিক পেটের তলায়, চোখ বুজিয়া বসিয়া পাড়য়াছিল। ভাবিলাম, তাইতো, এই দশবারটা ছেলে যদি আমাকেই গরু মনে করিয়া ছুটিয়া আমার দুই ঠ্যাংএর মধ্যে বসিতে আসে, তাহা হইলেই তো কাজ সারিয়াছে ! ভয়ে ভয়ে একটু পিছাইয়া আসিলাম; কিন্তু ভগবানের মস্ত দয়া, তাহারা আমাকে গরু মনে করিল না। কিন্তু তার বদলে যে আর একটা কাজ করিল, তাহাতে আমার তো একেবারে চক্ষু স্থির ! বলিলামই তো যে প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল মুচ্‌কি হাসি, তারপর হইল অট্টহাসি ; এইবার আরম্ভ হইল একেবারে আবোল-তাবোল বকা ! কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রত্যেকের মুখেই এককথা—প্রত্যেকেই বলে “আরে, আমিতো আগেই জান্‌তাম্ !” কি জানিত তাহা তো কেউ বলে না ! হঠাৎ তারক একটু চিন্তা করিয়া বলিল “কি রে, তোরা কি জানতিস্ রে ?”

তারপর জিজ্ঞাসা-বাদের পর যে ব্যাপারটা প্রকাশ পাইল, তাহাতে আমরা সকলে একেবারে মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ, হতচ্ছাড়া নিমাই আমাদের সব্বাইকে কি দারুণ বোকাই না বানাইয়াছে ! কি হইয়াছে বুঝিতে পারিলে ? হতভাগা আমার মত প্রত্যেকের কাছে গিয়াই বলিয়াছে, “দেখ্, তোর সাথে কি আর আমি চালাকি করতে পারি, তুই এমন বুদ্ধিমান ! আর সকলকে আমি এপ্রিল-ফুল করবো, তুই শুধু একবার দাঁড়িয়ে মজাটা দেখ্।” প্রত্যেকেই মনে করিয়াছে, ওঃ, আমি কি জেতাটাই না জিতিলাম ; আর সেই ভাবিয়া আসিয়াছে অপরকে ঠাট্টা করিতে। ফলে, প্রত্যেকেই হইয়াছে জব্দের

চূড়ান্ত !!! শুধু কি তাই ? তারক ভিন্ন আর সকলকেই ও বলিয়াছে "তোরই মাথায় যা একটু সোণারূপো আছে, বাদবাকীগুলোর মত ফাঁপা নয় ; থাব্ড়া মার্লে মোটেই বাজবে না,—দেখবি ?" বলিয়াই গায়ে যত জোর আছে, তত জোরে চড় মারিয়াছে। গোবিন্দকে নাকি এম্নি জোরে মারিয়াছিল যে বেচারা একেবারে

কি ধুরন্ধর ছেলে বাবা,…

মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল। কি ধুরন্ধর ছেলে বাবা, মনের সুখে আমাদের সকলকে তো চড়াইয়া লইলই, আর তার উপর নাকালও করিল যতদূর করিতে হয় ততদূর !

সব শেষে তারক বলিল "তবু বরাত ভাল, যে ছোঁড়া এখানে উপস্থিত নেই ; থাক্লে আর আমাদের মুখ দেখাবার যো থাকতো না।"

ঠিক এমন সময় একটা হাসির শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দেখি, যে আমাদের

মাথার উপরে, একটা গাছের ডালে বসিয়া নিমাই এম্নি হাসিতেছে, যে বোধ হইল যেন এখনি সে গাছ হইতে পড়িয়া যাইবে। হায়রে হায়, সব তো দেখিয়া ফেলিয়াছে ! আর কি সেখানে থাকা যায় ? আমরা চট্‌পট্ সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

সেই হইতে নিমাইকে প্রতিশোধ দিবার ফিকির খুঁজিতেছি, কিন্তু ছোকড়া বেজায় চালাক ! আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয়, প্রতিশোধ নিতে পারিব না ?

খোকার সাধ

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ)

এমন করে একলা ঘরে থাকতে পারি না,
মাগো, আমায় এনে দে' তুই, পক্ষিরাজের ছা' !
এক নিমেষে উধাও ভেসে' যাই মা-আমি উড়ে',
আকাশ, পাতাল, চৌদ্দ ভুবন বেড়িয়ে' আসি ঘুরে'।

নীলের ফাঁকে, পাকে পাকে হাল্কা হাওয়ায় ভেসে',
সাত-মহলা পাঁচিল-ঘেরা পরী-রাণীর দেশে ;
মেঘের বুকে সেথায় সুখে সোণার ডানা মেলে'
নধর, কচি, ছেলেপুলে বেড়ায় হেসে খেলে ;
চোখে যাদের লুটিয়ে পড়ে ভরা চাঁদের হাসি—
যাই মা, আমি তাদের সাথে একটু খেলে আসি !

সাগর-তলে যাই মা, চলে নাগ-কন্যার পুরী—
যেথায় জলে মুক্তা-মাণিক, হাজার যোজন জুড়ি'।
মাছের পিঠে বেড়ায় ছুটে সাগর-কুমারীরা
আদুল্ গায়ে জলুস্ জাগে—পান্না-চুনী-হীরা ;
চোখে তাদের নীলমণি, আর নখে লালের মেলা—
চুরি করে যাই' দেখি মা, তাদের জল-খেলা।

পাতাল-পুরীর গহন বুকে, সোণার পালঙ্কে
হরণ-করা রাজার মেয়ে, বেহুঁশ আতঙ্কে !
সোণার কাঠি, রূপার কাঠি, দুই দিকে তার দুই—
বাঁচাই গে' সেই সুন্দরীরে আল্‌গোছে মা ছুঁই'।
ডাইনী-বুড়ী রাক্ষসীরে মায়ায় ভুলাইয়ে',
কোটা-খুলি' ভোম্‌রা কাটি বৌটি আসি নিয়ে'।

যাই মা উড়ে, আকাশ ফুঁড়ে, নন্দনেরি বনে,
একটুখানি খেলে আসি দেব-বালাদের সনে।
প্রজাপতির রঙীন পাখায় ছড়িয়ে দু'টি পা'
উছলে-পড়া জ্যোছনা-ধারা সঙ্গে লুটি, মা।
ফুলের বনে সঙ্গোপনে যাই মা, তাদের সাথ,
লুকিয়ে আনি তোমার তরে, একটী পারিজাত !

ভয় কি মা তোর ? যখন খুসী ডাকবি খোকা বোলে'
পক্ষিরাজের পাখায় উড়ে' পড়বো নেমে কোলে ;
জড়িয়ে গলা পড়বো ঝুলে' গাল্‌টি দেবো পেতে',
খোকার মুখে মধু-ভরা হাজার চুমো খেতে'।
একলা ঘরে এমন করে, তোমায় রেখে' বাড়ী,
অনেক দূরে আমি কি মা, থাক্‌তে বেশী পারি ?

অরুণ-আলো

(শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন, এম্‌-এ)

(১৩)

বিপদ কিন্তু তক্ষুনি কেটে গেল।

জ্যোৎস্নার মত হাসি হেসে পরী বল্‌লে—"বেশ, বেশ, যা ইচ্ছে তাই ক'রো, কেমন ?"

অরুণ তখন বুঝলে যে এ পরী খুবই ভাল। তাই সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"পরী, তুমি আমার একটা উপকার কর্‌বে ?"

পরী। না !

অরুণ। কেন কর্‌বে না ?

পরী। ও, তাই ত ! কেন কর্‌ব না ? নিশ্চয়ই কর্‌ব ! কর্‌বই। কিন্তু, কি কর্‌তে হবে ?

অরুণ। আলোকে খুঁজে দাও।

পরী। ভারী রে ! আলোকে কেন খুঁজে দেব ?

অরুণ। না, পরী, আলোকে খুঁজে দাও।

কাজেই পরী সম্মত হ'ল এবং অরুণকে পরামর্শ দিল, যে আলোকে অন্বেষণ কর্‌বার জন্য তিনটী জিনিষ চাই-ই চাই।

অরুণ সাগ্রহে প্রশ্ন কর্‌ল—"কি কি চাই, বল দেখি !"

পরী। সোণার শেকল, পক্ষিরাজ ঘোড়া, আর আগুনের খড়্গ।

অরুণ। সোণার শেকল? আর পক্ষিরাজ ঘোড়া? আর আগুনের খড়্গ।

পরী। হাঁ।

অরুণ। কিন্তু কোথায় পাব ?

পরী তার সুন্দর হাত নেড়ে উত্তর দিল—"কই ? তা ত আমি জানি না।"

অরুণ হতাশ হ'য়ে ব'সে পড়্‌ল—বল্‌ল—"তবে ?"

অরুণের অবস্থা দেখে পরী হেসে গড়াগড়ি। হাসি থাম্‌লে পরী বল্‌ল—

"জানি গো জানি। সোণার শেকল আর পক্ষিরাজ ঘোড়া কোথায়, তা জানি।"

অরুণ। আর আগুনের খড়্গ ?

পরী। কই তা ত আমি জানি না।

অরুণ। তবে উপায় ?

পরী। উপায় ? ওহো, তাইত,—সবই জানি, ভুল বলেছিলাম। তিনটের কথাই জানি।

অরুণ। তবে আমায় বলো।

পরীর দুষ্টুমি কম্‌তেই চায় না,– সে বল্‌ল—“না, সেইটে আমি বল্‌ব না।”

এই না ব’লে পরী খঞ্জন পাখীর মত হেলে দুলে চ’লে পাশের এক ফুল-বাগানে গিয়ে ফুলেদের সাথে খেলা আরম্ভ কর্‌ল। পদ্ম, অপরাজিতা, মালঞ্চ, করবী, রজনীগন্ধা, মল্লিকা, টগর, গন্ধরাজ, মালতী, কুরুবক, বেলী, চম্পা, যূথী, জাতী, গাঁদা, জবা, সন্ধ্যামণি, পলাশ, গোলাপ, চামেলী, নোমালিয়া,—আরও অনেক ফুলের সেই বাগানে বাড়ী। পরী এ ফুলে যায়, মধু কাড়ে ; ও ফুলে যায়, চুমো খায় ! সে ফুলে যায়, আদর করে ; হেসে হেসে কথা কয়। ফুলের রাজ্যে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড ঘট্‌ল।

অরুণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব দেখচে, আর রাগ্‌চে, আর ভাবছে—“ছি, ছি, পরীটা কি নিষ্ঠুর !”

পরীর কিন্তু বিলাস থামে না। সে যেন ফুলের নদীতে স্নান কর্‌চে আর খেল্‌চে !

কাজেই ফুলের দেশ তোলপাড় হ’য়ে উঠল। ফুলেদের রাণী জোড়হাত ক’রে বল্‌লেন—“ওগো পরী, তুমি কি চাও ?”

পরী জিদ্ ধর্‌ল—“আমায় ব’লে দাও, সোণার শেকল, পক্ষিরাজ ঘোড়া আর আগুনের খড়্গ কোন্ দেশে আছে।”

অরুণ দাঁড়িয়ে শুন্‌চে, আর পরীর উপর খুবই খুসী হচ্চে, ভাবচে,—“হাঁ, একেই বলে পরী !”

ফুলেদের রাণী বল্‌লেন—“ওই যে দেখচ আঁকা বাঁকা সুদীর্ঘ পথ, ওই পথ ধ’রে সম্প্রতি পশ্চিমের দিকে ক্রমাগত চলে যাও,—সব পাবে।”

(১৪)

কিন্তু আলো কোথায় ? কোন্ পাহাড়ের পারে ? কোন্ সাগরের ধারে ?

সে আছে কেমন ? তার সুখ কেমন ? তার দুঃখ কেমন ? কি করে সে ? সারাটি দিন কি ভাবে সে ? কোন্ বাগানে ফুল তোলে সে ? কোথায় খায় ? কোথায় নায় ? কান্না পেলে কোথায় যায় ? এক কথায়, আলো কোথায় ?

কে জানে ?

আমি জানি। এবার আমি সেই কথাই বল্‌ব।

অনন্তশূন্যের মাঝে ভূত-পশুদের স্বর্গ। এ সংসারে যত পশু মরে, পাখী মরে, কীট আর পতঙ্গ মরে, তারা কোথায় যায় ? মানুষের স্বর্গে তাদের স্থান দেওয়া হয় নাই, তাই তাদের স্বর্গ এইখানে। অরুণ যে পোকাটীকে মেরেছিল, সেও এখানেই এসে স্থান নিয়েছে, এবং আলোকেও এখানেই এনেছে।

পশুদের এই স্বর্গে, নির্জ্জন এক প্রান্তে, প্রকাণ্ড এক নদীর ধারে, একটা পুরাতন ভাঙ্গা গুহা রয়েছে। এই গুহাটী ভূত-পশুদের ধর্ম্ম-মন্দির। মানুষ যেমন দেবদেবীর জন্য মন্দির গড়ে, পশুদের স্বর্গেও তেমনি তারা দেবতার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করে। এই গুহাটাই হ’ল সেই মন্দির,—পশুদের দেবতার মন্দির।

ভূত-পশুদের বহুদিন হ’তে ইচ্ছা ছিল যে মানুষদের নিয়মে পূজা-আর্চ্চা করবে। কিন্তু শেখাবে কে ? তাই তারা আলোকে পেয়ে তারই উপর মন্দিরের ভার দিয়েছে। আলো রয়েছে পশুদের মন্দিরের পূজারিণী হ’য়ে।

তার পরনে তপস্বীর বেশ ; তার কেশ আলু-থালু, মুখে মলিন হাসি, সারা অঙ্গে ক্লান্ত, দুঃখের তার শেষ নাই ! সারাটি দিন ধ’রে, সারাটি রাত্রি ধ’রে, সে কত কথাই ভাবে !

সেই সুন্দরী মাতৃভূমির কথা,—সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা মাতৃভূমি,—কে জানে এখন কি হ’য়েছে সেই দেশের ? হয়ত সে দেশ আজি আর শস্যশ্যামলা নেই, সুন্দর নেই !

মা, দিদিমা, অরুণমামা,—অন্তরের সখা অরুণমামা, পূজার দেবতা অরুণমামা,—হায়, এঁরা সব কি করছেন্? তাঁরা আসেন না কেন?

আলো ক্রমাগতই এই সব ভাবে। নদীতীরে জলের ধারে এসে আলো ব'সে রয়,—তার ভাবনার স্রোত ঠিক ওই নদীর মতই ব'য়ে ব'য়ে বহু দূরে চ'লে যায়। তারপর ক্লান্ত হ'য়ে নদীতীরেই আলো ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন!

এইভাবে দিন কাটে।

(ক্রমশঃ)

শিশু-স্বর্গ

(শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর)

শৈশবে আকাশে চাহি, ভাবিতাম স্বর্গ ঠিক
মাথারই উপর,
বুঝি তাহা ছোঁয়া যায়, চাঁদ ধরিবার তরে
বাড়াতেম কর।
বাল্যে ছিল স্বর্গ মম, রম্য রামধনু-সম
ঘেরি' চারি পাশ,
ক্রমশঃ সংসার-ঘোর, শৈশব-স্বপ্নেরে মোর
করে নিল গ্রাস।
বড় হই ক্রমে যত, দেখি স্বর্গ নির্ব্বাসিত
কল্পনার বনে,
শৈশবে মরিলে হায়, স্বর্গলাভ হ'তো বুঝি,
ভাবি এবে মনে!

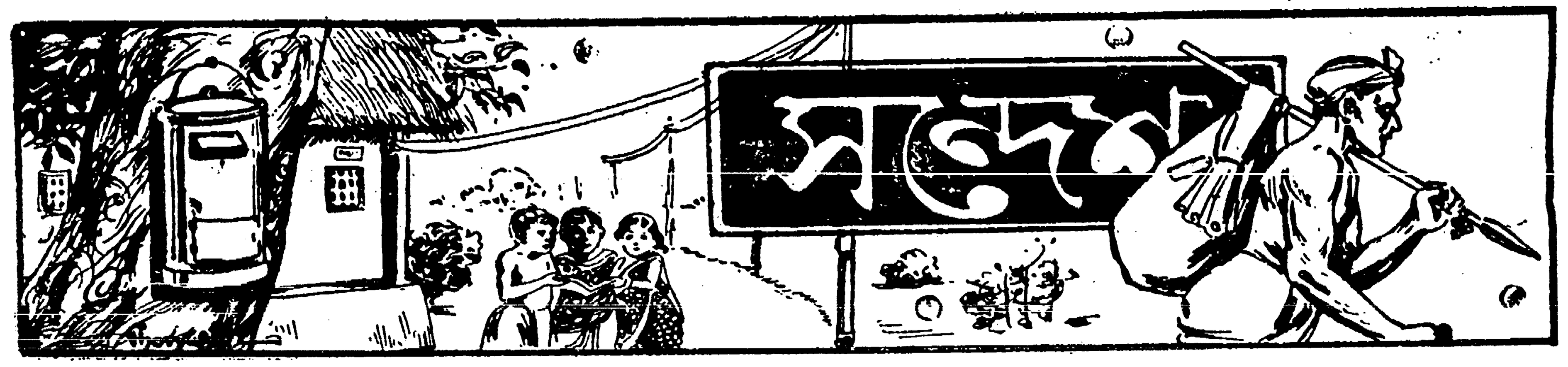

পেটুক ব্যাঙ্

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় কিছু দিন হইল একটা অদ্ভুত ব্যাঙ আনিয়া রাখা হইয়াছে। ব্যাঙটির গুণের মধ্যে আছে খাইবার ক্ষমতা। প্রতি সেকেণ্ডে সে ৬৬টি পোকা গিলিয়া ফেলে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, চেষ্টা করিলে ব্যাঙটি মিনিটে ৪ হাজার পোকা খাইতে পারে; তবে খোরাক যোগাড় করাটাই যা একটু মুস্কিল!

বাতাস হইতে বিদ্যুৎ

কারখানার বড় বড় ইঞ্জিন চালাইতে তেল আর কয়লার দরকার ভয়ানক বেশী। আমেরিকার এক বড় বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, এবার হইতে আর ও সব হাঙ্গামার মধ্যে যাইতে হইবে না। তিনি শুধু বাতাস হইতেই এমন বিদ্যুৎ বাহির করিয়া দিবেন, যে তাহার শক্তিতে বড় বড় কল-কারখানায় অনায়াসে কাজ চলিতে পারিবে। তিনি তাঁহার মুখের কথা দস্তুরমত হাতে নাতে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন।

মাছের গায়ে ব্যারোমিটার

তোমাদের মধ্যে যাহারা পল্লীগ্রামে থাক, তাহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে ঠিক বৃষ্টি হইবার আগে মাছেরা জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং ছুটাছুটিতে মাতিয়া যায়। বৃষ্টি হইবার আগেই মাছেরা তাহা জানিতে পারে। ইহার কারণ কি জান? প্রায় সব মাছেরই শরীরের মধ্যে বাতাসে ভরা একটা থলি থাকে। আমরা যেমন আকাশের অবস্থা বুঝিবার জন্য ব্যারোমিটার ব্যবহার করি, মাছেরাও এই থলিটাকে ঠিক সেই জন্য ব্যবহার করে। বৃষ্টি হইবার আগেই এই অদ্ভুত থলিটা আগের চেয়ে ভারী বলিয়া বোধ হয়। তখন মাছেরা বেশ বুঝিতে পারে যে শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে।

আদ্যিকালের লোকেরা নাকি মাছের এই ছুটাছুটি দেখিয়াই আকাশের অবস্থা জানিয়া লইত।

গাছের গুণ

যন্ত্রপাতি ভিন্ন দিক্ ঠিক করিবার অন্য উপায় একমাত্র ধ্রুবতারার কথাই আমরা জানি। কিন্তু এক রকম গাছ আছে যাহারা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। এ গাছের পাতাগুলি সর্ব্বদা ঠিক পূব দিকে মুখ করিয়া থাকে। কাজেই দিক্ ঠিক করিতে কোন গোলমাল হয় না।

দুঃখের বিষয় এ গাছগুলি শুধু আমেরিকার কোন কোন জায়গায় মাত্র পাওয়া যায়; আর কোথাও ইহাদের দেখা গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

দৌড়বাজ পায়রা

পাখীদের মধ্যে বোধ হয় পায়রাই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আর বেশীক্ষণ উড়িতে পারে। এক একটা পায়রাকে ঘণ্টায় ৬০ মাইল উড়িতে দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ পাঞ্জাব মেল কিংবা বম্বে মেলের সহিত ইহাদের দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইলে, কে জিতিবে বলা কঠিন।

বিলাতে একবার একটা দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল—৪৭৭ মাইল; কয়েকটি পায়রা সেই দীর্ঘ পথ মিনিটে গড়ে ১৫৩১ গজ হিসাবে গিয়াছিল।

দুগ্ধবতী গাভী

বিলাতে একটা গরুর কথা শোনা গিয়াছে! গেল বছর সে একাই ৩ হাজার গ্যালন দুধ দিয়াছিল! এই ধরণের গরু ইংল্যাণ্ডে নাকি আরও কতকগুলি আছে!

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি গরু ছিল, সে রোজ দেড় মণ দুধ দিত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। (ক) হরিদ্বার (খ) শ্রীহট্ট। ২। (ক) বর্দ্ধমান (খ) সিন্ধু (গ) কৃষ্ণা।

উত্তর দাতাদের নাম।

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—আভারেণু দেবী, মনোজিৎ বসু, কিশোর লাইব্রেরীর পরিচালিকাগণ, অনসূয়া দেবী, শান্তি, শক্তি, রেণু, হরিমোহন, কমল, হংস, জিতেন, কালী, মেনকা বসু, উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, ফয়জেন্নেসা উচ্চ ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ, হিমাংশুকুমার নিয়োগী, লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী, উত্তমপ্রসাদ মজুমদার, জ্যোৎস্না সেন, বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, প্রকাশভূষণ সরকার, সত্যসুন্দর ভট্টাচার্য্য, সুনন্দা দেবী, মুখার্জ্জী সেমিনারীর ২য় শ্রেণীর ছাত্রগণ, সৌরেন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অখিলচরণ বসু, বিমল, ধীরেন, রাধিকা, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার রায়, পর্জ্জনা বড় তরফ ভাদুড়ী বাড়ীর ছেলেরা।

যাঁহাদের ১টি ভুল হইয়াছে—যশোমাধব সাহিত্য-সঙ্ঘের সভ্যগণ, আশুতোষ চৌধুরী, আর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, পঞ্চানন দত্ত, অরুণা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ রায়, শক্তিপদ রায়, তারকদাস অধিকারী, রামরতি চক্রবর্ত্তী ও নির্ম্মলা রাণী দেবী, মাধুরী কুণ্ডু, শিবপদ.সেন, মিলনমালা ঘোষ, আশালেখাদেবী ও নিরুপমা দেবী, বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—দ্বিজনবালা দেবী, সন্তোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাত-কুমার বসু, হৃষীকেশ, অন্নদা, প্রমোদ, সুশীল, হরিপদ, তারাপদ, চৈতন্য ও মুকুন্দ, ধ্রুবজ্যোতি সেন, মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদচন্দ্র মুস্তোফি, সুবোধ, সমর, বসন্ত, রবীন, কুমুদ, রোহিণী, এস্, পি, দাশগুপ্ত, রাধাতরুণ-সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ, সদানন্দ সাহা, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার ঘোষ, অখিলকুমার গুপ্ত, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, নন্দরাণী দেবী, পারিজাতরেণু দেবী।

নূতন ধাঁধা

১

(Cross Word Puzzle)

সঙ্কেতঃ—নীচের ঘরগুলিতে দেখ, কতগুলি সংখ্যা বসান রহিয়াছে। ঐ গুলির স্থানে এক একটি শব্দ বসাইতে হইবে। কি শব্দ হইবে, তাহার অর্থ নীচে দেওয়া আছে; আর ক'ত অক্ষরের শব্দ হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করা আছে। মনে কর, ১ হইতে ২ পর্য্যন্ত একটি শব্দ চাই। নীচে লেখা আছে—পাশাপাশি ১—২=প্রসিদ্ধ কুস্তীগির। অর্থাৎ তোমাকে এমন একটা দু' অক্ষরের কথা বসাইতে হইবে, যাহা পাশাপাশি পড়িলে একজন কুস্তীগিরের নাম হয়—যেমন 'গামা'। তারপর দেখ "উপর নীচে—১—৬=চৈত্র মাসের গান;" এখানে ৩ অক্ষরের কথা—কেননা ৩টা ঘর জুড়িয়া কথাটা থাকিবে। আর পড়িতে হইবে উপর-নীচে—যেমন 'গাজন'। এম্নি করিয়া সবগুলি ঘর ভর্ত্তি করিতে হইবে। অর্থ ঠিক যেমন দেওয়া আছে তেম্নি হওয়া চাই। '×' চিহ্নিত স্থানগুলি খালি থাকিবে। নীচে উদাহরণ স্বরূপ এইরকম একটা ছোট্ট ধাঁধা ও তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

ধাঁধা—

১	২	×
৩	৪	৫
৬	×	৭
×	৮	৯

পাশাপাশি—

১—২=প্রসিদ্ধ কুস্তীগির (গামা)
৩—৫=যাহা জলে জন্মে (জলজ)
৮—৯=বিবাহের পাত্র (বর)

উপর হইতে নীচে—

২—৪=জিনিষ (মাল)
১—৬=চৈত্র মাসের গান (গাজন)
৫—৯=পেট=জঠর।

উত্তর—

গা	মা	×
জ	ল	জ
ন	×	ঠ
×	ব	র

এমনিভাবে নীচের ধাঁধাটির উত্তর দাও তো ঃ—

১	২	৩	×	১১
৪	৫	×	১০	১২
×	৬	৭	৮	৯
১৩	×	১৯	২০	×
১৪	১৭	২১	×	২৭
১৫	১৮	×	২৫	২৬
১৬	×	২২	২৩	২৪

পাশাপাশি—

১ হইতে ৩ = সহরের নাম
৪ — ৫ = সাপ
১০ — ১২ = সাদা পাখী
৬ — ৯ = অনিমন্ত্রিত আগন্তুক
১৯ — ২০ = যন্ত্র
১৪ — ২১ = বাসস্থান
১৫ — ১৮ = ধারণ-কর্ত্তা
২৫ — ২৬ = শুক্রাচার্য্যের শিষ্য
২২ — ২৪ = পাপীদের স্থান

উপর হইতে নীচে ঃ—

১ — ৪ = জলজ উদ্ভিদ্, ২ — ৬ = ফুলের নাম
১০ — ২০ = অনেক, ১১ — ৯ = ভক্ত
১৩ — ১৬ = তোমাদের যাহা পড়িতে ভাল লাগে
১৭ — ১৮ = মহাদেব, ৭ — ২১ = গাছের ছাল
২৫ — ২৩ = হাত, ২৭—২৪ = দ্রৌপদীর অপমানকারী

২

নীচের কবিতা দুইটীতে প্রত্যেক লাইনে একটী করিয়া ড্যাস চিহ্ন (——) আছে। প্রথম লাইনে এই ড্যাসের জায়গায় যাহা বসিবে, দ্বিতীয় লাইনে বসিবে ঠিক সেই কথাটাই উল্টা করিয়া। যেমন প্রথম লাইনে যদি হয়, 'রাম' দ্বিতীয় লাইনে হইবে 'মরা'

এইবার চেষ্টা কর দেখি

(১) অশথ গাছের শাখায়——দিব্যি বসে ঠায়,
মাথার উপর——বসিয়া সঙ্গীতে বন ছায়।
(২) ——ম ঘেরা কুঞ্জবনে মঞ্জু মালীর দেশে,
যাব আমি——পাড়িতে ভাদ্র মাসের শেষে।

ভক্তের ভগবান্

১ম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পানকৌড়ি

(শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়)

টুপ্ টুপ্   ছায় ডুব,
ঐ পানকৌড়ি,—

চুপ্ চুপ্   আয় সব !
আয় ভাই দৌড়ি !

একদমে ঝট্‌পট্,—
আয় ভাই চট্‌পট্

ছ্যাখ্ মজা, আয় ভজা !
শান্তি ও গৌরী !
টুপ্ টুপ্ ছ্যায় ডুব
ঐ পানকৌড়ি !

সাকরেদ মাছরাঙ্গা
ভ্যাবাচ্যাকা, আচ্ছা !
বলে, "এটা নির্ঘাৎ
ওস্তাদ বাচ্চা !"
পাড়ে বসে বুড়ো বক,—
করে শুধু বকবক্ !
বলে, "তোরা দেখে নিস্
জব হ'বে সাঁচ্চা !"
হাঁস কয় বাজে কথা
অদ্ভুত বাচ্চা !

নলবনে টুনটুনী
বসে হেসে হেসে কয়,—
"বাট্পাড় চোর ওটা !
দেখে নিয়ো নিশ্চয় !
নইলে কে সাধ করে,—
জলে কসরৎ করে ?
বেমালুম ডান্‌পিটে
কুমীরের নাই ভয় !"
কয় কাক, "তুকতাক্
জানে ভাই, নিশ্চয় !"

আশ্চর্য্য পোষাক

১

চন্দ্রনগরের রাজা দীর্ঘশ্মশ্রু বড় সাজ-পোষাক ভাল বাসিতেন। রাজ্যশাসন যে তাঁহার কাজ, একথা তাঁহার মনেই আসিত না। কর্ম্মচারীরা যাহার যাহা খুসী, তাহাই করিত। এ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। রাজ্যে শৃঙ্খলা নাই, কেহ কাহাকেও মানে না। সৈন্য-সামন্ত সময়মত বেতন পায় না। রাজা সাজগোজ লইয়াই মাতিয়া আছেন, এদিকে তাঁহার খেয়ালই নাই।

কেবল পোষাক, পোষাক, আর পোষাক ! পোষাকেরই বা বাহার কত ! কোনটায় হীরার পাথর বসান, কোনটায় চুণীপান্নায় চোখ ঝলসাইয়া যায়, কোনটা বা রং বেরংএর পাখীর মত—তোমরা হয়ত ভাবিতেও পারিবে না, কি আশ্চর্য্য সে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাজার পোষাক বদলান চাই। ওটা একবার পরা হইয়াছে, আর কি পরা যায় ? পরিলে, লোকে কি বলিবে ? রাতদিনই খুঁৎ খুঁৎ ; ভগবান্ যেন এই দেহটার সৃষ্টি করিয়াছেন, ভাল কাপড়চোপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই।

দেশ বিদেশ হইতে কত লোক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসে। দিনের পর দিন, তাহারা রাজ সভায় আসিয়া বসিয়া থাকে। রাজার আর দেখা মিলে না। অন্য রাজারা দূত পাঠান, দূত দেখা না পাইয়াই ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ মন্ত্রী একা আর কত দিক্ দেখেন ? এমনি করিয়া দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়।

২

দুই চোর,—দেশ বিদেশের লোকদের ঠকাইয়াই তাহাদের জীবন কাটে—নানা দেশ ঘুরিয়া চন্দ্রনগরে আসিয়া জুটিল। রাজধানীতে ঢুকিয়াই তাহারা রাজ্যের সমস্ত খবর জানিয়া লইতে ভুলিল না। আরও শুনিল, পোষাক ভিন্ন অন্য কোন কথা হইলে রাজার দেখা পাওয়া যাইবে না। চোরের বুদ্ধি, কয়েক মুহূর্ত্তেই ফন্দি আঁটিয়া লইল, "তবে ত' এ রাজ্যে বেশ একটু রোজগার হইতে পারে !"

৩

রাজবাড়ীর সিংহদরজায় দ্বারোয়ানের নিকট আরজি পৌঁছিল—কি? না দুই তাঁতী আসিয়াছে অনেক দূর হইতে, রাজার সাক্ষাৎ চাই।—তাঁতীর নাম শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

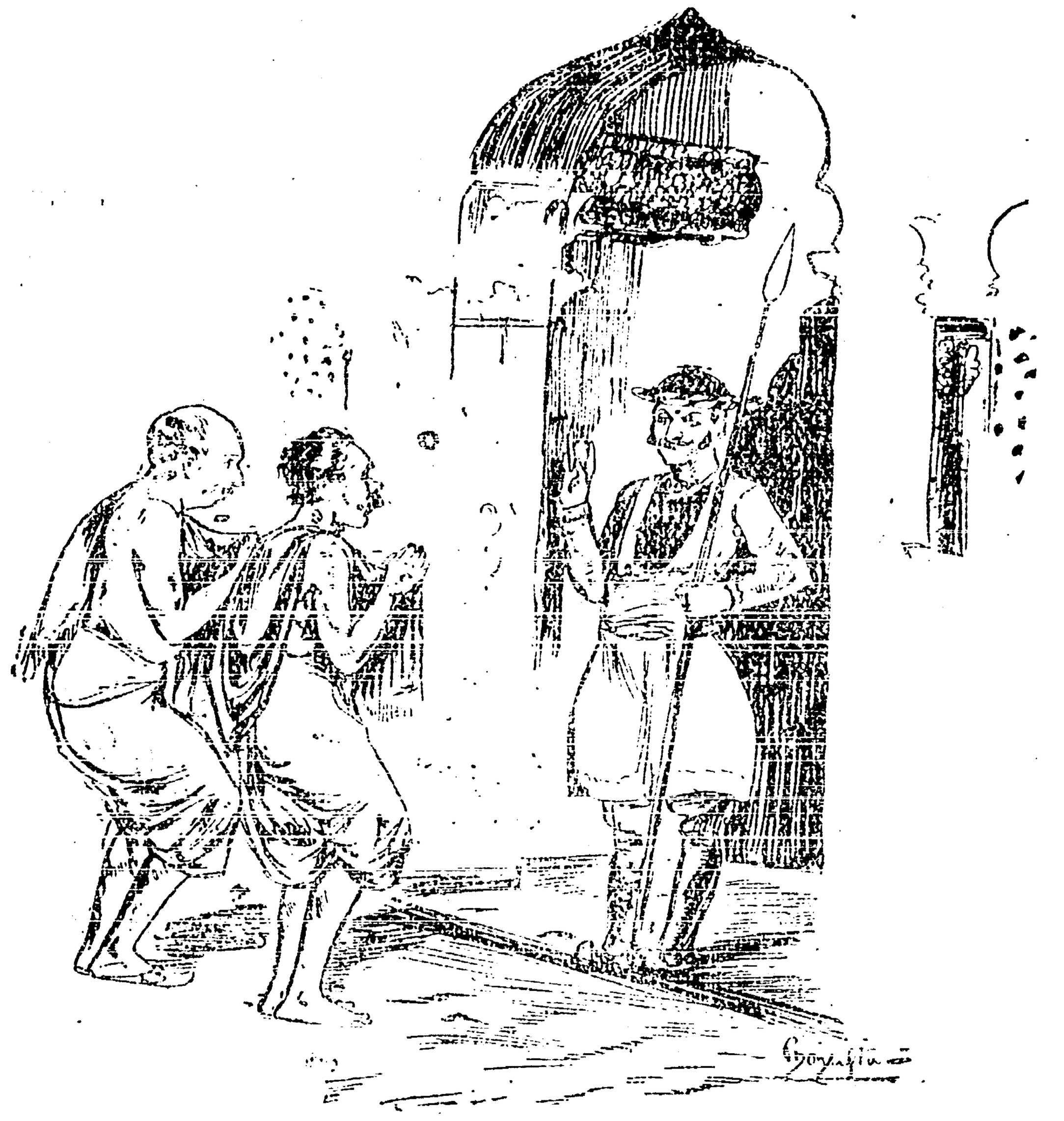
দ্বারোয়ানের নিকট আরজি পৌঁছিল।

তাঁতীরা বলিল—"মহারাজ, অনেক দূর দেশ হইতে আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি। আপনি গুণীর আদর জানেন বলিয়া লোকের মুখে শুনিয়াছি।" রাজা হাসিয়া বলিলেন—"কি চাই?" তাঁতীরা বলিল, "আমাদের সোণা দিন, রেশম দিন, আমরা এক রকম আশ্চর্য্য পোষাক তৈয়ার করিব, সে রকম পোষাক কেউ কখনও দেখে নাই; আপনার গায়েই তাহা মানাইবে ভাল। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য, সে পোষাকের একটা অদ্ভুত গুণ। যাহারা নিজ কাজের অনুপযুক্ত, তাহারা এ পোষাক চোখেই দেখিতে পাইবে না। কেবলমাত্র উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান্ লোকই দেখিতে পাইবে। বোকাদের কাছে এ পোষাক অদৃশ্য থাকিবে।"

রাজা ত শুনিয়া ভারী খুসী! ভারী মজার ত'। শুধু যে সুন্দর, তাই নয়, এ রকম একটা পোষাক থাকিলে তাঁহার রাজ্যের লোকেদের আর কর্ম্মচারী-

দেরও চিনিবার ভারী সুবিধা হইবে; কেননা এ পোষাকের কাছে ত' আর ফাঁকি দেওয়া চলিবে না! আর একটা সুবিধা, কে বোকা, কে চালাক, তাহাও চট্ করিয়া ধরা পড়িয়া যাইবে। রাজা হুকুম দিলেন—তাঁতীরা যা চায়, সব দেওয়া হোক্।

মণি, মুক্তা, সোণা, হীরা আর রং বেরংএর রেশম লইয়া তাঁতীরা চলিয়া গেল।

৪

তাঁতীরা কিন্তু আর কেহ নয়,—সেই দুই চোর। বাড়ী ফিরিয়া তাহারা হাসিয়াই অস্থির। তারপর মণি-মুক্তা-রেশম গুলি ভাল করিয়া বাক্সে ভরিয়া, খালি একটা তাঁত লইয়া বসিয়া গেল। তাঁতের মধ্যে সূতা নাই, রেশম নাই, কিচ্ছু নাই, সব ফাঁকা। চোরেরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চুপটি করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া থাকে, আর মনে মনে হাসে। আর কয়েকদিন পরে পরেই রাজবাড়ী গিয়া আরও মণি-মুক্তা লইয়া আসে। তারপর সেগুলিও ভাল করিয়া বাক্সে পূরিয়া আবার খালি তাঁতের সম্মুখে বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া অনেকদিন কাটিয়া গেল।

৫

রাজার আর সবুর সহে না। কবে বা সেই আশ্চর্য্য পোষাক শেষ হইবে, আর কবে বা রাজা তাহা পরিয়া মনের সাধে লোক চিনিয়া বেড়াইবেন—তখন আর কর্ম্মচারীদেরও ফাঁকি দেওয়া চলিবে না! রাজা থাকিতে না পারিয়া শেষে বৃদ্ধ মন্ত্রী অলম্বুষকে পাঠাইয়া দিলেন, দেখিয়া আস, পোষাক কতদূর হইল—আর কি রকমই বা হইল।

মন্ত্রী গিয়া তাঁতীদের বাড়ী হাজির। দেখে তাঁতীরা খালি একটা তাঁতের সম্মুখে বসিয়া আপন মনে হাত পা নাড়িতেছে!

মন্ত্রীকে দেখিয়া তাঁতীরা বলিল, "এই যে হুজুর, দেখুন দেখি কি চমৎকার পোষাক হইয়াছে—এত সুন্দর আর কোথাও দেখিয়াছেন কি? আর ঐ ঝালর

গুলি ?" মন্ত্রী ত অবাক্। কোথায় পোষাক ? তাঁত ত' একেবারে খালি। হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল, বোকারা আর কাজে অনুপযুক্ত লোকেরা ত' এ পোষাক

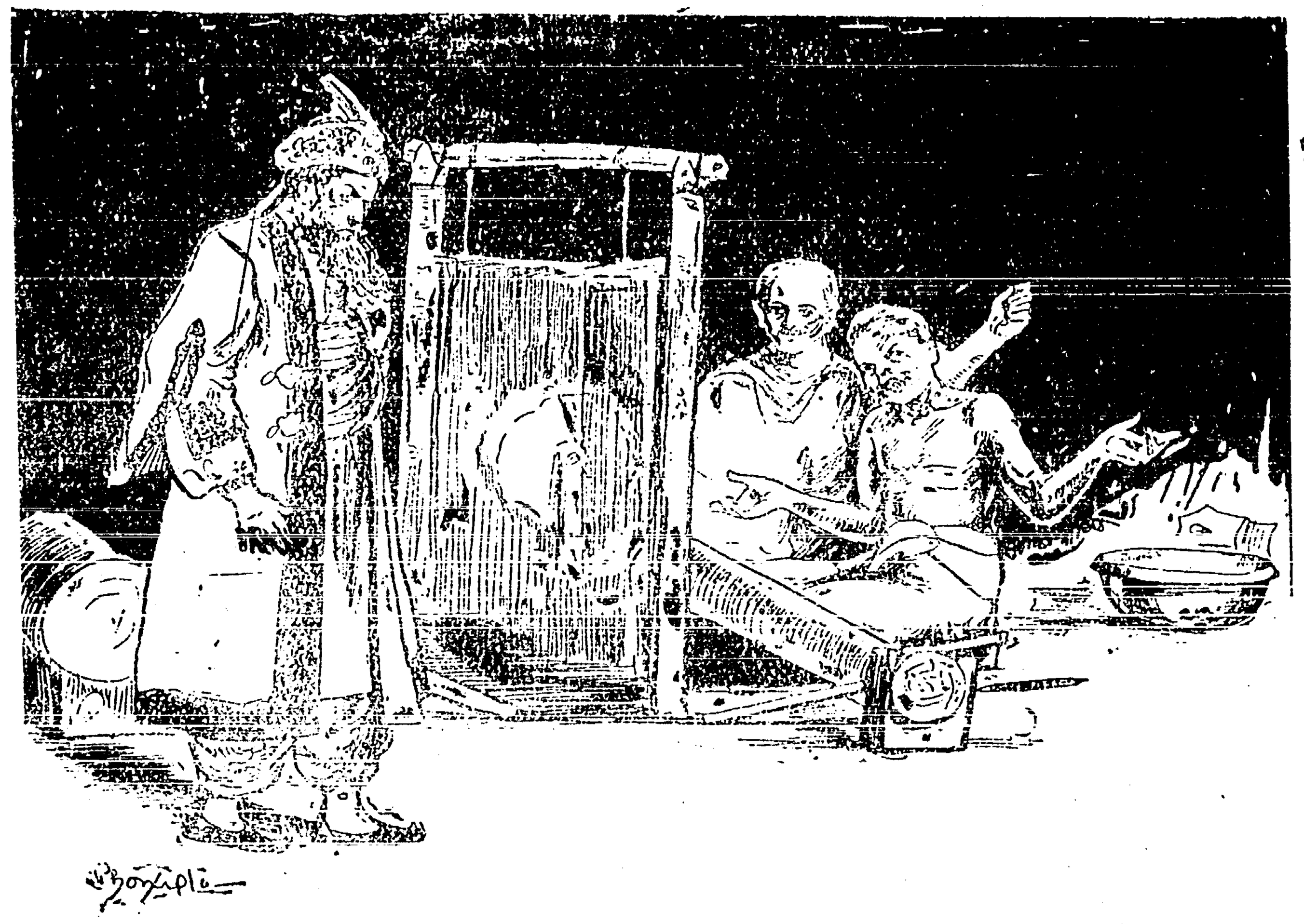

মন্ত্রীর মাথা ঘুরিয়া গেল।

দেখিতে পাইবে না! তবে কি তিনি বোকা! না কাজে অপটু! মন্ত্রীর মাথা ঘুরিয়া গেল।

তাঁতীরা ত' মনে মনে হাসিতেছে। বাহিরে গম্ভীরভাবে বলিল, "কি, হুজুর, চুপ্ করিয়া আছেন যে ? পোষাকের ছাঁটকাটটাই একবার দেখুন না ? আপনার পছন্দ হইল না কি ?" হঠাৎ মন্ত্রীর খেয়াল হইল, আর ত' চুপ করিয়া থাকা যায় না। তবে ত' সকলে তাঁহাকে কাজে অপটু আর বোকা বলিয়া জানিয়া লইবে। থতমত ভাবে বলিলেন—"বাঃ চমৎকার ত', বাস্তবিকই এত চমৎকার পোষাক ত' আর কখনও দেখি নাই! যাই, রাজাকে বলিয়া আসি।" মন্ত্রী তাড়াতাড়ি পালাইয়া আসিলেন ; রাজাকে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার টাকা সার্থক। এ রকম পোষাক পৃথিবীতে কেহ কখনও দেখে নাই। কি

তাহার ছাঁট কাট, আর কি তাহার রংএর বাহার!" রাজা ত' আহ্লাদে একেবারে আটখানা।

৬

আরও অনেকদিন চলিয়া গেল। তাঁতীরা আর পোষাক লইয়া আসে না। রাজা আর থাকিতে না পারিয়া কোটালকে পাঠাইলেন। কোটাল তাঁতীর বাড়ী গিয়া কিছু দেখিতে পায় না। তাঁতীরা যতই বলে, "কেমন দেখিতেছেন, মনে ধরিল তো ?" কোটাল ততই মাথা নাড়ে, পাছে লোকে বুঝিতে পারে যে কোটাল বোকা আর কাজের অনুপযুক্ত! কোটাল ফিরিলে রাজা বলিলেন, "কেমন দেখিলে হে, কত দূর হইল ?" কোটাল উত্তর দিল "প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; আর কি দেখিলাম ? জীবনে বোধ হয় ভুলিতে পারিব না।" রাজা আর এক গাল হাসিলেন।

৭

কয়েকদিন পরে রাজা ঠিক করিলেন, এবার তিনি নিজেই দেখিতে যাইবেন। কয়েকজন সভাসদ্ লইয়া একদিন তিনি সত্য সত্যই তাঁতীর বাড়ী গিয়া হাজির। রাজাকে দেখিয়া তাঁতীরা আরও ব্যস্তভাবে, খালি তাঁতের সম্মুখে, হাত পা নাড়িতে লাগিল।

রাজা তাঁতের কাছে গেলে, একজন তাঁতী জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এ রকম আর কোথাও দেখিয়াছেন কি ? এত সুন্দর, আপনার মনে ধরিয়াছে ত?" এদিকে রাজাও কিছু দেখেন না, সভাসদ্‌রাও কিছু দেখিতে পায় না। অথচ, মন্ত্রী ও কোটাল দেখিয়া গিয়াছে, কাজেই দেখিতে পাইতেছিনা, বলিলে নিজেকেই বোকা আর কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। তাহাতে সকলেরই আপত্তি। কাজেই রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, "বাঃ, কি চমৎকার! ঝালরগুলি দেখিয়াছ ? ঠিক যেন দেবতার হাতে তৈরী! মানুষে কি এত চমৎকার জিনিষ করিতে পারে ?" সকলেই উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁতীদের প্রশংসায় মাতিয়া গেল। একজন মোসাহেব বলিল, "এ আশ্চর্য্য পোষাক এ ভাবে বন্ধ

করিয়া রাখিলে চলিবে না। আগামী মাসে রাজার যে জন্মতিথিতে শোভাযাত্রা বাহির হইবে, তাহাতে রাজা এইটা পরিবেন। লোকেও দেখিয়া তৃপ্ত হইবে, আর বুঝিবে কার গায় এ পোষাক মানায়!” রাজা তাঁতীদের অনেকগুলি মোহর বখ্‌শীস্‌ দিয়া চলিয়া গেলেন।

৮

একমাস পরের কথা। আজ শোভাযাত্রা বাহির হইবার দিন। চোর দুইজন করিল কি, দুইটা প্রকাণ্ড বাক্স ঘাড়ে করিয়া রাজার বাড়ী গিয়া হাজির। রাজাকে বলা হইল, তাঁহার পরনের কাপড় খুলিয়া ফেলা হোক্, আশ্চর্য্য পোষাক তাঁহাকে পরান হইবে। রাজা বেচারা আর কি করেন, পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন। চোরেরা মিছামিছি পোষাক পরাইবার ভাণ করিয়া বলিল, “বাঃ, কি চমৎকার মানাইয়াছে! দেখুন দেখি, আয়নার দিকে চাহিয়া। রাজা আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পরনে কোন কাপড় নাই। অথচ মুখ ফুটিয়া বলিবারও উপায় নাই। রাজার পোষাকের কোণ ধরিবার জন্য যে সব চাকর ছিল, তাহারাও কিছু বলিতে পারে না। বলিলেই নিজেদের অপটু জানান হয় যে! তাহারা আর কি করিবে, পোষাকের কোণা ধরিবার ভাণ করিয়া রাজার পিছনে পিছনে চলিল। বাড়ী গিয়া চোরেরা ত' হাসিয়াই আকুল।

যথাসময়ে মিছিল বাহির হইল। কত ঘোড়সোয়ার চলিয়াছে, কত বাজনা বাজিতেছে! তার পিছনে নকল হাতী, জানোয়ার, জাহাজ, আরও কত কি! পথ লোকে লোকারণ্য। সকলেই রাজার আশ্চর্য্য পোষাক দেখিবার জন্য উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে।

রাজা চারিঘোড়ার গাড়ীতে মিছিলে বাহির হইলেন। মাথার উপর ছাতা; পিছনে চাকরেরা যেন পোষাকের কোণা ধরিয়া আছে, এমনি ভাণ করিয়া চলিতেছে। সকলেই অবাক্ হইয়া দেখিল—এ কি! রাজার দেখি পরনে কোন পোষাক নাই। কেহই কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিতে চায় না, কেননা প্রকাশ করিলেই যে নিজেকে বোকা আর কাজের অনুপযুক্ত বলা হইবে! সকলেই বলিতে

লাগিল, “বাঃ, আশ্চর্য্য পোষাক তো? দেখিয়াছ একবার রংটা, আর কি ঝক্ মক্ করিতেছে!”

রাজা চারি ঘোড়ার গাড়ীতে মিছিলে বাহির হইলেন।

ভিড়ের মধ্যে ছিল রামদিন স্কুলের ছেলে কানাইয়া। কোন কাজ করিবার বয়স তাহার হয় নাই। সে বোকা, কি বুদ্ধিমান্, তাহা ভাবিয়া মাথা ঘামাইতেও শেখে নাই। রাজাকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল! “কই, মহারাজের পরনে কাপড় নাই কেন?” সমস্ত ভিড়ের মধ্যে তখন একটা চাপা শব্দ উঠিল। সকলেই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, সত্যিই তো, কেহই তো পোষাক দেখিতে পাইতেছে না। তখন আসল ব্যাপারটা বাহির হইয়া পড়িল। রাজাতো লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

তখন খোঁজ পড়িল তাঁতীদের। তাহারা কি আর বসিয়া আছে? কোন্

ফাঁকে তল্পী-তল্পা গুটাইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে, কেহই তাহাদের খুঁজিয়া পাইল না।

রাজা বুঝিলেন, চোরেরা তাঁহার উপর এক হাত মারিয়াছে। তিনি কোন মতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সাদাসিধা পোষাক পরিলেন, এবং যে সময়টা পোষাকের চিন্তায় ব্যয় করিতেন, তাহা রাজ্যের কার্য্যে লাগাইতে লাগিলেন। রাজ্যে আবার শৃঙ্খলা আসিল, প্রজারা ক্রমে চোরদের কারসাজী ভুলিয়া গেল।

এডিসন

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

তোমরা রূপকথায় অনেক যাদুকরের গল্প শুনিয়াছ। যাদুকর মন্ত্রের জোরে পাহাড়-পর্ব্বত উড়াইয়া দেয়, কাঠি ছোঁয়াইয়া মানুষকে গরু ভেড়া বানাইয়া দেয়, এই রকম আরও কত কি!

একটু বড় হইলে আর তোমরা এসব বিশ্বাস করিবে না। সত্যই ত' আর যাদুকর বলিয়া কোন কিছু নাই! সবই ত' ছেলেভুলান আজগুবি গল্প।

আজ কিন্তু তোমাদের একজন লোকের কথা বলিব, যাঁর কাণ্ডকারখানা শুনিলে, তোমরা বলিতে বাধ্য হইবে, "হ্যাঁ, সত্যিই যদি যাদুকর বলিয়া কিছু থাকে, তো এই সে।"

মনে কর, বাহিরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার; বৃষ্টি পড়িতেছে, অথচ তুমি ঘরের ভিতর দিব্যি বিদ্যুতের আলোতে রাতকে দিন বানাইয়া কাজ করিতেছ। হঠাৎ তোমার খেয়াল হইল—এমন সময়টাতে একটু গান টান হইলে জমিত ভাল; অথচ বাড়ীর কেহই তেমন গান জানে না। কুছ্ পরোয়া নাই; লইয়া আস কলের গান। গায়কও লাগিবেনা, গলাও ব্যথা হইবে না, শুধু মাঝে মাঝে এক এক খানা রেকর্ড বদলাইয়া দিলেই চলিবে। বড় বড় ওস্তাদের গান ঘরে বসিয়াই শোনা যাইবে।

মন ভাল লাগিতেছে না, যাও বায়স্কোপে, ভাল ভাল গল্প-উপন্যাসের জীবন্ত ছবি দেখিয়া আস। ছবি সেখানে জ্যান্ত মানুষের মত অভিনয় করিয়া যাইবে। শুধু তাই নয়, সেখানে বসিয়া তুমি বিলাত হইতে আরম্ভ করিয়া, পাহাড়পর্ব্বত বন-জঙ্গল সব জিনিষের আসল চেহারাটা দেখিতে পাইবে।

এসব সুবিধা আর আরাম কিন্তু সেকালের লোকেরা মোটেই পান নাই। কেমন করিয়া পাইবেন বল? যে লোকটি মাথা ঘামাইয়া এসব বাহির করিল, সেই এডিসন ত' আর তখন জন্মান নাই!

এডিসন জন্মিয়াছিলেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে—আমেরিকায় ওহিও বলিয়া যে একটা জায়গা আছে, সেইখানে। তাঁহার বাবা ছিলেন গরীব। বুদ্ধি শুদ্ধি তাঁহার বেশ ছিল, কিন্তু কোনও কাজে তিনি লাগিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই দোষটার জন্য তিনি জীবনে কিছু করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার নাম রাখিয়া গেলেন তাঁহার ছেলে।

ছেলেবেলায় এডিসনের স্বভাব ছিল বেজায় এক গুঁয়ে। সব জিনিষেরই "কেন" টুকু তাঁহার জানা চাই। এটা হয় কেন, ওটা ওরকম কেন, অমুক জিনিষ

তৈরী করিতে কি কি লাগে ?—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যত খবর আছে, সব না জানিলে তাঁর চলিত না। স্কুলে তিনি ভর্ত্তি হইলেন একটু বড় হইয়া। কিন্তু সেখানেও ঐ রকম ; মাষ্টারমহাশয়দেরও তিনি 'কেন'র জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিলেন। মাষ্টার মহাশয়েরা ধরিয়া লইলেন 'ছেলেটা নিতান্ত হাবাগোবা, না হইলে কথায় কথায় এত প্রশ্ন করে ? কাজেই এডিসনের সঙ্গে তাঁহাদের বেশীদিন বনিল না। ব্যাপার দেখিয়া এডিসনের মা ছেলেকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া নিয়া নিজেই পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ছিলেন খুব লেখাপড়া-জানা মেয়ে, আর তেম্নি মিষ্টি ছিল তাঁর স্বভাব। মা'র কাছে পড়িতে এডিসনেরও খুব ভাল লাগিত। তিনি লেখা-পড়ায় খুব তাড়াতাড়ি আগাইয়া চলিলেন। বাড়ীতে একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ছিল। একটু বড় হইয়া তাঁহার খেয়াল হইল—তিনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া কি, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ২০।২৫ খণ্ডে একখানা প্রকাণ্ড অভিধান। অভিধান বলিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে অর্থের সহিত আরও অনেক কিছু থাকে। এক কথায় এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় পাইবে না এমন জিনিষই নাই। এই এন্‌সাইক্লোপিডিয়া পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞান জিনিষটা এডিসনের বড় ভাল লাগিয়া গেল।

তাঁহার মা বাবাও ছেলের ঝোঁকটা বুঝিয়া লইলেন। ছেলের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তাঁহারা খান কয়েক বিজ্ঞানের বই, আর অল্প স্বল্প কিছু যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম, এডিসনকে কিনিয়া দিলেন। তখন আর তাঁহাকে পায় কে ? খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, বালক এডিসন রাতদিন তাহা লইয়াই মাতিয়া আছেন।

গরীবের ছেলে কিনা, তাই বারো বছর বয়সেই এডিসন ভাবিলেন, "না, আর বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিলে লোকে বলিবে কি ? এবার একটা কাজে ঢুকিয়া পড়া ভাল।" যোগাড়-যন্ত্র করিয়া তিনি এক রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ বিক্রী করিবার কাজ জুটাইয়া লইলেন। তাঁহাকে একটা কামরার একটা কোণা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, খবরের কাগজগুলি রাখিতে হইবে ত'। খবরের কাগজের সঙ্গে এডিসন তাঁহার সেই বই ক'খানি আর ক্ষুদে যন্ত্রপাতিগুলিও সেখানে লইয়া

আসিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি একটা ছোট্ট প্রেস, আর কিছু সরঞ্জাম যোগাড় করিয়া ট্রেনে বসিয়াই একখানা ছোট খাট খবরের কাগজ বাহির করিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের চর্চ্চাও পূরাদমে চলিল।

এমনি করিয়া বছর চারেক বেশ কাটিল। এডিসনের বয়স যখন ষোল বছর, তখন একদিন এক বিষম কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 'ফস্‌ফরাস্‌' বলিয়া একটা জিনিষ আছে, খুব সহজেই তাহা জ্বলিয়া উঠে। তাই ইহাকে রাখিতে হয় জলের নীচে। আমরা যে দিয়াশলাই জ্বালাই না, তাহাতে এই ফস্‌ফরাস ব্যবহার করা হয়। কাজেই বুঝিতেছ জিনিষটা কি রকম! এডিসন একদিন এক বোতল ফস্‌ফরাস লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে হাত হইতে বোতলটা ফেলিয়া দিলেন ; কাজেই ব্যাপারটা হইল যেমন হইবার! কাগজপত্র ত' সব পুড়িয়া নষ্ট হইলই, তা ছাড়া ট্রেনের কামরারও অনেক কিছু নষ্ট হইয়া গেল। কণ্ডাক্টর ত' চটিয়া আগুন, "কি একটা হতভাগা ছেলে জুটিয়াছে! খবরের কাগজ বিক্রী করিতে আসিয়াছিস্‌ তাই কর নারে বাপু! তা'না, কোথাকার ছাই মাটী ওষুধবিষুধ জড় করিয়া রাতদিন এক কোণে বসিয়া ঘটর মটর করা কেন ? আর কি খেলা খুঁজিয়া পাইলি না ? শেষে কিনা জীবন লইয়া টানাটানি!" ব্যাপারটা শেষ হইল আরও কঠিন ভাবে। এডিসনের কাজ ত' গেলই, তাহার উপর কণ্ডাক্টর, বেচারার কাণ ছুইটা এমন করিয়া মলিয়া দিল, যে কিছুদিনের জন্য তিনি প্রায় কালা হইয়া গেলেন।

কাজ খোয়াইয়া এডিসন ঘুরিয়া বেড়ান। এম্নি করিয়া কিছুদিন গেল। এই সময় একটা ঘটনা ঘটিল। একদিন তিনি আপন মনে একটা ষ্টেশনের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন একটা ইঞ্জিন আসিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে কয়েক হাত দূরে, একটি ছোট ছেলে অন্যমনস্ক হইয়া খেলা করিতেছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছেলেটি চাকার তলায় পিষিয়া যাইবে। এডিসন নিজের প্রাণের দিকে না তাকাইয়া, ট্রেনের মুখে লাফাইয়া পড়িয়া ছেলেটিকে বাঁচাইলেন। ভগবানের কৃপায় সে যাত্রা দু'জনেই বাঁচিয়া গেলেন। ছেলেটির বাবা ছিলেন রেলের

এক উঁচু কর্ম্মচারী, এডিসনের উপর তাঁহার মায়া হইল। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি এডিসনকে টেলিগ্রাফী শিখাইতে রাজী হইলেন। এডিসন ত' মহা খুসী!

সমস্ত মন দিয়া তিনি বিজ্ঞানকে ভাল বসিয়াছেন, টেলিগ্রাফীতে ত' তাঁহার উন্নতি হইবেই। কিছুদিনের মধ্যে তিনি টেলিগ্রাফীতে ত' হাত পাকাইয়া ফেলিলেনই, তাহা ছাড়া টেলিগ্রাফীতে যন্ত্রপাতি লইয়া নানা রকম পরীক্ষাও জুড়িয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎ লইয়াও নানা রকম পরীক্ষা সুরু করিলেন।

১৮৬৯ সন। এডিসনের বয়স তখন বাইশ বছর। কিছুদিন এদিক ওদিক টেলিগ্রাফের কাজ করিয়া তিনি ঠিক করিলেন—এবার 'নিউ ইয়র্ক' সহরে গিয়া কাজ করিতে হইবে। যে কথা সেই কাজ, এডিসন নিউইয়র্কে গিয়া হাজির! অথচ তাঁহার কাছে টাকা-পয়সা কিছু নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে দমিবার পাত্র মোটেই নন। ভাবিলেন—"একটা টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ জুটাইয়া লইতে পারিব না? তবে আর এতদিনে কি শিখিলাম?"

একদিন তিনি "Gold and Stock Telegraph Company নামে এক অফিসে গিয়া হাজির হইলেন। বেচারা দরখাস্ত পেশ করিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন—একটা জবাবের আশায়। কিন্তু হায়রে হায়! কেহ যে ফিরিয়াও দেখে না! এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘরের মধ্যে টেলিগ্রাফের যন্ত্র লইয়া কাজ হইতেছিল, হঠাৎ কলটা বিগ্‌ড়াইয়া গেল। সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করিতেছে, কি যে হইয়াছে তাহা কেহই ধরিতে পারে না। শেষে অফিসের ওস্তাদ কর্ম্মচারীরা আসিয়া হাজির—কিন্তু কল অচল। এডিসন এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিতে ছিলেন। এবার আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, অনুমতি পাইলে তিনি একবার চেষ্টা করিতে পারেন। সকলে ত' অবাক্! ছোকরা বলে কি? বড় বড় মাথাওয়ালা লোকেরা গেল ঘাল খাইয়া, আর একটা চুনাপুঁটি কিনা বলিতেছে সব ঠিক করিয়া দিবে!

যাহা হউক, এডিসন অনুমতি পাইলেন। তারপর ঘণ্টা দুই পরে কল যেমন

চলিতেছিল, তেম্নি চলিতে লাগিল—যেন কিছুই হয় নাই। বলা বাহুল্য, এডিসন সেখানে একটা মোটা মাহিনার কাজ পাইলেন।

এইবার এডিসনের হাতে কিছু টাকা হইল। তাঁহার জীবনের আকাঙ্খা সফল করিবার সুবিধাও উপস্থিত হইল। এডিসন তখন রাতদিন বিজ্ঞানচর্চ্চায় মাতিয়া গেলেন।

শীঘ্রই তিনি একটা টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি তৈরী করিবার কারখানা খুলিয়া বসিলেন। তারপর আরম্ভ হইল তাঁহার নূতন নূতন আবিষ্কার। টেলিগ্রাফের যন্ত্রে নূতন ধরণের কল বসাইয়া তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনিয়া দিলেন।

তারপর তিনি পড়িলেন 'শব্দ' লইয়া। ঘরে বসিয়া অনেক দূরের লোকের সহিত কথা বলার চেষ্টা যে তিনিই প্রথম করেন তাহা নয়, কিন্তু তখনকার টেলিফোনে শব্দও ভাল আসিত না, আর সাধারণ লোকেও জিনিষটার সঙ্গে তেমন পরিচিত হয় নাই। এডিসন টেলিফোনের আওয়াজকে মুখের কথার মত পরিস্কার করিয়া দিলেন; যেখানে যেটুকু গলদ ছিল, অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে সেগুলি নতুন ভাবে তৈরী করিয়া তিনি ঘরে ঘরে টেলিফোনে কথা বলার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া এডিসন ঘরের কোণায় বসিয়া কি ঠুক্ ঠাক্ করেন, দিন নাই, রাত নাই, একটা কলের সম্মুখে বসিয়া কি যে আবোল তাবোল বকেন; সকলে ভাবিয়া অস্থির—'ব্যাপারখানা কি?'

এডিসন ছিলেন ফোণোগ্রাফ আবিষ্কারের মৎলবে। তোমরা যে কলের গান শুনিতে এত ভালবাস, তা এই ফণোগ্রাফের সাহায্যেই তৈরী। তোমরা নিশ্চয়ই ভাব, মানুষ নাই জন নাই, অথচ দিব্যি মানুষের গলায় গান হইতেছে, এ আবার কি রকম করিয়া হয়? এডিসন বুঝিয়াছিলেন, বুদ্ধি থাকিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মানুষের গলার স্বরকে রেকর্ডের মধ্যে গাঁথিয়া লওয়া যাইতে পারে। তারপর রেকর্ড হইতে সে স্বর আবার বাহির করিতে পারিলেই হইল। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব, তাহা তোমাদের আর একদিন বলিব। যাহা হউক,

এডিসন এই পরীক্ষা লইয়াই মাতিয়া রহিলেন। তারপর একদিন সকলে দেখিল, এডিসন আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিতেছেন। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখে, এডিসন নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আহ্লাদে আটখানা হইয়া, তাঁহার তৈরী এক অদ্ভুত যন্ত্রের সম্মুখে কাণ পাতিয়া বসিয়া আছেন, আর কল হইতে ঠিক এডিসনের মত গলায় আওয়াজ আসিতেছে—Mary had a little lamb. Mary had a little lamb (মেরীর একটা ছোট ভেঁড়া ছিল)। এডিসন বলিলেন, "ঠিক এই কথাটাই আমি কিছু আগে কলের মধ্যে বলিয়াছিলাম। কল আমার কথাটা তাহার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল, আর এখন তোমাদিগকে তাহাই শোনাইতেছে, কি মজা!" সকলে অবাক্!

ফোণোগ্রাফের জন্মের পরেই এডিসনের নাম সমস্ত সভ্য-জগতে ছড়াইয়া পড়িল। সকলে বলিতে লাগিল "হ্যাঁ, একখানা মাথা বটে,!" তিনি তখন তাঁহার ফোণোগ্রাফ লইয়া আরও উন্নত ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। ডিক্টে-ফোণের নাম তোমরা অনেকেই জান না বোধ হয়। আমাদের দেশে ইহার বিশেষ চল নাই। কিন্তু বিলাতের লোকেরা ইহা খুবই ব্যবহার করে। মনে কর, তুমি একটা খুব কাজের লোক। তোমার অধীনে অনেক লোক কাজ করে। সকাল বেলা তোমাকে একটা জরুরী কাজে বাহির হইয়া যাইতে হইবে; অথচ তোমার কর্ম্মচারীদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেককিছু বলিয়া যাওয়া দরকার। তাহারা তখনও কাজে আসে নাই। তুমি যাহা বলিবার, তাহা এই কলের মধ্যে বলিয়া গেলেই চলিবে। তারপর তুমি থাক আর নাই থাক, ঐ কল হইতেই তোমার কর্ম্মচারীরা সমস্ত কথা শুনিয়া লইবে—ঠিক যেন তোমার মুখের কথা শুনিতেছে।

আজকাল বড় বড় সহরে বিদ্যুতের আলো না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলে না। ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ না থাকিলে এই কলিকাতা সহরটা কেমন হইত ভাব দেখি! অথচ এডিসনের আগে "ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের আলো," একথা লোকে ভাবিতেও পারিত না। "বিজলী বাতী" বলিয়া তখন যাহা ব্যবহার করা হইত, তাহাকে বলে

'আর্ক্ লাইট্।' সে আলো বড় বড় রাস্তায়, কিংবা বড়জোর বড় বড় কারখানায় চলিতে পারে, কিন্তু ঘরের কাজে সে আলোর চলতি অসম্ভব। এডিসন ভাবিলেন, "তাইত,' এর একটা কিছু বন্দোবস্ত করা যায় না?"

কয়েক বছর ধরিয়া তিনি এই পরীক্ষা যুড়িয়া দিলেন। শেষে এক নতুন ধরণের বিজলী বাতী আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। আজকাল ঘরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র যে ইলেক্‌ট্রিক লাইট দেখা যায়, তাহা এডিসনের এই আলো। ইহাকে বলে incandescent lamp. এবার এডিসনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া গেল।

শুধু বিজলী বাতী তৈরী করিয়াই এডিসন ক্ষান্ত রহিলেন না, বিদ্যুৎ-সংগ্রহ করিবার জন্য যে যন্ত্র দরকার, তাহার মধ্যেও এক নূতনত্ব আনিলেন। আর সেই বিদ্যুৎকে রাস্তা-ঘাটে, কল-কারখানায়, রেল গাড়ী চালনায়, প্রভৃতি কত রকম কাজে যে লাগাইয়া দিলেন, তাহার হিসাব নাই।

এইবার বায়স্কোপের কথা বলি। গেল মাসের 'রামধনু'তে তোমরা বায়স্কোপ সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়িয়াছ। এডিসনই যে সকলের আগে বায়স্কোপ দেখাইবার চেষ্টা করেন, তাহা নয়। কিন্তু এডিসন না থাকিলে, আজ যে আমরা বায়স্কোপ দেখার কথা ভাবিতেও পারিতাম না, তাহা খুবই সত্যি। এডিসনের আবিষ্কারের উপরেই যে বায়স্কোপের জন্ম, একথা খুব জোর করিয়াই বলা চলে।

এখন বোধ হয় বুঝিতেছ কেন এডিসনকে "যাদুকর" বলিয়াছি। গল্পের যাদুকর যেমন যাদুর কাঠি ছোঁয়াইয়া অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ড করিতে পারে, এডিসনও তেম্নি বিজ্ঞানের সোণার কাঠি ছোঁয়াইয়া অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়াছেন। তিনি বিদ্যুৎকে ঘরের মধ্যে পূরিয়াছেন, কল কে দিয়া মানুষের মত কথা বলাইয়াছেন, ছবি কে দিয়া মানুষের মত কাজ করাইয়াছেন, ঘরে বসিয়া শত শত মাইল দূরের লোকের সহিত আলাপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন,—আর কত বলিব? অথচ এগুলি সবই তিনি করিয়াছেন, বিজ্ঞানের গোটা কয়েক মোটা মোটা সাধারণ নিয়ম হইতে। সে নিয়ম জানে, এরকম লোক হয়ত খোঁজ করিলে হাজার হাজার মিলিবে, কিন্তু মাথা খেলাইয়া তাহা হইতে এত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষের সৃষ্টি করিতে পারে ক'জন?

এডিসনের বয়স এখন একাশী বৎসর। এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও আজ তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের চর্চ্চায় কাটাইতেছেন। ঘুমাইবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তিনি নষ্ট করিতে নারাজ। এই সেদিনও কাগজে দেখিলাম, এডিসন ভগবানের নিকট নালিশ করিতেছেন—কেন তিনি দিনগুলিকে মাত্র ২৪ ঘণ্টা করিয়াছেন? ২৪ ঘণ্টায় যে তাঁহার কিছুতেই কুলায় না! দিনগুলি আর একটু বড় হইলে তাঁহার কাজের সুবিধা হইত অনেক বেশী। এমন মানুষ না হইলে কি আর এত বড় হইতে পারে?

ক্রিকেট-খেলোয়াড়

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ)

আমাদের দেশে আজকাল ক্রিকেট্ খেলার রেওয়াজটা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। শক্তপোক্ত করিয়া প্রথমে একটা ন্যাকড়ার বল তৈরি করিতাম। তারপর মুচিকে আনা দুই পয়সা কবুলাইয়া, বেশ করিয়া বলটাকে চামড়া দিয়া মুড়িয়া লওয়া হইত। কেরাসিনের কাঠ কাটিয়া একটা ব্যাট্ বানাইয়া লইতে যা দেরী! তারপর আমাদের যা অবস্থা—খাওয়া-দাওয়া চুলায় গেল, আমরা দিনরাত্রি কেবল বলই পিটিতেছি, আর বলই পিটিতেছি। তোমরা মুখ টিপিয়া খুব হাসিতেছ, না? আরে বাপ্, খেলার নেশা চাপিলে আর কেরাসিন কাঠের ব্যাটে, আর কেন-হ্যাণ্ডেল ব্যাটে কোন তফাৎ থাকে না—বিশ্বাস না হয়, একবার পরখ্ করিয়াই দেখ না।

বাস্তবিকই ক্রিকেট খেলার উৎসাহটা আমাদের বাংলাদেশে আস্তে আস্তে ক্রমেই বাড়িতেছে। কিন্তু তবুও, তেমন পাকা খেলোয়াড় বাঙ্গালীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত বড় একটা কেউ হয় নাই—অবশ্য ধীরে ধীরে তাহাও হইবে। বরং বাংলা দেশের বাহিরে দু'চারজন বড় বড় ভারতীয় খেলোয়াড়ের নাম শোনা গিয়াছে। কিন্তু যাকে বলে একেবারে 'বাঘা' খেলোয়াড়, সে যদি দেখিতে চাও, তো

তোমাদিগকে সাগর পাড়ি দিয়া যাইতে হইবে ক্রিকেটের প্রধান আড্ডা সেই বিলাতে।

পৃথিবীর মধ্যে ক্রিকেট্ খেলার জন্য প্রসিদ্ধ দুইটী দেশ—ইংল্যাণ্ড্ আর অষ্ট্রেলিয়া। এই শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া দুই দেশের মধ্যে যা রেষারেষি! প্রত্যেক বছরই এই দুই জাতির মধ্যে বল পরীক্ষার জন্য একটা করিয়া ক্রিকেট ম্যাচ হয়। এই ম্যাচকে বলে টেষ্ট্ ম্যাচ্। টেষ্ট্ ম্যাচের সময় আর দু দেশের লোকের জ্ঞান থাকে না; যেন কত বড় একটা যুদ্ধ হইতেছে, আর তার ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে দেশের মান-সম্মান, প্রতিপত্তি, যত কিছু আছে সমস্তই। এমনি উৎসাহ! সমস্ত দেশ হইতে এগারটী বাছা বাছা খেলোয়াড় লওয়া হয়—ধরিতে গেলে এক রকম সমস্ত পৃথিবীটার মধ্যেই তাহারা সেরা খেলোয়াড়। যদি কোন প্রকারে তুমি সেই এগারটীর মধ্যে ঢুকিতে পারিলে, তাহা হইলে, ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে তাহার চেয়ে আর বড় গৌরব নাই। আর যদি তুমি দলের নেতা বা ক্যাপ্‌টেন্ হও, তাহা হইলে তো একটী ছোটখাট রাজাই হইয়া গেলে।

এই "বাঘা" খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে দু'চার কথা জানিতে নিশ্চয়ই তোমাদের একটু কৌতূহল হইয়াছে। আজ তাই জনকয়েক বিলাতী খেলোয়াড়ের কথা তোমাদিগকে বলিব।

পরের পৃষ্ঠায় দেখ, হাতখানেক দাড়ীওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি চেহারার একজন লোক, বল হাতে উইকেটের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। বলিতে পার ইনি কে? ইঁহার নাম ডাক্তার উইলিয়াম গ্রেস, লোকে সংক্ষেপ করিয়া বলে "ডব্লিউ, জি." ক্রিকেট সম্বন্ধে কোন খবর দিতে গেলে, আগেই বলিতে হইবে এই "ডব্লিউ জির" কথা, কেননা ইঁহার নামই হইল, "The Grand Old Man Of Cricket." সাহেব ছিলেন একেবারে সব্যসাচী! সাধারণতঃ দেখা যায় যে ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা হয় খুব ভাল বল দিতে পারে, (বোলার) আর নয় তো, খুব জোর বল পিটাইতে পারে (ব্যাট্স্‌ম্যান)। ডাক্তার সাহেব ছিলেন দুই দিকেই সমান। তোমরা হয়তো জান, যে কোন খেলায় যদি কেউ একা একশো 'রাণ' করে, তবে তাহাকে 'সেঞ্চুরি' করা

বলে। বড় বড় ম্যাচে 'সেঞ্চুরি' করা এক দারুণ ব্যাপার। যদি কেহ জীবনে বিশ ত্রিশটী 'সেঞ্চুরি' করে, তবে সে তো নামজাদাই হইয়া গেল! ডাঃ গ্রেস্ এই রকম 'সেঞ্চুরি' করিয়াছিলেন কয়টা জান? মাত্র, দুইশোটা। ভদ্রলোক ব্যাট্ ধরিলে অনেক সময় ফিল্ডিং করিতে নামিত, ১১ জনের জায়গায় ২২ জন। লোকগুলি খাটিয়া খাটিয়া হয়রাণ হইয়া যাইত, কিন্তু তবুও "ডব্লিউ, জি,"কে কাবু করা তাহাদের সাধ্যে কুলাইত না।

ডাক্তার গ্রেস্—The Grand Old Man Of Cricket.

একবার একটা খেলায় "ডব্লিউ, জি" ব্যাট্ হাতে নামিয়াছেন। যে লোকটী বল দিতেছিল, সে, ডাক্তার গ্রেস্ প্রস্তুত আছেন কিনা, না দেখিয়াই বল ছাড়িয়াছে। ফলে গ্রেস্ তৎক্ষণাৎ আউট্! এখন, ক্রিকেট খেলার নিয়ম হইতেছে এই, যে ব্যাট্স্‌ম্যান, বোলারের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিত করিলে, তবে বোলার বল ছাড়িবে। তা না হইলেই সে বল্ অগ্রাহ্য। গ্রেস্ তো আউট্ হইয়া অপ্রস্তুতের একশেষ—আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আম্পায়ার (মধ্যস্থ) কিন্তু সে কথা মোটেই শুনিল না, বলিল, "না, তুমি আউট্ই

হইয়াছ।" এদিকে আসল কথাটা যে কি, সে তো আর বোলারের অজানা নাই! সে মনে মনে ভাবিল, "আর একবার খেলিতে চায়, খেলুক না! ভারী তো খেলোয়াড়, এক বলেই যে আউট্ হয়, তাহার মুরোদ তো বোঝাই গিয়াছে। ঘাল করিতে না হয় এক বলের জায়গায়, তিন বল লাগিবে; এইতো তফাৎ?" সে গিয়া আম্পায়ারকে বলিতেই, আম্পায়ার 'ডব্লিউ, জি'কে আবার খেলিতে অনুমতি দিলেন। হায়রে হতভাগ্য বোলার, তুমি ঘায়েল করিবে 'ডব্লিউ, জি'কে? তাহার মত কত বোলার আসিয়া নিজেরাই ঘায়েল হইয়া গেল। সেঞ্চুরি তো কোন্ সময় কাবার! ডাক্তার সাহেব সেই যে ব্যাট্ ধরিলেন, সারা দিনের মধ্যে আর আউট্ হইবার নামটীও করিলেন না।

বাংলার লাট্ সাহেব, স্যার ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন্

এইবার দ্বিতীয় ছবিখানির প্রতি নজর কর দেখি! একজন খেলোয়াড় ব্যাট্ হাতে, বলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভদ্রলোকটী কে বলিতে পার? বেশ ধীরে সুস্থে দেখ দেখি? পারিলে না? এ যে আমাদের বাংলাদেশের লাট্ সাহেব, স্যার ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সনের ছবি! লাট্ সাহেব যে একজন পৃথিবীবিখ্যাত ক্রিকেট্‌খেলোয়াড়। ইংল্যাণ্ডের হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট্ ম্যাচে তো ইনি খেলিয়াছেনই, ক্যাপ্টেনি পর্য্যন্ত করিয়াছেন। লাট সাহেবের

খেলার একটা প্রধান গুণ এই, যে ইনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া পড়েন না। ধর, একটা বল আসিতেছে। প্রথমে মনে হইল, বলটা বাঁ পাশ দিয়া আসিবে। সেই রকম ভাবেই বলকে পিটাইবার জন্য হয়তো ইনি প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় হয়তো বলটা একটা ব্রেক্ খাইয়া ঘুরিয়া, একেবারে তীরবেগে সোজা উইকেটের দিকে আসিতে লাগিল। অনেক খেলোয়াড় এখানে ভড়্‌কাইয়া গিয়া, একেবারে যা' তা' করিয়া বসে। লাটসাহেব কিন্তু ভড়্‌কাইবার ধার দিয়াও যান না, দিব্যি ধীরে সুস্থে খেলিয়া যান।

ভারত-গৌরব রণজিৎ সিংহ (নোয়ানগরের জামসাহেব)

তৃতীয় ছবি খানি ভারত-গৌরব রণজিৎ সিংহের ইনি একজন অসাধারণ খেলোয়াড়। সমস্ত ভারত-বর্ষের নাম ইনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহার খেলা দেখিলে মনে হইত, বল্‌টাকে বুঝি ইনি যাদু করিয়া রাখিয়াছেন। শোঁ শোঁ শব্দে তীরের মত, বাঁ পাশ দিয়া বল আসিতেছে, সে বল্ যে বাঁ দিক্ ভিন্ন কোন মানুষে অন্য দিকে পাঠাইতে পারে, তাহা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে না! কি করিয়া কি করিলেন, তিনিই জানেন, বল কিন্তু রণজিতের হাতের বাড়ি খাইয়া, সোজা উল্টা মুখী হইয়া চলিল ডান দিকে।

বিপক্ষদলের লোক গেল বোকা বনিয়া। বল্ আর সে তল্লাটেই নাই—রণজিতের হাতের মার তো!

রণজিতের খেলার সম্বন্ধে একটা ভারী মজাদার গল্প আছে। সবে তখন তাঁহার নাম বাহির হইয়াছে, একটা প্রকাণ্ড ম্যাচে সেই প্রথম নামিলেন। সকলে আশা করিয়া আছে একটা দারুণ খেলা দেখিবে। রণজিৎ ব্যাট হাতে গিয়া নামিলেন। কিন্তু হায়রে হায়, এক বলেই একেবারে কাৎ। সকলের চাপা হাসি আর টিট্‌কারীর চোটে বেচারার মাথা নুইয়া পড়িল। পরদিন রণজিৎ আবার নামিলেন। সকলে ভাবিল, ওঃ, ভারী তো খেলোয়াড়, এতদিন খেলিতেন বাছা চুণাপুঁটির দলে, সেখানেই ছিল যা কিছু ফষ্টি নাষ্টি; এই সব বোলারদের কাছে আর বাছাধনকে পাত্তা পাইতে হয় না! কিন্তু খানিকটা পরেই নিন্দুকের দলের চোখ ফুটিল। সেই বাঘা বাঘা বোলারেরা, সারাদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও রণজিতের কিছুই করিতে পারিল না। সারাদিন খেলার পর, সন্ধ্যার আগে, যখন বিজয়ী বীরের মত রণজিৎ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বদিনের অপমান, গ্লানি, সমস্তই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

রণজিৎ সিংহ নোয়ানগরের রাজা। নোয়া নগরের রাজাদের বলে 'জাম্ সাহেব।' বিলাতের লোকে ইঁহাকে 'রণ্‌জি' বলিয়া ডাকে। ইনি বহুবার ইংল্যাণ্ডের হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট্ ম্যাচে খেলিয়াছেন। রণজিতের ভাইপো' দলীপ সিংহ আজ কাল ক্রিকেট্ খেলায় দারুণ নাম করিতেছেন। আশা করা যায়, রণজিতের নাম ইনি রাখিবেন।

চতুর্থ ছবিখানি যাঁহার, আজ তাঁর নাম পৃথিবীর সকলের মুখে মুখে। তোমরাও বোধ হয় তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে। অনেকের মতে, এত বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই করে নাই। হব্‌সের কথা বলিতেছি। অবশ্য হব্‌স্ ও রণজিতের মধ্যে কে যে বড় খেলোয়াড়, তাহা বলা খুবই শক্ত; তবে একথা সত্য যে 'রাণ' করিতে হব্‌সের জুড়ি এ পর্য্যন্ত হয় নাই। শুধু টেষ্ট্ ম্যাচেই ইনি 'সেঞ্চুরি' করিয়াছেন ১৫০ বার। টেষ্ট্ ম্যাচ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা

বোধ হয় তোমরা ধারণাও করিতে পারিবেনা। আমাদের বাংলা দেশের সেরা খেলোয়াড় যাঁরা, তাঁরা বোধ হয় দশ মিনিট্ সেখানে ব্যাট্ ধরিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারেন কিনা সন্দেহ; সেখানে মাত্র দেড়শো বার 'সেঞ্চুরি' করা কতটা সোজা জিনিষ, ভাবিয়া দেখ।

প্রসিদ্ধ ব্যাট্‌স্‌ম্যান হব্‌স্।

হব্‌স্ সাহেবের খেলার ধরণটাও নাকি একটা দেখিবার জিনিষ। একটু লাফা-লাফি নাই, একটু অঙ্গভঙ্গী নাই,—ছবিটীর মত খেলিয়া যান।

শেষ ছবিখানি প্রসিদ্ধ বোলার রোড্‌সের। ইনি পাতিয়ালার মহারাজের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা শিখান। সাহেব বল করেন আস্তে আস্তে, তাও আবার বাঁ হাতে। কিন্তু সেই বাঁ হাতের ধীরে ধীরে বল দেওয়া দেখিয়া অনেক চাঁই খেলোয়াড়েরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। রোড্‌সের বয়স হইয়াছে, কিন্তু গতবার টেষ্ট্ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে হারাইতে ইংল্যাণ্ডের দরকার হইয়াছিল এই বৃদ্ধকেই।

আজকাল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলারের নাম টেট্। বছর দুই আগে যখন বিলাতের বিখ্যাত এম্, সি, সি, ক্রিকেটের দল এদেশে খেলিতে আসে, তখন তোমরা হয়তো কেহ কেহ ইঁহাকে দেখিয়া থাকিবে। লোকটী তো বল্ দেয় না, যেন গুলি ছোড়ে! প্রত্যেকটী বল্ আসে সোজা ক্রিকেটের দিকে—একটী ভুলিয়াও এদিক্ ওদিক্ যায় না। তুমি ব্যাটিং করিতে গেলে, হয় তুমি সে বল পিটাইবে, নয়তো সে বল তোমাকে আউট্ করিবে; ইহা ভিন্ন তৃতীয় সম্ভাবনা বড় নাই। লোকটী ইয়া লম্বা-চওড়া, আর ভারী হাসি খুসি! কলিকাতায় যে বল্‌টীতে তিনি কট্ আউট্ হইলেন, তাহা যা উপরে উঠিয়াছিল, যদি দেখিতে! রাবণ যেমন মৃত্যুবাণ দেখিয়াই চিনিয়া লইয়াছিল, টেটেরও হইল ঠিক সেই অবস্থা। বল্‌টা কেহ ধরিল কিনা, না দেখিয়াই তিনি গম্ভীর ভাবে ব্যাট বগলে করিয়া তাঁবুর দিকে চলিলেন। ভাবটা এই, যে আউট তো জানা কথা! ও-আর দেখিব কি? সকলেতো তাঁহার রকম দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির!

রোড্‌স্ বাঁ হাতে বল দিতেছেন।

আজ তোমাদের বিশেষ করিয়া বিলাতী খেলোয়াড়দের কথাই বলিলাম।

অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের কথা আর একদিন বলার ইচ্ছা রহিল। সেখানেও আর্মষ্ট্রং, পন্‌স্‌ফোর্ড প্রভৃতি মহা মহা রথীরা আছে। পন্‌স্‌ফোর্ড অসাধারণ খেলোয়াড়। ইঁহাকে লোকে বলে 'রাণ' করিবার যন্ত্র। একবার এক ম্যাচে ইনি একাই পাঁচশো 'রাণ' করিয়াছিলেন। লোকটার যে মাজা ভাঙ্গিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। বয়সও খুব অল্প, এই বছর পঁচিশেক হইবে।

রামধনু

(শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়)

আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা,
হ'লোনা ভাই, আজকে খেলা,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি পড়ে গায়,

আঁধার-বরণ মেঘের পাশে,
ক্ষণে, ক্ষণে, বিজ্‌লী হাসে
লুকিয়ে থেকে মেঘের ফাঁকে চায়।

গাঙের পারে, গাছের মাথে,
মেঘের খেলা, রবির সাথে,
রাধার পাশে যেন শ্যামরায়।

পূবের দিকে মেঘের কোলে,
সপ্ত রঙের পক্ষ মেলে,
রামের ধনু উঠ্‌ল গগন-গায়।

আজকে চ' ভাই নদীর চরে,
থাক্‌বো না আর বন্ধ ঘরে,
রামধনু আজ দেখব সবে, আয়।

রঙের পরে রঙের রেখা,
যাঁহার করের তুলির আঁকা,
ভক্তিভরে নমি তাঁহার পায়।

নেপোলিয়নের এল্‌বা-ত্যাগ

(শ্রীবিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

সমস্ত ইয়োরোপটা যেন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে ওলোট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। গোটা মহাদেশটাকে যিনি একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁর নাম শুনিলেই ইয়োরোপের রাজাদের একেবারে থরহরি কম্প আসিত, কয়েক বৎসরের মধ্যেই যিনি জুলিয়াস্ সিজার, হানিবল, এমন কি আলেক্‌জাণ্ডারের বীরত্ব-গৌরবকেও ম্লান করিয়া দিলেন, সেই নেপোলিয়ান আজ বন্দী! কার কাছে বন্দী? কাহারও সাধ্য আছে, একা পারে সেই সিংহটীকে কাবু করিয়া আনিতে? ইয়োরোপের সব কয়টা দেশ, অভিমন্যুর মত নেপোলিয়নকে ঘিরিয়া, তবে না পরাস্ত করিয়াছে! তাও কি পারিত, যদি না তাহার নিজের দলের মধ্যেই গোলযোগ বাধিয়া যাইত?

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের রাজত্ব শেষ হইল; বুরবন্ বংশ—যাঁহারা আগে রাজত্ব করিতেন—তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসিলেন রাজত্ব করিতে। নেপোলিয়নের উপর তাঁহাদের যা রাগ! পারে তো সেই মুহূর্ত্তেই গলার টুঁটি চাপিয়া মারিয়া ফেলে! ফ্রান্সের অনেক লোক তখন বুরবনদের পক্ষে জুটিয়া গিয়াছে। নেপোলিয়নের উপর তাহারাও খড়গহস্ত! তিনি নাকি তাহাদের দেশের দুর্গতির একশেষ করিয়াছেন!

ভূমধ্যসাগরে এল্‌বা নামে একটী ছোট দ্বীপ আছে। ইয়োরোপের রাজারা মিলিয়া ঠিক করিলেন, নেপোলিয়নকে দেশ ছাড়িয়া এই দ্বীপে থাকিতে হইবে।

দ্বীপের বাহিরে তিনি পা'টী পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারিবেন না। বাঘকে খাঁচায় পুরিয়া না রাখিলে চলে? কোন মতে একবার ছাড়া পাইলেই যে সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবে! এত ভয় কাহাকে? না, একটী মাত্র প্রাণীকে।

প্যারিস হইতে প্রায় সাতশো মাইল দূরে জাহাজ দাঁড়াইয়া, সেই জাহাজে নেপোলিয়নকে এল্‌বায় লইয়া যাওয়া হইবে। প্যারিসের আশে পাশের লোকেরা চিরকালই নেপোলিয়নের ভক্ত, তাহারা রাজার হালেই নেপোলিয়নকে বিদায় দিল। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে যাইতে হইল এমন সব পথ দিয়া, যেখানে বুরবন্‌দের প্রতিপত্তিটাই বেশী। তাহারা নেপোলিয়নকে অপমানের একশেষ করিল; ঢিল, পাথর, যাহা হাতের কাছে পাইল, তাহাই ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া শেষ কালটায় তিনি ছদ্মবেশ ধরিলেন। তা না হইলে, সেখানে নির্ঘাৎ তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিত।

নেপোলিয়ন তো এল্‌বায় নির্ব্বাসিত হইলেন, কিন্তু মন তাঁহার ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল ফ্রান্সে। কী, সিংহ হইয়া শেষে কিনা শৃগালের মত পচিয়া মরিবেন তিনি এই এল্‌বায়! কখনো না। তিনি এ শিকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন। ঠিক্ এই সময় খবর আসিল যে ফ্রান্সের নূতন বুরবন্ রাজা ভয়ানক অত্যাচার সুরু করিয়া দিয়াছেন। ফ্রান্সের লোকের মনে আর সুখ নাই। নেপোলিয়ন একমুহূর্ত্তে মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইবেন; যদি পৃথিবী তাহাতে বাধা দেয়, তো ভগবান্ তাঁহাকে বজ্রবাহু দিয়াছেন, সেই বজ্রবাহু দিয়া তিনি পৃথিবীকে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া দিবেন! উত্তেজনায় তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।

নেপোলিয়ন কি করিলেন? তোমরা সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না, ভাবিবে আমি বুঝি, নিজের মনেই গল্প বানাইয়া তোমাদিগকে শুনাইতেছি, মনে করিবে এ বুঝি স্বপ্নপুরীর কোন রূপকথা শুনিতেছ, এ মানুষ যে মাত্র শ' খানেক বছর আগে আমাদের মতই পৃথিবীতে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইত, তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিবে না।

করিলেন কি জান? জনকয়েক মাত্র অনুচর ও সৈন্য লইয়া একদিন রাত্রে জাহাজে গিয়া চাপিয়া বসিলেন। উদ্দেশ্যটা কি, না বুরবন্‌রাজের হাত হইতে ফ্রান্সকে কাড়িয়া লইবেন। নিতান্ত পাগল ভিন্ন বোধ হয়, আর যে কেউ ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিত। এল্‌বার চারিপাশে ইংরাজ ও ফরাসীরাজের অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘুণাক্ষরেও যদি তাহারা একটু কিছু টের পায়, তো এক মুহূর্ত্তেই সব ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। বেশী কিছু নয়, শুধু একটী মাত্র কামানের গোলা। তারপর আর কিছুই দেখিতে হইবে না।

খানিকদূর যাইতেই তো ফরাসীরাজের এক যুদ্ধ-জাহাজের সহিত মুলাকাৎ! এল্‌বা হইতে জাহাজ আসিতেছে দেখিয়া ফরাসী জাহাজের লোকেরা বলিল "এল্‌বা হইতে আসা হইতেছে নাকি? বলি, আমাদের ক্ষুদে সম্রাট্‌টী সেখানে আছেন কেমন?" (তোমরা নিশ্চয় জান, যে নেপোলিয়ন দেখিতে ছিলেন একটুখানি।)

ঠাট্টাটা যেন তাঁহার কতই ভাল লাগিয়াছে, এমনি সুরে নেপোলিয়ন জবাব দিলেন, "তোফা আছেন!" সঙ্গে সঙ্গে নিজের লোকদের যেখানে পারিলেন, লুকাইয়া ফেলিলেন।

ধী—রে, ধী—রে, তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতগুলি জাহাজের একটাও টের পাইল না, যে সিংহ খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

জাহাজে বসিয়াই, ফ্রান্সের লোকদের আর সৈন্য-সামন্তদের উদ্দেশ করিয়া নেপোলিয়ন এক অভিভাষণ লিখিয়া ফেলিলেন, আর তাঁর সঙ্গের লোকেরা প্রাণপণে লাগিয়া গেল সেইগুলি নকল করিতে। ফ্রান্সের লোকের যে তাঁর প্রতি কি টান, তা' তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন; ঠিক বুঝিয়া লইলেন যে একবার যদি তিনি তাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে পারেন, একবার যদি তাঁর মুখের কথা তাদের কাণে পৌঁছায় তো, তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিবে না। শেষে সকলে আসিয়া ফ্রান্সের মাটিতে পা দিলেন। আশায়, আনন্দে, নেপোলিয়নের বুক নাচিয়া উঠিল।

না আছে সৈন্যসামন্ত, না আছে অস্ত্রশস্ত্র, পথে যাইতে যাইতে যে কয়টী

ঘোড়া কিনিতে পারিলেন, তাই হইল সম্বল, চলিলেন তিনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দখল করিতে! পাগলামি আর কাকে বলে?

এ অভিযান হঠাইতে ফরাসীরাজের বিশেষ বেগ পাইবার কথা নয়। সৈন্যসামন্ত ত দূরের কথা, একদল পুলিশেই অনায়াসে তাঁহাকে থামাইয়া দিতে পারিত; তারপর, একটু বিচারের ভাণ করিয়া নেপোলিয়নকে ফাঁসিকাষ্ঠে লট্‌কাইয়া দিলেই তো গেল সকল আপদ চুকিয়া!

কিন্তু পথে ঘটিয়া গেল একেবারে বিরাট্ ব্যাপার! ফ্রান্সের গ্রাম্য লোক, চাষাভূষা, যেই শুনিল নেপোলিয়ন ফিরিয়া আসিতেছেন, অমনি যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া আসিল তাঁহার সাথে যোগ দিতে। মুখে তাহাদের আর কোন কথাই নাই, কেবল "সম্রাট, সম্রাট।" দল একটু পুরু হইয়া উঠিল; নেপোলিয়ন মহোল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

ক্রমে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গ্রে নোব্‌ল্ সহরের কাছে। সহরটা বেশ বড়, ফরাসীরাজের বিস্তর সৈন্যসামন্ত সেখানে মজুত থাকে। তাহাদের সেনাপতি যেই শুনিলেন নেপোলিয়ন আসিতেছেন, অমনি একেবারে ছ'হাজার সৈন্য লইয়া ছুটিয়া আসিলেন,—তোপের মুখেই আজ ক্ষুদে লোকটাকে সদলবলে উড়াইয়া দিবেন। কয়েকশো মাত্র লোক লইয়া পাহাড়ের পথে আসিতে আসিতে নেপোলিয়ন দেখিলেন, সেই ছ'হাজার লোক বন্দুক হাতে, রৈ রৈ শব্দে, তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

তিনি থামিলেন, তাঁর লোক-জনদেরও থামাইলেন। তারপর সকলকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া, মাত্র জনকয়েক অশ্বারোহী লইয়া চলিলেন, সেই হাজার হাজার সৈন্যের দিকে। বিপক্ষের সৈন্যদল যখন মাত্র শ'খানেক হাত দূরে, তখন তিনি তাঁহার বাকী লোককয়টীকেও থামিতে বলিলেন। তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া একাই হাঁটিয়া চলিলেন—সেই ছ'হাজার সৈন্যের সম্মুখে।

ফরাসী সেনাপতি হুকুম ছাড়িলেন "চালাও গুলি!"

তখন সেই বার হাজার হাত, ছ'হাজারটী বন্দুক উঁচাইয়া ধরিল—ঠিক্ নেপোলিয়নের বুকের দিকে নিশানা করিয়া।

বীরের চোখে কিন্তু পলকটী পর্য্যন্ত পড়িল না; তিনি আরও একটু আগাইয়া গিয়া, গায়ের জামাটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কে আছে তোমাদের মধ্যে, যে তার সম্রাটের বুকে গুলি মারিবে? যদি কেউ থাক, তো—এই আমি বুক পাতিয়া দিলাম, কর গুলি!"

সৈন্যেরা আর তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিল না,—ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া হাত হইতে তাহাদের বন্দুক খসিয়া পড়িতে লাগিল।

নেপোলিয়ন আবার বলিলেন, "কর গুলি, বুক তো পাতিয়া দিয়াছি!"

আর কি সৈন্যেরা স্থির থাকিতে পারে? "সম্রাট! সম্রাট!!" বলিয়া ছুটিয়া

"সম্রাট্! সম্রাট্!!"

আসিয়া তাহারা নেপোলিয়নের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িল। ছ'হাজার সৈন্যের চোখে জল, নেপোলিয়নের চোখে জল! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

সেনাপতি তো হতভম্ব! তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া সে মুল্লুক ছাড়িয়াই চম্পট্। পিছনে তাকাইতে পর্য্যন্ত সাহসে কুলাইল না। সৈন্যেরা হাতে পাইলে বোধ হয়, কীলাইয়াই তাঁহার ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দিত।

তারপর, তাঁর প্যারিস্ অধিকার এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! তাঁর নাম শুনিয়াই কাতারে কাতারে লোক আসিয়া যোগ দিতে লাগিল, সারা ফ্রান্সে কেবল একটী কথা—"নেপোলিয়ন!" সকলে বলিতে লাগিল, "প্যারিস অধিকার? সে তো আপনি করিবেন আপনার ঘোড়ার চাবুকের জোরে!" ফরাসীরাজ হারিবেন, সে আর বেশী কথা কি?

কখনো শুনিয়াছ, যে একজন লোক, অল্প কয়েকজন অনুচর লইয়া বিনা রক্তপাতে ফরাসী দেশের মত একটা দেশ দখল করিয়া লয়? নেপোলিয়নের এল্‌বা ত্যাগের জোড়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক রকম নাই বলিলেই চলে।

এই ঘটনার একশো দিন পরেই হয় ওয়াটারলুর মহাযুদ্ধ। সে আবার এক অন্য কথা।

জলপ্লাবন *

(মহাভারত হইতে)

সূর্য্যের পুত্র মনু যেমন গুণবান্, তেমনি ধার্ম্মিক, যেমন তেজস্বী, তেমনি তপস্বী ছিলেন। সূর্য্যের এক নাম বিবস্বৎ, বিবস্বতের পুত্র বলিয়া তাঁহাকে বৈবস্বত মনু বলা হইত। সূর্য্য ছিলেন কশ্যপের পুত্র, কশ্যপ ব্রহ্মার পুত্র। বিশালা নামে এক ভয়ানক বন ছিল। মনু এক সময়ে এই বনে ভীষণ তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া, হাত উপরে তুলিয়া তপস্যা করিতেন। একবার নীচের দিকে মাথা করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া দশ হাজার বৎসরই তপস্যায় কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, কাপড়-চোপড় ভিজা, এমন অবস্থায় একদিন একটী ছোট মাছ চীরিনী নদীর কিনারায় আসিয়া বলিল,—"ঠাকুর, আমি একটী ছোট মাছ, জোরাল মাছকে আমি বড় ভয় করি। আপনি আমাকে মাছের কাছ থেকে বাঁচান; যাদের গায়ে জোর, তারা দুর্ব্বলকে ধরিয়া খায়, বিশেষ, বড় মাছ ছোট মাছকে। তাই বলি, এই ভয়ানক বিপদ্ হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন; আপনি এই উপকার করুন। আমিও একদিন আপনার উপকার করিব।"

* বাইবেলে যে জলপ্লাবনের কথা আছে, তাহা মাঘ মাসের 'রামধনু'তে "রামধনুর কথা" প্রবন্ধে দেখিতে পাইবে। এবার মহাভারতে জলপ্লাবনের কথা যেমন আছে, তাহা বলা হইল। সেকালকার অনেক জাতির মধ্যেই জলপ্লাবনের কথা প্রচলিত ছিল।

মাছের কথায় মনুর মনে দয়া হইল। তিনি নিজেই মাছটীকে হাতে করিয়া তুলিলেন এবং নদীর জল হইতে আনিয়া এক মেটে হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। মাছটী চাঁদের আলোর মত চক্‌চকে সুন্দর দেখাইতে লাগিল। মনু তাহাকে ছেলের মত যত্ন করিতে লাগিলেন; মাছও মেটে হাঁড়ির মধ্যে বাড়িতেই লাগিল। তাহার শরীর শেষে আর সে হাঁড়িতে আঁটে না। আবার একদিন মাছ মনুকে বলিল,—"ঠাকুর, আমাকে এবার আর কোথাও রাখুন।" মনু মাছটীকে তুলিয়া লইয়া এবার এক বড় পুষ্করিণীর মধ্যে রাখিলেন। মাছ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সেই পুষ্করিণীর মধ্যে বাড়িতে লাগিল। পুষ্করিণীটী ছিল দুই যোজন লম্বা, এক যোজন চওড়া, কিন্তু এত বড় পুকুরেও মাছের শরীর আর আঁটে না। আবার একদিন মনুকে দেখিয়া মাছ বলিল,—"বাবা, এবার আমাকে গঙ্গায়, অথবা আপনার অন্য যেখানে ইচ্ছা নিয়া চলুন, আপনার দয়ায় আমার শরীরটা বড় বাড়িয়া গিয়াছে; আপনি যেমন হুকুম করিবেন, আমি সেই ভাবেই চলিব।" মনু মাছের কথা শুনিয়া নিজেই তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং গঙ্গার মধ্যে নিয়া ফেলিলেন। মাছ কিছু কাল গঙ্গার মধ্যে বাড়িতে লাগিল; শেষে সেখানেও তাহার দেহটা এত বড় হইয়া পড়িল, যে স্থানে আর কুলায় না।

আবার একদিন মনুকে দেখিয়া মাছ বলিল,—"ঠাকুর, আমি ত এত বড় হইয়া পড়িয়াছি, যে আর গঙ্গায়ও আঁটি না, আমাকে এবার দয়া করিয়া শীঘ্র সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিন।" মনু তাহাই করিলেন, মাছটাকে ধরিয়া গঙ্গা হইতে

তুলিলেন এবং সমুদ্রের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। এত বড় যে মাছ, মনুর বহিয়া নিতে কোন কষ্টই হইল না। আর তার গায়ের গন্ধই বা কি সুন্দর, স্পর্শই বা কি সুখের!

মনু যখন মাছকে সমুদ্রে ছাড়িলেন, তখন সে হাসিতে হাসিতে বলিল; *—"ঠাকুর, আপনি ত আমাকে বেশ আদরের সঙ্গে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন; এখন যে কাল আসিয়া পড়িল, তাহাতে আপনাকে কি করিতে হইবে শুনুন। চরাচর—যাহা কিছু দেখিতেছেন সব লয় পাইবে, জগৎকে পরিষ্কার করিয়া ফেলার সময় উপস্থিত: আপনার যাহাতে ভাল হইবে তাহা বলিতেছি। যাহা কিছু চলে ফেরে—এবং যাহা কিছু অচল, সকলের পক্ষেই এটা ভয়ানক সময়। আপনি বেশ শক্ত, মোটাসোটা একখানা নৌকা তৈয়ারী করান এবং তাহাতে এক লম্বা দড়ি বাঁধুন। তারপর নানা রকমের বীজ ও সেকেলে ঋষি ৭টীকে † সঙ্গে লইয়া সেই নৌকায় চাপিয়া বসুন। বীজগুলি বেশ যত্ন করিয়া রাখিবেন। তারপর দেখিবেন আমি কখন আসি। আমাকে না পাইলে, এই ভয়ানক জলপ্লাবন হইতে আপনি উদ্ধার পাইবেন না। আমার মাথায় দুইটা শিং থাকিবে, উহা দেখিয়াই আমাকে চিনিয়া লইতে পারিবেন। আমি এখন চলিলাম।" মনু মাছের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনি সহজ ব্যক্তি নন, আপনি যেমন বলিতেছেন, আমি তাহাই করিব।" মাছ চলিয়া গেলে, মনু মাছের কথামত সকল রকম বীজ সংগ্রহ করিলেন। তখন সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ উঠিল; মনু সেই ঢেউয়ের উপর তাঁহার মস্ত বড় নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মাছের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে মাছ আসিয়া দেখা দিল। মাছের চেহারাটা তখন পর্ব্বতের মত, মাথার উপর দুই শিং। মনু মাছকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নৌকার দড়িতে আগেই ফাঁস লাগান ছিল, তিনি ঐ ফাঁস মাছের শিংএর উপর ছাড়িয়া দিলেন। নৌকা মাছের শিংএ বাঁধা হইয়া গেল;

* তোমরা কখনো মাছের হাসি দেখিয়াছ কি?

† মরীচি, অত্রি প্রভৃতি ৭টী প্রাচীন ঋষিকে সপ্তর্ষি বলে।

মাছ ঐ নৌকা টানিয়া সমুদ্রের মধ্যে খুব জোরে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে লাগিল। সেই প্রলয়ের সময় সমুদ্রের কি ঢেউ আর কি গর্জ্জন! ভীষণ তুফানে মনুর নৌকা সমুদ্রে নাচিতে লাগিল; কোথায় থাকিল মাটী; আর কোথায় থাকিল দিগ্বিদিক্! কেবল জল, জল, জল,—চারিদিকে জল, আকাশে জল—দেখা যাইতে লাগিল।

ঐ ফাঁস মাছের শিংএর উপর ছাড়িয়া দিলেন

খালি মনু, সপ্তর্ষি আর সেই মাছ। সে কি দু এক দিন? বৎসরের পর বৎসর এইভাবে প্রলয়ের ব্যাপার চলিতে লাগিল। মাছ শিংএ দড়ি করিয়া মনুর নৌকা টানিয়া বেড়াইতে লাগিল। টানিতে টানিতে নৌকাখানিকে হিমালয়-পর্ব্বতের সব চেয়ে উচ্চ শৃঙ্গে, লইয়া গিয়া মাছ বলিল,—"এইবার এখানে নৌকা বাঁধ।" নৌকায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি সেই শৃঙ্গে নৌকা বান্ধিয়া ফেলিলেন। যেখানে নৌকা বাঁধা হইয়াছিল, এখনও লোকে সে জায়গাটাকে 'নৌবন্ধন' বলে।

সেই মৎস্য তখন ঋষিদিগকে বলিল,—"আমিই প্রজাপতি ব্রহ্মা; আমার চেয়ে বড় কেহ নাই। আমি মাছের মূর্ত্তি ধরিয়া তোমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম। মনু এবার সমস্ত সৃষ্টি করিবে—দেবতা, অসুর, মানুষ—সব

সৃষ্টি করিবে মনু ; যাহারা চলিতে পারে, যাহারা চলিতে পারে না—সমস্তই এবার মনু সৃষ্টি করিবে। এই ক্ষমতা তাহার জন্মিবে তপস্যার বলে, আমার আশীর্ব্বাদে তাহার মোহ জন্মিবে না।”

এই কথা বলিয়াই মৎস্য কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে দেখা গেল না। মনুরও তখন সৃষ্টি করার সাধ জন্মিল, তিনি সেই কার্য্যে লাগিয়া পড়িলেন।

গুনোরের মুস্কিল

(শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল)

পাশাপাশি ছুটো দেশ, ফরাসী আর জার্ম্মাণী,—যেন বাংলা দেশের পাশে ভোজপুরীর চাড়া দেওয়া গোঁফ—যে দিক্ দিয়ে দেখ, একেবারে বিপরীত।

ফরাসীর মিহি গলা, মিষ্টি ভাষা, হো হো করে হাসে,—পথ চলে মাড়িয়ে মাড়িয়ে, হাতের ছড়ি দিয়ে ছু'পাশের ঘাসগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, এখানে দাঁড়ায়, ওখানে দাঁড়ায়, ফুটপাতের উপরেই চেয়ার টেবিল পেতে হৈ হৈ করে কফি খায়! সারা দেশটি যেন একটা 'ইডেন্ গার্ডেন'—সবাই যেন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

তারই পাশে জার্ম্মাণী—মানুষ ত নয়, যেন এক একটি মস্ত মস্ত ইঞ্জিন্। রাস্তার ছু'ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, যেন এক একটা হাবড়ার ইষ্টিশান্—তারই সুমুখ দিয়ে মস্ত মস্ত মানুষগুলো ইঞ্জিনের মতন ছুম্ ছুম্ করে চলেছে। কথা যা বলে, তার সবই তালব্য 'শ' মূর্দ্ধণ্য 'ষ' 'হ', 'ট' আর 'ড'। যেন একটা একটানা 'হ—শ্—শ্—শ্—ষ্—ষ্—ষ্—ট' 'ড্—শ্—শ্—শ্—ষ্—ষ্—ষ্—হ'! কি রকম জানো? চলন্ত ইঞ্জিনের চোঙের 'ভস্ ভস্' আর চাকার বিকট 'ঘটাঘট্' এক সঙ্গে মিলে যেন গজরাচ্ছে। অবশ্য জার্ম্মাণদের সে ভাষা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। শ' র পাশে এমন ট' টি বসিয়ে দেবে, যে কথার মানে একেবারে বদ্‌লে যাবে, তুমি তা টেরও পাবে না। তার ওপর তার ভাষায় সে কি ঝাঁঝ! যেন সোডার বোতল! ব্যার্লিনের পথে যদি তোমায় একজন নমস্কার ক'রে বলে, "গুঘুটন্ মর্গ্ন্" তা'হলে হঠাৎ মনে হবে, একটা প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা দৈত্য, তোমায় ঘুঁসি উঁচিয়ে বল্‌ছে, "ভাগো হিঁয়াসে!"

এ হেন জার্ম্মাণীতে এসে, এক বেচারা ফরাসীর যা দুর্দ্দশা! বল্‌ছি।

ফরাসীদেশে তখন মহা বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে। ঘরোয়া লড়াই, তার উপর ঘরে নেই খাবার। দেশের লোক ছু'বেলা ছেড়ে, এক বেলাও খেতে পায় না।

ওনোরে একদিন ঘরে ফিরে দেখ্‌লে, একটি যবের কণাও নেই। দিনের পর দিন, নদীর ধারে বসে বেহালা বাজালে, যে ঘরের খাবার ফুরিয়ে যেতে একটুও দেরী লাগে না, এ কথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

নানা ভেবে চিন্তে, বেহালাখানা দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে, ওনোরে শেষটায় একদিন চল্‌লো চাক্‌রীর চেষ্টায়। এ গাঁ, সে গাঁ, এ শহর, সে শহর করে ওনোরে হঠাৎ দেখ্‌লে, সে ফরাসীর সীমা ছাড়িয়ে, একেবারে জার্ম্মানীর ব্যার্লিন্ শহরের এক রাস্তা দিয়ে চলেছে! এ ক'দিন তার খেয়ালই ছিল না, কোন্ দিকে সে চলেছে। বড় বড় রাস্তা, বড় বড় ইমারৎ,—লোকজন কারো মুখে এতটুকু ছুঃখের ছায়া পর্য্যন্ত নেই। বেড়ে দেশ ত! পথে একজনকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "হ্যার্ সাহেব, * একটা চাক্‌রী টাক্‌রী মিলবে এখানে?" লোক্‌টা একবার গোঁফজোড়াটা চুম্‌রে নিয়ে বল্‌লে, "চাক্‌রী?—বহুৎ! —পণ্টনমে নাম লেখাও!" ওনোরে অবাক্! এক কথায় এখানে চাক্‌রী! ওয়াহ্!—ওয়াহ্!—লোকটার কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়ে, সে চল্লো পল্টনে নাম লেখাতে। খানিক দূর গেলে লোকটী তাকে ডেকে বল্‌লে, "ওহে ছোক্‌রা

গোঁফ্ জোড়াটা চুম্‌রে নিয়ে বল্‌লে 'চাক্‌রী?—বহুৎ"

* ইংরাজদের যেমন জার্ম্মাণদের তেমনি Herr.

শোন, শোন, তুমি জার্ম্মান্ বলতে পার?" ওনোরে বল্‌লে, "না তা তো পারি না!" লোকটা খানিক ভেবে বললে, "তা হলে বাপু, তোমার এক কাজ কর্‌তে হবে। আমাদের কাইজার ভালো মানুষ, কিন্তু তাঁর এক খেয়াল, প্রায়ই তিনি প্রত্যেক সৈনিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন তিনটি কথা—'তোমার বয়েস কত?'—'কতদিন কাজ কর্‌ছো?' আর 'এখানকার ব্যবহার, আর জীবন ভালো লাগছে ত?' এই তিনটি কথার জবাব তোমায় জার্ম্মান ভাষায় শিখে নিতে হচ্ছে।" ওনোরে বল্‌লে, "এই?—কেন পার্‌ব না?" এই বলে, তার কাছ থেকে জবাব তিনটে কাগজে টুকে নিলে,—'একুশ বছর,' 'এক বছর' আর 'দুইই।' বুদ্ধিমান ছেলে, দু'এক মিনিটেই কথা তিনটে তার একেবারে মুখস্থ হয়ে গেল।

সকাল বিকেল কুচ্ কাওয়াজ—দিনে রাত্রিতে ঘুম, তার ওপর তোফা খাওয়া দাওয়া—সৈন্য নয় ত, যেন সব জামাই! ওনোরে মনে মনে বল্লে, "এমন দেশ থাক্‌তে কিনা গেলুম ফরাসীতে জন্ম নিতে! দুর্ব্বুদ্ধি! দুর্ব্বুদ্ধি!" জার্ম্মানীর সৈন্যদের তখন বেজায় খাতির। হঠাৎ একদিন জার্ম্মানী বুঝতে পেরেছে, তার মোক্ষ, দর্শনেও নেই, বিজ্ঞানেও নেই, আছে সৈন্যবলে। তাই যেন সে চোখ বুজে দিনরাত মুগুর ভাঁজছে।

একদিন খবর এলো, "সব তৈরী হও, কাইজার আস্‌ছেন দেখা ক'র্‌তে।" কোর্ত্তা পাৎলুন, টুপি, এঁটে সারি সারি সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে গেল। কাইজার সবাইকে ওই একই কথা জিজ্ঞেস করছেন, পরে পরে, "বয়েস কত?"—"কতদিনের চাক্‌রী?"—"এখানকার জীবন আর ব্যবহার ভাল লাগছে ত?"—সবাই এক রকমের জবাব দিয়ে যাচ্ছে। এইবার ওনোরের পালা। কপাল আর বলে কাকে? কাইজার এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটাই আগে করে ফেলেছেন, "কতদিন কাজ করছো?" ওনোরে চট্‌পট্ বলে দিলে প্রথম প্রশ্নের জবাব, "একুশ বছর!" তার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে কাইজার বল্‌লেন—"তোমার বয়েসের থেকে ত তোমায় অনেক ছোট দেখায়!—বয়েস কত হবে?"

এইবার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব—"এক বছর।"

"এক বছর!" তার মানে? পাগল নাকি?—না আমিই পাগল হ'লুম?"

এইবার শেষ প্রশ্নের জবাব—"দুইই"।

হাজার ভালো মানুষ হোক্, রাজা-বাদশা মানুষ ত'—তারই মুখের উপর, এতগুলো লোকের সুমুখে পাগল বলা! কাইজারও ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লেন না। হঠাৎ ওনোরে দেখলে,

দুটো ষণ্ডা ষণ্ডা লোক তার দিকে তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। ওনোরে অবাক্! কাইজারের চোখদু'টো দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে! চার দিকে এক মহা শোর-গোল পড়ে গেছে। মনে হচ্চে, নাকের ভেতর তাদের খাড়া খাড়া গোঁফ ঢুকে গিয়ে এতগুলো লোক যেন একসঙ্গে হেঁচে হেঁচে অস্থির হ'য়ে পড়্‌ছে। কিন্তু এ ষণ্ডামার্ক লোক দুটো যখন দড়ি দিয়ে ওনোরের সর্ব্বাঙ্গ আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেল্‌ল, তখন তার আর সন্দেহই রইল না, যে তাকে নিয়েই এত কাণ্ড! বেচারা ওনোরের তখন তার নিজের ভাষা বলা ছাড়া আর উপায় কি? সব কথা সে কাইজারকে খুলে বল্‌লে। কাইজার ফরাসী বুঝতেন ভালো রকমই।

সবাই হেসে অস্থির! ভালো মানুষ কাইজার ওনোরেকে মাপ করে দিলেন।

বড় হয়ে তোমরাও জার্ম্মাণীতে গিয়ে এমন মুস্কিলে না পড়, তবেই রক্ষে!

বার গণনা

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

আমরা রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এই কয়েকটি বারের নামে দিন গণি; এই গণনা কবে সুরু হইয়াছিল, বলিতেছি। অতি প্রাচীনকালে বেদ রচনার যুগে বারের নাম পাওয়া যায় না; তখন প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, প্রভৃতি তিথি দিয়া দিন গণনা হইত, আর এখনও ভারতের কোন কোন স্থানে তিথি দিয়া দিন গণনা চলিত আছে, ও অতি অশিক্ষিত চাষারাও তিথি দিয়া দিন গণে। বেদের যুগের সাহিত্যে যেমন স্পষ্ট ধরা যায় যে তিথি দিয়া দিন গণনা হইত, ঠিক সেইরূপ স্পষ্টভাবেই প্রাচীন বৌদ্ধদের সাহিত্য পড়িলেও ধরা যায়, যে দু হাজার আড়াই হাজার বছর আগে পর্য্যন্ত এদেশে তিথি দিয়াই দিন গণা চলিত ছিল। মহাভারতখানা খুব বড় বই, আর সে বড় বইখানির অনেক স্থানে দিনের গণনা আছে; আর সেই গণনা হইয়াছে তিথি দিয়া,—বারের নাম করিয়া নয়।

আমাদের প্রাচীনকালের কোন্ গ্রন্থ ক্‌বেকার লেখা, তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করিয়া ধরা যায় নাই; তবে যেখানে নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে, যে অমুক-অমুক

গ্রন্থ ১৯২৮ বৎসরের আগেকার, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের আগেকার, সেরূপ কোনও গ্রন্থে বারের নাম নাই,—সে সকল গ্রন্থে কেবল তিথি দিয়াই দিনের গণনা আছে।

১৯২৮ বৎসরের আগে পর্য্যন্ত বার গণনা ছিল না; তবে কবে কি অবস্থায় এই বার গণনা চলিত হইল, ইহাই হইল প্রশ্ন। আমরা জানি ইংরেজিতে রবির নাম Sunday, সোমের নাম Monday, প্রভৃতি চলিত আছে, আর ঐ গণনা ইংরেজেরা এদেশে আসিবার আগে ও এদেশ চিনিবার আগে চালাইতেন। সারা ইউরোপেই এই বারের নামে দিন গণনা অনেককাল হইতে চলিত আছে, আর সেই গণনার সঙ্গে আমাদের এই নূতন রকমের গণনা মিলিয়া যায়। কেমন করিয়া মিলিল? আমরা কি এই গণনা পরের কাছে ধার করিয়া পাইয়াছিলাম?

একথা অতি সত্য, যে মুসলমানেরা ও ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া তাহাদের প্রভাব বাড়াইবার বহুকাল আগে হইতে ভারতের পণ্ডিতদের সঙ্গে ইউরোপের ও পশ্চিম এসিয়ার পণ্ডিতদের পরিচয় ছিল, ও পরস্পরের মধ্যে অনেক বিদ্যার আদান-প্রদান হইত। প্রাচীনকালে ইহাতে কোনও দেশের পণ্ডিতেরা লজ্জিত হইতেন না, বরং বিদ্যার বিনিময়ে বিদ্যালাভ করিয়া সুখী হইতেন। আমাদের দেশের অনেক বিদ্যা গ্রীকেরা ধার করিয়া নিয়াছিল। ইউরোপীয়দের মত, বা পশ্চিম এসিয়ার লোকেদের মত ভারতবর্ষের লোকেরা জলে-স্থলে, নানা দেশে গিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত না; কেননা এদেশে খাদ্য ছিল যথেষ্ট। প্রয়োজনের তাড়নায় জলে-স্থলে যাহারা নানা দেশে গিয়াছিল, তাহারা পথ ঠিক রাখিবার জন্য আকাশের নক্ষত্রগুলি যত মনযোগ করিয়া দেখিয়াছিল ও সেগুলির গণনা করিয়াছিল, এদেশে তাহা করার প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য এদেশে একদিকে যেমন নানা রকমের বড় বিদ্যা নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেইরূপ আবার অন্যদিকে জ্যোতিষের বিদ্যা পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের মত খুব অধিক হয় নাই।

এক দেশে যদি ভাল শস্য হয়, আর অন্যদেশে পাওয়া যায় ভাল ভাল পাথর, তাহা হইলে শস্যের দেশের লোকেরা যদি পাথরের দেশে শস্য দেয় ও

নিজেদের ঘর-বাড়ীর জন্য পাথর আনে, তবে লজ্জার কথা হয় না। পশ্চিম অঞ্চলের টলেমির গণনা ধরিয়া সারা ইউরোপে রবি, সোম, প্রভৃতি ধরিয়া বার গণনা চলিয়াছিল। এই টলেমির বার-গণনা যে রোমানদের মধ্যে ছিল, সেই রোমানেরা খৃষ্টান হইবার পরে, পশ্চিম এসিয়ার ও ভারতে নানা বাণিজ্যের সম্পর্কে আসিয়াছিল। প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দে রোমানদের দিনার নামে টাকা এদেশে চল হইয়াছিল—পুরাণ প্রভৃতিতে আমরা সেই দিনার নাম পাই। এই রোমানদের সংস্পর্শে আমরা বার-গণনা প্রথমে পাইয়াছিলাম বলিয়া অনুমান হয়।

কেন যে ইউরোপে রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত, পরে পরে বারের নাম ধরিয়া দিন গণনা চলিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া নিলে ধরিতে পারিব, যে আমাদের বার-গণনা বিদেশের আমদানি। নীচে একটা চিত্র দিতেছি, আর সেই চিত্রটি দিয়া কথাটি বুঝাইতেছি।

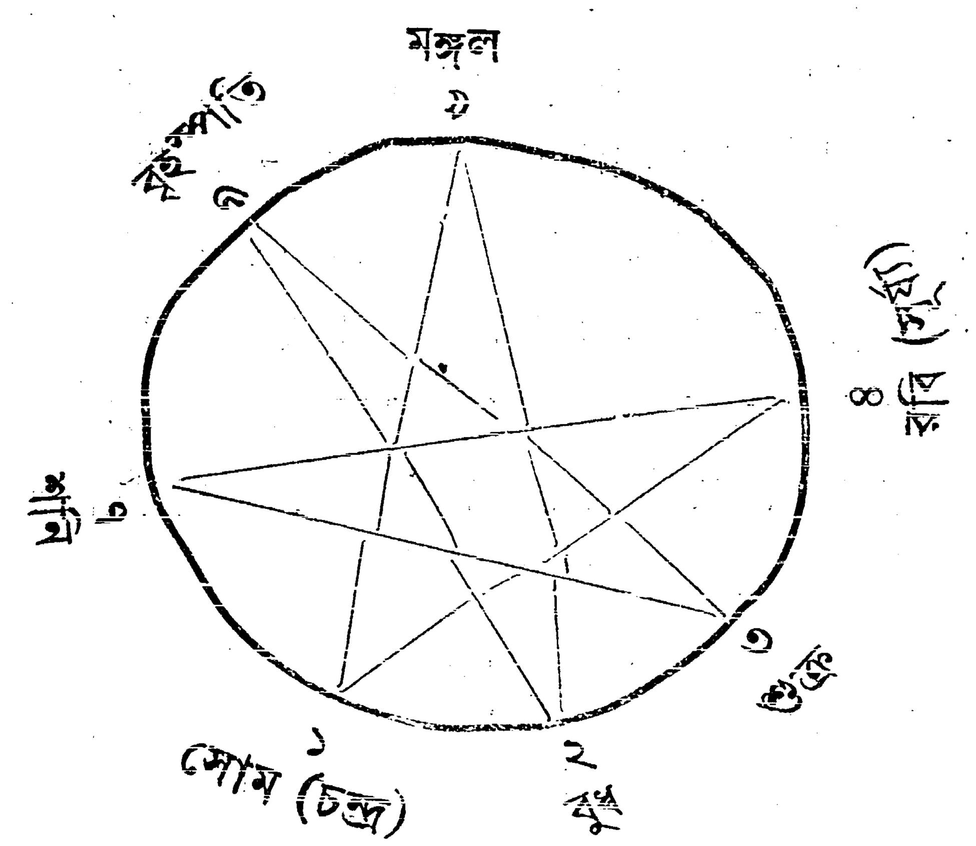

টলেমিক জ্যোতিষের বিচারে, কোন্ গ্রহ পৃথিবী হইতে কতদূরে, তাহা একটি বৃত্তের উপরে ডাইন হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁয়ের দিক পর্য্যন্ত, সোম প্রভৃতির নাম লিখিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিচারে সোম হইল পৃথিবীর অতি কাছে,

তাহার পর বুধ, তাহার পর শুক্র, তাহার পর রবি, তাহার পর মঙ্গল, তাহার পর বৃহস্পতি, আর তাহার পর অতি দূরে শনি। বিদেশী জ্যোতিষের এই গণাটা ভারতের পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণ মানেন নাই; অথচ দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে বার-গণনার সময়ে টলেমির হিসাবের ওলট্-পালট্ গণনা বুঝাইতেছি। দেখিতে পাইবে যে, পৃথিবী হইতে একটা কৌশলে কয়েকটি রেখা টানিয়া গ্রহগুলির গায়ে গায়ে যোগ করিয়া দেওয়া আছে। এটা হইল বিদেশের যাদুবিদ্যার একটা রেখাক্ষেত্র। তাহারা মনে করিত, যে যদি দূরত্ব ধরিয়া পরে পরে গ্রহের নাম করা যায়, তবে অমঙ্গল ঘটে; সেইজন্য যাদুবিদ্যার রেখাপাত ধরিয়া, পৃথিবী হইতে প্রথমে হাত চালাইয়া ধরিতে হয় রবিকে, তাহার পর রবি হইতে যাইতে হয় সোমে, সোম হইতে মঙ্গলে, মঙ্গল হইতে বুধে, বুধ হইতে বৃহস্পতিতে, বৃহস্পতি হইতে শুক্রে, আর শুক্র হইতে শনিতে। গ্রহের দূরত্বের গণনায় আমাদের সঙ্গে বিদেশের গণনায় মিল নাই, অথচ বিদেশের ওলট্-পালট্ পর্য্যায় ধরিয়া, ঠিক বিদেশীদের মত বারের নাম করা আছে। তাহা ছাড়া, রোমানদের মত রবিবারকে আমরা এক সময়ে Lord's day বা 'ভট্টারক বাসর' বলিতাম, আর ইটালী ভাষায়—Geovedi নামটা এদেশের জ্যোতিষীদের গ্রন্থে 'জীববাসর' নামে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে আমাদের অনুমান হয়, যে বার দিয়া বা গ্রহ দিয়া দিন গণনা বিদেশের আমদানি। আগেই বলিয়াছি, ইহাতে পূর্ব্বপুরুষদের কলঙ্কের কথা কিছুই নাই; তাঁহাদের অনেক বড় বড় বিদ্যা বিদেশীরা নিয়াছে ও তাহা শিখিয়া জ্ঞানী হইয়াছে।

অরুণ-আলো

(শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম্-এ, বি-এল্)

(১৫)

কত বিকট স্থান পার হ'য়ে,—সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে,—কড়ির পাহাড়, রূপোর পাহাড়, সোণার পাহাড়, মুক্তার পাহাড়, হীরার পাহাড়, আর স্বপ্নের পাহাড় পার হ'য়ে—সবুজ পাখী, হলদে সাপ ও সাদা মানুষের দেশ পার হ'য়ে,—রাক্ষসদের দেশ পার হ'য়ে, এবং

ক্ষোক্কসদের প্রদেশ পার হ'য়ে,—এস্কিমো আর নিশীথসূর্য্যের স্থান পার হ'য়ে,—অরুণ ও পরী একদিন সন্ধ্যার সময় এসে উপস্থিত হ'ল এক গহন অধিত্যকায়।

হঠাৎ শব্দ এল—"খটাখট্ খটাখট্ টুপ্ টুপ্ খটাস্।"

বনের ছোট্ট পথ দিয়ে একটী ছোট্ট বামন, কালো খরগোসে চ'ড়ে অরুণের দিকে ছুটে আস্‌চে, আর শব্দ হ'চ্চে,—খটাখট্ খটাখট্ টুপ্ টুপ্ খটাস্।

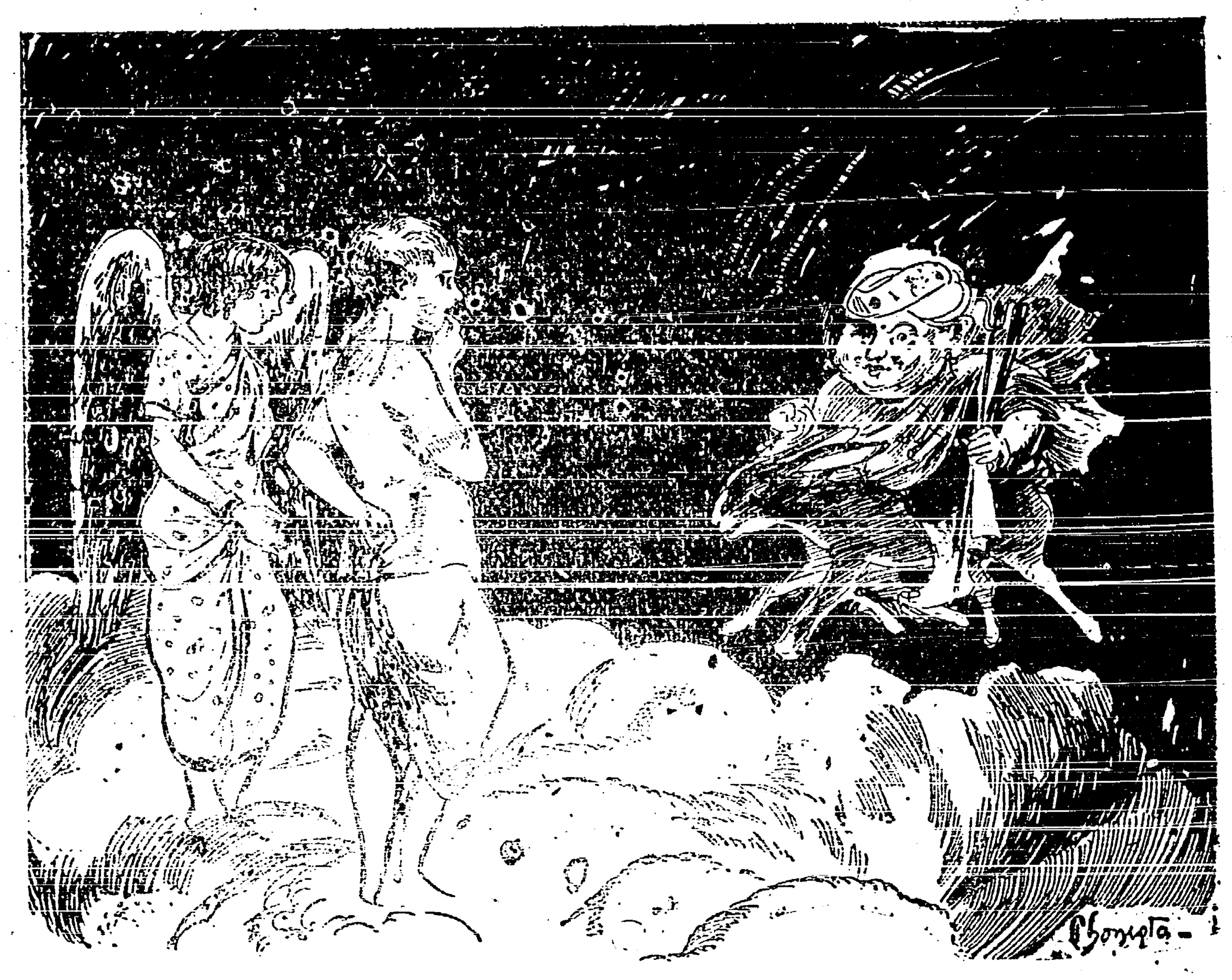

অরুণের দিকে ছুটে আস্‌চে…

বামনটা এক হাত লম্বা, এক হাত চওড়া এবং তার মুখটা প্রকাণ্ড, চোখগুলি ছোট ছোট, কাণ দুটো বিশ্রী, নাকটী সুন্দর; তার কপালে লাল তিলক, কাণে বনফুল, মাথায় টুপি, পায়ে খড়ম, গায়ে নামাবলী, পরনে গাছের ছাল। এক হাতে লতার লাগাম, অন্য হাতে একটী ত্রিশূল ও দুইটী বন্দুক।

খরগোসটী কালো,—ব্যস্, আর কিচ্ছু না!

এসেই বামন অরুণকে নমস্কার কর্‌ল, পরীকে প্রণাম কর্‌ল। তাকে দেখে অরুণ হ'য়েছে হতভম্ব, আর পরী অন্যমনস্ক।

বামন বল্‌লে—"অরুণ, আমি বড়ই অদ্ভুত।"

অরুণ বল্‌লে—"হাঁ"

আর পরী বল্‌লে—"বামন, তোমার ছল বুঝেছি।"

বামন বল্‌লে—"অরুণ, তোমার বন্ধু আমি, আমার সঙ্গে চলো।"

অরুণ বল্‌লে—"হাঁ"

আর পরী বল্‌লে—"বামন, তোমার রূপ জেনেছি।"

বামন বল্‌লে—"অরুণ, চল দুজনে যাই, এ পরী থাক্।"

অরুণ বল্‌লে—"হাঁ"

আর পরী বল্‌লে—"বামন, তোমার রক্ষা নাই।

ব'লেই পরী মৃদুমন্দ গতিতে এগিয়ে এসে, বামনের পানে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টির সম্মুখে বামনের শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল, অত্যন্ত অদ্ভুত স্বরে, এক নিশ্বাসে সে ব'লে ফেল্‌ল—"অরুণ, অরুণ, বার বার বল্‌ছি, আবার বল্‌ছি, চীৎকার ক'রে বল্‌ছি,—এই পরীটাকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দাও।"

এদিকে পরী এক ঝাপে খরগোসের উপর চ'ড়ে বসেই হট্ হট্ ক'রে খরগোস চালিয়ে দিল। এক মুহূর্ত্তে খরগোস, পরী আর বামনকে নিয়ে কোথায় চলে গেল, অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

পরীর এ সব কি কাণ্ড! অরুণ রাগে অস্থির, দুঃখে ম্লান, আর বিস্ময়ে ভরপুর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

ছি, ছি, ছি, পরীটা কি বিশ্রী! কোথায় সে অরুণকে সাহায্য করবে,—না এভাবে বাধা দিচ্ছে! নিজেও চ'লে গেল, আর দয়ালু বামনকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। যাক্‌গে, একাই পশ্চিমে যাই!

কাজেই অরুণের ম আজ সহস্রগুণ বেশী বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেচে; সে বারবার আলোকে ডেকে ডেকে কাঁদচে,—"ও আলো, আলো, ভাগ্নী, বন্ধু, ও বন্ধু, তুমি কোথায়? কোথায় তুমি?"

একটু পথ এগিয়ে গিয়ে অরুণ দেখ্‌ল,—অবাক্ কাণ্ড!

পথের পাশে পরী ঠিক মা দুর্গার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পায়ের কাছে মহিষাসুরের মতই অক্ষম ভাবে প'ড়ে রয়েছে,—একটা পোকা!

ওহো, এ যে সেই পোকা, যাকে অরুণ মেরেছিল।

পরী বল্‌ল—"অরুণ, তুমি বুঝলে না, কিন্তু আমি বুঝেছি। বামনের ছদ্মবেশে তোমার

সাথে এই পোকা চলেছিল! এ তোমার মহাশত্রু, নিশ্চয়ই তোমাকে ভুলপথে বিপদের মুখে, নিয়ে যেত।"

পোকাটা মহাক্রোধে গস্ গস্ ক'রে বল্‌ল—"হুঁ প্রতিহিংসা নিতুম্।" উঃ, কি ভীষণ!

অরুণ পরীর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল, যেন কত কি বলতে চায়! কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না। অরুণ শুধু বল্‌লে—"পরী, তুমি কি চমৎকার!"

অথচ এই পরীকেই সে একটু আগে কতই না দোষ দিচ্ছিল!

পরী এসে অরুণের চুলগুলিকে বিন্যস্ত ক'রে দিল।

(১৬)

এইবার অরুণ পোকাটাকে বল্‌ল—"আরে পোকা, তুই আমায় কত দুঃখ দিবি?"

পোকা। "কেন আমায় হত্যা করেছিলে? কোথায় গেল তোমার আলো, কোথায় গেল তোমার স্বর্গ?"

অরুণ ধীর-গলায় প্রশান্তচিত্তে জানাল—

"কিন্তু, পোকা, তোমায় আমি ক্ষমা কর্‌লাম্।"

ধন্য অরুণ! দুঃখের আগুনে পুড়ে তোমার অন্তরটী পবিত্র হ'য়েছে।

পোকা তবুও তার সেই পুরানো কথাই বলে, "কেন আমায় মেরেছিলে?"

অরুণ। "হাঁ, সেটা অন্যায় হ'য়েছিল। পাপ হ'য়েছিল। কিন্তু ভাই, প্রায়শ্চিত্ত ও ত হ'য়েছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আলোকে ফিরে পাই, বা না পাই, দুঃখের শেষ হোক্, বা না হোক্—আমি তোমায় ক্ষমা করেছি, তুমিও আমায় ক্ষমা কর।"

ধন্য অরুণ! তুমিই ঋষি, ছোট্ট ঋষি!

তারপর, সেই অজানা অরণ্যের মাঝে, আকাশের নীচে, পশ্চিমের পথে, আমাদের অরুণ আর পোকা পরম বন্ধুভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল, পাখীরা গান গাইল। ফুলেরা সৌরভের স্রোত ছড়িয়ে দিল। চারিদিকে দেবকন্যারা উঁকি ঝুঁকি দিলেন, দেবতারাও চাইলেন!

পোকা বল্‌লে—"অরুণ, তুমি আলোকে পাবে,—এই নাও সোণার শেকল, আগুনের খড়্গ আর পক্ষিরাজ ঘোড়া। যাও বীর, আলোকে উদ্ধার করগে!"

ব'লেই পোকা অন্তর্হিত হ'ল।

অরুণ আর পরী দেখলে—তাদের সম্মুখে সোণার শেকল, আগুনের খড়্গ, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া র'য়েছে!

পরী পুনরায় তার দুষ্টুমি আরম্ভ করল,—বল্‌ল—"কি অরুণ, এখন তুমি আমায় বিয়ে কর্‌বেই কর্‌বে ?"

অরুণ ভেবেচিন্তে উত্তর দিল—"না, পরী, তা হয় না।"

পরী হাসে আর বলে—"কেন হয় না, নিশ্চয়ই হয়।"

অরুণ—"না।"

পরী—"হাঁ।"

অরুণ—"না, না, সময় নাই।"

পরী—"হাঁ, হাঁ, সময় হবে।"

এদিকে পক্ষিরাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কারণ দাঁড়িয়ে থাকা তার অভ্যাস নয়। সে চায় উড়্‌তে, কেবল উড়্‌তে।

অতএব অরুণ ও পরী দুই লাফে পক্ষিরাজের পিঠে চড়্‌ল। অরুণের একহাতে সোণার শেকল, অন্য হাতে আগুনের খড়্গ, মনে অগাধ আনন্দ!

পক্ষিরাজ আকাশে উড়্‌ল। মেঘের দেশের প্রশান্ত পথগুলি ধ'রে ধ'রে পক্ষিরাজ হু হু করে উড়ে চল্‌ল।

পক্ষিরাজ আলোর কাছে উড়ে চলেছে!

(১৭)

ভূতপশুদের মন্দিরের দরজায় পাথরের উপর ভর দিয়ে, আলো দাঁড়িয়ে রয়েছে,—অশ্রুজলে তার চোখ ঝাপ্‌সা।

একান্তমনে সে অরুণ মামার কথা ভাবচে, এমন্ সময়ে পশুদের দেবতা ভিতর হ'তে ডাক্‌লেন—"ও পূজারিণি, আমার খাবার দেও, আমার মাংস দাও, বড্ড ক্ষিদে।"

আলো একান্তমনে অরুণমামার কথা ভাবচে, তার কাণে একটী কথাও গেল না।

দেবতা আবার ডাক্‌লেন—"ও পূজারিণী, আমার জল দাও, রক্ত দাও, বড্ড পিপাসা।"

আলো অরুণমামার কথাই ভাবচে, সে কিছুই শুন্‌ল না।

দেবতা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'লেন, হুঙ্কার ছেড়ে বল্‌লেন—"ওরে, ও পাপিয়সী আলো, তোর কি কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই ?"

এই ঘনঘোর হুঙ্কারেও আলোর চৈতন্য হ'ল না!

দেবতা এইবার শাপ দিলেন—"তবে শোন্, অরে পাপিয়সী আলো, পাগলিনী পূজারিণি! যার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে তুই আমায় অবহেলা কর্‌লি, অপমান কর্‌লি, সে তোকে মনে রাখবে না।"

একি কথা! ছোট্টমামা অরুণ, ছোট্টভাগ্নী আলোকে ভুলে রইবে? এ ও কি সম্ভব? যে অরুণ আলোর জন্য অরণ্যে, কান্তারে বাধা পর্ব্বতে, মহাসমুদ্রে ছুটে বেড়িয়েছে, অজস্র বিপদ তুচ্ছ করেছে, সেই অরুণ সেই আলোকে ভুলে রইবে? যে অরুণ দিকে দিকে ডেকে ডেকে, জিজ্ঞাসা করেছে, "আলো কই, আলো কই?"—সেই অরুণ, সেই আলোকে ভুল্‌বে? যে অরুণ পক্ষিরাজে চড়ে বিদ্যুতের বেগে আলোর কাছেই ছুটে আস্‌চে, সেই অরুণ আলোকে মনে রাখবে না?

এ ও কি সম্ভব? এ ও কি বিশ্বাস হয়? কিন্তু হায়, এযে দেবতার অভিশাপ!

আলো কিছুই শুন্‌ল না, কিছুই জান্‌ল না, কিছুই বুঝল না। সে একান্তমনে অরুণের ধ্যান কর্‌চে,—যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখচে। দেবতার কথার একটী বর্ণও সে শুন্‌ল না!

(ক্রমশঃ)

বাল্য-স্মৃতি

(শ্রীগোপিকা কান্ত দে, বি-এ)

পল্লী আমার সোণার ভবন,
চরম সুখের ঠাঁই,
এমন সুখের দেশটি কোথাও
খুঁজিয়া নাহি পাই।
এই পল্লীর সবুজ বক্ষে
খেলেছি কতই খেলা,
বাল্যের সারা জীবন ধরিয়া
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
ভাবি নাই কিছু, করি নাই কিছু,
শুধুই আমোদে মাতি'
নিরালায় বসি' গড়েছি সুখের
স্বপন, দিবস-রাতি।
নদী-সরোবরে নামিয়া পুলকে
করেছি সন্তরণ,
শৈশব-সাথী সঙ্গে সদাই
কতই না আলাপন!
উড়ায়েছি ঘুঁড়ি, সুনীল গগনে
ক্ষিপ্ত বায়ুর কোলে,

মনে হ'ত যেন, অসীম পুলকে
দোল খেয়ে খেয়ে দোলে।
অপরের ঘুঁড়ি কাটিবার তরে,
চেষ্টা করেছি কত,
শেষটা নিজের হারায়ে ফিরেছি
দারুণ মর্ম্মাহত।
সবুজ মাঠের কোমল অঙ্গে
দিনরাত ছুটোছুটি,
কভু বা আছাড় খাইয়া উঠেছি,
কখন বা লুটোপুটি।
'নষ্টচন্দ্রে' ছাড়ি নাই কভু
শশাও করিতে চুরি,
বেমালুম মোরা পড়েছি সরিয়া,
সাবধানে গুড়ি গুড়ি।
পাঠশালে যেতে করিয়াছি হেলা
গুরুম'শায়ের ভয়ে,
'মার্ব্বেল' লয়ে খেলিয়াছি শুধু,
ক'জনে মিলিত হ'য়ে।
পরদিন গুরু সুধালেন,—'কেন
আস নাই পাঠশালে,'
বল্লাম হেসে, এসেছিল জ্বর
ঠিক আসিবার কালে।
পল্লীর বুকে, ছিনু মোরা সুখে,
নাহি ছিল কোন ভীতি,
পরম আরামে বাল্য-জীবন
কাটায়েছি নিতি নিতি।
কোথায় রে আজ, সে সব দিনের—
সেই জীবনের কথা!
করিতে স্মরণ, সেই পুরাতন
পাই যে পরাণে ব্যথা।

কে কত দৌড়াইতে পারে

গত সংখ্যার 'রামধনু'তে তোমরা দৌড়বাজপায়রার কথা শুনিয়াছ। জানোয়ারদের মধ্যে কে কত দৌড়াইতে পারে, বল দেখি! এ বিষয়ে সবচেয়ে সেরা হইতেছেন, আমাদের কচ্ছপ ভায়া। ঘণ্টায় তিনি ৫০ গজ ছুটিতে পারেন, অর্থাৎ এক ঘণ্টায় 'ক্যাল্‌কাটা' ফুটবল গ্রাউণ্ড টার অর্দ্ধেকটা পথ যাইতে পারেন। সাধারণ ঘোড়া দৌড়ায় ঘণ্টায় ১৩।১৪ মাইল, ভাল ঘোড়া যায় ত্রিশ মাইল। হরিণ বাবাজী পা ফেলেন আরও তাড়াতাড়ি—ঘণ্টায় ৫০ মাইল। কিন্তু সবার উপর টেক্কা মারেন বাঘ। তিনি দৌড়ান ঘণ্টায় ৫৫ মাইল। অর্থাৎ, তোমাকে যদি বাঘে তাড়া করে, তো দার্জ্জিলিং মেল, শিলং মেল, ঢাকা মেল, চাটগাঁ মেল—কোন মেলে চড়িয়াই বাঘকে পিছনে ফেলিতে পারিবেনা। পার, যদি বোম্বাই মেল কিংবা পাঞ্জাব মেলে চড়। কিন্তু তবুও, ব্যাঘ্র মহাশয় তোমাকে প্রায় বর্দ্ধমানের কয়েক ষ্টেশন আগে পর্য্যন্ত সমানে পিছন পিছন তাড়াইয়া যাইবে!

২১১ বছর জেল

বুক্‌ম্যান জাতিতে জার্ম্মান, বয়স ৩৭ বছর। সোণার চাঁদের গুণ অনেক। এই বয়সেই, তিনি মাত্র ৫০০টী ডাকাতি করিয়াছেন। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট এই পাঁচশোটী অপরাধের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করিয়া যে জেল ঠুকিয়া দিয়াছেন, তাহা একত্র করিয়া দাঁড়াইয়াছে ২১১ বছর! লোকটা কি জেলের জের টানিতে আরও বার দুই পৃথিবীতে আসিবে নাকি?

জীবন্ত মাটী

জীবন্ত আর জড়—এই দুইরকম জিনিষের কথা আমরা জানি। জড় বলিতেই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে মাটীর কথা। মাটী প্রাণহীন, নির্জ্জীব, এই রকমই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু যদি একটা খুব ভাল অণুবীক্ষণ (মাইক্রস্‌কোপ) দিয়া দেখা যায়, তবে আর মাটীকে প্রাণহীন বলিতে সাহস হইবে না। এককণা মাটীর মধ্যে লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য প্রাণী বাস করে। ইহাদের বলে জীবাণু। ব্যাকটিরিয়া বলিয়া এক রকম জীবাণু আছে। একটা চায়ের চামচের এক চামচ মাটীর মধ্যে এই ব্যাকটিরিয়াই থাকে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ। তাহা ছাড়া, এই ব্যাকটিরিয়ারই মত হাজার হাজার রকমের জীবাণু ঐ মাটীটুকুর মধ্যে পাওয়া যাইবে।

পশুপক্ষীর পরিচ্ছন্নতা

আমরা শরীর সুস্থ থাকিলে, রোজই একবার করিয়া স্নান করি, কেননা নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে কে না চায়? শুধু যে আমরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চাই, তা নয়, পশুপক্ষীদেরও এ অভ্যাসটা আছে। চড়ুই পাখী, মুরগী প্রভৃতিকে নিশ্চয়ই তোমরা ধূলার মধ্যে গা ছাড়িয়া ডানা নাড়িতে দেখিয়াছ। আসলে তারা কি করে তাহা তোমরা বলিতে পার? ধূলার মধ্যে স্নান করে। তাহাদের গায়ে কীট, পতঙ্গ যদি কিছু পড়ে তো, ইহাতেই সে সব দূর হইয়া যায়। তারপর ঠোঁট দিয়া পালকগুলিকে ঠিকমত করিয়া লইলেই সব আপদ চুকিয়া গেল। যে সব পাখী জলঘেঁষা, তাহারা আবার ধূলার চেয়ে জলটাই পছন্দ করে বেশী। স্নানের জন্য জলটী তাহাদের চাই-ই।

বিড়াল প্রভৃতি জীব গা পরিষ্কার করে জিব দিয়া চাটিয়া—জিবটাকে দিয়া দিব্যি বুরুষের কাজ চালাইয়া লয়। কুকুরের গা ঝাড়ার প্রণালীটাও ভালই—ধূলার উপর গড়াগড়ি দেয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

পা	ট	না	×	ভ
না	গ	×	ব	ক
×	র	বা	হু	ত
রা	×	ক	ল	×
ম	হ	ল	×	কী
ধ	র	×	ক	চ
নু	×	ন	র	ক

(২) কপি, পিক; লতা, তাল।

যাঁহাদের উত্তর সম্পূর্ণ নির্ভুল হইয়াছে :—

সত্যসুন্দর ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বীণাপাণি দেবী, আভারেণু দেবী, সুনন্দা দেবী, মণ্টু, কপি, বীণা, বিমলবিহারী বসু, ধ্রুবজ্যোতি সেন, অরুণা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, স্বর্ণলতা রায়, অনিলকৃষ্ণ মজুমদার, অমিয় কুমার বরাট্, অখিল গুপ্ত, জ্যোৎস্না সেন, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবপদ সেন, ধামরাই যশোমাধব সাহিত্য-সঙ্ঘের সভ্যগণ, কমলা, হরিমোহন, হংস, কালো, জিতেন, বলাই, বীরেন, দিলীপ, প্রতীপ, সুনীপ, নীতিপ, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, পিটু ও মাণ্কে, কল্যাণী দত্ত, অরুণকুমার ঘোষ, বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, সদানন্দ সাহা, মাখনলাল অধিকারী, হিমাংশু কুমার নিয়োগী, হৃষিকেশ কুণ্ডু, অন্নদা প্রসাদ, প্রমোদ, সুশীল, হরিপদ, তারাপদ, চৈতন্যচরণ, মুকুন্দ, হিমাংশু কুমার মল্লিক, আশালেখা দেবী ও নিরুপমা দেবী, প্রভাত কুমার বসু, কুমারী গৌরী চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত রেণু দেবী, বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য ও বিজয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য, অজিত, নির্ম্মল, শিবু, রবি, স্নেহ, মায়া, সুধা, অশ্রু, প্রভাত, সমু, অমু, ভুলু, প্রবোধ, সুধাংশু শেখর চক্রবর্ত্তী, মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অমিয়, পাঁচগাই মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্র সম্মিলনী সভার সম্পাদক ও মনোজিৎ বসু।

যাঁহাদের একটী নির্ভুল ও অপরটী আংশিক ভাবে শুদ্ধ হইয়াছে :—

তারকদাস অধিকারী, অনসূয়া দেবী, শান্তি, শক্তি, রেণু, লক্ষ্মীময়ী দেবী, সমরেন্দ্র নাথ, বিনয়েন্দ্র নাথ, বসন্ত কুমার, অরুণোদয়, বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী, প্রবোধ কুমার, শশীভূষণ, নৃসিংহ চরণ (হিন্দুবোর্ডিং, মুর্শিদাবাদ) সনৎকুমার মজুমদার, কল্যাণ, রমা, পথিক ও পরিমল দেবী, শৈলেশচন্দ্র দাস, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেশলাল সেন।

যাঁহাদের একটী উত্তর নির্ভুল হইয়াছে :—

লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী, শান্তিলতা সেনগুপ্তা, মিলনমালা ঘোষ।

যাঁহাদের উত্তর মাত্র আংশিক ভাবে শুদ্ধ হইয়াছে :—

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সিংহ, যাদব, রাঘব, হৃষিকেশ ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী, বীরেন্দ্রলাল সেন, ধীরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শিবানী দেবী, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও The students of the Pre-matric. Class, Mukherjee's Seminary, Muzaffarpore.

(সময়ে সময়ে অনেকে চিঠি লেখেন, যে তাঁহারা ধাঁধার উত্তর ঠিকমত পাঠাইলেও, তাঁহাদের নাম কেন ছাপা হয় না। ছাপা না হওয়ার কারণ, সে সব চিঠি অনেক দেরীতে আসে; তখন কাগজ ছাপা আরম্ভ হইয়া যায়, কাজেই নূতন নাম আর দেওয়া যায় না। বাংলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে উত্তর আসিলে, নাম নিশ্চয়ই ছাপা হইবে।)

নূতন ধাঁধা

(Cross-Word Puzzle)

(১)

১	২	৩	×	৪
৫	×	৬	৭	৮
৯	১০	১১	×	১২
×	১৩	×	১৪	×
১৫	১৬	×	১৭	১৮
১৯	×	২০	২১	২২

[সঙ্কেতের জন্য গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'রামধনু' দেখ]

পাশাপাশি ঃ—

১—৩=মারাঠা বীর।
৬—৮=সুগন্ধি পুষ্প।
৯—১১=বন।
১৫—১৬=অন্তঃকরণ।
১৭—১৮=প্রাণী।
২০—২২=বাসস্থান।

উপর হইতে নীচে ঃ—

১—৯=যান বিশেষ।
৩—১১=প্রাণ।
৪—১২=মেঘ।
১০—১৬=চক্ষু।
১৪—২১=ফুল বিশেষ।
১৫—১৯=পতঙ্গ বিশেষ।
১৮—২২=অরণ্য।

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত।

(২) নীচের এই ছবি চারিখানা আঁকিতে গিয়া, চিত্রকর ইচ্ছা করিয়াই প্রত্যেকটীতে এক একটী মস্ত মস্ত ভুল করিয়াছেন। তোমাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি কত প্রখর বুঝা যাইবে, যদি চারিখানি ছবির চারিটী ভুল বাহির করিতে পার।

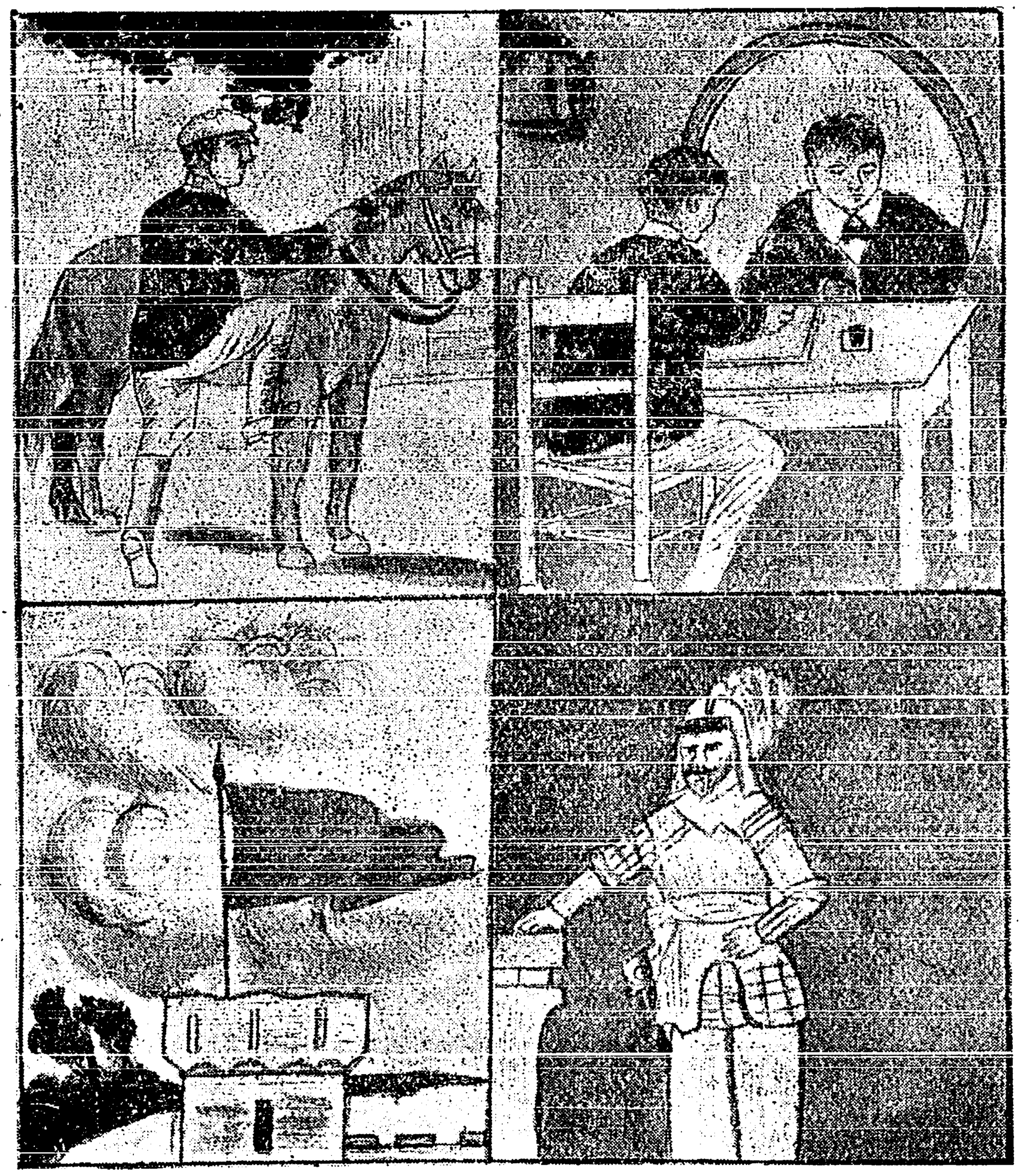

মনসা দেবী

" কনক চম্পক পাঁতি অপূর্ব্ব অঙ্গের ভাতি
হেম জিনি মুক্তাহার সাজে।"
—গঙ্গা দাস সেন।

" চারিদিকে নাগের স্তম্ভ নাগের যে ফণা
চতুর্দ্দিকে শোভা করে নাগের থোপনা "
—দ্বিজরসিক।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

১ম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩৮ { ৭ম সংখ্যা

প্রজাপতি ও ঘুড়ি

(রুশীয় কবি ইভান ক্রিলভ হইতে)

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

ঘুড়ি ডেকে কয় "ওরে প্রজাপতি,
যোজন খানেক তলে
রোস্, তবু আমি দেখি তোরে শুধু
দিব্য দৃষ্টি বলে।
আচ্ছা, বল্‌ত গ্রহমণ্ডলে
চলা ফেরা দেখে মোর,

অবাক্ হ'য়ে কি ম্লোস্‌নাক চেয়ে ?
হিংসা হয় না তোর ?"
প্রজাপতি কয় "কি তোর বুদ্ধি,
কাগুজে চিড়িয়া ঘুড়ি,
আমি কেন তোরে হিংসে করিব ?
মধু খেয়ে খেয়ে উড়ি।
তুইত বন্দী, গর্ব্ব করনা
যতই উপরে থেকে,
স্বাধীন কখনো হিংসে করে কি
গোলামের তেজ দেখে ?"

বলির পুজো

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ)

এক বাগ্‌দী-বৌ, আর তার এক ছেলে। বাপ-মরা কোলের ছেলে—মায়ের বুকের মাণিক।

ও-পাড়ার বামুনদের বাড়ী ছোট্ট ছোট্ট ছাগলছানা হয়েছে, তা'রা কেমন টুর্ টুর্ ক'রে ফেরে—দেখে' বাগ্‌দীর ছেলের ভারী সাধ হোলো সে-ও একটা ছাগলছানা পুষ্‌বে।

বামুন-বাড়ী সময়-অসময় ফাই-ফরমাস্ খেটে ব'লে-ক'য়ে বাগ্‌দী-বৌ একটা ছাগলছানা চেয়ে আন্‌লে। ছেলে ছাগল পেয়ে মহাখুসী—দিনরাত কাছ-ছাড়া করে না।

কিছুদিন যায়—হঠাৎ একদিন বাগ্‌দী ছেলের ব্যামো হোলো। মা গরীব মানুষ—ওষুধ-পত্তর পায় কোথা ?—ছেলেকে কোলে ক'রে ব'সে ঠাকুর-দেবতাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো।

পাড়া-পড়্‌শীরা বল্লো—'বাগ্‌দী-বৌ, ঘরে ব'সে শুধু শুধু ডাক্‌লে কি ঠাকুর-দেব্‌তার দয়া হয় ? মা রক্ষা-কালীকে পাঁঠা দিয়ে পুজো মানত কর্—দেখ্‌বি, ছেলে ভালো হ'য়ে উঠ্‌বে।'

যুক্তি শুনে' বাগ্‌দী-বৌ ছেলের জন্যে বলির পূজো মানত কর্‌লে।

মানত তো হোলো, কিন্তু পূজোর উপায় কি ? বাগ্‌দী বৌ টাকা-পয়সা-ও জোটাতে পারে না, পূজোর জোগাড়ও হয় না।

সবাই বলে—'বে-আক্কেল বৌটার কাণ্ড দেখেছ ? চট্‌পট্ পূজো না দিলে দেব্‌তা কি সেধে-সেধে ছেলে সারিয়ে দেবেন নাকি ?'

'তাইতো!'—বাগ্‌দী-বৌ চম্‌কে উঠ্‌লো—'মানত পূজো দেওয়া তো চাই-ই!'···কিন্তু,···কেমন ক'রে সে পূজোর জিনিষ জুট্‌বে ?

সবাই বল্লো—'ভাব্‌না কি! দশ জনের কাছে চেয়ে-চিন্তে নয় পূজোর সামিগ্রী জুটিয়ে আন্। আর বলির পাঁঠা তো ঘরেই আছে—ঐ ছানাটাকেই বলি দিস্। দেব্‌তার ধার কি ফেলে' রাখ্‌তে আছে ?'

বাগ্‌দী-বৌ এ-বাড়ী-সে বাড়ী ঘুরে' ঘুরে' পূজোর চাল-কলা জোগাড় কর্‌লে। কিন্তু···বলির পাঁঠা ?

···সে এক-একবার ছাগল-ছানাটার দিকে চায়, আর ভাবে—শেষে কি এটা-কেই বলি দিতে হবে ? আহা, এ যে তা'র ছেলের পোষা! এই ছাগলটাকেই বলি দেবে, একথা মনে হোলেই তা'র বুকের মাঝে কি যেন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে।

···কিন্তু উপায় কি ? ছেলের প্রাণ বড়, না, একটা পশুর মায়া বড় ?—মা চুপি চুপি ছাগলটাকে বারোয়ারীতলায় নিয়ে গেল; আর সেখানে সেটাকে বলি দিয়ে পূজোর মানত রাখ্‌ল।

বাড়ীতে ফিরে' বাগ্‌দী-বৌ লুকিয়ে লুকিয়ে ফির্‌তে লাগ্‌লো—ছেলে টের না পায়! র'য়ে র'য়ে তবু তার বুকের ভেতর ঢুপ্ ঢুপ্ কর্‌তে লাগ্‌ল—যেন এই মাত্র কা'কে খুন ক'রে সে ঘরে ফিরেছে!

ছাগলছানা দেখ্‌তে না পেয়ে ছেলে অনেকক্ষণ ধ'রে মাকে ডেকে ডেকে

ঘুমিয়ে পড়েছে। খানিক পরে মা-ও চুপি চুপি এসে ছেলের পাশে শুয়ে' পড়্‌ল। তখন একবার ছেলের কথা, আর একবার ছাগলের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাগ্‌দী-বৌরও চোখ ঘুমে বুজে' এল।···

···হঠাৎ যেন বাগ্‌দী-বৌ শোনে বামুন-বাড়ী ভারী সোরগোল পড়ে' গেছে—বামুনদের কোন্ ছেলের কি ব্যামো—বাড়ীতে ডাক্তার-কব্‌রেজ-হকিম ধরে না। কিন্তু কেউ-ই কিছু কর্ত্তে পার্চ্ছে না। তারপর কোত্থেকে এক ভৈরবী এলেন। তিনি এসেই বল্লেন—'রোগীর সমবয়সী এক ছেলে চাই, আর সে ছেলে যদি সবে অসুখ-বিসুখ হ'তে সেরে উঠে থাকে তো আরো ভালো।'

বামুনদের বাড়ীর লোকজনেরা গাঁ খুঁজে' বাগ্‌দীর ছেলেকে নিয়ে হাজির কর্ল্লে।

ভৈরবী বল্লেন—'ঠিকই হয়েছে। এ ছেলে রোগীর সমবয়সীই বটে, আর সবে ব্যামো থেকে উঠেছে ব'লে এ'র গায়ের রক্তও তাজা আছে। ছেলেটার গলার নালী কেটে গরম গরম রক্ত নিয়ে এখ্‌খুনি যজ্ঞ কর্ত্তে হবে। সেই যজ্ঞের ছাইয়ের ফোঁটা কপালে দিলেই রোগী সেরে উঠ্‌বে।' শুনে' বাগ্‌দী-বৌ শিউরে উঠ্‌ল—'এ কি ডাকাতে কথা গো! গলা কেটে ছেলেকে খুন কর্‌বে নাকি?'

বামুনরাও আম্‌তা আম্‌তা কর্‌তে লাগ্‌লেন—'তাইতো! এ যে মুস্কিলেরই ব্যাপার!'

কিন্তু ভৈরবী স্পষ্টই বল্লেন—'ও রকম না কর্ল্লে চল্‌বে না; আর দেরী হোলেও রোগীর প্রাণ বাঁচানো দায়।'

ছেলের প্রাণ-রক্ষার যখন আর কোনো উপায়ই নেই, তখন বামুনরাও ভৈরবীর কথায় মত দিলেন। তাঁরা বাগ্‌দী-বৌকে বুঝাতে লাগ্‌লেন—কিছু রক্ত বইতো নয়!—তা' নেওয়া হোলেই তাঁ'রা নিজেরাই চিকিৎসা-পত্তর ক'রে ছেলেকে আবার চাঙ্গা ক'রে দেবেন। বরং বাগ্‌দী-বৌ যত টাকা চায় তাঁ'রা দিতে রাজী।

বাগ্দী-বৌ কাঁদ্‌তে লাগল—'বাবু, তোমাদের পায়ে পড়ি,—আমার একে রোগা ছেলে, গলা কাট্‌লে ও আর বাঁচ্‌বে না।'

কিন্তু ঘরের ছেলের প্রাণ বাঁচাতে কে পরের ছেলের মায়া রাখে? তার-ওপর বামুনরা বড়লোক—জোর ক'রে বাগ্‌দী-বৌকে আট্‌কে রেখে তা'র ছেলের রক্ত নেওয়ার ব্যবস্থা কর্ল্লেন।

সারাদিন ধ'রে রোগীর ঘরে যজ্ঞ চল্‌ল। সন্ধ্যা-বেলা ভৈরবী ঘরের দরজা খুল্লেন। সকলে দেখে—বামুনের ছেলে দিব্যি সুস্থ হ'য়ে উঠেছে, আর মাটীর ওপর মরার মত প'ড়ে রয়েছে বাগ্‌দীর ছেলে—তা'র গলার নালী কাটা, তা' দিয়ে তখনও ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়্‌ছে।

বাগ্‌দী-বৌ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে' এসে—'ও বাবা গো'—ব'লে ছেলের বুকের ওপর অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌ল।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই দেবতারই মূর্ত্তি।

যখন হুঁস্ হোলো তখন বাগ্দী-বৌ দেখে—কোথায় বামুনের ছেলে, আর কোথায়ই বা ভৈরবী? তা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সেই দেবতারই মূর্ত্তি, যাঁর কাছে সে ছেলের পোষা ছাগল বলি দিয়েছে! দেবী আদর ক'রে বুকে চেপে ধ'রেছেন সেই ছাগল-ছানাটী, আর তাঁর হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে বাগ্দী-বৌর নিজেরই ছেলে—কিন্তু কারুরই গায়ে কাটা-ছেঁড়ার চিহ্নটীও নেই।

দেবী বাগ্দী-বৌকে

বল্লেন—'পূজোর নামে ছাগল কেটে তোরা দেবতাকে খুসী কর্ত্তে চাস্? দেবতা কি তা'তে খুসী হ'ন? দেবতার কাছে ছাগলে আর মানুষে তফাৎ কিরে? একটা প্রাণ বাঁচাতে হোলে আর একটা প্রাণ ঘুষ দিতে হবে, এ-ইবা কেমন ধর্ম্ম? যারই হোক্, প্রাণ হারাণোর কি দুঃখ, নিজেও তো বুঝলি? দেবতার পুজো কর্ত্তে চাস্ তো মরাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা কর,—তাতেই দেবতা খুসী হবেন; জ্যান্ত-কিছু মেরে দেবতার পূজো হয় না।

বল্‌তে বল্‌তে দেবী যেন কোথায় মিলিয়ে গেলেন। চট্ কোরে বাগ্‌দী-বৌরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে জেগে উঠে' দেখে—সন্ধ্যা হয়-হয়, আর তার বুকের কাছে তখনও ঘুমিয়ে আছে তার রোগা ছেলে।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে মা ভাব্‌তে লাগ্‌ল—'একি স্বপ্ন দেখলাম!'

জানোয়ার কি নিরেট বোকা?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে বুদ্ধি জিনিষটা ভগবান্ মানুষেরই এক-চেটিয়া করিয়া দিয়াছেন; না হইলে এত বড় পৃথিবীটা একা মানুষ কেমন করিয়া দখল করিয়া লইল? বিশ্বাসটা যে একেবারে ভুল তাহা নহে, তবে জানোয়ারদের আমরা দূর হইতে যতটা বোকা মনে করি আসলে কিন্তু তাহারা তত বোকা নহে। যাঁহারা জানোয়ার লইয়া কারবার করেন তাঁহাদের কাছে মাঝে মাঝে জানোয়ার-দের অদ্ভুত বুদ্ধির গল্প শোনা যায়। আজ তোমাদের তাহারই কয়েকটা শোনাইব।

বিলাতের এক মস্ত বড় পণ্ডিত বলিয়াছেন মানুষের পূর্ব্বপুরুষ নাকি বানর। বাস্তবিক মানুষের সাথে বানরের চেহারার ত' খুব বেশী রকম মিল আছেই, বুদ্ধি আর ব্যবহারেও আছে যথেষ্ট। মানুষের অনুকরণ করিতে ইহাদের যোড়া

দুনিয়ায় দু'টি মিলিবে না। নীচে একখানা ভারি মজার ছবি দেওয়া গেল। এক বানর দিব্যি সাহেব সাজিয়া ফটো তুলিতে বসিয়াছে। সুট—ওয়েষ্টকোট নেক্‌টাই, বুট জুতা—কোথাও একটু খুঁত ধরিবার যো নাই। বসিবার ধরণটি পর্য্যন্ত মানুষের। রাতদিন সাহেবি কায়দায় থাকিয়া ইহার মেজাজটাও হইয়া গিয়াছে সাহেবী। আর একখানি ছবিতে দেখ এক সাহেব তার মেমের হাত ধরিয়া সাজিয়া গুজিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। তোমরা হয়ত বলিবে "এতে আর কি? সন্ধ্যার পর চৌরঙ্গীর উপর ত' এ রকম হামেশাই দেখা যায়।" একটু তফাৎ আছে বই কি। সাহেবের আসল পরিচয় জানকি? একবার টুপীর নীচে মুখখানা ভাল করিয়া দেখ দেখি।

সাহেব ফটো তুলিতে বসিয়াছেন।

সকালে বিকালে একটু বায়ু সেবন।

আর এক পৃষ্ঠায় দেখ তিন জন ওরাংওটান দিব্যি ডিনারে বসিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাও পাকা সাহেব। হাতে আর আজকাল ইঁহারা খাইতে পারেন না। ছুরি আর কাঁটা চামচ না হইলে ইঁহাদের ভয়ানক অসুবিধা হয়। শুধু তাই নয়, ইঁহারা আবার নেশা করিতেও শিখিয়াছেন। ছবিতে দেখ একজন দিব্যি আয়েসে মদের বোতল হইতে মদ ঢালিতেছেন। ওরাংওটানই বানরদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান্। কথাবার্ত্তাও ইহাদের অনেকটা মানুষের মত। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করিবার সময় জোরে

কিচিরমিচির করে, আবার দরকার হইলে কাণে কাণে ফিশফাশ করিতেও ইহারা পটু।

ছুরী আর কাঁটা চামচ না হইলে ভয়ানক অসুবিধা হয়।

এ গুলি ত' গেল পোষা বানর। জংলী বানরদের বুদ্ধিরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শোনা গিয়াছে। বলিতেছি একটা ঘটনার কথা। ব্যাপারটা হইয়াছিল আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে (Cape of Good Hope)। এক জায়গায় সৈন্তেরা ছাউনি ফেলিয়াছে। তাহার কিছু দূরে পাহাড়ের গুহায় একপাল বেবুনের আড্ডা। একদিন বেবুনের দল আসিয়া চুপি চুপি সৈন্তদের কতকগুলি জামা কাপড় চুরি করিয়া পালাইল। ব্যাপারটা যখন জানিতে পারা গেল, তখন সেনাপতি ত' চটিয়া অস্থির। একদল সৈন্তকে তিনি হুকুম দিলেন "যাও, বেবুনের নিকট হইতে কাপড় কাড়িয়া আন।"

এদিকে বেবুনের দল কাপড় লইয়া দৌড়াইয়াছে। মানুষ সৈন্তেরা তাহাদের তাড়া করিল। হঠাৎ দেখা গেল এক বৃদ্ধ বেবুন চীৎকার করিয়া অন্য বেবুনদের কি বলিল, অমনি কতকগুলি বেবুন সমস্ত কাপড় লইয়া ছুটিল গুহার

দিকে, আর জনা-পঞ্চাশেক বেবুন দাঁড়াইয়া গেল সেই পথের পাহারায়। সৈন্তেরা আসিলে তাহাদের বাধা দিবে। বাকী বেবুনগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ঝোপের আড়াল হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর গড়াইয়া মানুষ সৈন্তদের দিকে ছুড়িতে লাগিল। তাহাদের দলপতি সেই বৃদ্ধবেবুন ঠিক মানুষ সেনাপতির মত তাহাদের পরিচালনা করিতে লাগিল। বানরের বুদ্ধির কাছে সেদিন মানুষের বুদ্ধি টিকিল না। সৈন্তেরা খালি হাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

বানরের কথা ছাড়িয়া এবার অন্য জানোয়ারের কথা বলি। শেয়াল আর এক বুদ্ধিমান জানোয়ার। একবার এক শিকারী বনের মধ্যে দেখিলেন দু'টি শেয়াল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন বলাবলি করিতেছে। তারপর তাহাদের একটী গিয়া একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিল, আর একটী কোথায় যেন চলিয়া গেল। শিকারীর কৌতূহল হইল, 'দেখা যাক্ কি হয়।' তিনি একজায়গায় লুকাইয়া থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। খানিক পরেই দেখা গেল একটা খরগোস প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে, আর তাহার পিছনে কয়েকটা শেয়াল তাহাকে তাড়া করিয়াছে। খরগোসটা যেই সেই ঝোপের পাশ দিয়া আসিবে, অমনি সেই লুকান শেয়ালটা তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু খরগোসটার বরাত ছিল ভাল। কয়েক আঙ্গুলের জন্য শেয়ালের শিকার ফস্কাইল। তখন যে শেয়ালটার দোষে এমন চমৎকার ভোজটা মাটি হইল তাহার উপর অন্য শেয়ালগুলির যা রাগ, পারে ত' তাহাকেই কামড়াইয়া খায়। তাহারা এত যুক্তি করিয়া ফাঁদ পাতিয়াছিল, আর ও কিনা সব ভণ্ডুল করিয়া দিল।

নেকড়ে বাঘও শিকার ধরিবার সময় এম্নি ভাবেই কাজ হাঁসিল করে। একদল নেকড়ে এক জায়গায় জুটিয়া প্রথমে পরামর্শ করিয়া লয়, তারপর এক এক জন গিয়া এক একটা ঝোপে লুকায়। যেই কোন হরিণ কি আর কিছু আসিয়া জুটিল অমনি একজন বাহির হইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া অন্য ঝোপের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সেখানে আর একজন বসিয়া আছে; যেই

কাছে যাওয়া অমনি সেও বাহির হইয়া তাড়া করিতে আরম্ভ করে, আর লইয়া যায় আর একটা ঝোপের দিকে। এম্নি করিয়া খাণিকক্ষণের মধ্যেই হরিণ বেচারা হয়রাণ হইয়া যায়। তখন আর শিকার হাতছাড়া হইবার কোনও ভয় থাকে না। বাঘ সিংহের মধ্যেও অনেক সময় অনেক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

হাতীর বুদ্ধির কথা শুনিয়াছ কি? বাংলায় একটা কথা আছে "হস্তীমূর্খ।" কথাটার মানে যে হাতীর মত মূর্খ তাহা নয়, হাতী প্রকাণ্ড জানোয়ার কিনা তাই 'হস্তীমূর্খ' বলিলে "মস্ত বড় মূর্খ" বুঝায়। পোষা হাতীকে ত' বোকা কিছুতেই বলা চলে না। পোষা হাতীর বুদ্ধির গল্প তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান, বুনো হাতীর বুদ্ধির একটা গল্প বলিতেছি। গ্রীষ্মকালে অনেক জায়গারই জল শুকাইয়া যায়, কাজেই যে সব সরোবরে সামান্য কিছু জল থাকে তৃষ্ণার্থ জানোয়ারের ভিড় সেখানেই বেশী হইবার কথা। শিকারীরাও তাই এই সব জায়গায়ই ওৎ পাতিয়া থাকে। একবার 'হাতীধরা' দলের এক ইংরাজ কর্ম্মচারী এই রকম এক সরোবরের ধারে একটা উচুঁ গাছের উপর বসিয়া আছেন, কখন্ হাতীরা জল খাইতে আসে দেখিবার আশায়। ১ঘণ্টা, ২ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কোন সাড়াশব্দ নাই। শিকারীর ধৈর্য্য কমিয়া আসিতেছে—হঠাৎ দেখা গেল এক অতিকায় হাতী পা টিপিয়া টিপিয়া পুকুরের ধারে আসিয়া হাজির। হাতীটা আসিয়াই কাণ পাতিয়া চারিদিক পরীক্ষা করিয়া লইল। তারপর কেহ কোথাও নাই ঠিক করিয়া আবার ফিরিয়া গেল। খানিক পরে হাতীটা ফিরিয়া আসিল। এবার তাহার সঙ্গে আরও ৫টা হাতী, দলপতি হাতীটা তাহাদের ৫ জায়গায় পাহারায় বসাইয়া আবার চলিয়া গেল। এবার তাহার সঙ্গে আসিল আশীটা হাতী। তখন সকলে মিলিয়া সাবধানে জল খাইয়া চলিয়া গেল। সাহেব গাছের উপর অবাক্ হইয়া রহিলেন। হাতীরা জানে কোথায় বিপদ ঘটিতে পারে, তাই তাহাদের এত সতর্কতা।

পোষা প্রাণীদের মধ্যে কুকুরের বুদ্ধির কথা বোধ হয় তোমাদের বলিবার

প্রয়োজন নাই। কুকুরের বুদ্ধির অসংখ্য গল্প শোনা যায়। তবু একটা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না! লণ্ডনের এক হাঁসপাতালের সামনেই ছিল এক বইএর দোকান। দোকানের মালিকের ২টি টেরিয়র কুকুর ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কুকুর তু'টী কোথা হইতে আর একটা হাত-পা-ভাঙ্গা কলি কুকুরকে সঙ্গে লইয়া হাঁসপাতালের ডাক্তারের ঘরে গিয়া হাজির। ব্যাপারটা আর কিছুই না। কুকুর ২টা রাত-দিন দেখিত যত সব রুগ্ন, হাত-পা-ভাঙ্গা লোকদের হাঁসপাতালে আনা হইতেছে। তারপর কয়েক-দিনের মধ্যেই তাহারা আরাম হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই তাহারাও ভাবিয়াছিল খোঁড়া কুকুরটার পাও বোধ হয় এখানে আনিলে সারিয়া যাইতে পারে। 'কলি' কুকুরটাকে তাহারা কেমন করিয়া বুঝাইয়া হাঁসপাতালে আনিয়াছিল, তাহাই শুধু ভাবি।

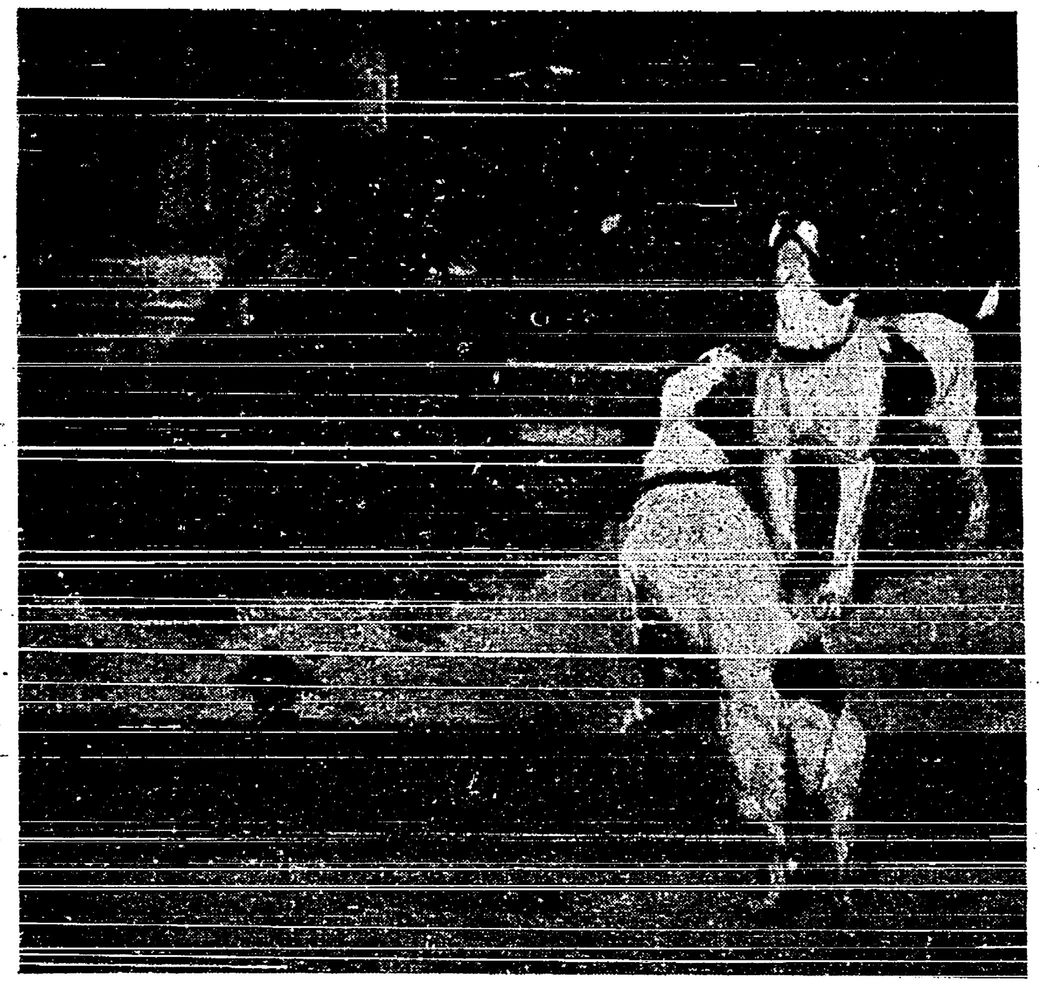

টেরিয়ার কুকুর তুইটি খোঁড়া কুকুরকে হাঁসপাতালে যাইবার জন্য বুঝাইতেছে।

এবার একটা বিড়ালের কথা বলিয়া শেষ করিব। এক মেম সাহেবের একটা আত্নরে বিড়াল ছিল। একদিন তুপুর রাত্রে মেম সাহেব ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন বিড়ালটা তাঁহাকে প্রাণপণে আঁচড়াইতেছে। প্রথমে তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু একটু পরেই বুঝিলেন বিড়ালটা তাঁহাকে কোথাও যাইতে

বলিতেছে। বিড়ালটার পিছু পিছু গিয়া তিনি দেখিলেন পাশের ঘরে তাঁহার স্বামী জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। বিড়ালটা টের পাইয়া তাই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তোমরাই বল, জানোয়ার কি সত্য সত্যই নিরেট বোকা ?

উদয়ন-কথা *

(শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল্)

তোমাদিগকে সে কালের একজন বড় রাজার কথা বলিব। তাঁহার নাম উদয়ন। উদয়ন ভরতবংশে জন্মিয়াছিলেন। ভরত-বংশ কি তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। সে কালে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার রাণীর নাম ছিল শকুন্তলা। ভরত নামে তাঁহাদের এক পুত্র হয়, তাঁহারই নামে তাঁহার রাজ্যের ভারতবর্ষ নাম হইয়াছিল। এই ভরতের বংশে যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন। রাজা উদয়নও এই ভরত-বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শতানীক, পিতামহের নাম সহস্রানীক। তোমরা অবশ্য বুদ্ধদেবের কথা শুনিয়াছ। যে সময়ে বুদ্ধদেব জন্মিয়াছিলেন, উদয়নেরও সেই সময়ে জন্ম হয়। পূর্ব্বে হস্তিনাপুর ভরতবংশের রাজধানী ছিল, কিন্তু তাহা গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, কৌশাম্বী নগর তাঁহাদের রাজধানী হয়। কৌশাম্বী প্রয়াগ বা এলাহাবাদের নিকট। উদয়ন এই কৌশাম্বীতেই রাজত্ব করিতেন। তিনি বৎসগণের অধিপতি ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বৎসরাজও বলিত। উদয়ন যে সময়ে কৌশাম্বীতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে অবন্তী বা উজ্জয়িনীতে মহাসেনপ্রদ্যোত নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি অনেক রাজাকে তাঁহার বশে আনিয়াছিলেন

* রাজা উদয়নের অনেক কথা হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিল বাবু সেগুলি মিলাইয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অনেককালের কাহিনী—কতকটা পৌরাণিক গোছের হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সং

কিন্তু উদয়নকে কিছুতেই পারিয়া উঠেন নাই। তাই তাঁহাকে কৌশলে বশে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উদয়ন গানবাজনায় দক্ষ ছিলেন। তিনি হাতী শীকার করিতে ভালবাসিতেন। বীণা বাজাইয়া মন্ত্র পড়িয়া হাতী বশ করিতে পারিতেন। একবার তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট নর্ম্মদা নদীর তীরে হাতী ধরিতে গেলে, প্রদ্যোত তাহা জানিতে পারিয়া, নীলরঙ্করা একটা কাঠের হাতী সেখানকার বনের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। সেই হাতীর ভিতর তাঁহার কয়েকজন সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লুকাইয়া রহিল। নীল রঙের হাতী দেখিতে পাওয়া যায় না। উদয়ন কিন্তু হস্তিবৃত্তান্তগ্রন্থে তাহা পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রদ্যোতের একটা চরের নিকট নীল হাতীর কথা শুনিয়া একাকী বীণাটি মাত্র লইয়া হাতী ধরিতে গেলেন। যেমন তিনি হাতীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি প্রদ্যোতের সৈন্যেরা তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি যতক্ষণ পারিলেন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন, শেষে ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন প্রদ্যোতের লোকেরা কতকগুলি বনের লতা দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাঁহাকে লইয়া উজ্জয়িনীতে চলিয়া গেল।

প্রদ্যোত উজ্জয়িনীর কারাগারে উদয়নকে রাখিয়া দিলেন। তিনি অনেক ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে বশে আনিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তেজস্বী উদয়নকে কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। প্রদ্যোত তখন উদয়নের নিকট হাতী ধরার মন্ত্র শিখিতে চাহিলেন। উদয়ন বলিলেন,—"আমাকে গুরু বলিয়া প্রণাম না করিলে মন্ত্র দিব না।" কিন্তু প্রদ্যোত কিছুতেই উদয়নের নিকট মাথা নোয়াইতে চাহিলেন না। প্রদ্যোত মন্ত্রটা শিখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। শেষে তিনি এরূপ এক উপায় স্থির করিলেন যে, কোন একজন মন্ত্রটা শিখিয়া লইবে এবং সেই উদয়নকে প্রণাম করিবে। প্রদ্যোত তাঁহার কন্যা বাসবদত্তাকে তাহা শিখিয়া লইবার জন্য বলেন। বাসবদত্তা খুব সুন্দরী ছিলেন। রূপের তরঙ্গে তাঁহার শরীর টল্‌টল্ করিত। প্রদ্যোতের ইচ্ছা ছিল না যে, উদয়ন তাঁহার এই পরমাসুন্দরী কন্যাকে

দেখিয়া ফেলেন। উদয়নও সুপুরুষ ছিলেন। বাসবদত্তাও যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে না পান, প্রদ্যোতের তাহাও ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি বাসবদত্তাকে বলিলেন,—"একটী লোকের কাছে তোমাকে বীণাবাদ্যের সহিত হাতী ধরার মন্ত্র শিখিতে হইবে। সে লোকটা কিন্তু একটা কদাকার বামন। তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে না।" আর উদয়নকেও বলিলেন,—"তোমাকে একটা কুৎসিত ও কুব্জা মেয়েকে বীণা ও মন্ত্র শিখাইতে হইবে। কিন্তু তাহার দেখা ঘটিবে না।" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তিনি দুইজনার মধ্যে একটা পর্দ্দা টানাইয়া বীণা ও মন্ত্র শিক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। যথানিয়মে শিক্ষা দিতে দিতে উদয়ন তাঁহার শিষ্যার উপর একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কোথাকার কুঁজী!" বাসবদত্তা বলিলেন,—"কে কুঁজীরে, বামন?" তখন উদয়ন পর্দ্দা সরাইয়া দেখিলেন পরমা সুন্দরী রাজকন্যা। বাসবদত্তাও দেখিলেন এক সুপুরুষ রাজপুত্র। তখন উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। পরে তাঁহারা পলাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উদয়নের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম যৌগন্ধরায়ণ। তিনি বড়ই বুদ্ধিমান্। যৌগন্ধরায়ণ উদয়নের বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া, ছদ্মবেশে লোকজন লইয়া উজ্জয়িনীতে গেলেন। তাঁহার একটি লোক গুপ্তভাবে একটা হাতী লইয়া গিয়া কৌশলে উদয়ন ও বাসবদত্তাকে রাজবাটী হইতে সরাইয়া আনিল। প্রদ্যোতের লোকেরা তাঁহাদের পিছনে ছুটিতে লাগিলে, বাসবদত্তা সোনার টুক্‌রা ও টাকা ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহারা তাহা কুড়াইতে লাগিয়া গেল। এদিকে উদয়ন বাসবদত্তাকে লইয়া অনেকদূর চলিয়া আসিলেন। যৌগন্ধরায়ণও তাঁহার লোকজন লইয়া প্রদ্যোতের লোকজনের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। যুদ্ধে কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। এদিকে উদয়ন কৌশাম্বীতে গিয়া পঁহুছিলেন। প্রদ্যোত যখন জানিতে পারিলেন যে, উদয়ন চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি যৌগন্ধরায়ণকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন। কৌশাম্বীতে আসিয়া উদয়ন ধূমধামের সহিত বাসবদত্তাকে বিবাহ করিলেন।

উদয়ন বেশ সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন; কিন্তু সময় কখনও একভাবে যায় না। কখনও সুখ আসে, আবার তাহার পরই দুঃখ আসিয়া জুটে। উদয়নেরও তাহাই ঘটিল। তাঁহার রাজ্যের অনেক স্থান তাঁহার শত্রুরা কাড়িয়া লইল। তিনি কৌশাম্বী পরিত্যাগ করিয়া লাবানক নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ আবার এই সকল স্থান উদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে হউক নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিবেন। সেই সময়ে জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া বলিলেন যে, মগধের রাজা দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের আবার বিবাহ হইলে, সমস্ত রাজ্যই তাঁহার হাতে আসিবে। কিন্তু রাজা উদয়ন বাসবদত্তাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে তাঁহার আবার বিবাহ করা সম্ভব নহে। সেই জন্য যৌগন্ধরায়ণ অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত একটা উপায় স্থির করার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা শিকারে বাহির হইলে, মন্ত্রীরা লাবানকে আগুন লাগাইয়া দিলেন। তাহাতে অনেক ঘর দুয়ার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। মন্ত্রীরা রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, রাণী বাসবদত্তা পুড়িয়া মরিয়াছেন। আর তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সকলই মিথ্যা। যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে লইয়া ছদ্মবেশে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বাসবদত্তাকে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার পর পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ হইলে, আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি এক তপোবনে গিয়া উপস্থিত হন। দর্শক রাজার ভগ্নী পদ্মাবতীও সেখানে আসেন। পদ্মাবতী তপোবন-বাসীদের যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা পূরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সন্ন্যাসি-বেশধারী যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার এই ভগিনীটিকে তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিতে চাহেন, পরে এক সময়ে ফিরাইয়া লইবেন। পদ্মাবতী তাহাতে সম্মত হন। বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর হাতে দিয়া, যৌগন্ধরায়ণ ছদ্মবেশে বেড়াইতে লাগিলেন, তিনি আর লাবানকে ফিরিয়া গেলেন না।

পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে লইয়া মগধের রাজধানী রাজগৃহে আসিলেন। তখন রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। পরে পাটলিপুত্র বা পাটনা তাহার রাজধানী হয়। রাজগৃহ পাটনা হইতে বেশীদূর নহে। রাজগৃহ মহাভারতের সময়ের রাজা জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। যৌগন্ধরায়ণ পদ্মাবতীর নিকট বাসবদত্তার নাম আবন্তিকা বলিয়া ছিলেন। তিনি এখন হইতে সেই নামেই পরিচিত হইতে লাগিলেন। উদয়ন বাসবদত্তার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অনেকদিন ধরিয়া তিনি শোকে অভিভূত হইয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে তিনি একটু শান্ত হইলে, মন্ত্রীরা পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। আবন্তিকা পদ্মাবতীর সখীর মত থাকিতেন। পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ হইবে শুনিয়া আবন্তিকা মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও সে কথা জানিতে দিলেন না। তিনি স্বামীর মঙ্গলের জন্য সমস্তই সহ্য করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ হইয়া গেল। উদয়ন কিছুদিন রাজগৃহে রহিলেন। একদিন পদ্মাবতী অসুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া, উদয়ন পদ্মাবতীর বিশ্রামগৃহে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, পদ্মাবতীর শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাত্রিও হইয়াছে। ঘরের মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সকল জিনিষ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। আবন্তিকাও পদ্মাবতীর অসুখ শুনিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি পদ্মাবতী শয্যায় শুইয়া আছেন মনে করিয়া, উদয়নের নিকট গিয়া বসিলেন। উদয়ন বাসবদত্তাকে ভুলিতে পারেন নাই, তিনি স্বপ্নে বাসবদত্তাকে কথা বলিতেছিলেন। আবন্তিকা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সেখানে পদ্মাবতী নাই, উদয়নই রহিয়াছেন। তিনি রাজার কথার দু'একটী উত্তর দিয়া, রাজার হাতখানি শয্যার উপরে রাখিয়া, পলাইয়া গেলেন। পাছে রাজা তাঁহাকে দেখিতে পান এবং যৌগন্ধরায়ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে তিনি সেখানে থাকিতে সাহস করেন নাই। বাসবদত্তার হস্তস্পর্শে রাজার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বাসবদত্তার স্পর্শ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তাঁহার

মন্ত্রীরা সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজগৃহে আসিলে, দর্শক রাজার সৈন্যসামন্ত তাহাদের সহিত যোগ দিয়া, উদয়নকে লইয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল।

উদয়ন যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, তাঁহার রাজ্যের আবার উদ্ধার হইল। তিনি আবার কৌশাম্বীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া, যৌগন্ধরায়ণ আবার দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ছদ্মবেশে আসিয়া রাণী পদ্মাবতীর নিকট তাঁহার ভগিনীকে চাহিলেন। উদয়ন পূর্ব্ব হইতে পদ্মাবতীর নিকট আবন্তিকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, তাঁহাকে বাসবদত্তা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী যখন বাসবদত্তাকে লইয়া আসিতেছিলেন, রাজা তখন তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলে, যৌগন্ধরায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—ভরত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, রাজ-ধর্ম্মের গুরু হইয়া, অপরের গচ্ছিত বস্তুর উপর দৃষ্টি করা আপনার উচিত নহে।" শুনিয়া রাজা লজ্জিত হইলেন। তাহার পর বাসবদত্তা সকলের সম্মুখে আসিলে তাঁহার আবরণ উন্মোচন করা হইল। যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজের জয় হউক।" উদয়ন তখন বাসবদত্তাকে জানিতে পারিলেন ও যৌগন্ধরায়ণকেও চিনিলেন। তাহার পর বাসবদত্তাও পদ্মাবতীর সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, বুদ্ধদেব ও উদয়ন এক সময়েরই লোক। বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, তখন অনেকে তাঁহার মতে আসিয়াছিল। কিন্তু রাজা উদয়ন প্রথমে তাঁহার মত গ্রহণ করেন নাই। এক সময়ে উদয়ন কোন একটি রাজ্য জয় করিতে যাইতেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার সম্মুখে পড়িলে, তিনি তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বাণ ছাড়িয়া দেন। সেই বাণ কিন্তু আকাশে উড়িয়া যায়। উদয়ন তখন করযোড়ে বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে মানুষ শত্রু বিনাশ করিতে নিষেধ করিয়া, নিজের মনের অহঙ্কার শত্রুকে নষ্ট করিতে বলেন এবং আরও অনেক উপদেশ দেন। তখন হইতে উদয়ন তাঁহার ভক্ত হন। উদয়ন কৌশাম্বীতে চন্দন কাষ্ঠের গড়া একটি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চীন-

দেশের ভ্রমণকারী যুয়ান চুয়াং কৌশাম্বীতে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা উদয়নের সম্বন্ধে অনেক কথা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যে উজ্জয়িনীর বৃদ্ধ লোকেরা উদয়নের কথা বলাবলি করিত বলিয়া লিখিয়াছেন।

"পাইয়া অবন্তী, যথা গ্রামবৃদ্ধগণ
জানে উদয়ন কথা"—

ভাসকবি ও রাজকবি শ্রীহর্ষের কোন কোন নাটকে, কথা সরিৎসাগর নামে সংস্কৃত গ্রন্থে ও কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থেও উদয়নের কথা বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। অতএব তোমরা জানিতে পারিতেছ, উদয়ন কত বড় রাজা ছিলেন।

ভুয়ো দ্বন্দ্ব

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ)

ভুগোল বলিছে বলিতে গেলে ত'
আমিই ধরিত্রী,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা করে
আমার আরত্রি।

তিনভাগ জল, একভাগ স্থল
সেথা কতটুকু ঠাঁই,
তাহাতে আবার নরের আবাস
খুঁজে কয় ঘর পাই।

তাহারি আবার ক'টা লোক লয়ে
জাঁক করো ইতিহাস,
সাল তারিখের খতেন খাতার
বহরে লাগায় ত্রাস।

মাটি যে মাটিকে হাঁজড়ে আঁচড়ে
করে গেল পাগলামি,
তোমার চক্ষে দেখছি তারাই
সব চেয়ে বেশী দামী।

উঠিল, ফুটিল টুটিল যাহারা
নিমেষে হাউই সম
তাদেরি কাহিনী কহিছ কেবল,
দেখে হাসি আসে মম।

পড়ে আছে মোর চরণের তলে
বিপুল বসুন্ধরা,
মহাসাগরের মধ্যে হতেছে
নবীন পৃথিবী গড়া।

পাহাড় আমার উগারে বহ্নি,
কখনো রত্ন ঢালে,
শিখরে শিখরে সিংহ, ব্যাঘ্র
ফিরিতেছে পালে পালে।

করনা গ্রাহ্য আমার রাজ্য,
ওগো মিথ্যার গড়,
রক্তারক্তি রোজ নামচার
বড্ড যে দেখি দর!

ইতিহাস কয়, জানি, মহাশয়,
গ্রহ-সাথে তব যোগ,
আমার বীরেরা তোমার ধরণী
জোর ক'রে করে ভোগ।

ও মানচিত্র উলটি পালটি
দিয়াছে সেকেন্দার,
ইচ্ছায় তারে ভাঙ্গে আর গড়ে—
কত নাম লব আর।

তুমি ত আমার কৃপার ভিখারী,
ভয়ে হয়ে থাক বশ,
আধেক তোমার শক্তি জোগালে
আমার কলম্বস।

শুধু গোটা কত রেখা আর দাগ,
শুধু গোটা চার রঙ,
ইঞ্চি ফুট আর গজের ব্যাপারী
তাতেই বেজায় ঢঙ।

সবাকার চেয়ে মানুষ বড় যে
আমি কই তার কথা,
অতুল তাহার শৌর্য্য-বীর্য্য
অদ্ভুত জাতীয়তা।

তার উত্থান- পতন-কাহিনী,
তাহার শিল্পকলা,
তার উজ্জ্বল গৌরব-গাথা
তব কাছে বৃথা বলা।

আকারের মত, বন্ধু, হে তব
বুদ্ধিও গোলাকার,
বিষুবরেখার জবর আমিন
জানাই নমস্কার।

চেন্ টেনে টেনে জীবন গোঁয়ালে
জরিপ করগে ভূমি,
আমার কদর বুঝিতে নারিবে
নক্সা-নবীশ তুমি।

———

ধুন্ধুমার রাজার কথা।

(মহাভারত হইতে)

সে কালে সূর্য্যবংশে বৃহদশ্ব নামে এক মস্ত বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কুবলাশ্ব। কুবলাশ্ব গুণে হইয়াছিলেন বাপের চেয়েও বড়। যেমন বীর, তেমনি ধার্ম্মিক। আর কুবলাশ্বের ছেলে হইয়াছিল কতগুলি জান ? একুশ হাজার।

বৃহদশ্ব পুত্রকে এত বড় উপযুক্ত দেখিয়া রাজ্যশাসনে বসাইয়া দিলেন, আর নিজে চলিলেন তপস্যা করিতে বনে। উতঙ্ক নামে এক খুব বড় ঋষি ছিলেন। তিনি শুনিলেন, বৃহদশ্ব রাজ্য ছাড়িয়া বনে যাইতেছেন, আর অমনি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এমন সুন্দর করিয়া রাজ্য শাসন করেন, আর এখন বনে যাইতেছেন ? কখনো তাহা করিবেন না, প্রজা পালন করাই আপনার উচিত। প্রজা পালনে যতটা ধর্ম্ম হয়, বনে গেলে তাহা হয় না।"

উতঙ্ক মুনির নিজের একটু গরজ ছিল। তাঁহার আশ্রম ছিল মরুধন্ব প্রদেশে—আর সেই আশ্রমের কাছেই উজ্জালক নামে বালিতে ভরা একটী প্রকাণ্ড সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্রে মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধু * নামে এক বেজায়

* মহাভারতে এইরকমই আছে। মধু ও কৈটভ দুইটী অসুরের নাম। দুইজনের এক পুত্র কেমন করিয়া হইল মহাভারতে তাহা লেখা নাই। হরিবংশ নামক অন্য এক পুরাণে পাওয়া যায় ধুন্ধু ছিল মধুর পুত্র।

দুরন্ত অসুর বাস করিত। ধুন্ধু বালির মধ্যে ঘুমাইয়া থাকিত—আর এক বৎসর গেলে নিঃশ্বাস ছাড়িত। সে কি যে সে নিঃশ্বাস? সে নিশ্বাসে কত ধূলাই

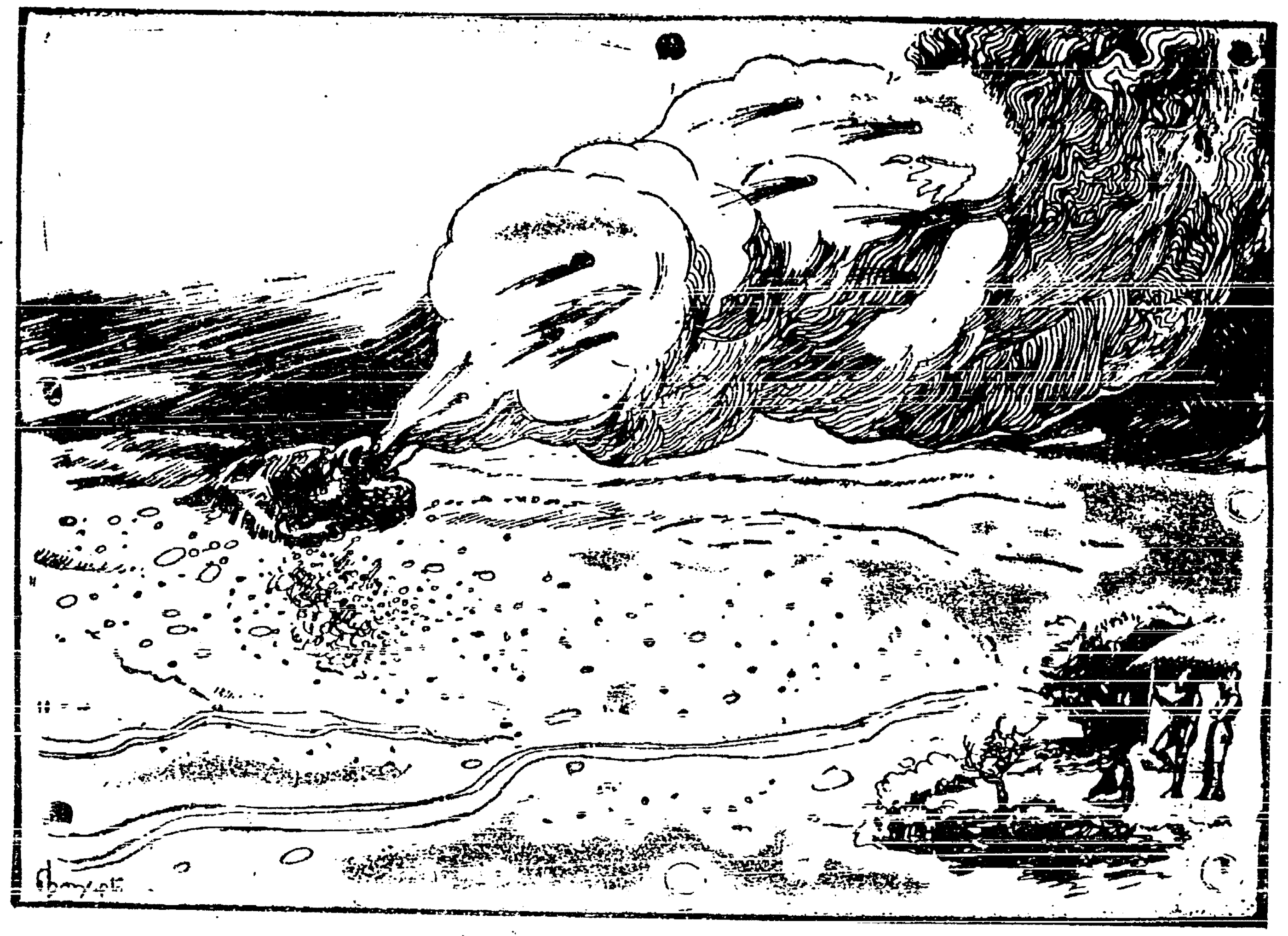

এক বৎসর গেলে নিঃশ্বাস ছাড়িত।

উড়িত—আর পাহাড় বন সঙ্গে নিয়া পৃথিবী উপর দিকে উঠিয়া পড়িয়া এমন কাঁপিত যে আগুনের শিখা, ফুল্‌কা ও ধোঁয়া বাহির হইতে থাকিত। মুনির তখন সেই আশ্রমে থাকিতে বড়ই কষ্ট হইত। সেই অসুর আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার কাছে এমন বর পাইয়াছিল যে দেবতা, দানব, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস কাহারও সাধ্য ছিল না তাহাকে বধ করে।

মুনি রাজাকে বলিলেন, 'আগে ঐ অসুরটাকে মারুন' তারপর বনে যাইবেন, আমি বিষ্ণুর নিকট বর পাইয়াছি, যে রাজা ঐ ধুন্ধুকে মারিতে যাইবে তাহার শরীরে বিষ্ণুতেজ প্রবেশ করিবে। আপনি সেই তেজ লইয়া উহাকে মারিয়া ফেলুন'।

রাজা বৃহদশ্ব কিন্তু মুনির কথা রাখিতে পারিলেন না। তিনি হাতযোড়

করিয়া বলিলেন—'ভগবন, আমি যে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাকে আপনি বিদায় দিন,—আমার ছেলে কুবলাশ্ব আছে, সে তার ছেলেদের সঙ্গে নিয়া ধুন্ধুকে মারিয়া আসিবে।

উতঙ্ক এ কথায় সায় দিলেন, রাজাও বনে চলিয়া গেলেন।

ধুন্ধুর পিতা মধুকৈটভ দৈত্য মরিয়াছিল বিষ্ণুর হাতে। বিষ্ণু যখন প্রলয়ের কালে শেষ নাগের শরীরের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার নাভি হইতে সূর্য্যের মত তেজঃসম্পন্ন এক পদ্ম বাহির হয়। সেই পদ্ম হইতেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার জন্ম। মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইয়াই তাঁহাকে ভয় দেখাইতে থাকে। ব্রহ্মা ভয়ে সেই পদ্মের ডাঁট নাড়িতে থাকায় বিষ্ণুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি ঐ প্রবল অসুর দুইটাকে দেখিয়া তাহাদিগকে কুশল-প্রশ্ন করার পর বর দিতে চাহেন। অসুরেরা তখন বলিয়া ফেলে 'আমরাই বরদাতা, তুমি আমাদের কাছে বর চাও।' বিষ্ণু উত্তরে বলেন—"তোমরা ত মস্ত বীরই, লোকের উপকারের জন্য আমি এই বর চাই যে আমি যেন তোমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে পারি।"

অসুরেরা তখন বলে 'আমরা কোনকালেও মিথ্যা কথা কহি নাই, আমরা সত্যপ্রিয়, এখন আমাদের কথা মিথ্যা হইবে কেন? কিন্তু আমাদিগকে মারিতে হইবে এমন জায়গায় যাহার উপর কোন আবরণ নাই,—এ বর আমরা পূর্ব্বেই তোমাকে দিয়াছি।'

ভগবান বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করিয়া নিজের উরুর উপর মধুকৈটভকে রাখিয়া চক্র দিয়া তাহাদের মাথা কাটিয়া দিয়াছিলেন।

পিতার শত্রু বলিয়া বিষ্ণুর উপর ধুন্ধুর রাগটা বরাবরই ছিল। সে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণকে এবং গন্ধর্ব্বগণকে বারবার হারাইয়া দিয়া বিশেষ কষ্ট দিয়াছিল। শেষে উজ্জালক সমুদ্রে বালির মধ্যে থাকিয়া উতঙ্ক মুনির আশ্রমের একটা উৎপাত হইয়া পড়িয়াছিল। আগুনের শিখার মত তাহার ভয়ানক নিঃশ্বাস—আশ্রমটাও ছিল খুব কাছে।

কুবলাশ্বরাজা নিজের সৈন্য সামন্ত, ২১ হাজার পুত্র ও উতঙ্ক মুনিকে সঙ্গে

লইয়া যখন ধুন্ধুকে মারিতে চলিলেন তখন বিষ্ণু সাহায্যের জন্য তাঁহার শরীরটা নিজের তেজে পূর্ণ করিয়া দিলেন। আকাশ হইতে দেবতারা কুবলাশ্বের উপর ফুল ছড়াইতে লাগিলেন। দেবতাদের বাজনা বাজিয়া উঠিল, বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া আস্তে আস্তে বহিতে লাগিল ; ইন্দ্র বৃষ্টি নামাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও বড় বড় ঋষিরা যুদ্ধের তামাসা দেখার জন্য রথে চড়িয়া আকাশের উপরই রহিলেন।

মধুকৈটভ-বধে ভগবান্ বিষ্ণু।

কুবলাশ্বের শরীরে বিষ্ণুর তেজ, তিনি তাঁহার ছেলে-গুলিকে উজ্জালকসাগরের চারিদিক ঘিরিয়া উহা খুঁড়িতে বলিয়া দিলেন। সাতদিন খোঁড়া হইলে বালির মধ্যে অসুরের শরীরটা দেখা গেল। সে কি ভয়ানক শরীর ! সেটা সূর্য্যের মত জ্বলিতেছিল। কুবলাশ্বের পুত্রেরা অসুরের চারিদিক ঘিরিয়া তাহার উপর নানা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিতে লাগিল।

ধুন্ধু ভয়ানক মা'র খাইয়া চটিয়া গেল, আর সেই অস্ত্রশস্ত্রগুলি গিলিতে লাগিল। তখন তাহার মুখ হইতে যে ভয়ানক আগুন বাহির হইল সাধ্য কি যে রাজার সেই ২১ হাজার ছেলে তাহার কাছে দাঁড়ায় ! তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইল। তিনটী ছাড়া আর সকলেই একেবারে পুড়িয়া ছাই ! তখন রাজা কুবলাশ্ব নিজেই

সেই অসুরকে মারিতে চলিলেন। রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ ঘুম ভাঙ্গার পর যেমন ভয়ানক দেখাইয়াছিল, অসুর ধুন্ধুও সেইরূপ। রাজা অসুরের নিকট আসিলে তাহার শরীর হইতে জল বাহির হইতে লাগিল। সে ত জল নয়, জলের আকারে সাক্ষাৎ তেজ। রাজা সেই জল খাইয়া ফেলিলেন—আর যোগের জল দিয়া অসুরের মুখের আগুন নিবাইয়া দিলেন। শেষে তিনি ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িয়া অসুরকে একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

দেবতারা ও বড় বড় ঋষিরা ত ভারী খুসী। তাঁহারা রাজা কুবলাশ্বকে বলিলেন,—'তুমি বর লও।' রাজা খুব নম্রভাবে হাতযোড় করিয়া আনন্দের সহিত বলিলেন—'দেবগণ, আমি যেন ব্রাহ্মণদিগকে ধন দিতে পারি, * শত্রুরা যেন

রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমাকে হারাইতে না পারে, নারায়ণের সঙ্গে যেন আমার খুব ভাব থাকে,

* তখনকার ব্রাহ্মণেরাও দানের পাত্রই ছিলেন।

আমার মনে যেন কোন অনিষ্টচিন্তা না জাগে, ধর্ম্মে যেন সর্ব্বদা মতি থাকে এবং শেষে যেন চিরকাল স্বর্গে থাকিতে পারি।'

দেবতারা খুসী হইয়া বলিলেন—'তাহাই হইবে।' উতঙ্ক মুনি, গন্ধর্ব্ব ও ঋষির দল রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ধুন্ধু অসুরকে মারিয়াছিলেন বলিয়া রাজা কুবলাশ্বের নাম হইল ধুন্ধুমার। সূর্য্যবংশ ধুন্ধুর নিঃশ্বাসের আগুনে নিঃশেষ হইল না। কুবলাশ্বের যে তিনটী ছেলে রক্ষা পাইল, তাহাদিগের হইতে আবার বংশটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঐ ছেলে তিনটীর নাম দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব।

দিনে দুপুরে

(শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল)

অতবড় ছেলেটাকে অমন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌তে দেখে আমরা গাড়ী-শুদ্ধ লোক একেবারে যেন অবাক্ হয়ে গেলাম। সবাই এক সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌ল—কেউ বল্লে "রোকো রোকো," কেউ বল্‌লে,—"একখানা হাত ছিঁড়ে ঐ 'আপ্' গাড়ীখানাতেই র'য়ে গেছে"—কেউ কণ্ডাক্‌টারকে দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লে,—"বেল্ দাওনা হে!" এবং কণ্ডাক্‌টারের অপেক্ষা না ক'রেই যে হাতের কাছে পেলে, সেই একবার করে দড়ি ধরে টান্ মারতে ছাড়লে না। ফাষ্টক্লাশের কণ্ডাক্‌টার হতভম্ব হ'য়ে গিয়ে একটার বদলে দুটো বেল্‌ই দিয়ে ফেল্‌লে, এবং ফলে গাড়ী যেমন চল্‌ছিল, চৌরঙ্গীর মাঠের কাছে এসে তার দ্বিগুণ জোরে চল্‌তে লাগ্‌ল। সবাই বলে—"কি হ'য়েছে, মশাই?" ফাষ্টক্লাশ থেকে সাহেব মেম ঝুঁকে পড়লো—"হোয়াট ইজ্ দি ম্যাটার বাবু?" অফিসের ফির্‌তি মুখো গাড়ী, তার উপর সেকেণ্ড ক্লাশ—যেন "বিস্‌রা লাইমের বস্তা বোঝাই ক'রে চ'লেছে। সামনের লোকগুলো যে যা পারলে বলে দিলে।

"ওয়ান্ হ্যাণ্ড টরন্ ইন্ দি আপ্ কার, ম্যাডাম্"। "নো, নো, হিজ হেড্ ব্রোকন্ এণ্ড অল্ দি বাটার্ কাম্ আউট্।" এবং আরও কত কি।

মাথার ঘিলু বেরিয়ে গেছে, এবং হাতটা ছিঁড়ে গেছে শুনে মেম সাহেবদের গা বমি বমি কর্‌তে লাগলো। লোকটাকে অবিলম্বে হাঁসপাতালে পাঠান উচিত, এই পরামর্শ দিয়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়্‌লেন। ফাষ্ট ক্লাশের সামনের বেঞ্চীর কয়েকজন সহৃদয় সাহেব হৈ চৈ শুনে, জান্‌লা দিয়ে ছড়ি বাড়িয়ে ড্রাইভারকে খোঁচা দিয়ে গাড়ীখানাকে সত্য সত্যই অচল ক'রে ফেল্‌লেন।

কিন্তু এত বড় একটা কাণ্ড একেবারে একটী মূষিক প্রসব কর্‌লে।

পেছন থেকে একজন ভারী গলায় বল্‌লে "না, না, কিছু হয়নি, মশায়; এই ফাষ্টক্লাশ! বেল্ দাও।" কিন্তু গোলমাল এবং হৈ চৈ যেমন চলছিল তেমনই চল্‌তে লাগলো। ব্যাপারটা কি, জান্‌বার জন্য একটু ঠেলাঠেলি ক'রে এগিয়ে দেখলাম একটী ১৯।২০ বছরের ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কোঁচার খুটে নাক মুছ্‌ছে এবং তাকে সবাই মিলে সান্ত্বনা দিয়েও শান্ত করতে পারছে না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঘটনাটা সে যা সবাইকে বল্‌ছে তা এই—

পরশু বাড়ীতে বে। বদ্দোমানে বাড়ী গো, বড় বেলুনগাঁয়ে—বামুন কায়েতের বাস নেই, সব আগুরী, চাঁষী, মুনিষ, চাঁষ কর্য়ে খায়। বে'র বাজার কর্‌তে সে এয়্যেছিল কলক্যাতায় তার গুলেদাদার সঙ্গে। হাবড়ার ইষ্টিশানে লেম্যে, মটরে চঁড়্যে, কাপড়ের দোকানকে এয়্যেছিল। হোতায় য়েস্যে সে তার গুলে দাদাকে হারিয়ে ফেল্যেচে। শেষে উপায় না দেখে, খানিক এদিক্‌ওদিক্ ঘুরে এই ছোট 'রেলে' উঠে পড়েছে—এবং তার উপর কণ্ডাকটার পয়সা চাওয়াতেই এই কাণ্ড!

ব্যাপারটা সব বলেই সে আবার কেঁদে উঠ্‌লো—"ওগো, গুলে দাদা গো—ও-হো-হো,—তুমি ঘরে ফির্য়ে কি কইবে গো?"

পাশে এক মাড়োয়ারী বসে বসে ঢুল্‌ছিল, গোলমালে তার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে তার মেজাজ্ একটু ঝাঁঝিয়ে ছিল। একটা ধমক্ দিয়ে বল্‌লে "আরে

চুপ্ রও, আবি পুল্সের হাতে জিম্বা করো্যে দেবে হামি। এত্তাবড়া ছোকড়া রোৎতা হ্যায় লড়্কনিয়োকো মাফিক্। চুপ্‌সে বৈঠো,—নেই তো, সড়কের উপ্‌রে ছোড়ে দেবে। ই কল্‌কাত্তা শহর হ্যায়! কেত্তো চোর, আউর ডাকু থাকে ইখানে; জান্ লিয়ে লেবে! সম্‌ঝেছো? চুপ্‌সে সুস্থির বৈঠো।”

চোর, ডাকাতের নাম শুনে ছেলেটী করুণভাবে বল্‌লে, “মশাই, আমাকে বাঁচান! ওরে বাবা রে! আমার গুলে দাদাকে নিশ্চয়ই ডাকাতে মেরে ফেল্যেছে। ওঃ, হোঃ, হোঃ।”

জান্‌লার ধারে বেঞ্চীর উপর পা মুড়ে এক ভদ্রলোক নিবিষ্টমনে একখানি বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বোধ করি চীনের যুদ্ধের খবরগুলো নিঃশেষ ক'রে, তাঁর একখানি কাঁচশূন্য এবং আর একখানি কাঁচবাঁধা চশমাটীর তলা দিয়ে চোখ দুটী বা'র ক'রে ঘাড়টী অসম্ভব রকম উঁচু ক'রে বল্‌লেন—“কী বল্‌ল্যা? য়্যাঁ, বদ্দোমানে বাড়ী?—কোন্ গাঁয়ে হে ছোক্‌রা?—বড় বেলুন?—ইষ্টিশান

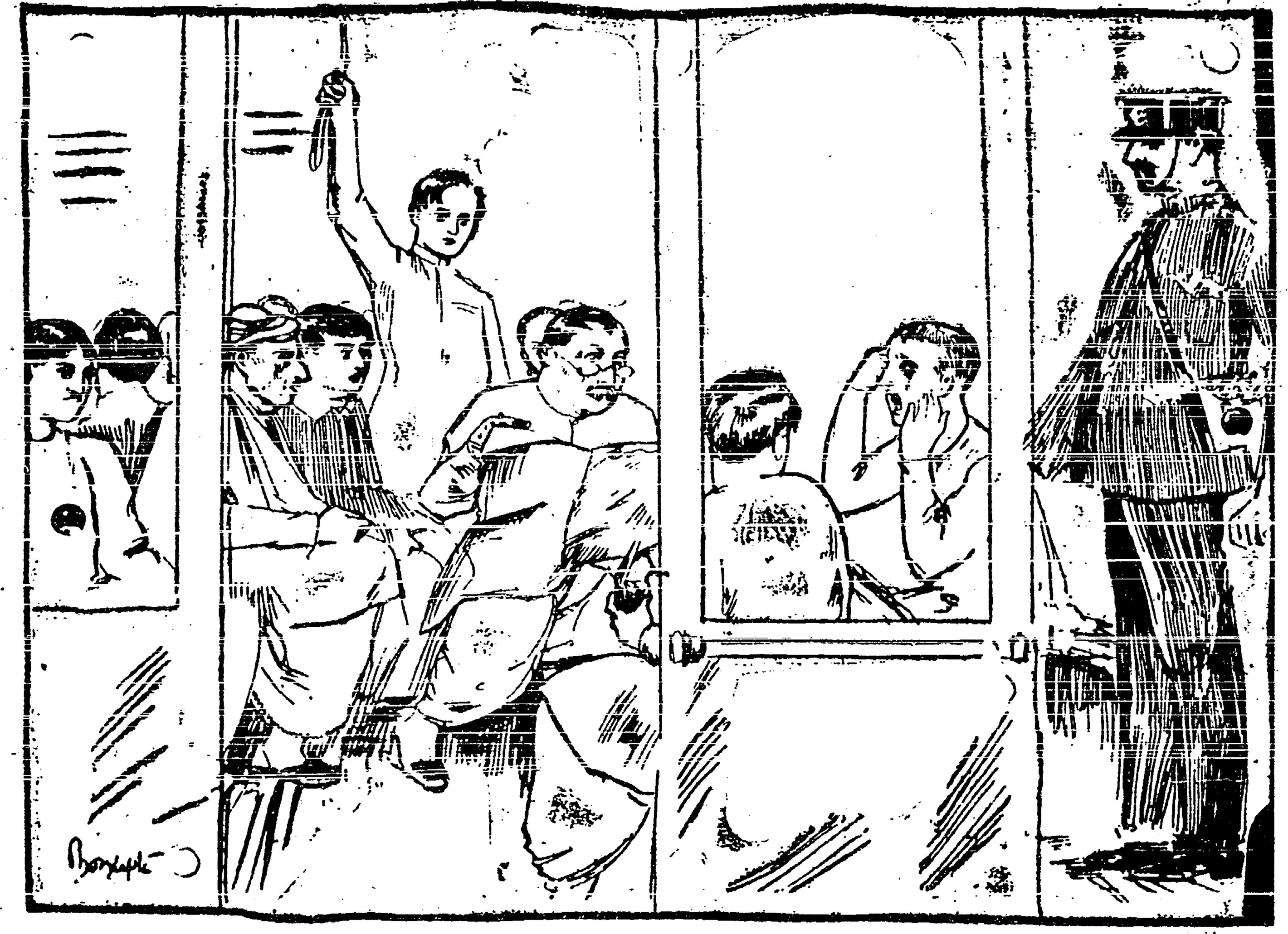

“কি বলল্যাঃ! য়্যাঁ, বদ্দোমানে বাড়ী…?”

থেকে ক' কোশ হবে?—দশ কোশ? নাঃ, অত হবে না।—আমি যে গিচি মশায়—মাইল বারো হবে।”

ছোক্‌রাটী একটু আশান্বিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে,—“বাবু মশাই, আপনার দেশ কি বদ্দোমানে?”

ভদ্রলোক সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “ক্ষেপেছো?” এবং পরক্ষণেই কাগজখানার আর একপিঠ উল্টে নিয়ে তেমনি নিবিষ্ট হয়ে গেলেন।

ছেলেটি হা হুতাশ ক'রে কাঁদতে লাগলো।

সবাই সমবেদনা প্রকাশ ক'রে বল্‌লে,—“দেখুন তো, মশাই, আক্কেল খানা—এই অজ পাড়া-গেঁয়ে মানুষটাকে কিনা এই ক'ল্‌কাতার সহরের মাঝ মধ্যিখানে ছেড়ে দেওয়া।”

সেই মাড়োয়ারীটী বল্‌লে “মগর হোতা হামারা দেশওয়ালী, তব কব্‌ভি রোতা নেহি—জ্যায়সে আওরতিয়া।”

ওই কোণের দিকে যে বাবরীকাটা চুলওয়ালা একটী ছোকরা দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণ তার দিকে কেউ চেয়েও দেখেনি। খুব করুণভাবে একটু সমবেদনা প্রকাশ করে সে বল্লে “দিয়ে দিন মশাইরা দু' এক পয়সা করে,—আহা বেচারী! বুঝলেন না, ফোঁটা ফোঁটা জল নিয়েই বৃষ্টি বন্যে হয়ে যায় মশাই,—আর এক এক পয়সা করে ওর ভাড়াটা উঠবে না, মশাই? আসুন দি' দু' এক পয়সা করে।” এই ব'লে সে পকেটে ব্যাগ হাতড়াতে লাগলো। চাঁদার কথা শুনে সবাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তা, বাড়ী, লোকজন—যেন এই সব দেখতে লাগ্‌লো।

ছেলেটী কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল ক'রে ফেলেছে। চাঁদা ওঠা দূরে থাক্, কণ্ডাক্টার দূরে এক “চেকার”কে দেখে তাকে নেমে যাবার জন্য ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগলো,—এবং সেও তত জোরে গুলে দাদার উদ্দেশ্যে নানা কথা বলে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এতগুলো লোকের এই হৃদয়হীন আচরণে বিরক্ত হয়ে বল্‌লাম “কত ভাড়া হে বদ্দোমানের?” চোখের জলের ভিতর দিয়ে রাঙ্গা রাঙ্গা দুই চোখ বার

করে সে বল্‌লে—"এক টাকা সাড়ে এগারো আনা"। পকেট থেকে সিকি, আধুলি ও দোয়ানীতে ট্রেন ভাড়া ও ট্রাম ভাড়া বাবদ দু' টাকাই তাকে দিয়ে দিলাম।

সে নিতেই চায়না। "না, মশাই, আপনার ঠিকেনা না দিলে নোবো না।"

বাবরীকাটা ছোক্‌রাটী বল্লে "যাক্‌, বেঁচে গেলে হে। ফিরেই বাবুকে টাকা দু'টো মণিঅর্ডার করে দিয়ো। চলো, আমি ট্রামে তুলে দিচ্ছি।—আমি নাব্‌বো এখানে।"

ছেলেটী চোখ মুছতে মুছতে নেমে গেল। এবং বাবরীকাটা ছোকরাটীও নেমে গেল।

নামতেই যা দেখলাম তাতে আমার মনে হ'ল জগৎ, সংসার, ব্রহ্ম সব মিথ্যা।

সেই বর্দ্ধমানের ছেলেটী বাবরীকাটা ছোকরাটীর পিঠের উপর দুম করে এক কীল মেরে বল্‌লে "এই দু' টাকা—আয় লিয়ে বাজী পাঁচ টাকা! জল্‌দি জল্‌দি—"

সবাই হৈ চৈ করে চেঁচামিচি করতে লাগলো "জোচ্চোর, জোচ্চোর! পুলিশ, পুলিশ!"

আমিও নেমে গেলাম। নামবার সময় শুনতে পেলাম মাড়োয়ারীটা বল্‌ছে "হাম্‌নে পহ্‌লেহি কহা থা!" এবং আরো কি কি।

সটান বাড়ীর দিকে চল্‌তে লাগলাম। সেদিন যা ঠকা ঠকেছিলাম, সে কথা কি আর কাউকে বলেছি? তোমাদেরই শুধু বল্‌ছি, যেন ফাঁস করে দিওনা আবার!

খনির আলো

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

সে আজ প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। মাটীর তলায় শত শত হাত নীচে কয়লার খনি—কোথায় বা রহিয়াছে সূর্য্যের আলো, আর কোথায় বা

রহিয়াছে বাহিরের জগতের হাসি-কোলাহল! যেদিকে তাকান যায়, শুধু কালো কয়লার স্তূপ আর গভীর অন্ধকার।

সেই ভীষণ পাতালপুরীর মধ্যে হাজারহাজার মজুর সারাদিন কয়লা ভাঙ্গিতে। কাজ তো নয়, যেন জীবন্ত কবর। বাতাস নাই, স্যাঁৎ সেঁতে গন্ধে প্রাণ বাহির হইয়া আসে; আর সব চেয়ে বড় শাস্তি, আলো জ্বালিবার উপায় নাই। একখানি মাত্র ইস্পাতের চাকা ঘুরিতেছে—চাকা ঘুরিবার সময় তাহার চক্‌চকে গা হইতে সামান্য আলোর যেটুকু আভাস পাওয়া যায়, সম্বল মাত্র সেটুকু। ভাবিয়া দেখ কি তাহাদের অবস্থা!

বিজ্ঞানবীর সার হামফ্রী ডেভি।

কেন সেখানে আলো জ্বালান' যাইত না, তাহা তোমরা জান কি? খনির মধ্যে বিশ্রী স্যাঁৎসেতে এক রকম গ্যাস জমিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে বলেন "মার্শ গ্যাস", (Marsh gas) আর সাধারণ লোকে ইহাকে বলে ফায়ার ড্যাম্প (Fire damp)।

এই গ্যাসের কাছে যদি আগুন লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া দপ্‌ করিয়া গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে চারিদিক্‌ কাঁপাইয়া ফাটাইয়া দিয়া যাইবে। কাছে যাহারা থাকিবে তাহাদের আর বাঁচিবার কোনই আশা নাই।

বছরের পর বছর খনির ভিতর আলো লইবার চেষ্টা হইত,আর হাজার হাজার মজুর এম্নি করিয়া সেই ভীষণ গ্যাসের মুখে প্রাণ দিত। এম্নি করিয়া আর কতদিন চলে ? আলোও ব্যবহার করা যায় না, আবার অন্ধকারে কাজ করাও যেমনি কঠিন, তেমনি বিপদের। অথচ কেহই কোন উপায় বাহির করিতে পারে না।

সার হাম্‌ফ্রী ডেভি তখন বিলাতের এক মস্ত বৈজ্ঞানিক। আজ এটা আবিষ্কার করিতেছেন, কাল ওটা, পণ্ডিতমহলে তাঁহার যুড়িদার আর নাই বলিলেই চলে। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল "ডেভি যদি মাথা খাটাইয়া কিছু করিতে পারেন।"

এই সময় নিউ ক্যাসেলের নিকট হজ্‌সন্ নামে এক পাদ্রী বাস করিতেন, লোকে তাঁহাকে বলিত "গরীবের বন্ধু"। খনির মজুরদের জীবন দেখিয়া হজ্‌সন্ আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না। "যেমন করিয়া হউক, খনির ভিতর আলো লইতে হইবে" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। একদিন তিনি গিয়া ডেভিকে পাকড়াও করিলেন, "এর একটা প্রতিকার আপনাকেই করিতে হইবে। কেননা যদি কেউ পারে সে বিজ্ঞান। আপনার বসিয়া থাকিলে চলিবে না।"

খনির বিপদের কথায় ডেভির মনে বড় লাগিল। তিনি হজ্‌সন্‌কে আশ্বাস দিয়া তাঁহার বিজ্ঞান-পরীক্ষার ঘরে ঢুকিলেন।

দিনের পর দিন যায়—দিন নাই, রাত নাই, ডেভি খালি চিন্তা করেন আর নানারকম পরীক্ষা করেন। তিনি কত ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন, কত গ্যাস বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিদ্যুৎ লইয়া কত কাণ্ড করিয়াছেন, আর এটা পারিবেন না ? পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন তিনি এক উপায় আবিষ্কার করিয়া বসিলেন।

ডেভি তারের জাল লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন তারের জাল আগুনের উপর রাখিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো বাহির হইয়া আসে কিন্তু আগুন বাহির হইতে পারে না। তোমরা হয়ত বলিবে আগুন না ই বা বাহিরে

আসিল কিন্তু জালের ভিতর দিয়া গ্যাস ঢুকিয়া ত' আগুনের সাথে মিশিতে পারে। তাহা হইলে ও ত' যে বিপদ ছিল সেই হইল।

ডেভিও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন বই কি! অত বড় মাথাওয়ালা লোকটার কি সহজে ভুল চুক হয় ? কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গ্যাস তারের জালের ভিতর আগুনের সহিত মিশিয়া জ্বলিয়া উঠুক না কেন, সে আগুন জালের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিবে না।

তিনি তখন হজসনকে বলিলেন "এক বোতল ফায়ার-ড্যাম্প আনিয়া দিন ত।" ফায়ার-ড্যাম্প আসিল। ডেভি একটা প্রদীপের চারিদিক তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া, তাহার সম্মুখে সেই গ্যাস ছাড়িয়া দিলেন। গ্যাস জালের ছিদ্র দিয়া ভিতরে ঢুকিল, আগুনের সাথে মিশিল, কিন্তু জালের বাহিরে কোন দুর্ঘটনাই ঘটিল না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনা।

ডেভি তারপর একরকম লণ্ঠন তৈরী করিলেন। বিশেষ কিছুই না— সাধারণ একটা তেলের বাতি। তাহার চারিদিকে তারের জাল চিমনীর মত করিয়া ঘেরা। তিনি ইহার নাম দিলেন "সেফ্‌টি ল্যাম্প" বা "নিরাপদ দীপ।" ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী 'সেফ্‌টি ল্যাম্প' তৈরী হইল। হজসন তখন সেই সামান্য অথচ অদ্ভুত আলো লইয়া খনির ভিতর নামিলেন।

পাতালপুরীর গভীর অন্ধকারে মজুরেরা কয়লা ভাঙ্গিতেছে, হঠাৎ তাহাদের চোখে একটা আলোর কিরণ আসিয়া পড়িল। সকলে চমকিয়া দেখে একজন লোক আলো হাতে ধীরে ধীরে খনির ভিতর আসিতেছে। ভয়ে তাহাদের মুখ সাদা হইয়া গেল ; সকলে একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"আলো নিভাও, আলো নিভাও"। তাহারা ত' আর জানে না এ আলোর কি গুণ। তাহারা জানে এখনই সেই ভীষণ গ্যাস আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও জীবনের সাধ শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবু আলো নিভিল না ; আরও নিকটে আসিতে লাগিল। আবার চীৎকার শোনা গেল—"আলো নিভাইয়া ফেল, মূর্খ না পাগল! জাননা এখনই কি কাণ্ড ঘটিবে ?" সে শব্দ যেন পারে ত'

সেই লোকটিকে ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু তবু আলো নিভিল না। রাগে, ভয়ে বেচারাদের গলা আটকাইয়া আসিতেছিল। তবু প্রাণপণে তাহারা শেষবার

"আলো নিভাও, আলো নিভাও।"

চীৎকার করিয়া উঠিল "পায়ে পড়ি, আলো নিভাও।" আলো কিন্তু তখনও আগাইয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে হজসন মজুরদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল—এ যে গরীবের বন্ধু পাদ্রী হজসন সাহেব। হাতে তাঁহার সেকি অদ্ভুত মায়াপ্রদীপ। তোমরা আরোব্যোপন্যাসে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা পড়িয়াছ। ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প তাহাকেও হার মানাইয়া দিল। খনির অন্ধকার বুকে সে যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ—অন্য জগৎ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে।

ডেভি শুনিলেন তাঁহার আবিষ্কার সার্থক হইয়াছে। সকলে তখন তাঁহাকে বলিল "এ অদ্ভুত আলোর আবিষ্কারের স্বত্ব আপনি ছাড়িবেন না! বছরে ইহা হইতে আপনার অন্ততঃ দেড়লাখ টাকা আয় হইবে।" ডেভি কিছুতেই রাজী হইলেন না। তিনি উত্তর দিলেন "আমি টাকা লইয়া প্রাণ বাঁচাইতে চাই না। আমার আলো গরীবের জন্য। যাহার খুসী ব্যবহার করুক।"

আজ একশ বছর পরে খনির চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের হাতে

পড়িয়া এখনকার এই বিদ্যুতের (Electricity) যুগের খনির সাথে সেকালের খনির কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ডেভির সেই মরণ-জয়ী আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রহিয়া গিয়াছে।

পণ

(শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত বি, এ)

লক্ষ্মী-বারেতে চা'ল ধার দিতে কুণ্ঠিত হও ভাইকে ভাই,
লক্ষ্মী তুলিছ পরের খামারে, বিনিময়ে তার পেয়ে কি ছাই ?
শতেক বছর আগেও যখন মায়ের বক্ষে বসেনি রেল,
টাকা টাকা মণ ছিল ধান গম, টাকায় মিলিত ছ'সের তেল ;
বিলায়ে পরেরে দুহাতে সে সব হাজার হাজার গাড়ী
সাবান, এসেন্স, জলছবি নিলে বাহারি সেমিজ শাড়ী।

পেটের অন্ন বেচিয়া আলোক জ্বালিলে ফর্সা কাঁচে,
সাবান্ মাখিয়া, চিম্‌নি সাজায়ে শুনেছ মানুষ বাঁচে ?
প্রাঙ্গণে যার ঝরে শেফালিকা, উদ্যানে ফোটে যূথী,
তার ছেলেদের মালা গেঁথে আনে ইউরোপ থেকে পুঁতি !
চা'ল বেচে মোরা সিগারেট খাই, গিন্নি পরেন চুড়ি,
এহেন জাতের স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে পাবেনা যুড়ি।

নর ছিনু মোরা হইনু বানর, ওরা হ'ল নারায়ণ,
মোদের সঙ্গ ছাড়িয়া কমলা ওদের সঙ্গে র'ন ;
বাইশ বছর গড়ে বাঁচি মোরা, ওরা বাঁচে পঞ্চাশ,
ওরা খায় যত মাংস, পণীর, মোরা বাগানের ঘাস।
ঢাকাই শাড়ীতে শোভিত অঙ্গ ধরার শ্রেষ্ঠ সতী,
বিদেশী বসনে আজি সে লোলুপ, একি নিয়তির গতি ?

গান্ধীর মতে সন্ধি করিয়া অস্ত্র-বিহীন রণ
আজি, জাতিমান রক্ষার তরে, হউক মোদের পণ ;
দু'বেলা দু'পেট মোটা ভাত খাব, পরিব কাপড় মোটা,
এই অস্ত্রেই মুক্তি লভিব, ধরিব না লাঠি সোটা ;
আজি হ'তে ভাই এই হ'ল পণ আমি বলি তুমি বল,
আজি হ'তে ভাই মুক্তির পথে আমি চলি তুমি চল।

অরুণ-আলো

(শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল্‌)

(১৭)

বিদ্যুতের বেগে ছুটে ছুটে পক্ষিরাজ ঘোড়া অরুণ আর পরীকে নিয়ে পশুদের স্বর্গে এসে নাম্‌ল।

অম্‌নি দলে দলে লাখে লাখে পশু, পাখী, সাপ, কীট, পতঙ্গ এবং আরও কত কি হুর্‌ হুর্‌ ক'রে এসে তাদিকে ঘিরে ফেল্‌ল। কিন্তু আগুনের খড়গ ও সোণার শেকলের ভয়ে বেশী কাছে ঘেঁসতে সাহস পেল না।

পরী বল্‌ল—"অরুণ, এদের কাছেই আলো আছে।"

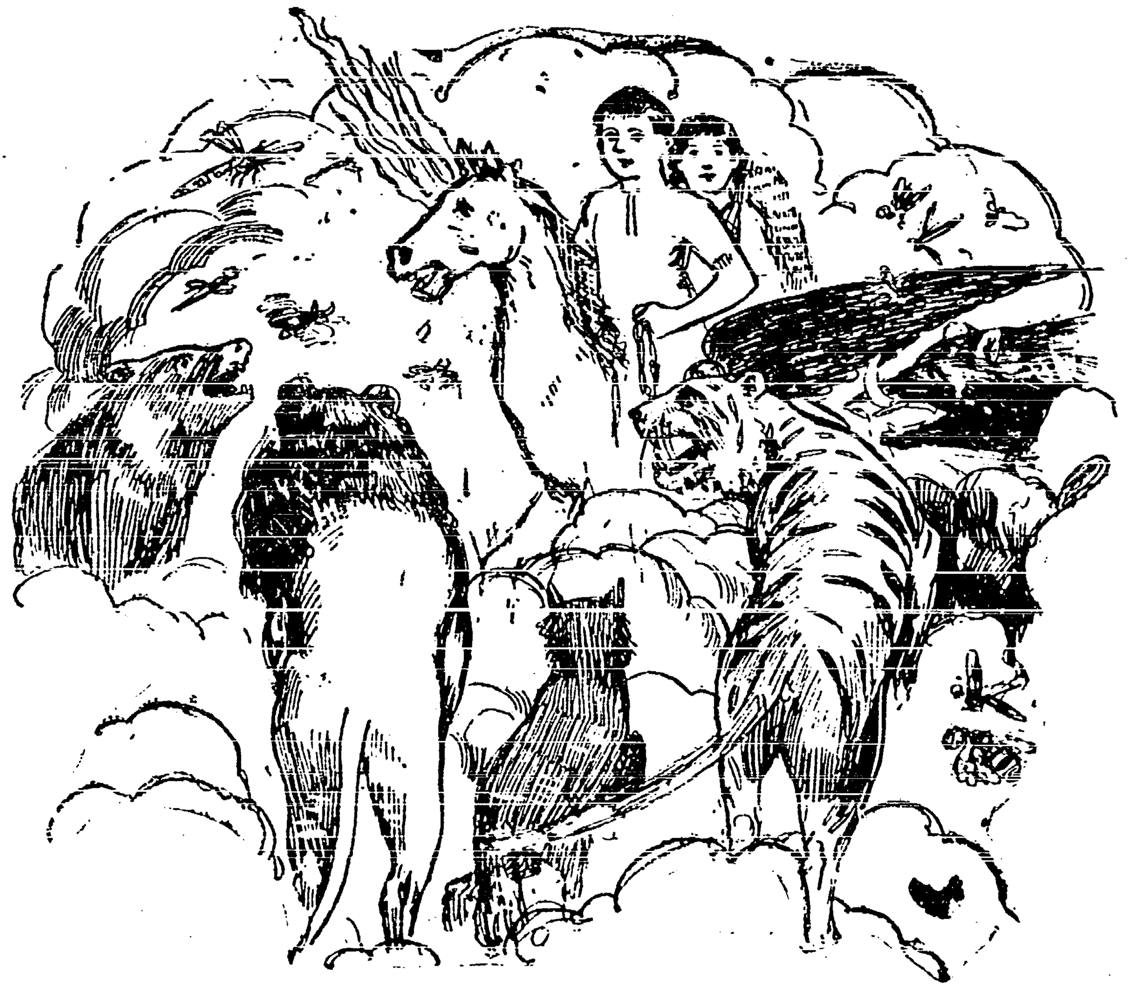

অম্‌নি দলে দলে লাখে লাখে পশু-পাখী···তাদিকে ঘিরে ফেল্‌ল।

অরুণ মুখে মৃদুহাসি হাস্‌ল। সে পশুদের ডেকে আজ্ঞা দিল—"তোমাদের কাছে আমার ভাগ্নী আলো রয়েছে। তাকে কোথায় রেখেছ ? এক্ষুণি আলোকে ফিরিয়ে দাও।"

পশুদের রাজার বুড়ো মন্ত্রী এগিয়ে এসে বল্‌লেন্‌—"আলোকে তবেই দেব, যদি একটা প্রতিজ্ঞা করো।"

"কি প্রতিজ্ঞা ?"

বুড়ো মন্ত্রী ধীরে ধীরে কইতে লাগ্‌লেন্‌—"শোন বাপু অরুণ, তুমি মানুষ। আমরা কেহ পশু, কেহ বা পক্ষী, কেহ কীট, কেহ পতঙ্গ, কেহ বা সাপ।"

অরুণ,—"আহা, তা ত জানি।"

মন্ত্রী—"হাঁ, জানো। কিন্তু একবার ভাব দেখি, বাপু, তোমাদের জাত এই মানুষেরা আমাদের উপর কি ভীষণ অত্যাচার কর্‌চে। আমাদের তোমরা যন্ত্রণা দাও, খাটিয়ে নাও, বলি দাও, হত্যা কর।—"

বুড়ো মন্ত্রী আরও কত কি বল্‌ছিলেন, কিন্তু হাঁফিয়ে পড়্‌লেন। তাই খানিক চুপ ক'রে বিশ্রাম কর্‌লেন, খক্‌ খক্‌ কাশ্‌লেন।

অরুণ ভেবে বুঝ্‌ল—হাঁ, এ সব সত্যি বটে। কিন্তু বুড়োর উদ্দেশ্যটা কি ?

বুড়ো মন্ত্রী ফের আরম্ভ কর্‌লেন—"সর্ব্বত্র আমরা বিতাড়িত হচ্ছি। আর তোমরা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সমস্ত পৃথিবীটা অধিকার ক'রে ফেল্‌চ। জঙ্গলগুলো কেটে বড় বড় বাড়ী, ঘর, বাজার, হাট, সহর, কারখানা নির্ম্মাণ ক'রে আনন্দ কর্‌চ,—কিন্তু এটা কি উচিত ?"

অরুণ পরীর দিকে চাহিল,—পরী গম্ভীর !

পশুদের বুড়ো মন্ত্রী আবার কাশ্‌লেন্‌ এবং বল্‌লেন—"শোন অরুণ,—আমরা পশু আর তোমরা মানুষ। তাই ব'লে কি আমরা ক্রমেই ধ্বংস পেয়ে যাব আর তোমরা ক্রমেই সভ্য হবে,—এটা কি উচিত ?"

অরুণ এইবার উত্তর দিল—"হাঁ, এ সব নিশ্চয়ই উচিত। কারণ, ভগবান্‌ মানুষের জন্যই পৃথিবীটা সৃষ্টি করেছেন।"

পশুদের বুড়ো মন্ত্রী তখন খুব জোরে মাথা নেড়ে ঘৃণায় হাস্‌লেন এবং আরও জোরে মাথা নেড়ে খক্ খক্ ক'রে কাশ্‌তে কাশ্‌তে বল্‌লেন—

"উঁহু, উঁহু, তা নয়, তা নয়, তোমরা ভুল করচ। অন্যায় করচ।"

অরুণ পরীর দিকে চায়, পরী গম্ভীর।

বুড়ো মন্ত্রী বল্‌লেন—"অরুণ, তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে মানুষের দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বল্‌বে, তারা যেন আমাদের পৃথিবী আমাদের ফিরিয়ে দেয়। কতটাই বা মানুষ আছে? তাদের অল্প স্থানেই বেশ চল্‌বে। কিন্তু আমাদের সংখ্যা কোটি কোটি, আমাদের আরও অনেক যায়গা দরকার।" বুড়ো মন্ত্রী থাম্‌লেন্ এবং পুনরায় বল্‌লেন—"করো অরুণ, প্রতিজ্ঞা করো। প্রতিজ্ঞা করো যে মানুষ জাতকে এই সব বুঝিয়ে বল্‌বে। নইলে আলোকে পাবে না।"

এইবার অরুণ ভাব্‌চে, সোণার শেকল আর আগুনের খড়্গ দিয়ে বুড়ো-মন্ত্রী ও পশুর পালকে জব্দ করবে!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সোণার শেকল গ'লে জল হ'য়ে গেল, আগুনের খড়্গ নিভে শূন্য হ'য়ে গেল!

পরী গম্ভীর, অরুণ অবাক্। মন্ত্রী বল্‌লেন—"দেখ্‌লে অরুণ? অত্যাচার করবার অস্ত্রশস্ত্র শেষ পর্য্যন্ত টেকে না! সুতরাং প্রতিজ্ঞা করো।"

অগত্যা অরুণ প্রতিজ্ঞা করল। তখন বুড়ো মন্ত্রী বল্‌লেন—"বেশ, কাল সকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আলো কে পাবে।"

তবে কি পশুদের দেবতার শাপ ফল্‌বে না? দেখা যাক কি হয়।

(১৮)

এইসব পশুদের মধ্যে ছিল এক শেয়াল। আলোদের বাড়ীর চাকর রামধন এই শেয়ালের মাকে মেরে ফেলেছিল; তাই শেয়াল আলোর উপর বিষম চটা। সে চায় যে আলোর দুঃখ আরও বেশী হোক্।

শেয়াল চুপচাপ সবই দেখ্‌ল, সবই শুন্‌ল। দেখ্‌ল, অরুণকে, পরীকে আর পক্ষিরাজ ঘোড়াকে। শুন্‌ল—বুড়ো মন্ত্রীর কথাবার্ত্তা এবং খক্ খক্ কাশি।

সে এক দৌড়ে গিয়ে হাজির হ'ল নদীর কিনারায়।

সেখানে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে শেয়াল বালি দিয়ে একটি মূর্ত্তি গড়্‌ল,—মূর্ত্তিটি দেখ্‌তে প্রায় আলোর মত।

সেই মূর্ত্তি নিয়ে আর এক দৌড়ে শেয়াল হাজির হ'ল,—পশুদের দেবতার মন্দিরের ভিতর।

গুহায় দেবতা ব'সে রয়েছেন। শেয়াল সাষ্টাঙ্গে প্রণত হ'য়ে নিবেদন করল—"হে মঙ্গলময় দেবতা, হে পরম পিতা, আমি আলোকে জব্দ করতে চাই।"

নিবেদন শুনে দেবতা খুসীই হলেন, কারণ তিনিও আলোর উপর চ'টে র'য়েছেন। বল্‌লেন—"আমি আলোকে শাস্তি দিয়েছি।"

শেয়াল সেই মূর্ত্তিটি দেবতাকে অর্পণ ক'রে প্রার্থনা করল—"হে মঙ্গলময় দেবতা, এই মূর্ত্তিটিতে মন্ত্র প'ড়ে প্রাণ দিয়ে দাও। নকল আলোর জন্ম হোক, এবং অরুণ এই নকল-আলো নিয়ে চলে যাক্। আসল আলোর দুঃখের যেন শেষ না হয়।"

দেবতা বল্‌লেন—'বেশ ত! নকল আলোকে পেয়ে অরুণ আলোকে ভুলে রইবে, আমার শাপ সার্থক হ'বে, বেশ হবে।"

এইরূপে নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে গুহার অন্ধকারে আলোর দুই শত্রু ঘোরতর ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করল।

নকল-আলো গ'ড়ে উঠ্‌ল। আলোর মতই তার আকৃতি, আলোর মতই তার রূপ, আলোর মতই তার মনভুলানো দমকা হাসি, পটলচেরা গভীর চোখ। সবই আলোর মত,—কিন্তু হ'লে কি হয়? আলোর ভিতরকার অন্তরটী, প্রকৃতিটী, মনটি সে কোথায় পাবে?

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শেয়াল গিয়ে অরুণকে নকল-আলো

উপহার দিল। অরুণ আলোকে ফিরে পেয়ে পাগলের মত আনন্দ কর্‌ল। তারপর তাকে সাথে নিয়ে পক্ষিরাজে চ'ড়ে বস্‌ল।

পরী বল্‌লে—"অরুণ, এ কিন্তু আলো নয়!"

অরুণ রেগে উঠ্‌ল—"কি বল্‌ছ?"

পরী—'এ আলো নয়।'

অরুণ—'আমি আলোকে চিনি না, তুমি চেনো! পরী, তুমি পাগল হ'য়েছ'।

পরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—"অরুণ, তুমি চ'লে যাও, আমি এখানেই থাকি।"

অরুণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কেন? কেন তুমি এখানে থাকবে?"

পরী।—"আলো এদেশে রয়েছে, তাই আমিও এই দেশে থাকব। যদি পারি, তবে আলোকে নিয়ে ফির্‌ব, নইলে ফির্‌ব না।"

পশুদেবতার মায়াবলে অরুণ পরীর কথায় একেবারেই কাণ দিল না। শুধু বল্‌ল—"সত্যি পরী, তুমি সত্যিই পাগল হ'য়েছ। এই যে আলো,—একে কি দেখ্‌ছ না?"

অতএব নকল-আলোকে পক্ষিরাজে চড়িয়ে অরুণ মহানন্দে আকাশপথে ফিরে চল্‌ল।

পশুর দেবতার শাপ ফ'লে গেল!

মনের দুঃখে পরী ধীরে ধীরে মন্দিরে গিয়ে আলোর পাশে এসে বস্‌ল।

তপস্বিনী আলো সেই মন্দিরের পূজারিণী হ'য়েই রইল। পরী তাকে কত সোহাগে নানা সান্ত্বনা দেয়,—কিন্তু আলোর সেই তপস্বিনীর বেশ, তার কেশ আলুথালু, সারা অঙ্গে ক্লান্তি, মুখে মলিন হাসি,—তার দুঃখের অন্ত নাই, বেদনার শেষ নাই!

(১৯)

"রিনি রিনি ঝিনি ঝিনি রুণুনু ঝুণুনু ঝুণু"—নকল-আলো নাচে, হাসে, গায়।

অরুণ বেশ সুখেই আছে। সত্যিকারের আলোকে সে একেবারেই ভুলেছে দেবতার শাপ সার্থক হ'য়েছে।

হঠাৎ তবু অরুণের মন যেন দুঃখিত হ'য়ে ওঠে,—কি যেন নাই, কি যেন হারিয়ে গেছে।

নকল-আলো তক্ষুনি আবার নাচে,—"রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু রিনিনি ঝিণিনি ঝিনি" আর অরুণও ফের খুসী হয়।

তবুও বারবার অরুণের দুঃখ ফিরে আসে। বাতাসে বাতাসে কে যেন মুহু মুহু স্বরে গুঞ্জরিয়া উঠে,—আলো নাই, আলো নাই, আলো নাই।

আকাশে তারায় তারায় কে যেন ছোট্ট অক্ষরে লিখে রাখে—আলো নাই, আলো নাই, আলো নাই।

সেই লেখার প্রতিবিম্ব পড়ে নদীর জলের বুকে। সেখানেও লেখা,—আলো নাই, আলো নাই।

মৌমাছিরা ফুলবনে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে গায়—"নাই, নাই, আলো নাই।"

অরুণ ভাবে কেন এমন হয়! চারিদিকে আকুল হ'য়ে সে চায়, আর ভাবে কেন এমন হয়!

নকল-আলো আবার হাসে, গায়, নাচে,—
রিনি ঝিনি রুণু ঝুণু।

(ক্রমশঃ)

চীনের ছাত্র-সমাজ

(শ্রীবিমল সেন)

(১)

সকল দেশের সকল ছাত্রের প্রাণে যে দুটো সুর সব চেয়ে বেশী ক'রে বাজে তা হ'ল দেশসেবা এবং অধ্যয়ন।

দেশকে ভালোবাসে না এমন ছেলে মেয়ে নাই। ভালো বই প'ড়ে নতুন নতুন জিনিষ শিখ্‌তে চায় না, এমন ছেলে মেয়েও নেই।

চীনের ছাত্রসমাজ আজ দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে লক্ষে লক্ষে যোগ দিয়েছে। তাই তারা পড়াশুনায় কেমন, তা জানতে অনেকের ইচ্ছা হ'তে পারে। আমি সেই সম্বন্ধেই দুচারটী কথা বল্‌ব।

চীনাদের ভাষা নাকি সব চেয়ে বর্ণবহুল। এক একটা জিনিস বুঝাতে এক একটা বর্ণের সৃষ্টি ক'রে চীনভাষায় চৌদ্দ হাজারের উপর বর্ণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজকাল যদিও চীন পণ্ডিতরা বর্ণের সংখ্যা অনেকটা কমিয়ে এনেছেন, তবুও চীনভাষা কঠিন ভাষাই র'য়ে গেছে।

চীন-ছাত্রদের এই কঠিন ভাষা আয়ত্ত করতে অনেক সময় দিতে হয়। তাতে তারা কুণ্ঠিত নয়। অধ্যয়নকে ঠিক তপস্যার মত দে'খে তারা পড়াশুনা করতে থাকে। দুঃখ-কষ্ট, অভাব কোন কিছুতে তাদের এ তপস্যার ব্যাঘাত হয় না। তাদের মধ্যেও যে বহুকাল হ'তে অধ্যয়নতপস্বী ছাত্র জন্মগ্রহণ করছে, তাদের দেশে প্রচলিত দুচারটী গল্প দিয়ে সেই কথাই আমি আজ বোঝাব।

(২)

চীনের এক পল্লীগ্রাম। এখানকার অধিবাসীরা এত গরীব যে কোনমতে প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে দুবেলা দুমুঠো খাবারের জোগাড় করে, কিন্তু রাত্রে যে আলো জ্বালাবে তা পারে না। দিন থাকতেই সব কাজ কর্ম্ম সেরে অন্ধকার হ'তেই শুয়ে পড়ে। এই দরিদ্র পল্লীর এক দরিদ্র গৃহস্থের পুত্র কাং। স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সে পড়্‌ত। তার পড়াশুনায় অসাধারণ মনোযোগ। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, সে একনিষ্ঠ সাধকের মত পড়ে। তারপর অন্ধকার হ'লেই তার মুখখানি বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। সে ভাবে, ভগবান্‌ যদি তাদের আলো জ্বালার মত পয়সা দিতেন, তা হ'লে তো রাত্রির সমস্ত সময়টা ঘুমিয়ে কাটাতে হ'ত না। সে আলোর সাহায্যে আরো বেশী পড়্‌তে পারত।

তখন শীতকাল। সমস্ত মাঠ-ঘাট সাদা সাদা বরফে ছেয়ে গেচে। একদিন অন্ধকারে সেই বরফের দিকে চেয়ে কাংএর মনে হ'ল, বরফগুলি থেকে যেন আলো ছুটে বেরুচ্ছে। বরফের অন্ধকারে সামান্য আলো দেবার শক্তি আছে। কাং একথা টের পেয়ে সেই শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা বরফের উপর বই খুলে পড়্‌ত। সমস্ত শীতকালটা এমনিভাবে কাট্‌ল। অতঃপর গ্রীষ্ম এল, বরফ গ'লে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এখন বেচারী কাং কি করে?

কিন্তু যার ইচ্ছা আছে, তার উপায়ের অভাব হয় না। কাং দেখ্‌ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোনাকী পোকাগুলি একটু একটু আলো দেয়। সে তখন বড় একটা কাঁচের বোতলে রাশি রাশি জোনাকী পোকা ভ'রে, বিচিত্র রকমের আলো তৈরি ক'রে নিল। তাতে রাত্রে তার বেশ পড়াশুনা চল্‌ত।

বড় হ'য়ে কাং একজন বিখ্যাত লোক হ'য়েছিল।

(৩)

ইয়াংসু যখন চার বছরের, তখন তার বাবা মারা যান। কাজেই অনাথ ইয়াংসুর পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করে, সংসারে এমন কেউই ছিল না। কিন্তু যার অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে তার নিজের তত্ত্বাবধান নিজে করে। পিতৃহারা ইয়াংসু নিজে নিজেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করতে লাগ্‌ল। অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সে পড়্‌ত। একটু বড় হ'লে তার কাগজের দরকার হ'ল। কিন্তু কাগজ কোথায়? কাগজ কেনার পয়সা তো তার নেই, অথচ কাগজ না হ'লে লেখা যাবে না, অঙ্ক কষা যাবে না, পরীক্ষায় পাশ করা শক্ত হবে। অনেক ভেবে চিন্তে ইয়াংসু এক চমৎকার উপায় বের ক'রলে। সমুদ্রের তীরেই তাদের বাড়ী ছিল। সে একটা কাঠি নিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতে ব'সে বালুশয্যার উপর লেখার কাজ করত।

ইয়াংসুর মত ছাত্র সেদিনে আর ছিল না বল্‌লেও চলে।

(৪)

আর একটি ছাত্রের কথা বল্‌ছি, এর বাড়ী ছিল 'সু'প্রদেশে।

ছাত্রটি গভীর মনোযোগী ছিল। অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তার অত্যন্ত বেশী। কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতার দরুণ সে বেশী রাত পড়তে পারতো না। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই ঘুমিয়ে পড়ত। অনেক দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রেও এ ঘুমকে থামাতে না পেরে সে এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন কর্‌ল। তার টিকিটার সঙ্গে একগাছা শক্ত দড়ি বেঁধে ছাতের কড়ি-বরগার সঙ্গে দড়িগাছি বেঁধে রাখল। যখনই ঘুমে ঢলে পড়ত, মাথায় হেঁচকা টান লেগে ঘুম্ টুটে যে'ত। বলা বাহুল্য এম্‌নিভাবে ঘুম দূর ক'রে সে একজন যশস্বী ছাত্র হ'য়েছিল।

(৫)

মেনিকাসের তিন বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হ'ল; কিন্তু তার মা ই তাকে সযত্নে মানুষ করতে লাগলেন। সকল মা ই চান, ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'য়ে উঠুক। মেনিকাসের মার প্রাণেও সেই আকাঙ্ক্ষা ছিল। মা কাপড় বুনে, সেলাইর কাজ করে ছেলের শিক্ষার ব্যয় বহন কর্‌তেন। তিনি দারুণ পরিশ্রম ক'র্‌তেন, কিন্তু সেজন্য তাঁর আনন্দ বই দুঃখ ছিল না। তাঁর আশা ছিল, মেনিকাস্ মানুষ হ'য়ে তাঁর সকল দুঃখ ঘোচাবে।

মেনিকাস্ কিন্তু মায়ের আশানুরূপ ফল দেখাতে পা'রল না। সে ছেলে হিসাবে ভালোই ছিল, প্রথম প্রথম খুব উৎসাহের সঙ্গেই স্কুলে যেত। কিন্তু কিছুদিনের ভিতর কেন যেন তার উৎসাহ পড়ে এল। শেষে একদিন মেনিকাস্ স্কুল থেকে পালিয়ে এল।

মা তখন একখানা দামী কাপড় বুনছিলেন। ছেলেকে স্কুল পালাতে দেখে তাঁর ভারী দুঃখ হ'ল কিন্তু তিনি কোন কথা না ব'লে একখানা ছুরি নিয়ে কাপড়-খানা টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেল্‌লেন।

মেনিকাস্ বিষণ্ণভাবে মার দিকে চাইল।

মা বল্‌লেন,—মেনিকাস্, এ কাপড়খানা কাট্‌তে দেখে তুমি যতটা দুঃখিত হ'য়েছ, তোমাকে স্কুলপালাতে দেখে আমি তার কত গুণ বেশী দুঃখিত হয়েছি, তা যদি বুঝ্‌তে।

মেনিকাস্ মায়ের বুকের ব্যথা বুঝ্‌তে পারল। সে বিনা বাক্যব্যয়ে স্কুলে চ'লে গেল।

এর পরে কেউ কখনো মেনিকাস্‌কে পড়াশুনায় অমনোযোগী হ'তে দেখেনি।

(৬)

পড়্‌বার তীব্র ইচ্ছা আছে, অথচ অভাবের দরুণ পড়্‌তে পারে না, এমন উদাহরণ দিতে হয় তো কোয়াং-হুংএর নামই মনে পড়ে।

কোয়াং-হুং যারপর নাই গরীব। সহরের অন্যান্য ছেলেদের পড়তে দেখে তারও ইচ্ছা হ'ল পড়বে, কিন্তু কেইবা বই দেবে, কেইবা আলো দেবে, কেইবা অন্যান্য খরচ দেবে!

কোয়াং মলিনমুখে দিন কাটাতে লাগল। অবশেষে সুযোগ উপস্থিত হ'ল। সেই সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট একটী বালকভৃত্য রাখ্‌বেন শুনে কোয়াং তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কোয়াংকে দেখে পছন্দ করে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তুমি কত মাইনে চাও?" কোয়াং বললে, "আমি মাইনে চাই না। আপনি আমায় পড়বার বই কিনে দেবেন। তার বদলে আমি আপনার কাজ ক'রব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট একটু অবাক্ হ'য়ে তাতেই রাজী হলেন। কোয়াং বই পেল, কিন্তু আলো কোথায় পায়? তখন সে এক বুদ্ধি বের কর্‌ল। তার পাশের বাড়ীর লোকদের আলো ছিল। কোয়াং মাঝখানের দেওয়ালটায় ছোট একটা ছেঁদা ক'রে যে সামান্য একটু আলো আস্‌ত, তাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বই পড়্‌ত।

পরীক্ষার সময় কোয়াং এমন চমৎকার ফল দেখালো যে সম্রাটের কাণে তার কথা উঠ্‌ল। সম্রাট্ খুসি হ'য়ে তাকে বড় একটা সরকারী চাকরী দিলেন।

এই মেধাবী ছাত্র কালে চীনসাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হ'য়েছিল।

———

বাঙ্গালী পালোয়ান ভূপেশচন্দ্র

মাঘ মাসের 'রামধনু'তে তোমরা 'বাঙ্গালী পালোয়ান' রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার কথা পড়িয়াছ। পাশে যে ছবিখানা দেখিতেছ এটী তাঁহার একজন শিষ্যের ছবি। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার, ইনিও গুরুর একজন উপযুক্ত শিষ্য। বড় বড় লোহার ডাণ্ডা লইয়া ইনি জিলাপির মত পাক দিতে পারেন। শরীরের সমস্ত পেশী সঞ্চালন করিতেও ইনি পটু। বুকের উপর ভারী ভারী জিনিষ রাখা, গরুর গাড়ী চালান প্রভৃতি আরও অনেক শক্তির কাজ ইনি দেখাইয়াছেন। ভূপেশচন্দ্র কলিকাতা রিপণ কলেজে পড়েন।

বাঙ্গালী পালোয়ান ভূপেশচন্দ্র।

পদ্মরাগ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

(১)

গুণ্ডার কবলে

রাত তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ঢাকা সহরের বড় রাস্তার উপর, বেশ সাজানো গোছান একখানা দোতালা বাড়ীর সামনে রণজিতের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

কোন্ রণজিতের কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছ। সমশেরপুরের রণজিতের নামটা কি আর শোন নাই? সারা বাংলা দেশটায় খেলা-ধূলা, দৌড়ঝাঁপ সাঁতার-কসরৎ প্রভৃতিতে অত বড় ওস্তাদ আর কে আছে? বয়স তার সবে এই পঁচিশ ছাব্বিশ বছর, কিন্তু ইহার মধ্যেই গোটা দেশময় সে বেশ একটা নাম করিয়া লইয়াছে। বড় লোকের ছেলে, টাকা পয়সার অভাব নাই, লেখাপড়াটাও ভাল মতই শিখিয়াছে, গায়ে অসুরের মত জোর, দিব্যি স্বাস্থ্য, সবদিক্ দিয়াই চমৎকার। ভারী মনের ফূর্ত্তিতে আছে সে।

ঢাকায় আসিয়াছে রণজিৎ তার দিদির বাড়ীতে বেড়াইতে। অনেক দিন দিদির সাথে দেখা হয় নাই, তার উপর আবার দিদির ছেলেপেলেদের না দেখিয়া রণজিৎ বেশীদিন থাকিতেও পারে না—বড় মন কেমন কেমন করে।

আসিবার আগে কোন খবর দেওয়া ছিল না, কাজেই রণজিতের দিদি সুপ্রভা কোন খবরই রাখিতেন না। বাড়ীর খাওয়া দাওয়ার পাট তখন চুকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ রণজিৎকে দেখিয়া দিদি আহ্লাদে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রেই হাঁক্ ডাক করিয়া চাকর বাকরদের উঠাইয়া, লুচি ভাজিয়া, ডাল্না রাঁধিয়া, রাবড়ি আনাইয়া একেবারে একটা রাজসূয় ব্যাপার বাধাইয়া তুলিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা, অর্থাৎ কিনা রণজিতের ভগিনীপতি বিনোদবাবু, তখন খাটের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে দারুণ নাক ডাকাইতে-ছিলেন। ভদ্রলোক আজ মনে বড় কষ্ট পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, রাত্রের খাওয়াটা তাঁর আজ মোটেই জমে নাই। মাছ গিয়াছিল বিড়ালে খাইয়া, আর দুধ গিয়াছিল নষ্ট হইয়া। কাজেই মনে কষ্ট হওয়ার তো কথাই। লুচির মিষ্টি গন্ধ নাকের ভিতর ঢুকিতেই তিনি জাগিয়া উঠিয়া একেবারে বিছানার উপর সোজা হইয়া বসিলেন। প্রথমটা ভাবিয়াছিলেন, বাড়ীর সকলে বুঝি তাঁহাকে দু'টি ডাল ভাত খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া, নিজেদের জন্ত ফলারের জোগাড় করিতেছে; কিন্তু রণজিৎকে দেখিয়া বুঝিলেন, না তিনিই ভুল করিয়াছেন। বলিলেন "আরে এই যে, খেলোয়াড় যে, কখন আসা হোলো? তাইতো ভাবি, এত রাত্রে লুচির গন্ধ কেন? ভাই বোনে দিব্যি ফলার হচ্ছে! আচ্ছা দাঁড়াও আমিও জুট্‌ছি এসে!"

সুপ্রভা বলিলেন "থাক্, থাক্, অত আরামে কাজ নেই! লুচি ভেজেছি রণজিতের পরিমাপ, একখানাও বেশী হ'বে না।" কিন্তু বিনোদবাবু পাকা লোক, এসব কথায় কেন তিনি দমিবেন? দমিলে তো কাঁচা লোকই হইয়া যাইতেন! গম্ভীর ভাবে রণজিতের পাশে একখানা আসন পাতিয়া গিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাধ্য হইয়া শেষে সুপ্রভাকে একখানা লুচি দিতেই হইল।

রাত্রি ক্রমেই বাড়িতেছিল, কাজেই রণজিৎ খাওয়া দাওয়া সারিয়াই শুইতে চলিল।

পরদিন ভোরে রণজিৎ চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখে, তাহার বিছানার একেবারে কাছেই, লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আর কেহ নয়, স্বয়ং বোম্বা গুণ্ডা! একটা নূতন জায়গায় গিয়া তোমরা যদি ভোরে চোখ মেলিতেই দেখ, লাঠি হাতে একটা গুণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে, তবে তোমাদের মনের অবস্থাটা কি রকম হয় বল দেখি? তাও আবার যে সে গুণ্ডা নয়, স্বয়ং বোম্বা গুণ্ডা! সামান্য একটু পরিচয় দিলেই সে যে কি ভীষণ চীজ্ তা' বুঝিতে পারিবে। লম্বায় সে কত বড় জান? দে—ড় হাত! হাতের লাঠিখানা কত বড় জান? কুড়ি আঙ্গুলের কমতো কিছুতেই নয়, বরং একটু বেশীও হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ কি সাংঘাতিক!!!

ঠিক্ এই সময় একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বোম্বা গুণ্ডার দাদা, সুপ্রভার বড় ছেলে অরুণ বাবু (ওরফে উড়ুন বাবু) একটা বিড়ালের পিছন পিছন তাড়াইয়া আসিতে-ছিল। বিড়ালটা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া একেবারে বোম্বাগুণ্ডার দুই পায়ের ভিতর দিয়াই ছুট্ দিল। কাজেই তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া গুণ্ডা গেল পড়িয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে সুরু করিয়া দিল দারুণ কান্না! তা, ইহাতে হাসিবার কিছুই নাই। যত বড় গুণ্ডাই হউক না কেন, বোম্বাও তো মানুষ! একটা বাঘ দেখিলেই তোমরা ভয়ে মরিয়া যাও, আর সেই বাঘের মাসী তাহার গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে সে একটু কাঁদিবেও না? কান্না দেখিয়া রণজিৎ জিজ্ঞাসা করিল "বোম্বাগুণ্ডা, কি হোলো?" গুণ্ডার তখন অবস্থা কাহিল, চোখের জলে মুখ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "পোয়ে গেয়াম্।" (গুণ্ডা আবার র বা ল কিছুই উচ্চারণ করিতে পারে না।)

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করিল "কি কোয়ে, কি কোয়ে?"

"বিয়াও ফেয়ে দিয়ো"

"তোমাকে তুয়ি?"

"তোও।"

রণজিৎ তাহাকে তুলিয়া ধরিল। শেষে আবার জিজ্ঞাসা করিল "উঁচু করি?"

"কও।"

এমন সময় উড়ুন বাবু আসিয়া খবর দিলেন "চা তৈরি।" সকলে চা খাইতে চলিয়া গেল।

চা খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঠিক এমন সময় বাড়ীর চাকর আসিয়া জানাইল, মামাবাবুর নামে একটা বিশেষ জরুরী টেলিগ্রাম আছে। (ক্রমশঃ)

পাখীদের পাঠশালা

এক ধরণের পাখী আছে যাহাদের শিখাইলে ঠিক মানুষের মত পড়িতে পারে। কাকাতুয়া এই দলের একটি। মিষ্টার কিং নামে এক ভদ্রলোক বিলাতে এক স্কুল বসাইয়া-ছেন। তাঁহার ছাত্রেরা সকলে এই ধরণের পাখী। তিনি সেখানে যন্ত্রপাতি, গ্রামোফোণ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহার পাখী ছাত্রদের ইংরাজি কথা শিখান। তাঁহার স্কুলের নিয়ম ঠিক্ মানুষের স্কুলের মত। সেখানে আলাদা আলাদা ক্লাস আছে। পাখীরা পরীক্ষা দিয়া প্রমোশন পাইয়া, তবে নূতন ক্লাশে উঠিতে পারে। আইনও বড় কড়া। কোনও পাখী পরীক্ষায় ফেল করিলে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

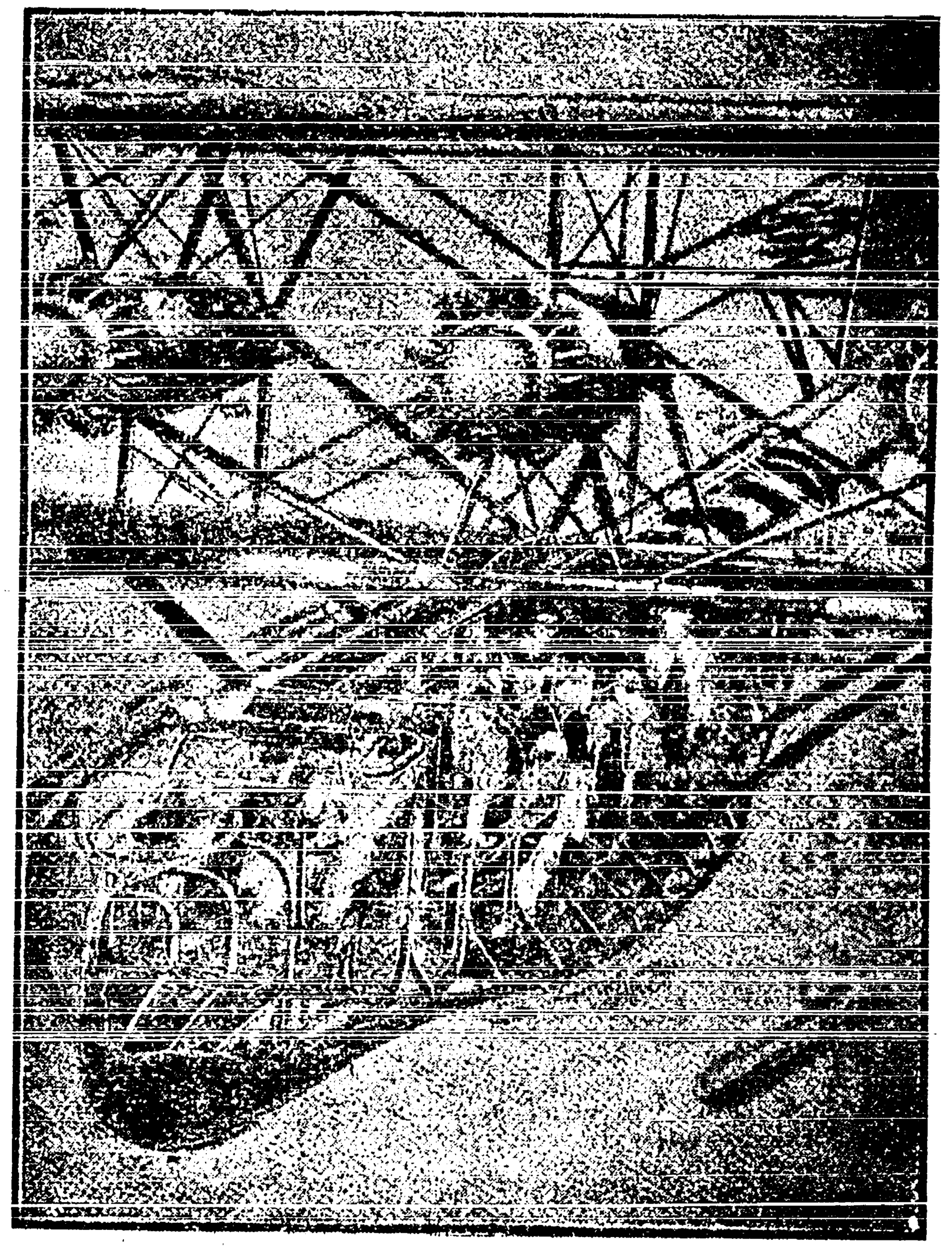

বিলাত যাইবার উড়োজাহাজ

কয়েক বছরের মধ্যেই এয়ারোপ্লেন জিনিষটা সভ্য জগতের খুব দরকারী জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল আর বিলাতের লোকেরা দূর দেশে যাইতে হইলে ধীরে সুস্থে জাহাজে চড়িয়া যাইতে চাহে না। তাহাদের ইচ্ছা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফশ্ করিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়। কিছুদিন পরেই আমাদের দেশ আর বিলাতের মধ্যে রীতিমত এয়ারোপ্লেন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সে এয়ারোপ্লেন অবশ্য খুব বড় হইবে। এখানে আমরা সেটা কি রকম হইবে, তাহারি একটা ছবি দিলাম। ইহাতে ১৫ জন যাত্রী আর

৩ জন চালক বসিতে পারিবে। থাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটাও যাহাতে আকাশের উপরেই সারিয়া লওয়া যায়, তাহারও বন্দোবস্ত থাকিবে। আর ইহা চলিবে ঘণ্টায় ১২০ মাইল।

আমেরিকায় মোটর গাড়ী

আজকাল বড় বড় সহরের রাস্তা দিয়া হাঁটাই মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে শুধু প্যাঁক্ প্যাক্—মোটরের আওয়াজ। একটু অন্যমনস্ক হইয়াছ কি গিয়াছ। বাস্তবিক মোটরের সংখ্যা যে দিনে দিনে কি রকম বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা দেখিলে অ াক্ হইতে হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার যুড়িদার আর কোন দেশ নাই। গেল বছর সেখানে ৩,৩৯৪,২৫৫ খানা মোটরকার তৈরী হইয়াছে। এ গুলির দাম কত শুনিবে ?—২৫৭৭০০০০০০ ডলার। ১৯২৭ সনে সেখানে মোটরের তেল খরচ হইয়াছে ৩৯০,০০০,০০০, গ্যালন। মোটরের চাকার টায়ার তৈরী হইয়াছে ৬৬,০০০,০০০গুলি। এগুলি দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে বারকয়েক জড়ানো যায়। গেল বছর আমেরিকায় মোটরের কারখানায় লোক খাটিয়াছিল ৩৬,৭৫০০০ জন।

ঘুড়ি চড়িয়া আকাশ ভ্রমণ

এক আমেরিকান্ ভদ্রলোক একখানা অদ্ভুত রকম ঘুড়ি তৈরী করিয়াছেন। ঘুড়িখানা এত বড় যে তাহার সহিত একজন লোককে বাঁধিয়া দিলে সেও ঘুড়ির সঙ্গে উড়িবে। এই ভদ্রলোকটি তাঁর ছেলেকে ঘুড়িতে বাঁধিয়া আকাশে তুলিয়াছিলেন। ছেলেটি ঘুড়িতে চড়িয়া অনেকক্ষণ আকাশে বেড়াইয়া আসিয়াছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(২)

শি	বা	জী	×	জ
বি	×	ব	কু	ল
কা	ন	ন	×	দ
×	য়	×	রা	×
ম	ন	×	জী	ব
শা	×	ভ	ব	ন

ছবি চারিখানির প্রধান প্রধান ভুল—

(১) ডান দিক দিয়া বড় কেহ ঘোড়ায় চড়েনা, কেননা তাহা অসুবিধাজনক।

(২) আয়নার ছায়ায় ডান হাত বাঁ হাত বলিয়া মনে হয়। এখানে উল্টা হইয়াছে।

(৩) যে দিকে বাতাস বহিতেছে, মেঘ চলিতেছে, নিশানও সেদিকেই উড়িবে।

(৪) তলোয়ার ডান দিকে থাকে না, বাঁ-দিকে থাকে।

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

অবনীকান্ত ঘোষ (বালিগঞ্জ), সুনন্দা দেবী (রংপুর), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা), অনিল, লীলা, বেলা, ফণী, গণেশ, ইন্দু, চিত্ত, সাধন, আশা, শেফালী, শোভা, সমরেন্দ্র, দুর্গা, জলধীশ, চামেলী, বীণা, শকুন্তলা, ভ্রমর (আধুরিয়া, ঢাকা), সেক্রেটারী, যশোমাধব সাহিত্যসঙ্ঘ (ধামরাই), তারকদাস অধিকারী (চেঙ্গুটিয়া), কমলকুমার দাস (কলিকাতা), কচি ও সুধীন (সিলেট), জ্যোৎস্না দেবী (কুড়িগ্রাম), অজিতকুমার ঘোষ, মনোরমা ও অনুপমা (চাপাই, নবাবগঞ্জ), সমরেন্দ্রনাথ, বিনয়কুমার, অরুণোদয়, বসন্তকুমার, অশোককুমার, সুবোধমোহন (রাঁচি)।

যাঁহাদের একটি ঠিক হইয়াছে অপরটি আংশিক হইয়াছে—

লক্ষ্মীময়ী দেবী (ভরাকর, ঢাকা), সুধীন্দ্রমোহন রায় ও শান্তিপ্রসাদ নাগ (গাইবান্ধা), সনৎকুমার মজুমদার (কালিম্পং), যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বলরাম ও খুদিরাম পাল (কলিকাতা), সুধীররঞ্জন দাস (বরিশাল), কল্যাণী দত্ত (সিমলা), দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (রাজসাহী), হিমাংশুকুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ী), সাধনা সেনগুপ্তা (কলিকাতা), রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অনিল কৃষ্ণ মজুমদার, ষোড়শীবালা দেবী, বিদ্যুল্লতা দেবী (উদীশা), লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর), অর্ণবনাথ খাঁ (গয়া), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), এ, চক্রবর্ত্তী (গয়া), মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সিরাজগঞ্জ), হৃষীকেশ কুণ্ডু, অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু, প্রমোদ গুন গোস্বামী, সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, তারাপদ কুণ্ডু, চৈতন্যচরণ কুণ্ডু, হরিপদ কুণ্ডু, মুকুন্দলাল কুণ্ডু, (আবাইপুর, যশোহর) মাখনলাল অধিকারী (কিশোরগঞ্জ), বীণাপাণি দেবী ও রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বনগাঁ, যশোহর), নিমাই, জানকী ভদ্র, জগদীশ দাস, গৌরাঙ্গ, অরুণ নাগ, শশাঙ্ক দে (মধুকর আশ্রম, রাঁচি), পঞ্চানন দত্ত (আত্রা, খুলনা), রামরতি চক্রবর্ত্তী ও বিশ্বনাথ বসু (কালীঘাট), হরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (কালীঘাট), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী)।

যাঁহাদের একটি ঠিক হইয়াছে—

দিলীপ দাশগুপ্ত ও প্রতীপ দাশগুপ্ত, কিশোর লাইব্রেরীর পরিচালিকাগণ (রায়পুর), শচীনচন্দ্র পাল (জলপাইগুড়ী), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), ফয়জন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ (কুমিল্লা), চারুলতা দেবী (জলপাইগুড়ী), কমলিনী দেবী (জলপাইগুড়ী), মিলনমালা ঘোষ (ভবানীপুর, কলিকাতা), অমরেশচন্দ্র বসু (হাওড়া), সম্পাদক, ছাত্রসম্মিলনী সভা, এম্-ই স্কুল (পাঁচগাঁও, শ্রীহট্ট), রমেন্দ্র চৌধুরী (কলিকাতা), নির্ম্মলকুমার চক্রবর্ত্তী (পুরী), অনসূয়া দেবী (গয়া), টেনু, শক্তি, শান্তি, রেণু (গয়া), প্রভাতকুমার বসু ও নিশীথ (আনিয়াবাদ), অমরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (রাজসাহী)

যাঁহাদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে—

কুমারীপ্রভা পাল (জলপাইগুড়ী), বিমলচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা), রেণু, রাণু, কালী, হাসি, সুধা, লুচি, স্নেহ, সুশীলা, প্রমদা, দুলাল, শৈলেন, কানাই, (বেঙ্গলী প্রাইমেরী স্কুল, মান্দালয়, বর্ম্মা), ভবানীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ইম্ফাল, মণিপুর), অবনীবন্ধু আচার্য্য ও শৈলেশচন্দ্র রায় (সিরাজগঞ্জ), স্বর্ণলতা রায় (বারন্দা), সুষমাসুন্দরী দেবী সত্যেন্দ্র, শচীন্দ্র, নীলিমা, নিরঞ্জন, খুকুরাণী, শম্ভু, মীরারাণী ঘোষ (শ্রীরামপুর), শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরশি ফরিদপুর)।

নূতন ধাঁধা

Cross-Word-Puzzle.

[সঙ্কেত জ্যৈষ্ঠ মাসের রামধনুতে দেখ]

১	২	৩	×	৪	৫	৬	৭	×	×
৮	৯	×	১০	১১	×	১২	১৩	×	১৪
১৫	×	১৬	×	১৭	১৮	×	×	১৯	২০
২১	×	২২	×	২৩	×	২৪	২৫	×	২৬
×	×	২৭	২৮	×	২৯	×	৩০	৩১	×
৩২	৩৩	৩৪	×	৩৫	৩৬	৩৭	×	৩৮	৩৯
৪০	৪১	×	৪২	৪৩	×	৪৪	×	৪৫	৪৬
৪৭	৪৮	×	৪৯	×	৫০	×	৫১	×	×
৫২	×	৫৩	৫৪	×	৫৫	৫৬	৫৭	×	৫৮
×	৫৯	৬০	×	৬১	৬২	×	৬৩	৬৪	৬৫

পাশাপাশি :—

১—৩=জনক তনয়া
৪—৭=শিব
৮—৯=নূতন
১০—১১=অবনী
১২—১৩=অক্ষর
১৭—১৮=আকাশ
১৯—২০=বাক্‌শক্তি রহিত
২৪—২৫=শুক্ল
২৭—২৮=পথিক
৩০—৩১=অন্য
৩২—৩৪=ইন্দ্রজিৎ
৩৫—৩৭=অনাদর
৩৮—৩৯=ইচ্ছা
৪—৪১=উৎসব
৪২—৪৩=পুণ্যস্থান
৪৫—৪৬=সাপ
৪৭—৪৮=টাকা-কড়ি
৫৩—৫৪—সূর্য্য সম্বন্ধীয়
৫৫—৫৭—নারী
৫৯—৬০—বাসনা
৬১—৬২—এক প্রকার ধাতু
৬৩—৬৫—অসুর

উপর হইতে নীচে :—

১—২১—শ্রীকৃষ্ণের বাহন
২—৯—স্বর
৪—২৩—ভারতবর্ষের একটী প্রদেশ
৭—১৩—রং
১৪—২৬—সমূহ
১৬—৩৪—শিব
২৫—৩০—গ্রীষ্মকাল
২৯—৩৬—মঙ্গল
৩১—৪৫—জিহ্বা
২২—৫২—ছেলেমেদের একটি উৎকৃষ্ট মাসিক
৩৩—৪৮—বহিয়া লওয়া
৩৫—৪৩—ধন
৩৭—৪৪—যাহা জানা গিয়াছে
৩৯—৪৬—পাখী
৪২—৫৪—ব্যাধ
৫০—৬২—সপ্তর্ষির এক ঋষি
৫১—৬৩—শব্দ
৫৩—৬০—অট্টালিকা
৫৮—৬৫—হস্তী

শ্রীরামরতি চক্রবর্ত্তী।

রামধনু

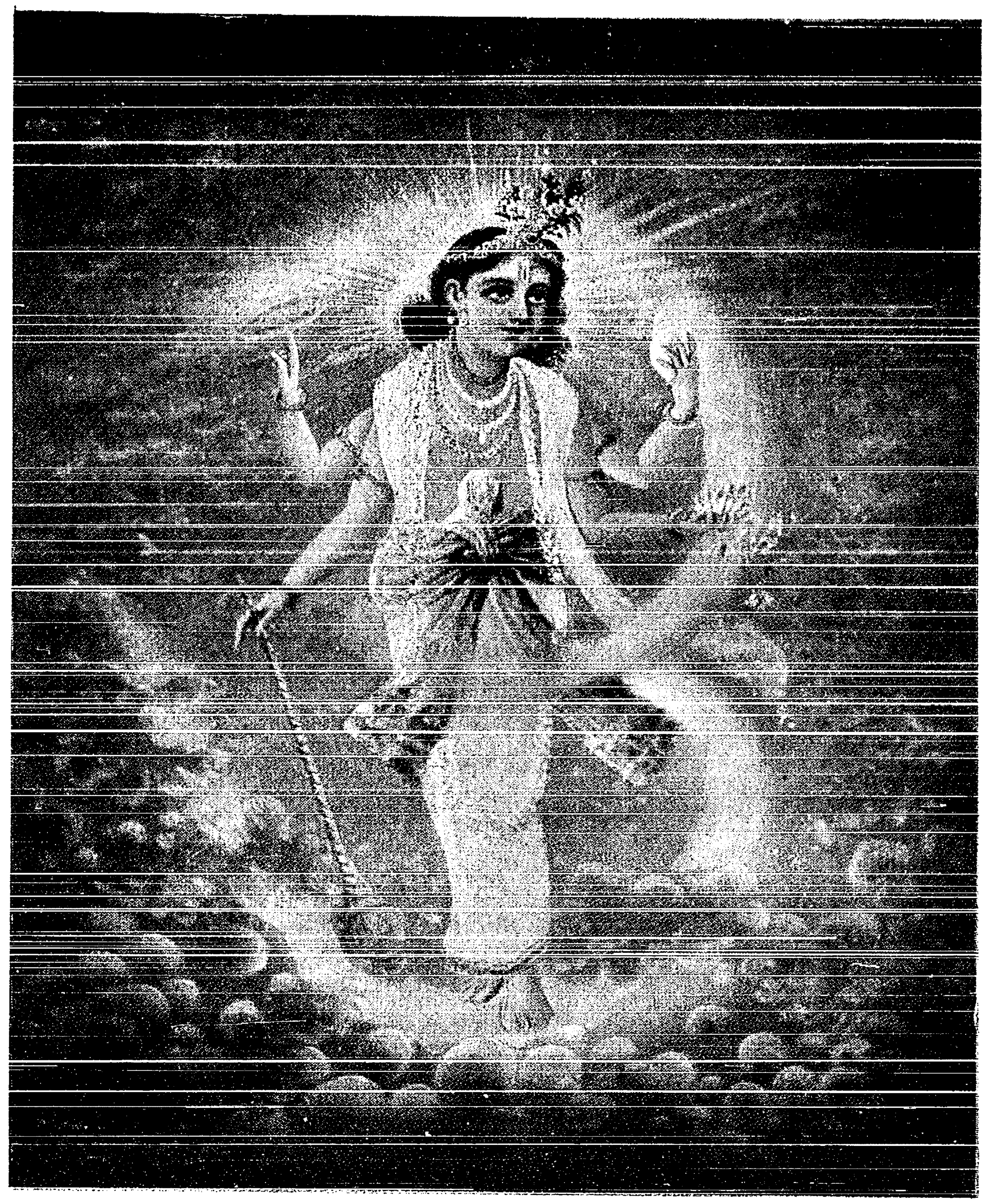

"চেয়ে আছে জগৎ সতৃষ্ণ!
এসো ভারতের প্রাণ, এসো জগতের ত্রাণ,
এসো নয়নাভিরাম, কৃষ্ণ!"

কুমুদরঞ্জন—(জন্মাষ্টমী)

১ম বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩৫ { ৮ম সংখ্যা

আঘাত

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ষ্ট্রাইক্ মানে আঘাত, এবং আঘাত করা কর্ম্ম
নয়ক ভালো শাস্ত্রে বলে, বোঝ ইহার মর্ম্ম।
কিন্তু গোটা দেশটা জুড়ে আঘাত করা চল্ছে,
বুকে আঘাত দিয়েই লোকে পরের কথা বল্ছে।

২

মিলে আঘাত, রেলে আঘাত, আঘাত শিরে গাত্রে,
কলেজেতে করছে আঘাত শিক্ষক এবং ছাত্রে।

চল্‌ছে ঝাড়ুদারের আঘাত, বাল্‌তি ঝাঁটা সঙ্গে,
আঘাত করার ঢেউ উঠেছে নূতন নূতন রঙ্গে।

৩

ভৃগু মুনির আঘাত এ কি, করতে দেবে' ধন্ধ ?
কিম্বা আঘাত রঘুমণির, সাগর-শাসন জন্য ?
দুর্যোধনের উরু হবে এর ঘায়ে কি ভগ্ন ?
মিথ্যা এবং পাপের তরী, হবেই জলমগ্ন ?

৪

এর আঘাতে পাতাল থেকে, ভোগবতী কি উঠ্‌বে ?
চিত্ররথে বাঁধতে একি, স্বরগ-পথে ছুটবে ?
আঘাত কি এ ভীষণ ভয়াল কালিয়া নাগ শাস্‌বে ?
এই বাঁটুলে বাঁদর না হোক, বাঁদরামি কি নাশ্‌বে ?

৫

এর ঘায়ে কি চূর্ণ হবে, বৃত্রাসুরের দম্ভ ?
দর্শনে এর দশাননের উঠ্‌বে হৃদি-কম্প ?
কিম্বা ইহা মিথ্যা বৃথা 'ডন কুইক্সো'র কুস্তি ?
বুঝ্‌তে মোরা পারছি না যে, পাচ্ছিনা যে স্বস্তি।

সাবেক আমলের গাড়ী

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

প্রায় একশ' বছর আগের একটা ঘটনার কথা বলিতেছি। এক ধনী ভদ্রলোকের বিশেষ জরুরী একটা কাজে বিদেশে যাইবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তা প্রায় ৫০।৬০ ক্রোশ, অথচ খুব তাড়াতাড়ি না গেলে অনেক লোকসান

হইয়া যাইবে। ভদ্রলোক ঠিক করিলেন খুব দ্রুতগামী একখানা ঘোড়ার গাড়ী লইবেন, আর পথের মাঝখানে ঘন ঘন ঘোড়া বদলাইয়া ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে যাইবেন। তাহা হইলে হয়ত সময় মত পৌঁছিতে পারিবেন।

সব ঠিক, যাত্রার একটু আগে তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া হাজির। ভদ্রলোক তাঁহাকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, বন্ধু ত' আকাশ হইতে পড়িলেন! "এ বলে কি ? ঘণ্টায় দশ মাইল ? মাথায় রক্ত উঠিয়া মারা যাইবে যে, খবর্দ্দার, অমন মতলব মনেও আনিও না।" ভদ্রলোককে শেষে বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে হয় তিনি পথের মাঝখানে কোথাও থামিয়া বেশ ভাল করিয়া দিন দুই বিশ্রাম করিয়া লইবেন, না হয় গাড়ীর বেগ কমাইয়া অর্দ্ধেকেরও কম করিয়া দিবেন।

বন্ধু কিন্তু জানিতেন না, যে শীঘ্রই এমন একদিন আসিবে, যখন তিন মাসের শিশুও অতি আরামে গাড়ীতে বসিয়া ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিবে। আর ৬০।৭০ মাইল ত' ভাল কথা, ঘণ্টায় ২০০।৩০০ মাইল যাওয়াটাকেও আজকালকার লোকেরা মোটেই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করে না। দেশের অবস্থা এমনই বদলাইয়া গিয়াছে।

তখনকার দিনে ১০০ মাইল যাইতে হইলেই কেহ কেহ উইল টুইল করিয়া রাখিয়া যাইত। আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইতেও ভুলিত না। কে জানে, এতখানি পথ, ফিরিয়া আসিতে পারিবে কিনা তাহারই বা ঠিক কি ?

গাড়ী ঘোড়ার চালে বিলাতের সাথে পাল্লা দিতে পারে এমন দেশ বোধ হয় নাই। কাজেই গাড়ী ঘোড়ার কথা উঠিলেই প্রথমে তোমাদের নিশ্চয়ই জানিতে ইচ্ছা হইবে বিলাতের গাড়ী ঘোড়ার কথা। আজ তাই সেখানকার গাড়ী ঘোড়ার সম্বন্ধেই কিছু বলিব।

খুব বেশী দিনের কথা নয়—লণ্ডন সহরের রাস্তার অবস্থা দেখিলে তখন কান্না আসিত। বড় বড় গর্ত্ত, কাদা, কাহার সাধ্য কাপড় চোপড় বাঁচাইয়া স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়ায় ? তাহার উপর ক্বচিৎ কখনও কোন ধনকুবেরের দু' একখানা ঘোড়ার গাড়ী চোখে পড়িত। সাধারণ লোকে ঘোড়ার গাড়ী জিনিষটা কি

তাহা এক রকম জানিত না বলিলেই চলে। নদীতে অবশ্য নৌকা মিলিত যথেষ্ট, কিন্তু গোলমাল ছিল যত ডাঙ্গায়। এই সময়ে এক ভদ্রলোক মাথা খেলাইয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোকদের জন্য এক রকম ভাড়াটে গাড়ী বাহির করিলেন। ইহার নাম ক্যাবগাড়ী। এই ক্যাব বিলাতের রাস্তায় এখনও যথেষ্ট দেখা যায়। ধরিতে গেলে ইহাই বিলাতে সাধারণ লোকের প্রথম ঘোড়ার গাড়ী। তাহার আগে যে সব গাড়ীতে সাধারণ লোকে চাপিত, তাহা অনেকটা আমাদের ময়লা টানা গাড়ীগুলির মত (wagon)। তাহাকে গাড়ী বলিতে তোমাদের নিশ্চয় বাধ-বাধ ঠেকিবে।

ক্যাব বাহির হইতেই বিলাতী সৌখীন মেয়েদের বড় সুবিধা হইয়া গেল, কিন্তু মুস্কিল হইল মাঝিদের। বেচারাদের আর ভাত জোটে না, কাজেই তাহারা ক্যাব তাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল!—লণ্ডনের এমন চমৎকার রাস্তা দুইদিনে গাড়ীর চাকায় নষ্ট হইয়া যাইবে, গাড়ী চাপা পড়িয়া লোক মারা যাইবে, এই রকম আরও কত কি! তাহারা কয়েকজন কবিও যোগাড় করিয়া লইল। ইহাদের কাজ ছিল ক্যাব গাড়ীকে ঠাট্টা করিয়া কবিতা লেখা।

ইংলণ্ডের তখন যিনি রাজা, তাঁহার কেন জানিনা ক্যাব গাড়ী ভাল লাগিত না। কাজেই তিনিও ক্যাব গাড়ীর চলাচল সম্বন্ধে খুব আঁটাআঁটি নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্যাবের সংখ্যা কমিল বটে, কিন্তু একেবারে গেল না।

তখন আরম্ভ হইল পাল্কীর মত একরকম গাড়ী। এদিক্ দিয়াও লোকেরা আপত্তি তুলিল। মানুষকে দিয়া জানোয়ারের মত খাটাইয়া লওয়া হইতেছে, লোকে সহ্য করিবে কেন? এই ধরণের গাড়ীও বেশী দিন টিকিল না।

ঘোড়ায় টানা বাস্‌গাড়ী বিলাতে প্রথম বাহির হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। ইহারও দেড়শ' বছর আগে ফরাসী দেশে একবার এই ধরণের গাড়ী চালাইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু ব্যাপারটা সাধারণ লোকে তত সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে নাই। এখন কিন্তু বাস্ গাড়ী লোকের খুব প্রিয় হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ, সামান্য অবস্থার লোকেদের পক্ষে। বাসের সংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই বেশ বাড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসের মালিকদের মধ্যে রেষারেষিও আরম্ভ হইল। এক বাস্‌ওয়ালা

সে যুগের মোটরকার ছিল ভারী অদ্ভুত—এ যুগের মোটর গাড়ীর সহিত তার কোন সাদৃশ্যই নাই। একটা ছ'চাকাওয়ালা ল্যাণ্ডো গাড়ীর সাম্‌নে ও পেছনে খানিকটা বসিবার জায়গা করিয়া দিলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম। গাড়ীর

তাহার গাড়ীতে ভাল ভাল খবরের কাগজ রাখিয়া দিত, যাত্রীরা যাহাতে খবরের কাগজের লোভে তাহার গাড়ীতে আসে। দেখাদেখি আর এক বাসওয়ালা তাহার বাসখানাকে একখানা ছোটখাটো লাইব্রেরী করিয়া ফেলিল—নানা রকম গল্পের বই, মাসিক পত্রিকা বাসে চড়িলেই পড়িতে পাইবে। যাত্রীরা কিন্তু ছিল আরও চালাক। তাহারা বাসে চড়িয়া বই খুলিয়া বসিত আর নামিবার সময় সেখানা লইয়া চম্পট দিত। ফলে বাসওয়ালাকে শীঘ্রই লালবাতি জ্বালিতে হইল।

বাস্ গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। কিছুদিন পরে ঘোড়ায়টানা বাসের বদলে মোটর বাস্ আরম্ভ হইল। ঠিক তাহার আগে লণ্ডন সহরে প্রায় ৪ হাজার ঘোড়ায়টানা বাস্ চলিত। বৈজ্ঞানিক সকল জিনিষেরই ক্রমে উন্নতি হয়।

হাজির যেখান দিয়া যাইতে হইলে মাশুল দিতে হয়। মাশুলওয়ালা মাশুল আদায় করিতে আসিল, কিন্তু এঞ্জিনের চেহারা দেখিয়াই ত' তাহার চক্ষু চড়ক গাছ! মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া বাহির হইতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের মত ঝলক হানিতেছে; আর কি তাহার গর্জ্জন! সে ঠিক ধরিয়া লইল বন্ধু দুটি দুই অপদেবতা আর এই ভীষণ জানোয়ারটা তাহাদের বাহন। বন্ধু দুটি যতই জিজ্ঞাসা

তাহা এক রকম জানিত না বলিলেই চলে। নদীতে অবশ্য নৌকা মিলিত যথেষ্ট, কিন্তু গোলমাল ছিল যত ডাঙ্গায়। এই সময়ে এক ভদ্রলোক মাথা খেলাইয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোকদের জন্য এক রকম ভাড়াটে গাড়ী বাহির করিলেন। ইহার নাম ক্যাবগাড়ী। এই ক্যাব বিলাতের রাস্তায় এখনও যথেষ্ট দেখা যায়। ধরিতে গেলে ইহাই বিলাতে সাধারণ লোকের প্রথম ঘোড়ার গাড়ী। তাহার আগে যে সব গাড়ীতে সাধারণ লোকে চাপিত, তাহা অনেকটা আমাদের ময়লা টানা গাড়ীগুলির মত (wagon)। তাহাকে গাড়ী বলিতে তোমাদের নিশ্চয় বাধ-বাধ ঠেকিবে।

ক্যাব বাহির হইতেই বিলাতী সৌখীন মেয়েদের বড় সুবিধা হইয়া গেল, কিন্তু মুস্কিল হইল মাঝিদের। বেচারাদের আর ভাত জোটে না, কাজেই তাহারা ক্যাব তাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল!—লণ্ডনের এমন চমৎকার রাস্তা দুইদিনে গাড়ীর চাকায় নষ্ট হইয়া যাইবে, গাড়ী চাপা পড়িয়া লোক মারা যাইবে, এই রকম আরও কত কি! তাহারা কয়েকজন কবিও যোগাড় করিয়া লইল। ইহাদের কাজ ছিল ক্যাব গাড়ীকে ঠাট্টা করিয়া কবিতা লেখা।

ইংলণ্ডের তখন যিনি রাজা, তাঁহার কেন জানিনা ক্যাব গাড়ী ভাল লাগিত না। কাজেই তিনিও ক্যাব গাড়ীর চলাচল সম্বন্ধে খুব আঁটাআঁটি নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্যাবের সংখ্যা কমিল বটে, কিন্তু একেবারে গেল না।

তখন আরম্ভ হইল পাল্কীর মত একরকম গাড়ী। এদিক্ দিয়াও লোকেরা আপত্তি তুলিল। মানুষকে দিয়া জানোয়ারের মত খাটাইয়া লওয়া হইতেছে, লোকে সহ্য করিবে কেন? এই ধরণের গাড়ীও বেশী দিন টিকিল না।

ঘোড়ায় টানা বাস্‌গাড়ী বিলাতে প্রথম বাহির হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। ইহারও দেড়শ' বছর আগে ফরাসী দেশে একবার এই ধরণের গাড়ী চালাইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু ব্যাপারটা সাধারণ লোকে তত সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে নাই। এখন কিন্তু বাস্ গাড়ী লোকের খুব প্রিয় হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ, সামান্য অবস্থার লোকেদের পক্ষে। বাসের সংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই বেশ বাড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসের মালিকদের মধ্যে রেষারেষিও আরম্ভ হইল। এক বাস্‌ওয়ালা

সে যুগের মোটরকার ছিল ভারী অদ্ভুত—এ যুগের মোটর গাড়ীর সহিত তার কোন সাদৃশ্যই নাই। একটা ছ'চাকাওয়ালা ল্যাণ্ডো গাড়ীর সাম্‌নে ও পেছনে খানিকটা বসিবার জায়গা করিয়া দিলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম। গাড়ীর পেছনে রেলগাড়ীর মত লম্বা লম্বা চোঙ্গা থাকিত, আর ভস্ ভস্ করিয়া বাষ্পের সাহায্যে রাস্তা দিয়া 'সাহেবলোক'দের মোটর গাড়ী চলিত।

রেলগাড়ীর প্রথম চল্‌তি হয় ১৮২৫ সনে। সে রেলগাড়ীর যা চেহারা ছিল, আ হা হা, দেখিলে হাসিয়াই অস্থির হইতে! ময়লা-টানা গাড়ীর মত খান কয়েক গাড়ী, সাম্‌নে একখানা তদ্রূপই এঞ্জিন! গাড়ীর আগে আগে একজন লোক ঘোড়ায় চড়িয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে চলিত। কি দারুণ বেগে যে ট্রেন চলিত, তাহাতো বুঝিতেই পারিতেছ।

প্রথম রেলগাড়ী চালাইবার সময়ও গোলমাল কম হয় নাই। একদল লোক ব্যাপারটাকে ঠাট্টা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিত! আর একদল নানারকম গুজব রটাইয়া দস্তুর মত মুস্কিল বাধাইবার চেষ্টায় ছিল। সুখের বিষয়, সে সব আপত্তি বেশী দিন টিকিল না, লোকের শ্রদ্ধা রেলগাড়ীর উপর বাড়িয়া চলিল; দিনে দিনে তাহার উন্নতিও হইতে লাগিল যথেষ্ট।

প্রথম রেলগাড়ী সম্বন্ধে ভারী মজার একটা গল্প আছে। একবার দুই বড় বড় বৈজ্ঞানিক একখানা ছোট্ট এঞ্জিন তৈরী করিলেন। রেলগাড়ীর চল্‌তি কিন্তু তখনও হয় নাই—কাজেই এঞ্জিন জিনিষটা কি, তাহা শুধু বৈজ্ঞানিকেরাই জানিতেন। একদিন রাত্রে বৈজ্ঞানিক বন্ধু দুটি এঞ্জিনখানা লইয়া একটু বাহিরে ঘুরিয়া আসিতে গেলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা এমন এক জায়গায় গিয়া হাজির যেখান দিয়া যাইতে হইলে মাশুল দিতে হয়। মাশুলওয়ালা মাশুল আদায় করিতে আসিল, কিন্তু এঞ্জিনের চেহারা দেখিয়াই ত' তাহার চক্ষু চড়ক গাছ! মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া বাহির হইতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের মত ঝলক হানিতেছে; আর কি তাহার গর্জ্জন! সে ঠিক ধরিয়া লইল বন্ধু দুটি দুই অপদেবতা আর এই ভীষণ জানোয়ারটা তাহাদের বাহন। বন্ধু দুটি যতই জিজ্ঞাসা

Correction

করেন "কত মাশুল চাই ?" সে বেচারা ততই ভয়ে কাঁপে আর সেলাম করে। মাশুল সে কিছুতেই লইতে সাহস করিল না।

রেলগাড়ীর এঞ্জিন তো গেল। গাড়ীর কামরাগুলিও ছিল তথৈব চ। থার্ড্ ক্লাসের যাত্রীদের ভাগ্যে তখন ছাদ বলিয়া কোন জিনিষ জুটিত না। এখনকার কয়লা-টানা মালগাড়ীর মত একখানা গাড়ী—তাহাতে না ছিল বসিবার বন্দোবস্ত—তাহাতেই ঠেঁসাঠেসি করিয়া পালে পালে লোক চলিত। গাদা-গাদিতে চ্যাপ্টা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু লোকেদের ফূর্ত্তি তাহাতে মোটেই কমিত না—নানা রকমের ফূর্ত্তি—কেউ গাহিত গান, কেউ বা নিশান উড়াইত।

রাজারাজড়ারা আবার রেলগাড়ীতে চড়িতেন অদ্ভুতভাবে। তাঁহারা তাঁহাদের সৌখীন ঘোড়ার গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া লইয়া, গাড়ীখানা শুদ্ধ ট্রেণের একটা খোলা ছাদশূন্য কামরার ভিতর চাপাইয়া দিতেন, আর নিজেরা বসিতেন সেই গাড়ীর ভিতর।

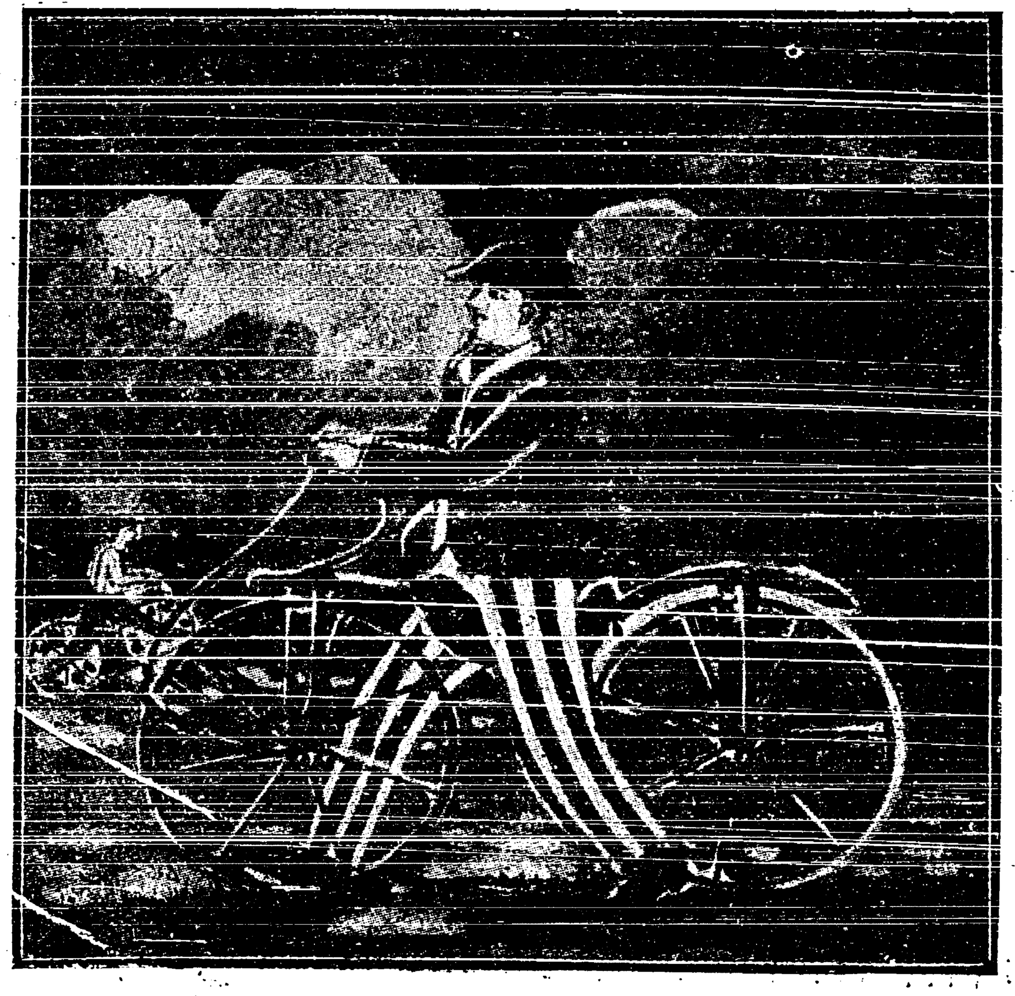

সাইকেলের সঙ্গে চালককে দৌড়াইতে হইত

সে কালের সাইকেল কেমন ছিল জান ? সাইকেলের আসল জিনিষ 'চেন' আর পা দিয়া ঘুরাইবার 'প্যাডেল'ই তখন ছিল না। সাইকেল চালককে মাটীর উপর পা ফেলিয়া সাইকেলের

সঙ্গে দৌড়াইতে হইত। অর্থাৎ ব্যাপারটা ছিল দৌড়ানই, তবে বসিয়া বসিয়া দৌড়ান এই যা সুবিধা।

ভূস্বর্গের দৃশ্য

তোমরা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ও তাঁহার নন্দনবনের কথা শুনিয়াছ। ভারত-বর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীর রাজ্য এতই সুন্দর যে ইহাকে ভূ-স্বর্গ অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গ বলে। অনেক সুন্দর সুন্দর লোক এখানে আছে কিন্তু তাহাদের চেয়েও সুন্দর এখানে প্রকৃতি দেবী। রাজধানী শ্রীনগর এক প্রকাণ্ড সমতলের উপর, যদিও পাহাড় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া সেখানে উঠিতে হয়। আশে পাশে পাহাড়, নদী, হ্রদ, সমতল জায়গা সবই আছে, আর ফুলের ত অন্তই নাই। সুন্দর সুন্দর বাগানই বা কত ! এবার কাশ্মীরের কয়েকটী দৃশ্য ছবিতে দেখান হইল।

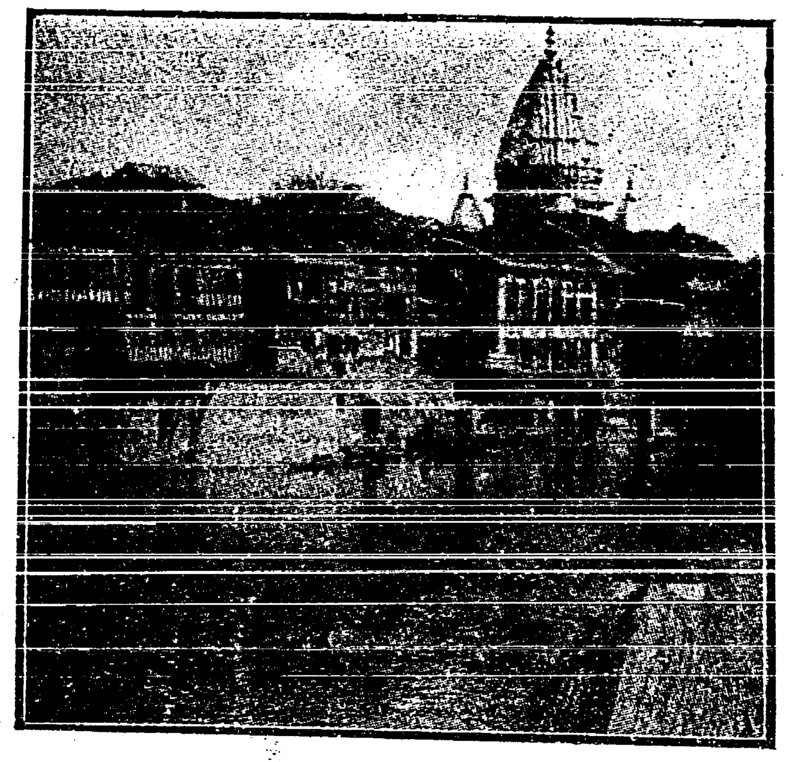

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের একটু অংশ

শ্রীষ্মকালে শ্রীনগরে আমাদের অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত। তখন ফুল ফোটে, ফল পাকিতে থাকে।

শীতকালে শ্রীনগর কেমন দেখায় ?

Correction

শীতকালে জায়গাটা ভারী ঠাণ্ডা হয়। তখন চারিদিকে কেবল বরফ, বরফ, বরফ। কাশ্মীরের বেশীর ভাগ লোকই গরীব। তাহাদের তখন ভারী কষ্ট।

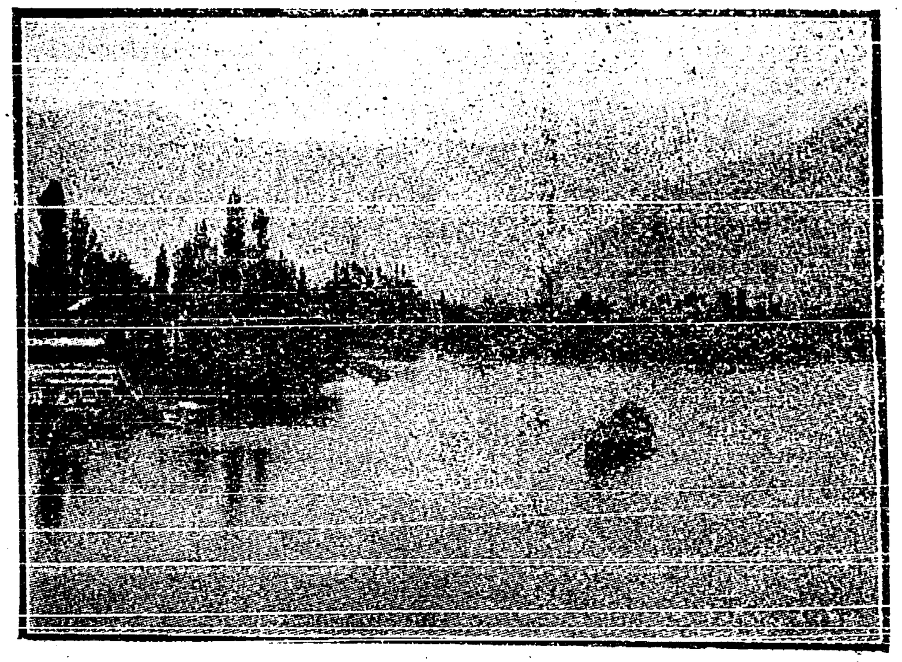

ডালহ্রদের একাংশ

শ্রীনগরের খুব কাছেই ডাল হ্রদ। এখানে নৌকায় বেড়াইতে বেশ স্ফূর্ত্তি। জলের উপর তরকারীর বাগান – আবার সময় সময় ফুলেরই কি বাহার! সাহেব মেমেরা এখানে সাঁতার খেলিতে খুব ভাল বাসে। পৃথিবীর মধ্যে এমন মজার জায়গা খুব কমই আছে।

গ্রীষ্মের সময় যখন শ্রীনগরে গরম পড়ে (আমাদের দেশের মত নয়, তবে ঠাণ্ডা কমিয়া যায়) তখন কাশ্মীরের মহারাজ প্রভৃতি গুল-মার্গে চলিয়া যান। সে জায়গা তখনও বেশ ঠাণ্ডা থাকে। বেশী উপরে কিনা! সাহেব মেমদের তখন সেখানে কতই আমোদ!

গুলমার্গের একটী দৃশ্য

ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা

(মহাভারত হইতে)

১

কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার যেমন ছিল বিদ্যা তেমনি ছিল জপতপ। একদিন ব্রাহ্মণ ঠাকুর এক গাছের তলায় বসিয়া বেদ আওড়াইতেছেন এমন সময় উপর হইতে তাঁহার গায়ে পাখীর বিষ্ঠা পড়িল। গাছের উপর একটা বক ছিল, তাহারই এই কর্ম্ম।

পাখী বেচারা……প্রাণ ছাড়িয়া দিল

ঠাকুর ত রাগে অস্থির। উপরে বকের দিকে চাহিবা-মাত্র পাখী বেচারা সে ব্রহ্ম-তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে প্রাণ ছাড়িয়া দিল—তাহার শরীরটা পড়িয়া গেল নীচে। ব্রাহ্মণের মন তখন দমিয়া গেল। তিনি দুঃখিত হইয়া বারবার ভাবিতে লাগি-লেন—আমি রাগের মাথায় কি কুকর্ম্মই করিলাম।

কিন্তু খাওয়া দাওয়াটা ত' সকলেরই আছে। ব্রাহ্মণ অনেক দুঃখ করিয়া শেষে গ্রামে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। ঘরে ঘরে ভিক্ষার জন্য ঘুরিয়া শেষে তিনি এক চেনা বাড়ীর গৃহস্থের স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার

Correction

নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। গৃহিণী বলিলেন "ঠাকুর, একটু দেরী করুন, আমি ভিক্ষা দিতেছি"। এই বলিয়া তিনি ঘরে গিয়া ভিক্ষার পাত্র পরিষ্কার করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার স্বামী বাড়ী আসিলেন। গৃহিণী দেখিলেন তাঁহার স্বামীটী ক্ষুধায় কাতর। দেখিয়াই তিনি আগে লাগিয়া গেলেন স্বামি-সেবায়—ব্রাহ্মণের ভিক্ষার কথা চাপা পড়িল। স্বামীকে পা ধোয়ার জল, আসন, ভাল ভাল খাবার জিনিষ দিয়া খুব নরমভাবে তিনি স্বামীর সেবা করিলেন। গৃহিণীর স্বভাবই এমন ছিল যে রোজ রোজ স্বামীর উচ্ছিষ্ট খাইতেন, দেবতার মত তাঁহার সেবা করিতেন এবং যাহাতে স্বামী খুসী থাকেন সর্ব্বদা সেই দিকে মন দিতেন। নিজে সর্ব্বদা শুদ্ধ আচারে থাকিয়া দেবতা, অতিথি, চাকরবাকর, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং আত্মীয়স্বজনের যাহাতে মঙ্গল হয় সেই রকম কাজ করিতেন।

গিন্নী স্বামীর সেবায় এতটা তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণের ভিক্ষার কথা মনেই ছিল না। ব্রাহ্মণের উপর নজর পড়ায় কথাটা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। তারপর ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইতেই ব্রাহ্মণ রাগে গড়্‌গড়্‌ করিতে করিতে কহিলেন—"কেন তুমি আমায় একটু দেরী করিতে বলিয়া এতক্ষণ আট্‌কাইয়া রাখিলে?"

গৃহিণী বলিলেন—"আপনি পণ্ডিত লোক, আমার অপরাধ মাপ করুন। আমি স্বামীকে পরম দেবতা মনে করি—তাঁহার পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারই সেবা করিতেছিলাম।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"স্বামীই তোমার বড়, আর ব্রাহ্মণ গুরু নয়? তুমি আছ গৃহস্থধর্ম্মে আর অপমান কর ব্রাহ্মণের! মানুষ ত কোন্ ছার, ইন্দ্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন। আমার মনে হয় তুমি বৃদ্ধদিগের নিকট ভাল শিক্ষা পাও নাই। ব্রাহ্মণ আগুনের সমান, মনে করিলে সবটা পৃথিবী পোড়াইয়া ফেলিতে পারেন।"

সতী গিন্নী বলিলেন,—"ঠাকুর, রাগ ছাড়ুন। আমাকে কি বক পেয়েছেন? কি হবে আমার আপনি রাগ করিয়া আমার উপর দৃষ্টি করিলে?

আমি ভাল ব্রাহ্মণকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করি না, তাঁহাদের তেজের কথাও জানি। সমুদ্রের জল যে লোণা হইয়া গিয়াছে, খাওয়া যায় না, সে ত ব্রাহ্মণেরই রাগে। দণ্ডক যে অরণ্য হইয়া গেল সে ত ব্রাহ্মণেরই তেজে। ব্রাহ্মণদের তুরবস্থা করিত বলিয়াই ত অগস্ত্য ঋষি বাতাপিকে খাইয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণের রাগও যেমন, দয়াও তেমন। আপনি মাপ করুন আমাকে। আমার মতে মেয়েলোকের পতিসেবাই প্রধান ধর্ম্ম এবং স্বামী সব দেবতার চেয়ে বড়। আমি খুব ভক্তির সহিত স্বামীর সেবা-যত্ন করি। আপনি যে বক পোড়াইয়া মারিয়াছেন তাহা আমি সেই ভক্তির ফলেই জানিতে পারিয়াছি।

"ঠাকুর, রাগ মানুষের ভয়ানক শত্রু। খাঁটি ব্রাহ্মণ কে? যাঁর রাগ নাই, মোহ নাই, যিনি সর্ব্বদা সত্য কথা কহেন, গুরুজনকে খুসী রাখেন, যাঁকে হিংসা করিলেও যিনি প্রতিহিংসা করেন না, যিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ থাকেন, ধর্ম্ম আচরণ করেন, পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকেন ও অন্যকে পড়ান, শরীরের ভিতরকার রিপুগুলিকে বশে রাখেন, যিনি সকল লোককে নিজের মত দেখেন, সকল ধর্ম্মের কাজে যোগ দেন, যিনি যাগযজ্ঞ করেন ও করান, সাধ্যমত দান করেন, ব্রহ্মচারীর ভাবে থাকেন ও বেদ পড়েন। বেদ পড়া, মনটাকে স্থির রাখা, সরলতা, সংযম ও সত্য ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা থাকা চাই। ধর্ম্ম বড় সূক্ষ্ম জিনিষ—বুঝিয়া ওঠাই কঠিন। আপনি পড়াশুনা করেন, শুদ্ধভাবে থাকেন, ধর্ম্মও জানেন—কিন্তু বোধ হয় খাঁটি ধর্ম্ম জানেন না।

"ঠাকুর, যদি খাঁটি ধর্ম্ম না জানেন তবে মিথিলায় গিয়া ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ সত্য কথা কয়, নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করিয়াছে এবং সর্ব্বদা বাপমার সেবা করে। সে আপনাকে ধর্ম্মের কথা বুঝাইয়া দিবে। ঠাকুর, মেয়েলোকদিগকে মারিয়া ফেলিতে হয় না। আমি যে—মেয়েলোকের যেমন স্বভাব—এতগুলি কথা বলিলাম তার জন্য আমাকে মাপ করুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি তোমার উপর খুব খুসী হইয়াছি, আমার রাগও

Correction

থামিয়া গিয়াছে। তোমার এই বকুনিতে আমার উপকার হইল। তোমার ভাল হউক, আমি চলিলাম।"

ব্রাহ্মণ বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিলেন।

২

বাড়ী গিয়াও ঠাকুরের মনের খেদ মিটিল না। ধর্ম্মের সরুগতি কেমন-ধারা ?—ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে সেই মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের কাছে যাওয়াই স্থির হইল। কত বন-জঙ্গল, কত গ্রাম, কত সহর পার হইয়া ঠাকুর মিথিলায় আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়া দেখেন মিথিলা নগর বড়ই সুন্দর! কত সুন্দর সুন্দর রাস্তা, কত গাড়ী ঘোড়া, কত বড় বড় কোঠাবাড়ী, কত বীর যোদ্ধা,—আবার চারিদিকে কত যজ্ঞ ও ধর্ম্মকার্য্যের আয়োজন।

ধর্ম্মব্যাধ···কসাইখানায় বসিয়া মাংস বেচিতে ব্যস্ত

কৌশিক ব্রাহ্মণদের কাছে খোঁজ খবর লইয়া সেই ব্যাধের নিকট গিয়া হাজির হইলেন। ধর্ম্মব্যাধ তখন কসাইখানায় বসিয়া মাংস বেচিতে ব্যস্ত—হরিণের মাংস, মহিষের মাংস এই সব বিক্রয় করিতেছে। দোকানে লোকজনের ভিড় দেখিয়া ব্রাহ্মণ এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্যাধ তাঁহার আসার বিবরণ মনে মনে বুঝিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া বলিল—"ঠাকুর, এই কসাইকে কি করিতে হইবে, হুকুম হউক। সেই সতী গৃহিণীর কথা শুনিয়া কেন এখানে আসিয়াছেন তাহা আমি জানি।"

ব্রাহ্মণ ত' তাহার কথা শুনিয়া অবাক্। ব্যাধ তাঁহাকে যত্ন করিয়া নিজের বাড়ী আনিল। ব্রাহ্মণ সেখানে মুখ, হাত, পা ধুইয়া আসনে বসিয়া কহিলেন,—"দেখ, বাপু, আমার মনে হয় এই মাংস বিক্রয়ের কাজটা তোমার নিতান্তই অযোগ্য। তোমার এই কাজ দেখিয়া আমার মনে সত্যই বড় কষ্ট হইতেছে।"

ব্যাধ বলিল—"ঠাকুর, আমার পূর্ব্বপুরুষ যাহা করিয়া গিয়াছেন আমিও তাহাই করিতেছি, আপনি রাগ করিবেন না। আমি বৃদ্ধ ও গুরু লোকদিগের যত্ন করিয়া সেবা করি, সত্য কথা কহি, কাহারও ধনদৌলতে হিংসা করি না, সাধ্যমত দান করি, দেবতা, অতিথি ও চাকরবাকরদের খাওয়া হইয়া গেলে খাই, পরনিন্দা করিয়া বেড়াই না। পূর্ব্বকর্ম্মের ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভরণপোষণের উপায়। এই জনক রাজার রাজ্যে যার যার নিজের কাজই লোকে করিয়া থাকে, কুকর্ম্মী লোক কেহ নাই। রাজা এমন, যে নিজের পুত্র খারাপ কাজ করিলে তাহাকেও শাস্তি দেন। তিনি রাজকার্য্য নিজে দেখেন, ধার্ম্মিক লোক এদেশে কষ্ট পায় না। আমি নিজে পশু মারি না, অন্য লোক মারিয়া আনিলে তাহার মাংস বিক্রয় করি। কিন্তু মাংস আমি খাই না; দিনে আমার খাওয়াই হয় না, রাত্রিতে খাই। কেহ আমার নিন্দাই করুক আর প্রশংসাই করুক আমি তাহাকে খুসী রাখিতে চেষ্টা করি"।

ব্যাধ ব্রাহ্মণকে অনেক রকমের অনেক উপদেশ দিয়া শেষে বলিল—

"ঠাকুর, আপনি বাপমার অনুমতি না লইয়াই ঘর হইতে বেদ পড়ার জন্য চলিয়া আসিয়াছিলেন। এটা আপনার ভারী অন্যায় কাজ। আপনার বাপ মা শোকে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। আপনি শীঘ্র বাড়ী যান ও তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। না করিলে আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই বৃথা।"

ব্যাধ আরও বলিল—"আমিও পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম, আর আমার বন্ধু

ছিলেন এক রাজা। রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমিও একজন্ বড় শিকারী হইয়া উঠিয়াছিলাম। একদিন হরিণ মারিতে গিয়া ভুলে এক ঋষির গায়ে বাণ ছুড়িয়া ফেলিলাম। সেই ঋষির শাপেই আমার এই ব্যাধের ঘরে জন্ম। ব্যাধের ঘরে জন্মিয়াও আমি পিতামাতার সাধ্যমত সেবা করিতেছি। তাঁহাদের ব্যবসায় চালাইতেছি। ইহাতেই আমি তরিয়া যাইব।"

ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন,—"তুমি শূদ্র হইলেও আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ মনে করি। যাহার ব্যবহার ভাল সেই ব্রাহ্মণ। যাহার কাজকর্ম্ম খারাপ সে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেও শূদ্রের মত। দেখ, আমি নরকে পড়িয়াছিলাম, তুমিই আমাকে রক্ষা করিলে।"

ইহার পর কৌশিক বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভক্তির সহিত বাপ মার সেবায় লাগিয়া গেলেন।

পল্লীমায়ের অন্দরে

(শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত)

আজ্‌কে মোরা গিয়েছিলেম পল্লীমায়ের অন্দরে,
যেথায় বাতাস সদাই আকুল বহে ফুলের গন্ধরে,
যেথায় সবুজ ওড়্‌না তলে,
শিশির-বধূর মুখ্‌টী ঝলে,
জর্দ্দা শাড়ীর আঁচল টেনে' সন্ধ্যা নামে মন্থরে,
পল্লীমায়ের অন্দরে।
যেথায় ফুলের পশ্‌রা বুকে লতায় লতা লজ্জাতে,
ভোম্‌রা যেথায় মুগ্ধ নিতুই ফুলের নবীন সজ্জাতে,
আব্‌ছা আঁধার আলোর কূলে,
মুকুলবালা চোখ্‌টী খুলে,

রামধনু-রঙ্‌ পর্‌জাপতি লুটায় সবুজ-শয্যাতে,
লুটায় লতা লজ্জাতে।
যেথায় ভোরের থির্ গগনে সূর্য্য উঠে সত্বরে,
ঝল্‌মলানো ভোরের আলো ঝিকায় তরু পত্তরে।
যেথায় ভোরের পাখীর গানে,
নূতন আমোদ-স্ফূর্ত্তি দানে,
উজল শ্যামল বনশ্রেণী করে হৃদয় মত্ত রে,
সূর্য্য উঠে সত্বরে।
সাঁঝ্‌ গগনে আল্‌তো আলো লুকায় ধরার অঙ্কেতে,
ধান্য, গোধূম, কলাই যেথা ঘোম্‌টা খোলে সঙ্কেতে।
যেথায় সবুজ প্রাণের মেলা
যেথায় হাস্য—আমোদ—খেলা,
মনটা সেথায় রইল পড়ে জড়িয়ে গ্রামের অঙ্গেতে,
পল্লীমায়ের অঙ্কেতে।

ঠক বাছাই

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

রাজামশাই আজ দারুণ চটিয়া গিয়াছেন। চাকর মহীপাল সিং বেচারী তামাক দিতে দেরী করিয়া ফেলায় প্রচণ্ড ধমক্ খাইয়াছে, তরকারীতে নূন বেশী দিয়া ফেলায় পাচক বেচারীর চাক্‌রী যাইবার যো হইয়াছে। কাহারও একটু দোষ বাহির হইলেই অমনি রাজামশাই ধম্‌কাইয়া সারা করিতেছেন। সকলে অবাক্— ব্যাপারখানা কি? অমন যে শান্ত শিষ্ট রাজামশাই, তিনি আজ এত রাগারাগি করিতেছেন কেন?

ব্যাপার খানা কি তবে শুনিবে? রাজকোষে যে ট্যাক্স আদায় করিয়া জমা দেয়, গোল বাধিয়াছে সেই লোকটাকে লইয়া। যাহাকেই সে কাজের ভার দেওয়া যায়, শেষটায় দেখা যায়, সেই ট্যাক্স হইতে কিছু না কিছু সরাইয়াছে। রাজা কত লোককে বরখাস্ত করিলেন, কত লোকের পিছনে গোয়েন্দা লাগাইলেন, কত লোককে জেলে পাঠাইলেন, কিন্তু ব্যাপার যে সেই-ই। খাঁটী মানুষ আর একটীও মেলে না। আজও একটী নূতন লোকের চুরী ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সেই হইতে রাজামশাই বেজায় খাপ্পা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, যে তাঁর রাজ্যশুদ্ধ সকলেই ভণ্ড জুয়াচোর। কাজেই এত কাণ্ড!

এদিকে রাজার কাছে রোজই খবর আসিতেছে, অমুক জায়গায় জল-প্লাবনে সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে, টাকার বিশেষ প্রয়োজন, অমুক জায়গায় দুর্ভিক্ষের জ্বালায় মানুষ গাছের পাতা খাইতেছে, অবিলম্বে টাকা না পাঠাইলে দেশ শ্মশান হইয়া যাইবে!

২

বুড়া মন্ত্রী আর থাকিতে না পারিয়া শেষে একদিন ছদ্মবেশে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন, এবং কোথা হইতে যেন একটী ফকির সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ফকিরকে অবিলম্বে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা বলিলেন "ফকির সাহেব, বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি এই ট্যাক্স আদায় করা লইয়া। যাকেই সে কাজের ভার দেওয়া যায়, সেই আমার ঘাড় ভাঙ্গে। সারা দুনিয়া খুঁজিয়া এ কাজের জন্য একটীও সাধু লোক মিলিল না। দিন না আমাকে বেশ একটী সাধু লোক বাছিয়া!"

ফকির বেশ এক গাল হাসিয়া, ভরসা দিয়া রাজাকে বলিলেন "মহারাজ, সেজন্য আর ভাবনা কি? আজই আপনি ঢেঁড়ি পিটাইয়া দিন যে রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর দরকার। আর দেখুন, মাহিনাটা একটু বেশী করিয়াই বলিবেন। তারপর লোকজন দেখা করিতে আসিলে আমাকে খবর দিবেন, আমি ঠিক্ বাছিয়া দিব কে ভাল, কে মন্দ!"

সেই দিনই রাজ্যময় ঢেঁড়ি পিটাইয়া দেওয়া হইল—সুদক্ষ লোক চাই, মোটা মাহিনা, থাকিবার জন্য ভাল কোঠাবাড়ী দেওয়া হইবে, আর প্রতি মাসে রাজবাড়ী হইতে একটী করিয়া সিধা মিলিবে।

ঢেঁড়ি শুনিয়া পরদিনই তো দশ বার জন উমেদার আসিয়া হাজির। ফকিরের তলব পড়িল। ফকির আসিয়া রাজাকে একধারে ডাকিয়া লইয়া পরামর্শ দিলেন, "আজ নয়, আগামী শনিবার, রাত আট্‌টার সময় সব উমেদারকে হাজির হইতে হুকুম্ দিন, ঐদিন আমি ভাল লোক বাছিয়া দিব।" ফকিরের পরামর্শ মত রাজা সেইরকমই হুকুম দিয়া দিলেন।

৩

চাক্‌রীর গরজ,—বড় সোজা জিনিষ তো নয়, কাজেই নির্দ্দিষ্ট দিনে ছয়টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই উমেদারের দল আসিয়া আবার উপস্থিত। কিন্তু আসিলে কি হইবে, আট্‌টার আগে রাজামশাই মোটে নীচেই নামিবেন না! সেকেণ্ডের পর মিনিট,—এমন করিয়া মানুষের সমস্ত জীবনটাই কাটিয়া যায়, দু'ঘণ্টা কাল আর কাটিবে না? কাজেই শেষে দু'ঘণ্টা কালও কাটিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে উমেদারদেরও ডাক পড়িল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার একটা সরু ঢাকা বারান্দা দিয়া উমেদারদের রাজার বসিবার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। রাজামশাই ভারী প্রফুল্লচিত্তে বসিয়া আছেন; পাশেই ফকির। সকলে রাজাকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন "আপনাদের ভিতর হইতে বেশ একজন পাকা লোক আমি আজই বাছিয়া লইব; কিন্তু তার আগে আপনারা কে কেমন নাচিতে পারেন, নাচুন দেখি!"

রাজামশায়ের মুখে একি কথা? নাচিতে বলেন কেন? চাক্‌রী মিলিলে তাহারা তো রাজার পর্‌ওয়ানা দেখাইয়াই লোকের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করিবে—বানরের মত নাচ দেখাইয়া তো আর পয়সা আদায় করিতে হইবে না! তবে রাজা তাহাদের নাচ দেখিতে চান কেন? একজন জিজ্ঞাসা করিল

"মহারাজ কি আমাদের নাচিতে আদেশ করিলেন ?" রাজা জবাব দিলেন "হাঁ, আমি যখন বলিতেছি, তখন তাহাতে আর কোন লজ্জা নাই।"

কিন্তু কি জান কেন, নাচিতে কেহই রাজী হয় না। কেউ বলে তাহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, নাচিলে খোঁড়া হইয়া যাইবে ; কেউ বলে তার মাজায় বাত হইয়াছে, নাচিলে পক্ষাঘাত হইবে। সকলেই একটা না একটা ওজর দেখায়। কেবলমাত্র একজন লোক, কোন রকম ওজর আপত্তি না তুলিয়া, হঠাৎ একেবারে দারুণ নাচ স্বুরু করিয়া দিল। ওঃ, সে কি নাচের বহর ! মাজা দোলাইয়া, হাত কাঁপাইয়া, ঘরময় এমনি নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, যে রাজা পর্য্যন্ত অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রহিলেন।

ফকির তখন উঠিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি লোকটার নাচন বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজার নিকট তাহাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার লোক আমি চিনিয়া লইয়াছি। এই এতগুলি লোকের মধ্যে যদি সাধুপুরুষ কেউ থাকে তো, সে এই একটী। বাদবাকী সব কয়টাই চোর—আগাগোড়া ভণ্ডের দল।"

এখন বল তো ফকির অতগুলি লোককে ভণ্ড সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল কি করিয়া ? সেই যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার সরু বারান্দা দিয়া উমেদারদের রাজার কাছে লইয়া আসা হইয়াছিল, সেটা ছিল মোহরের বস্তায় ভরা। অন্ধকারে কেউই টের পাইবে না মনে করিয়া উমেদারের দল যত পারিয়াছে পকেটে মোহর বোঝাই করিয়াছে। তারপর যখন নাচের হুকুম হইল, তখন তো তাহাদের চক্ষু স্থির ! নাচিতে গেলেই তো পকেট হইতে মোহর বাহির হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িবে, আর তাহাদের সাধুপনাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে ! যে লোকটী নাচিতেছিল, সেই শুধু রাজার মোহর স্পর্শ করে নাই ; কাজেই তার আর নাচিতে ভয় কিসের ? দেখ দেখি, ফকিরের কৌশলে কেমন চমৎকার ঠক বাছাই হইয়া গেল ! *

——(০)——

* একটা সেকেলে গল্পের ছায়া লইয়া।

কইরু কোলের কথা

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

এক যে ছিল কইরু মুণ্ডা—জাতিতে কোল, গায়ের রঙ্ ছিল কুচ্‌কুচে কালো, শরীর ছিল বলিষ্ঠ। তীর-ধনুক নিয়া শিকার করিতে ছিল খুব ওস্তাদ, আর যখনকার কথা বলিতেছি, তখন তাহার বয়স ছিল কুড়ি। কইরুর কথা শুনাইবার আগে তাহার দেশের একটুখানি পরিচয় দিতেছি।

বাঙ্গলা দেশের পশ্চিমে যে বন-পাহাড়ের মুল্লুকের নাম ছোট নাগপুর, সেই মুল্লুকের দক্ষিণ দিকে ছিল কইরুদের বসতি। পাহাড়িয়া ও বুনা কোল জাতির একটা সম্প্রদায়ের নাম "চুটিয়া ;" এই চুটিয়া সম্প্রদায়ের কোলেরা এক সময়ে খুব ক্ষমতাশালী ছিল, আর সেই চুটিয়াদের নামে সেই অঞ্চলটার নাম হইয়াছিল চুটিয়া নাগপুর। লোকে এখন বলে ছোট নাগপুর। কোলেদের গায়ের রঙ্ কালো, থাকে বনে-পাহাড়ে ; কিন্তু ঐ জাতির লোকেরা বড়ই সাহসী, সত্যবাদী ও প্রফুল্ল। উহারা হিঁদুদের ছোঁয়া জলটুকুও খায় না, তা সে জলটুকু ব্রাহ্মণই দিন্ আর যিনিই দিন্।

ছোটনাগপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের কাছাকাছি অনেকগুলি কোলেদের গ্রাম, আর তাহার মধ্যে আমরা বলিব তুইখানি গ্রামের কথা। কইরু মুণ্ডার গ্রামের নাম 'উলিকেরা' আর তাহার পাশের অন্য একখানি গ্রামের নাম 'দিরিকেরা'। দিরিকেরা গ্রামের যে বড় চাষী, অর্থাৎ মুণ্ডা, তাহার মেয়ের নাম ছিল জুল্‌কি ; আর গল্পের সময় সেই মেয়ের বয়স ছিল পনের। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই, কেননা কোলেদের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা বড় হইয়া নিজেদের পছন্দমত বিবাহ করে। একদিন জুল্‌কি খেলা করিতে করিতে ও গান গাইতে গাইতে, একা একটা পাহাড়ের মাথায় চড়িয়া চারিদিকের বন-জঙ্গল দেখিতেছিল। গ্রামের লোকেরা তখন পাহাড়ের তলায় একটা চটাঙ্গ্-এর উপরে বসিয়া গল্প-সল্প করিতেছিল, আর

কয়েকজন ছেলে-মেয়ে খেলার ছলে জুল্‌কির দিকে তাকাইয়া তাহাকে চেঁচাইয়া ডাকিতেছিল। জুল্‌কি সহসা একটা কুলা বা বাঘ দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া চেঁচাইল। সেদিন কইরু আসিয়াছিল দিরিকেরায় বেড়াইতে, আর তাহার যেমন অভ্যাস সেই রকম তাহার তীর-ধনুক সঙ্গে আনিয়াছিল। মেয়েটির চেঁচানি শুনিয়া সবল পুরুষেরা গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল, আর বাঘ কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। জুল্‌কি খুব খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বুঝাইয়া দিল যে পাহাড়ের পশ্চিমের দিকের ঝর্ণায় মহুয়া গাছের তলায় বাঘ জল খাইতেছে। সকলেরই পথ-ঘাট চেনা ছিল; কইরু ও আর জনকতক জোয়ান ছেলে তীর-ধনুক ও "টাঙ্গিয়া" হাতে নিয়া ছুটিল। জুল্‌কি পাহাড় হইতে নামিল না; বাঘের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঝর্ণার দিকে গিয়া শিকারী কোলের দল কি রকমে কোথায় বড় বড় পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া তাক্ করিয়া শর ছুড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, জুল্‌কি তাহা দেখিতে পায় নাই। বাঘটা জল খাইয়া গভীর বনের দিকে যখন ধীরে ধীরে চলিতেছিল, তখন জুল্‌কি দেখিল বাঘের গায়ে একটা শর বিঁধিয়াছে, আর বাঘটা গাঁ-গাঁ আওয়াজ করিয়া ঝর্ণার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরের পর শর বাঘের গায়ে বিঁধিল, আর বাঘটা লাফাইয়া ঝর্ণার কূলে আসিয়া পড়িয়া গেল। জুল্‌কি তখন দেখিল, যে কইরু ও তাহার সঙ্গীরা ছুটিয়া বাঘের দিকে চলিতেছে।

বাঘ মরিল, আর কোল শিকারীরা তাহাদের টাঙ্গিয়া বা কুড়াল দিয়া কয়েকটা লতা কাটিল, আর সেই লতা দিয়া বাঘকে বাঁধিয়া, তাহাদের শরগুলি গুছাইয়া নিয়া বাঘটিকে বহিয়া গ্রামের দিকে চলিল। জুল্‌কি আনন্দে লাফাইয়া লাফাইয়া যখন পাহাড় হইতে নামিল, শিকারীরা তখন বাঘ বহিয়া ফিরিল, আর গ্রামের লোকেরা বাঘ ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কোলেদের মধ্যে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে সংবাদ পৌঁছাইবার আশ্চর্য্য সঙ্কেত আছে। দেখিতে দেখিতে কইরুর উলিকেরা গ্রামের ও অন্য গ্রামের অনেক স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া জুটিল। বাঘ ছিল

খুব বড়, তাহার মাংস হইল ঢের; তিন গ্রামের লোকেরা মাংস ভাগ করিয়া নিল। কোলেরা বাঘের মাংস খায়।

যখন মাংসের জন্য বাঘ কাটা হইতেছিল, তখন দিরিকেরার চিম্‌নু শিকারী বলিল যে বাঘের জিভ্‌টা পাইবে কইরু। বাঘের জিভে ওষুধ হয় বলিয়া উহার অনেক মূল্য। কইরু সে কথা শুনিয়া বলিল যে, বাঘের জিভ্ পাইবে জুল্‌কি, কেননা সেই-ই বাঘ দেখিয়াছিল। জুল্‌কি বলিল, না না, জিভ্ পাইবে শিকারীরা। তখন জুল্‌কির এক সহচরী হাসিয়া বলিল, যে জিভ্‌টি কইরু পাইলেও জুল্‌কির হইবে, জুল্‌কি পাইলেও কইরুর হইবে। কারণ, সে জানে যে কইরু জুল্‌কিকে বিবাহ করিতে চায়। সকলে কইরু ও জুল্‌কির দিকে তাকাইল। কইরু কথা কহিল না—মাংস কাটিতে লাগিল, আর জুল্‌কি সহাস্য মুখে মাটীর দিকে তাকাইল।

সেখানে জুল্‌কির মা-বাপ ছিল। কইরুর বাপ, মা, ভাই বোনেরাও আসিয়াছিল। সকলেই বুঝিল কথাটা ঠিক। জুল্‌কির বাপ তখন বলিল যে, আজ এই শিকারের দিনে, তিন গ্রামের লোকের সাক্ষাতে তবে কইরু ও জুল্‌কির বিবাহের দিন স্থির হউক। কোলেদের বিবাহ হয় মাঘ মাসে, আর সেই মাঘ মাস হইবার অল্পই দিনকতক বাকী ছিল।

কথা ঠিক হইয়া গেল; তখন স্থির হইল যে সকলেই রাত্রে দিরিকেরায় খাইবে ও নাচ-গান করিবে। রাত্রে সকল ছেলে-মেয়েরা জুটিয়া নাচিল, গাইল, ও মাদল বাজাইল, আর সেই নাচের দলে কোলেদের নিয়ম অনুসারে কইরু ও জুল্‌কি নাচিতে লাগিল। মাঘ মাসে যেদিন বিবাহ হইয়াছিল, সেদিনও হইয়াছিল এই রকমের খাওয়া-দাওয়া, আর নাচগান। কোলেদের বিবাহে পুরোহিত চাই না; মন্ত্র পড়ারও প্রয়োজন নাই। এই রকমের আনন্দ-উৎসব হইলেই বিবাহ শেষ হয়।

গ্যাস লাইটের জন্মকথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

আমাদের একটী বন্ধু আছেন, বাড়ী তাঁহার খাস কলিকাতায়। বন্ধুবরের একবার খেয়াল হইল—পাড়াগাঁয়ে গিয়া দিন কয়েক কাটাইয়া আসিতে হইবে।

বন্ধু ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিহে, বলি পাড়াগাঁটা লাগ্‌ল কি রকম ?"

বন্ধু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"দেখ্‌তে শুন্‌তে চমৎকার ! কিন্তু যাই বল বাপু, আর কিন্তু কোনদিন এ শর্ম্মা ওমুখো হচ্ছে না।"

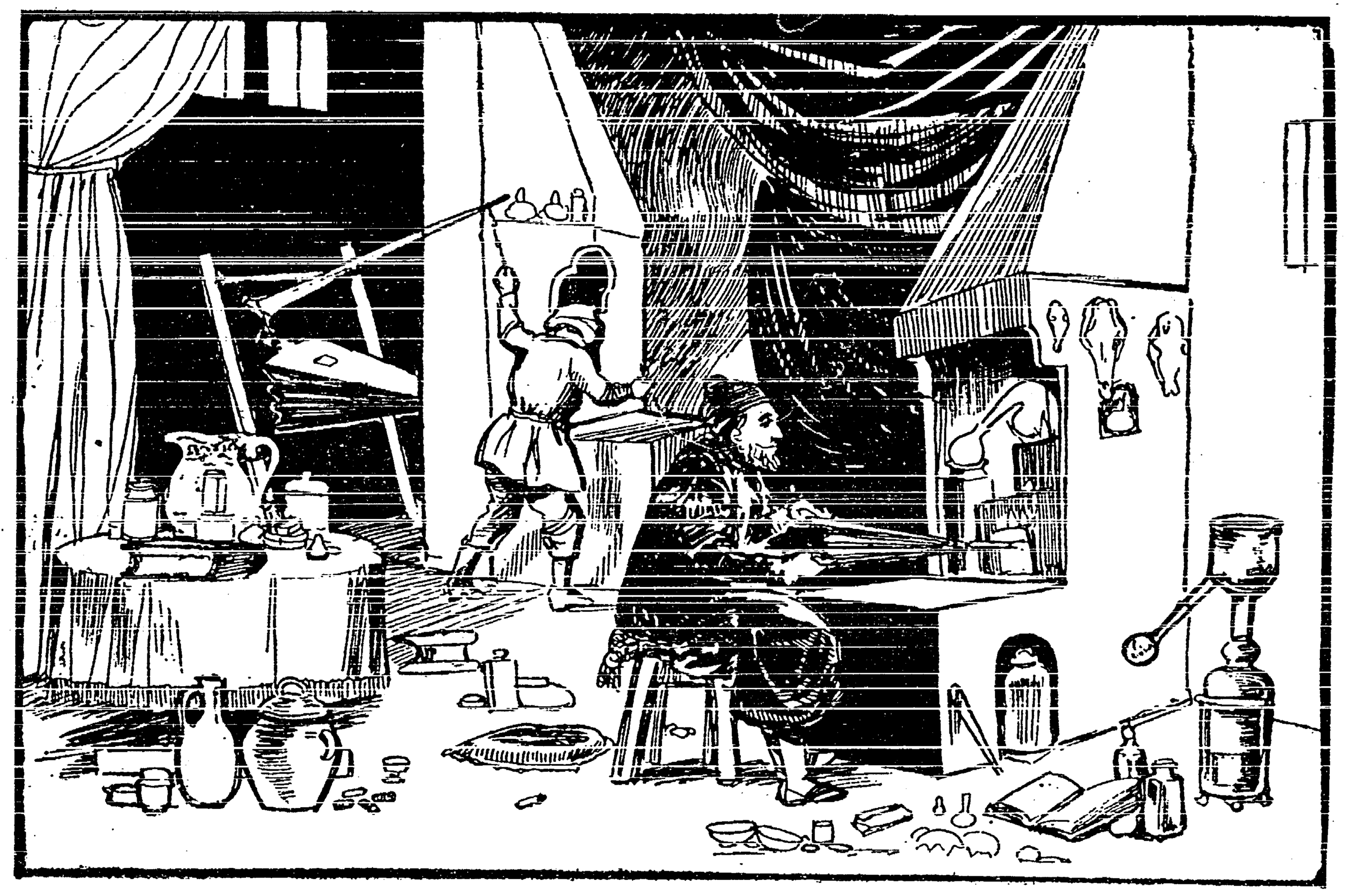

আলোর সন্ধানে

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"অর্থাৎ ? দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল বল্‌ছ অথচ—?"

বন্ধু তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, দিনের বেলাটা তাঁহার অতি চমৎকার কাটিত ; যত গোল বাধিত রাত্রে। আজন্ম কলিকাতার চোখ ঝল্‌সানো

গ্যাস আর ইলেক্‌ট্রিকের আলোতে কাটাইয়া, মিট্‌মিটে কেরোসিনের আলোর ভিতর বেচারা কেমন করিয়া টিকিতে পারে বল দেখি ? মফঃস্বলে ত' আর সব জায়গায় গ্যাসের আলো নাই, তাই সন্ধ্যার পরেই বেচারা চোখ থাকিতেও হইয়া যাইত রাত-কানা।

বন্ধুকে যদি কিছুদিন আগে এই পৃথিবীতে জন্ম লইতে হইত, তাহা হইলে কি হইত তাহাই ভাবি ! গ্যাস কিম্বা ইলেক্‌ট্রিকের আলো আর কত দিনের ? এই সেদিন ও ত' পৃথিবীতে সমস্ত সভ্য জাতিকেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত মোমবাতি কিংবা তেলের প্রদীপের উপর। আমরা গল্প, ইতিহাসে কত রাজ-রাজড়াদের চোখ ঝল্‌সানো সভার বর্ণনা পড়ি, কিন্তু একবারও ভাবিনা, এখনকার আলোর তুলনায় সে আলো কত ক্ষীণ, কত অন্ধকার ! এখনকার বিলাতের সাধারণ গৃহস্থের ঘরে রাত্রে যতখানি আলো দেখা যায়, তখনকার রাজ-রাজড়ার সভার প্রদীপেও সেটুকু আলো হইত কি না সন্দেহ।

যে গ্যাসের সাহায্যে এই এত বড় পরিবর্ত্তন, তাহার নাম "কোল গ্যাস" (Coal Gas)। কোল মানে কয়লা। কয়লাকে যদি তেমন ভাবে পোড়ান যায়, তবে তাহা হইতে ধোঁয়ার মত এক রকম জিনিষ বাহির হয়। এই ধোঁয়াই কোল গ্যাস। আসলে কিন্তু ইহা একটা গ্যাস নয়। অনেকগুলি গ্যাস এই কোল গ্যাসের মধ্যে থাকে। এই কোল গ্যাসে যদি আগুন ধরাইয়া দেওয়া যায়, তবে ইহা জ্বলিতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেশ তীব্র এক রকম আলো বাহির হয়। এই কোল গ্যাস হইতেই গ্যাস লাইটের জন্ম।

কোল গ্যাস কেমন করিয়া আবিষ্কার হইল, আর লোকেই বা কেমন করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে শিখিল, সেই গল্প আজ তোমাদের বলিব।

হোয়াইট্‌ হেভেন্‌ বলিয়া একটা জায়গায় কতকগুলি কয়লার খনি ছিল। একদিন দেখা গেল কয়লা হইতে ধোঁয়ার মত একরকম জিনিষ বাহির হইতেছে, আর আগুনের ছোঁয়াচ্‌ লাগিয়া এই ধোঁয়াটে জিনিষটা দিব্যি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ! এই রকম রোজই হইতে লাগিল। খনির লোকেরা ত' জানে না

জিনিষটা কি, তাহারা প্রথমে আলো নিভাইবার চেষ্টা করিল। তারপর না পারিয়া, ইট দিয়া লম্বা একটা চিম্‌নী তৈরী করিয়া দিল। কয়লার ধোঁয়া সেই চিম্‌নীর ভিতর দিয়া উপরে উঠিত, তারপর চিম্‌নীর আগায় গিয়া চারিদিক্ আলো করিয়া জ্বলিতে থাকিত।

ঘটনাটা একখানা খবরের কাগজে বাহির হইল। কাগজ পড়িয়া ডাক্তার ক্লেটন নামে এক ভদ্রলোকের মাথায় খেয়াল হইল—ব্যাপারটা সত্যি কি না পরীক্ষা করা যাক্। তিনি একটা কেট্‌লীতে করিয়া কতকগুলি কয়লা পোড়াইলেন, আর তাহা হইতে যে ধোঁয়াটা বাহির হইল, তাহা একটা রবারের ব্লাডারের মধ্যে পূরিলেন। তারপর সেই ব্লাডারের গায়ে একটা ছোট ছিদ্র করিয়া দিতেই, সোঁ সোঁ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে লাগিল। ক্লেটন সেই গ্যাস জ্বালাইয়া দিলেন, আর বন্ধুবান্ধবকে সেই তামাসা দেখিতে ডাকিয়া আনিলেন। ক্লেটন কিন্তু ভিতরের ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন নাই, কাজেই কাণ্ডটা একটা তামাসার মতই রহিয়া গেল। সকলে দেখিল, যে একটা তীব্র আলো যেন ব্লাডার হইতেই বাহির হইতেছে। কিন্তু ইহার ভিতর যে কতবড় একটা আবিষ্কারের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তারপর বছর পঞ্চাশেক কাটিয়া গেল।

গ্যাস লাইটের আসল জন্মদাতা উইলিয়াম মারডক্ নামে একটি লাজুক ছেলে। তোমরা ষ্টিম্ এঞ্জিনের (Steam Engine) এর আবিষ্কর্ত্তা জেম্‌স্ ওয়াটের নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। এ লাজুক ছেলেটী ছিল তাঁহারই কারখানার এক কর্ম্মচারী। মারডকের কারখানায় ভর্ত্তি হইবার একটা মজার গল্প আছে। বেচারা গিয়াছে চাকুরীর চেষ্টায়। এদিকে মালিক মহাশয় নিজে উমেদারদের ডাকিয়া ডাকিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। মারডকের ডাক পড়িতেই বেচারা এত ভড়্‌কাইয়া গেল, যে হাত কাঁপিয়া তাহার টুপিটা গেল পড়িয়া। টুপি পড়িতেই খট্ করিয়া একটা কেমন আওয়াজ হইল, আর সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মারডক্ তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জানাইল যে টুপিটার ভিতরটা সোলার নয়, কাঠ দিয়া তৈরী, আর সে নিজের হাতে তাহা তৈরী করিয়াছে। কারখানার মালিক

বুঝিলেন ছেলেটা মুখচোরা হইলে কি হয়, ইহার মাথাটার বেশ দাম আছে। তাঁহার কারখানায় এই ধরণের লোকেরই দরকার।

কারখানায় মারডক্ অন্য লোকেদের মত কাজ করিতেন, কিন্তু তফাৎ ছিল এই, যে অবসর সময়টা তিনি অন্য লোকদের মত আড্ডা দিয়া না কাটাইয়া বিজ্ঞান চর্চ্চায় কাটাইতেন। তিনি অনেক কিছু মাথা হইতে বাহির করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লাজুক স্বভাবের জন্য তাহার অনেকগুলিই বাহির হইয়াছিল বেনামীতে। রাত্রে কাজ করিতে গিয়া মারডক্ একটা বড় অভাব অনুভব করিতেন—মোমবাতির আলোতে তাঁহার বড় অসুবিধা হইত। একটা উজ্জ্বল সাদা আলোর জন্য তিনি বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হইল, এই মস্তবড় অভাবটা কি করিয়া দূর করা যায়। নানারকম পরীক্ষা চলিল। তারপর, হঠাৎ একদিন তাঁহার ৫০ বছর আগের ক্লেটনের সেই তামাসার কথা মনে পড়িল। মারডক্ অবশ্য তামাসার দিক্ দিয়া মোটেই যান নাই। তিনি কয়লা আনিয়া পোড়াইয়া, সেই গ্যাস লইয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা জুড়িয়া দিলেন।

সে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা মারডক্‌কে বড় পছন্দ করিত। একদিন তাহারা আসিয়া তাঁহার ঘরের কাছে উঁকিঝুকি মারিতেছে, হঠাৎ মারডক্ একজনকে ডাকিয়া বলিলেন "লক্ষীটী, দোকান হইতে একটা জিনিষ আনিয়া দাওত"। জিনিষটা আর কিছুই না, সেলাই করিবার সময় দর্জ্জিরা আঙ্গুলে যে একরকম ঠুসি পরে না, তাহারই একটা। ছেলেটির কিন্তু ভয়ানক কৌতূহল হইল। সে ঠুসি আনিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কাণ্ড দেখিতে লাগিল। একটা কেট্‌লীর মধ্যে কতকগুলি কয়লা পুড়িতেছিল, আর সেই কেট্‌লীর নলের সঙ্গে আর একটা লম্বা নল লাগান ছিল। মারডক্ ঠুসিটা সেই নলের মুখে আঁটিয়া দিলেন, আর তাহার গায়ে একটা ছোট্ট ছিদ্র করিয়া দিলেন। তারপর তাহার সম্মুখে খানিকটা আগুন ধরিলেন। ছেলেটী অবাক্ হইয়া দেখিল, সেই ছিদ্র দিয়া এক রকম গ্যাস বাহির হইতেছে, আর আগুনের সংস্পর্শে সেই গ্যাস জ্বলিয়া এক অদ্ভুত তীব্র আলোর সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্ধকার মিট্‌মিটে তেলের প্রদীপের যুগে মারডকের সেই অদ্ভুত চোখ-ঝলসানো আলো দেখিয়া গ্রামের লোক ধরিয়া লইল, মারডক্ নিশ্চয়ই একজন যাদুকর।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন মারডক্ তাঁহার বাগানের মধ্যে অনেক খানি "কোল গ্যাস" তৈরী করিয়া ফেলিলেন। তারপর, তিনি সেই গ্যাস বাহির হইবার পাত্রের সঙ্গে নল লাগাইয়া, সেই নল জানালা ফুটা করিয়া ঘরে আনিয়া, কড়িকাঠে ঝুলাইয়া দিলেন। নলের ভিতর দিয়া গ্যাস আসিতে লাগিল, আর তাহা জ্বালাইয়া দিতেই সমস্ত বাড়ী আলোয় আলোময় হইয়া গেল! এমনি ভাবে সেই কোন্ সুদূর এক পাড়াগাঁয়ে, বৈজ্ঞানিকের ঘরে প্রথম গ্যাসের আলো মানুষের কাজে লাগান হইল।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার লইয়া শীঘ্রই বেশ হৈ চৈ পড়িয়া গেল, আর মারডকের দেখাদেখি আরও কতকগুলি জায়গায় গ্যাসের আলোর ব্যবহার আরম্ভ হইল। মারডককে অনেকে টাকার লোভ দেখাইয়া নিজেদের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মারডক্ পুরাতন মনিবকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী হইলেন না।

গ্যাস লাইটের ত সৃষ্টি হইল, কিন্তু বড় বড় সহরের পথে-ঘাটে ইহার চল্‌তি হইতে আরও অনেক দিন লাগিল। লোকে প্রথম প্রথম ব্যাপারটাকে ততটা বড় করিয়া দেখে নাই। বিলাতের মস্ত বড় সাহিত্যিক, স্যার ওয়াল্টার স্কট্ ত' সমস্ত কথা শুনিয়া হাসিয়াই কুটি কুটি হইয়াছিলেন। তিনি লোকের কাছে গল্প করিতেন, "লণ্ডনে এক মাথা-পাগলা আসিয়াছে,—বলে কিনা কয়লার ধোঁয়ায় সহরটাকে আলোয় আলোময় করিয়া দিবে!" সাহিত্যিক মহাশয়কে কিন্তু শেষে বিজ্ঞানের কাছে হার মানিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পরে এমন দিনও আসিল, যখন তাঁহার নিজেরই গ্যাসের আলো না হইলে এক রাত্রিও চলিত না।

ভিতরের ব্যাপারটাও লোকে সহজে বুঝিত না। বড় বড় পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত মনে করিতেন—আগুনটা বুঝি নলের ভিতর দিয়াই আসে। নলের ভিতর

যে ঠাণ্ডা গ্যাস ভিন্ন আর কিছু নাই, আর সে গ্যাস যে নল হইতে বাহির হইয়া, তবে জ্বলে, তাহা তাঁহারা ধারণাই করিতে পারিতেন না। বিলাতের পার্লামেণ্টে যখন গ্যাসের আলো বসান হইল, তখন মন্ত্রী মহাশয়েরা গ্যাসের নলকে দেওয়ালের গায়ে বসাইতে দেন নাই। তাঁহারা ভাবিতেন, দেওয়াল পুড়িয়া যাইবার ভয় আছে। প্রথম যেদিন সেখানে আলো জ্বালান হইল, সেদিন নাকি সভ্যেরা হাতে দস্তানা পরিয়া, ভয়ে ভয়ে আসিয়া নলে হাত দিয়া দেখিয়াছিলেন, নলটা কতখানি গরম হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নলটাকে অতখানি ঠাণ্ডা দেখিয়া তাঁহারা খুবই ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছিলেন।

ইহার পর গ্যাস লাইটের নানারকম উন্নতি হইতে লাগিল। নানারকম উপায়ে এই আলোকে আরও সাদা আর তীব্র করা হইল। ক্রমে ইহার এত উন্নতি হইয়াছে যে ৩০০ মোমবাতি একত্র করিলে যতটা আলো হয়, একটা গ্যাসের আলোয় তার চেয়ে বেশী আলো পাওয়া গিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে, স্যার হামফ্রী ডেভি বিদ্যুতের আলোর সৃষ্টি করিলেন। তখন হইতে গ্যাস লাইটের সহিত বিদ্যুতের আলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

অরুণ-আলো

(শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন, এম্-এ, বি-এল্)

(২০)

এদিকে পশুদের দেবতার মন্দিরে আলো আর পরী বাস করচে।

আলো অরুণের কথা ভাবে, আর আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে।

পরী অরুণের কথা ভাবে, আর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে আলোকে সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু উপায় যে নাই!

আলো পরীকে জিজ্ঞাসা করে,—"বল্ দেখি বোন্, কি করি?"

পরী বলে—“তাইত ভাব্‌চি বোন্, কি যে কর্‌তে হবে, তাইত ভাব্‌চি।”

তখন দুজনে মিলে ব্যাকুল-মনে ব’সে রয়।

হায়, অরুণ শেষে আলোকে এত দুঃখ দিল! অরুণ আলোকে ভুলেই রইল!

পরী সব কথাই জানে কিনা,—তাই সে আলোকে সব কথাই বুঝিয়ে বল্‌ল।

আলো বুঝ্‌ল, যে পশুদের দেবতার শাপেই অরুণ মামা তাকে ভুলে রয়েছে। বুঝে, সে সঙ্কল্প কর্‌ল—পশুদের দেবতাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে হবে।

আলো পরীকে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রশ্ন কর্‌ল—“কি বলিস্ বোন্, ওই দেবতাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌ব না?”—ব’লে সে গুহার দিকে ইসারা কর্‌ল; কিন্তু স্পষ্ট ক’রে ‘পশুর দেবতা’ বল্‌ল না। কারণ, পশুকেও যদি তুমি পশু বল, আর সে শুন্‌তে পায়, তবে সে নিশ্চয়ই চট্‌বে।

পরী সস্নেহে বল্‌ল—“হাঁ, তুমি হয়ত পশুর দেবতাকেও সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌বে। কই, আলো, দেখি তোমার মুখখানা।”

আলো লজ্জায় রাঙ্গা হ’য়ে মুখখানা এগিয়ে দিল,—পরী পরমস্নেহে আলোর দিকে চেয়ে রইল।

যেন দুটী পুষ্প পরস্পরের প্রতি সোহাগে চেয়ে রয়েছে!

আলোর মুখ সাহসে ভরা, সঙ্কল্পে ভরা, আশায় ভরা, তেজে ভরা, উৎসাহে ভরা!

চেয়ে চেয়ে পরী বল্‌ল—হাঁ, তুমি পার্‌বে।

(২১)

পরীর কথা শুনে আলোর উৎসাহ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল।

এদিকে পশুদের দেবতা দেশভ্রমণে যাত্রা কর্‌বেন্—তারই আয়োজন চলেছে। বছরের মধ্যে কয়েক মাস তিনি ভক্তদের অবস্থা নিজের চোখে দেখে নেবার জন্য, এইভাবে দেশভ্রমণ ক’রে বেড়ান্।

তিনি সমারোহে যাত্রা কর্‌লেন্—একাকী। আলো আর পরী তাঁকে না জানিয়ে, পেছনে পেছনে চল্‌ল। আলো চলেছে—পদব্রজে। পরী চলেছে—অদৃশ্য হ’য়ে উড়ে উড়ে।

আলোর ত আর পথে চলা অভ্যাস নেই, তাই কখনও বা তার পা কেটে রক্ত পড়ে, কখনও বা সে ক্লান্ত হ’য়ে ভীষণ কষ্ট পায়! কিন্তু তবুও তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

অনেক পথ চলার পর পশুর দেবতা ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেন্—তাঁর পেছনে পেছনে পূজারিণী আস্‌চে।

আলোর উপর রাগ তাঁর তখনও কমেনি,—চীৎকার ক’রে বল্‌লেন্,—“যা, যা, ফিরে যা, কোথায় চলেচিস্?”

ব’লেই আবার চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন্।

আবার অনেক পথ চলার পর পশুর দেবতা ফিরে দেখেন্—আলো সঙ্গেই চলেছে।

আলোর কেশ আলুথালু, মুখে শান্ত হাসি, সারা অঙ্গে ক্লান্তি, আর তার পা কেটে দরদর ধারে রক্ত পড়্‌চে।

পশুর দেবতার দয়া হ’ল,—বল্‌লেন্—“তুমি কি চাও?”

আলো বর চাইল—“আমার অরুণ মামা যেন আমায় মনে আনে।”

পশুর দেবতা বল্‌লেন্—“ওটী হবেনা, আর কি চাই?”

আলো বর চাইল—“আমার মাতৃভূমি যেন স্বর্গের মত সুন্দর হ’য়ে ওঠে।”

দেবতা বল্‌লেন্—“তথাস্তু।”

অদৃশ্য পরী—আলোর কানের কাছে গান গাইল—“ধন্য আলো, ধন্য তুমি।”

তারপর দেবতা আবার চলেছেন্।

অজগর ভক্তদের দেশ, গণ্ডার ভক্তদের দেশ, ভল্লুক ভক্তদের দেশ, শার্দ্দূল ভক্তদের দেশ, তিমি ভক্তদের দেশ, সিন্ধুঘোটক ভক্তদের দেশ,—এই সবের মধ্য দিয়ে পশুর দেবতা হন্ হন্ ক’রে চলেছেন্।

বহুদূরে গিয়ে, দেবতা আবার ফিরে চাইলেন,—"একি! আলো যে! কি চাও?"

আলো—"আমার অরুণমামা যেন আমায় মনে আনে।"

দেবতা—"ওটী হবেনা, আর কি চাই?"

আলো—"আমার দেশের লোকেরা যেন উন্নত হয়, সুখী হয়, অপরাজেয় হয়। তাদের সকল যন্ত্রণার সমাধা হোক, তাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হোক্।"

দেবতা বল্লেন্—"তথাস্তু।"

অদৃশ্য পরী আলোর কাণের কাছে প্রশংসা গাইল—"ধন্য আলো, ধন্য আলো।"

দেবতা পুনরায় চলেছেন্—আলোও চলেছে। আলোর ভয় নাই, ভ্রান্তি নাই, পরাজয় নাই, অদম্য তার মন। কত না কাঁটা তার পায়ে ফুটচে, কত না আঘাত তার গায়ে লাগ্‌চে, তবু অবেলায় অনাহারে আলো চলেচে, চলেচে, চলেচে।

পশুর দেবতা ফিরে চেয়ে দেখলেন্—"আহা, এখনও রয়েছ! কি আলো, কি চাও?"

আলো—"আমার অরুণমামা যেন আমায় মনে আনে।"

দেবতা—"না, ওটী হবে না, অন্য বর চাও।"

আলো বর চাইল—"আমার গুরুজনেরা যেন প্রতিদিন আমায় আশীর্ব্বাদ করেন্। সর্ব্বদা আমায় মনে রাখেন্।"

দেবতা বল্লেন্—"তথাস্তু।"

অদৃশ্য পরী গান গাইল—"ধন্য আলো, ধন্য তুমি।"

দেবতা আবার চলেছেন্।

আলো এবার পেছন থেকে ডাক দিল—"ও দেবতা!"

দেবতা থমকে দাঁড়ালেন—"কি?"

আলো—"আপনার বর ফল্‌বে?"

দেবতা—"নিশ্চয়ই!"

আলো—"আপনি বর দিলেন, যে আমার গুরুজনেরা প্রতিদিন আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন্—কেমন?"

দেবতা—"হাঁ, নিশ্চয়ই কর্‌বেন, তুমি খুব ভাল মেয়ে, খুব লক্ষ্মী মেয়ে।"

আলো এবার সুখের স্বরে বল্‌ল—

"কিন্তু দেবতা, আমার অরুণমামা ত আমার গুরুজন?"

দেবতা—"হাঁ, তা ত বটেই, মামা নিশ্চয়ই গুরুজন।"

আলো—"বেশ। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে অরুণমামাও আমায় প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন?"

দেবতা—"হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

আলো—"সুতরাং, অরুণমামা আমায় প্রতিদিন মনেও আন্‌বেন্!"

দেবতা ঠিক বুঝ্‌লেন্ না, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্—"কি বল্‌ছ? আবার বলো, বুঝ্‌লেম্ না।" আর, "আবার বলো!" দেবতা ফাঁদে পড়েছেন!

আলো অল্পকথায় তাঁকে বেশ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, যে যদি দেবতার বর ফল্‌তে হয়, তবে অরুণ মামা প্রতিদিন আলোকে মনে আন্‌বেন; নইলে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন কি ক'রে?

দেবতা বল্‌লেন—"ওহো, তাইত!" আর, "ওহো তাইত!" দেবতা ঠকেছেন! দেবতা খুব কাতর হ'য়ে বল্‌লেন—

"তাইত, আলো, তাইত! এ যেন ভুল হ'য়ে গেল! আমার আগেকার শাপ আর এখনকার বর যেন উল্টো হ'ল! কি বল?"

আলো মনে মনে হাস্‌ল, মুখে বল্‌ল—"আপনি বিবেচনা করুন। আমি কি জানি?"

অথচ আলো সবই জানে! তার মত বুদ্ধিমতী আর হাস্যময়ী মেয়ে আমি দুটী দেখি নাই।

দেবতা ভেবে চিন্তে বল্‌লেন—"বেশ, ভালই হয়েছে। তুমি খুব ভাল

মেয়ে, বেশ হয়েছে। আমার শাপটা ফিরিয়ে নিলেম্, বরটা বজায় রইল। অরুণ তোমায় মনে আন্‌বে, কখ্‌খনো ভুল্‌বে না। তুমি এখন ফিরে যাও, আমার শাপ ফিরিয়ে নিলেম্। হাঁ, বেশ, যাও,—আমি এখন পিঁপড়েদের দেশে যাব।"

তিনি চল্‌লেন—আলো থাম্‌ল। তখন পরী আর আলো অসংখ্য রকমে আনন্দ কর্‌ল। দুজনের পা হ'তে চুল পর্য্যন্ত আনন্দে ভ'রে গেল, হাসিতে ভ'রে গেল।

তার পর পরী তার লাবণ্যময় ডানা মেলে উড়্‌ল। আলো তার ডানা জড়িয়ে ডানার উপর শুয়ে রইল। এইভাবে দুজনে উড়ে চলেচে, যেন দুটী অপ্সরী উড়্‌চে। তাদের রূপের ঝলকে সূর্য্যের চোখ ঝল্‌সে গেল,—তাদের রূপের স্পর্শে শূন্যভূমি চমকে চমকে উঠল,—তাদের রূপের মায়ায় চরাচর মোহিত হ'য়ে ঘুমিয়ে রইল,—শুধু পর্ব্বতগুলো মাথা উঁচু ক'রে অবাক্ হ'য়ে উপরের দিকে চেয়ে রইল,—পরী আর আলোর পানে।

উঃ কি প্রভেদ!

(২২)

"রিণি রিণি ঝিণি ঝিণি রুণুনু ঝুণুনু ঝিনি।" নকল-আলো নাচে, গায়।

তবু অরুণের মন যেন কেমন ক'রে ওঠে। বাতাস যেন বয়না, পাখী যেন

ডাকে না, ফুল যেন ফোটে না, মন যেন হাসে না। কিন্তু কিসের যে অভাব তাও স্পষ্ট বোঝা যায় না।

ঠিক এম্‌নি সময় বহুদূরের দেশে পশুর দেবতা আলোকে বল্‌লেন—"আমার শাপ ফিরিয়ে নিলেম্।"

অম্‌নি আসল-আলোর কথা অরুণের মনে পড়্‌ল। উ, কি প্রভেদ!

নকল-আলো আবার নাচল—রিণি ঝিণি। ওদিকে, পশুর দেবতা বহুদূরের দেশে আলোকে বল্‌লেন—"আমার শাপ আমি ফিরিয়ে নিলেম্।"

অম্‌নি তাঁর মন্ত্র বিফল হ'ল। যে মন্ত্রের বলে পশুর দেবতা বালির মূর্ত্তিকে নকল-আলো করেছিলেন, সেই মন্ত্র বিফল হ'ল।

ফলে যা ঘট্‌ল, তা মনে হ'লেও শরীর শিউরে ওঠে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নকল-আলোর সুষমা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; তার হাসি গেল মিলিয়ে, গান গেল মিলিয়ে, নৃত্যের ছন্দ থম্‌কে গেল, চোখ দুটো যেন কেঁদে কেঁদে মিশিয়ে গেল। তার রূপলাবণ্য যেন শ্মশানের মাঝে পুড়ে ছাই হ'ল।

হায়, হায়, এমন সুন্দর শরীরের সব গেল,—বাকি রইল কেবল এক স্তূপ বালি!

যাক্‌গে, এমন কত যায়!

অরুণ নিজের চোখে সব দেখ্‌ল,—তার গায়ে কাঁটা দিল, চোখ বুজে এল, মাথার ভেতর টন্ টন্ ক'রে ব্যথা জাগল, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে এল, সারা পৃথিবী যেন কাঁপছে, শূন্য যেন কাঁদ্‌চে।

তারপর?

তারপর অকস্মাৎ হাজার আলো জ্বলে উঠ্‌ল; হাজার বাঁশী বেজে উঠল; গানে গানে গানে সব পুলকিত হল; আনন্দের বন্যা বইল; যেন নন্দনকানন ঘুম হ'তে জেগে উঠ্‌চে!

আর আনন্দের নেশায় অরুণ যেন অবশ হয়ে পড়্‌ছে!

৫৪

অরুণের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—আলো, আর পরী!

আলো আর পরী উড়ে উড়ে এসে অরুণের সাম্‌নে দাঁড়াল।

কি আনন্দ! কি আনন্দ! এ আনন্দের কথা বল্‌তে বল্‌তে কূল পাওয়া যায় না।

পরী হাসে, হাসে, হাসে আর বলে,—

'কি অরুণ, আমায় নিশ্চয়ই বিয়ে করবে?'

অরুণ প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"পরী, তুমি আমার জন্য এত করলে কেন? তুমি আমার কে?"

পরী বল্‌লে—"যতদিন তুমি ঘুরে বেড়ালে, ততদিন আমি ছিলাম তোমার পথের সাথী; আজ আমি তোমার রাণী।"

অরুণ লজ্জায় রাঙ্গা হ'ল, তাই বল্‌ল—

'না, না, সেকথা নয়।'

পরী বল্‌লে—"হাঁ, হাঁ, সেইটেই কথা!"

অরুণ—না, না, না, ভেবে দেখি।

পরী—হাঁ, হাঁ, হাঁ, বেশী ভাব্‌তে নেই।

অরুণ—আহা, দাঁড়াও।

পরী—উঁহু, এই আমি বস্‌ছি।

অরুণ—না, না পরী।

পরী—হাঁ, হাঁ অরুণ।

অরুণ—না।

পরী—হাঁ।

অবশেষে অরুণ রাজি।

পরী ত রাজি বটেই।

আলোর সুখের অন্ত নাই, সে হাস্‌তে হাস্‌তে চোখ মুছ্‌ল। তখন ঠিক হ'ল অরুণের সঙ্গে পরীর বিয়ে হবে।

ঠিক এম্‌নি সময় দেশের সমুদায় লোক এসে বল্‌লে—"না, না, এ বিয়ে হ'তে পারে না, কিছুতেই হ'তে পারে না।"

কেন! কেন!! কেন এ বিয়ে হ'তে পারে না?

দেশের সমুদয় লোক উত্তর করল—

"বর কনে একজাত নয়, এ বিয়ে হবে না। বর জাতিতে মানুষ, কনে জাতিতে পরী। দুই জাতে কি বিয়ে হয়?

বর কনে এক জাত নয়, এ বিয়ে হ'তেই পারে না।"

অরুণের মুখ গম্ভীর হ'ল, আলোর মুখ মলিন হ'ল। আর পরী? সে মনের বেদনায় ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল;—কোথায় যে চ'লে গেল জানি না।

কতবার আমি ভেবেছি, পরী হয়ত ফিরবে। কতবার অরুণ ভেবেছে, পরী হয়ত ফিরবে। আলো পরীর জন্য কত আশা ক'রে ব'সে রয়েছে।

তবু পরী ফেরে নাই। তার ভালবাসা আর তার দুষ্টুমি চিরকালের তরে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে!

তাতে কি? এমন কত যায়!

সমাপ্ত

এ যুগের কামান

বাঙ্গালীর যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস নাই, কাজেই কামান গোলার কথা বইতেই পড়িতে হয়। রামায়ণ মহাভারতে পড়ি সেকালকার বীরেরা অগ্নিবাণ, ব্রহ্ম-অস্ত্র, আরও কত কি ছুড়িতেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা বন্দুক কামানও ব্যবহার করিতে জানিতেন। বড় বড় ঐতিহাসিকেরা কিন্তু এ কথা মানেন না। তাঁহাদের মতে মানুষ মারার এই সব ফন্দী মানুষের মাথা হইতে বাহির হইতে আরও অনেক দিন লাগিয়াছে।

৬০০ বৎসর আগেকার বন্দুক কামান কেমন ছিল জান? বারুদ যে বন্দুকে লাগে একথা তখনও কাহারও খেয়ালেই আসিত না; নলের মধ্য দিয়া কৌশলে শত্রুর উপর পাথর ছোড়া হইত। পরে মানুষকে পৃথিবী হইতে সরাইবার জন্য বারুদ আসরে নামিলেন; কিন্তু তখনও কামান ছিল ছোট, হাতে করিয়া এখানে ওখানে নেওয়া চলিত। এই কামানকে বড় করিতে করিতে ক্রমে এমন প্রকাণ্ড মানুষ মারা কল করা হইয়াছে যে তাহার কাণ্ড দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এখন আর বারুদে আগুন লাগাইতে সেকালকার মত পল্‌তে ব্যবহার করিতে হয় না।—কলেই সে কাজ চট্ করিয়া সারিয়া দেওয়া চলে।

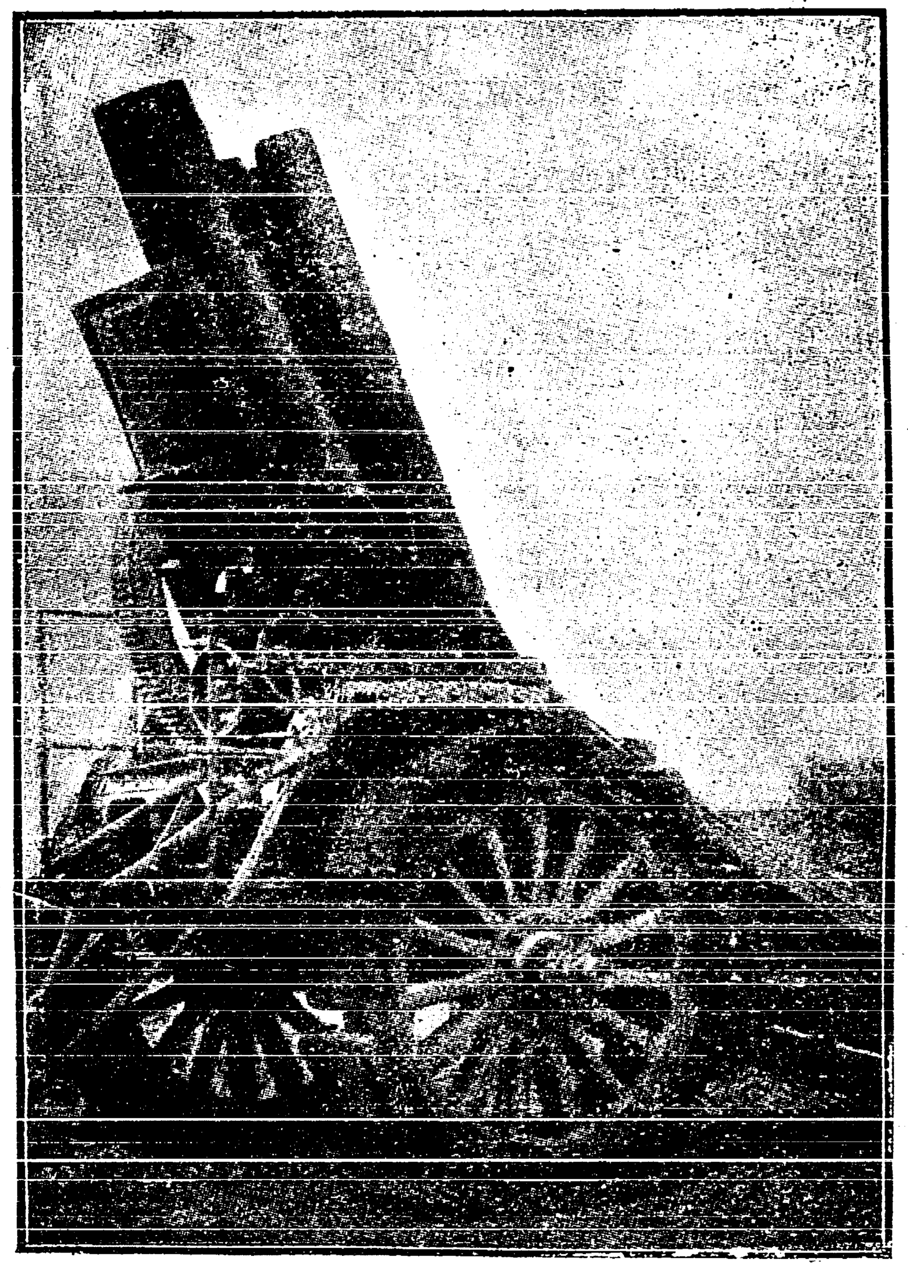

ক্রমে এমন প্রকাণ্ড মানুষ মারা কল করা হইয়াছে

এখনকার বড় বড় যুদ্ধে আর চড় চাপড়ের কারবার নাই। এক পক্ষ অপর পক্ষকে দেখিতেই পায় না; গায়ের জোর বেশী কি কম সে পরীক্ষার দিন চলিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণদের সঙ্গে সেবারকার বড় যুদ্ধের সময় আমাদের দেশী সৈন্য বিভাগের অনেক বীর ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে লড়াই করিতে গিয়াছিল। সেখানে খাদের মধ্যে বালিভরা বস্তার আড়ালে থাকিতে হইত, আর কোথা হইতে আসিয়া কামানের গোলা

পড়িত দেখাই যাইত না। পড়িয়াই গোলা যাইত ফাটিয়া, আর চারিদিকে হইত অগ্নিবৃষ্টি। একজন এদেশী বীর বলিয়াছিল এত "আদমীকা লড়াই নেহি, হাওয়েকা লড়াই।" মানুষে মানুষে কুস্তী বা তরোয়ালের কাটাকাটি বা বন্দুক ছোড়া এদেশে অনেকে বুঝিত, কিন্তু অতদূর হইতে ঝপ্ করিয়া গোলা আসিয়া পড়িল—মানুষ জন দেখা যায় না, কাহাকেও ধরিবার ছুঁইবার যো নাই—এ বড় বেজায় সঙ্গীন কাণ্ড!

ঐ বড় যুদ্ধের সময়ই নূতন রকমের মানুষ মারার অনেক কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যে সব বেলজিয়ামের মজবুত কেল্লা কেহ জয় করিতে পারিবে না বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, তোপের মুখে সে সব কোথায় উড়িয়া গেল। ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীর উপর জার্ম্মাণেরা গোলা ছুড়িয়াছিল কতদূর হইতে জান? ৭৫ মাইল তফাৎ হইতে। ভাবিয়া দেখ বর্দ্ধমানের ওদিককার কানু জংশন ষ্টেশন হইতে কলিকাতার উপর তোপ দাগিলে যেমন হয় সেই রকমটা।

জল-যুদ্ধ, স্থল-যুদ্ধ, সকল যুদ্ধেই এখন বড় বড় কামানের জয় জয়কার। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের যুদ্ধ-জাহাজ অনেক—দেশ বিদেশে তাহাদের রাজত্ব, সমুদ্রের উপর দিয়া তাহাদের গতিবিধি, কাজেই বেশী যুদ্ধ-জাহাজ না থাকিলে কাজ হাঁসিল হয় না। আজকাল আবার উড়োজাহাজের রেয়াজ চলিয়াছে। উপর হইতে বোমা ছুড়িয়া শত্রুর নগরকে কাবু করিবার এমন কৌশল আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তলা হইতে উপরে গুলি গোলা চালাইবার মতন ভাল বন্দুক কামানের নিকট উড়োজাহাজও কাবু।

ইংলণ্ডের যুদ্ধ-জাহাজই সকল দেশের চেয়ে বেশী আবার তাহার জাহাজের কামানগুলিও সকলকার চেয়ে বড়। জাহাজের বড় বড় কামানকে ১৫ ইঞ্চি কামান বলা হয়। কামানের যে জায়গা হইতে গোলা বাহির হইয়া যায় তাহা ১৫ ইঞ্চি চওড়া। ১২ ইঞ্চিরও বেশী চওড়া গোলা ছুড়িয়া ইহা দিয়া ৮।১০ মাইল দূরের জাহাজকে একেবারে লোনা জলের তলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। আরও দূরেও এই সব গোলা চলে, কিন্তু যে জিনিষটার দফা শেষ করিতে হইবে সেটাকে

লক্ষ্য করিয়া ত ছোড়া চাই। ইহার বেশী দূরের জিনিষের উপর দৃষ্টি ঠিক রাখিয়া ছোড়া কঠিন। সমুদ্রের কাছাকাছি যে সকল সহর বন্দর তাহাদেরও এই সব জাহাজের তোপের মুখে রক্ষা নাই। সেবার জার্ম্মাণদের একখানা ছোট জাহাজ মান্দ্রাজে বিভীষিকা জন্মাইয়া দিয়াছিল।

এই সকল কামান হইতে যখন গোলা বাহির হয় তখন কি ভীষণ শব্দ! কাণে তালি লাগিয়া যায়। আর কত জোরে আকাশ পথে সেই গোলা চলে! মিনিটে ২০ মাইলের উপর। আমরা বাঙ্গালী, ঘরে বসিয়া এসব ধারণাই করিতে পারি না।

স্থল-যুদ্ধের কোন কোন কামান জল-যুদ্ধের কামানের চেয়েও বড়। জার্ম্মাণেরা যে সব কামানে বেলজিয়মের কেল্লা চূরমার করিয়া দিয়াছিল, যে কামান পারীর উপর ছুড়িয়াছিল সে আরও বড় কামান। নিউইয়র্ক সহরের নিকট স্যাণ্ডীহুক নামক স্থানে মার্কিনেরা বন্দর রক্ষা করার জন্য যে কামান বসাইয়াছে তাহা আকারে জার্ম্মাণদের বড় কামানের চেয়ে ছোট হইলেও শক্তিতে অনেক বড়। পানামার খালেও এই রকমের তুই বড় কামান বসান হইয়াছে।

উড়োজাহাজে চড়িয়া শত্রু কোথায় আছে ঠিক করিয়া নিয়া এই সব বড় কামান দিয়া তাহাকে নষ্ট করা—ইহাই এখন বড় রকমের বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ।

এই সব কামান গোলা কি যে সে টাকায় তৈয়ারি হয়? ধনশালী, শক্তি-শালী গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন কাহার সাধ্য উহা প্রস্তুত করে? ইংলণ্ড ধনকুবেরের দেশ, আমেরিকা ধন কুবেরের দেশ অথচ বীরের দেশ, তাই তাহারা এই সব তৈয়ারী করিয়া নিজেদেরকে আরও বড় করিতেছে। জার্ম্মাণী গত যুদ্ধের পর বেজায় কাবু হইয়া পড়িয়াছে, তাই কিছু করিতে পারিতেছে না। তাহার মাথা তুলিতে এখনও অনেক দেরী।

সাবধানী বুড়ো

(শ্রীমাঠব্য)

সাবধানেতে রইবে সদা, পষ্ট কথা বল্‌ছি শোন,
এর পরেতে পস্তালে, দোষ দিওনা আমায় কোন।

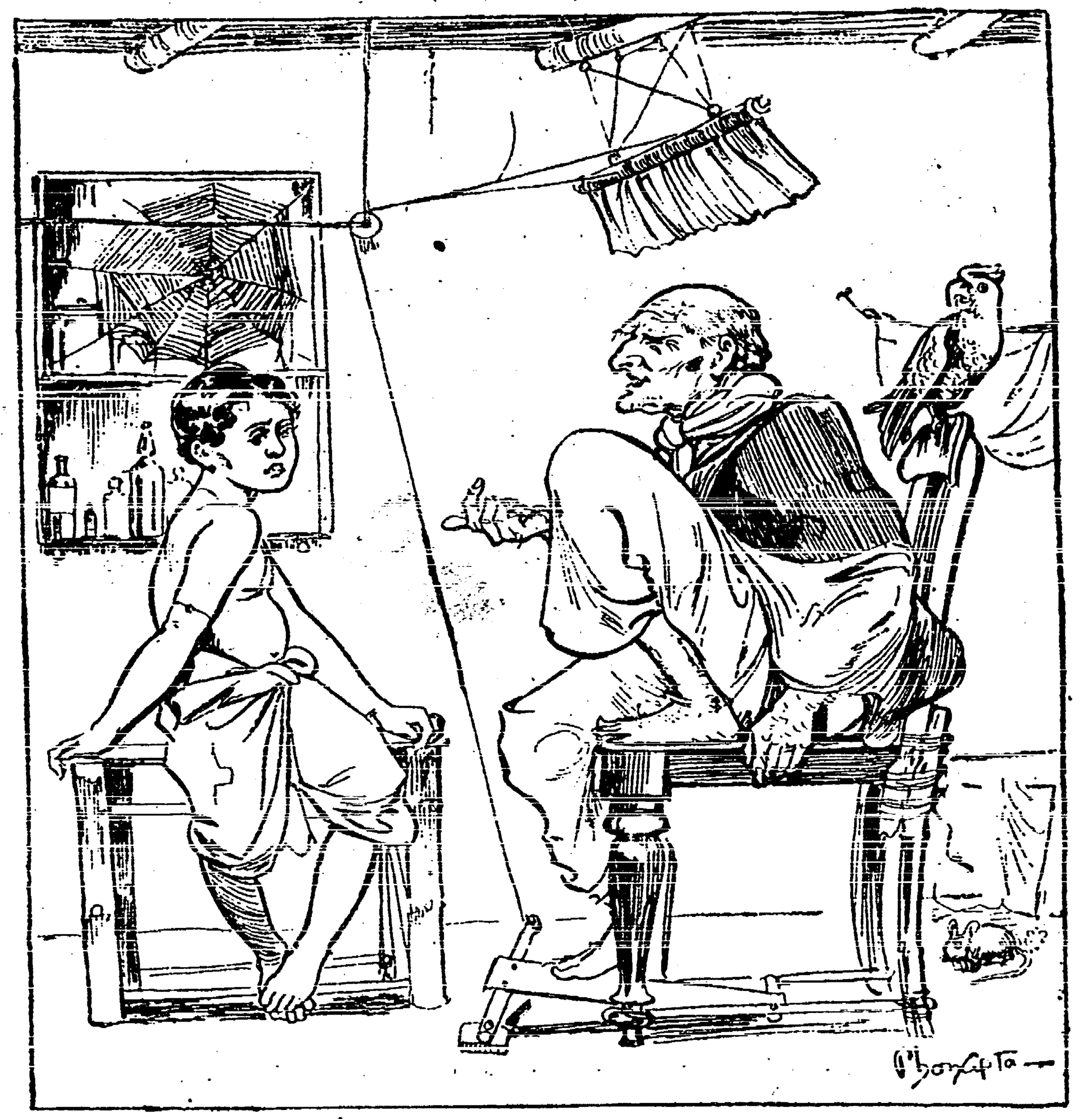

দোষ দিওনা আমায় কোন

পো'টেক খানেক কাপাস তূলো ভিজিয়ে নিয়ে অম্বলে,
নাকের দুটো ফুটোয় গোঁজ, 'জয়ভোলানাথ ব্যোম' বলে;
নইলে সেথায় বাঁধলে বাসা টিক্‌টিকি কি হস্তীতে,
কেমন করে, ঘ্যাচ্‌ঘ্যাচা ঘ্যাচ, দিন কাটাবে স্বস্তিতে?

কাপাস তুলো কোথায় পাবে ? তাও লিখে নাও, বাৎলেদি,
এসব খবর অপর কাকেও অষ্টপ্রহর সাধ্‌লে দি।
চণ্ডীখুড়োর তপোবনের একটুখানি নৈঋ্র্তে,
যেথায় মৃগ বাঘের সাথে ঘুরছে ভুলে বৈরিতে,
একটু থেমে, ঈশান দিকের শাল গাছটা বাঁয় রেখে,
নাক বরাবর চলবে সিধে, অগ্নি-কোণে ঠায় বেঁকে।
চাইবে নাক' ঊর্দ্ধ পানে, অধোর পানে চাইতে মানা,
—এসব নেহাৎ মোটা কথা, উচিত বাপু তোমার জানা !
পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে সেথায়, মস্ত ধানের গাছটা যে,
কড়াইসুঁটির বৃক্ষ যেথায় নিত্য নূতন সাজ সাজে,
আওতাতে তার বাড়্‌ছে কত, আম, বেল, কুল, কামরাঙা,
অশথ, পলাশ, বরবটী, তালের রস, আর জাম রাঙা।
তোমায় দেখে ফুলগুলি যার, উঠ্‌বে ফুটে ফট্‌ ক'রে,
কাপাস ব'লে, এক নিমেষে, চিন্‌বে তারে চট্‌ করে।

——(০)——

পদ্মরাগ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

২

ছেলেরা আজকাল সেয়ানা হইয়াছে

টেলিগ্রামের কথা শুনিয়াই সুপ্রভার মুখ ফ্যাঁকাসে হইয়া গেল। আর, তা নাই বা হইবে কেন বল, বাঙ্গালীর ঘরে তো সচরাচর টেলিগ্রাম করার রেওয়াজ নাই ! টেলিগ্রাম আসিলে ভাবনা তো একটু হইবারই কথা। সুপ্রভার ভাবনাটা যে মোটেই অযথা নয়, তাহা একটু পরেই প্রকাশ পাইল, যখন রণজিৎ শুক্‌নো মুখে তারখানা লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া বিনোদ

বাবু যে বিনোদ বাবু, তিনি পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "কিহে, ব্যাপার কি, কোথাকার তার ?"

সুপ্রভার মুখ ফ্যাঁকাশে হইয়া গেল

"সমসেরপুরের। রাজাবাহাতুর করেছেন, পড়ে দেখুন," বলিয়া রণজিৎ তারখানা বিনোদ বাবুর হাতে বাড়াইয়া দিল। টেলিগ্রাম পড়িয়া তো বিনোদ বাবুর চক্ষু স্থির ! তাহাতে লেখা আছে—"সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, শীঘ্র এসো"।

একদিনের মধ্যে এমন কি বিপদটা যে ঘটিয়া গেল, তাহা তো সকলেরই বুদ্ধির অগম্য ! সুপ্রভা যখন শুনিলেন, যে তাঁর বাপের বাড়ীর টেলিগ্রাম নয়, তখন তিনি একটু আশ্বস্ত হইলেন, তবুও মনটা তাঁর কেমন কেমন করিতে লাগিল। সুপ্রভার একটা অভ্যাস ছিল, কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলেই ছোট ছোট ছেলেদের প্রশ্ন করিতেন। তাঁহার ধারণা, ভগবান্‌ ছোটদের মুখ দিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দেন। তাই বোম্বা গুণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বোম্বো, সমসেরপুরের সব্বাই কেমন আছে ? গুণ্ডা কি বুঝিল সেই জানে, মুখে বলিল "ভাও আছে।"

সে দিনই বেলা পাঁচটার গাড়ীতে রণজিৎ সমসেরপুর ফিরিয়া যাইবে, ঠিক হইল। কথাটা অরুণের কাণে উঠিতেই, অমনি সে বায়না ধরিল—মামা-বাড়ী যাইবে। কিন্তু মা বাবা তার বড়ই অবুঝ, কথাটা যেন কাণেই তুলিতে চান না। অরুণ মনে মনে স্থির করিল, বিদ্রোহী হইবে। বিদ্রোহ ঘোষণা করার আগেই কিন্তু ছুই দলে একটা রফা হইয়া গেল। স্থির হইল, সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে অরুণ একটী ফুট্‌বল পাইবে, আর তার মামাকেও ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিতে পারিবে।

পাঁচটা বাজিবার খানিকটা আগেই, দলবলশুদ্ধ রণজিৎ আসিয়া ষ্টেশনে হাজির হইল, এবং টিকিট কিনিয়া রেলের একটা কামরায় গিয়া চাপিয়া বসিল। গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় সাহেবী পোষাক পরা একজন ভদ্রলোক, ছুইটী ছোট ছোট ছেলেকে সঙ্গে লইয়া, হাঁফাইতে হাঁফাইতে একেবারে রণজিতের কামরায় আসিয়া উপস্থিত! পরে, রণজিতের দিকে তাকাইয়া বলিল "আপনি কোথায় যাবেন, সেটা জিজ্ঞেসা কর্‌তে পারি কি?"

রণজিৎ দেখিল, ভদ্রলোক কেতা-ছুরস্ত বটেন, জবাব দিল "সম্‌সেরপুর।"

"ওঃ, তা হ'লে একটু উপকার যদি করেন! আমার এ ছেলে ছুটী যাচ্ছে রতনপুর। পথে তো আর কোন গাড়ী বদ্‌লী নেই! সেখানে সবই ঠিক আছে, ষ্টেশনে লোক এসে এদের নামিয়ে নিয়ে যাবে। যদি দয়া করে, পথে এদের ওপর একটু দৃষ্টি রাখেন—এই যাতে পড়ে, টড়ে, না যায়!"

রণজিৎ জবাব দিল "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" ছেলে ছুইটীর দিকে এইবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। বড়টীর বয়স বছর এগার, দেখিতে একটু কোলা-ব্যাঙ্‌ গোছের। ছোটটী বোধ হয় তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট হইবে, চেহারাখানা দেখিয়া বেশ বুদ্ধিমান্‌ বলিয়াই মনে হয়। রণজিৎ পরে জানিয়াছিল, তাহার নাম 'রামু,' ভাল নাম, 'ধীরাজকুমার।'

ঠিক সেই সময় গার্ড্‌ সাহেব সিটি বাজাইয়া নীল নিশান দেখাইতেই, অরুণ তাহার বাবার সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়ী আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল—রণজিৎ দেখিল, অরুণ তাহাকে দেখাইয়া রুমাল উড়াইতেছে।

রণজিতের যেরূপ ফুর্ত্তিবাজ স্বভাব, তাহাতে অন্য সময় হইলে, নিশ্চয় সে এতক্ষণে রামু ও তাহার কোলাব্যাঙ্‌ দাদাটীর সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিত। কিন্তু আজ তাহার আর অন্য কোন দিকেই মন বসিতেছিল না। রাজাবাহাদুর তাহাকে যে খুবই ভাল বাসেন, তাহা অবশ্য সম্‌সেরপুরের সকলেই জানে, কিন্তু তবুও এরূপ একটা রহস্যময় টেলিগ্রামের কি যে অর্থ হইতে পারে, তাহা সে কোন মতেই বুঝিতে পারিল না। টেলিগ্রামে আছে—সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তবে কি কেউ মারা গিয়াছে? বোধ হয়। কিন্তু কে মারা গেল? রাজাবাহাদুরের তো আর ছেলে পেলে নাই! তবে কি তাঁর ভাইপো'দের মধ্যেই কারও কিছু হইল?—দূর ছাই, রণজিৎ আর ভাবিতেই পারিল না, মাথা গরম হইয়া উঠিল।

একটা বড় জংসন ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই রণজিৎ ঠিক করিল, একটু লেমনেড্‌ খাইয়া, ও একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া, মাথাটা তার ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে। মাথা ঠাণ্ডা করিয়া সে তাহার নিজের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেখানে দস্তুরমত একটী ছোটখাটো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। ভীষণ বচসা চলিতেছে—একদিকে রামু ও তাহার কোলাব্যাঙ্‌ দাদা, অন্যদিকে রেল কোম্পানীর 'রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমের' একজন আর্দ্দালী। রণজিৎকে দেখিয়াই রামু নালিসের সুরে বলিল, "দেখুন দেখি, আমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে, কেমন ঠকিয়ে নিতে চাচ্ছে!" কোলাব্যাঙ্‌ তখনও অন্য কোন দিকে না চাহিয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আর্দ্দালীটাকে কেবল ধম্‌কাইয়াই চলিয়াছে।

শেষে ব্যাপারটা কি হইয়াছে, বোঝা গেল। চা দেখিয়া ছেলেদের পিপাসা পাওয়ায়, তাহারা আর্দ্দালীকে ডাকিয়া চা, কেক্‌ প্রভৃতি লইয়াছে। এখন আর্দ্দালী দাম হাঁকিতেছে একটাকা, ছেলেরা বলিতেছে আট্‌ আনা! ওঃ, তাহারা কি আর জীবনে কখনো রিফ্রেস্‌মেণ্ট্‌ রুমের চা খাইয়াছে?—আর্দ্দালীই আজ তাহাদের প্রথম খাওয়াইলেন—যাও, যাও, ও রকম আর্দ্দালী তাহারা ঢের ঢের দেখিয়াছে!!

এম্নি সময়ে গাড়ীখানা একটু নড়িয়া উঠায়, আরদালী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আউর গোল মাৎ কীজিয়ে বাবালোগ্, হাম্ কব্ভি ঝুট্ নেহি বলতেহেঁ।"

আর্দ্দালী নিতান্তই জিতিয়া যায় দেখিয়া, রামু মাথা খাটাইয়া একটা ভয়ানক বুদ্ধির কাজ করিয়া ফেলিল। যে 'ট্রে' খানায় করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে চা তৈরির পরে আরও খানিকটা দুধ ও চিনি বাকী ছিল। পূরা টাকাটাই যখন তাহারা দিবে, তখন দুধ ও চিনিটুকুই বা ফিরাইয়া দিতে যাইবে কেন? সব চাটিয়া পুটিয়া খাইয়া ফেলিবে। রামুর উপদেশ মত, কোলাব্যাঙ্ চোঁ চোঁ করিয়া দুধে চুমুক লাগাইল, রামু নিজে চিনির সসারটী লইয়া মহা উৎসাহে চাটিয়া চাটিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া দিল। তারপর ট্রের্ উপর যে রুমালখানায় টিপট্ প্রভৃতি থাকে, তাহা তুলিয়া লইয়া দু'জনে মুখ মুছিল, পরে জুতা মুছিল। আর্দ্দালী তো তার খরিদ্দারদের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে 'থ'! রণজিৎ বুঝিল, রামু মাথায় খাটো হইলে কি হইবে, বুদ্ধিতে অনেকের উপরেই টেক্কা মারে। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "ছেলেরা আজকাল বেশ সেয়ানা হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি।"

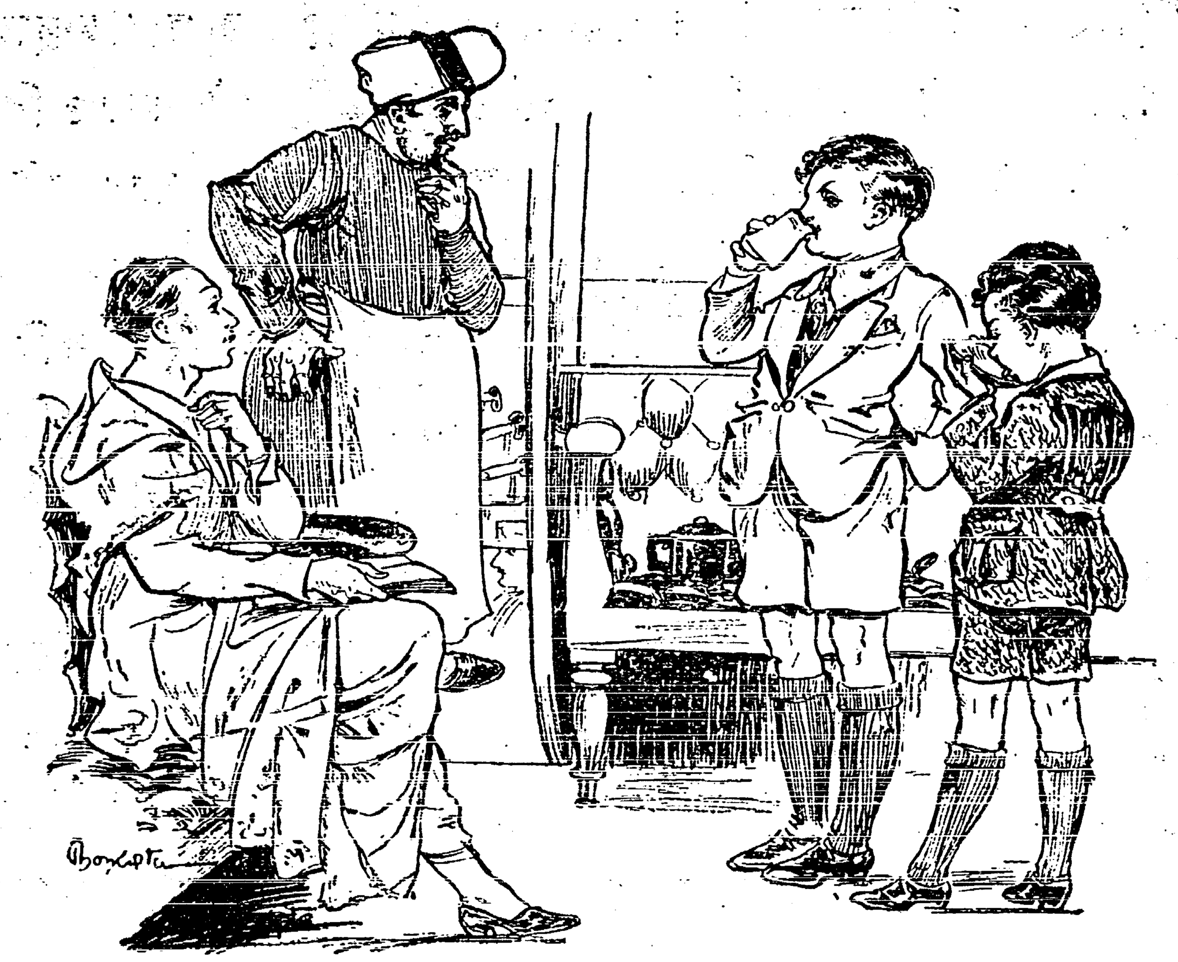

পূরা টাকাটাই যখন তাহারা দিবে ··· ফিরাইয়া দিতে যাইবে কেন?

পরদিন খুব ভোরেই রামু ও তাহার দাদা রতনপুরে নামিয়া গেল—তাহাদের কাকা আসিয়া তাহাদের নামাইয়া লইয়া গেলেন। ঘণ্টা দুই পরে, রণজিতের সমসেরপুরও আসিয়া উপস্থিত হইল।

রণজিৎ ঠিক করিয়াছিল, ষ্টেশন হইতে প্রথমে সে সটান তাহার নিজের বাড়ীতে যাইবে। তারপর, স্নান সারিয়া, একটু সুস্থ হইয়া, রাজা বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে রাজবাড়ীতে আসিবে। কুলীর মাথায় মালপত্র চাপাইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই সে লক্ষ্য করিল, রাজাবাহাদুরের নিজের ব্যবহারের প্রকাণ্ড মোটরকার খানা সেখানে দাঁড়াইয়া। তবে কি রাজা বাহাদুর কোন কাজে এদিকে আসিয়াছেন? একবার খোঁজ লইতে হইতেছে তো!

ষ্টেশনের ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেই, রাজবাড়ীর তক্মা-পরা একজন চাপরাশী আসিয়া, রণজিৎকে প্রকাণ্ড এক সেলাম করিয়া, হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা সীল-মোহর করা, দেখিলেই বোঝা যায় খুব গোপনীয়। রণজিৎ তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল। বেশী কিছু নয়, মাত্র দু'চারটা কথা, কিন্তু তাহা পড়িয়াই রণজিৎ হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—চিঠিতে লেখা ছিল।

"রণজিৎ,

ষ্টেশন হইতেই আমার গাড়ীতে চড়িয়া, বরাবর এখানে চলিয়া আসিবে। এখানে কি হইয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না। টেলিগ্রামের কথা ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। আশীর্ব্বাদক শশাঙ্কশেখর।"

শশাঙ্কশেখর রাজাবাহাদুরের নাম।

ভিতরের উদ্বেগ বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এম্নি ভাবে রণজিৎ রাজাবাহাদুরের মোটরে গিয়া চড়িয়া বসিল। সমসেরপুরের রাস্তাঘাট কাঁপাইয়া, বিশাল মোটর গাড়ী নক্ষত্রবেগে রাজবাড়ীর দিকে ছুটিল।

(ক্রমশঃ)

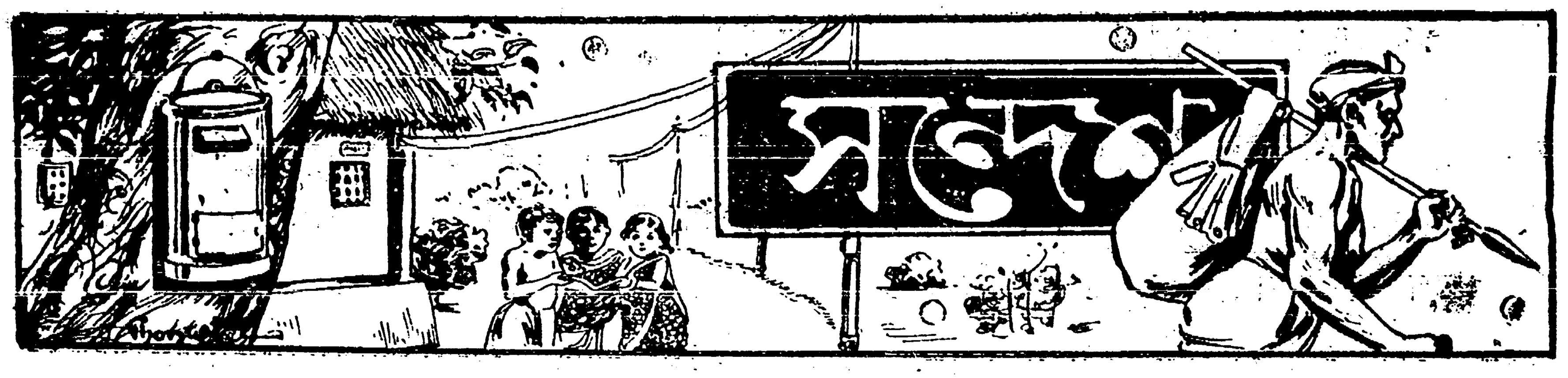

ক্যামেরার শক্তি

আমেরিকার সৈন্য-বিভাগ কিছুদিন হইল, এক প্রকাণ্ড ক্যামেরা তৈরী করিয়া কাজে লাগাইতেছে। ক্যামেরাটি শুধু দেখিতেই প্রকাণ্ড নয়, ইহার গুণও তেমনি। তুমি সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া থাক, ফটোগ্রাফার হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় (এভারেষ্টে) বসিয়া এই ক্যামেরার সাহায্যে তোমার হুবহু ছবি তুলিয়া লইবে। ক্যামেরার লেন্স খানাই ৯ ইঞ্চি চওড়া। এয়ারোপ্লেন হইতে এই ক্যামেরা দিয়া ৫ মাইল নীচের ছবি তোলা হয়।

মাকড়সার জাল কতখানি ভারী ?

তোমাদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, এমন একটা জিনিষের নাম কর, যাহা গুটাইলে পকেটে পুরিয়া রাখা যায়, আর খুলিলে তাহা দিয়া গোটা পৃথিবীটাকে জড়ান যায়," তবে কি উত্তর দিবে বল ত ? আমি হইলে বলিব, "মাকড়সার জাল।" হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যে আধ সের মাকড়সার জাল দিয়া পৃথিবীটাকে জড়াইয়া ফেলা যায়। অবশ্য আধ সের জাল যোগাড় করা বড় সহজ ব্যাপার নয়!

আলুর রবার

বাজারে আজকাল নকল জিনিষের অভাব নাই। সেদিন কাগজে পড়িলাম, কোন্ এক বৈজ্ঞানিক আলু হইতে খুব সহজ উপায়ে, এক রকম রবার বাহির করিতেছেন। কিছুদিন পরে হয়তো আর রবারের জন্য রবার গাছ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। যাহাদের আলু ভাতে না হইলে ভাত খাওয়া হয় না, তাহাদের চিন্তার কথা বটে—কেননা আলুর টান পড়িলেই মুস্কিল।

আলো না গুপ্তচর ?

গভীর রাত্রে যখন আকাশ দিয়া শত্রুপক্ষের এয়ারোপ্লেন উড়িয়া চলে, তখন ঘরে বসিয়া তাহাকে দেখা সম্ভব নয়। এক উপায় সার্চ্চলাইট। কিন্তু সার্চ্চলাইট ফেলিলে এয়ারোপ্লেনের লোকেরা বুঝিতে পারে, হয়তো বা সাবধান হইয়াও যাইতে পারে। সম্প্রতি মিঃ টেলিভিসান বেয়ার্ড নামে এক বৈজ্ঞানিক, এক অদ্ভুত বৈদ্যুতিক সার্চ্চলাইট আবিষ্কার করিয়াছেন। এই

আলোর মজা এই, যে উহা আর কেউ দেখিতে পায় না। এমন কি, এয়ারোপ্লেনের চালকও কিছু টের পায় না। এয়ারোপ্লেন হাজার হাজার ফুট উপরে উড়িতেছে, এই সার্চ্চলাইট ফেলিয়া দাও, ঘরের ভিতর একখানি পর্দ্দার উপর সেই এয়ারোপ্লেনের হুবহু ছবি আসিয়া পড়িবে।

প্রকৃতির খেয়াল

নীচে যে পাথরের মানুষের মাথা দেখিতেছ, উহা কিন্তু কোনও কারিগর তৈরী করে নাই। হাজার হাজার বছর ধরিয়া বৃষ্টির জল, বালি (বাতাসে উড়িয়া আসে) প্রভৃতি

পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া লাগিয়া, উহার নরম অংশগুলি ক্ষয় করিতে করিতে, তাহাকে এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রকাণ্ড পাথরখানা আছে ইংলণ্ডের কর্ণওয়ালে। লোকে উহার নাম রাখিয়াছে, ডাক্তার সিন্ট্যাক্স।

বিলাতে হিন্দু আশ্রম

তোমাদের মধ্যে যাহারা খুব গোঁড়া, অথচ বড় হইয়া বিলাত যাইতে চাও, তাহাদের আর এবার হইতে কোনও মুস্কিল হইবে না। লণ্ডন সহরে সম্প্রতি হিন্দুদের জন্য একটা আশ্রম তৈরী হইতেছে। সেখানে পূজা-আহ্নিক করিবারও অসুবিধা হইবে না। কেননা, এই আশ্রমের সঙ্গে একটি মন্দিরও তৈরী হইবে। শুধু জাহাজে হিন্দুয়ানীটা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলেই হইল।

ইন্দুর মারিবার অদ্ভুত উপায়

বাহিরের শত্রু দমন করিবার জন্য কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি অনেকে পুষিয়া থাকে, কিন্তু কেহ কখনও সাপ পোষে বলিয়া শুনিয়াছ কি? মেক্সিকোর অনেক জায়গায় ভয়ানক ইন্দুরের উৎপাৎ। সে দেশের লোকেরা সে জন্য পাইথন জাতীয় এক রকম সাপ পোষে। এই সাপের বিষ নাই। ইহারা কাহাকেও কামড়ায় না, শুধু ইন্দুর দেখিলেই টপ্ টপ্ গিলিয়া ফেলে।

বোতলের বাড়ী

আমেরিকায় রায়ো ভিষ্টা নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে কিছুদিন হইল একটা অদ্ভুত বাড়ী তৈরী করা হইয়াছে। বাড়ীটী ইট-পাথর দিয়া তৈরী নয়,— ইটের বদলে ব্যবহার করা হইয়াছে, কতক গুলি কাচের বোতল। বোতলের পর বোতল, সারি সারি সাজাইয়া, তাহাদের ভিতরের ফাঁকটুকু মাটী দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীখানি ২০ ফিট উঁচু, আর ১৬ ফিট চওড়া। ঘরও আছে দুইটি। ইহা তৈরী করিতে কত বোতল লাগিয়াছে জান? ১০ হাজার!

সমুদ্রে কতখানি লবণ আছে?

তোমাদের মধ্যে যাহারা সমুদ্র দেখিয়াছ, তাহারাই জান সমুদ্রের জল কি রকম লোণা। সমুদ্রের জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লবণ মিশান আছে। সে লবণ কত খানি জান? পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া ঠিক করিয়াছেন, যে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র যদি শুকাইয়া যায়, আর তাহার সমস্ত লবণ একত্র করা যায়, তবে উহাকে জায়গা দিতে একটা পাঁচলক্ষ মাইল লম্বা, পাঁচ লক্ষ মাইল চওড়া, আর একলক্ষ মাইল উঁচু ঘরের দরকার হইবে।

পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী ভ্রমণ

উইলিয়াম উলফ্ নামে এক ভদ্রলোক ৭ বৎসরের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া, পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবেন, ঠিক করিয়া ১৯২৫ সনে লস এঞ্জেল্‌স্ হইতে যাত্রা করেন। তিনি এ কয় বছরে কতখানি ঘুরিয়াছেন জান? আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোচীন, মালয়, সিংহল—সব তিনি ঘুরিয়া আসিয়াছেন! তিনি কিছুদিন আগে মান্দ্রাজে আসিয়াছিলেন। গোটা ভারতবর্ষ বেড়াইয়া, তিনি পারস্য, আরব, প্রভৃতির দিকে রওনা হইবেন। লোকটির ক্ষমতা আর সাহস দেখিলে হিংসা হয় না?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১ বৈ	২ দে	৩ হী	×	৪ ম	৫ হা	৬ দে	৭ ব	×	×
৮ ন	৯ ব	×	১০ ম	১১ হী	×	১২ ব	১৩ র্ণ	×	১৪ নি
১৫ তে	×	১৬ শূ	×	১৭ শূ	১৮ ন্ত	×	×	১৯ মূ	২০ ক
২১ য়	×	২২ ল	×	২৩ র	×	২৪ সি	২৫ ত	×	২৬ র
×	×	২৭ পা	২৮ ন্থ	×	২৯ শি	×	৩০ প	৩১ র	×
৩২ রা	৩৩ ব	৩৪ ণি	×	৩৫ অ	৩৬ ব	৩৭ জ্ঞা	×	৩৮ স	৩৯ শ্ব
৪০ ম	৪১ হ	×	৪২ তী	৪৩ র্থ	×	৪৪ ত	×	৪৫ না	৪৬ গ
৪৭ ধ	৪৮ ন	×	৪৯ ব	×	৫০ পু	×	৫১ নি	×	×
৫২ নু	×	৫৩ সৌ	৫৪ র	×	৫৫ ল	৫৬ ল	৫৭ না	×	৫৮ গ
×	৫৯ সা	৬০ ধ	×	৬১ গৌ	৬২ হ	×	৬৩ দ	৬৪ নু	৬৫ জ

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

সাধনা সেনগুপ্তা (কলিকাতা), শিশির কুমার রায় (বসির হাট), সুধীন্দ্রনাথ রায়, শান্তিপ্রসাদ নাগ, ফণীন্দ্রনাথ চাকী (গাইবান্ধা), অনিলবরণ মজুমদার (চাঁইবাসা), শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় (ধুবড়ী), ইন্দুভূষণ দে, জীবনকৃষ্ণ রায় (গাইবান্ধা), হিমাংশু কুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ী), ইন্দিরা, শচীন্দ্রনাথ, প্রভাস চন্দ্র, মীরারাণী, খুকুরাণী ঘোষ, প্রভাসচন্দ্র নাথ (শ্রীরামপুর), সমরেশচন্দ্র বসু (হাওড়া), সুনন্দা দেবী (রংপুর), অজিতকুমার, মনোরমা, অনুপমা ঘোষ (নবাবগঞ্জ, মালদহ), আশারাণী, অশোক, ক্ষেমময় (কলিকাতা), সম্পাদক ও চতুর্থ শ্রেণীর বালক সমিতি, সরিষা এইচ্ ই, স্কুল, এ, চক্রবর্ত্তী (গয়া), অখিল কুমার গুপ্ত (পাণিহাটি), অবনীবন্ধু আচার্য্য ও শৈলেশচন্দ্র রায় (সিরাজগঞ্জ), হরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (কালীঘাট), রেণু, রাণু, কালী, বেবী, হাসি, সুধা, স্নেহ, সুশীলা, প্রমদা, শৈলেন কানাই, পতাকী ও ভবানন্দ (বেঙ্গলী প্রাইমারী স্কুল মান্দালয়, বর্ম্মা), রণেশকুমার গুপ্ত

(জামসেদপুর), অমরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (রাজসাহী), লক্ষ্মীময়ী দেবী (ভরাকর, ঢাকা), শৈলেন্দ্র ও জ্যোৎস্না দত্ত (আড়াই-হাজার, ঢাকা) ফয়জন্নেসা উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ (কুমিল্লা), নিত্যগোপাল কুণ্ডু (পাকশী, পাবনা), ধ্রুবজ্যোতি সেন, শৈলেন্দ্রনাথ দাশ ও বিমলজ্যোতি সেন (কমলা স্কুল ঢাকা), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর) হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কলিকাতা), অবনী, রমণী, ক্ষীরোদ, ননী ও মিনু (আধুরিয়া, ঢাকা), রমারাণী চট্টোপাধ্যায় (ঝিনাইদহ, যশোহর), পঞ্চানন দত্ত (আটরা, খুলনা), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা), ব্যোমকেশ সিংহ (মহেশপুর) প্রভাতকুমার বসু, নিশীথ, তপন, সরোজ (পাটনা), উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, শক্তিধর নন্দ, নরনারায়ণ ত্রিপাঠি, হরনারায়ণ ত্রিপাঠি (মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর), সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী) অনিল, লীলা, বেলা, ইলা সৌরীশ, ইভু, ইন্দু, ফণী, সাধন, আশা, চিত্ত, শেফালী, শোভা, উষা, পুষ্প, সমরেন্দ্র, দুর্গা, জলধীশ, পৃথ্বীশ, চামেলী, বীণা, যতীন, শকুন্তলা, ভ্রমর (আধুরিয়া বড়বাড়ী ঢাকা)। উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), তারকদাস অধিকারী (চেঙ্গুটিয়া), মনোজিৎ বসু (কুড়িগ্রাম), অরুণ কুমার ঘোষ (আসানসোল), বীরেন্দ্রলাল সেন (নেহরা, চট্টগ্রাম) বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, (পাঁচগাঁও, সিলেট), জ্যোৎস্না দেবী, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুষমা সুন্দরী দেবী (সিলেট); ব্যোমকেশ মজুমদার (ত্রিবেণী, হুগলী ', চিত্তরঞ্জন, কামাখ্যারঞ্জন (কালীঘাট)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

প্রফুল্ল কুমার কুণ্ডু (লোহজঙ্গ) গিরিধারী বেরা (কলাগাছিয়া, মেদিনীপুর) মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সিরাজগঞ্জ) পারিজাত রেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মনোরমা দেবী (জলপাইগুড়ী) তারাপদ মুখোপাধ্যায় (বালী) বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীঅশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি, বি-ই-এস্)

পৃথিবীর মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ বাহন ;
লাঙ্গুল কাটিলে করি পৃথিবী ভ্রমণ।
নানা দেশ হ'তে আনি' বিবিধ সন্দেশ,
নিবেদি ভূপতি-পদে সহি নানা ক্লেশ।
মাথা কাটি রক্ষি দেশ বিক্রমে প্রবল ;
পলায়ন কালে কিন্তু আমিই সম্বল।
অতীব বিনীত আমি, বিদিত ভুবনে,
লঘু গুরু সব ভার বহি সে কারণে।
আমিই চালাই সবে হইয়া সচল,
কি নাম আমার বল পণ্ডিত সকল।

কালীয়-দমন

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

১ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৫ { ৯ম সংখ্যা

পেটুকের ভূগোল

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,)

১

মেওয়ার আমীর কাবুল এবং ফলের রাজা কাশী,
আমরুদেরি এলাহাবাদ বড্ড ভালবাসি।
আড্ডা আটার পাঞ্জাব এবং আমের আড়ত বোম্বাই,
সিঙ্গাপুরকে কর্‌লে মধুর আনারস আর রম্ভাই।
আখ্‌রোট এবং আঙ্গুর গড়া কাশ্মীর এবং জম্মু,
ভাঙের লাগি রঙ্গপুরকে আদর করেন শম্ভু!

২

মাখন-মোকাম আলিগড়, আর ঘৃতের ঘর ত খুর্জ্জা,
ডালপুরীতে কনৌজ আলো, আনন্দে যাই মূর্চ্ছা:!
গোলাপের গড় গাজিপুর, আর হিংএর সহর মুলতান,
আফিং লাগি চীন যে আপন, ফকির ব'নে সুলতান।
লেবুর লাগি সিলেট মিঠা, এলাচ লাগি গুর্জ্জর,
ল্যাংড়া ত দ্বারভাঙ্গার কিরীট—রসনা হয় ঝর্ ঝর!

৩

চানার লাগি পাটনা এবং অর্হর লাগি ছাপড়া,
তপ্‌সে লাগি বিখ্যাত, হায়, উলবেড়ে ও হাবড়া।
লক্ষ্ণৌএরি আতা এবং গয়ার কলাকন্দ,
মজঃফরপুর কর্‌লে আকুল পাকা লিচুর গন্ধ।
নিকট ফেলে কেন দূরের অনুরাগে মজ্‌লি?
মালদহেতে স্থাপ্‌লে সহর গোপালভোগ আর ফজ্‌লি।

৪

ভেট্‌কী, কই আর চিংড়ি লাগি যশোর হলেন ধন্য,
সরভাজাতে কৃষ্ণনগর নগর বলে গণ্য।
ছানাবড়ায় মুর্শিদাবাদ—জামের মত বর্ণ,
হুগলীকে, হায়, গৌরব দেয় তাহার সাঁচি পর্ণ।
বীরভূমেরে কর্‌লে খ্যাত মোরব্বা আর কুল গো,
বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, হায়, কে তার সমতুল গো!

৫

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বলরামী আটকে,
মিলবে নাক এমন জিনিষ ভুবনখানা হাঁট্‌কে।

ভূগোলকারই সত্য কবি, কালিদাসের তুল্য,
পৃথিবী ঠিক কমলাবেবু, উপমা অমূল্য।
সত্য হবে সরস ধরা, মধুর মত মিষ্টি,
ভগবানের আশিস্ মাগো—তাঁহার কৃপাদৃষ্টি।

ব্রাহ্মণ ও বক

(মহাভারত হইতে)

এক ব্রাহ্মণ ছিল, তার নাম গৌতম, বাড়ী মধ্য দেশে। সে ভিক্ষার জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে এমন এক গ্রামে গিয়া পৌঁছিল, যেখানে ধনদৌলত অনেক কিন্তু ব্রাহ্মণ একেবারেই নাই। এক ডাকাত সেই গ্রামে থাকিত, তার টাকা-পয়সা ছিল অনেক। ডাকাত হইলে কি হয়? তার ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি ছিল খুব, আর দানধ্যানও ছিল যথেষ্ট। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই ডাকাতের কাছে গিয়া একটি থাকিবার জায়গা আর এক বৎসরের মত খোরাক চাহিয়া বসিল। ডাকাত তাহা ত দিলই, তাহা ছাড়া আরও দিল নূতন কাপড় ও দাসী।

গৌতম আহ্লাদে আটখানা। সে সেই ডাকাতের দেওয়া ঘরে বাস করিতে লাগিল, আর সেই দাসীর আত্মীয়স্বজনকে পুষিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দেখিল এখানকার লোক ধনুকবাণ হাতে করিয়া পশুপক্ষী মারিয়া বেড়ায়, তাহারও ইচ্ছা হইল ঐ রকম করিতে। সে বাণ ছোড়া শিখিল, আর বনে বনে ঘুরিয়া হাঁস মারিতে লাগিল। সর্ব্বদা ডাকাতদের সঙ্গে থাকিয়া তাহার মনটাও ডাকাতদের মতই হইয়া গেল; দয়া মায়া যাহা কিছু ছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গেল। সে পাখী মারিত, আর সেই ডাকাতদের গ্রামে থাকিয়া মনে করিত—আঃ কি সুখ!

অনেকদিন এইভাবে কাটিলে সেই গ্রামে আর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি খাঁটি ব্রাহ্মণ—মাথায় জটা, পরণে হরিণের চামড়া, লেখাপড়ায় খুব মন, চেহারায় দেমাকের গন্ধও নাই, বেদে খুব জ্ঞান, স্বভাবটী খুব ভাল। এই

শালগাছের ফুল দিয়া বানান আসন, আর খাইতে দিল বড় বড় মাছ। জ্বলন্ত আগুনও আনিয়া দিল।*

গৌতমের ভোজনব্যাপার শেষ হইলে রাজধর্ম্ম নিজের পাখা দিয়া তাহাকে হাওয়া করিল। গৌতম যখন বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে তখন বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। গৌতম পরিচয় দিতে গিয়া বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ, নাম গৌতম।" বক ফুল ও পাতা দিয়া সাজাইয়া গৌতমের জন্য বিছানা করিল। গৌতম তাহাতে বেশ আরামে শুইয়া পড়িলে রাজধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি এখানে আসিলেন কেন?" গৌতম বলিল, "দেখ, আমি বড় গরীব; কিছু টাকার জন্য সমুদ্রের দিকে চলিয়াছি; চলিতে চলিতে এখানে আসিয়াছি।" রাজধর্ম্ম উত্তরে বলিল—"ঠাকুর, আপনি কিছু ভাবিবেন না, টাকা লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিবেন। আপনার সঙ্গে যখন আমার বন্ধুত্ব হইল তখন, আপনি যাহাতে টাকা পান, আমিই তাহার যোগাড় করিয়া দিব"। বক চুপ করিল, ব্রাহ্মণও ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি পোহাইলে রাজধর্ম্ম গৌতমকে এক লম্বা পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আপনি এই পথ ধরিয়া যান, এখান হইতে তিন যোজন দূরে এক মস্তবড় রাক্ষসের রাজা থাকেন, তাঁহার নাম বিরূপাক্ষ; তিনি আমার ভারী বন্ধু, তাঁহার নিকট গেলেই আপনার ইচ্ছামত জিনিষ পাইবেন।" গৌতম বকের কথামত সেই পথ ধরিয়া চলিল। পথে চন্দনের গাছ, অগুরুর গাছ, অমৃতের মত সব ফল—গৌতম গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে, ফল খাইতে খাইতে চলিল। রাক্ষসদের রাজধানীর নাম মেরুব্রজ—সেখানে পাথরের দরজা, পাথরের প্রাচীর, পাথরের কপাট—সবই পাথরের। দরোয়ান গিয়া রাজার নিকট গৌতমের খবর দিল। রাজা যখন শুনিলেন ব্রাহ্মণ তাঁহার বন্ধু রাজধর্ম্মের নিকট হইতে আসিতেছে, তখন তিনি হুকুম দিলেন—"যাও, শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আন"। রাজার চাকরবাকর ছুটিয়া

* গৌতম যে হাজার হইলেও মানুষ। একটু পোড়াইয়া না নিলে মাছগুলি খাইবে কেমনে? বক ত নয়, যে কাঁচা খাইবে।

ব্রাহ্মণের কাছে আসিল, ব্রাহ্মণ রাক্ষস-রাজের রাজধানীর আশ্চর্য্য শোভা দেখিতে দেখিতে তাহাদের সঙ্গে রাজার নিকট পৌঁছিলেন। রাজা তাঁহাকে খুব সমাদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন এবং পরিচয় ও বিদ্যাবুদ্ধির কথা জানিতে চাহিলেন। গৌতমের ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গেল—লাগিবারই কথা—তিনি কেবল নিজের গোত্রটী বলিয়া চুপ মারিয়া গেলেন। রাজা দেখিলেন ব্রাহ্মণের না আছে পড়াশুনা, না আছে ব্রহ্মতেজ! তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বাড়ী কোথায়, আপনি বিবাহই বা করিয়াছেন কোথায়? কোন ভয় নাই, ঠিক করিয়া বলুন।" গৌতম তখন বলিল,—"আমি ঠিক ঠিকই বলিব, জন্ম আমার মধ্যদেশে, থাকি আমি কিরাতের দেশে, আর বিবাহ করিয়াছি এক শূদ্রের বিধবাকে।"

রাজা একটু ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। শেষে মনে করিলেন, ইহার জন্ম ব্রাহ্মণবংশে, আর ইহাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন রাজধর্ম্ম যিনি আমার পরমবন্ধু, যাহাতে আমার বন্ধু সন্তুষ্ট হন আমাকে তাহাই করিতে হইবে। আজ'ত কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা, হাজার ব্রাহ্মণের ভোজন হইবে, ইহাকেও খাওয়াইয়া যথেষ্ট টাকাকড়ি দেওয়া যাইবে।

ক্রমে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া জুটিলেন। রাক্ষসের রাজা তাঁহাদিগকে অনেক ধন-দৌলত দিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখুন, কেবল আজই রাক্ষসেরা আপনাদের কোন অনিষ্ট করিবে না; আপনারা জিনিষপত্র নিয়া সরিয়া পড়ুন, এখানে একটুও দেরী করিবেন না।" ব্রাহ্মণেরা তাহাই করিলেন। গৌতম সোণার ভার লইয়া আবার সেই বটবৃক্ষের তলায় গিয়া হাজির হইল। পরিশ্রমে ক্ষুধাটাও বেশ জমিয়া আসিল। তখন সেই বক রাজধর্ম্ম আসিয়া নিজের পাখা চালাইয়া তাহাকে হাওয়া করিল এবং খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিল। গৌতম বেশ করিয়া খাইল, বিশ্রাম করিল। তারপর মনে মনে ভাবিল—আমি ত মজুরের মত এই সোণার বোঝা নিয়া রওনা হইয়াছি, কিন্তু পথে খাবার জিনিষ কিছুই দেখি না। আমাকে যাইতেও হইবে অনেক দূর। এক কাজ করা যাক্, এই বকটাকে মারা যাক্, এর গায়ে খুব মাংস আছে, পথের ব্যাপারটা বেশ চলিয়া যাইবে।

গৌতম যেখানে শুইয়াছিল তাহার পাশেই শুইয়াছিল রাজধর্ম্ম, আর কাছেই জ্বলিতেছিল আগুন। গৌতম দেখিল বক বেশ সুখে ঘুম যাইতেছে, সে ঐ আগুন আনিয়া পাখীর জীবন-লীলা শেষ করিয়া দিল। শেষে তাহার গায়ের রোঁয়া ছাড়াইয়া, আগুনে বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া, সোণার সঙ্গে বাঁধিয়া খুব জোর পায়ে রওনা হইল।

সেদিন কাটিয়া গেল। পরদিন সেই রাক্ষসের রাজা বিরূপাক্ষ নিজের ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, আজ রাজধর্ম্মকে দেখি না কেন? সে রোজ সকাল বেলা ব্রহ্মাকে বন্দনা করিতে যায়, ফিরিবার সময় আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া ঘরে যায় না। কিন্তু দুই রাত্রি চলিয়া গেল, সে ত আসিতেছে না। আমার মনটা বড় খারাপ হইয়াছে, সেই গৌতমের উপর আমার সন্দেহ হইতেছে—লোকটার না আছে লেখাপড়ার জ্ঞান, না আছে ব্রাহ্মণের গুণ, তাহাকে ডাকাতের মত মনে হয়। তুমি যাও, রাজধর্ম্মের থাকার জায়গায় গিয়া একটু খোঁজ লইয়া আইস।"

বিরূপাক্ষ রাজার পুত্র তখন অনেক রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া সেই বটগাছের তলায় গেলেন। গিয়া সেখানে সেই বকের হাড় কয়েকখানি মাত্র পাইলেন। তখন তাঁহার কান্না দেখে কে? কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি আর সব রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া গৌতমের পেছনে ছুটিলেন এবং অনেক দূরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া ফেলিলেন। গৌতমকে নিয়া তখন উপস্থিত করা হইল রাক্ষসরাজের নিকট—তাহার সঙ্গে থাকিল সেই বকের লাস। লাস দেখিয়া বিরূপাক্ষ ও রাজবাড়ীর আর সবাই ত কাঁদিয়া অস্থির। রাক্ষসরাজ শেষে পুত্রকে হুকুম দিলেন—"তুমি এই দুষ্টকে মারিয়া ফেলিয়া রাক্ষসগণকে ইহার মাংস খাওয়াও।" রাক্ষসেরা এই কথা শুনিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"মহারাজ, এই লোকটা এত পাপী যে ইহার মাংস খাইতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা হয় না। আপনি একে ডাকাতের হাতে ফেলিয়া দিন।" রাজা বলিলেন—"তবে তাহাই হউক।" রাক্ষসেরা তখন গৌতমের শরীরটা ডাকাতদিগের হাতে দিয়া দিল—

আস্ত শরীরটা দিল না, অস্ত্রদ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তবে দিল। দস্যুরাও কিন্তু সে মাংস খাইতে চাহিল না—দুষ্কর্ম্মটা তাহার এতই ভয়ানক!

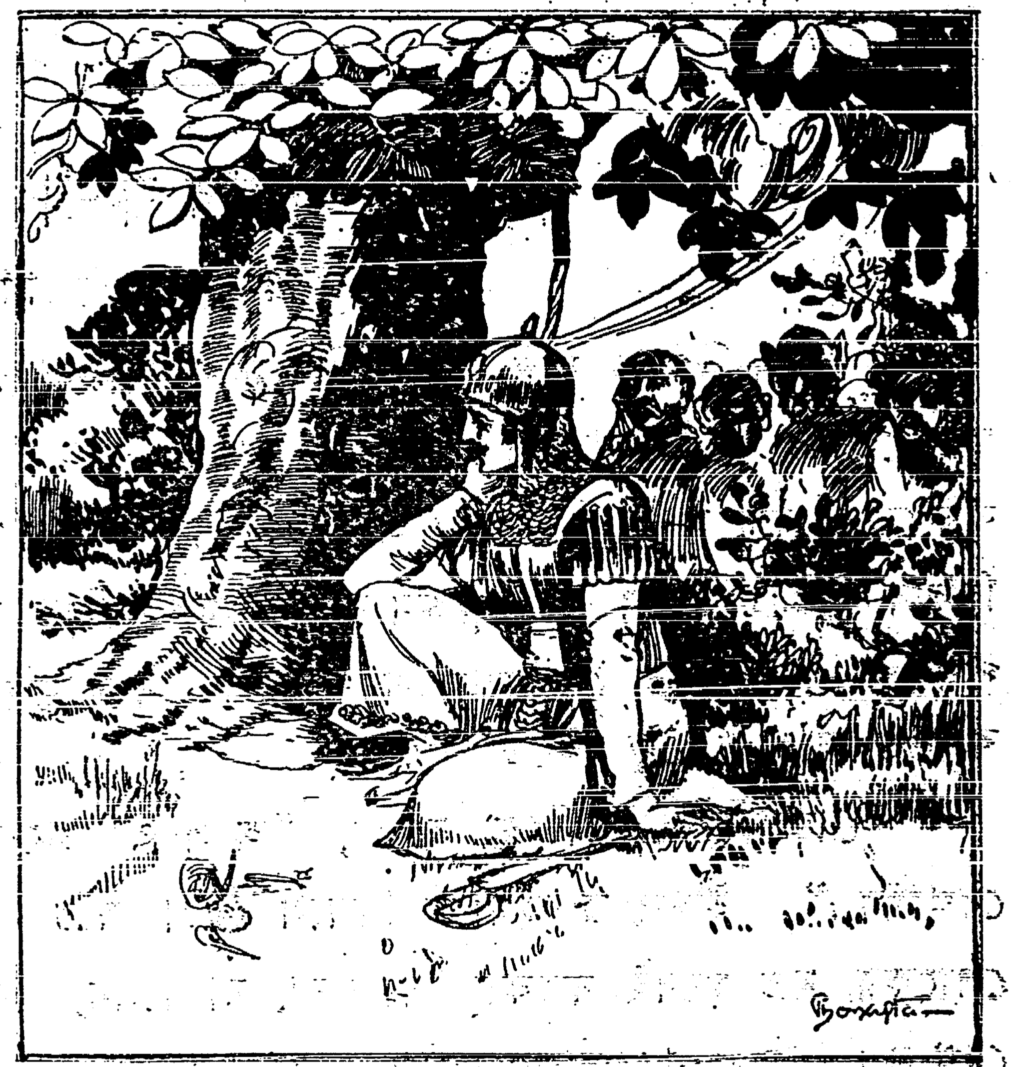

হাড় কয়েকখানি মাত্র পাইলেন

রাক্ষসরাজ তখন খুব ধূমধাম করিয়া রাজধর্ম্মের চিতা সাজাইয়া দিলেন। এই সময় রাজধর্ম্মের মাতা ঐ চিতার উপর আসিলে তাঁহার মুখ হইতে অমৃত বাহির হইয়া ঐ চিতার উপর পড়িল। অমৃত পড়াতে রাজধর্ম্ম আবার বাঁচিয়া উঠিল, চিতা হইতে মাথা তুলিয়া বিরূপাক্ষের নিকট আসিয়া হাজির হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তখন সেখানে আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে এই বক কোন সময়ে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হওয়ায় ব্রহ্মা ইহাকে শাপ দিয়াছেন, যে ইহাকে অনেক দিন এই বকের শরীরে থাকিতে হইবে, তাই এ আবার বাঁচিয়া উঠিল।

বক ইন্দ্রকে প্রণাম করিল। বকের কথায় ইন্দ্র অমৃত ছিটাইয়া গৌতমকেও আবার বাঁচাইয়া দিলেন। বক গৌতমের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিল, তাই তাহার তখনও এই দয়া! আর দেবতারাও বককে মারিয়া ফেলার জন্য গৌতমকে এই শাপ দিয়াছিলেন যে সে অনেক কাল বাঁচিয়া, অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়া, শেষে

নরকে যাইবে। বক বাঁচিয়া উঠায় দেবতাদের সেই শাপই ফলিল। তাহার পাপের ভার পূর্ণ করাই ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্য।

হীরার কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

তোমাদিগকে যদি কেহ গম্ভীর মুখে আসিয়া বলে, হীরাও যা, কয়লাও তাই, তবে তোমরা খুবই আশ্চর্য্য হইয়া যাও, না? এক মণ কয়লার দাম আর কত? বড় জোর দশ আনা কি বারো আনা,—আর একমণ হীরা? কয় কোটি টাকা তাহা হিসাব করিতে হইলে বড় একজন অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত আনিতে হইবে—আমি বাপু পারিব না। এত যে আকাশ পাতাল তফাৎ দুইটা জিনিষ, তাই নাকি আবার কখনও আসলে এক হইতে পারে?

বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলেন, "আলবৎ পারে; আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইব।" ইঁহাদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না, ইঁহারা তো আর সাধারণ লোকের মত মুখেই ফর্‌ফর্ করেন না, যা বলেন, হাতে নাতে সেটা প্রমাণ করিয়া দেখান। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন, কয়লাও আগাগোড়া যা দিয়া তৈরী, হীরাও তাই।

রাজা-রাজড়াদের পোষাকে, মুকুটে হীরা ঝলমল করে, তোমরা অবাক্ হইয়া তাহারি গল্প শোন। বড়ঘরের মেয়েদের গায়ে হীরা-বসান গহনা হইতে আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়ে, তোমরা অবাক্ হইয়া তাহা দেখ, কিন্তু কি করিয়া সে হীরা তৈরী হইয়াছিল তাহার কোনও খবর রাখ না।

সেকথা জানিতে হইলে তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে লক্ষ লক্ষ বৎসর আগের এক দিনে, মানুষ তখনও হয়ত জন্মায় নাই, কোন প্রাণীই হয়ত জন্মায় নাই; শুধু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গলে এই গোটা পৃথিবীটা ভরা ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেই সব গাছ মাটীর তলায় চাপা পড়িয়া গেল। হাজার হাজার বছর ধরিয়া

সেই গাছ মাটীর তলায় থাকিয়া উপরের দারুণ চাপ মুখ বুজিয়া সহ্য করিল। তারপর একদিন দেখা গেল, সে আর গাছ নাই, তাহার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। এখন সে কয়লা।

তার পরেও কত শত সহস্র বৎসর! পৃথিবীর ভিতরে, শত শত মাইল নীচে, যুগের পর যুগ ধরিয়া অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—তরল লোহা, আরও কত রকম ধাতু সেখানে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। আর তাহার উপর কোটি কোটি মণ পাহাড় দিবারাত্র চাপিয়া বসিয়া আছে। সেই ফুটন্ত আগুনের মধ্যে আমাদের কয়লাও মিশিয়া গেল,—কতদিন সে সেই অবস্থায় ছিল, কে জানে? পৃথিবীর উপর ততদিনে হয়ত কত প্রাণী জন্মাইয়া আবার চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া গিয়াছে।

তারপর একদিন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেই আগুনের ভিতর হইতে কতক অংশ ছিট্‌কাইয়া উপরে উঠিয়া আসিল—কয়লারও খানিকটা উঠিয়া আসিল। তারপর সেই কয়লা হাজার হাজার বছর ধরিয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল।

এইবার এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঠাণ্ডা হইলে দেখা গেল, সে আর সেই নোংরা কুৎসিৎ কয়লা নাই, লোকে আর তাহাকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ বাঁকাইবে না, আগুনের স্নান হইতে উঠিয়া সে হইয়া গিয়াছে মাণিকের সেরা—হীরা।

সেই ভাবেই বা যে কতদিন সে ছিল, কে জানে? মানুষ যখন তাহাকে মাটীর তলা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিল, তখন হইতেই তাহার আদর।

মানুষ হীরার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে অনেক দিন, পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই হীরার খনি আছে। আমাদের ভারতবর্ষেও নাম করা হীরার খনি আছে। কিন্তু আসল হীরার জায়গা যদি দেখিতে চাও, তবে তোমাকে যাইতে হইবে দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে কোটি কোটি টাকার হীরা বাহির হইতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরার খনি আবিষ্কারের গল্প ভারী মজার। একদিন একটি ছোট্ট ছেলে রাস্তায় খেলা করিতে করিতে একটি ছোট চক্‌চকে পাথর কুড়াইয়া পাইল। পাথরটা দেখিতে যেমন সুন্দর, তেম্নি অদ্ভুত। আর তাহার গা

হইতে কেমন যেন একটা আভা বাহির হইতেছিল। জিনিষটা যে কি, তাহা কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে নাই।

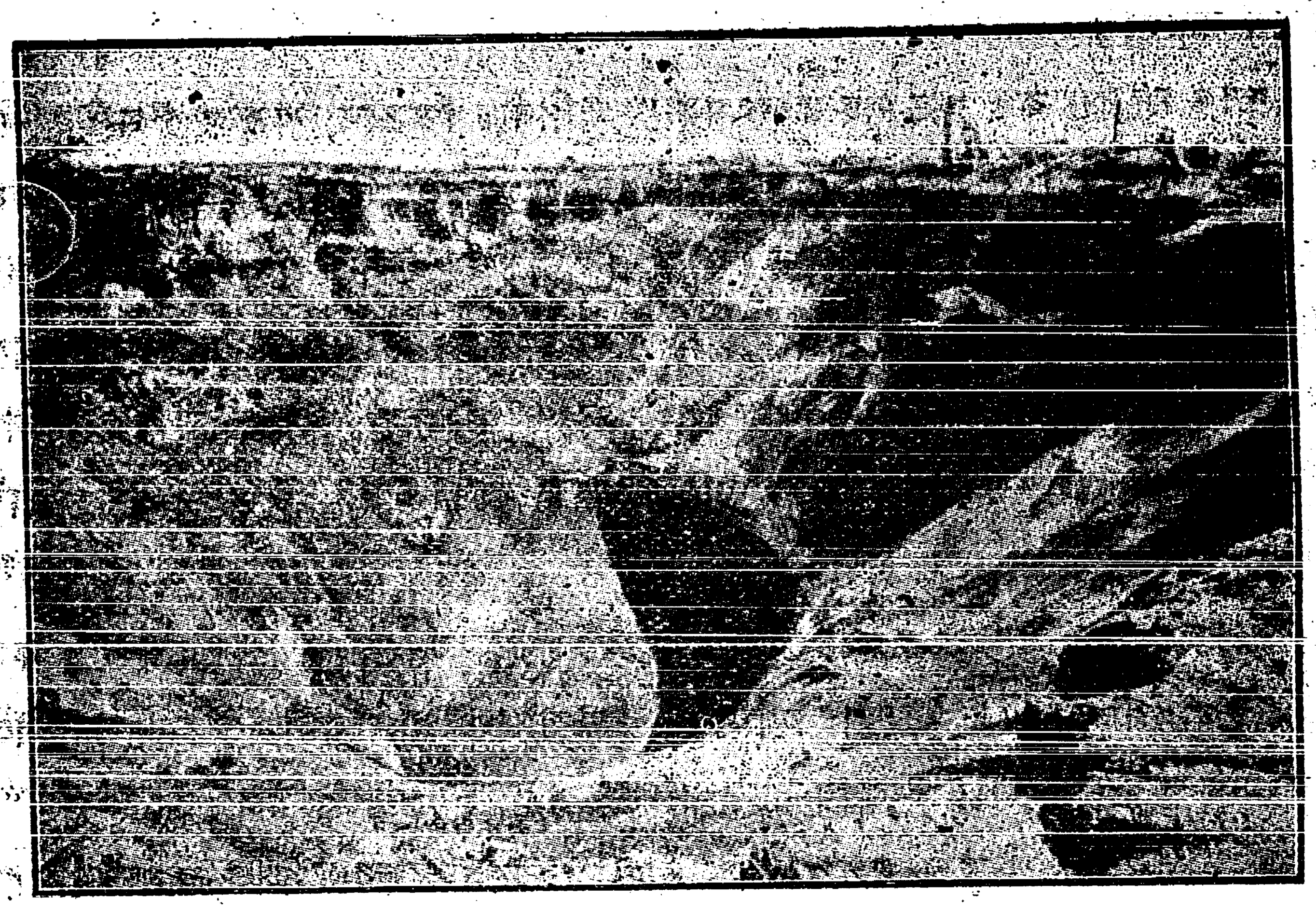

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জায়গা—এখানে অসংখ্য হীরা পাওয়া যায়।

ইহার কিছুদিন পরে কেমন করিয়া যেন এক ভদ্রলোক পাথর খানার কথা শুনিলেন। নতুন ধরণের একটা কিছু শুনিলেই লোকের কৌতুহল হয়, পাথরটা তিনি তাই দেখিতে চাহিলেন। সাধারণ একটা রাস্তায় পড়া নুড়ি, কেই বা আর তাহা কুড়াইয়া রাখিতে গিয়াছে! পাথর পাওয়া গেল না। কিন্তু কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল রাস্তার এককোণে কাচের মত কি একটা চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখা গেল, ইহাই সেই হারানো নুড়িটা। ভদ্রলোক আবার আসিলেন। নুড়িটা দেখিয়া তাঁহার কেমন সন্দেহ হইল; তিনি বলিলেন, "এটা আমি কিনিব।" ছেলেটির মা ত' হাসিয়াই আকুল! লোকটির মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি? রাস্তার একটা নুড়ি কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাই নাকি আবার কেহ কাহাকে বিক্রী করে! তিনি পাথরটা অমনি দিয়া দিলেন।

পাথর লইয়া ভদ্রলোক সটান ছুটিলেন এক জহুরীর কাছে। জহুরী পরীক্ষা করিয়া দেখে—এ যে আসল হীরা! তখন সেই খেলিবার পাথরটা জহুরী সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া লইল।

এ রকম একটা ব্যাপারে বেশ একটু হৈ চৈ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আশে পাশের সকলেই তখন নিজেদের জায়গা-জমি খুঁজিতে আরম্ভ করিল,—কি জানি যদি দৈবাৎ এক আধ টুক্‌রা মিলিয়া যায় তবে ত' রাজা! বাস্তবিক রাজা না হইলেও বড়লোক হইল অনেকেই। আশে পাশের বহু জায়গায় অসংখ্য হীরার টুক্‌রা বাহির হইতে লাগিল। এক ভদ্রলোক মাটী দিয়া দেয়াল তুলিতে গিয়া দেখিলেন, মাটীর মধ্যে হীরার টুক্‌রা। তখন খোঁড় মাটী। আর তার ফলে কিছুদিন পরে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ হীরার খনি আবিষ্কার হইয়া গেল।

হীরার খনি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ও রকম দেখিবার জিনিষ নাকি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। মাটীর তলায় দেড় হাজার, দু হাজার ফিট্ নীচে সে এক আশ্চর্য্য দেশ। অসংখ্য বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে, চারিদিকে রেল, ট্রলি, হাজার হাজার মজুর, রাতদিন হীরার খোঁজে খাটিতেছে। রূপকথায় সেই যে পাতালপুরীর ভিতর সাত রাজার ধন মাণিকের গল্প পড়িয়াছ না, ঠিক যেন তাই।

এক টুক্‌রা হীরাও যাহাতে চুরি না যাইতে পারে, তাহার জন্যই বা কত সতর্কতা! কাফ্রী মজুরেরা একবার খনির ভিতরে ঢুকিলে তিনমাস আর বাহিরে আসিতে পারে না। যখন বাহিরে আসে তখন নানারকম ওষুধ বিষুধ দিয়া পরীক্ষা করা হয়, শরীরে কোথাও হীরা লুকান আছে কিনা। মজুরেরাও সুবিধা পাইলে ছাড়িতে চায় না। একবার একজন পায়ের মধ্যে ছুরী দিয়া গভীর একটা গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে নয় খানা হীরা ভরিয়া পালাইয়া আসিয়াছিল। বেচারা কিন্তু শেষ কালটায় ধরা পড়িয়া গেল।

হীরার গুণের কথা তোমরা অনেকেই হয়ত জান। হীরার মত শক্ত জিনিষ

আর নাই ; কাচ কাটিতে, পাথর কাটিতে, হীরা অদ্বিতীয়। কিন্তু হীরার আসল খাতির রত্ন হিসাবে। তেমন তেমন এক একখানা হীরার ইতিহাস অনেক বড় বড় রাজাদের ইতিহাসের চেয়েও জম্‌কালো। "রিজেণ্ট" বলিয়া একখানা হীরা আছে। সে কতগুলি হাত ঘুরিয়াছে শুনিবে ? এই হীরাখানা প্রথম পাইয়াছিল আমাদের দেশেরই এক ক্রীতদাস। একদিন দুপুর রাত্রে সে হীরা লইয়া মাদ্রাজে পালাইয়া আসিল। এক ইংরাজ নাবিক কেমন করিয়া যেন হীরাখানার কথা জানিতে পারে। সাহেব লোকটাকে ভুলাইয়া তাহার জাহাজে তুলিয়া লইল, তারপর সমুদ্রের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিল। তারপর সে ১৫০০০ টাকায় হীরাখানা বিক্রী করিল এক ইংরাজ সওদাগরের কাছে। সওদাগর দশগুণ দামে মাদ্রাজের লাট সাহেবের কাছে তাহা বিক্রী করিল। লাটসাহেব হীরা কিনিলেন, কিন্তু চোরের ভয়ে তাঁহার নাকি রাত্রে ঘুম হইত না। কাজেই হীরা চলিয়া গেল একেবারে ফ্রান্সের রাজার কাছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় সেখানা গেল চুরি ; তারপর কিছুদিন পরে হীরাখানা পাওয়া গেল, একটা খাদের মধ্যে। এম্নিভাবে প্রায় সব বিখ্যাত হীরাই সাতঘাটের জল খাইয়া ফিরিয়াছে। কোহিনূরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এক সময় এই কোহিনূর ছিল দিল্লীর বাদশাদের মুকুটে। তারপর শিখ রাজা রণজিৎ সিংহ ইহা অধিকার করেন। এখন ইহা আছে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মুকুটে।

'হোপ্' বলিয়া আর একখানা হীরা আছে। এখানা সাধারণ হীরার মত সাদা নয়, নীল রংএর। এই হীরার সম্বন্ধে একটা গুজব আছে যে, যে ইহা লইবে তাহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। আর আশ্চর্য্য, এই গুজবটা প্রায়ই ফলিয়া গিয়াছে। যাহারা এই হীরার মালিক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজনকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। দু'জনের মৃত্যু হয় দারুণ কষ্টের ভিতর, আর একজন জীবিত অবস্থায়ই নানারকম দুর্নাম সহ্য করেন। পৃথিবীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত হীরা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে বড় হীরার নাম "কুল্লিকান্।" সম্প্রতি এটাকে কাটিয়া কয়েক টুক্‌রা করা হইয়াছে।

হীরাকে নকল ভাবে তৈরী করিবার চেষ্টা করিতেও বৈজ্ঞানিকেরা ছাড়েন নাই। কয়লা আর হীরা যখন এক, তখন কয়লাকে হীরা করা যাইবে না কেন ? তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, মসিয়ান্ নামে এক বৈজ্ঞানিক কয়লাকে সত্য সত্যই হীরা বানাইয়াছেন। কেমন করিয়া জান ? বিদ্যুতের চুল্লীর দারুণ উত্তাপের মধ্যে তিনি কয়লাকে গলাইয়া তরল লোহার মধ্যে মিশাইয়াছেন। তারপর তাহাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করিয়া দেখিয়াছেন, কতক কয়লা বদলাইয়া ছোট্ট ছোট্ট হীরা হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বড় হীরা একখানাও পাওয়া যায় নাই। ফলে, হীরার দামের চেয়ে তৈরী করিবার খরচই পড়িয়াছে বেশী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পিছ-পা নহেন। কে জানে হয়তো কিছুদিন পরেই বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রাগারে কয়লা হইতে বড় বড় হীরার টুক্‌রা তৈরী হইবে। তখন পথে ঘাটে হীরা ছড়াছড়ি যাইবে, আর হীরার তেমন দামও থাকিবে না।

পদ্মরাগ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৩

সূচনা

রাজবাড়ীর ফটক পার হইলেই, মখ্‌মলের মত সবুজ ঘাসে ঢাকা খানিকটা জমি, তাহাতে নানা রকমের বাহারী-ফুলের গাছ, লতা-মণ্ডপ, মাঝে মাঝে মাটীতে আঁটা বেঞ্চি—এক কথায় হাল্‌ফ্যাসানের যতকিছু জিনিষ থাকিতে হয়, তার কোনটারই অভাব নাই। একটা লাল সুর্‌কির রাস্তা ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজবাড়ীর সিঁড়ি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বাগানেরই একখানা বেঞ্চির উপর বেশ নাদুস্-নুদুস্ চেহারার একজন যুবক মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া বসিয়াছিল। রাজাবাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সে, নাম দিবেন্দ্রনাথ—আমাদের

রণজিতেরই ছোট বেলার বন্ধু। রাজবাড়ীর মোটর গাড়ীখানা রণজিৎকে লইয়া ফটকের ভিতর ঢুকিতেই দিবেন্দ্র উঠিয়া রণজিতের দিকে আগাইয়া আসিল। রণজিৎ বেশ দেখিল, দিবেন্দ্রের হাসি-হাসি মুখখানা আজ কেমন যেন একটু মেঘে ঢাকা। কথাও হইল দুই বন্ধুতে মাত্র দুই একটী। দিবেন্দ্র বলিল, "জ্যাঠামশাই সকাল থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন, ওপোরে চল।"

রণজিৎ উত্তর দিল "চল।"

দোতালায় একটা বড় ঘরে রাজা শশাঙ্কশেখর একখানা সোফার উপর কাৎ হইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। একেই তো শরীরটা তাঁর রোগা, এই দুর্ঘটনায় তিনি যেন আর নাই বলিয়াই রণজিতের মনে হইতে লাগিল। পায়ে-হাঁটার শব্দ হইতেই চোখ মেলিয়া রাজাবাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও, রণজিৎ? এসো বাবা, এসো।"

রণজিৎ রাজাবাহাদুরের পায়ের ধূলা লইয়া কাছেই একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—দিবেন্দ্র ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মিনিট্‌খানেক তো রাজাবাহাদুর চোখ বুজিয়াই পড়িয়া রহিলেন। তারপর, ধীরে ধীরে, ক্লান্তস্বরে বলিলেন "রণজিৎ, খুব একটা গুরুতর, দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য আজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আশাকরি তুমি আমায় নিরাশ করবে না।"

রণজিৎ যেন আর থাকিতে পারিতেছিল না। ভাবে ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে, ইঁহারা সকলেই একটা মস্ত বড় বিপদের আভাস দিতেছেন, কিন্তু কই, কি হইয়াছে তাহাতো দেখি ভাঙ্গিতেছেন না! ধৈর্য্য যে আর রাখা যায় না! কি হইয়াছে ছাই বলিয়া ফেলিলেই তো হয়! মুখে বলিল "কি, বলুন!"

আবার একটু থামিয়া রাজাবাহাদুর বলিলেন, "বলছি শোন। দেখ, আমাদের এই রায় বংশটাকে সববাই সমশেরপুরের জমীদার বংশ বলে থাকে, তাতো তোমরা জানোই! আচ্ছা, বলতো কতদিন থেকে আমরা এখানে জমীদারি করছি?"

"আজ্ঞে, তাতো জানিনে?"

"জানোনা? প্রায় দুশো বছর থেকে। রাজা সীতারাম রায়ের নাম,

নিশ্চয়ই শুনেছ?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বঙ্কিমবাবু যে সীতারামের কথা লিখে গেছেন তাঁর কথাই বল্‌ছি—সেই সীতারাম রায়ের আমল থেকে আমরা এই সমসেরপুরের জমীদার। তুমি হয়তো শুনে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ রায়ের এমনও একদিন ছিল যখন সব সময়ে দুবেলা হয়তো ভাতও তাঁর জুটতো না। শুনেছি, মনের দুঃখে তাই একদিন নাকি তিনি আত্মঘাতী হ'তে গিয়েছিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় তাঁর ওপরে একজন সাধুপুরুষের কৃপা হোলো। ভবানন্দ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তার সামনেই একটা বড় মত উইটিপি ছিল, সাধু তাঁকে সেটা খুঁড়ে ফেল্‌তে বল্‌লেন। খুঁড়তেই তার ভেতর থেকে বেরোল এক অপূর্ব্ব. আশ্চর্য্য জিনিষ। সেদিন থেকেই ভবানন্দের দিন ফিরে গেল।"

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করিল "কি সে জিনিষটা?"

"একখানা পদ্মরাগ মণি। সে যে কি অপূর্ব্ব মণি, কি যে তার আশ্চর্য্য ছটা, সে তুমি চোখে না দেখ্‌লে বুঝ্‌তেই মোটে পারবেনা, কাজেই তা আমি তোমাকে বোঝাবার চেষ্টাও করবো না। যাক, যা বল্‌ছিলাম—সেদিন থেকেই ভবানন্দ রায়ের বরাত ফিরে গেল। সীতারাম রায় সেদিন বেরিয়েছিলেন শিকারে, হঠাৎ পড়ে গেলেন এক বাঘের মুখে—একেবারে একা। বাঁচার আর কিছুমাত্র আশা নেই, কিন্তু দৈবের ব্যাপার—ভবানন্দ ঠিক সেই সময় আস্‌ছিলেন সেই বনের পথ ধরে ধরে। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সম্বল তো শুধু হাতের বাঁশের লাঠিখানা, কিন্তু তা হলে কি হবে, ষণ্ডা ছিলেন খুব! পেছন থেকে এক ঘা দিতেই বাঘতো একেবারে ছিট্‌কে গিয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়্‌লো! এর মধ্যে সীতারামও নিজেকে সাম্‌লে নিলেন। বাঘ মারা পড়লো। সেই যে ভবানন্দ রাজা সীতারাম রায়ের সুনজরে পড়ে গেলেন তারপর থেকেই তাঁর অদৃষ্ট গেল একেবারে ফিরে। ভবানন্দের কিন্তু সারা জীবন বিশ্বাস ছিল যে পদ্মরাগ খানাই তাঁর জীবনের সমস্ত উন্নতির মুল। সাধু নাকি তাঁকে বলেছিলেন, "যদি খুব খারাপ অবস্থাতেও পড়—তা'হলেও এ পদ্মরাগ হাতছাড়া করবে না কিন্তু।"

কথার মাঝখানে রাজাবাহাদুর হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন। একটুখানি দম

লইয়া আবার বলিতে সুরু করিলেন, "সেই থেকে সম্‌সেরপুরের জমীদারেরা নিজেদের প্রাণের চাইতেও বেশী যত্নে এই পদ্মরাগখানাকে রক্ষা করে আসছেন। একথা যে আর কেউ জানেনা এমনও নয়। তুমি ছেলেমানুষ তাই এ সবের কোন খবর রাখ না, কিন্তু যাঁরা বুড়ো হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ সব খবরই রাখেন। আমার বাবা মারা যাবার আগে আমার হাতে এই পদ্মরাগ সঁপে দিয়ে ব'লে গিয়েছিলেন, "দেখো, এ যেন কখনো হাতছাড়া না হয়। কিন্তু···" রাজাবাহাদুরের স্বর কাঁপিতে লাগিল—"কিন্তু—হতভাগ্য আমি—আমি বংশের সেই অপূর্ব্ব রত্ন খুইয়ে বসে আছি···"—মনের আবেগে একেবারে তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

একেবারে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন

আর রণজিৎ? সে তো একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছে! কথা বলিবার জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কি জানি কেন, কথা তার কোনমতেই গলার

এদিকে আর বাহির হইতেই চাহিল না। ফলে একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা গোটা ঘরখানাকে যেন জুড়িয়া রহিল।

রাজাবাহাদুরই আবার কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার এ কটা কথা শুনেই যখন এতটা আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, তখন কি অদ্ভুত উপায়ে যে পদ্মরাগমণি চুরি হয়েছে, তা' শুনলে বোধ হয় আরও ঢের বেশী আশ্চর্য্য হবে। আশ্চর্য্য রকমের চুরি! এবিষয়ে যতই ভাবছি, ব্যাপারটা যেন ততই ঘোলাটে হ'য়ে উঠ্‌ছে। হুকাকাশিকে সেদিনই কল্‌কাতায় খবর পাঠিয়েছিলাম, কাল দুপুরে সেও এসে পৌঁচেছে—"

"কাকে খবর পাঠিয়েছিলেন বল্লেন?"

"হুকাকাশিকে। কেন, হুকাকাশির নাম শোনোনি নাকি? সে যে একজন মস্ত বড় ডিটেক্‌টিভ্—বাড়ী জাপানে। তার সাথে আলাপ আমার প্রায় বছর দশেক আগে। বিশেষ একটা জটিল ব্যাপারে সে সময় তার সাহায্য নিয়েছিলাম। লোকটার বাস্তবিকই অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। দেখা যাক্ সে যদি এই ভুতুড়ে ব্যাপারের কোন একটা কিনারা করতে পারে। একজন খুব সাহসী, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ যুবকের সাহায্য সে চায়। রণজিৎ, আশা করি, তুমি সে সাহায্য করতে পিছ-পা হবে না!"

রাজাবাহাদুরের শেষ কথা কয়টা শুনিয়া রণজিৎ একেবারে চুপ্ হইয়া গেল, হাঁ-না কোন কথাই চট্ করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। প্রথমতঃ রাজাবাহাদুরের কথার ভাবে যতটা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে পদ্মরাগকে সরান হইয়াছে খুবই আশ্চর্য্য কৌশলে। কাজেই চোর—সে যেই হউক না কেন,—যে একজন অতি পাকা ধড়িবাজ, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। তারপর মণিখানা যে রকম দামী, তাহাতে চোর সেটা যাহাতে নিজের দখলে রাখিতে পারে, সে জন্য যে তাহার সবখানি বুদ্ধিই খরচ করিয়া ফেলিবে, সেও নিশ্চিত। তার একটা দলবল থাকিবারও খুবই সম্ভাবনা। রণজিৎ সেই দলের বিরুদ্ধে নামিলে, তাহাদের বিশেষ খুসী হইবারও কথা নয়। নানারকমে রণজিতের ক্ষতি করিবার

চেষ্টা করিবে, এমন কি মারিয়া ফেলার চেষ্টাও আশ্চর্য্য নয়। কাজেই রাজা-বাহাদুরের কথায় রণজিৎ চট্ করিয়া একটা উত্তর দিয়া ফেলিতে পারিল না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রাজাবাহাদুর যেন একেবারে দমিয়া গেলেন; নিতান্ত কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "পারবে না রণজিৎ? কিন্তু নির্ভর করবার মত আমার যে আর কেউই নেই! দিবেন? ও নিতান্ত সোজা মানুষ, একেবারে হাবাগবা। আর দীপেন? তার কাজ করবার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু সে বড় খাম্‌খেয়ালী। তবু তাকেই যা হোক্ কতগুলো খোঁজ খবর নিতে কাল্‌কে কল্‌কাতায় পাঠিয়েছি। খোঁজ খবর করা চুলোয় দিয়ে এখন সে কেবল বায়স্কোপ দেখা স্থুরু না করে, তা' হলেই বাঁচি। মৎলবী মানুষ, কখন কি খেয়াল চাপে, তার তো কিছুই জানা নেই। কাজেই তার ওপোরেও আমি ঠিক নির্ভর কর্‌তে পারিনে। আমার নিজের বুড়ো বয়েস, তাতে আবার এই রোগা শরীর। তুমি ছাড়া নির্ভর করার মত আমার আর কে আছে বল? পারবে না রণজিৎ? হুকাকাশিকে সাহায্য কর্‌তে পারবে না?"

এটা আমি বরাবরই দেখি, যে হৃদয়টা যাদের বীরের তারা কখনও লোকের কাতরকণ্ঠ শুনিয়া ঠিক থাকিতে পারে না। রণজিৎও রাজাবাহাদুরের কাতর কথায় আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, "পারবো, নিশ্চয়ই পারবো।"

রাজাবাহাদুরের রোগা মুখখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বাঃ, এই তো পুরুষের মত কথা, রণজিৎ! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি জয়ী হবে, সুখী হবে।"

ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে কাহাদের যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল, কাজেই দুইজনেই খুব চম্‌কাইয়া উঠিলেন। পরের মুহূর্ত্তেই দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিল দিবেন্দ্র, সঙ্গে তার আর একজন ভদ্রলোক। আগন্তুক ভদ্রলোকটী বেশ 'বাবু' গোছের—পরণের ধূতি-চাদর খুব ফিট্‌ফাট্—খাসা চোস্ত ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে রণজিতের দিকে তাকাইলেন, তারপর চোখ ফিরাইয়া লইয়া তাকাইলেন রাজাবাহাদুরের দিকে, এবং সবার শেষে একখানা

চেয়ার টানিয়া লইয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। দিবেন্দ্র ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

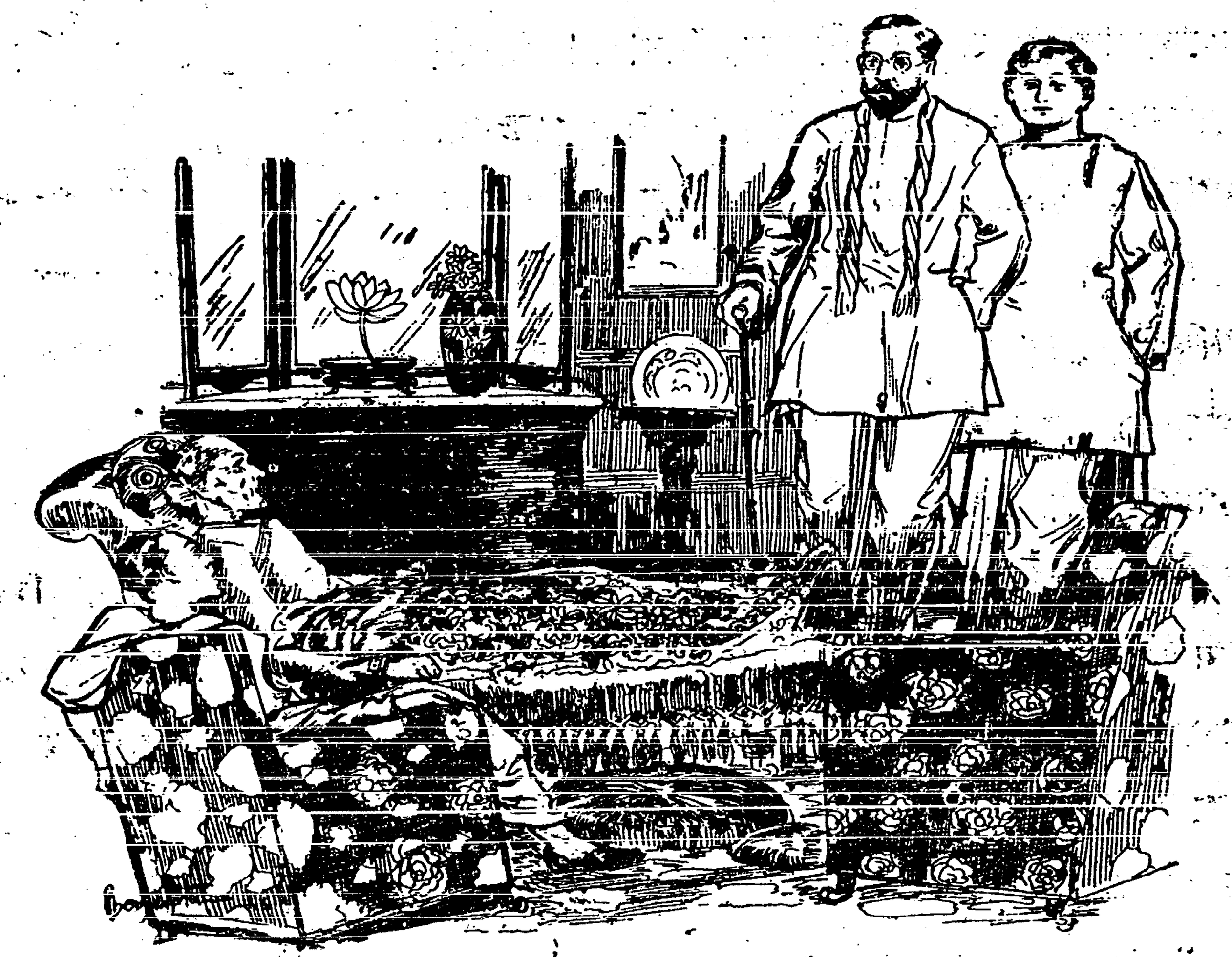

ঘরে ঢুকিল দিবেন্দ্র, সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক

চকিত ভাবটা কাটিয়া যাওয়ার পর রাজাবাহাদুর বলিলেন, "রণজিৎ, ইনি পদ্মরাগের ব্যাপার—তার গোড়ার ইতিহাস থেকে স্থুরু করে চুরি যাওয়া পর্য্যন্ত—সব খবরই রাখেন। এঁর কাছে তোমার কিছু গোপন করবার দরকার নেই। আমাকে যে কথা বল্‌তে পার, তা এঁকেও অনায়াসে জানাতে পার।"

রণজিৎ উত্তর দিল, "আচ্ছা। হ্যাঁ, দেখুন, হুকাকাশিকে অবশ্য আমি আমার যতদূর ক্ষমতা সাহায্য করবোই, কিন্তু তবুও একটা কথা আমার বারে বারেই কেবল মনে হচ্ছে। যে কাজে আমরা হাত দিতে যাচ্ছি, তাতে কৃতকার্য্য হ'তে হোলে আমাদের সর্ব্বদাই নিজেদেরকে গোপন করে চল্‌তে হবে। হুকাকাশি জাপানী লোক, সে কি ঠিক পারবে এই বাঙ্গালীর রাজ্যে নিজেকে গোপন করে চলতে?"

বলিয়া সে যেন আগন্তুক ভদ্রলোকটী কি বলেন তাই জানিতে চায় এম্নি ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইল।

ভদ্রলোকটী জবাব দিলেন, "কথাটা ঠিকই বটে, কিন্তু হুকাকাশি শুনেছি নাকি ভারী অদ্ভুত রকম নিজের চেহারা বদ্‌লাতে পারে।"

রণজিৎ বলিল, "তা যতই ছদ্মবেশ পরুক না কেন সে, হাজার হোলেও সে তো চ্যাং ব্যাংএরই জাতভাই। অমন থাসা চ্যাপ্টা নাকটা, থ্যাব্‌ড়া মুখখানা আর মিট্‌মিটে চোখ তুটো—এ সে লুকোবে কোথায়? আমি তো হাজার লোকের ভেতর থেকেও তাকে ঠিক চিনে বের করতে পারি।

এমন সময় ভদ্রলোকটী হঠাৎ যেন কেন উঠিয়া দরজার দিকে আগাইয়া গেলেন। তরপর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার উপর পিঠ ঠেসাম দিয়া দাঁড়াইলেন। শেষে চশমা খুলিয়া লইয়া, মানুষে যেমন ঘাম মোছে ঠিক তেম্নি ভাবে মুখখানা একটু ঘষিলেন। এক মুহূর্ত্তে দাড়ি ও গোঁফ মাটীতে পড়িয়া গেল, এবং রণজিৎ অবাক্ হইয়া দেখিল দিব্যি একজন মোটাসোটা জাপানী ভদ্রলোক তাহার দিকে তাকাইয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া পরিষ্কার বাংলায় বলিতেছে, "ঠকে গেলেন, রণজিৎ বাবু, ঠকে গেলেন। চ্যাপ্টা নাক, থ্যাবড়া মুখ আর মিট্‌মিটে চোখ ধরতেই পারলেন না।"

লজ্জায় রণজিতের মাথা মাটীতে নুইয়া পড়িল। মাটীর সাথে মিশিয়া যাইতে পারিলে বোধ হয় সে আরও আরাম পাইত। বহু কষ্টে কোন মতে সে বলিল "মাপ্ করবেন, মিষ্টার হুকাকাশি। আমি সত্যি বলছি, আপনার জাতকে অসম্মান করবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না।"

হুকাকাশি হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! ও যেতে দিন, এ খালি আমি আমার ছদ্মবেশটা পরীক্ষা করে নিলাম মাত্র। এখন আসুন, পদ্মরাগ চুরির আশ্চর্য্য ব্যাপার শুন্‌বেন। রাজাবাহাদুরের চাকর তো হলফ্ করেই বল্‌ছে যে স্বচক্ষে সে ভূতকে পদ্মরাগ নিয়ে যেতে দেখেছে। ঘটনাটা বলছি, শুনুন।

(ক্রমশঃ)

জলের দোল

(শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়)

কল্ কল্ কল্ আস্‌ল জল,—
খালের কোলে নাম্‌ল ঢল!
—চল্‌রে চল!

চল্‌রে চল! ছুট্‌ছে জল,
জুট্‌ছে সব ছেলের দল;—
দৌড়ে যায়, আস্তে ভাই,
জলের গান শুনতে পাই!
অই আসে — অই আসে!
খাল, নালা, বিল ভাসে!
অই লাগে ঘুরণ পাক;
নলবনে কিসের ডাক!
উড়ছে কাক, উড়ছে চিল;—
ভর্‌ল খাল, — ভর্‌ল বিল!

খল্, খল্ খল্ হাস্‌ছে জল,—
খালের কোলে নাম্‌ছে ঢল!
—চল্‌রে চল!

চল্‌রে চল! ভর্‌ল খাল!
বন্‌বাদার ভাসল আল,
ধান ক্ষেতে লাগল দোল;—
একদিনে কী হিন্দোল!
ভর্‌ল মাঠ, ভর্‌ল ঘাট—
ডুবল ধান, ডুবল পাট!

হিজ্জল্ গাছ ঠায় অবাক ;
শাখায় তার ডাকছে কাক !
খাগ্ড়া বন অবাক থ ;—
কোরাল গায়, ক্ক, কঃ অঃ ;

কল্ কল্ কল্ ছুটল জল,—
খালের কোলে নাম্ল ঢল !
—চল্রে চল !

চল্রে চল ! মস্ত সাপ !
অই ভাসে, বাপ্রে বাপ !
মিশ্ কালো, মাম্দো জোঁক ;
অযুত সব অচিন্ পোক।
পানার দল ঘুরছে অই—
কয় সবাই, কুমীর কই ?
মাছরাঙ্গা উড়ছে ঠায়,—
বক বুড়ো নিদ্রা যায়!
কাঁক্ড়া ঘাস আঁক্ড়ে তাই—
চিংড়িমাছ খাচ্ছে ভাই !

খল্ খল্ খল্ হাস্ছে জল ;—
খালের কোলে নাম্ছে ঢল !
—চল্রে চল !

চল্রে চল ! ডাক্ছে জল ;—
পুব্পাড়ার দস্যিদল !
পাঠ্শালে, আজকে ভাই,
সত্যি বল, কেমনে যাই ?

ভাঙ্গা অই বাড়ীর ধার ;
বাব্লা বন, বন বাদার ;—
তার মাঝে কোণ ঠাসা—
বন-বিড়াল, বাগ্ডাশা।
দেখ্তে চাস ?— দৌড়ে আয় !
মাঠ ছেড়ে, ঢুক্ল গাঁয় !

কল্ কল্ কল্ ছুট্ল জল !
খাল্ বিলে সব নাম্ল ঢল !
মাঠ, ঘাট জলের তল।

সেকালকার মস্ত বীর

সেকালকার অনেক বীরের কথা তোমরা শুনিয়াছ। পুরাণে ও কাব্যে যাহা পাওয়া যায় তাহার কতকটা খাঁটি, কতকটা মন-গড়া কথা। খাঁটি ইতিহাস গ্রীস্, রোম প্রভৃতি জায়গায়ই আগে দেখা দিয়াছিল আর যে সকল বীরের কথা সাবেক-কালের খাঁটি ইতিহাসে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন আলেক্-জান্দার। শুধু সাবেককালে কেন, সমস্ত বিষয় ধরিয়া বিবেচনা করিলে অনেকের মতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও এমন বীর আর পাওয়া যায় না। তখন বন্দুক ছিল না, কামান ছিল না, উড়োজাহাজ ছিল না, রেলগাড়ী ছিল না, টেলিগ্রাফ্ ছিল না, তবু এই বীরটী পাহাড়, জঙ্গল, নদী লঙ্ঘন করিয়া গ্রীস হইতে দেশ জয় করিতে করিতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া কি কাণ্ডটাই না করিয়াছিলেন! মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মোটে ৩২ বৎসর। আর কিছুদিন বাঁচিলে পৃথিবীর দেশগুলাকে আরও ওলট্পালট্ করিয়া দিয়া যাইতেন।

যে অবস্থায় তিনি এত কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন সে অবস্থায় কেবল বীরত্বে বড় হইলে এতটা করা চলিত না। এমন সব গুণ আবশ্যক ছিল যাহাতে

লোকে ভয় করে ভক্তি করে, অথচ ভালবাসে। গ্রীসের উত্তরদিকে মাসিদোনিয়া নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। আলেকজান্দার ছিলেন এই রাজ্যের রাজা ফিলিপের পুত্র। কতই আর সৈন্যসামন্ত ছিল? সব জোটাইয়া লইয়া আলেকজান্দারকে দিগ্বিজয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার গুণের যে সকল কথা প্রচলিত আছে তাহার গোটাকয়েক এখানে দেওয়া গেল।

আলেক্‌জান্দার

বাল্যে মতিগতি

তাঁহার ছেলেবেলা একবার পারস্য হইতে কয়েকটী দূত আসিল; ফিলিপ তখন রাজধানীতে নাই। আলেক্‌জান্দারই তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিলেন। পাঠক, হয়ত মনে করিবে, পারস্যের ছেলেরা কি রকম খেলাধূলা করে তিনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মোটেই না। যাহাতে গায়ের জোর বাড়ে এমন খেলাধূলা যে তিনি পছন্দ করিতেন না তাহা নয় কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন অন্য কথা—কোন্ জায়গা হইতে কোন্ জায়গা কতদূর, রাস্তাগুলি কেমন, রাজা কেমন, রাজা শত্রুদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন, পারস্যদেশ কিসে শক্তিশালী, ইত্যাদি। দূতদের চমক লাগিয়া গেল! তাহারা ভাবিতে লাগিল, ফিলিপ্ যে এত চালাক তিনি ত' এ ছেলের কাছে কিছুই নন। ফিলিপ্‌ও যে-সে লোক ছিলেন না—তিনিও ছিলেন ছোটখাটো এক দিগ্বিজয়ী। যখনই খবর আসিত ফিলিপ্ অমুক নগর জয় করিয়াছেন, কি অমুক যুদ্ধ জিতিয়াছেন, তখনই আলেক্‌জান্দার তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতেন,—"বাবাইত সব জয় করিয়া ফেলিলেন, তুমি আমি তবে কি করিব?"

তিনি ভাবিতেন প্রথমেই বড় রাজ্যের রাজা হইয়া বসিলে গৌরব বাড়িবে কেমনে! ধনদৌলত, বিলাস, আরাম এ সকলের জন্য তিনি মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। যুদ্ধ, মারামারি, লোকের নিকট গৌরব এই সকলেরই স্বপ্ন দেখিতেন।

বাল্যে সাহস

থেসালী প্রদেশের একটা লোক রাজবাড়ীতে বুকিফালা নামে একটা ঘোড়া বিক্রয় করিতে আনিল। ঘোড়াটার দাম ছিল কত জান? আমাদের একালকার টাকার প্রায় ৪০০০০। রাজা আলেক্‌জান্দারকে ও আরও আরও লোককে সঙ্গে লইয়া মাঠে ঘোড়া দেখিতে গেলেন। সে কি যে সে ঘোড়া? দেখিয়াই মনে হইত ঘোড়া ত নয়, যেন বাঘ; কি দুরন্ত আর পাজী! তাহার উপর চড়া ত দূরের কথা, কাহার সাধ্য কাছে গিয়া কথা কয়? কোন সহিস আসিলেই তাহাকে তাড়া করে। ফিলিপ্ ঘোড়ার দুষ্টামি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"নিয়া যাও উহাকে এখান হইতে।" আলেক্‌জান্দার বেশ করিয়া ঘোড়াটাকে দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—"একটু কৌশল, একটু চালাবার ফিকির না জানায় কি চমৎকার ঘোড়াটাই হাতছাড়া হইতেছে।" ফিলিপ্ প্রথমে কথাটায় কাণ দিলেন না কিন্তু, আলেক্‌জান্দার বার বার ঐ কথা বলায় এবং একটু ব্যস্ত হইয়া পড়ায়, বলিয়া উঠিলেন—"ছোকরা, তুমি বড়দের দোষ ধর আর মনে কর তাদের চেয়ে বেশী বোঝ আর ঘোড়াটা বেশ চালাইতে পারিবে!" আলেক্‌জান্দার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই পারিব।"

"আর যদি এ ঘোড়ায় চড়িতে না পার, তবে এই গোঁয়ারতামির জন্য কি দিবে?"

"ঘোড়ার দাম দিব।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজা ও কুমারের মধ্যে দেনাপাওনার কথা ঠিক হইয়া গেলে আলেক্‌জান্দার দৌড়িয়া ঘোড়ার কাছে গেলেন এবং লাগাম ধরিয়া তাহাকে সূর্য্যের দিকে ফিরাইলেন—কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন যে সামনে যে

ছায়া পড়িয়াছিল এবং ঘোড়াটা নড়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়িতেছিল তাহাতেই ঘোড়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সূর্য্যের দিকে ফিরাইবার পর ঘোড়াটা যতক্ষণ দুরন্তপনা করিল ততক্ষণ তিনি বেশ নরমভাবে তাহার কাছে কথা কহিতে লাগিলেন এবং আস্তে আস্তে তাহার গায়ে আদর করিয়া চাপড় মারিতে লাগিলেন। তাহার পর নিজের কাপড় ঠিক করিয়া লইয়া চট্ করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িলেন এবং এমন করিয়া চাপিয়া বসিলেন যে পড়িয়া যাইতে না হয়। তারপর লাগামও শক্ত করিয়া টানিলেন না, চাবুকও ব্যবহার করিলেন না, ঘোড়ার পাশে ঘাও মারিলেন না কিন্তু ঘোড়াকে ছুটিতে দিলেন। যখন দেখিলেন ঘোড়ার আর দুরন্তপনা নাই, সে এখন চায় কেবল দৌড়াইতে, তখন আর তাঁহাকে পায় কে? পূরাদমে ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন, কথার চোটে ও পাশের ঘায়ে ঘোড়াকে বুঝাইয়া দিলেন—হাঁ, একজন সওয়ার বটে!

ফিলিপ্ ও রাজবাড়ীর লোক প্রথম প্রথম কিছু ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছিলেন—পড়িবারই কথা। কাহারও মুখে কথা নাই। যখন আলেক্‌জান্দারকে পিঠে করিয়া ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইল, তখন জয়ধ্বনি উঠিল। ফিলিপ আনন্দে চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে পুত্রকে চুম্বন দিয়া বলিলেন,—"তুমি, বাবা, তোমার উপযুক্ত অন্য রাজ্যের খোঁজ কর; মাসিদোনিয়া তোমার পক্ষে নেহাৎ ছোট।"

লেখাপড়া

সে সময় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন এরিষ্টটল। ফিলিপ্ তাঁহাকে আনাইয়া তাঁহারই হাতে আলেক্‌জান্দারের শিক্ষার ভার দিলেন। এরিষ্টটলের নিকট আলেক্‌জান্দার নানাবিদ্যা শিক্ষা করিলেন—কতক প্রকাশ্য, কতক গুপ্ত। আলেকজান্দার লেখাপড়া ভালবাসিতেন—পড়িতেনও যথেষ্ট। বড় হইয়া তিনি একবার এরিষ্টটলের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"ক্ষমতায় ও রাজ্যের পরিমাণে বড় হওয়া অপেক্ষা বিদ্যায় অন্য লোক অপেক্ষা বড় হওয়া আমি বেশী পছন্দ করি।"

হোমারের ইলিয়াড্ কাব্য তিনি এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার তরবারির সঙ্গে একত্র বালিসের নীচে রাখিয়া দিতেন। এসিয়া জয় করিতে করিতে যাইবার সময়, দেশ হইতে চিঠি লিখিয়া, অনেক ভাল ভাল পুস্তক আনাইয়াছিলেন।

পারস্যদেশ জয়ের সময় যে সমস্ত ভাল ভাল জিনিষ, লুটপাটের পর, তাঁহার হাতে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে খুব সুন্দর এক রত্ন রাখার পাত্র ছিল। আলেক্‌জান্দার বন্ধুবান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার মধ্যে কি রাখা যায়?" এক একজন এক এক জিনিষের নাম করিলেন কিন্তু আলেকজান্দারের মনে কোনটাই লাগিল না। তিনি বলিলেন,—"ইহার মধ্যে রাখিতে হইবে ইলিয়াড্।" ইলিয়াড্ হইতে তিনি অনেক যুদ্ধের কৌশল শিখিতেন।

(ক্রমশঃ)

শরৎ-ভোরে

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

মরতে শরৎ-ভোরে হাসেরে আলো,
গগনে মিলালো কালো মেঘের জাল ও।
হাসেরে শেফালি কুঁদ, মউ খেয়ে অলি বুঁদ,
রুণু রুন্ গুন্ গুন্ গাহেরে ভালো,
মরতে শরৎ-ভোরে হাসেরে আলো!

কুঞ্জ-কানন ঘেরি' পবন নাচে,
দোলন চাঁপার দোল লেগেছে গাছে।
থল্ কমলের পাশে বেলা, যূঁই নাচে, হাসে,
করবী গরবী চালে দাঁড়ায়ে আছে,
কুঞ্জ-কানন ঘেরি' পবন নাচে!

চাহিল নয়ন মেলি' কমল-কলি,
বীণাও বাজিল কার, আসে কি অলি ?

গায়ক পাখীর দলে নীড় ছাড়ি কুতূহলে
দূরে কোন্ দূরদেশে যেতেছে চলি,
বীণাও বাজিল কার, আসে কি অলি ?

ওকি ও ঝুমুর ঝুম্ নূপুর বাজে ?
তটিনী চলেছে বুঝি নাচের সাজে !

দু'ধারে কাশের বনে দোলা লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
তরণী চলেছে ধীরে নদীর মাঝে ;
ওকি ও ঝুমুর ঝুম্ নূপুর বাজে ?

মরি মরি সীমাহারা মাঠের কোলে
সোণার ধানের শীষ দোলেরে দোলে।

মৃদুল বাতাস আসি নেচে যায় ভাসি' ভাসি',
মানস মুগধ মরি, নয়ন ভোলে ;
সোণার ধানের শীষ দোলেরে দোলে।

প্রকৃতি দিয়েছে ছাপি' মরত ভ'রে—
অঢেল রূপের রাশি শরৎ-ভোরে।

ওঠ্ ওরে, ঘুম্ টুটে, আয় তোরা, আয় ছুটে,
দেখে যা সেজেছে ধরা কেমন ক'রে,—
প্রকৃতির মধুরিমা শরৎ-ভোরে।

সর্দ্দারীর বিপদ্

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

খুদিরামের জ্বালায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ; বুঝুক আর না বুঝুক, জানুক আর না জানুক সব কথায়ই তাহার ফোঁড়ন দেওয়া চাই। এই স্বভাবটার জন্য ছোকরা কতবার নাকাল হইয়াছে, বন্ধুবান্ধবদেরও বিপদে ফেলিয়াছে, কিন্তু তবু এই সর্দ্দারী করিবার অভ্যাসটা তাহার কিছুতেই কমিল না।

খুদিরামের কোন্ এক মামা একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, আর তাহাকে পায় কে ? দুনিয়ার যত আজগুবী খবর সব যেন তাহার ঠোঁটের আগায়। তাহার উপর সত্যি মিথ্যা নানা রকম রং চড়াইয়া সে যখন নিঃসঙ্কোচে টিপ্পনী কাটিয়া যাইত তখন ম্যাট্রিক ক্লাশের ছেলেগুলি শুদ্ধ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। একদিন সে বলিল—"জানিস্, জেকোশ্লোভিয়ার লোকদের গোঁফ রাখতে হলে বছরে এক টাকা করে ট্যাক্স দিতে হয়।" মতিলাল ছেলেমানুষ, জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, গোঁফ রাখ্‌লে দোষ কি ?" খুদিরাম বলিল, "আরে এটা আর বুঝছিস্ না, সে দেশের লোকগুলো যে ভয়ানক সিগারেটখোর। কখন সিগারেট খেতে গিয়ে গোঁফে আগুন ধরিয়ে বসবে, তাই এই ব্যবস্থা। জানে ট্যাক্সের নাম শুনলে কোন বাবাজী আর গোঁফ রাখ্‌ছেন না, কাজেই কোন বিপদের ভয়ও থাকবে না।"

এই ধরণের আজগুবী গল্প সে অনেক করিত। তা করুক, ইহাতে ত' কাহার বিশেষ কিছু অসিয়া যায় না, কিন্তু মুস্কিল বাধিত যখন সে না ভাবিয়া চিন্তিয়া ফস্ করিয়া এক একটা কথা বলিয়া বসিত।

সেবার তাহাদের ক্লাশে নন্দলাল নামে একটি সুন্দর মত ছেলে ভর্ত্তি হইল। ছেলেটি আবার বেশ কবিতা লিখিতে পারিত। ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে ভালরকম পরিচয় হইবার আগেই তাহার একটা কবিতা স্কুল ম্যাগাজিনে বাহির হইয়া গেল ; শুধু তাই নয়, সেদিন হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ক্লাশে আসিয়া নন্দলালের লেখাটার ভারী

প্রশংসা করিলেন। হঠাৎ খুদিরাম উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে স্যার, ওটা চোরাই মাল। অন্যের লেখা টুকে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে।" সকলে অবাক্ হইয়া খুদিরামের দিকে চাহিল। মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেকি বল্‌ছ? কোন্ বই থেকে বল দেখি?" খুদিরাম বোকার মত উত্তর দিল "আ—আমি নিজে ঠিক দেখিনি কিন্তু মামা বলেন যে আজকালকার নূতন লেখকরা শুধু পরের লেখা চুরি ক'রে চালায়; তাই আমার মনে হয় ওরটাও তাই।" ক্লাশশুদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাস্টার মহাশয় গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তা এরকমটা যাতে ভবিষ্যতে না মনে হয় তার ত' একটা ব্যবস্থা করা উচিত।" ব্যবস্থা অবশ্য বেশ সুন্দরই হইল। খুদিরাম কয়েক ঘণ্টার জন্য বেঞ্চের উপর কাণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর একবারের কথা মনে পড়ে। ছোকরার জন্য বন্ধুবান্ধবেরা কি নাকাল-টাই না হইয়াছিল। চাটুয্যেপাড়ায় চমৎকার একটা বাগানবাড়ী ছিল। ছেলেদের সেটা দেখিলেই চড়ুইভাতির কথা মনে পড়িত। কিন্তু সে বাগানে ঢুকিবার সাহস বোধ হয় সমস্ত সহরটার মধ্যে কাহারও ছিল না। বাগানের মালিক ছিলেন যেমন কৃপণ তেমনি খিট্‌খিটে। খুদিরাম একদিন বলিল—"আরে ওখানে চড়ুইভাতি কর্‌বি তাতে আর কি? আমায় নিস্ তাহ'লে আর কোনও গোলমাল হবে না। ও বাগানের মালিক যে আমার মেসোমশাই হন রে।"

খুদের কথায় যেন সকলে হাতে স্বর্গ পাইল। আরে, এমন ভাল কথাটা এতদিন খামাখা চাপিয়া রাখিয়াছে—বলিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ঠিক হইল, সকলে এক টাকা করিয়া চাঁদা দিবে। খুদিরাম অবশ্য কিছুই দিল না। তা নাইবা দিল, তাহার জন্যই না আজকার এত বড় আমোদটা ফলিতে বসিয়াছে।

চড়ুইভাতি আরম্ভ হইল। সকলে বাড়ীতে বলিয়া আসিল সেদিন আর কেহ বাড়ীতে খাইবে না। সকাল হইতে হল্লা করিতে করিতে রান্না শেষ হইল বেলা আড়াইটায়। খুদিরাম রাঁধিতে জানে না, অথচ ভার লইল মাছের ঝোল রাঁধিবার। রান্না হইলে সুধীর একটু চাখিয়া বলিল, "করেছিস কি? চমৎকার

তাজা মাছটা, লবণে যে মুখে দেওয়া যায় না।" খুদিরাম মোটেই দমিবার পাত্র নয়। চট্‌পট্ জবাব দিল—তাহার মামা বলিয়াছেন লবণটা খুব খাইবে, ওটা ভয়ানক উপকারী, তাইত সে ইচ্ছা করিয়াই অতটা লবণ দিয়াছে। হোক্ না খাইতে একটু খারাপ, কিন্তু উপকারিতাটা ত' আর মাঠে মারা যাইবে না। মাছের ঝোলের আশা ছাড়িয়া সকলে খাইতে বসিবে, হঠাৎ দেখা গেল দূরে লাঠি হাতে সেই কিপ্‌টে বুড়ো, সঙ্গে ভোজপুরী দ্বারোয়ান আর ইয়া বড় দুই নেকড়ে বাঘের মত কুকুর। আর আশ্চর্য্য এই, সেই মেসোমশাই নামধারী জীবটিকে দেখিয়া খুদিরাম লম্বা দিল সকলের আগে। অন্য ছেলেরাই বা কি করে, প্রাণ আগে না খাওয়া আগে? পিক্‌নিক্ চুলায় গেল। দেয়াল টপ্‌কাইতে হাত মুখ গেল ছড়িয়া, কাঁটায় কাপড় গেল ছিঁড়িয়া, হাঁফাইতে হাঁফাইতে সকলে পালাইয়া বাঁচে। সুধীর বেচারা আর একটু হইলেই প্রায় গিয়াছিল আর কি!

সবচেয়ে বিপদে ফেলিয়াছিল সে সেবার থিয়েটারে। সেবার তাহারা সেকেণ্ড-ক্লাশে উঠিয়াছে। স্কুলের কর্ত্তা বলিলেই চলে। ফার্ষ্ট ক্লাশের ছেলেদের পরীক্ষার বছর। তাহাদের এ সব দিকে বড় একটা ঝোঁক নাই। সেকেণ্ড ক্লাশের ছেলেরা মিলিয়া ঠিক করিল, গ্রীষ্মের ছুটীর দিন স্কুলে থিয়েটার করিতে হইবে।

প্রথমেই কিন্তু গোল বাধিল কি বই হইবে তাহা লইয়া। এটার পার্টগুলি বড় লম্বা, ওটায় রাণী সাজিবার ছেলে জুটিবেনা—এই রকম নানা জল্পনা চলিতেছে, এমন সময় খুদিরাম গিয়া হাজির। খুদিরামের মামা একখানা নতুন নাটক লিখিয়াছেন "জরাসন্ধ-বধ।" বইখানা তখনও বাহির হয় নাই, কিন্তু যাহারা দেখিয়াছে তাহারা বলে একখানা বইএর মত বই হইয়াছে। খুদিরামের হাতে সেখানার পাণ্ডুলিপি। খুদিরাম জায়গায় জায়গায় পড়িয়া শুনাইল। অনেকেরি ভাল লাগিল, আর এমন একখানা বই বাহির হইবার আগে প্রথম অভিনয় করার গৌরবটাও ত' কম নয়! কাজেই ঠিক হইল, হ্যাঁ, এটাই প্লে করিতে হইবে। খুদিরাম তখন এক বায়না ধরিল তাহাকে কিন্তু ভীমের পার্ট দিতে হইবে। সুধাংশু ঘোর আপত্তি তুলিল, সে কেমন করিয়া হয়? অমন ষণ্ডা মানুষটার পার্ট কি খুদিরামের মত একটা রোগা পট্‌কা

ছেলের উপর দেওয়া যায় ? লোকেইবা বলিবে কি ? প্রত্যুত্তরে খুদিরাম তাহাকে প্রচণ্ড এক ধমক লাগাইয়া দিল, "বলি চোখ যে কপালে তোলা হল, মূল সংস্কৃত মহাভারতটা পড়া হয়েছে ? ভীমের আসল চেহারার কোনও খবর রাখিস ? ফ্যাট থাকলেই বুঝি পালোয়ান হয় ?" মূল মহাভারত পড়িবার বিদ্যা অবশ্য কাহারও ছিল না। অবশেষে পাছে বইটা হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে খুদিরামের কথাতেই সকলে রাজী হইল। কাজেই জরাসন্ধের পার্টটাও একটি রোগা ছেলের ঘাড়ে চাপান হইল।

কিন্তু যাহার জরাসন্ধ সাজিবার কথা, থিয়েটারের দুই দিন আগে সে পড়িল জ্বরে। তাড়াতাড়ির সময় অত বড় একটা পার্ট কাহাকেই বা দেওয়া যায় ? শেষে কি সব মাটী হইয়া যাইবে ? এমন সময় হরিদাস আসিয়া বলিল, তাহাকে লইলে সে এক দিনে জরাসন্ধের পার্টটা মুখস্থ করিয়া ফেলিতে পারিবে। হরিদাসের মুখস্থ করিবার শক্তির উপর অবশ্য আমাদের যথেষ্টই শ্রদ্ধা ছিল। জিওমেট্রির থিওরেম্, য়্যাল্‌জেব্রার উত্তর, ট্রানশ্লেশনের খাতা, 'এনে'র বই কিছুই সে মুখস্থ করিতে বাদ রাখিত না। আর শুধু কি মুখস্থ ? পুরুতের মন্ত্র পড়ার মত সে চোখ বুজিয়া সেগুলি গড় গড় করিয়া আওড়াইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু যত গোল তাহার চেহারা খানা লইয়া। চৌদ্দ বছরের ছেলে, সবে সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিয়াছে, তাহার ওজন কিনা এক মন সাড়ে সাঁইত্রিশ সের! সেবার স্কুলে স্কুলে ছাত্রদের যে ডাক্তারী পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে হরিদাসকে লিখিয়া দিয়াছিল 'শরীরের ওজন আর চর্ব্বি একটু কমান দরকার।' ওঃ, সেদিন তাহার কি রাগ! সে সব সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু মোটা বলিলে আর রক্ষা ছিল না। এ হেন হরিদাসকে জরাসন্ধের পার্ট দেওয়া কেমন কেমন ঠেকিলেও তখন নাকি আর উপায় নাই।

থিয়েটারের দিন হল লোকে লোকারণ্য। শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। এইবার ভীম বেচারা জরাসন্ধকে বধ করিবে, অর্থাৎ কুস্তিতে কাৎ করিয়া আছাড় দিবে। নাটক অনুসারে ভীমের নামিবার কথা ছদ্মবেশে। কিন্তু খুদিরামের তাহাতে ভয়ানক আপত্তি, অমন সুন্দর সুন্দর জরির কাজ করা পোষাকগুলি

থাকিতে সে কি খালি গায়ে নামিতে পারে ? খুদিরাম সাজিয়া গুজিয়াই নামিল। তারপর সে গলাটাকে যথাসম্ভব মোটা করিয়া—"রে পাপিষ্ঠ জরাসন্ধ, সিংহাসনের কুক্কুর, শোণিত-লোলুপ সয়তান," প্রভৃতি সম্বোধনের পর হরিদাসকে

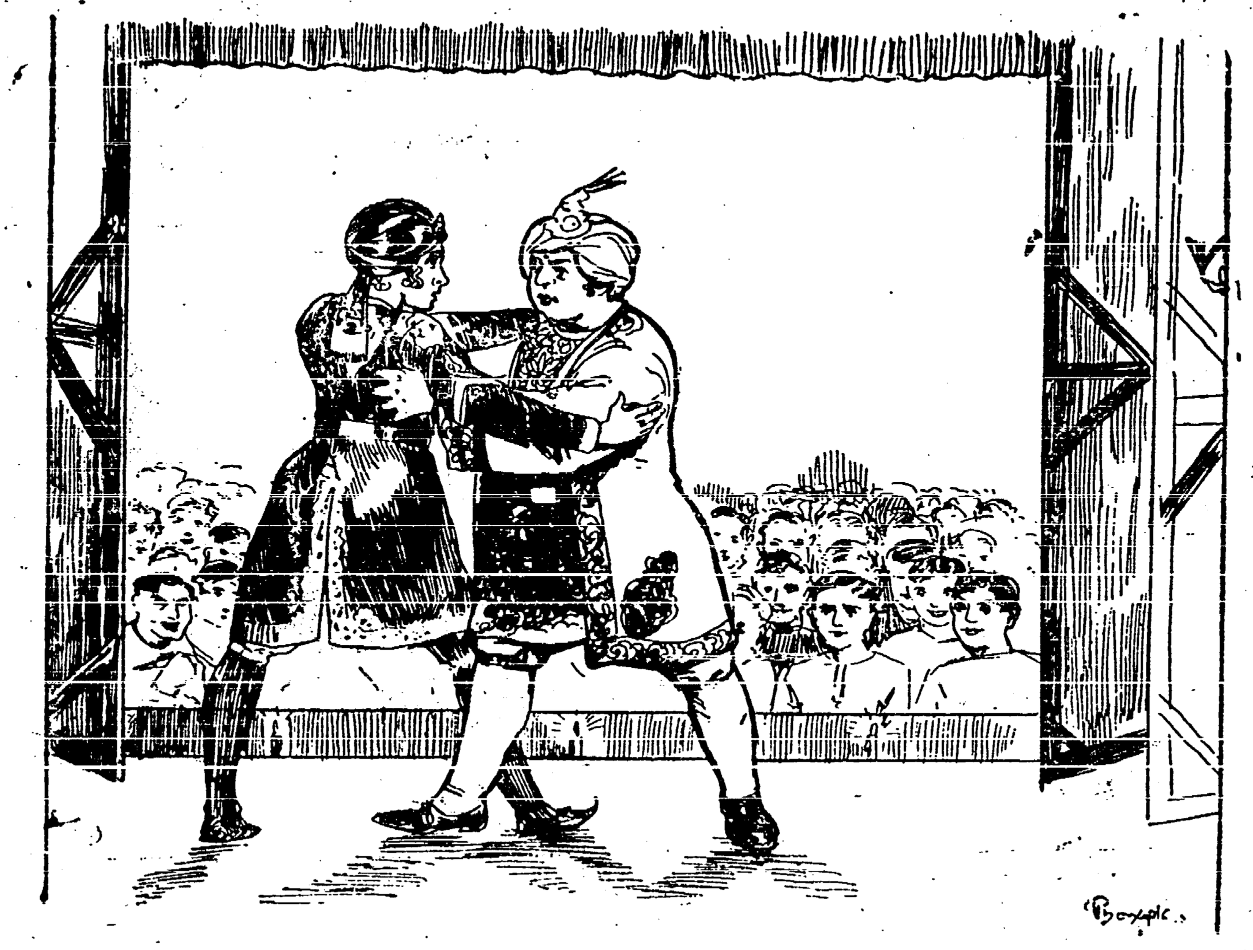

খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল

জড়াইয়া ধরিল। খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল। দর্শকেরা উৎসুক হইয়া দেখিতেছে আর ভাবিতেছে এইবার হাততালি দিতে হইবে—এই বুঝি জরাসন্ধ কাৎ হইল—এমন সময় হরি হরি! খুদিরাম এক কাণ্ড করিয়া বসিল! হরিদাসের বিশাল দেহ নড়াইতে না পারিয়া ভীমসেন হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আরে ধ্যেৎ, তুই বড্ড মোটা।" কি ? মোটা বলা ? ফলে জরাসন্ধও স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া ভীমসেনের দিকে খানিকক্ষণ কটমট করিয়া তাকাইয়া ষ্টেজ হইতে বাহির হইয়া গেল। অমন করিয়া এক হল লোকের সামনে মোটা বলিলে কাহার না রাগ হয় ? হাততালি, ঠাট্টা, বিদ্রূপে থিয়েটারের সেখানেই ইতি হইল।

এম্নি করিয়া আর কতদিন চলে বল ? ছোকরার চালিয়াতিতে বন্ধুবান্ধবেরা

দস্তুর মত চটিয়া আছে, এমন সময় একটা ঘটনা হইল। তাহার কথাই আজ বলিব।

রমেশের সেজমামা ছিল স্পিরিচুয়ালিস্ট। স্পিরিচুয়ালিস্ট কাকে বলে জান না বোধ হয়। মানুষ মারা গেলে তাহার আত্মার কি হয়, ভূত আছে কিনা, এই সব লইয়া যাহারা চর্চ্চা করে তাহাদের বলে স্পিরিচুয়ালিস্ট; সংস্কৃতে একটা কথা আছে—মানুষের স্বভাব নাকি হয় ঠিক তাহার মামার মত; রমেশের সম্বন্ধে কথাটা ঠিক না ঘটিলেও ছেলেটা মামার দৌলতে ভূতের গল্প শুনিয়াছিল বিস্তর, আর ছুটির দিনে সেই সব গল্প বন্ধুবান্ধবদের বলিয়া আসর জমাইয়া রাখিতেও তাহার কিছুমাত্র কার্পণ্য ছিল না।

সেদিনও দুপুর বেলা তাহাদের ছোট ঘরটায় ৮।১০টি ছেলে মিলিয়া বেশ গল্প চলিতেছে। বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। রমেশ ভূতের গল্প বলিতেছে আর সকলে হাঁ করিয়া কথাগুলি যেন গিলিতেছে। এমন সময় দেখা গেল খুদিরাম একটা প্রকাণ্ড ছাতি মাথায় দিয়া, এক গাল পান আর হাসি লইয়া হাজির।

একটু পরেই রমেশের সহিত খুদিরামের তুমুল তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল। খুদিরাম বিদ্রূপের হাসিতে মুখখানা ভরাইয়া বলিল "তোরাও দেখ্‌ছি সেকেলে বুড়ীদের মত ঐ সব আজগুবী গল্প বিশ্বেস করিস্। ছিঃ ছিঃ, টোয়েণ্টিএথ্ সেঞ্চুরিতে জন্মেছিস্ এখনও সেই আদ্যিকালের কুসংস্কারগুলো গেল না? যেমন তুমি, তেম্নি তোমার সেজমামা।"

রমেশ আর সব সহ্য করিতে পারে,—কিন্তু সেজমামাকে ঠাট্টা! তাহার মাথা চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

"তুই তবে ভূত মানিস্ নে?"

"আলবৎ নয়।"

"দুপুর রাত্রে একা শ্মশানে যেতে পারিস্?"

নিতান্ত তাচ্ছীল্যভাবে খুদিরাম উত্তর দিল—"তোরা হাসালি, কতবার বল্‌ব

ভূত মানিনে, তা আবার ভূতের ভয় কিসের?" নন্দলাল এতক্ষণ এক কোণে বসিয়া একখানা সাড়ে চার ইঞ্চি পুরু পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতেছিল, এইবার বলিল—"অত কথা কাটাকাটির কি দরকার, আস্‌ছে মঙ্গলবার অমাবস্যা আছে। ঐদিন আমড়াতলায় নীলকুঠিতে খুদিরামকে রেখে আসলেই ত গোল চুকে যায়। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে যাবে, আর ভোর বেলা চলে আসবে।" সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা।" খুদিরামও একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বেশ।"

এইখানে নীলকুঠির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সহরের এক কোণে ছোট্ট একটা নদী আছে। জায়গাটার চারিদিকে জঙ্গল, মাঝখানটা খোলা মাঠের মত। এইখানেই শ্মশান, লোকে ইহাকে বলে আমড়াতলা। নীলকুঠি সেই আমড়াতলায় বহুদিনের পুরাণো একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী। প্রবাদ, বাড়ীটা ভূতের। শুধু তাই নয়, আরও অনেক ভয়ানক ভয়ানক গল্প বাড়ীটার সম্বন্ধে আছে। আগে নাকি বাড়ীটা ছিল কোন এক নীলকর সাহেবের কুঠি। তারপর কবে হইতে যে ওটা ঐ অবস্থায় আছে, তাহা পাড়ার ঠাকুর্দ্দারাও ভাল বলিতে পারেন না। জায়গাটা দিনের বেলা দেখিলেই গা শির্ শির্ করিয়া উঠে। ছেলেরা দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে সেখানে আমড়া পাড়িতে যায় বটে; কিন্তু রাত্রে? ওরে বাবা! বছর কয়েক আগে গুপী জেলে নাকি একদিন সন্ধ্যা বেলা ওখান দিয়া আসিতেছিল, তখন ঐ বাড়ীটা হইতে একটা চাপা গলার কান্না শুনিতে পায়। সেই হইতে আর কেহ ওমুখো হয় না। দল বাঁধিয়া যখন মড়া পোড়াইতে যায় সে আলাদা কথা, কিন্তু মফঃস্বলে সে আর কতই বা?

খুদিরাম প্রথমে মনে ভাবিয়াছিল ব্যাপারটা বুঝি ঐখানেই শেষ হইবে। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর যখন ৬।৭টি ছেলে দল বাঁধিয়া গিয়া তাহাকে পাকড়াও করিল, তখন বেচারা বড়ই ঘাবড়াইয়া গেল। কিন্তু তখন 'না' বলিলে ত' আর ক্লাশে মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না, কাজেই শেষে গুটি গুটি পা ফেলিয়া রওনা হইল। পথে সুধাংশু বলিল, "খুদে এখনও সময় আছে।" খুদে উত্তর দিল 'তাই নাকি?

বন্ধুবান্ধবদেরও সেদিন সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা নীলকুঠির ভিতর পর্য্যন্ত খুদিরামকে আগাইয়া দিল। যাইবার সময় রমেশ বলিয়া গেল, "মনে থাকে যেন, পালাবার পথে ফার্ষ্ট বাড়ী আমাদের। যদি দেখতে পাই ত' বুঝেছই।" খুদিরাম গম্ভীর মুখে বলিল, "সকলেই ত' আর তোমার সেজ মামা নন।" বন্ধুরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত খুদের গলাটা বেশ ভারী।

বন্ধুরা চলিয়া গেল, খুদিরাম নীলকুঠিতে একা। মিনিট ৪।৫ পরেই খুদিরামের হাত পা হিম হইয়া আসিতে লাগিল। সে মাঠের দিকে তাকাইল, বেলগাছটাকে দেখিয়া মনে হইল একটা কালো রংএর বিরাট্ চেহারা হাত পা বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। হঠাৎ ওকি! ছোট ছেলের কান্নার মত ও কিসের আওয়াজ? তালগাছের উপর একটা প্যাঁচা বসিয়াছিল শব্দটা তারই। খুদিরাম কি করিবে, সে ত আর বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে না, যে প্যাঁচার ডাক শুনিবে! অমাবস্যার ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, মড়ার মাথার ভিতর হাওয়া ঢুকিয়া সোঁ সোঁ গর্জ্জন হইতেছিল। খুদিরাম চোখ বুজিল, কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। চোখ খুলিতেই দেখে সিঁড়ির উপর দরজার চৌকাঠে কিসের দুটা চোখ ভাটার মত জ্বলিতেছে। সে ভাবিল এইবার পালাই, কিন্তু পালাইবে কোথা দিয়া? ঠিক দরজার উপরেই যে সেই ভীষণ চোখ জোড়া তাহার দিকে কট্মট্ করিয়া তাকাইয়া আছে। অন্ধকারে ত' আর কিছু দেখা যায় না। "রাম, রাম, রাম, রাম!" কিন্তু রাম নামই বলিবে কি, গলা যে ভয়ে আঠার মত আটকাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ খুদিরামের মনে পড়িল, এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মণদের ভূত সহজে কিছু করিতে পারে না। সেও তো চাটুয্যে, গলায় হাত দিয়া দেখিল, পৈতাটা ঠিক আছে ত? হায়, হায়, তাও দেখি একেবারে ছেঁড়া। ছেঁড়া পৈতা দেখিয়া দিন দুই আগে ঠাকুরমা কত বকিয়াছিলেন। সেও ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, ওসব কুসংস্কার সে মানে না। হায় রে সেদিন সে যদি একটা নতুন পৈতা গ্রন্থি দিয়া লইত। এই ছেঁড়া পৈতা দেখিলে কি আর ভূত তাহাকে ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া বিশ্বাস করিবে?

একটু পরে আর ঘরে থাকা অসহ্য হইয়া পড়িল, মরি-বাঁচি ভুলিয়া খুদিরাম

একলাফে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই চোখ দুটার নীচে ম্যাঁও করিয়া একটা আওয়াজ হইল। কি আশ্চর্য্য, ভূত যে বিড়ালের মত শব্দ করে! খুদিরাম ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছে ভূতেরা ইচ্ছা করিলে যে কোন জানোয়ারের মত আওয়াজ করিতে পারে। তবে ত' সত্যিই ভূত! হঠাৎ খুদিরাম দেখে, কখন যে মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ত' সে টেরই পায় নাই। তুমুল বৃষ্টি। দৌড়ান যে অসম্ভব। আবার কি সেই নীলকুঠিতেই ঢুকিতে হইবে নাকি? হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুৎ চোখের উপর তলোয়ারের মত নাচিয়া গেল! ও কি, তালগাছের উপর সাদা কাপড় পরা ও আবার কে আসিল? শাঁখচুন্নি নয় ত? বেচারা জানিত না, কাল দিনুর দোকান হইতে আড়াই পয়সা দিয়া সে যে বড় সাদা ঘুড়িটা কিনিয়াছিল, ডাক্তারদের বাড়ীর ছেলেটার সাথে প্যাঁচ খেলিতে গিয়া সেই যেটা কাটা গিয়াছিল, তাহাই আসিয়া এই তালগাছের উপর আটকাইয়াছে। শাঁখচুন্নির নাকি ছায়া থাকে না। কিন্তু এই অন্ধকারে তাহা কি আর দেখা যায়?

আবার পিছনে আওয়াজ হইল ফ্যাঁস্ ফো। খুদিরাম সেই বৃষ্টি মাথায় লইয়া ছুটিল। পায়ের নীচে মড়ার মাথার খুলিতে পা আট্‌কাইয়া যায়, বাতাসের মধ্যে যেন কাহার অট্টহাসি। আর পিছনে কাহার পায়ের শব্দ না? হ্যাঁ তাহারই ঠিক পিছনে কে যেন ছুটিয়া

পিছনে কাহার পায়ের শব্দ না?

আসিতেছে, সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সম্মুখে একটা শেয়াল কি যেন খুঁজিতেছিল, খুদিরামকে দেখিয়া চম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। খুদিরামকে তখন জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিতে পারিত না—সে আছে কি নাই, তাহার চারিদিকে সমস্ত লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান-শূন্য হইয়া বেচারা নদীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

সেই রাত্রে খুদিরাম যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার মা ছেলের মুখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজা, মুখ একেবারে ফ্যাঁকাশে, পা মাতালের মত টলিতেছে, মুখে কথা নাই। পিছনে তাহার আদরের পোষা কুচ্‌কুচে কালো বিড়াল পুষি। খাওয়া দাওয়ার পর হইতেই ছেলের উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছিল না, তাহার বিড়ালেরও না। কিন্তু এ ভাবে যে সে ফিরিবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে রাত্রে সে কোন কথাই বলিল না, শুধু মা যখন গা হাত পা মুছাইয়া তাহাকে শুইতে বলিলেন তখন সে প্রায় আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "আজ মা, একা ঘরে কিছুতেই শুতে পারব না। আজ তোমার ঘরে শোব," মা আশ্চর্য্য হইলেন বটে কিন্তু ছেলের অবস্থা বুঝিয়া সে রাত্রে আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। খুদের বাবা ছেলের উদ্দেশে অনেক গরম গরম ধমক ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। মা তাঁহাকেও কিছু বলিতে দিলেন না।

খুদিরাম তিন দিন স্কুল কামাই করিল। কিন্তু তাহার সর্দ্দারীর সাজা তখনও শেষ হয় নাই। চার দিনের দিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল বোর্ডের উপর বড় বড় অক্ষরে নন্দলালের হাতে লেখা রহিয়াছে—

খুদিরাম আমাদের ভূত নাহি মানে,
প্রমাণ করিতে গেল নীলকুঠি পানে।
তালগাছে কাটা ঘুড়ী দেখি হৃদ্‌কম্প,
ভয় পাঞা খুদিরাম জলে দিল ঝম্প।
তেঁই সে কাহিনী শুনি, গায়ে ঝরে ঘাম,
বাকীটুকু বলিবেক নিজে খুদিরাম।

নন্দ কি ত্রিকালজ্ঞ? ছেলেদের প্রশ্নের ঠেলায় তাহাকে আরও ২ দিন স্কুল কামাই করিতে হইল।

সেই হইতে খুদিরাম একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। আজকাল সে ক্লাশে যায় ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে, বসে গিয়া লাষ্ট বেঞ্চে, আর কথা বলে খুব কম। সর্দ্দারী একেবারে কমিয়া গিয়াছে। বন্ধুবান্ধবরাও আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

পালোয়ানের মত পালোয়ান

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ)

আমাদের এই বাংলা দেশটায় মাথাওয়ালা বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন অনেক। তাঁদের অবশ্য আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি, কেননা দেশের নাম রাখিয়াছেন তো তাঁরাই! বিদেশে গেলে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কে হে তুমি, তখন পরিচয় তো দিব আমরা তাঁদেরই। এঁদেরই সমান শ্রদ্ধা আমি কিন্তু করি তাঁদেরও, যাঁরা গায়ের জোরের জন্য গোটাদেশের মাথা উঁচু করিয়াছেন। আমাদের দুর্ব্বল বলিয়া একটা বদ্‌নাম আছে কিনা, কাজেই সে বদ্‌নামটা যাঁরা ঘুচাইতেছেন তাঁদের কি সম্মান না করিয়া আমরা থাকিতে পারি? আজ যে আমরা বড় গলায় বলিতেছি, আরে যাও, যাও, অত বড়াই কর কিসের, ইচ্ছা করিলে আমরা—বাঙ্গালীরাও—তোমাদের অমন অনেক মেড়া-খাসি-খাওয়া পালোয়ানকে কাবু করিতে পারি, সে তো এঁদেরই দৌলতে!

(গত মাঘ মাসের 'রামধনুতে' রাজেন্দ্র গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সহিত তোমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছি। ইনি এখন বাংলাদেশে বীর বালক ও বীর যুবকের দল তৈরি করিতেছেন। বুক টান্ করিয়া বীরের মত যখন তাঁর শিষ্যেরা রাস্তা দিয়া চলাফেরা করে, চোখ যেন তখন জুড়াইয়া যায়।)

আজ তোমাদের যে তিনটী লোকের কথা বলিব মনে করিয়াছি, তাঁদের কিন্তু আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। শ্যামাকান্ত, ভীমভবানী ও গোবরের নাম জানে না, এমন বাঙ্গালী ছেলেও আবার আছে নাকি? আমার তো বিশ্বাসই হয় না!

পাশের ছবিতে, বাঘের ছাল পরা, সন্ন্যাসীর বেশে যে পুরুষটী দাঁড়াইয়া, তিনিই শ্যামাকান্ত। আর্য্য চেহারা বটে। লম্বা ও চওড়া গড়ন, বেশ ফর্সা রং, গা ফুঁড়িয়া যেন তেজ বাহির হইতেছে।

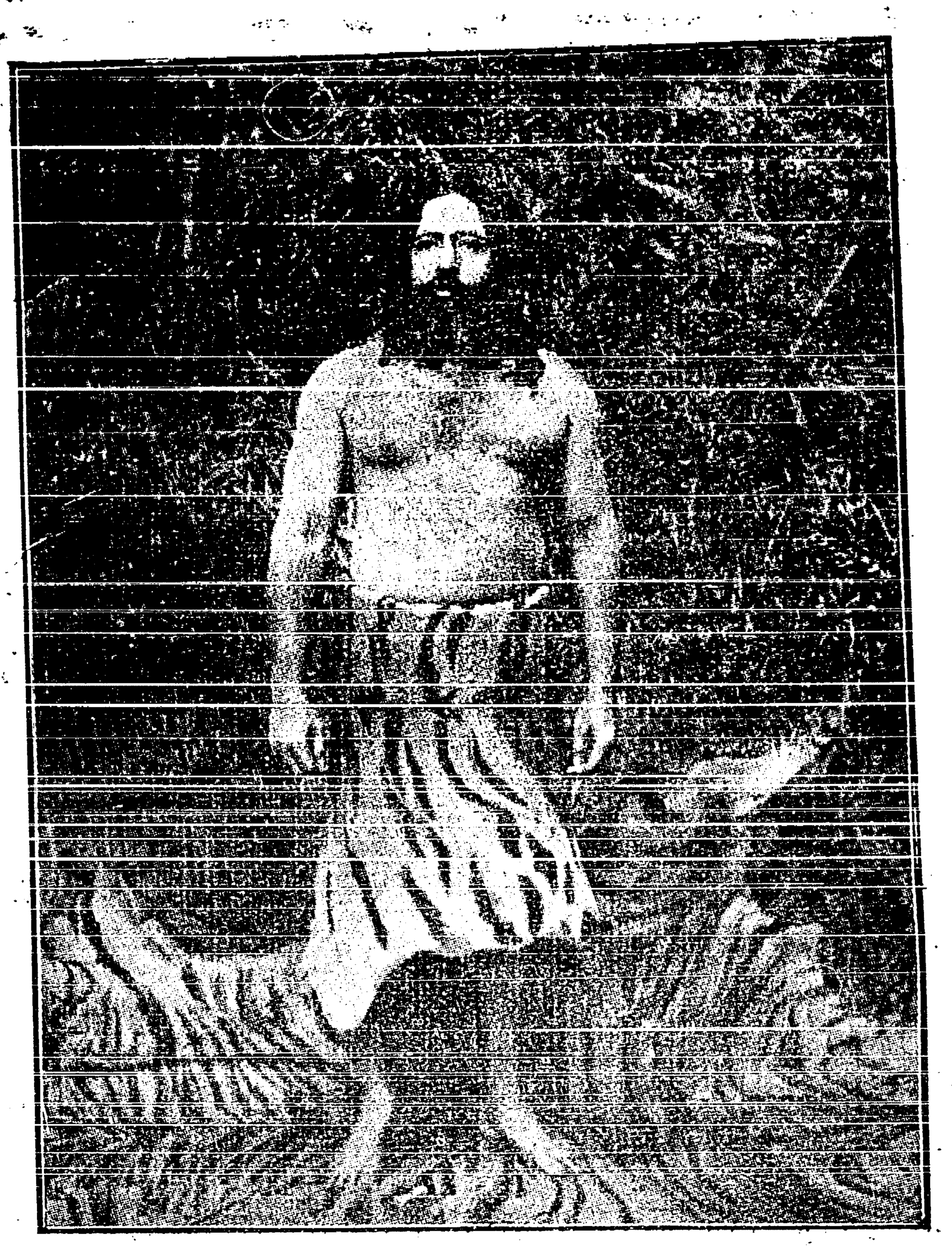

সন্ন্যাসীর বেশে শ্যামাকান্ত

এক কথায় পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হইবে—ইনি ছিলেন একটী 'অদ্ভুত' মানুষ। যেমন গায়ের জোর, তেমনি সাহস! এমনটী আর কেউ অন্য কোন দেশে দেখাইয়াছে কিনা, আমিতো জানি না। বোধ হয় নেল্‌সনের মত তিনিও বলিতেন "ভয়? সে আবার কে? কই, সে ভদ্রলোকের সাথে তো কোনদিন আলাপ-পরিচয় হয় নাই!"

শ্যামাকান্তের বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। ছোটবেলা হইতেই বেশ গঁট্টা-গোট্টা ছিলেন, আর গায়ে জোরও ছিল খুব। একটু বয়স বাড়িতেই নিয়ম-মত কুস্তি আর ব্যায়াম কসরৎ করিয়া একটা দস্তুরমত পালোয়ান হইয়া উঠিলেন। বয়স অল্পই, চলিলেন পশ্চিমে। রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক কুস্তি করিলেন এবং বড় বড় ভুঁড়িওয়ালা পালোয়ানদের ঘালও করিলেন ঢের! সখ হইল সার্কাস্ করিবেন, অমনি জুড়িয়া দিলেন সার্কাস্ করা। এই সার্কাসেই এমন সমস্ত কাণ্ড তিনি করিতে লাগিলেন, যে তা মনে করিলে আমাদের গায়ে একেবারে কাঁটা দিয়া উঠে। বাংলায় সারা পড়িয়া গেল, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বাঙ্গালী যুবক বাঘের সাথে লড়াই করে। আরে দূর, তাও কি হয়! একটা মহিষ, কম করিয়াও ওজন তাহার ১০।১২ মণ তো হইবেই, তাকে এক চাপড়ে ঘাল করিয়া পিঠে ফেলিয়া ৩০।৪০ মাইল দৌড়াইয়া যায় যে বাঘ, তার সাথে লড়িবে কিনা মানুষ! রামচন্দ্রঃ। দলে দলে লোক চলিল সার্কাস্ দেখিতে। বাঘের খেলা আরম্ভ হইল। ওমা, এ যে একেবারে টাট্‌কা ধরা বুনো বাঘ! বীর যুবক শ্যামাকান্ত সোজা গিয়া খাঁচার ভিতর ঢুকিলেন,—ভয়ে সকলের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল—এই বুঝি রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া যায়! তখন আরম্ভ হইল বাঘে মানুষে লড়াই। বাঙ্গালী ছেলের ধাক্কা খাইয়া বাঘ ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িল। বিপুল জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

বাঘকে লইয়া শ্যামাকান্ত যা' তা' করিতেন। কখনো বা হাতখানা বাঘের মুখের ভিতরেই পূরিয়া দিতেন। বাঘ মহাশয় কামড় দিতে অবশ্য একটুও দেরী করিতেন না, কিন্তু বাঘের মুখ হইতে হাত তিনি জোর করিয়া ছিনাইয়া আনিতেন, রক্তে হাত তাঁর লালে লাল হইয়া যাইত। রাজেন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের কাছে গল্প শুনিয়াছি, একবার পাটনার নবাব শ্যামাকান্তকে একটা ভীষণ হিংস্র বাঘিনীর সাথে লড়াই করিতে বলেন। সভা লোকে লোকারণ্য। বাংলার বীর গিয়া বাঘের খাঁচায় ঢুকিলেন। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বাঘ তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। শ্যামাকান্ত একটু টলিলেনও না, সামনের পা দুটী ধরিয়া ফেলিয়া ধাক্কা দিয়া জানোয়ারটাকে ছিট্‌কাইয়া ফেলিলেন। বাঘ দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল, কিন্তু গড়াগড়ি দিতে হইল তাহাকে এবারও। তৃতীয়বার আক্রমণের পরেও বাঘকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া শ্যামাকান্ত যখন বাহিরে আসিলেন, বিপুল জয়ধ্বনিতে সভা তখন ভরিয়া গিয়াছে। নবাব বাহাদুর তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও দিয়া দিলেন।

শ্যামাকান্ত আর এক ভীষণ কাণ্ড করিতেন, সেটা বুকের উপর পাথর ভাঙ্গা। দুখানা চেয়ার—একখানার উপর তাঁহার মাথা, অপর খানার উপর থাকিত পা' দুখানা। শরীরটা ঝুলিত শূন্যে। তারপর তাঁর বুকের উপর মণ দশেক পাথর চাপান হইত। শুধু চাপান নয়, হাতুড়ি দিয়া সে গুলিকে আবার ভাঙ্গাও হইত। কি ভীষণ অবস্থা ভাবিয়া দেখ!

শ্যামাকান্তের কাছে গোরা সৈন্যগুলা খুব জব্দ থাকিত। স্বভাবটা তাদের ফরমাস দেওয়া কিনা, তাই মাঝে মাঝে একটু আধটু ওষুধের দরকার হইত, আর তিনিও মাঝে মাঝে তাদের তুলাধুনা করিয়া ছাড়িতেন।

তোমরা অনেকেই জান, শেষ বয়সে শ্যামাকান্ত সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তখন হইতে তাঁকে বলা হইত সোহহংস্বামী। হিমালয়ের কোলে একটা নির্জ্জন জায়গায় তিনি

তপস্যা করিতেন। আজ প্রায় দশ বছর হইল সোহহংস্বামী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা কিন্তু কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না।

পরপৃষ্ঠায় ঐ দৈত্যটীর চেহারা দেখ। কে, বুঝিতে পারিলে তো?—ভীমভবানী। ভবানী কিন্তু ছোটবেলায় শ্যামাকান্তের মত জোয়ান ছিলেন না, জোয়ান হইবার তাঁর সাধ হইল একদিন এক খেলার সাথীর হাতে মার খাইয়া। খুব মার খাইয়াছিলেন মনে বড় কষ্ট হইল, তাইতো, গায়ে জোর না থাকিলে, দেখিতেছি কেউই কেয়ার করেনা। আচ্ছা দাঁড়াও, জোর করিয়া লইতেছি। সেই দিনই আরম্ভ করিয়া দিলেন ব্যায়াম কসরৎ, আর তার ফলে আমরা পাইলাম ভারত-গৌরব ভীম ভবানীকে।

সোহহং স্বামিরূপে শ্যামাকান্ত

কিছুদিন ব্যায়াম কসরতের পর ভীম ভবানীর শরীরখানা এমনি হইল যে বিখ্যাত পালোয়ান রামমূর্ত্তি ডাকিয়া তাঁহাকে শিষ্য করিয়া লইলেন। দুদিন পরেই কিন্তু রামমূর্ত্তি বুঝিলেন, এ শিষ্য বড় সোজা নয়, শীঘ্রই এ গুরুকে ছাড়াইয়া যাইবে।

বাস্তবিক হইলও তাহাই। ভীমভবানীর নাম কিন্তু প্রথমে বাহির হইল ভারতের বাহিরে। একটা সার্কাসের দলে মিশিয়া তখন তিনি চীন, জাপান প্রভৃতি নানাদেশের লোকদের তাক্ লাগাইয়া দিতে লাগিলেন। গায়ের জোরের এমন সব নমুনা তিনি দিতে লাগিলেন, যে রামমূর্ত্তির নামও ডুবিয়া গেল। রামমূর্ত্তি থামাইতেন একখানা মোটর, ভীমভবানী দুইখানা এবং শেষে একদিন তিনখানাই থামাইয়া ফেলিলেন: লোহার শিকল দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া

ফেলা হইল, শরীর ফুলাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সে শিকল তিনি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুইখানা গরুর গাড়ী লোকে বোঝাই করা হইল, এক একখানায় বসিল ৫০ জন করিয়া, দিলেন তাহা বুক আর উরুর উপর দিয়া চালাইয়া।* অপরে বুকে তোলে সার্কাসের শিক্ষিত হাতী, তাঁর তোলা চাই অশিক্ষিত ক্ষ্যাপা হাতী। আর কুস্তি? কত বড় বড় বিলাতী পালোয়ানকে যে তিনি পট্‌কান দিয়াছেন, তার তো কথাই নাই! ভীম ভবানীর নাম ভারতের পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িল।

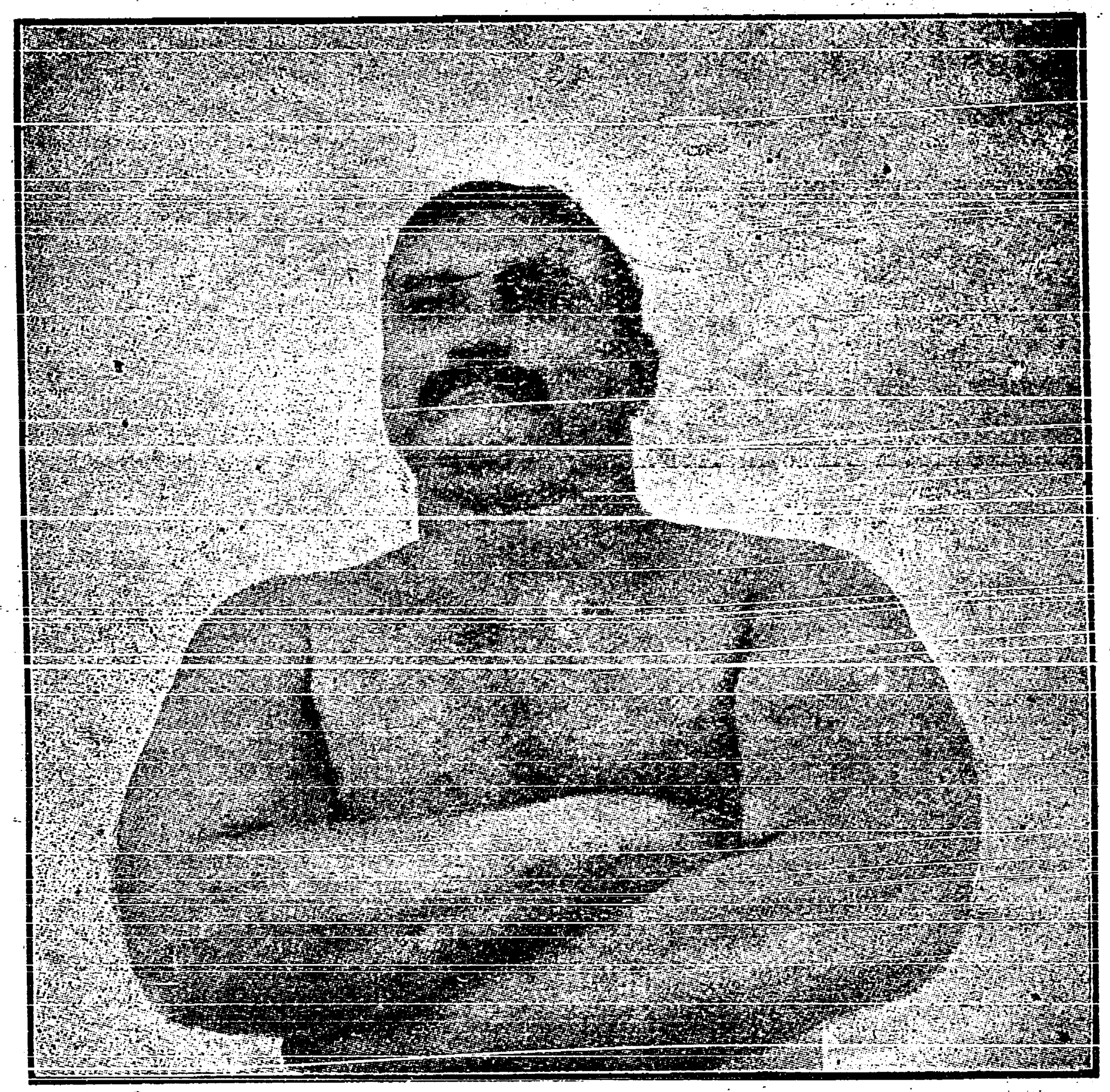

ভীম-ভবানী

একদিন শুনিলাম ভীম ভবানী আমেরিকা যাইয়া সেখানে বাঙ্গালীর গায়ের জোরের একটু নমুনা দিয়া আসিবেন। আমাদের গৌরব সেখানে মার্কিন পালোয়ানদের একে একে চিৎ করিতে ছিলেন, ভাবিলাম ভবেন্দ্র (ভীমভবানীর প্রকৃত নাম ভবেন্দ্র) বাংলার মান আরও বাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু হায় হায়, দুদিন পরে কি নিদারুণ কথা শুনলাম? কি একটু অসুখ হইয়াছিল—কলিকাতায় খবর ছড়াইয়া পড়িল—ভীমভবানী আর নাই। চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে হইল নিজের একজন কাউকে বুঝি হারাইলাম!

* মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র, ১৩২৯।

গোবর

গোবর আমাদের সারা বাংলার অপূর্ব্ব গৌরবের জিনিষ। ইঁহাকে বিশ্ব-বিজয়ী বীর বলিলেও চলে, কেননা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া ইনি এক রকম গোটা পৃথিবীটাই জয় করিয়াছেন। পৃথিবীর সে সময়কার সেরা কুস্তিগীর (World's Heavy-weight Champion) ষ্ট্র্যাংলারের সহিত আমেরিকায় গোবরের কুস্তি হয়। শুনিয়াছি সিংহের হাতে পড়িলে মৃগের যে অবস্থা হয়, গোবরের হাতে পড়িয়া ষ্ট্র্যাংলারের প্রায় সেই অবস্থাই হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যস্থ তবুও বলিলেন কুস্তিটা সমান সমান হইয়াছে। আমেরিকার খবরের কাগজগুলি কিন্তু একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে গোবরেরই জিত হইয়াছিল—তাহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে, ভবিষ্যতের World-Champion গোবর। আজ আমি দু'কথায় গোবরের পরিচয় দিতে পারিবনা, কেননা আমাদের বর্ত্তমান আশা ভরসা গোবর। আর এক দিন তাঁহার কথা তোমাদের শুনাইব।

আমার বড় ইচ্ছা হয়, জগদ্বিখ্যাত কুস্তিগীর ভারত-গৌরব গামার সহিত গোবরের লড়াই দেখিতে। গোবর আবার গামার শিষ্য—যেমন গুরু, তেমনি তার শিষ্য—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

গামা (বাঁদিকে) ও তাহার ভাই ইমামবক্স

মুক্তি

(শ্রীপ্রভাতকুমার শর্ম্মা)

এক ছিলেন রাজা আর তাঁর ছিলেন এক রাণী। পরম সুখে তাঁ'দের দিন যায়! না যাইবে কেন? দেশযোড়া রাজ্য, মাঠ-ভরা শস্য, সহরভরা লোকজন; রাজ্যের প্রজারা অতিরিক্ত ভক্ত, কর্ম্মচারীরা অতি বিশ্বস্ত; চারিদিকে সুখ, চারিদিকে হাসি, চারিদিকে আনন্দ। কিন্তু খাইতে খাইতে অমৃতও বিষ হয়—রাজারও এ সুখ বেশীদিন সহিল না। সুখশান্তি মানুষকে চিরকাল ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই—শান্ত, অলস জীবন; এর চেয়ে বিপদ ভাল, মৃত্যুও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। একটা কিছু তাই করা চাই, যাতে বোঝা যায় প্রাণ আছে—একটা দিগ্বিজয়, কি একটা যুদ্ধ, কি নিতান্ত একটা মৃগয়া।

অবশেষে দিগ্বিজয়ই স্থির হইল। অমনি সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। পদাতিক সাজিল, রথ সাজিল, হাতী সাজিল, ঘোড়া সাজিল, রণ-দামামায় আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল—রাজপথে লোক ধরে না, রাজ্য তোলপাড়। শুভদিনে, শুভলগ্নে রাণীর কাছ হইতে বিদায় লইয়া রাজা যাত্রা করিলেন।

যাত্রা যে বিশেষ শুভ হইয়াছিল তা' বলিতে পারি না; কারণ, প্রথম যুদ্ধেই রাজা হারিয়া গেলেন; আর হারিলেন যদি তো এমন হারা যে তাঁর সৈন্যসামন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় পলাইয়া গেল তার ঠিক ঠিকানা রহিল না; কিন্তু দুর্দ্দশা আর অপমানের চূড়ান্ত হইল তখনি, যখন রাজা নিজে বন্দী হইলেন।

অন্ধকার কারাগার—রাজা সেখানে বাস করেন। দিনে পাথর ভাঙ্গেন, ঘানি টানেন; রাত্রে হাতে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় ঘুমান। সোণার সিংহাসনে তুলার গদীতে বসিয়া যখন দিন কাটাইতেন তখনও দিন যাইত, আজকালও যায়।

এমনি ভাবে কিছুদিন গেলে পর রাজা অনেক চেষ্টায় গোপনে একখানি চিঠি রাণীর কাছে পাঠাইলেন—"কারাগারে বন্দী, যেমন করিয়া হয় উদ্ধার কর।" চিঠি পাইয়া রাণী একেবারে কাঁদিতে লাগিলেন—"আমি কেমন করিয়া রাজাকে উদ্ধার করিব? হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত যার কাছে পরাজিত হইল, রাজা নিজে যার কাছে বন্দী, আমি তার সঙ্গে কেমন করিয়া পারিব!" রাণী বিপদসাগরের কূল দেখিতে পাইলেন না।

রাণী কেবলি ভাবেন—কি করি, কি উপায়! অনেক ভাবিয়াও কিছুতে কিছু হইল না;

তখন তিনি এক অসমসাহসিক কাজ করিয়া বসিলেন—মাথার চুল খাটো করিয়া কাটিলেন, তারপর পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিলেন। তার উপর আলখাল্লা পরিলেন, তারপর বীণাটী মাত্র হাতে লইয়া অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাজবাড়ীর কেউ কিছু জানিতে পারিল না।

রাণী চলিলেন—গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া, মাঠের পর মাঠ পার হইয়া, কত বনজঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত নদ-নদী প্রান্তর মরুভূমি ডিঙ্গাইয়া। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, তবু পথের শেষ নাই। কোনদিন বা গাছতলায় রাত কাটান, কোনদিন বা কোন গৃহস্থের ঘরে একটু আশ্রয় পান। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে বসিয়া পড়িয়া বীণা বাজাইয়া ক্লান্তি দূর করেন। রাস্তার লোক দাঁড়াইয়া শুনে—মুগ্ধ হয়।

এমনিভাবে ছ'মাস চলিতে চলিতে রাণী আসিয়া পৌঁছিলেন—যে দেশে রাজা বন্দী। রাণী সহরের চারিদিক্ একটু ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, কারাগারের অন্ধকার প্রাচীরের সামনে একটু দাঁড়াইলেন, রাজবাড়ীর দরজার পাশে একটু ঘোরা ফেরা করিলেন, তারপর সাহসে বুক বাঁধিয়া রাজদরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা বলিলেন—"তুমি কি চাও?"

রাণী উত্তর করিলেন—"মহারাজ, অভয় দিন তো একবার আপনাকে বীণা বাজাইয়া শুনাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন—"বেশ ত, বীণা শুনিতে আপত্তি কি?"

সভাসদ্‌রা বলিয়া উঠিলেন—"সত্যিই ত, বীণার মত এমন চমৎকার জিনিষ কি আছে?"

রাণী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কি চমৎকার সে বীণা! তার মিষ্টিসুরে সভা ভরিয়া উঠিল, সভাসদ্‌রা মুগ্ধ হইয়া গেল আর রাজা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন।

সঙ্গীত শেষ হইলে রাজা বলিলেন—"বীণাকার, এমন মিষ্টি সুর আর শুনি নাই; তুমি কি পুরস্কার চাও, বল।"

রাণী বলিলেন—"মহারাজ, প্রতিজ্ঞা করুন, যা চাই দিবেন।"

রাজা বলিলেন—"তুমি যা' চাও, তাই দিব।"

রাণী বলিলেন—"মহারাজ, আপনার কারাগারের একজন বন্দীকে আমি চাই।"

রাজা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন; বলিলেন—"বন্দীকে নিয়া তোমার কি হইবে? সে তোমার কি কাজে আসিবে?"

রাণী বলিলেন—"মহারাজ, ওই আমার এক সখ। রাজদরবারে গান গাই, রাজারা

যদি খুসী হইয়া পুরস্কার দিতে চান, ত আমি একজন বন্দী বাছিয়া লইয়া তা'কে মুক্তি দিই।"

রাজা তখন খুব খুসী হইয়া গেলেন আর সভাময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। রাজা বলিলেন—"কোতোয়াল তোমাকে সঙ্গে লইয়া কারাগারে যাইবেন; তুমি যা'কে দেখাইয়া দিবে কোতোয়াল তা'কেই মুক্তি দিবেন।"

রাণী কোতোয়ালের সঙ্গে কারাগারে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার কারাগার—তার ভিতরে কোথায় যে কে আছে রাণী বুঝিতেই পারিলেন না। শেষে অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখেন রাজা এক কোণে পড়িয়া আছেন—হাতে পায়ে শিকল বাঁধা। রাণী কোতোয়ালকে বলিলেন—"এই বন্দীটীকে আমি চাই।" কোতোয়াল রাজাকে মুক্ত করিয়া দিলেন; কতকালের রুদ্ধদুয়ার যেন হঠাৎ খুলিয়া গেল—রাজা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাণীরও চোখের জল আসে আসে, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে চাপিয়া রাখিলেন, কিছুতেই পরিচয় দিলেন না।

দু'জনে তখন বাড়ীর পথ ধরিলেন। রাণীর মনে মনে কত আনন্দ—রাজাকে তিনি মুক্ত করিয়াছেন। রাজা মুক্তি পাইয়া খুবই খুসী হইলেন আর ভাবিলেন, রাজ্যে পৌঁছিয়াই বীণকারকে খুব বড় রকমের একটা কিছু পুরস্কার দিবেন; কিন্তু রাণীর উপর তাঁর বড় রাগ হইল, আর সে রাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিনি ত আর রাণীকে চিনিতে পারেন নাই, তাই ভাবিলেন রাণী বোধ হয় তাঁ'কে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন; নইলে তিনি বন্দী হইয়া কারাগারে পড়িয়া আছেন, তবু রাণী তাঁ'কে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না কেন? রাজা মনে মনে ঠিক করিলেন রাণীকে শাস্তি দিবেন। নিজের ভাগ্যের উপর যে রাগ সেটা পড়িল গিয়া রাণীর উপর।

তাঁরা যখন রাজধানীতে আসিয়া প্রায় পৌঁছিয়াছেন তখন রাণী বলিলেন—"আমি এখন বিদায় নিলাম।"

রাজা বলিলেন—"বীণকার, আমি একেবারে সাধারণ লোক নই। এ দেশের আমিই রাজা। তুমি কোন পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

রাণী বলিলেন—"মহারাজ, আমার যখন দরকার হইবে, রাজ-দরবারে সাক্ষাৎ করিব"—বলিয়া রাণী বিদায় নিলেন।

এ দিকে রাজা রাজবাড়ীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল—রাজা আসিয়াছেন, রাজা আসিয়াছেন। রাজ্য ভাঙ্গিয়া লোক আসিল রাজাকে দেখিতে। রাজা সকলকে হাসিমুখে আপ্যায়িত করিলেন—কি করিয়া বন্দী হইলেন, কারাগারে কেমন ছিলেন,

কি করিয়া মুক্তি পাইলেন, সকল কথাই বলিলেন। তারপর রাজ্যের সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল খুঁটিনাটি খবরই নিলেন, কিন্তু রাণীর কথা মুখেও আনিলেন না।

রাজসভা বসিল—বহুদিন পরে রাজা সিংহাসনে বসিলেন ও বসিয়াই প্রহরীকে আদেশ দিলেন—"প্রহরী, রাণীকে সংবাদ দাও তাড়াতাড়ি রাজসভায় আসিতে।"

অমনি সভাসদ্‌রা বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, রাণীর ত খোঁজ নাই। যেদিন আপনার পত্র আসিয়া পৌছিল, সে দিন রাণী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কেউ জানে না।"

রাজা রাগিয়া আগুন! হাত পা ছুড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা রাণীর!" রাজার শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল; সভাস্থ সকলে ভয়ে চুপ, কারো মুখে কথা নাই—সহসা সেই স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া এক অতি সুন্দর, অতি মধুর সুর-লহরী ভাসিয়া আসিতে লাগিল, আর তার স্পর্শে রাজার ক্রোধ আর সভাসদ্‌দের ভয় একেবারে জল হইয়া গেল!

রাজা বলিয়া উঠিলেন—"এই সেই তরুণ বীণকার, যার কাছে আমি আমার জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ।"

ধীরে ধীরে বীণকার সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল! দেখিতে সে কি সুন্দর! আর কি তার বীণার সুর! সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

সঙ্গীত শেষ হইলে রাজা বলিলেন—"বীণকার, তুমি কি চাও বল।"

বীণকার বলিল—"মহারাজ, সে দেশের রাজার কাছে যা' চাহিয়াছিলাম, এখানেও তাই চাই।"

রাজা বলিলেন—"বীণকার, তুমি অদ্ভুত লোক; তোমার যাকে ইচ্ছা বাছিয়া নাও।"

বীণকার বলিল—"মহারাজ, আমি আপনাকে চাই।"

সভাস্থ সকলে অবাক্। এর মানে কি?

বীণকার তখন ধীরে ধীরে তা'র আলখাল্লা খুলিল, আর তার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন রাণী নিজে।

তখন আর রাজার আনন্দ দেখে কে? মনে মনে নিশ্চয়ই তিনি লজ্জিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু এই লজ্জা আর কতক্ষণ!

তারপর যা ভোজটা হইল! বাগ্‌দীর রসগোল্লা, মণ্ডলীভোগের পান্তোয়া আর গোলাবাড়ীর সন্দেশের স্তূপ হইল পর্ব্বত-প্রমাণ; আর সে পর্ব্বত হইতে নদী বহিতে লাগিল ছাতকের কমলা-মধুর; আর সে নদী পড়িল গিয়া সাগরে, যা' ছিল শ্রীরামপুরের দইয়ে কাণায় কাণায় ভরা।

সাড়ে তিন হাজার মাইল দৌড়।

কিছুদিন হইল আমেরিকায় এক অদ্ভুত দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। এই দৌড়ে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের কতখানি দৌড়াইতে হইয়াছিল জান? ৩৪০০ মাইল। দুইজন লোক এই অসমসাহসিক খেলায় নামিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমেরিকারই এক আদিম অধিবাসী, অন্য জন এক সাহেব। দুর্গম পথ, বন, জঙ্গল, মরুভূমি পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতি পার হইয়া তাঁহাদের ছুটতে হইয়াছিল। কত সময় শীতে তাঁহারা মর মর হইয়াছেন, ক্ষুধার জ্বালায় রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই খাইয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহাদের খেলার নেশা যায় নাই। আদিম অধিবাসীটি গড়ে দিন ৪২ মাইল দৌড়াইতেন (অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬ মাইলেরও কিছু বেশী)। বেচারা ২৮০০ মাইল দৌড়াইয়া শেষে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সাহেবটি দৌড়াইতেন গড়ে ঘণ্টায় ৫ মাইল। ইনি শেষ পর্য্যন্ত ছুটিয়া ৫০০০ পাউণ্ড পুরস্কার পাইয়াছেন। দৌড় শেষ হইতে ইঁহার লাগিয়াছিল ৮৫ দিন।

বিদ্যুতের লাঙ্গল।

বিলাতের লোকেরা বিদ্যুতের শক্তিকে মানুষের যত রকম কাজে লাগান সম্ভব তাহার চেষ্টায় রাতদিন মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহারা এক নূতন বৈদ্যুতিক লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই লাঙ্গল একবার চালাইলে মাটীর ভিতরকার যত রকম অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ আছে, সব মরিয়া যাইবে। আবার চালাইলে আগাছাগুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে মাটীর উর্ব্বরতাও অনেক গুণ বাড়িয়া যাইবে।

হাল্কা শিশু।

লণ্ডনে যে ছেলেটী এখন সবচেয়ে হাল্কা তাহার ওজন ১ পাউণ্ড ১০ আউন্স। অর্থাৎ তিন পোয়ার একটু বেশী। লিভারপুলে আর একটী ছোট মেয়ে আছে। তাহার ওজন ১ পাউণ্ড ৮ আউন্স। বছর ৪।৫ আগে খবরের কাগজে আর একটি মেয়ের কথা পড়িয়াছিলাম। তাহার ওজন তখন ছিল এক পোয়া।

শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল।

মুরগীর দাম।

লণ্ডনের বাজারে একটী মুরগী যে দামে বিক্রী হইয়াছে তাহাতে একখানা ভাল মোটর-গাড়ী পাওয়া যায়। মুরগীটীর দাম ৩০০০ টাকা। এক বছরে এই মুরগীটী ৩৫১টী ডিম দেয়।

কাজের লোক।

উইলিয়াম পেটারসন্ বলিয়া একজন লোক ৬৩ বছর সমানে কাজ করিয়া সেদিন পেন্সন লইল। আশ্চর্য্য, এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে সে একটী দিনও কাজে কামাই করে নাই। লোকটীর অসুস্থ শরীর লইয়া, ভাঙ্গা হাত লইয়াও সে নিজের কাজ করিয়া গিয়াছে। লোকটীর বাড়ী লণ্ডনে।

কে কত উপবাস করিতে পারে।

সাপকে আমরা বলি বায়ুভুক্। তাহার কারণ সাপ নাকি অনেকদিন কিছু না খাইয়া থাকিতে পারে। এই ধরণের অন্য জীবেরও কিন্তু অভাব নাই। একটা কাঁকড়া-বিছাকে ৩৬৮ দিন কিছু খাইতে না দিয়া দেখা গিয়াছে, সে মরে নাই। মাকড়সার অনাহারে থাকিবার ক্ষমতা আরও বেশী। একটি মাকড়সাকে ১৭ মাস না খাইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা উপবাসের কথা শোনা গিয়াছে—৭১ দিন।

হাসির দাম।

প্যারিস্ সহরের মেয়েরা নিজেদের খুব সুন্দর বলিয়া মনে করেন। একবার তাঁহাদের একজন রাস্তার একটা দুর্ঘটনায় এমনি আঘাত পাইলেন, যে সারিয়া উঠিলেও নাকি তাঁহাকে হাসিলে আর আগের মত সুন্দর দেখাইত না। মনের দুঃখে তিনি যাহার জন্য দুর্ঘটনা হইল তাহার নামে নালিশ করিয়াছিলেন। বিচারক তাঁহাকে ২৫০০ পাউণ্ডের ডিক্রী দিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফসল পাকান।

সাধারণতঃ গম পাকিতে মাস পাঁচেক সময় লাগে। বিলাতের পণ্ডিতেরা অতদিন সবুর করিতে নারাজ। সম্প্রতি কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গমকে বিদ্যুতের সাহায্যে ১৩ সপ্তাহের মধ্যে পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে। বিজ্ঞান ক্রমে প্রকৃতিদেবীর নিয়মকেও অগ্রাহ্য করিতে সুরু করিল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চরণ

উত্তরদাতাদের নাম

সাধনা সেনগুপ্তা (কলিকাতা), সুধীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ (দিনাজপুর) আশারাণী, অশোক, বিমল, ক্ষেমময়, সুষমাময় ও প্রীতিময়ী (কলিকাতা), শিশির কুমার রায় (বসিরহাট) ব্যোমকেশ মজুমদার (ত্রিবেণী), আভারেণু দেবী (রংপুর) মিলনমালা ঘোষ (ভবানীপুর) সলিলচন্দ্র বর্দ্ধন (নেত্রকণা), অক্ষয়, সুরেন্দ্র, রাধাচরণ, নন্দলাল ও হেরম্ব কুমার বসাক (সিরাজগঞ্জ) পুষ্পরেন্দ্ধ দত্ত, অজুবেলা, (ডাল্টনগঞ্জ) সুনন্দা ভৌমিক (রংপুর) সরোজ মোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ) জ্যোৎস্না দেবী (কুড়িগ্রাম) অরুণা দেবী (পাটনা) অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রংপুর) পঞ্চানন দত্ত (আট্রা) প্রভাস চন্দ্র নাথ, সত্যেন্দ্র, শচীন্দ্র, নীলিমা, সুষমা, নিরঞ্জন, সুধীর, মীরা ও ইন্দ্রিরা ঘোষ (শ্রীরামপুর) অর্ণব নাথ খাঁ, নগেন্দ্র, যাদবেন্দু, কমল, গোবিন্দ্র, কমলা ও অতসী দেবী (গয়া) কিশোরীলাল ভাণ্ডারী (সরিষা রামকৃষ্ণ আশ্রম), বীরেন্দ্র কুমার রায়, মনীন্দ্র ক্ষীরোদ নরহরি (শোকপুরা, চট্টগ্রাম) লক্ষ্মী দেবী (সাওগাঁ) বিজয় ভূষণ ও বিনয় ভূষণ ভট্টাচার্য্য (রংপুর), নিরুপমা দেবী (চট্টগ্রাম) মধ্য বাংলা সারস্বত আশ্রমের ঋষি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (জয়দেবপুর, ঢাকা), পারিজাত রেণু দেবী (রংপুর) রণজিৎ, কল্যাণী, অজয় ও অঞ্জলী দাস (কলিকাতা) প্রভাত কুমার বসু (পাটনা) নীরদা, স্নেহ, রাণু, রেণু, সুধা, বেবী, কালী, সুশীলা, শৈলেন, কানাই, পতকী, হাবু, ভবানন্দ (মান্দালয়, বর্ম্মা) আয়জন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ (কুমিল্লা) বিপ্রদাস বড়ুয়া (আকিয়াব) সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), রাজলক্ষ্মী দাসী, পুণ্টু, মণ্টু, নণ্টু গুপ্ত (আকুই), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) হিমাংশুকুমার মল্লিক (কলিকাতা), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), লক্ষ্মী নারায়ণ গোস্বামী, হরেন্দ্র, মন্মথ (বাঁকুড়া), মনোজিৎ বসু (কুড়িগ্রাম) বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য (সুরানন্দ, সিলেট) ডিরু, উমু, রমু, দলু, বীরু, নিপু ও মনুয়া (রাণাঘাট)।

নূতন ধাঁধা

শব্দ চৌকী

সঙ্কেত—সমান তিন অক্ষরের তিনটি কিংবা চারিটি শব্দ এমন ভাবে বসাইতে হইবে যাহা ডাইনে বাঁয়ে পড়িলেও যাহা হয়, উপরে নীচে পড়িলেও তাহাই হয় যেমন—

তিন অক্ষরের ঃ—

১—র জ ত
২—জ থ ম
৩—ত ম সা

চারি অক্ষরের ঃ—

ব রা ব র
রা জ র ক্ত
ব র রু চি
র ক্ত চি হ্ন

ধাঁধার শব্দ গুলির অর্থ সাঙ্কেতিকভাবে দেওয়া থাকিবে। এই ভাবে বাহির করত—

তিন অক্ষরের চৌকী ঃ—

১

সমস্ত শুনিয়া পরে করিবে বিচার,
প্রথম বিখ্যাত বিশ্বে জ্ঞানী অবতার,
দ্বিতীয়েরে পাবে খুঁজি' গানের আসরে,
তৃতীয় বিরাজে সদা পুঁথির উপরে।

২

প্রথম সে ভারতের বিখ্যাত সহর,
দ্বিতীয়ের পাবে খুঁজি ফুলের ভিতর।
তৃতীয় পুরাণ-খ্যাত ঋষিশ্রেষ্ঠ জন,
কহিনু সকল কথা বলত এখন,

রামধনুর পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার—১ খানা রৌপ্য পদক।
দ্বিতীয় পুরস্কার—৬৲ টাকা দামের বই।
তৃতীয় পুরস্কার—৩৲ টাকা দামের বই।

"ছেলেদের মাসিক পত্র কিরূপ হওয়া উচিত" এই বিষয়ে গল্পের আকারে লিখিতে হইবে। কেবল মাত্র বার্ষিক বা ষান্মাসিক গ্রাহকেরাই প্রতিযোগিতার জন্য লিখিতে পারিবেন। লেখা যে নাবালকের নিজের, তাহা তাহার অভিভাবকের নিকট হইতে লেখাইয়া লইতে হইবে। লেখা ২৯শে অগ্রহায়ণের মধ্যে রামধনু অফিসে পৌঁছান চাই। ডাকে পাঠাইলে রেজিষ্ট্রি করিয়া পাঠাইতে হইবে। মাঘ মাসের রামধনুতে ফলাফল জানান হইবে ও পুরস্কার ঐ মাসের মধ্যেই বিতরণের ব্যবস্থা করা যাইবে।

রচনা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে 'রামধনু'তে প্রকাশ করা হইবে।

১৫ই আশ্বিনের মধ্যে বাহির হইবে

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ

১ম খণ্ড

রামধনু-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্ প্রণীত। মহাভারত নানারকম গল্পের সমুদ্র। তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি চমৎকার গল্প ছেলেপিলেদের উপযোগী ভাষায় লেখা। কতক 'রামধনু'তে বাহির হইয়াছে কিন্তু স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। বাকীগুলি নূতন। **পূজার সময়** তোমাদের একখানা চমৎকার **উপহার** হইল এই বইখানা। ছবিও আছে অনেক। দাম মাত্র ॥০।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—'রামধনু' কার্য্যালয়, আশুতোষ লাইব্রেরী, এস, কে লাহিড়ী এণ্ড কোংএর দোকান প্রভৃতি।

" আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে "
—রবীন্দ্রনাথ—

[illegible] (কার্য্যাধ্যক্ষ), শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল।

১ম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩৫ { ১০ম সংখ্যা

পূজা

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

শরৎ হাসে মোদের বাসে, আকাশ খাসা নীলে মাজা,
বর্ষারসে সবাই সরস,—লতা পাতা সবুজ তাজা।

ঝিলের বিলের পদ্মফুলের সুবাসে বয় বাতাস বনে।
ভোরের বেলায় শিউলিতলায় বিশ্বমাকেই পড়ে মনে।

ধানের ক্ষেতের আশে পাশে কাশের ফুলের বরণ শাদা ;
দীঘীর জলে কলকলে হাঁসেরা ধায় সারি বাঁধা।

… ভট্টাচার্য্য (কার্য্যাধ্যক্ষ), শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল।

নদীর জলে শাদা পালে দলে দলে নৌকা উজায়,
মাঠে ঘাটে শোভা ফোটে ; সবাই জোটে মায়ের পূজায়।
সাঁঝের পরে শোভায় সাজে সারা আকাশ তারায় তারায় ;
জলে স্থলে ঝলে আলো, হিরণ-বরণ কিরণ-ধারায়।
ওই আলোকে উজল চোখে আয়রে ছেলে-মেয়ে সবে,
দীপ্ত চোখে মাকে দেখে, তাঁকেই পূজি মহোৎসবে।

দৃষ্টিলাভ

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত)

এক অন্ধ। পথে পথে সে ভিখ্ মাগে।

প্রথম প্রথম ভিক্ষেয় যা মিল্‌ত তা'তে পেট একরকম চ'লে যেত। কিন্তু অন্ধ মানুষ,—অজানা পথে এক্‌লা হাঁটার যো নেই ; তার উপর এক জায়গায় রোজ রোজ ভিক্ষেই বা দেয় কে ? এখন কোনদিন ভিক্ষে জোটে, কোনদিন জোটেও না।

পথে পথে ঘুরে' ঘুরে' দিন এক রকমে কেটে যায়। রাত্রে শুয়ে' শুয়ে' দুঃখের ভাব্‌না আর ফুরোয় না। কপালের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্ধ-চোক দু'টি জলে ভ'রে উঠে ; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—হায় ! একটা চোকও যদি ভাল থাক্‌ত ! তা হ'লে খেটে খাওয়ারও উপায় হ'তো !

এরি মধ্যে বাদ্‌লায় দু'দিন ঘরের বার হওয়ার জো ছিল না। এ দুদিন অন্ধের দিকে তাকায় কে ? বেচারার পেটে দেওয়ার কিছুই নেই, সে শুয়ে' শুয়ে' দুঃখের ভাবনাই শুধু ভাব্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্ধ ঘুমিয়ে পড়েচে, শেষ রাতে স্বপ্ন ছাখে, কে যেন তা'কে বল্‌চে 'পরের দুঃখে তুই যদি চোক বুজে' না থাকিস্, তা হ'লে তোর চোখেরও দৃষ্টি মিল্‌বে।'

এ কি স্বপ্ন ! অন্ধ ঘুম থেকে উঠে' ভাব্‌তে লাগ্‌ল তার কি চোক আছে যে সে পরের দুঃখ দেখ্‌তে পাবে ! আর, তা জান্‌লেই বা তার মত ভিখিরীর করার কি সাধ্যি আছে।...দূর ছাই—যত না চাঁদ ধর্‌বার আশা ! এই না ভেবে, সে স্বপ্নের কথা মনে তুল্‌লে না।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৫ বছর আগেকার ছবি)

দু'দিন বাদে অন্ধ ভিক্ষে মেগে ফির্‌চে। লোকের দোরে চেয়ে-চিন্তে যে দু চারটে পয়সা মিলেছে, তা কাপড়ের গাঁটে বাঁধা। হাতের লাঠি দিয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে পথ ঠাউরিয়ে সে রাস্তার মোড় ফিরেচে, কে পেছন হ'তে ব'লে উঠ্‌ল—'বাবা, দুঃখীকে দয়া করুন। আজ দু'দিন খেতে পাইনি। একটা পয়সা দিয়ে যান।'

অন্ধ চ'লে যাচ্ছিল, তারই মত আরো কে এ দু'দিন খেতে পায়নি শুনে' থম্‌কে দাঁড়াল। বল্‌ল—'কে গো তুমি, ভিক্ষে চাইছ ?'

পথের ভিখিরী বল্‌ল—'আমি একজন দুঃখী, বাবা। চোক নেই, তার ওপর পা দুটোও খোঁড়া—দেখ্‌তেও পাইনে, চল্‌তেও পারিনে।'

য়্যাঁ! চোক নেই, তার ওপর আবার খোঁড়া!—শুনে' অন্ধ ভিখিরী থম্‌কে দাঁড়াল। 'আমিও ভাই তোমারই মত এক দুঃখী'—এই না ব'লে সে গাঁট থেকে দুটো পয়সা খুলে' পথের ভিখিরীর হাতে গুঁজে' দিল। তারপর আর না দাঁড়িয়ে লাঠি ঠক্ ঠক্ ক'রে চ'লে গেল।

সেদিন কুঁড়েয় ফিরে' অন্ধের মনে হ'তে লাগ্‌ল—তার চোকের সাম্‌নে যেন আলোর পরীরা নাচ্‌না সুরু করে দিয়েচে, আর মনের মধ্যে শুধু গানের সুরই বাজ্‌চে। স্বপ্নের কথা চট্ করে তার মনে পড়্‌ল—'তাই তো, তার তো শুধু চোক নেই! চোকের সঙ্গে পা-ও নেই, এমন দুঃখীও তো পৃথিবীতে আছে!'

পথের ভিখিরী যেখানে ব'সে ভিখ মাগে, অন্ধ ভিখিরী সেই পথ দিয়ে রোজ সকালে ভিক্ষে করতে যায়। আর দুপুর বেলা ফেরার সময় নিজের ভিক্ষের ভাগ কিছু না কিছু তাকে দেয়। এ রকম রোজই চল্‌চে। অন্ধ ভিখিরী যা দেয় পথের ভিখিরী দু হাত পেতে নেয়, আর 'জয় হোক' ব'লে আশীর্ব্বাদ করে। অন্ধ ভিখিরী তা শুনতে না শুনতে লাঠি ঠক্ ঠক্ ক'রে চ'লে যায়। ব'সে ব'সে পথের ভিখিরীর মনে হয়—'রোজ পয়সা পাই, কে এ দয়ালু লোকটা?' অন্ধ ভিখিরী যেতে যেতে মনে ভাবে—'চোক নেই, বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—আহা, লোকটার কতই না যেন দুঃখ-কষ্ট! বেচারার হেঁটে চলারও যে উপায় নেই!'

হঠাৎ সপ্তাহখানেক এর সাথে ওর দেখা নেই। কোথায় গেল লোকটা—অন্ধের রোজই তা মনে হয়!

একদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধ ভিখিরী ঘরে ফির্‌চে। পথে একটা বস্তির কাছে এসেচে, শোনে ভারী সোরগোল—'আগুন! আগুন!' কিসের আগুন, কোথায় আগুন—কিছুই সে দেখ্‌চে না। তবু আশেপাশের লোকের চ্যাঁচামেচি, আগুনের শোঁ শোঁ, দাউ দাউ শব্দ, আর কাঠ-বাঁশ ফোটার ফট্ ফট্ আওয়াজ শুনে' সে থম্‌কে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মনে হ'লো—সাম্‌নের দিকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'রক্ষা কর! রক্ষা কর! পুড়ে মলুম।' এ কার স্বর?—অন্ধ কান পেতে রইলো। পাশের কে ব'লে গেল—'আহা, দুঃখী লোকটা! ঘরের ভেতর

রয়েচে—পুড়েই বা মরে!' দুঃখী লোক! কে সে? বেচারা পুড়ে মর্‌বে!—অন্ধের দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান রইল না। হাতের লাঠি ছুড়ে ফেলে সে পাগলের মত ছুটে' চল্‌ল—যেদিকে পা চলে। তার চোকের ওপর শুধু একটা ছবি ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—দাউ দাউ ক'রে ঘর জ্বল্‌চে, তার মাঝে নিরুপায় হ'য়ে ব'সে আছে এক দুঃখী—তার চোকও নেই, পা-ও নেই।

অন্ধের কাণ্ড দেখে' আশেপাশের লোকেরা চম্‌কে উঠ্‌ল—লোকটা পাগল নাকি!

পাগলের মতই অন্ধ শুধু ছুট্‌চে আর হাতড়াচ্ছে কোথায় সে দুঃখী! এক একবার জোর-গলায় সে ডেকে বল্‌চে 'কে রয়েচ আগুনের ভেতর—বল, কই তুমি? আমি যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।'

অন্ধ কোথায় কার সাড়া পেলে—লাফে লাফে আগুন ডিঙ্গিয়ে এক ঘরের ভেতর গিয়ে উঠল। আর সেখান থেকে পাঁজা-কোলা ক'রে কাকে নিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে আস্‌তেই অন্ধ ভ্যাখে—তার চোখের ঝাপ্‌সা ভাব কেটে গ্যাছে, আর কিছুই তার কাছে আঁধার নেই। আর কোলে ক'রে যাকে সে আগুনের ভেতর হতে বাঁচিয়ে এনেছে, তার মুখের দিকে চেয়েও সে দেখ্‌তে পেলে সে—আর কেউ নয়, সেই পথের ভিখিরী!

বৈজ্ঞানিকের চক্ষু

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

অনেকক্ষণ হাঁটিয়া হাঁটিয়া বেজায় পিপাসা পাইয়া গিয়াছিল। সম্মুখে একটা পুকুর দেখিয়া তাড়াতাড়ি খানিকটা জল তুলিয়া লওয়া গেল। জল মুখে দিতে যাইব, এমন সময় বৈজ্ঞানিক 'হাঁ হাঁ' করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, "আহা

করকি ! করকি ! ঐ নোংরা জল, পোকা-মাকড় কিল্ বিল্ কর্‌ছে—দিব্যি মুখে পূ্রে দিচ্ছ !" হাসিয়া বলিলাম "পাগল হলে নাকি ? এমন চমৎকার টলটলে জল, মুক্তার মত সাদা, এর মধ্যে আবার নোংরা দেখলে কোথায় ?" বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "খানিকটা জল নিয়ে আমার ঘরে এস—দেখাচ্ছি ।"

ঘরে ঢুকিয়া বৈজ্ঞানিক একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাহির করিলেন । তার-পর একটা ছোট্ট কাচের উপর এক ফোঁটা জল বসাইয়া বলিলেন—"এইবার দেখ ।" আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম আরে বাস্‌রে একি ? এমন পরিষ্কার স্বচ্ছ জল তাহার মধ্যে এসর কি পোকার মত কিল-বিল করিতেছে ? দেখিলে গা যে শির্ শির্ করিয়া উঠে । বৈজ্ঞা-নিক বলিলেন, "এটা হচ্ছে আমা-দের একটা চোখ, আমরা একে বলি অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ইংরাজীতে বলে মাইক্রস্‌কোপ্ ।"

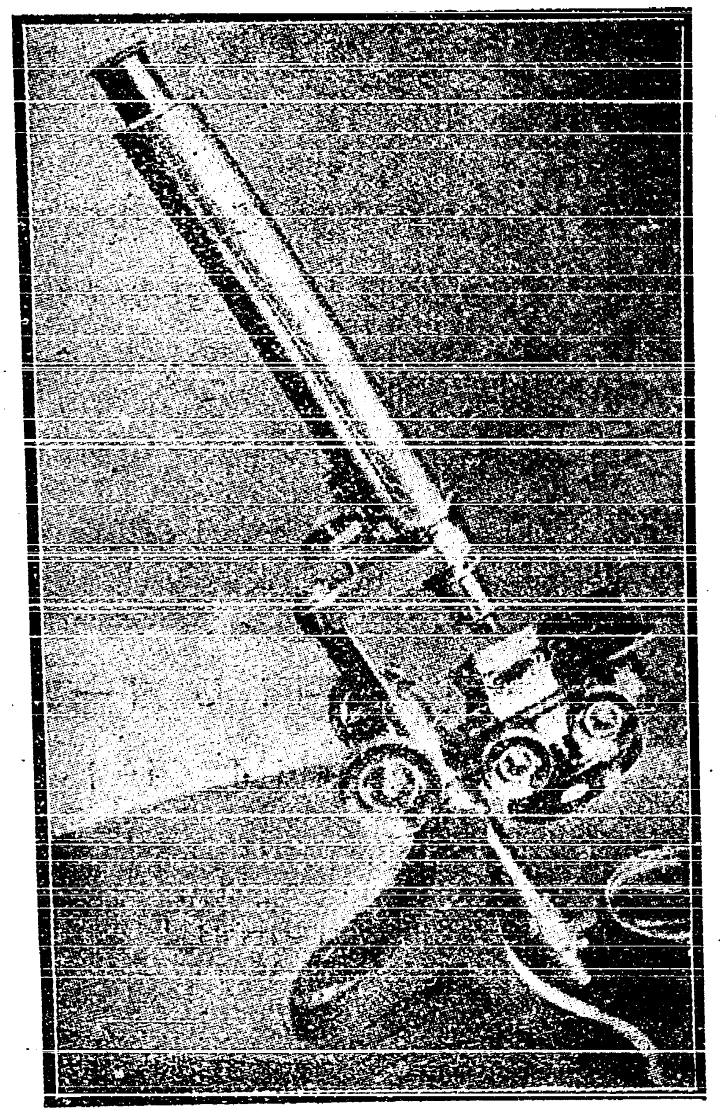
একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাহির করিলেন

বাস্তবিক আমরা সুবোধ ছেলের মত ভগবানের দেওয়া একেক জোড়া চোখ লইয়াই বেশ সন্তুষ্ট আছি । আমরা মনে করি আশে পাশের জিনিষগুলিকে শুধু চোখে যেমনটি দেখিতেছি, আসলে তাহারা ঠিক সেই রকম । তোমরাও নিশ্চয়ই তাই মনে কর । আচ্ছা, তোমাদের আশে পাশের সমস্ত জিনিষের মধ্যে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ থাকিতে পারে, কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দিবারাত্র ঘটিতে পারে, তাহা তোমাদের কখনও মনে হয় কি ? বৈজ্ঞানিকদের কিন্তু হয় ।

তাঁহারা ভাবেন এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিষগুলি, শুধু চোখে যাহাদের ভাল করিয়া অনুমান করাই যায় না, সেগুলি যদি আর একটু বড় করিয়া দেখা যাইত, তবে না জানি কত বড় বড় রহস্যই না তাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইত । আহা, তা যদি করা যাইত !

প্রায় হাজার বছর আগেকার লোকেরাও একথা ভাবিতেন, আর শুধু ভাবা নয়, ব্যাপারটা কাজে ফলাইবার চেষ্টা করিতেও ছাড়িতেন না । কিন্তু ব্যাপারটা ত' নেহাৎ সহজ নয়, তাই সময়ও লাগিল যথেষ্ট । তারপর একদিন এক বৈজ্ঞানিক ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখিবার প্রথম যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন । সে যন্ত্রের কথা শুনিলে তোমরা নিশ্চয়ই হাসিবে—কেননা যন্ত্র বলিতে আমরা আজকাল একটা ভয়ানক কিছু মনে করিয়া বসি ।—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে সেই ছোট্ট আবিষ্কারটুকুর উপরেই রং ফলাইয়া আজকালকার এই অদ্ভুত অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক দেখিলেন, কোন একটা জিনিষের উপর এক ফোঁটা জল রাখিলে জিনিষটাকে সামান্য একটু বড় দেখায় । ব্যাপারটা হয় আলোক-বিজ্ঞানের একটা সাধারণ নিয়মের জন্য । তিনি দেখিলেন জলের বিন্দুর সবটা ঠিক সমান উঁচু নয়, মাঝখানটা একটু গোলমত হইয়া দু'পাশে ঢালু হইয়া গিয়াছে—অনেকটা ডিমের গায়ের মত । তিনি তখন ভাবিলেন, আচ্ছা ঐ রকম জলের বদলে, যদি একটা স্বচ্ছ আর ঐ রকম বাঁকান পাথর ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে কি রকম হয় ? যেমন ভাবা তেমনি কাজ । তিনি একটা কাচের মত পাথর জোগাড় করিয়া লইলেন । তারপর তাহার গা টা ঘসিয়া গোল করিয়া লইতেই দেখা গেল যে, কোন জিনিষের উপর পাথরখানা ধরিলে জিনিষটাকে একটু বড় বলিয়া মনে হয় । তিনি ইহার নাম রাখিলেন লেন্স্ । লেন্সের আবিষ্কার হইলে তখনকার লোকেদের যা আনন্দ !

তাহার পর ধূম পড়িয়া গেল—নানা রকম লেন্স তৈরী করিবার । কত রকম পাথর—এমন কি হীরা পর্য্যন্ত—লোকে লেন্সের জন্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল । এক ভদ্রলোক কাচ গালাইয়া, তাহাতে ফুঁ দিয়া বেশ একটা বুদ্বুদের মত তৈরী

করিলেন। তারপর তাহার ভিতরে জল ভরিয়া এক খানা লেন্স তৈরী করিয়া ফেলিলেন। এই সব লেন্সের কোন কোনটা বেশ চমৎকার হইত। এক একটা জিনিষকে অনেক সময় বেশ বড় দেখাইত।

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে হারভী নামে এক ডাক্তার কয়েকখানা লেন্স একত্র জুড়িয়া একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করিলেন। এইবার দেখা গেল এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক একটা জিনিষকে আগেকার তুলনায় অনেকখানি বড় দেখায়। ডাক্তার হারভী ইহার সাহায্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোকের চমক লাগাইয়া দিলেন। হারভীর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখা গেল, শরীরের মধ্যে রক্তের চলাচল বেশ দেখা যাইতেছে। শুধু তাই নয়, আরও দেখা গেল রক্তের মধ্যে অসংখ্য লাল পোকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আর তাই রক্তটাকে লাল বলিয়া মনে হইতেছে।

হারভীর আবিষ্কারের পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কদর ভয়ানক বাড়িয়া গেল। বেশ একটা ভাল রকম অণুবীক্ষণ যন্ত্র হইলে যে আরও কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা জানা যাইবে, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। এবার অনেকেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে লিষ্টার নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহাকেই লোকে বলে আসল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্মদাতা। লিষ্টার একটা চোখে একটু কম দেখিতেন। একদিন তিনি ঘরের মধ্যে চুপটি করিয়া বসিয়া আছেন। কাচের জানলার ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্যটা বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। লিষ্টারের বড় ভাল লাগিল। কিন্তু একটা চোখে যে ভাল দেখা যায় না! হঠাৎ লিষ্টারের নজর পড়িল, জানলার সার্সিতে একটা জায়গা তৈরী করিবার সময় কেমন যেন একটু ফাঁপা হইয়া রহিয়াছে, আর তাহার ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্যটা তাঁহার খারাপ চোখেও বেশ সুন্দর দেখা যাইতেছে। লিষ্টার ভাবিলেন, চোখের কাজে এই ব্যাপারটা লাগাইলে কেমন হয়?

ইহার কিছুদিন পরে লিষ্টার সত্যি সত্যিই কতগুলি লেন্স নিজে তৈরী করিয়া লইয়া কাজে নামিয়া পড়িলেন। তারপর তিনি দু' মাপের দু খানা লেন্স

লইয়া নানা পরীক্ষার পর এমন ভাবে কায়দা করিয়া বসাইলেন যে একটার পিছনে ছোট্ট একটা জিনিষ রাখিয়া আর একটা লেন্স দিয়া দেখিলে জিনিষটা প্রকাণ্ড বড় দেখায়। এমনি করিয়া আসল অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হইল।

তাহার পরেও দিনে দিনে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কত রকম উন্নতি হইতেছে। মানুষের সুবিধার জন্য আসল যন্ত্রের গায়ে কতরকম কল-কব্জা বসাইয়া তাহাকে আরও চমৎকার করা হইতেছে। আজকালকার একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কল-কব্জা দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। আসল ব্যাপার কিন্তু ঐ দুইখানা লেন্সের মধ্যে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক একটা জিনিষকে কত বড় দেখায় জান কি? এখানে তাহার কয়েকখানা ছবি তুলিয়া দিলাম। কোনটাই না বলিয়া দিলে আর চিনিবার জো টি নাই, অথচ সেগুলি হয়ত' তোমাদের নিতান্ত পরিচিত জিনিষ।

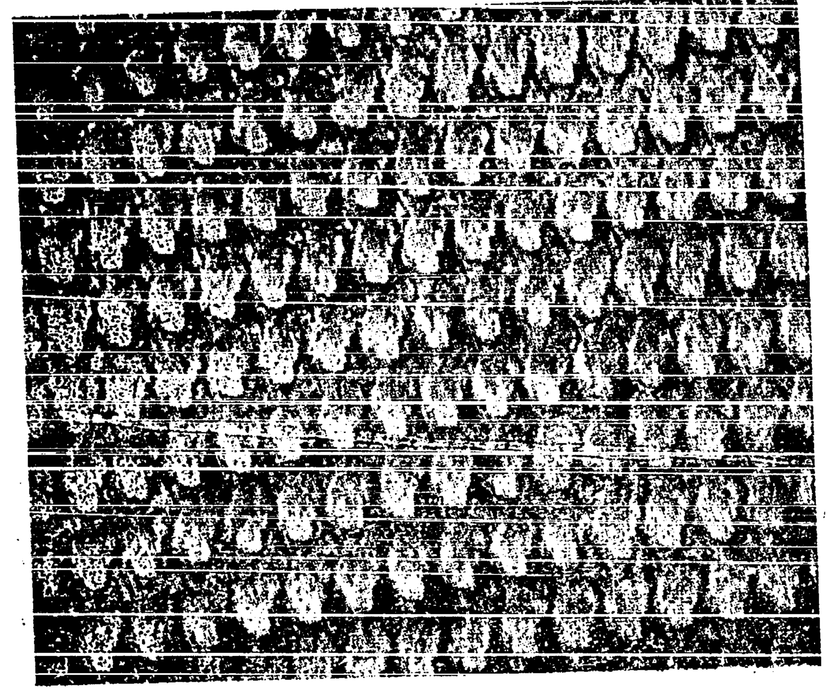

শামুকের (গুগ্‌লির) দাঁত

একটা শামুক (গুগ্‌লি) আর দেখিতে কত বড়? তাহার যে আবার দাঁত থাকিতে পারে, তাহা আমাদের মনেই আসেনা। ছবিতে দেখ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া সেই শামুকের দাঁতগুলিকে কেমন প্রকাণ্ড দেখা যাইতেছে। একটা মাকড়সার ঠ্যাং লইয়া যদি অনুবীক্ষণের নীচে বসাইয়া দাও তবে মনে হইবে যেন একটা গরু বাঁধিবার মত মোটা দড়ি পড়িয়া আছে। আসল মাকড়সাটা যে কত বড় দেখাইবে তাহা নিশ্চয়ই আন্দাজ করিতে পারিতেছ। একটা আল-পিনের সরু মুখকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ধরিলে বেশ একটা মোটা কলম বলিয়া ভুল করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়! মশার হুল, প্রজাপতির জিভ প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষও বেশ পরিষ্কার ও বড় হইয়া দেখা দিবে।

নীচে আর একখানা ছবি দেখ। এখানা তোলা হইয়াছে একটা খুব দামী মাইক্রসকোপের সাহায্যে, ছবিখানা কিসের বলতো ? মাছির চোখ, তারও আবার খানিকটা অংশ মাত্র, সবটা নয়। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে মুখের

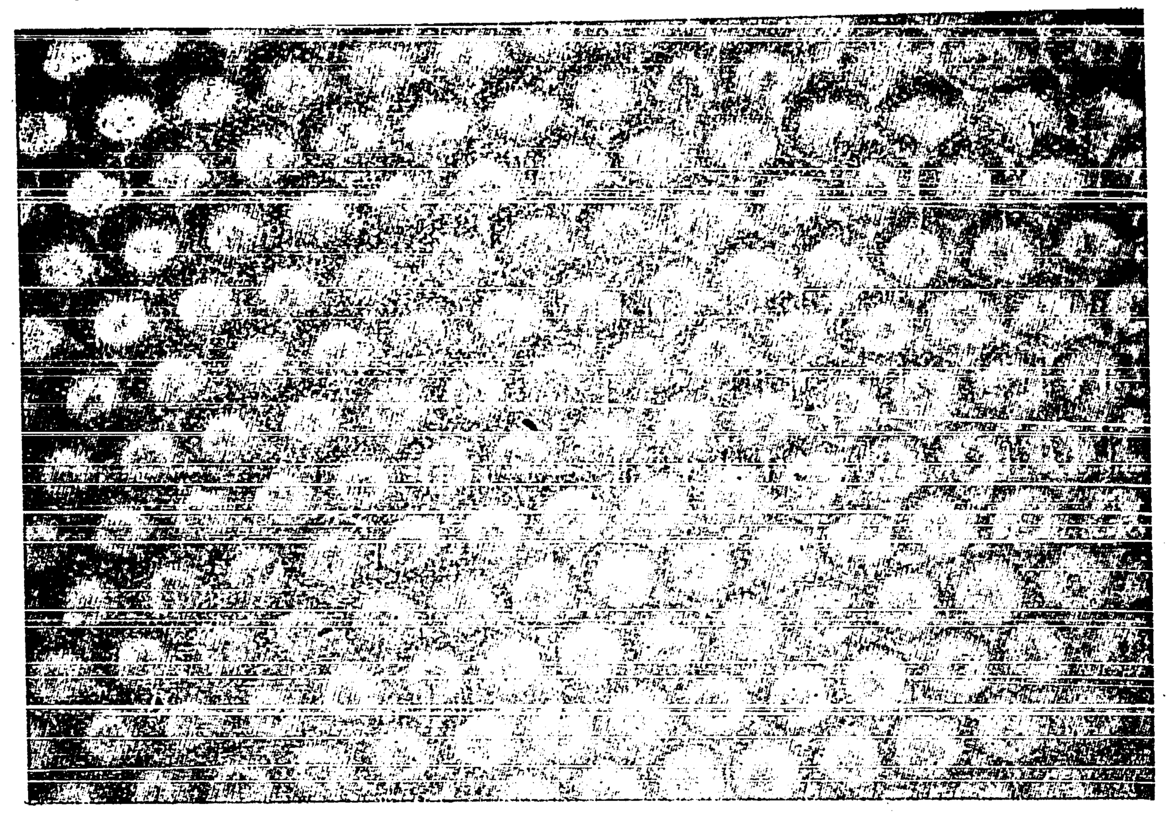

মাছির চোখ

কাছে মাছি ভন্ ভন্ করিলেও হাত দিয়া তাহাদের ফস্ করিয়া ধরিয়া ফেলা অত শক্ত কেন ? গোটা দুই চোখ থাকিলে বরঞ্চ কোন রকমে ফাঁকি দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু অতগুলি চোখ এড়াইয়া কাজ হাঁসিল করা কি সহজ কথা ? আমাদের চোখ যদি ঐ রকম হইত, তবে একজন লোকের দিকে তাকাইলে তাহাকে কেমন দেখিতাম জান ? পরপৃষ্ঠার ছবিখানা দেখ। চারিদিকেই কেবল মানুষের মুখ। মাছি ও একজন লোককে ঠিক ঐ রকম দেখে ; কাজেই থাকেও তেমনি সাবধানে।

তাই বলিয়া মনে করিওনা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে শুধু এই রকম মজার মজার জিনিষ দেখিবার জন্য ! মাইক্রস্কোপের সাহায্যে আমরা আমাদের চোখের আড়ালের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারের সন্ধান পাইয়াছি ; আর ধরিতে

গেলে তাহার উপরেই ভিত্তি বসাইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের আশে পাশে অসংখ্য জীবাণু দিবারাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া সেগুলি চিনিয়া লইয়াছেন, আর তাহাদের কোন্‌টার কি দোষ কোন্‌টার কি গুণ, কোন্‌টাকে নষ্ট করিতে হইবে, কোন্‌টাকে কি কাজে লাগাইতে হইবে, সব ঠিক করিয়া লইয়াছেন। আজকাল যে চিকিৎসাবিদ্যার এত উন্নতি তাহা ত' অনেকটা ইহারই জন্য। শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞান নয়, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, যাহাই বলনা কেন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার না হইলে ইহাদের অনেকটাই পাওয়া যাইত না।

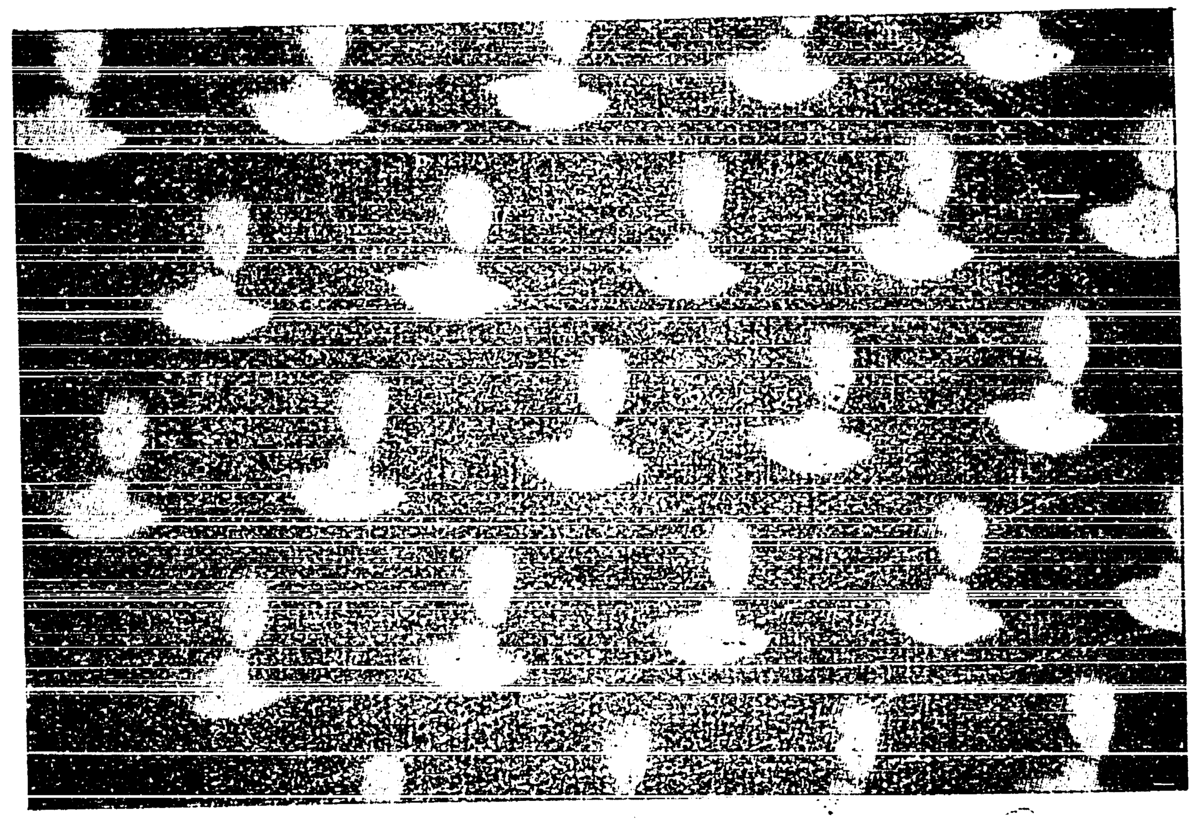

মাছির মত চোখ হইলে কেমন দেখাইত

আজকাল আমেরিকার পণ্ডিতেরা এক অদ্ভুত কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের চারিপাশে যে অসংখ্য জীবাণু ভাসিয়া বেড়ায়, তাঁহারা সেগুলি শুধু দেখিয়া লইয়াই থামেন নাই, তাহাদের গতিবিধি জীবন-যাত্রা সব তাঁহারা খুঁটিয়া বাহির করিয়াছেন, আর বায়স্কোপের ছবিতে সেগুলি তুলিয়া লইয়াছেন।

জীবাণু কেমন করিয়া জন্মায়, কেমন করিয়া বড় হয়, কি কি কাজ করে, এখন হইতে সে সব আমাদের চোখের সম্মুখে দেখা যাইবে, ঠিক যেমনটি আসলে হয় তেমনি! তখন আর তাহারা অদৃশ্য জগতে থাকিবে না।

বৈজ্ঞানিকের একটি চোখের কথা আজ তোমাদের বলিলাম। আর একটি কি বলতো? সে কথা তোমাদের আর একদিন বলিব।

খোকা খুকুর গান

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ)

১

না থাক্‌তাম আমরা যদি, ব্যাপারটা কি হত!
ঝুমঝুমি আর কাঠের পুতুল আদর কোথা পে'ত?
দেশটা শুধু জুড়ি
রইত জুজুবুড়ী
ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিশী কোথায় আহা যেত?

২

ভাঙ্‌তো কে হায় নানান্ জিনিষ, কাট্‌তো কে হায় হাত?
কে করিত কেঁদে কেঁদে ভবন খানা মাৎ?
ঘরের মাঝে খেলা
জম্‌তো দুপুর বেলা
টুম্‌টুমিটির বাগ্যে কাহার, দেবতা থতমত?

৩

ধরতো কে হায়, ক্ষণে ক্ষণে, এমন করে খোট?
কে কুড়াতো আনন্দেতে এম্নি 'হরির লোট'?

কাহার রাঙ্গা লাঠি
ঘুরতো পরিপাটী,
গুরু লঘু ভেদ না করি চলতো অসংযত?

৪

পূজার সময় পরতো কারা রঙীন রঙীন সাজ?
টিপ্ কাজলে ভূষিত হয়ে আনাগোনাই কাজ!
শানাই বাঁশীর স্বরে
নাচতো পুলক ভরে,
হাতে হাতে সিঁড়ির লাড়ু ফিরতো অবিরত।

৫

কা'রা দিত হামাগুড়ি, হাঁট্‌তো পাটা পাটা?
কা'রা বিনা ধরাখানা একেবারেই মাটী?
ভাঙ্গা কথার দর
নামতো ধরাধর,
কাকাতুয়ার মুখটী হোত পেঁচার মত নত!

৬

ব্যাপারটা কি হোত ভেবেই উঠছে হাসির ঢেউ,
চাঁদা মামার টিপ্ নিতে আর থাক্‌তো না যে কেউ!
'দাদু' তামাক খেয়ে
থাকতো উদাস চেয়ে,
কা'দের সাথে কইত তাহার মনের কথা যত?

অকৃতজ্ঞ

(মহাভারত হইতে)

এক ভয়ানক বন, কোনও মানুষজন সেখানে থাকে না। যেই বনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এক মুনি। মুনি ফলমূল খান, পড়াশুনা করেন আর ধ্যানে থাকেন। এত যে বনের দুষ্ট দুষ্ট জন্তু, মুনির ভাবগতিক দেখিয়া সবাই বশ হইয়া গেল। দুষ্ট বাঘ, পাগ্‌লা হাতী, গণ্ডার, ভালুক এরা যে এত দুরন্ত, মুনির কাছে কোন দুরন্তপনাই দেখাইত না। কাছে আসিত, মুনির ভালমন্দের খবর লইত, আবার চলিয়া যাইত —যেন সব শিষ্য।

মুনির আশ্রম

মুনির আশ্রমে আসিয়া জুটিল এক পোষা কুকুর। সেও ফলমূল খায়, মুনির মত উপবাস করে, শান্ত-ভাবে থাকে—এ রকম কুকুরের গায়ে আর কতই জোর হইবে? কুকুরটা মুনিকে বড়ই ভক্তি করিত, তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া থাকিত, এদিক্ ওদিক্ মোটেই চলিয়া যাইত না। মুনিও কুকুরটার ভক্তি দেখিতেন আর তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। একদিন হইল কি—এক ছোট্ট দুষ্ট

বাঘ রক্তের আশায় হাঁ করিয়া মুনির আশ্রমের দিকে আসিল। ক্ষুধায় তাহার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতেছিল, সে জিভ্ দিয়া নিজের ঠোঁট চাটিতে-ছিল, আর লেজটা নাড়িতেছিল। তাহাকে দেখিয়া কুকুর ভয়ে মুনির কাছে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর, ঐ দেখুন, কুকুরের মহাশত্রু বাঘ আমাকে মার্‌তে আস্‌ছে। আপনি তো সবই জানেন। এখন আমাকে বাঁচান।"

মুনি সকলের মনের ভাবই বুঝিতেন। তিনি বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। তুমি কুকুরের চেহারা ছাড়, ঐ বাঘের মত হও।" মুনির জপতপের জোর এমনি যে এই কথা বলামাত্রই কুকুরটাও হইয়া গেল ঐ রকমের বাঘ। তাহার শরীরের রংটা হইল সোণার মত, আর কোথায় চলিয়া গেল তাহার ভয়! বাঘটাও দেখিল—সেও যা এও তাই, তখন আর তাহার কুকুরকে খাবার ইচ্ছা থাকিল না। খানিক পরে এক ভয়ানক মস্ত বাঘ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার রক্ত খাওয়ার ইচ্ছাটা তখন খুব, কারণ তাহার খুব ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে আসিল হাঁ করিয়া নিজের জিভ্ চাটিতে চাটিতে। কুকুর তখন ছোট বাঘের চেহারা পাইয়াছে,বড় বাঘকে দেখিয়া তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। সে আবার মুনির নিকট আসিয়া তাঁহার আশ্রয় চাহিল। মুনি তাঁহার নিজের তপস্যার জোরে এবার ঐ কুকুরকে বড় বাঘ করিয়া দিলেন। যে বাঘটা তাহাকে খাইতে আসিয়াছিল, সে যখন দেখিল এ ও নিজেদেরই একজন, তখন আর তাহার উহাকে মারার মতলব থাকিল না।

কুকুর প্রথমে হইল ছোট বাঘ, তার পরে হইল বড় বাঘ। বড় বাঘ হওয়ার পর তাহার প্রকৃতিটাও বড় বাঘের মত হইয়া গেল। এখন আর ফলমূল মুখে রোচে না, মাংস চাই। বনে কত জীব জন্তু ছিল; সে ঐগুলি ধরিত আর খাইত।

একদিন ঐ বাঘ (আগে যে কুকুর ছিল) জীবজন্তু মারিয়া তাহাদের রক্ত মাংসে বেশ করিয়া পেটটা পূরিয়া মুনির কুঁড়ের সামনে আরামে শুইয়া আছে এমন সময় সেখানে প্রকাণ্ড এক পাগলের মত হাতী আসিয়া উপস্থিত। তার মস্ত মস্ত দাঁত আর কি মেঘের মত প্রকাণ্ড শরীর! কুকুর যে এত বড় বাঘ

হইয়া পড়িয়াছিল, সেও এই প্রকাণ্ড হাতীকে দেখিয়া ভয় খাইয়া গেল। সে আবার মুনির দয়া চাহিল। মুনি এবার তাহাকেও হাতী বানাইয়া দিলেন। যে হাতীটা আসিয়াছিল সে দেখিল এ আবার কি,—এ যে আর এক প্রকাণ্ড মেঘের মত হাতী! সে ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল।

হাতীর শরীর পাইয়া কুকুর তো ভারী খুসী। সে পদ্মবন ওলট্ পালট্ করে আর বেশ সুখে দিন কাটায়।

তার পর একদিন আসিল এক ভয়ঙ্কর সিংহ। কী বড় বড় কেশর তার মাথায়, যেন টাট্‌কা পর্ব্বতের গুহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। আমাদের হাতী মহাশয়ের তো তাহাকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপুনী আসিল। তিনি আবার আসিলেন মুনির নিকট। মুনি তাহার দুরবস্থা দেখিয়া তাহাকেও সিংহ করিয়া দিলেন। তখন সিংহে সিংহে দেখা—যে সিংহটা দূর হইতে আসিয়াছিল সে দেখিল এও তো কম জানোয়ার নয়, তাহার মনে ভয় হইল। সে আর উহার কিছু করিল না। এদিকে মুনি ঠাকুরের সিংহ সিংহের মতই চলাফেরা করিতে লাগিল। বনে যে সকল ছোটখাটো জানোয়ার ছিল তাহারা উহাকে দেখিয়া এদিক্ ওদিক্ চম্পট দিতে লাগিল।

তার পর একদিন বন হইতে এক ভারী জোরদার শরভ * আসিয়া উপস্থিত। তাহার আটটা পা, চক্ষু উপরের দিকে—শরভের ইচ্ছা সিংহটাকে মারিয়া ফেলে। মুনি সমস্ত দেখিয়া তাহার সিংহকেও শরভ করিয়া দিলেন। যে শরভটা আসিয়াছিল সে দেখিল এখানকার শরভ আরও জোরদার, আরও ভয়ঙ্কর। ভয়ের চোটে সে তো দেছুট্।

কুকুর এই রকমে ক্রমে ক্রমে শরভ হইয়া দাঁড়াইল, আর মহাসুখে থাকিতে লাগিল সেই মুনির কাছে। অন্য যত সমস্ত জানোয়ার ছিল, তাহাদের এত ভয় হইয়া গেল যে তাহারা ঐ তপোবন হইতে এদিক্ ওদিক্ চলিয়া গেল। শরভ

* অনেক প্রাচীন পুস্তকে শরভ নামে প্রকাণ্ড জানোয়ারের কথা পাওয়া যায়।

কি আর বনের ফলমূল খায়? সে যে জানোয়ার পাইত তাহাকেই মারিয়া মাংস দিয়া নিজের কাজ সারিয়া লইত। তাহার রক্তের তৃষ্ণা এত বাড়িয়া গেল যে একদিন মনে করিল, এই মুনিকেই মারিয়া খাই। মুনি যে তাহার এত উপকার করিয়াছেন, সে কথা থাকিল চাপা পড়িয়া। মুনি তো আর যে সে মানুষ ছিলেন না। জ্ঞানের জোরেই তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তার পরে বলিলেন, "ওরে দুষ্ট, তুই তো ছিলি কুকুর, আমি তোকে করলাম প্রথমে ছোট বাঘ, তার পরে বড় বাঘ, তার পর হাতী, তার পর সিংহ, তার পর শরভ; তোর যত উন্নতি আমা হ'তে, তোর কোন ক্ষতি আমি করিনি, আর তুই কিনা খেতে চাস্ আমাকে? যা, তুই এখনি আবার কুকুর হ।" যে কথা সেই কাজ—শরভ মহাশয় যে কুকুর ছিলেন, মুনির কথা শেষ হইতে না হইতে আবার সেই কুকুর! তাহার মনে অবশ্যই খুব কষ্ট হইল, কিন্তু মুনির মন আর গলিল না। মুনি তাহাকে বকাবকি করিয়া দূর করিয়া দিলেন।

শনিবার! শনিবার!!

(শ্রীমাঠব্য)

শনিবার, শনিবার, আয় ছুটে অনিবার,
মন যেরে পড়ে থাকে, শুধু তোরে গণিবার—
একটা বাজিয়া গেলে, কোন মতে ভাইরে,
আহ্লাদে ভাবি বুঝি' আমি আর নাইরে—
এক সাথে পড়ে মনে কথা লাখে লাখে গো,
বর্শী, ঘুড়ির সূতা, উঁকি দিতে থাকে গো!
মনে পড়ে ঘোষেদের শশা, কলা, বাতাপি,
(পণ্ডিত বলে কিনা মেধা নাই তথাপি!)

... শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম-এ. বি-এল।

রবিবার পারে নারে তোর সাথে যুঝ্‌তে,
তো'তে গাঁথা রবিবার এ কথাটা বুঝ্‌তে
পারে না কো'—থাকে যদি এত বড় হাঁদাটা—
ঝুড়ি ঝুড়ি গোবরেতে ভরা তার মাথাটা!
মোর চোখে, তোর চেয়ে কেউ দাদা বড় না,
আঁধারেতে আলো তুই, মরু-মাঝে ঝরণা—

কোথাকার কি জিনিষ কতখানি মিষ্টি,
কবি দিয়াছেন তার এতবড় লিষ্টি
"পেটুকের ভূগোলে"তে * তোর নাম নাই তো!
কতখানি অবিচার! মনে ভাবি, "তাই তো,
গোল্লা, সে লাগে ভাল হয় যদি নাটোরে,
পাঁচ কোশ দূরে গেলে গুণ তার খাটোরে,
এক ঠাঁই শুধু ভাই, মিঠা সরপুরিয়া—
শনিবার মিঠা যেরে ধরাখানা জুড়িয়া!!"

শনিবার, শনিবার, কি মজার নাম রে!
নিউটনও হেরে যায় কষিবারে দামরে।
কি করিয়া বলি সে যে কতখানি মিষ্টি,
সে-ই শুধু দুনিয়ায় করে সুধাবৃষ্টি!
শ্রীরামের হনুমান্ ছিল সেরা ভক্ত,
আমি হনুমান ভাই, তোর অনুরক্ত।
শুধু এই বর মাগি, শনিবার দাদারে,
পদে তোর মতি মোর থাকে যেন বাঁধারে!

———

* আশ্বিন মাসের 'রামধনু'তে শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "পেটুকের ভূগোল" দ্রষ্টব্য।

বীরবলের গল্প

(শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

১

কথিত আছে আকবর বাদশাহের সভাসদ্ রাজা বীরবল অত্যন্ত চতুর, সুরসিক ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং বাদশাহকেও তিনি দু'কথা শুনাইয়া দিতে ভয় করিতেন না। বীরবলের প্রতি বাদশাহের স্নেহ ও শ্রদ্ধাও অপরিসীম ছিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

একদিন বাদশাহ দরবার বরখাস্ত (সভা বিসর্জ্জন) করিবার সময়, সে কালের প্রথা অনুসারে উপস্থিত পাত্রমিত্রগণ পাণ ও আতর বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় অসাবধানতা বশতঃ এক ফোঁটা আতর নিম্নস্থ গালিচার উপর পড়িয়া গেল। বাদশাহ হঠাৎ ঝুঁকিয়া, সেই আতরের ফোঁটাটি আঙুলে মুছিয়া তুলিয়া লইলেন। তুলিয়াই রাজা বীরবলের

দিকে তাঁহার নজর পড়িল। বীরবল মস্তক নত করিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিলেন।

সভাভঙ্গের পর বাদশাহ বিশ্রামস্থানে গেলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরে এই কথাটাই ক্রমাগত খচ্‌ খচ্‌ করিতে লাগিল—"কেনই বা আমি নেহাৎ কঞ্জুষের মত সে আতরের ফোঁটাটুকু তুলিতে গেলাম! একজন গরীব লোক যে আতর কখনও চোখে দেখে নাই, সে ওরূপ করিলে সাজিত। কিন্তু আমি দুনিয়ার মালিক আকবর বাদশা হইয়া—ছি ছি বড়ই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। বীরবল দেখিয়াছে—একদিন নিশ্চয়ই সে ইহা লইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিবে।"

এই ত্রুটিটুকু সারিয়া লইবার মানসে, পরদিন বাদশাহ হুকুম দিলেন, "রাজবাড়ীর সাম্‌নে ঐ যে জলের হাউজটা আছে, উহা খালি করিয়া, উৎকৃষ্ট আতরে ভর্ত্তি করিয়া দাও—এবং সহরে ঢোল দাও যে, বাদশাহ প্রজাদের জন্য আতর-সত্র খুলিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে আসিয়া ঘটি বাটী কলসী ভর্ত্তি করিয়া আতর লইয়া যাইতে পারে।"

ঘড়া ঘড়া আতর ঢালিয়া সেই প্রকাণ্ড হাউজ ভর্ত্তি করা হইল। দুই তিন ঘণ্টা মধ্যে, হাজার হাজার লোক আসিয়া, ঘটি বাটি কলসী ইত্যাদি ভরিয়া সেই মূল্যবান আতর সমস্তটা লুটিয়া লইয়া গেল।

আকবর বাদশাহ বীরবলকে সঙ্গে লইয়া এই আতর-লুট দেখিতেছিলেন, শেষ হইলে বলিলেন, "রাজা, কেমন আনন্দ হইল বল দেখি ?"

বীরবল উত্তর করিলেন "জাঁহাপনা, হাউজ দিয়া কি বিন্দু ঢাকা যায় ?"

শুনিয়া বাদশাহের মনে বড়ই ক্রোধের উদয় হইল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বীরবল, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাহি না। তুমি দূর হও। তোমার ধনসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিবে,—ইহাই তোমার দণ্ড।"

"যো হুকুম জাঁহাপনা"—বলিয়া কুর্ণিশ করিয়া বীরবল প্রস্থান করিলেন।

২

বীরবল নির্ব্বাসিত। তাঁহার রাজ্য, ধনসম্পত্তি সমস্তই বাদশাহের আদেশে বাজেয়াপ্ত।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে বাদশাহের রাগ পড়িয়া আসিল। তখন তাঁহার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। "আহা, কেন তাহাকে তাড়াইলাম ? বড় ভাল লোক ছিল,—যেমন রসিক, তেমনি বুদ্ধিমান্। বড় আনন্দেই তাহার সহিত কাল কাটাইতাম। কেন তাহাকে তাড়াইলাম ?"

বাদশাহ প্রতিদিনই বীরবলের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দেশে দেশে গুপ্তচর পাঠাইলেন—সন্ধান পাইলে নিজে গিয়া তাঁহার মান ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবেন।

দুই মাস গেল, চারি মাস গেল, ছয়মাস গেল, কিন্তু বীরবলের কোন সন্ধানই নাই। অবশেষে বাদশাহ স্থির করিলেন, একটা কৌশল করিয়া দেখিবেন। হুকুম দিলেন, "আমার অধীনে যত বড় বড় সামন্তরাজ আছে, তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত কর।"—তালিকা প্রস্তুত হইল, ৫০ জন সামন্তরাজের নাম তাহাতে লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর বাদশাহ হুকুম দিলেন, "৫০টা মেড়া খরিদ করিয়া আন।"

মেড়া খরিদ হইল। তখন নিম্নলিখিত পরোয়ানা সহিত, ঐ ৫০ জন সামন্ত-রাজের প্রত্যেকের নিকট এক একটা মেড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পরোয়ানা

আকবর বাদশাহ এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম করিতেছেন, রাজকর্ম্মচারীর সহিত প্রেরিত মেড়াটি এক মাসকাল তুমি প্রতিপালন করিবে। ইহাকে প্রত্যহ চারি সের পরিমাণ উৎকৃষ্ট দানা খাইতে দিবে। যে রাজকর্ম্মচারী ইহা লইয়া যাইতেছে, সে নিজ তত্ত্বাবধানে মেড়াকে দানা খাওয়াইবে। একমাস পরে মেড়াটি রাজধানীতে ফেরৎ পাঠাইবে, কিন্তু সাবধান, বর্ত্তমানে ইহার দেহের ওজন যাহা

আছে, ঠিক সেইরূপ থাকা চাই। যদি এক তোলা পরিমাণও ওজন ইহার বৃদ্ধি পায়, তবে তোমার লক্ষ টাকা জরিমানা হইবে। প্রকাশ্য দরবারে এই মেড়ার ওজন করা হইল......মণ......সের......পোয়া......ছটাক......কাঁচ্চা।"

—অর্থাৎ, যে মেড়া যে রাজাকে পাঠানো হইতেছে,—সেটার কত ওজন, তাহা সেই রাজার নামীয় পরোয়ানায় লিখিত হইল।

এই মেড়া ও পরোয়ানা পাইয়া, রাজ্যে রাজ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল, প্রত্যহ চারি সের উৎকৃষ্ট দানা খাইয়াও মেড়ার ওজন বাড়িবে না,—ইহা ত' অসম্ভব কথা। কেহ কেহ বলিল, "ইহা কেবল টাকা আদায়ের ফন্দি, আর কিছু নয়। তার চেয়ে খোলাখুলি পরোয়ানা দিলেই হইত, এক লক্ষ টাকা আমায় পাঠাইয়া দাও।"

৩

বীরবল রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, যে সামন্ত রাজার সীমানার মধ্যে গিয়া ছদ্মবেশে ও ছদ্ম নামে বাস করিতেছিলেন, সেই রাজার নিকটও রাজকর্ম্মচারি-সহ একটি মেড়া ও পরোয়ানা গিয়া পৌঁছিল। সে রাজা কিছু অমিতব্যয়ী ছিলেন, ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এই পরোয়ানা পাইয়া তিনি ত' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "তাই ত, একে এই টানাটানি,—একমাস পরে এক লক্ষ টাকা পাই কোথা ? কি ফেসাদেই পড়া গেল, ছি ছি।"

লোকমুখে বীরবলও এই ব্যাপার অবগত হইলেন। তখন তিনি চাপকান পাগড়ী ইত্যাদি পরিধান করিয়া, রাজবাড়ী গিয়া, রাজার সহিত দর্শন প্রার্থনা করিলেন।

রাজার নিকট গিয়া তাঁহাকে আশির্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, শুনিলাম আপনি নাকি মহা এক মেড়া-সমস্যায় পড়িয়াছেন ?"

"হাঁ, সমস্যা নয় ত' আর কি ?"

"আমি আপনার একজন দীন প্রজা। যদি আদেশ করেন আমি সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারি।"

"তাহা হইলে ত' বাঁচি। কি সমাধান ? বল বল!"

"মহারাজের চিড়িয়াখানা আছে, তাহাতে কতকগুলি বড় বড় খাঁচায় বড় বড় বাঘ আবদ্ধ আছে দেখিয়াছি। সেই একটা বাঘের খাঁচার কাছে মেড়াটাকে বাঁধিবার হুকুম দিন। এক মাস ও মেড়া সেই খানেই বাঁধা থাকিবে। চারি সের কেন, যত খাইতে পারে দানা উহাকে দিবার আদেশ করিয়া রাখুন।"

এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য হইল।

মাসান্তে রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব জিম্মার মেড়া লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মেড়াগুলি একে একে আবার ওজন করা হইল। সেগুলির ওজন কাহারও দশ সের, কাহারও বিশ সের, কাহারও একমণ বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল একটি মেড়া, অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার ওজন প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

বাদশাহ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এ মেড়াটী এমন কাহিল হইয়া গেল কেন ? ইহাকে চারি সের দানা কি রোজ দেওয়া হইত না ?"

কর্ম্মচারী হাতযোড় করিয়া বলিল, "চারি সের কেন জাঁহাপনা, ৫।৬ সের দানা ইহাকে প্রত্যহ দেওয়া হইত। কিন্তু তাহার সিকি ভাগও এ খাইত না। খাইবে কি—ইহাকে একটা মস্ত বাঘের খাঁচার সামনে এই একমাস বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটা যখন তখন ইহাকে দেখিয়া গর্জ্জন করিত, লোলুপ নেত্রে ইহার পানে চাহিয়া, জিভ্ বাহির করিত, সে জিভ দিয়া টস্‌টস্ লালা ঝরিত। মেড়া দানা খাইবে কি, ভয়েই কাঠ হইয়া থাকিত। আতঙ্কে আতঙ্কে দিন দিনই রোগা হইতে লাগিল।"

বাদশাহ বলিলেন, "কে এ রকম করিতে সে রাজাকে পরামর্শ দিয়াছিল জান ?"

"শুনিয়াছি তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ * প্রজা তাঁহাকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিল।"

* প্রবাদ এই যে, রাজা বীরবল কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইহা শুনিয়া বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, সে ব্রাহ্মণ আর কেহ নয়, সেই বীরবল। নহিলে এত বুদ্ধি কার ?

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজ্যে একজন দক্ষ গুপ্তচরকে পাঠাইয়া দিলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বীরবলই নাম ভাঁড়াইয়া সেখানে বাস করিতেছেন। তিনিই রাজাকে পরামর্শ দিয়া মেড়াকে বাঘের খাঁচার সমুখে বাঁধাইয়াছিলেন।"

বাদশাহ বলিলেন—"সে আমি আগেই বুঝিয়াছি।"

তার পর বাদশাহ হাতী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজোচিত সমারোহে সেই রাজ্যে যাত্রা করিলেন এবং, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, মহা সমাদরে বীরবলকে ফিরাইয়া আনিলেন। বলা বাহুল্য, বীরবল তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন।

ক্ষমা

(শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর)

সাগর-তলের কীটে যখন
শুক্তি-গায়ে ছিদ্র করে,
শুক্তি তাহা বুজায় ক্রমে
মুক্তা-কণিকায়,
আততায়ী যদি তোমার
মর্ম্মহৃদয় বিদ্ধ করে,
ক্ষতির ক্ষত ঘুচাও [illegible]ব
ক্ষমার মহিমায়।

রামধনুর পরিচালকগণ ও কয়েকটী বন্ধু

পিছনের সারি (বাঁ দিক্ হইতে ডানদিক)—অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত (রামধনুর চিত্রশিল্পী), শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল, শ্রীবীরেন্দ্রবিজয় পাঠক। মাঝের সারি (বাঁ দিক্ হইতে)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, রামধনু-সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নীচের সারি (বাঁ দিক্ হইতে)—শ্রীতারককিঙ্কর মুখোপাধ্যায় (কার্য্যাধ্যক্ষের সহকারী), শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এল্ (প্রেস-ম্যানেজার), কুমারী প্রতিভা দেবী, শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য (কার্য্যাধ্যক্ষ), শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল।

পূজার গল্প

(শ্রীহীরণ্ময় ঘোষাল)

জ্যেঠামশাই থাকেন লাহোরে, কাকা থাকেন আগ্রায়, টুটু, মিনু, এরা সব কলকাতাতেই বাবার কাছে থাকে, পড়াশুনা করে।

কাকা জ্যেঠামশাই দু'জনেই সেই যে দু' বছর আগে দিদির বিয়ের সময় এসেছিলেন, তারপর আর কোনও খোঁজ-খবরই নেই। টুটু, মিনু, দু'জনেই জেদ্ ধরেছে—হয় তারা এবার পূজোর সময় আগ্রা থেকে কাকাকে নিয়ে লাহোরে জ্যেঠামশাইয়ের কাছে যাবে, আর না হয়, কাকা, জ্যেঠামশাই, দু'জনেরই এবার কল্‌কাতায় এসে পূজোর ছুটি কাটাতে হবে।

জ্যেঠাইমাও নেই, কাকীমাও নেই, কাজেই কাকা, জ্যেঠামশাই, এঁদের আর ঝঞ্ঝাট্‌টা কি! বেয়ারার কাছে বাড়ীর জিম্মা দিয়ে, ব্যাগ হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়া বই ত নয়! বাবার কথায় টুটু,মিনু,দুজনেই রাজী হয়ে গেল—তারা আজই চিঠি লিখে দেবে। জ্যেঠামশাই আর কাকা দু'জনেই যা চমৎকার চমৎকার গল্প বলেন!—তাঁদের সব ছেলেবেলাকার কীর্ত্তি! বাবা যেন গুরুমশাই—কেবলই পড়া ছাড়া মুখে আর কথাই নেই...শুধু পড়, পড় আর পড়।

চিঠি লেখা হলো, এবার আসা চাই-ই চাই। আর একটা মজার খবর, আমরা দু'জনেই আজকাল সংস্কৃত আর ফরাসী পড়ছি। তার জন্য প্রাইজ আনা চাই—দিল্লী থেকে শাড়ী আর পাগড়ী,আর আগ্রা থেকে নাগ্রা—জরী দেওয়া হওয়া চাই। এবার কিন্তু গল্প টল্প সব ঠিক করে না আসলে চল্‌বে না। অষ্টমীর দিন বোট্যানিক্‌সে ট্রিপ্ দেবো আমরা...বাড়ী থেকে কেক্ কোকো,আর কিশ্‌মিশ্ নিয়ে যাওয়া হবে। আরও যা যা ঠিক করেছি, এলেই জান্‌তে পারবে।...টুটু মিনু।

সপ্তমীর দিন ঘুম থেকে উঠে টুটু আর মিনু দেখ্‌লে, বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। বৈঠকখানায় বসে জ্যেঠামশাই আর কাকা হৈ হৈ ক'রে হাস্‌ছেন।

জ্যেঠামশাইয়ের মাথায় ধব্‌ধবে কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, কাঁধ পর্য্যন্ত—ধব্‌ধবে দাড়ী—চোখে প্যাঁসনে চশমা—পরনে কাল রঙের আলখাল্লা। কাকার মাথায় কুচ্‌কুচে কালো ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল, গোঁফ-দাড়ী কামানো, পরনে সিল্কের পায়জামা আর উর্দ্দী।

চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘরে ঢুক্‌তেই জ্যেঠামশাই ফরাসী কায়দায় মাথা নীচু ক'রে 'আইয়ে আইয়ে' ভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন, "লে ভোয়ালা বঁ জুর মঁস্যো এ মাম্‌জেল্।" (মানে—আরে আরে নমস্কার, মশাই, এবং মহাশয়া) বলেই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। কাকা বল্লেন—"আস্যাই-য়ে ভু, সিল্ ভু প্লে"—(মানে বস্‌তে আজ্ঞা হোক্)—আবার দুজনেরই হৈ হৈ ক'রে হাসি। টুটু মিনু ব'ল্লে, "ম্যার্সি—(ধন্যবাদ)—কিন্তু গল্প-টল্প সব তৈরী ক'রে আসা হয়েচে ?" "আরে, স্যাংর্ (নিশ্চয়ই)…তা না হ'লে কি আর ভরসা ক'রে এসেছি ?" "আচ্ছা, দেখা যাবে তখন !"

টুটু মিনু চুপি চুপি জ্যেঠামশায়ের কাণে কাণে বল্‌লে, "কিন্তু, বাবা এ পূজোর ক'দিনও ছুটি দেবেন না বলেচেন। মাষ্টারমশাইকেও আস্‌তে ব'লে দিয়েছেন। কেবল পড়ো আর পড়ো !"—জ্যেঠামশাই বাবাকে এক ধমক্ দিয়ে বল্লেন, "হ্যাঁরে বীরু, তুই কি মনে ভেবেছিস, তোর মাথার ওপরে আর কেউ নেই ?—নিজের ছেলেবেলাকার কথাগুলো কি একেবারে ভুলে যাওয়া হ'য়েছে ?"—টুটু মিনু একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো, "না না, এখন ওসব কথা আমরা কিছু শুন্‌তে চাই না, সে সব কাল্‌কে বোট্যানিক্‌সে—" জ্যেঠামশাইয়ের হাসির চোটে, ঘরখানাই বুঝি পড়ে যায়—চা খেতে খেতে কাকার বিষম লাগে।

সেদিন বসে বসে টুটু, মিনু কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে এক প্রোগ্রাম ক'রে ফেল্‌লে।—বল্‌ছি,—ভোর ৬টায় উঠে, তক্তাঘাট থেকে ৭টা ১৯ মিনিটের ষ্টীমারে চড়ে পৌনে আটটায় বোট্যানিক্‌সে পৌঁছান, আটটা থেকে সাড়ে আট্‌টা, "পেতি দেজোনে" (প্রাতরাশ)—"গাতো" (কেক্)—"শোকোলা" (কোকো) আর "তার্তিন" (টোষ্ট); তারপর আট্‌টা থেকে বারোটা অবধি ঘুরে বেড়ানো,

'চোর-চোর' খেলা, বেঞ্চিতে বসা; তারপর বারোটার সময় ঘাসের ওপর গাছের তলায় বসে "দেজোনে" (মধ্যাহ্ণ-ভোজন);—"ওম্‌লেৎ"—"এোক্ (ডিম্)—"কুতোলেৎ" (চপ্ কাট্‌লেট), "লেগ্যুম্ (শব্জীর তরকারী)—"তার্তিন্"—আর "কাফে নোয়ার" (দুধ না দেওয়া কফি); বারোটা থেকে চারটে অবধি বড় বটগাছের তলায় কারপেট্ বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে, পালা করে জ্যেঠামশাই আর কাকার গল্প; চারটের সময় "গুতে" (টিফিন)—"প্যাঁ" (পাঁউরুটি) আর "তে" (চা)। তারপর পৌনে পাঁচটার ষ্টীমারে বাড়ী ফেরা।

খাওয়ার প্রোগ্রাম টুটু আগে থেকেই তার ফরাসী বই থেকে টুকে রেখেছিল। জ্যেঠামশাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই দিনই প্রায় সব আনানো হয়ে গেল, শুধু টাট্‌কা জিনিষগুলি কাল সকালে আনিয়ে নেওয়া।

পরদিন সকাল বেলা, জিনিষপত্র, শ্রীমন্তর ঘাড়ে চাপিয়ে ঠিক সময় মত বোট্যানিক্‌সে এসে হাজির হয়ে তাদের যা আনন্দ !

বোট্যানিক্‌সে দেখবার জিনিষ যে কত তার ইয়ত্তা নেই। কত রকমের নানা জাতের গাছ, লতা, ফুল—সবার তলায় তলায় টিকিটের ওপর তাদের নাম। গাছে গাছে ছায়া করা পথ, সবুজ মাঠ, জঙ্গল, পুকুর, ঝিল্—ঝিলে ঝিলে পদ্ম, শালুক। সব বাগানটাই যেন ছবি ! সব থেকে সুন্দর হচ্ছে, এমন চমৎকার ভাবে কেয়ারী করা, যে মনেই হবে না বাগান,—দেখ্‌লে মনে হবে এমনটিই বুঝি ভগবান্ তৈরী করেছিলেন। চার ঘণ্টা কেন, সবটা দেখ্‌তে হলে, সমস্ত প্রোগ্রামে কুলোবে না। কিন্তু অমন চমৎকার চমৎকার ফুলের নামগুলো কি বিশ্রী !—"ড্যাণ্ডিলিয়ান্," "গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা—নাম শুন্‌লে যেন ফুল ব'লেই মনে হয় না।

সাড়ে আট্‌টায় "পেতি দেজোনে" সেরে বারোটার মধ্যে কত জিনিষই দেখ্‌তে বাকী রইল ! ঘড়ি দেখে জ্যেঠামশাই বল্লেন, "দেজোনের" সময় হয়েছে কিন্তু।" গাছ দেখে, প্রজাপতি ধ'রে, টুটু মিনুর খেয়ালই ছিল না, খাবার কথা। গাছের তলায় খানিক জিরিয়ে নিয়ে দেজোনে সার্‌তে সার্‌তে ১॥০টা বেজে গেল। অবশ্য এতে জ্যেঠামশাইএর দুষ্টুমী ছিল। একটি মাত্র ত' গল্প তৈরী করে

এসেছেন—তা দিয়ে ত আর ৩৷৪ ঘণ্টা চল্‌বে না ! খাওয়া শেষ হতে না হতেই টুটু মিন্নু ধরে বস্‌লো, "এইবার গল্প ।"

জ্যেঠামশাই কাকার দিকে চেয়ে বল্লেন,"হ্যাঁরে তোর অবিনাশ বুড়োকে মনে পড়ে ?—না, কি করেই বা পড়বে, তোর তখন জ্ঞান হয় নি। শোন সব মন দিয়ে। আমরা তখন ছেলে-ছোক্‌রার দল, হুগ্‌লী কলেজে ফার্ষ্ট্‌ কি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। এই যে শাদা শাদা চুল আর দাড়ী দেখ্‌ছো, এ সব ছিল কালো। যাক্‌—গ্রামে থাক্‌তুম, আমাদের সে দলের ছিল সবাই একএকটী হনু-মূর্ত্তি ; পড়াশুনোয় মন টন ত ছিলই না—তার ওপর নানান্‌ রকম দুষ্টুমী বুদ্ধি। টুটু মিন্নু এরা ত হীরের টুক্‌রো ছেলে মেয়ে।

যাক্‌, হঠাৎ একদিন মুখুয্যেদের পুরানো পোড়ো বাড়ীতে পিদিম জ্বলতে দেখা গেল। আমরা জ্ঞানভোর ওটাকে ভূতের বাড়ী বলেই জান্‌তুম। শোনা গেল, মুখুয্যেদের একমাত্র বংশধর অবিনাশ বাড়ী-ঘর ছেড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োরদের সঙ্গে লড়াই করতে, তার পর বহুৎ দিন তার কোনও খোঁজই পাওয়া যায় নি। সেই অবিনাশ মুখুয্যে কোথা থেকে বুড়ো বয়সে তার বংশে বাতি দেবার জন্যই ফিরে এসেছে। বয়েস বছর পঞ্চাশ হবে—দাঁত কটী নেই বলেই মনে হয়। গ্রামে এসে তার কথার চোটে সবাই অস্থির—সব সময় ফিরিঙ্গী সেজে, রাইডিং বুট পরে, পাইপ মুখে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—মুখে ইংরাজী বুলি, সরু করে গোঁফ্‌ পাকানো—কে বল্‌বে, বাংলা দেশেরই এক ব্রাহ্মণ-বংশে এর জন্ম ? এসেই ত লম্বা লম্বা কথা, এ করেছি, সে করেছি, এই এক নিগ্রোর দলের সঙ্গে কি ভীষণ মারামারি, এই এক সিংহের সঙ্গে কি রকম হাতাহাতি—এই এক প্রকাণ্ড হিংস্র সাপকে কেমন করে তিনি এক কোপে দুখানা করে ফেলেছিলেন, এই সব।

আমরা বলি ভালোরে ভাল,এর তুম্বীর চোটে যে একেবারে অস্থির ! দেখি কতখানি মুরদ তোমার ! আমাদের মধ্যে সব থেকে ডান্‌পিটে ছিল ন'দা, আমার খুড়তুত ভাই,—বেচারা অল্প বয়সেই মারা গেল—তোমাদের জ্যেঠামশাই, এই

নিনি ভালো মানুষটী সেজে তোমাদের সাম্‌নে বসে বসে দাড়ীতে হাত বুলোচ্ছেন, আর বলাই। বলাই ছিল, মস্ত স্পোর্টস্‌ম্যান্‌—ক্রিকেটে অমন ব্যাটার আর কেউ ছিল না। হুগলী কলেজের হুইলার সাহেব বল্‌তেন, 'দি ট্রিমেণ্ডাস্‌ ব্যাটার' (ভয়ঙ্কর ব্যাটার)। যাই হোক্‌ আমরা ঠিক কর্‌লুম, দেখি কেমন অবিনাশ মুখুয্যে বুয়োরদের সঙ্গে লড়াই করেছে। আমাদের গুরুদেব ছিলেন ছোট কাকা—ইদানীং বয়েস হয়েছিল বলে নিজে আর কিছু করতেন না, তবে যত দুষ্টুমীর পরামর্শ,

এক নিগ্রোর দলের সঙ্গে কি ভীষণ মারামারি

সব তাঁর কাছ থেকে শোনা। তাঁর কাজের মধ্যে ছিল মুগুর ভাজা, কুস্তী করা, খাওয়া আর ঘুমোনো।—সময়ে সময়ে মামলা-মোকদ্দমায় চাষাভূষোদের পরামর্শ দিতেন। দুষ্টুমী কর্‌লে কি হবে, তাঁর প্রাণ ছিল চমৎকার, তাঁর কথা আর একদিন বলব এখন।—যাক, ছোট কাকা বল্‌লেন, 'যে অবিনাশ মুখুয্যেকে ভয় দেখিয়ে অজ্ঞান করে ফেল্‌তে পারবে, তার ভাগ্যে এই পঁচিশ রূপেয়া।' দুনিয়ার

তাঁর থেকে যে আর কেউ সাহসী থাক্‌তে পারে এ কথা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পার্‌তেন না। যাই হোক্, আমরা তিনজনেই তালঠুকে দাঁড়ালুম। ছোট কাকা আমাদের একটা করে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা, মরদ্‌কা বাচ্চা। আজই তা হলে।—কিন্তু মনে থাকে যেন, মারধোর দিয়ে নয়।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

নানান রকম বুদ্ধি আঁটি, একটাও খাটে না। ক্রমে বিকেলও হয়ে আস্‌ছে। এমন সময় ন'দা বল্‌লে, 'ঠিক হয়েছে—বুদ্ধি ঠিক করেছি। কিন্তু ধরা পরলে, ছোটকাকা বলেছেন, এক এক রদ্দা খেতে হবে। খুব সাবধান।' ঠিক হলো, ভূতের ভয় দেখানো হবে। অবিনাশ বুড়ো বহুদিন ইংরিজী কায়দায় থেকেই হোক, আর যাই হোক, একটু নেশা করা অভ্যেস করে ফেলেছিল। কিন্তু যখন পয়সা ছিল, তখন ছিল এক কথা। এখন পয়সা না থাকলেও নেশা তো আর এক কথায় যেতে পারে না। কাজেই বুড়ো ঠিক এগারোটার সময় রোজ বিপিন ভুলের কাছ থেকে সস্তার তাড়ি খেয়ে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে বড় বাঁশ-বাগানটার ভেতর দিয়ে বাড়ী ফিরতো।

বাবা ত দেশেই থাকতেন না। সুতরাং আমাদের আর কি? কিন্তু বলাইয়ের হলো মুস্কিল। সে থাকতো মামার কাছে। যাই হোক্, দম্‌বার ছেলে নয়।—বল্‌লে, ঠিক সময়মত আমি ঠিক জায়গায় হাজির থাকবো।—তার পালা ছিল, বাঁশ-বাগানের শেষে, গ্রামে ঢুকবার পথে বড় আঁটকুড়ো আমগাছটার আগ-ডালে এক কলসী জল নিয়ে বসে থাকা। আমার পালা, মাঝপথে একখানা বাঁশকে নুইয়ে ধরে ওপাশে খানার ভেতর লুকিয়ে বসে থাকা—পথ আট্‌কে।—ন'দা ঠিক করেছিল, একখানা কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে বিকট আওয়াজ করে রাস্তায় একবার এদিক্ আর একবার ওদিক্ ছুটোছুটি করবে।

ঠিক সাড়ে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই আম্‌রা যে যার জায়গায় তৈরী হয়ে রইলুম। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, তার ওপর খানার ভেতর মশার কামড়। সময়

যেন কাটে না। ওদিকে দূর থেকে শুন্‌তে পাচ্ছি; আমগাছের আগা থেকে বলাই গান ধরেছে—

অবিনাশ
কচি ঘাস
খাওরে যাদু—উ—উ—!
তোমায় আজ করবো
কাবু—উ—উ—উ ॥

এমন সময় দূর থেকে শোনা গেল, অবিনাশ বুড়ো মনের আনন্দে ইংরেজ সৈন্যদের 'টি, প্যারেরী' গান ধরেছে। 'টি, প্যারেরী--ঈ--ঈ-ঈ টি, প্যারেরী—ঈ।' বলাইয়ের গান থেমে গেল। আমরা সবাই ঠিক হ'য়ে রইলুম। ন'দার কাছে আস্‌তেই সে কম্বল মুড়ি দিয়ে 'উকু, উকু' করে রাস্তায় ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু সাহেবের খেয়ালই নাই। বল্‌লে, 'ইউ, ড্যাম নেটিভ্ নিগার!' ন'দার কসরৎ মাটী। আমার কাছাকাছি এসে যেন একটু থম্‌কে

মাঝপথে একখানা বাঁশকে নুইয়ে ধরে…

দাঁড়ালে। হাসিতে আমার পেটের মধ্যে তোলপাড় কর্‌ছে। 'চাপ্‌তে গিয়ে প্‌প্ৰুপু' করে এক বিকট আওয়াজ বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফল হল ভালোই। বাঁশের উপর ছড়ি মেরে বল্‌লে 'ইউ, নেটিভ গোষ্ট; আই ড্যান্ ইউ।' কিন্তু গলা কাঁপ্‌ছে। বল্‌তেই হাসির চোটে হাত ফস্‌কে বাঁশটা সাঁৎ করে উপরে উঠে গেল। বাঁশটা উপরে উঠে যেতেই দেখ্‌লুম, সাহেব বেশ একটু জোরে জোরে হাঁট্‌তে সুরু কর্‌লেন,—'টি্‌ প্যারেরী' গান থেমে গেছে। খানিক দূর যেতেই বলাই উপর থেকে ছর্ ছর্ করে জল ঢেলে দিলে একেবারে বুড়োর গায়ের উপর। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না—তার উপর বলাই ছিল মিশ্‌মিশে কালো। গায়ে জল পড়তেই বুড়ো হাতের ছড়ি ফেলে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ কর্‌লে—এমন দৌড় কেউ দেখেনি—যেন রেসের ঘোড়া। আমরাও যে যার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে এক দৌড়ে বাড়ী এসে হাজির। বলাই নিজের বাড়ী গিয়ে একেবারে লেপের তলায়! আমি আর ন'দা খিড়কী দিয়ে বাড়ী ঢুকে দেখি, বৈঠকখানা ঘরে ছোটকাকা হৈ চৈ করছেন—'দেখ ত একবার, বুড়ো মানুষ, রাত্তির বেলা বেরুলো!' চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘুম থেকে ওঠার মত ভারী গলায় বল্‌লুম—'কি হ'য়েছে, কাকামণি?' বাইরে থেকেই অবিনাশ বুড়োর গোঙানী শুন্‌তে পাচ্ছি কি না!—ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলুম—চোখে মুখে জল দিয়ে তার জ্ঞান করা হয়েছে, কিন্তু মাৎলামী কাটে নি। জড়ানো কথায় তিনি বল্‌ছেন—'ও দি নেটিভ গোষ্ট—ব্লাকার ভ্যান্ দি নিগ্রো এণ্ড ফিয়ার্সার ভ্যান দি লায়ন' অর্থাৎ নেটিভ ভূত নিগ্রোর থেকেও কালো এবং সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

পরদিন যে মস্ত ভোজটা হল, তার কারণ কেউ টেরও পেল না।—তবে অবিনাশ বেচারীর নেশা একেবারে জন্মের মত ছেড়ে গেল।"

কাকার গল্প সুরু হবার আর সময় কোথায়? ষ্টীমার ঘাটের কাছে এসে পড়েছে, তাড়াতাড়ি তল্পিতল্পা বেঁধে সেদিন সবাইকে বাড়ী ফির্‌তেই হ'লো। টুটু, মিনু বল্লে—"কাকার গল্প কিন্তু রাত্তিরে শোবার সময় পাওনা রইল।"

শিশু সাঁতারু

পাশে যে সাঁতারের পোষাক পরা ছোট্ট ছেলেটিকে দেখিতেছ, তাহার পরিচয় জান কি? জানিলে আর ইহাকে "ছোট্ট" বলিতে সাহস করিবে না, অনেক বুড়ো বুড়ো লোকেদের এই ছোট্ট ছেলেটির কাছে হার মানিতে হইবে। ইহার নাম শ্রীমান্ বলাইদাস সরকার, বাড়ী কাশীর বাঙ্গালী-টোলায়। বয়স মাত্র সাত বছর। কিন্তু সাত বছর বয়স হইলে কি হয়, সাঁতারে এই সাত বছরের ছেলেটিকে হটাইতে পারে গোটা দেশটার মধ্যে এমন খুব কম শৰ্ম্মাই আছে। কত সাঁতারের প্রতিযোগিতায় যে বলাই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, রাশি রাশি মেডেল পাইয়াছে, তাহার হিসাব দেওয়াও কঠিন। তিন বৎসর বয়স হইতে সে এমনি ওস্তাদ!

শিশু সাঁতারু শ্রীমান্ বলাইদাস সরকার

কলিকাতায় সেদিন যে ১৩ মাইল, ২২ মাইল ও ৩০ মাইল সাঁতারের প্রতিযোগিতা হইয়া গেল আমাদের বলাইও তাহার মধ্যে নামিয়াছিল। অনেকে ভাবিয়াছিল, হুঁঃ, সাত বছরের ছেলে ত', একটু সাঁতার শিখিয়াছে, অমনি এত বড় প্রতিযোগিতাটায় নাম দিয়াছে। নিজেদের মধ্যে একটু ভাল সাঁতার কাটে তাই

বলিয়া এত বড় একটা প্রতিযোগিতায় দিব্যি নাম দিয়া বসিল! লোক হাসাইবে দেখিতেছি। কিন্তু সাঁতার আরম্ভ হইলে এই ছোট্ট প্রতিদ্বন্দ্বীটির সাহস, ধৈর্য্য ও সন্তরণ-পটুতা দেখিয়া সকলেই বলিতে বাধ্য হইয়াছিল, হ্যাঁ, একটী ছেলে বটে—সাঁতরাইতে শিখিয়াছে বটে!

আমাদের দেশে না হইয়া বিলাত কিংবা আমেরিকায় জন্মাইলে বলাইএর নাম কি রকমটা হইত তাহাই ভাবি!

বীরনারী

নীচে যাঁর ছবি দেখিতেছ, তিনি নারী হইলেও সাহসে অনেক পুরুষের চেয়েই বড়। এঁর নাম কুমারী এমেলিয়া ইয়ার হার্ট্, বয়স বছর ত্রিশেক, বাড়ী আমেরিকায়।

বীর নারী

উড়োজাহাজে চড়িয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হওয়াটা এতদিন লোকে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়াই দিত। তার প্রধান কারণ এই যে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের আব্‌হাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। কিন্তু বিলাতের লোকেরা তো আর আমাদের মত নয়, যে বিপজ্জনক বলিয়াই অমনি হাত-পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে! তারা যে অসমসাহসিক, বিপদকে তুচ্ছ করাই যে তাদের কাজ! তাই উড়ো-

জাহাজে চড়িয়া আটলাণ্টিক পার না হইয়া তাহারা ছাড়ে নাই।

কিন্তু উড়োজাহাজে যাঁরা আটলাণ্টিক পার হইয়াছেন তাঁরা ছিলেন সকলেই পুরুষ। তিন জন মেয়ে আসরে নামিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাগর পার হইতে পারেন নাই—প্রাণ হারাইয়াছেন! একাজ প্রথম করিলেন কুমারী ইয়ার হার্ট্। যখন প্রথম ইনি সাগর পার হইয়া উড়োজাহাজ হইতে নামিলেন, ওঃ, তখন কি বিপুল অভ্যর্থনা! এত লোক হইয়াছিল যে পুলিশ কোনমতেই সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই।

এবার হয়তো রামধনুর পাঠিকারা খুবই তম্বী করিয়া বলিয়া বেড়াইবে, "আরে যাও, যাও, পুরুষেরা ভাবে বুঝি সাহস জিনিষটা তাদেরই একচেটিয়া—যেন মেয়েরা আর সে সব কাজ করিতেই পারে না!" পারে বৈ কি! কিন্তু কুমারী ইয়ার হার্টের মত রামধনুর কোন পাঠিকা উড়োজাহাজে আটলাণ্টিক পার হইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে বুঝি!

ব্যাঙের জন্ম

(শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত এম্-এ)

[গ্রীসদেশের গল্প]

তোমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় পুকুরপাড়ে অথবা খালে ব্যাঙ্ দেখেছ! আজ তা'দেরই জন্মকাহিনী তোমাদের বল্‌ব।

সে অ—নে—ক দিনের কথা, গ্রীসদেশে খুব সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। তার নাম লেটোনা। তার চোখগুলি ছিল টানা-টানা। মুখখানা ছিল পদ্মফুলের মত আর গায়ের রং ছিল এক্কেবারে ধব্‌ধবে ফর্সা।

বেচারা সুন্দর হ'লে কি হবে, তার জীবনটা ছিল বেজায় দুঃখের। সে খুব সুন্দর ছিল কিনা, কাজেকাজেই দেবতাদের রাজার স্ত্রী "জুনো" তাকে দু'চোখের কোণেও

দেখতে পারতো না। সে তাকে বেজায় হিংসা করত। লেটোনা যে জায়গাতেই যায়—জুনো সেখান হ'তেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। মনের দুঃখে লেটোনা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়—কিন্তু কোনও জায়গায়ই স্থির থাকতে পারে না।

অনেক দিন যায়—একদিন এম্নিভাবে ঘুরতে ঘুরতে লেটোনা এক নদীর পাড়ে উপস্থিত। নদীর পাড়ে ছিল একখানা নৌকা, কিন্তু তাকে চালাবার জন্য কোনও কিছুই ছিল না। লেটোনা একটুও বিবেচনা না করে সেই নৌকায় উঠে বস্‌ল। ভাব্‌ল, "আমার যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন! এখানেও জুনোর বকুনি খাই—ওখানেও না হয় খাব। অন্ততঃ কয়েকটা দিনের জন্য তো জুনো আমার কোনও খোঁজ পাবে না।"

নৌকা যায় যায়, একটুও থামে না—জলের কল্ কল্ শব্দে লেটোনা ঘুমিয়ে পড়্‌ল। যখন ঘুম ভাঙ্গ্‌ল তখন সে দেখতে পেল—তার চোখের সাম্‌নে মস্তবড় একটা দ্বীপ। লেটোনা একটু ভয়ে ভয়ে সেখানে নাম্‌ল। একটা পাহাড়ের গায়ে লেটোনা তার ঘরবাড়ী কর্‌ল, আর পাহাড়ে ঝর্ণার জল, গাছের ফল—এই সব নিয়েই বেশ স্বচ্ছন্দে দিনগুলি তার যেতে লাগ্‌ল। 'জুনো' কিন্তু এখন পর্য্যন্তও একটু টের পায়নি যে, লেটোনা সেখানে পালিয়ে আছে। অনেকদিন যায়, দেবতারাও দেখলেন লেটোনার একা থাকতে বড্ড কষ্ট হয়—তাই তাঁরা দয়া করে ছোট্ট ছোট্ট দুটি খোকাখুকু পাঠালেন। লেটোনা এদের সাথে কথা বলেই তার দিনগুলি বেশ আরামে কাটিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

কিন্তু ভগবান্ কারও কপালে একেবারে সুখ লেখেন না। লেটোনা একদিন দুপুর বেলা ছেলে দুটীকে নিয়ে বেশ আরামে গল্প কর্‌ছে—এমন সময় আকাশে ভয়ঙ্কর মেঘ দেখা দিল। কতক্ষণ পরে লেটোনা দেখ্‌তে পেল—মেঘ থেকে একটী মেয়ে নেমে এল—আর তার চোখ দুটো রাগে একেবারে লাল!

এ আর কেউ নয়—আমাদের জুনো! জুনো যখন খোঁজ করে জান্‌ল যে লেটোনা বেশ আরামে আছে, তখন তার আর রাগ দেখে কে? জুনো লেটোনাকে বল্ল, "কি লেটোনা, বেশ আরামে আছিস্—না? হতভাগি,—আমার দ্বীপ হ'তে বেরিয়ে যা—এখানে তোর জন্য একটুও জায়গা নেই।"

লেটোনা আর কি করে? ছেলে মেয়ে দুটীকে সাথে ক'রে—অন্য জায়গার খোঁজে চল্‌ল, আর তার চোখ হ'তে দরদর করে জল পড়তে লাগ্‌ল।

কয়েকদিন এম্নি ভাবে যাওয়ার পর সে আবার আর একটা দ্বীপে গেল। কিন্তু সেখানে

সে না দেখ্‌তে পেল একটা জলের ধারা—না পেল একটা ফল!—ছেলে মেয়ে দুটীকে কোলে ক'রে লেটোনা আবার হাঁটতে আরম্ভ কর্‌ল!

অনেক খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে অনেকক্ষণ পরে সে দেখ্‌তে পেল একটী পুকুর—সেখানে সে আরও কতকগুলি লোককে স্নান কর্‌তে দেখ্‌ল। লেটোনা বড় আশা করে জল খাওয়ার জন্য মাথা নীচু কর্‌ল। লোকগুলি তখনই কাদা ছিটিয়ে জলটা একেবারে ঘোলা করে দিল, আর লোটানাকেও ভীষণভাবে বক্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। লেটোনা বেচারা আর কি করে? একবার উপর দিকে তাকিয়ে জোরে বল্‌ল, "ঈশ্বর! এরা আমাকে একটু জলও খেতে দিলে না! তুমি, এরা এ পুকুর থেকে অন্যত্র য'তে না যেতে পারে, তাই করে দাও"। বলার সঙ্গে সঙ্গে লেটোনা দেখতে পেল, ঐ লোকগুলি নূতন একটা জীব হয়ে জলে লাফ দিতে আরম্ভ কর্‌ল। এরাই আমাদের ব্যাঙ্।

আমরা শুনেছি, ব্যাঙেরা সব বৈঠক করে, স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের কাছে দরবার কর্‌বে ঠিক হ'য়েছে। তাই এখনও তারা স্বর্গের পথ খুঁজ্‌ছে। তোমরা যদি লক্ষ্য কর তাহ'লে দেখ্‌বে, এক ব্যাঙ বলে "পেয়েছ? পেয়েছ?" আর অম্নি অন্য সকলে একত্র হয়ে উত্তর দেয় "না পাই নি, পাই নি"। আজ এই পর্য্যন্তই।

টাকার বিপদ্

(অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম্-এ, বি-এল্)

টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে এলো দিব্যি গোল চক্‌চকে একটা টাকা—রাজার মুখ তা'র বুকের মাঝখানটিতে আঁকা। বেরিয়ে এসে সে তো আহ্লাদে আটখানা! বল্লে,—"এইবার বাঁচা গেল। সারা পৃথিবী বেশ ঘুরে বেড়ানো যাবে।" এই বলে' সে চল্‌লো বেড়াতে।

প্রথমে এলো সে একটা ছোটো ছেলের হাতে। ছেলেটি তা'র ছোট্টো কচি আঙুলগুলো দিয়ে তা'কে ধর্‌লে,—গালে দেবার চেষ্টা কর্‌লে,—অমনি মা খপ্ করে' টাকাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলে—আর সে ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। এইবার এলো সে একটা বুড়ো সুদখোর মহাজনের কাছে; সে তো তাকে ছাড়্‌বে

না কোনোমতে, হাতের চেটোর ভেতর জাপ্টে ধরে' রাখ্‌লে,—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে বার বার দেখ্‌লে—তারপর খুবই অনিচ্ছায় তাকে বের করে' দিলে। কম-বয়সী একজন এবার তার মালিক হোল ; নবাবের মতো মেজাজ তা'র ; সে টাকাটাকে ফুটকড়াই করে উড়িয়ে দিলে মিনিট খানেকের ভেতর।

রূপোর টাকা ; তামার ধার দিয়ে সে যায় না ; দিব্যি বাজে ; বেশ রঙের জেল্লা। কাজেই তার গর্ব্ব কতো ? কিন্তু বছরখানেক সে বেরিয়ে এসেছে,—এই এক বছর সে নিজের দেশেই ঘুরেছে,—বিদেশে যাবার সুবিধে তার হয় নি।

এইবার বিদেশে যাবার সুযোগ হোল তা'র। একটি ভদ্রলোক বিলাত যাচ্ছেন ; তার থলিটার এক কোণে টাকাটা লুকিয়েছিল। ভদ্রলোক আগে তা' জান্‌তে পারেন নি ; পারলে তিনি সেটা বদ্‌লে নিতেন।—এ দেশের টাকা বিলাতে চলে না কিনা ! কিন্তু যখন তিনি জান্‌তে পারলেন, জাহাজটা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কাজেই তিনি বল্লেন,—"যাক্ ! একটা টাকা তো ! থাকুক সঙ্গে !" এই বলে' তিনি টাকাটা থলিতে ফেল্লেন। টাকার কী আহ্লাদ ! সে ঠং ঠং করে' বেজে উঠলো,—আনন্দে নাচতে সুরু করে' দিলে।

থলির ভেতর টাকাটা অনেক বিদেশী সঙ্গী পেলে। তা'রা কেবলি যাওয়া-আসা করছে ; একটা যাচ্ছে তো আর একটা আসছে। কিন্তু টাকাটি যেখানে আছে, সেইখানেই থেকে গেল। এ তা'র কম সম্মান নয় !

দিন যায়—মাস যায়। টাকা বুঝছে যে নানান্ দেশ সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গীদের কাছে শোনে যে, তারা কেউ হয়তো অমুক দেশের, কেউ হয়তো তমুক দেশের। তা'রা সব কতো গল্প করে—টাকা মনে করে, সে সব আজব দেশের আজব কথা। থলির ভেতর তার বাসা ; বাইরে যে কি আছে, না আছে, তা তো জানতে পারে না !

একদিন থলিটার মুখ খোলা ছিল। টাকাটার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি গজালো। কেউ নেই দেখে সে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে জামার পকেটের ভেতর বসে পড়লো। কাজটা তার ভালো হয় নি মোটে ; তাই তার ভোগ হোল অনেক। জামা

ছাড়বার সময় টাকাটা মেঝের ওপর পড়ে গেল। কেউ তার আওয়াজ শুন্‌তে পেলে না, কেউ তাকে দেখতে পেলে না। সে দিন সন্ধ্যাবেলা ভদ্রলোক সে দেশ ছেড়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে ঘর ঝাঁট দিতে এসে দাসী তাকে খুঁজে পেলে। ভাবলে, বেশ হয়েছে, এটাকে কোনো মতে চালান করে দিতে হবে।

এইবার টাকার ভারী বিপদ্ সুরু হলো। কেউ তাকে নেয় না, বলে,—"না, বাপু, এ অচল,—এখানে চল্‌বে না।" এই সব শুনে টাকার ভারী রাগ হোত। ভাবতো—"কি রকম ! আমি অচল ? আমার কোনো দাম নেই ? যত সব পাজী বদ্‌মায়েসের দল !" ঘুরে ঘুরে দাসী যখন কোনো মতে টাকাটা চালাতে পারলে না, তখন ভাবলে,—"অন্ধকারে এটাকে চালাতে হবে।" তাই হোল। রাত্তিরে অন্ধকারে টাকাটা বেশ চলে গেল ; কিন্তু দিনের বেলা আবার তার সেই যন্ত্রণা ! কেউ তাকে নেয় না,—সবাই বলে,—"না, ও চল্‌বে না।" যখনি তাকে চালাবার চেষ্টা করা হোত, টাকাটা তার মালিকের আঙুলের ফাঁকে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতো।

টাকাটা ভাবতো,—"আমি হচ্ছি রূপোর চক্‌চকে টাকা—রাজার মুখ আমার বুকে আঁকা ! কিন্তু বাজারে আমার দাম নেই। এর চেয়ে জলে ডুবে মরাও যে ভালো। কোনো দোষী নেই,—অথচ সবাই আমায় একঘরে করে রেখেছে। যদি দোষ করতুম, তা হলে না জানি কী হতো ?"

টাকাটাকে যখুনি চালাবার জন্যে বার করা হোত,—তার সে কী কাঁপুনী ! কি জানি, কে কি বল্‌বে ? কতো গাল দেবে ? হয়তো ছুড়ে ফেলে দেবে ! এই সব নানান্ ভয়ে সে অস্থির হয়ে উঠতো।

একবার একটা গরীব মজুরনীর হাতে গিয়ে সে পড়্‌লো ! বেচারী ! তাকে কে ঠকিয়েছে। সে তো কোনোমতেই সেটা চালাতে পারলে না। গরীব বড়ো বিপদে পড়লো।

সে ভাব্‌লে,—"কী যন্ত্রণা গা ! বুড়ো বয়সে এইটের জন্যে আমায়

জোচ্চোর বদনাম কিন্‌তে হবে ? যাই, রুটী-ওলার কাছে। তার তো টাকার অভাব নেই,—হয় তো দয়া করে এইটে নিতে পারে।"

টাকা ভাব্‌লে,—"বুড়ো হয়েছি বলে আমারও কি মন বদ্‌লে গেছে ? এই ভালোমানুষ বুড়ীটীকে কি কষ্টই না দিচ্ছি !" এই ভেবে সে একটা মস্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্লে।

বুড়ী তো গেল রুটি-ওলার কাছে। রুটি-ওলা কেনা-বেচার কাজে দাড়ী পাকিয়ে ফেলেছে। তার চোখে ধূলো দেওয়া কি বুড়ীর কাজ ? সে রেগে টাকাটা ছুড়ে ফেলে দিলে একেবারে নর্দ্দমায়। বুড়ীকে গালাগালি দিয়ে উঠ্‌লো। সেদিন বুড়ীর রুটি কেনা হোল না। সে টাকাটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাসায় ফিরলে।

ফিরে এসে বুড়ী টাকাটাকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলে। তারপর বল্লে,—"আমার নাকে কাণে খৎ ! আর আমি কাউকে ঠকাতে যাবো না। তার চেয়ে এর ভেতর একটা গর্ত্ত করে দেবো, যা'তে লোকে বোঝে, এটা অচল।" আবার কি মনে হোল, তাই খানিক ভেবে বল্লে, "হয়তো এ টাকাটা বড়ো পয়মন্ত। তা হ'লে এক কাজ করা যাক্। এর ভেতর একটা ফুটো করে তাতে একটা সূতো গলিয়ে সইয়ের ছেলের গলায় পরিয়ে দিই। সে বড়ো খুসী হবে।"

যে কথা, সেই কাজ ! টাকাটার কিন্তু বড়ো ভালো লাগ্‌ছিল না,—তার কষ্ট হচ্ছিল বেজায় ! কিন্তু সে চুপ করে' সব স'য়ে গেল। তা'র কথা তো বুড়ী বুঝ্‌বে না,—তাই।

সূতোয় বাঁধা টাকার মালা পরে' ছেলেটার কী আহ্লাদ ! সে টাকাটাকে চুমু খেলে। সারা রাত টাকাটা ঘুমন্ত ছেলেটির বুকের ওপর নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে বাঁচলো।

সকাল হ'তেই ছেলেটির বাপ তা'কে ডাক্‌লে—টাকাটাকে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌লে—তারপর কি ভেবে সূতোটা কাঁচি দিয়ে কেটে টাকাটা পকেটে ফেল্লে। ছেলেটির মা জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"ও কি হোল ?" তা'তে সে

উত্তর দিলে,—"দেখি, তোমার সইয়ের কি রকম পয়মন্ত টাকা ! এইটে দিয়ে সন্ধ্যাবেলা লটারীর টিকিট কেনা যাবে।"

টাকাটার শুনে' বড়ো কষ্ট হলো। আবার সেই গালাগালি, সেই ছুড়ে ফেলে দেওয়া—সেই পাঁচজনের সাম্‌নে অপমান—এই তার বরাতে আছে। কিন্তু তার কিছুই হোল না। লটারীর টিকিটের ঘরে বেজায় ভিড় ; কে কাকে দেখে, কে কার খোঁজ নেয় ? কাজেই দিব্যি টাকাটা বাক্সের ভেতর চলে' গেল।

সকালে আবার সেই বিপদ্। আবার সেই ঠকাবার চেষ্টা—সেই গালাগালি—চেঁচামেচি,—আবার সেই ছুড়ে' ফেলা। টাকাটার বড়ো প্রাণে লাগলো,—সত্যি টাকা সে, দিব্যি তা'র আওয়াজ ;—অথচ তা'কে ঝুটো সেজে থাক্‌তে হোল—কেউ তা'কে রাখ্‌তে চাইলে না।

নানান্ হাত-ফের হ'তে হ'তে টাকাটা অপমান স'য়ে এক বছর কাটিয়ে দিলে। কেউ তাকে বিশ্বাস কর্‌তো না,—কেউ তাকে ভালো চোখে দেখ্‌তো না—গালাগালি সহ্য করেই তার দিন কাট্‌তো। একদিন হঠাৎ তা'র বরাত গেল ফিরে'। একজন দোকানদার একটী ভদ্রলোককে টাকাটা দিলো চালিয়ে—তিনি বিদেশী—কাজেই কিছু না বলে' ভালো মানুষের মতো টাকাটী পকেটস্থ করে' নিলেন অনেকগুলি সে-দেশী টাকার সঙ্গে।

পরের দিন তিনি কি একটা জিনিষ কিনে' তা'র দাম দিতে গিয়ে যেমনি টাকাটা দিয়েছেন, অমনি দোকানদার বলে' উঠ্‌লো,—"না, মশাই, এ চল্‌বে না ! এটা মেকি !" "মেকি ? কই দেখি ! আমি তো ভালো টাকা বলেই নিয়েছিলুম !" এই বলে' ভদ্রলোকটী টাকাটা তুলে নিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন। তিনি ছিলেন বাঙালী। টাকাটা দেখেই তাঁ'র মুখ চোখ আনন্দে ভরে' উঠ্‌লো। দোকানদার অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"ব্যাপার কি ?" তিনি বল্লেন,—"এ মেকি নয়, আমাদের দেশের আসল টাকা। এরা একটা ফুটো করে' দিয়ে মিছামিছি এর 'মেকি' অপবাদ দিচ্ছে। আমি একে দেশে নিয়ে যাবো।"

এতদিনের পর একজন তবু একটু সুনাম গাইলে। টাকাটার সারা অঙ্গে

আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। তা'র ইচ্ছে হোল, তার ভেতর থেকে আগুনের ফুল্কি বেরুবে। কিন্তু তা' কি হবার যো আছে—সে যে রূপো, লোহা বা ইস্পাত তো নয়।

ভদ্রলোকটি টাকাটাকে সাদা কাগজে মুড়ে' আলাদা রেখে দিলেন ; ভয়, পাছে অন্যমনস্কে হারিয়ে যায়, বা খরচ করে ফেলেন। তিনি দেশী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'লেই টাকাটি দেখাতে লাগলেন। সবাই বলতো;—"বড়ো জবর ব্যাপার তো! ভারী মজার!" টাকা হাঁ করে ভাব্‌তো, তার ভেতর মজার এরা কি পেলে।

যা হোক, বিলাত ঘুরে টাকাটা অনেকদিন পরে নিজের দেশে ফিরে এলো। এখন সে নিশ্চিন্ত ; তার এখন বেজায় আমোদ। ঠন্ ঠন্ করে বাজে আর হেসে গড়িয়ে কেবল লুটোপাটী খায়। এক দুঃখ যে, ধরে বেঁধে তাকে ফুটো করে দেওয়া হয়েছে। তাতে কি যায় আসে ;—সে তো আসল চাঁদির টাকা—বুকের ওপর রাজার মুখ ঠিক আঁকা আছে—দশচক্রে পড়ে ভগবান্‌ও যখন ভূত বনে গিয়েছিলেন, তখন নিৰ্জ্জীব টাকা, তার ভিতর ফুটো ক'রে তা'কে অচল বানিয়ে দেওয়াতে আর আশ্চর্য্য কি ? তাতে তো আর টাকার আসল দামটা চলে যায় না। এই ভেবে টাকাটা দিব্যি ফুর্ত্তিতে রইলো।

সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ইঞ্জিন

ডার্জ্জিলিয়ান রেলওয়ের মধ্যে এই ইঞ্জিনখানি চলে। লম্বায় ইহা ১৫০ ফিট্। অতবড় ইঞ্জিন ত' আর ইচ্ছামত বাঁকান যায় না, তাই ইঞ্জিনটাকে তিন ভাগ করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, গাড়ী খুব অল্প জায়গার মধ্যে বেঁকিতে পারে। ইঞ্জিনখানা কত গাড়ী টানিতে পারে জান ? ৯ হাজার টন ওজনের গাড়ী। সমস্তটা গাড়ী দাঁড়াইলে ২ মাইল জায়গা জুড়িয়া যাইবে। ইঞ্জিন-খানা চলে বিদ্যুতের সাহায্যে।

জানোয়ারের ভদ্রতা-জ্ঞান

নীচের এই ছবি খানার দিকে তাকাও তো! মনে হইবে যেন দুইটী জানোয়ার মারমুখী হইয়া কোঁদল করিতেছে। আসলে কিন্তু তারা কেউ

জানোয়ারের ভদ্রতা-জ্ঞান

কোঁদলের ধার দিয়াও যাইতেছে না—করিতেছে পরস্পরের সহিত ভদ্রতার বিনিময়। ব্যাপারটী কি হইয়াছিল তবে খুলিয়াই বলি। একটা পাখী দেখিতে পাইয়া দুইটী বলবান্ জানোয়ার—পেকিন ও লিঙ্ক্‌স্—ছুটিয়া আসিল—

উদ্দেশ্য অবশ্য ফলার করা। কিন্তু পেকিনের ভাগ্য ছিল ভাল, কাজেই সেই প্রথমে পাখীটাকে ধরিয়া ফেলিল। গায়ের জোরে লিঙ্ক্‌স্‌ পেকিনের চেয়ে কম যায় না, কিন্তু তবুও সে এমনি কেতা-দুরস্ত জানোয়ার যে পেকিনের ফলারে কোন রকম বাধা না জন্মাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। যদি পাখীটাকে পেকিন না ধরিয়া লিঙ্ক্‌স্‌ ধরিত, তবে পেকিনও বোধ হয় ঠিক এমনি ভদ্রতা দেখাইত! কেমন সুন্দর ভদ্রতা-জ্ঞান দেখ দেখি! অথচ এদের আমরা কতই না নিন্দা করি।

মাছের বড়শী-বাওয়া

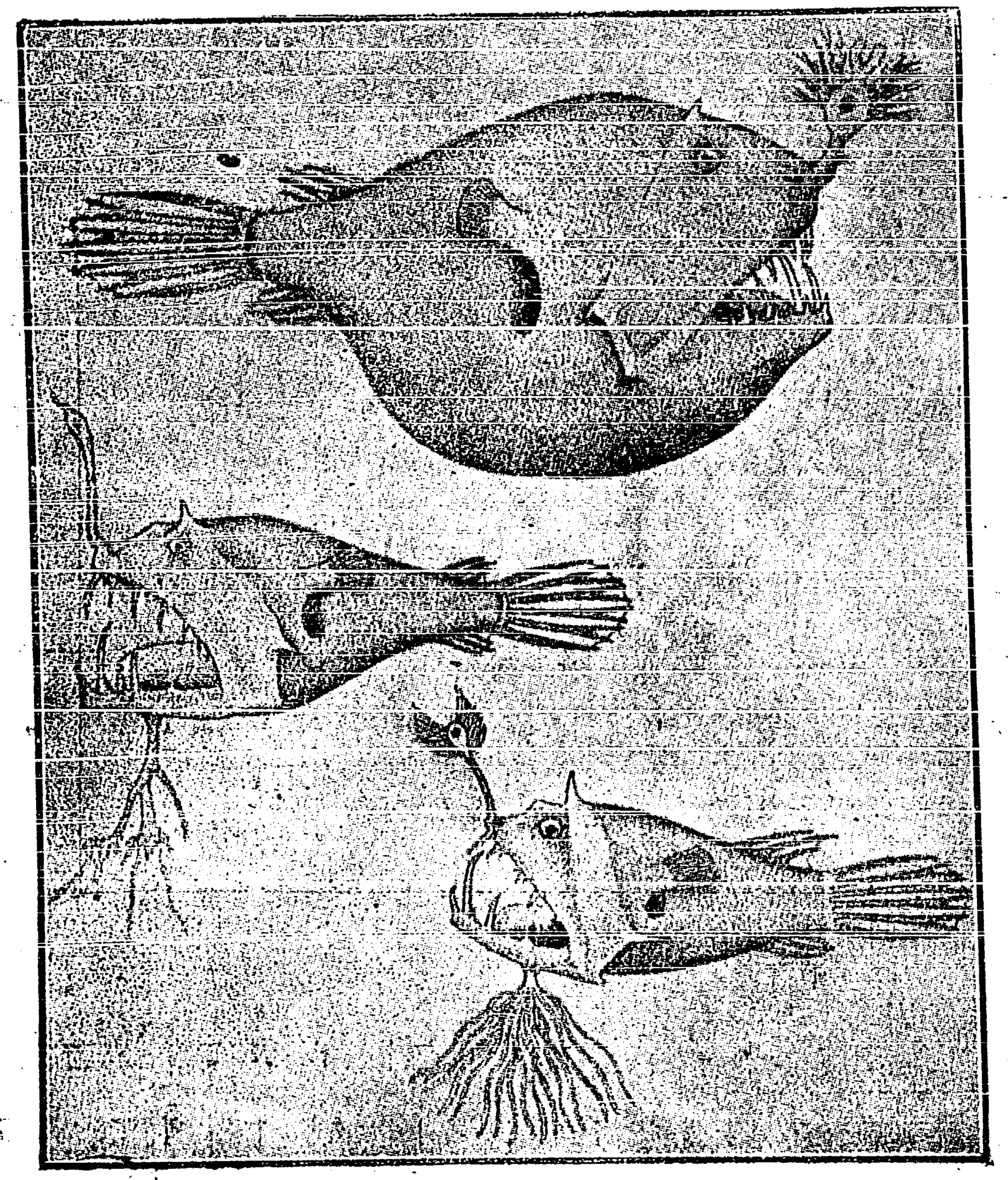

মাছের বড়শী-বাওয়া

তোমাদের ধারণা বড়শী দিয়া মাছ ধরিতে জান এক তোমরাই। কিন্তু ছবিতে দেখ এ বুদ্ধি মাছেদেরও আছে। ঐ যে বড় বড় মাছগুলার মাথা ও মুখ হইতে শিংএর মত একটা কি বাহির হইয়াছে ঐগুলিই ওদের বড়শী! ঐ "বড়শীর" মাথাটার উপর এমনি একটা জিনিষ আছে, যা সর্ব্বদাই জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে। ছোট খাটো মাছ মনে করে সেগুলি বুঝি তাদের খাবার। বেচারারা খাবার দেখিয়া

খুব উৎসাহের সাথে ছুটিয়া আসে সে গুলি গিলিতে আর অমনি তাদের গলা যায় মাছের বড়শীতে আট্‌কাইয়া। তারপর? তারপর যে কি হয় তা তোমরা নিজেরাই বুঝিয়া লও।

প্রতি মাসে ১৮ হাজার মাইল বেড়ান

ফ্রান্সে পেরি রবিন্‌ বলিয়া একজন ভদ্রলোক আছেন। ইনি রাতদিন উড়োজাহাজ লইয়াই আছেন। প্রত্যেক মাসে ইনি কম করিয়া ১৮ হাজার মাইল আকাশে না বেড়াইয়া ক্ষান্ত থাকেন না। প্যারিস্‌ হইতে বার্লিন ৬ শত মাইল। রবিন্‌ একদিন অন্তর প্যারিস্‌ হইতে বার্লিন যাতায়াত করেন।

বাতাবি লেবুর মত কাগজী লেবু

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিলে যে সব গাছপালাই কত অদ্ভুত অদ্ভুত ফল দিতে পারে তাহার পরিচয় দিয়াছেন আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক! ইনি একটা সাধারণ লেবুগাছকে টবে পুতিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাকে বাড়িতে দিয়াছেন। কিছুদিন পরে দেখা গিয়াছে কাগজী লেবু বড় হইয়া বাতাবি লেবুর মত হইয়াছে; আর, তাহাদের এক একটার ওজন হইয়াছে এক সের করিয়া।

অদ্ভুত খেলার সাথী

ল্যাকোস্ট ফ্রান্সের এক মস্ত টেনিস্‌ খেলোয়ার। আজকাল বড় খেলোয়ার হইলে একটা মুস্কিল আছে। খেলা অভ্যাস করিবার সময় তেমন ওস্তাদ সঙ্গী সব সময় পাওয়া কঠিন। ল্যাকোস্ট আজকাল কেমন করিয়া খেলা অভ্যাস করেন জান? তিনি মাথা খেলাইয়া এক অদ্ভুত যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। এই যন্ত্রটিকে যদি নেটের আর একদিকে বসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহা হইতে অনর্গল নানা ভাবে বল্‌ বাহির হইয়া আসে। খেলোয়ার মহাশয়কে এই অদ্ভুত যন্ত্র-খেলোয়ারটির পাল্লায় পড়িলে বেশ ছুটাছুটি করিতে হয়। কোন ওস্তাদ খে[illegible]য়ারের সাথে খেলিলে যেটুকু খেলা শেখা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা[illegible] কিছুমাত্র কম শেখা যায় না। যন্ত্রটি চালাইতে হইলে বিদ্যুতে[illegible]

সাহায্য লইলেই ভাল হয়। আবার, টেনিসের নামও শোনে নাই এমন একজন সাধারণ লোককে লইয়াও দিব্যি কাজ চলে।

ক্ষুদে মোটরকার

এক জার্ম্মান কারিগর একখানা ভারী মজার মোটরকার তৈরী করিয়াছে। কার খানার ওজন মাত্র দশ সের। দেখিতে একখানা ছোট ছেলেদের ঠেলা গাড়ীর চেয়েও অনেক ছোট। পুতুলের গাড়ী বলিলেই চলে, কাহারও পক্ষে ভিতরে বসা সম্ভব নয়। কিন্তু মোটরকার খানার মধ্যে আসল মোটরের কলকব্জার কিছুই বাদ নাই। ইহাতে চারিটা সিলিণ্ডার আছে। মোটরকার খানার বেগও আসল কারের মত। কারিগর ইহাকে ঘণ্টায় ১৭ মাইল বেগে চালাইয়াছে।

সেকালকার মস্ত বীর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান

আলেকজান্দার রাজা হইয়াছিলেন ২০ বৎসর বয়সে। রাজা হওয়ার অল্প দিন পরে থিব্‌স্ নগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় আলেকজান্দার যুদ্ধ করিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করেন। এই সময় তাঁহার লোকজন থিব্‌সের উপর নানা রকমের অত্যাচার করিয়াছিল। ঐ নগরে তিমোক্লিয়া নামে একটী মহিলা ছিলেন—উচ্চ বংশে তাঁহার জন্ম, গুণের জন্য লোকে তাঁহার খুব সম্মান করিত। আলেক্‌জান্দারের দলের কতকগুলি লোক—থ্রেস্ প্রদেশে তাহাদের বাড়ী—এই মহিলার বাড়ীখানাকে চুরমার করিয়া দিল। সৈন্যেরা যাহা পাইল লুটিয়া লইল। তাহাদের দলপতি অনেক অকথ্য অত্যাচারের পর স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার সোণারূপা লুকাইয়া রাখিয়া থাকিলে কোথায় রাখিয়াছ বল।" তিনি দলপতিকে এক বাগানের মধ্যে লইয়া গিয়া একটী কূয়া দেখাইয়া বলিলেন—"যখন সৈন্যেরা নগরটা দখল করিল তখন দামী জিনিষ যাহা কিছু ছিল ঐ কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি।" দলপতি বাঁকা হইয়া কূয়ার দিকে মুখ নামাইয়া দেখিতে লাগিলেন—রমণীটীও সুযোগ বুঝিয়া ধাক্কা মারিয়া দলপতিকে একেবারে কূয়ার মধ্যে "পপাত" করিয়া দিলেন। তাহার পর পাথরের উপর পাথর দলপতির শরীরের উপর পড়িতে লাগিল; তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া পলাইল। থ্রেসের লোকজন আসিয়া মহিলাটীকে ধরিয়া তাঁহার হাত বান্ধিয়া ফেলিল এবং আলেক্‌জান্দারের নিকট তাঁহাকে হাজির করিয়া দিল। আলেক্‌জান্দার তাঁহার চেহারা, ভাবগতিক এবং ভয়শূন্যতা দেখিয়াই বুঝিলেন, এটী সামান্য স্ত্রীলোক নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" মহিলাটী উত্তরে বলিলেন, "আমি থিয়াজিনিসের ভগ্নী, যে থিয়াজিনিস্ গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য সেনাপতিরূপে ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিরোনিয়ার যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।" আলেক্‌জান্দার তাঁহার কার্য্যে ও উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া হুকুম দিলেন, "ছাড়িয়া দাও ইঁহাকে ইঁহার সন্তানসন্ততি-সমেত।"

পারস্যরাজ দারার সহিত ইসাসের যুদ্ধের পর আলেক্‌জান্দার আহারে বসিয়াছেন এমন সময় খবর আসিল,—"বন্দীদিগের মধ্যে আছেন দারার মাতা, স্ত্রী ও দুইটী অবিবাহিতা কন্যা"—ইঁহারা দারার রথ ও ধনুক দেখিয়া দারা মারা গিয়াছেন মনে করিয়া বড়ই কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আলেক্‌জান্দার একটু থামিলেন, তাহার পর লিওনেটাস্ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা তাঁহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে দারা মরেন নাই, আলেক্‌জান্দার হইতেও তাঁহাদের কোন ভয় নাই, আলেক্‌জান্দার কেবল সাম্রাজ্যের জন্যই দারার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, দারার সৌভাগ্যের সময় তাঁহারা যেরূপ যত্নে ছিলেন এখনও সেইরূপই থাকিবেন। আলেক্‌জান্দার তাঁহাদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান ঠিক করিয়া দিলেন; পূর্ব্বে তাঁহাদের যেমন দাসদাসী ছিল এখনও সেইরূপ থাকিল। হুকুম হইল, কেহ যেন তাঁহাদের কাছে না যায় কিম্বা তাঁহাদের সম্মুখে কোন খারাপ কথা না বলে। এমন ব্যবস্থা হইল যেন তাঁহারা শত্রু-শিবিরে নাই, কোন পবিত্র মন্দিরে আছেন।

দারা নিজে ছিলেন খুব লম্বা সুপুরুষ আর তাঁহার রাণী ছিলেন পরমা সুন্দরী ; মেয়েরাও প্রায় তাঁহাদের মতই ছিলেন। কিন্তু আলেক্‌জান্দার মনে করিলেন, শত্রুজয় অপেক্ষা নিজেকে জয় করা বড় কাজ। তিনি তাঁহাদের নিকটেও গেলেন না। তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কাহারও স্ত্রীলোকের প্রতি অন্যায় আচরণের কথা শুনিলে তিনি তাহার কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন।

বিলাসিতার অভাব

বহুকাল পর্য্যন্ত আলেক্‌জান্দার নিতান্ত সাদাসিধা ভাবে থাকিতেন। ইসাসের যুদ্ধে জয়ের পর তিনি দারার স্নানের ঘরে স্নান করিতে গিয়া দেখেন, সেখানে সোণার কাজ-করা কত পাত্র, কত বাক্স, কত শিশি, আরও কত কি! কত বড় বড় কামরা, আর তাহাতে কত সুন্দর সুন্দর আস্‌বাব, আর কত গন্ধদ্রব্যের ভুর্‌ভুরে গন্ধ। দেখিয়া তিনি নিজের বন্ধুদিকের দিকে চাহিয়া একটু ঠাট্টার সুরে বলিলেন—"হাঁ, একেই বলে রাজার হাল।"

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও তিনি সাধারণতঃ খুব হিসাব করিয়া চলিতেন। আডা নামে একটী মহিলাকে তিনি "মা" বলিয়া ডাকিতেন, ইঁহাকে তিনি কেরিয়ার রাণী করিয়া দিয়াছিলেন। আডা ভাল ভাল খাবার প্রস্তুত করিয়া আলেক্‌জান্দারের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। শেষে ভাল ভাল রান্ধুনী পাঠাইয়া দিলেন। আলেক্‌জান্দার বলিয়া পাঠাইলেন—"এ সকলে আমার কোন প্রয়োজন নাই ; আমার শিক্ষক লিওনিডাস্ আমাকে ইহা অপেক্ষা ভাল রান্ধুনীর যোগাড় করিয়া দিয়াছেন—মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে সৈন্যের সঙ্গে যাত্রা (March) আর মধ্যাহ্ন আহারটী পরিমাণে এত অল্প যে রাত্রের আহারটায় কোন গোল না বাধে। কেবল তাই নয়, লিওনিডাস্ আমার কাপড় চোপড়ের বাক্স পেঁটরা পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিতেন পাছে আমার মা কোন বিলাসিতার জিনিষ কি অনাবশ্যক জিনিষ ইহার মধ্যে পূরিয়া রাখেন।"

ভাল জিনিষ খাওয়ার রুচি তাঁহার এত কম ছিল যে দূর হইতে ভাল ফল কি ভাল মাছ আসিলে তাহা বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে বিলাইতে বিলাইতে অনেক

সময়ে নিজের জন্য কিছুই রাখিতেন না। তবে খাওয়াদাওয়ার ব্যয়ও তাঁহার নিতান্ত কম পড়িত না—নিমন্ত্রণ করিতেন অনেক লোক।

এসিয়াখণ্ডের বিলাসিতার মধ্যে আসিয়া আলেক্‌জান্দারের বড় বড় কর্ম্মচারীরা ক্রমে ঘোর বিলাসী হইয়া পড়ে—যেমন খাওয়াপড়ায়, তেমনি অন্যান্য ব্যাপারে। কেহ জুতায় রূপার কাঁটা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কেহ কুস্তির সময় গায়ে মাখিবার মাটী আনিলেন কতকগুলি উটে বোঝাই করিয়া মিশর দেশ হইতে ; কেহ শিকারের জন্য প্রকাণ্ড, অদ্ভুত জাল প্রস্তুত করাইলেন ; স্নানের পর তৈলের পরিবর্ত্তে গন্ধদ্রব্য মাখা চলিতে লাগিল ; স্নান করাইবার চাকর, বিছানা করিবার চাকর ইত্যাদি, ইত্যাদি। আলেক্‌জান্দার এই সব দেখিয়া ইঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, এত বড় বড় যুদ্ধ করিয়াও তোমরা বুঝিলে না যে যাহারা শ্রম ও শরীর-চালনা করে তাহারা যে আরামে ঘুমায়, দুর্ব্বল ও অলস প্রকৃতির লোক তাহা পায় না। পারসীকদিগের আচার-ব্যবহারের সহিত মাসিদোনিয়ার লোকের আচার-ব্যবহার তুলনা করিয়া তোমরা বুঝিলে না যে আমোদ ভালবাসা পরাধীনতার চিহ্ন, আর পরিশ্রমের জীবন রাজার জীবন। যে লোকের হাত এত কোমল যে নিজের শরীরটার কাজ সারিয়া লইতে পারে না, সে তাহার ঘোড়ার জিম্মা লইবে কেমন করিয়া, তাহার বল্লম, যুদ্ধের কিরীট এ সবই বা কেমন করিয়া পরিষ্কার রাখিবে ? তোমরা কি জান না যে, যাহাদিগকে জয় করা হইল তাহাদিগের মত কাজ করা জয়ের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য আরও বড় ?"

দান-প্রবৃত্তি

আলেক্‌জান্দার বরাবরই বন্ধুবান্ধব ও সৈন্যসামন্তকে দান করিতে ভাল-বাসিতেন। কোন একটা যুদ্ধ হইয়া গেলেই লোকে ভাল ভাল জিনিষ পাইত। তাঁহার বিত্ত-সম্পত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দান-প্রবৃত্তিও বাড়িতে লাগিল। কেহ কিছু চাহিলে তিনি বিরক্ত হইতেন না, বিরক্ত হইতেন তাঁহার দেওয়া জিনিষ না লইলে। তাঁহার দানের অনেক গল্প আছে। সিরাপিওন নামে এক যুবক তাঁহার সহিত বল্

খেলিত। সে কিছুই চাহিত না বলিয়া আলেক্‌জান্দারও তাহাকে কিছুই দিতেন না। একদিন খেলার সময় বল্‌ ছুড়িবার বেলা সিরাপিওন কেবল অন্য লোকের সম্মুখে বল্‌ ছুড়িতে লাগিল, আলেক্‌জান্দারের সম্মুখে একটাও নয়। আলেক্‌জান্দার বলিলেন,—"তুমি আমাকে বল্‌ দাওনা কেন?" যুবক উত্তর করিল,—"আপনি ত' চান নাই।" আলেক্‌জান্দার হাসিলেন এবং তাহার পর সিরাপিওনকে অনেক উপহার দিলেন। আলেক্‌জান্দারের মাতা অলিম্পিয়াস্‌ এক পত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন;—"তুমি বন্ধুবান্ধবকে অনেক দিতেছ, ভালই; কিন্তু তাহাদিগকে যতই রাজার মত করিয়া দিতেছ এবং বন্ধুবান্ধব করার ক্ষমতা দিতেছ, ততই তোমার নিজের ঐ অধিকারটা কমিয়া যাইতেছে।" এই রকমের চিঠি অলিম্পিয়াস্‌ যখন তখন লিখিতেন। আলেক্‌জান্দার এগুলি কাহাকেও না দেখাইয়া গোপন করিতেন। একদিন হিফিষ্টিয়ান্‌ নামে আলেক্‌জান্দারের এক বন্ধু ঐ রকম এক পত্র দেখিতে পাইয়া পড়িয়া ফেলিলেন। আলেক্‌জান্দার পড়িতে নিষেধ করিলেন না, কিন্তু নিজের হাত হইতে মোহরওয়ালা আংটি খুলিয়া মুখে লাগাইলেন—অর্থ, কাহাকেও এ কথা বলিও না।

দারার প্রিয়পাত্র মাজিয়াসের পুত্র দারা থাকিতেই এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার তাহা অপেক্ষাও বড় একটা প্রদেশ শাসনের ভার তাঁহার উপর দেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন;—"আমাদের ছিলেন এক দারা, আর আপনি যে অনেক আলেক্‌জান্দারের সৃষ্টি করিতেছেন।"

গুণের আদর

আলেক্‌জান্দার মাসিদোনিয়ার রাজা হইবার কিছুদিন পরেই কোরিন্থ নগরে গ্রীকদিগের এক বিরাট্‌ সভায় স্থির হয় যে পারস্য দেশ আক্রমণ করিতে হইবে।—গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্যসামন্ত যাইবে আর আলেকজান্দার হইবেন সকলের উপর সেনাপতি। এ বিষয়ে আর কোন দ্বিমত থাকিল না। অনেক পণ্ডিত লোক আলেকজান্দারের এই সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিতে

আসিলেন। এই সময়ে ডায়জিনিস্‌ নামে এক মস্ত বড় পণ্ডিত করিন্থে বাস করিতেন। দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার খুব নাম ছিল। আলেক্‌জান্দার মনে করিলেন, এত এত পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছে, ডায়জিনিস্‌ও আসিবেন। ডায়জিনিসের স্বভাবটা কিন্তু ছিল কতকটা আমাদের দেশের সাবেক কালের তপস্বীদের মত—তিনি নিজের ভাবেই নিজে বিভোর থাকিতেন, কাহারও তোয়াক্কা রাখিতেন না। আলেক্‌জান্দার শীঘ্রই বুঝিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে, ডায়জিনিস্‌ তাঁহার নিকট আসিবেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, এত বড় পণ্ডিত লোকটীকে একবার দেখা উচিত, নিজেই তাঁহার কাছে চলিলেন, তাঁহার দলবলও সঙ্গে চলিল। গিয়া দেখেন ডায়জিনিস্‌ রৌদ্রের মধ্যে শুইয়া আছেন। লোকগুলিকে আসিতে দেখিয়া ডায়জিনিস্‌ একটু মাথা তুলিলেন এবং আলেক্‌জান্দারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আলেক্‌জান্দার তাঁহাকে সম্মান করিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং বলিলেন, "আমাদ্বারা কি আপনার কোন উপকার হইতে পারে?" ডায়জিনিস্‌ বলিলেন, "হাঁ, রোদটা ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়ান।" আলেক্‌জান্দার দেখিলেন, লোকটা তাঁহাকে এতটুকুও গ্রাহ্য করে না। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং বুঝিলেন, ইনি নিশ্চয়ই এক অসাধারণ ব্যক্তি। আলেক্‌জান্দারের সঙ্গের লোক ভাবিল, কি একটা কিম্ভূত কিমাকার অদ্ভুত জীবের নিকটই তাহারা আসিয়াছে, তাহারা ডায়জিনিস্‌কে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কিন্তু আলেক্‌জান্দার গম্ভীর। তিনি কেবল বলিলেন, "যদি আলেক্‌জান্দার না হইতাম তবে আমার ডায়জিনিস্‌ হওয়ার ইচ্ছা হইত।"

গ্রীস দেশে এক ডায়জিনিস্‌ ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ ডায়জিনিসের অভাব ছিল না। আলেক্‌জান্দার পঞ্জাব জয় করার পর তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কল্যাণ নামে এক সাধুর নিকট আলেক্‌জান্দারের দূত আসিলে সাধু দূতকে নিতান্ত অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেন এবং তাহার সহিত রুক্ষভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন। দূত তাঁহার নিকট শাস্ত্রকথা শুনিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—"কাপড় চোপড় ছাড়, উলঙ্গ হও, তবেই আমি শাস্ত্রকথা বলিব, তাহা না করিলে তুমি জুপিটারের নিকট

হইতে আসিলেও বলিব না"। দণ্ড নামে আর এক যোগী আলেক্‌জান্দারের দূতকে বলিয়াছিলেন—"আলেক্‌জান্দারের নিকট যাওয়ার আমি কোন প্রয়োজনই দেখি না। তিনি ঈশ্বরের পুত্র? আমিও ত তাই। তাঁহার সঙ্গের লোক জলে স্থলে ঘুরিতেছে কিন্তু ভালত কিছুই পাইতেছে না। আলেক্‌জান্দারের কোন জিনিষেই আমার লোভ নাই; তাঁহা হইতে কোন ভয়ও নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিলে ভারতবর্ষের ফলমূলই আমার অভাব পূরণ করিবে। আর মরিয়া গেলে ত এই দেহটা হইতে খালাস পাইব।" এই সকল লোকের কথা আলেক্‌জান্দার ভক্তের মত সহ্য করিতেন, বুঝিতেন, এরা যে-সে লোক নহে।"

পুরুকে যুদ্ধে জয় করার পর তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া আলেকজান্দার তাঁহার যেরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা খুবই জানা কথা। এখানে আর তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করিলাম না।

খোকা ও দিদি

(শ্রীসুশীলচন্দ্র গুহ-খাসনবীশ, এম্-এ)

খোকা বলে দিদিরে তার ডেকে,
"তুই কেন হ'লি আমার বড়?
বাঘা, টমি, আমায় দেখে সদা
শুয়ে থাকে, ভয়েই জড় সড়!
রেলগাড়ী চালাই বুদ্ধি ক'রে,
আমার কাছে মিনী বিড়াল কাবু!
তবু কেন বেয়ারা বেটা বলে,—
'দিদিমণির ছোট খোকাবাবু?'"
দিদি বলে, খোকার গলা ধরি,
"তা, বুঝি জানিস্‌নি তুই ওরে!

কানু যখন মার্ত্তে আসে ধেয়ে,
কে বাঁচাবে বল্ দিকিনি তোরে?
কার কাছে লুকুবি তুই গিয়ে
ভাঁড়ার থেকে খাবার চুরি ক'রে?
মা জননী এই না ভেবে তেবে,
তোমার বড় দেছেন করি মোরে।"

বিশু-চরিত

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, সারা বাংলা দেশটা তিনি খালি ঘুরিয়াই বেড়াইতেন। আজ আছেন হয়তো বাঁকুড়ায়, রাত না পোহাইতেই বদলী হইলেন চাটগাঁয়। মারা পড়িতাম তাতে আমি বেচারী। বাবার আর কি? সামান্য একটু যাতায়াতের কষ্ট বই তো নয়? কিন্তু ভাব দেখি একবার আমার অবস্থাটা! বাঁকুড়ায় হয়তো পড়িতেছি "দি গ্লোব্ রিডার," পরীক্ষার বাকী মাত্র মাসখানেক, চাটগাঁয় গিয়া দেখি সেখানে পড়ান হইতেছে "দি টুয়েণ্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি রিডার।" পড় এখন গোটা বইখানা এক মাসের মধ্যে! আমাদের হয়তো ফ্র্যাক্‌সনই হয় নাই, তারা হয়তো ডেসিম্যাল সারা করিয়া বসিয়া আছে। এ অবস্থায় আর ছাই পড়াশুনা কি হইবে? সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিতেই তাই ঠিক হইল বাকী বছর দুটী মামাবাড়ীতে থাকিয়া সেখানকার স্কুলে পড়িব। 'প্রি-ম্যাট্রিক' ক্লাশে উঠিয়াই তাই গাঁট্রী বোঁচ্‌কা বাঁধিয়া মামাবাড়ী আসিয়া হাজির হইলাম।

স্কুলে ভর্ত্তি হইবার আগের দিন মেজমামা ডাকিয়া লইয়া সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখ্ কেষ্টা, বিশুর সাথে কোনদিন মিশিসনে যেন, পরকাল কিন্তু তা' হলে ঝর্‌ঝরে হ'য়ে যাবে!"

বিশু আবার কে রে? তা' সে যেই হোক্, তার কথা ভাবিবার আমার তখন মোটেই সময় ছিল না। কাল স্কুলে ভর্ত্তি হইব—লক্ষ্মীছাড়া স্কুল আবার পরীক্ষা না করিয়া ভর্ত্তি করে না—কাজেই কোন্ বিষয়ে কতটা পড়া হইয়াছে সেটা তো জানিয়া লইতে হইবে! অবিনাশ, নিমাই, বিজয় প্রভৃতিকে আসিতে বলিয়াছিলাম, তাহারা আসিয়া জুটিয়াছে। অবিনাশ বলিল "নদী নাকি শুন্লাম বেজায় বেড়ে গেছে রে—চল্ নদীর ধারে যাওয়া যাক্—বেড়ানও হবে, জল দেখাও হবে, কথাবার্ত্তাও সেই সাথেই বলা চল্‌বে।"

নদীর পারে আসিয়া তো চক্ষুস্থির! নদী পাগল হইয়া গিয়াছে! ঠাট্টা নয়, সত্যি কথাই। পাগল হইলে মানুষের যেমন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকেনা—যা ইচ্ছা হয় তাই করে, নদীরও হইয়াছে তাই। শুধু গর্জ্জনের কথাটাই একবার ধর না! শোঁ—ও—ও, শোঁ—ও—ও করিয়া সে কি দারুণ শব্দ, বোধ করি দুই মাইল দূর হইতেও তাহা শোনা যায়। জলের সে কি ভীষণ নাচ—প্রায় হাত দশেক উঁচু হইয়া জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আর পরের মুহূর্ত্তেই আছড়াইয়া পড়িয়া নদীর বুকখানা ফাটাইয়া দিতেছে। গোক্ষুর সাপের ফণার মত ঢেউগুলি সপাৎ সপাৎ করিয়া পারের গায়ে ছোবল মারিতেছে, আর ঝুর্ ঝুর্ করিয়া মাটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে নদীর মধ্যে। গোটা নদীময় ঘূর্ণিপাক,—যাকে তোমরা ভাল কথায় বল আবর্ত্ত,তাই খেলিয়া বেড়াইতেছে। তীরে দাঁড়াইতে তো আমাদের সাহসেই কুলাইল না। যদি একবার কোনগতিকে পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া যাই, তো আর দেখিতে হইবে না। নির্ঘাৎ মৃত্যু—হাজার সাঁতার জানিলেও বাঁচিবার ভরসা নাই।

এমন সময় কি দারুণ ব্যাপারই না দেখিলাম! দেখিলাম, মাঝ-নদী দিয়া মানুষের মত কি যেন একটা ভাসিয়া যাইতেছে। হায়রে হায়, কোন্ হতভাগ্যকে বুঝি নদী টানিয়া লইল রে, এক্ষুণি সে সতেরো হাত জলের নীচে তলাইয়া যাইবে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া তাকাইতেই দেখিলাম, লোকটা যেন সাঁতার কাটিয়া আমাদেরই দিকে আসিতেছে। সাবাস্ ভাই, সাঁতার শিখিয়াছিলে বটে! আমাদের কাছাকাছি আসিতেই কিন্তু ভয়ে আর বিস্ময়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার

জো হইল। এ যে আমাদেরই সম-বয়সী একটী ছেলে দেখিতেছি—দু' এক বছরের বড় হইতে পারে। মুখে তার এমনি ফূর্ত্তির হাসি যে বেশ বুঝিলাম, ইচ্ছা করিয়াই নদীতে নামিয়া সে এই সাঁতার-বাজী খেলিতেছে—কক্ষণো সে পড়িয়া যায় নাই। বাপরে বাপ, এই নদীতে সাঁতার-বাজী? এত বড় ডানপিটে ধুরন্ধর যে আমার কল্পনায়ও আসে না! কিন্তু আমি কোন কথা বলার আগেই অবিনাশ, বিজয়, নিমাই—সকলে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "বিশু

হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল

ভাই, লক্ষী ভাই, উঠে পড়্, উঠে পড়্, মারা যাবি।" ওঃ, এই তবে বিশু? এতক্ষণে বুঝিলাম, কেন মেজমামা এর সাথে মিশিতে এত করিয়া বারণ করিতেছিলেন।

বিশু কিন্তু উঠিল না। একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কপ্ করিয়া একটা ডুব দিল। মিনিট্ পাঁচেক চুপচাপ্—কোনই সাড়া-শব্দ নাই, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আমরা

নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। হাত চল্লিশেক দূরে আবার কপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখি বিশু মাথা তুলিয়া মাঝ-নদীর দিকে সাঁতরাইয়া চলিয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে সব্বার প্রথমে কথা কহিল অবিনাশ। বলিল, "কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ভাই! বছর দুই আগে এই বিশু ছিল কি গোবেচারী! সাত চড়েও কথা কইতো না। আর সাহস তো ছিল না বল্লেই চলে! আর এখন? এখন ও না করতে পারে এমন কাজই নেই। কামানের সাম্‌নে বুক পেতে দাঁড়াতে বল্লেও বোধ হয় পিছ-পা হবে না।"

বিজয় অবিনাশের কথায় সায় দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এখন মনে হয় 'বিশে' ডাকাতই বুঝি আবার 'বিশু' নাম নিয়ে বাংলায় এসে জন্মগ্রহণ করেছে; অথচ কি ছিল বছর দুই আগে!"

কথা কহিল না শুধু নিমাই। অবিনাশ তাই তার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি বলিস্‌রে নিমাই?"

নিমাই জবাব দিল, "তোরা তো ওর পরিবর্ত্তনে খুবই অবাক্ হয়ে গেছিস্! তা হবিই তো! কিন্তু কেন যে ও এ রকম বদ্‌লে গেল, সে ইতিহাস যদি জান্‌তিস্, তো এতে মোটেই আশ্চর্য্য হতিস্ নে। বরং এর উল্টো হলেই তোরা আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতিস্।"

"কি ইতিহাস রে ভাই, কি ইতিহাস?

"উঁহু, সে আমি কিছুতেই বল্‌তে পারবো না, ওর বারণ আছে!"

কত বলিলাম, নিমাই কিন্তু কিছুতেই কোন খবর ভাঙ্গিল না।

২

দিন তিনেক হইল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। স্কুল-কম্পাউণ্ডের বড় আম গাছটার তলায় ড্রিল-মাষ্টার আমাদের ড্রিল করাইতেছিলেন। একটা নূতন কায়দা দেখাইয়া দিয়া তিনি সবে মাত্র বলিতেছেন, "যেমন তরকারিতে নুন ঝাল দিলে তার সমস্ত দোষ কেটে যায়, তেম্নি পায়ের ডিস্‌ট্যান্স্ বাড়িয়ে দিলে এ ও সমস্ত

দোষ—" অমনি তাঁর ঠিক মাথার উপরে আমগাছ হইতে একটা হনুমান্ "উব্ উব্" করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ঠিক্ পরের মুহূর্ত্তেই হনুমান্ গাছ হইতে একেবারে লাফাইয়া পড়িল—ড্রিলমাষ্টার আঁৎকাইয়া উঠিয়া হাত দশেক সরিয়া গেলেন।

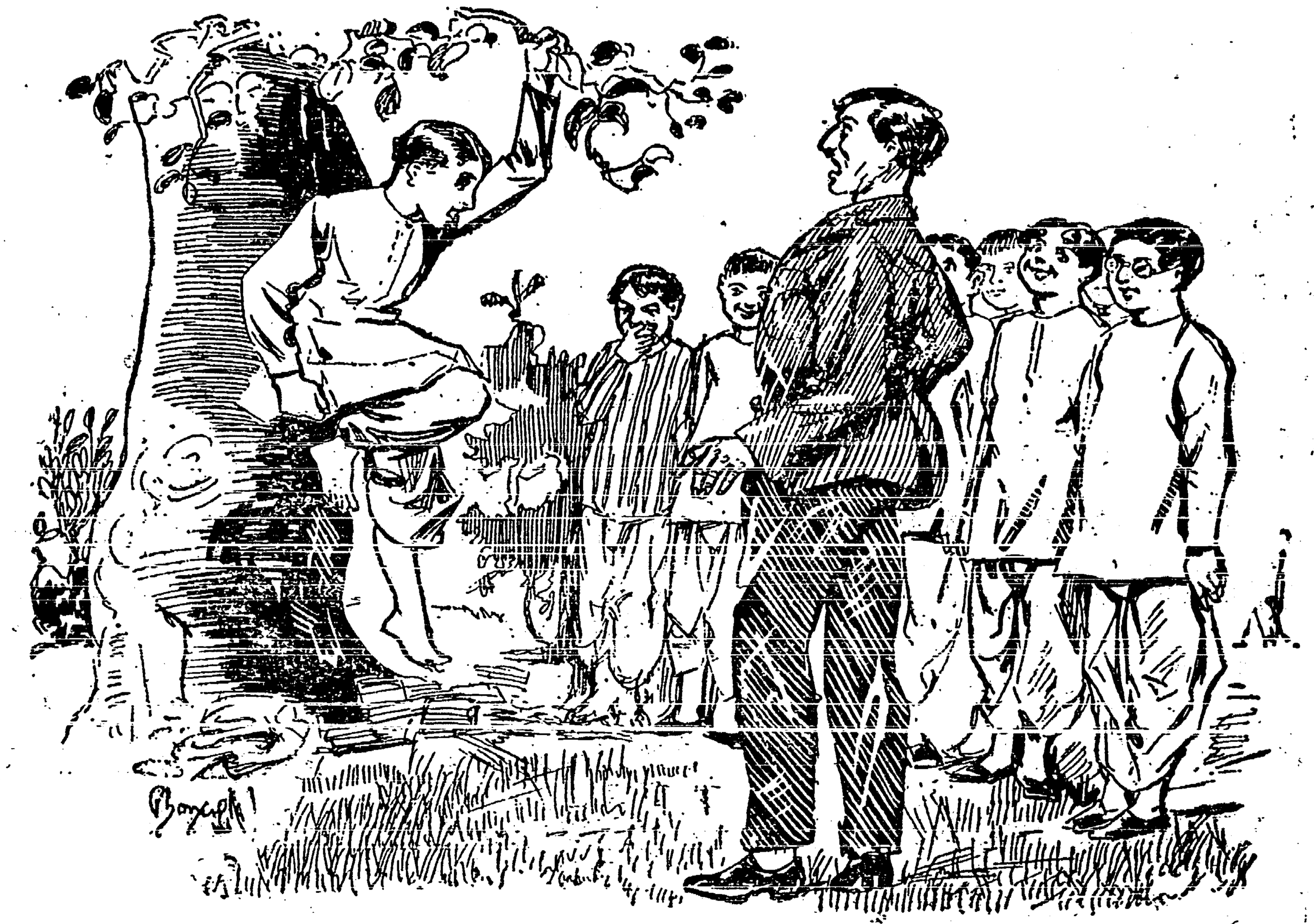

আঁৎকাইয়া উঠিয়া হাত দশেক সরিয়া গেলেন

ছেলের দল একসঙ্গে হাসিয়া উঠিতেই ড্রিলমাষ্টার দেখিলেন, হনুমান্‌টী আসলে মানুষ—তাঁরই ছাত্র, নাম শ্রীমান্ বিশু। বিশু কিন্তু ততক্ষণে হাত দুটী জোড় করিয়া ও মাথাটী নীচু করিয়া ড্রিল্-মাষ্টারের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেন কতই না সুবোধ বালক! মাষ্টার মশাই তখন কাছে আসিয়া খুব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বিশু, তুমি তো আগে এ রকম ছিলে না!"

"আজ্ঞে না।"

"কিন্তু এখন যে একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"কবে থেকে এ রকম জাহান্নামে যেতে সুরু ক'রেছ ?"

"আজ্ঞে কাল থেকে।"

ড্রিল-মাষ্টার বুঝিলেন, ছাত্রটীর সাথে বেশী কথা বলিয়া আর বিশেষ কোন লাভ নাই।

বাড়ী ফিরিবার সময় অবাক্ হইয়া গেলাম—অবিনাশের কথাবার্ত্তায়! সেও দেখি নিমাইএর বুলি ধরিয়াছে; বলিতেছে, "বিশুর ভেতরের কথা তোরা যদি শুনিস, তা'হলে তোরাও বুঝবি, এ সব ব্যাপারে কিছুই আশ্চর্য্য হবার নেই!" "ভেতরের কথাটা" কিন্তু সেও কিছুতেই ভাঙ্গিল না। দুই দুইজন লোক একটা কথা চাপিয়া যাইতেছে, কাজেই কৌতূহলটা যে কেমন হইল, তা'তো বুঝিতেই পার!

ঠিক এম্নি সময় হাজির হইল আসিয়া বিশু নিজে। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিল, "নতুন ভর্ত্তি হয়েছিস্ বুঝি? যতে গু'র ভাগ্নে না তুই?"

কথার ছিরিখানা দেখনা একবার! মেজমামার নাম 'যতীন', 'যতে' বল্‌বার দরকার কিরে তোর? যতীন বল্‌তে কি মুখে ব্যথা হয়? তারপর মামার পদবী গুহ, গুহ-ই বলা উচিৎ, গুহ'র 'হ'টা বাদ দিলে কি বিশ্রী শোনায় বলতো! ভারী বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলাম, তাই শুধু মাথা নাড়িয়া ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলিয়াই চুপ করিলাম।

৩

সাত, আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। সহরের মাইল দুই দূরে একটা বড়-মত খাল ছিল। বড় বলিলাম এই জন্য যে খালটা চওড়াও ছিল খুব আর গভীরও ছিল খুব; কিন্তু জল তাতে এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। নৌকা চালান চলিত বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, তার বেশী আর কিছু নয়! সন্ধ্যা তখনও ঠিক হয় নাই, কিছু বাকী আছে, আমি সেইখানে একদিন যাইতেছিলাম। খালের উপরেই রেলের পোল। সেদিকে তাকাইতে গিয়া দেখি বিশু পোলের ভাও (ঐ যে প্রকাণ্ড উঁচু ধনুকের মত জিনিষ গুলা, ইংরাজীতে যাকে বলে আর্চ্চ) বাহিয়া

দিব্যি উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। আগের দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, ভাও নিশ্চয়ই পিছল হইয়া রহিয়াছে; যদি কোন মতে পা একটুখানি পিছলাইয়া যায় তো একশো হাত নীচে পড়িয়া একেবারে চূরমার হইয়া যাইবে, কেননা নীচে জল যে কতখানি সে তো আগেই বলিয়াছি। বিশুর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই, খাসা বাহিয়া চলিয়াছে।

আমায় দেখিয়া বিশু নামিয়া আসিল; বলিল, "হ্যাঁরে, কেষ্টা, তুই নাকি আমার ইতিহাস জান্‌বার জন্যে দিন রাত অবিনাশ আর নিমেকে খোঁচাচ্ছিস, শুন্‌তে ইচ্ছে হ'য়েছে নাকি তোর?"

বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, বলিলাম 'হ্যাঁ ভাই'।

"আচ্ছা। চল্ তবে আমার সাথে শ্মশানখোলার দিকে।"

খালের ধার ধরিয়া আমরা শ্মশান খোলার দিকে চলিলাম। জায়গাটা বাস্তবিকই ভীষণ! আশে পাশে দু'তিন মাইলের মধ্যে মানুষের নামগন্ধও নাই। আধ মাইলটেক দূরে একটা বড় জঙ্গল, তাতে বোধ করি দিনের বেলায় হাতী গণ্ডারও লুকাইয়া থাকিতে পারে।

বিশু আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে প্রায় মিনিট্ খানেক তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ, প্রায় দু'বছর আগে আমি মরে গেছি!"

একে তো শ্মশানের কাছে বসিয়া, তাতে চারি পাশের দৃশ্যটা অমন চমৎকার, বিশুর চোখমুখের ভঙ্গী আর কথার ধরণ শুনিয়া আমি যেন দশ হাত মাটীর নীচে ঢুকিয়া পড়িলাম। ভয়ে হাঁটু দুটা কাঁপিতে লাগিল, গলা কাঠ হইয়া আসিল, কোনমতে বলিলাম "ওকি কথা? ওতে আমার বড় ভয় করে।"

বিশু বলিল, "কিন্তু অই ঠিক কথা যে! আমি তো আর মানুষ নই, আমি তো ম'রে গেছি। তোর সামনে দাঁড়িয়ে এতো মরা বিশুর প্রেতাত্মা।"

আমি আর পারিলাম না, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তোমরা হাসিতেছ? হাস, ও অবস্থায় পড়িলে তোমরাও কাঁদিতে।"

বিশু একটু নরম হইয়া বলিল, "ব্যাপারটা শোন্ তবে। আগে ছিলাম

আমি একেবারে নিরীহ গোবেচারা। প্রথমবার যখন পরীক্ষায় ফেল্ হ'লাম, তখন বাড়ীর সকলের কি টিট্‌কারী! মানুষ ব'লে কেউ মনে কর্‌তেই চায় না, গরু গাধার সামিল মনে করে, আর উঠ্‌তে বস্‌তে খোঁটা দেয়। কপাল খারাপ, তাই পরের বছরও ফেল্ হ'লাম। আমার ছোট ভাই শিবু আমার ওপরে উঠে গেল। এবার আমার তিষ্ঠানই দায় হোলো। ঘরে টিট্‌কারী, বাইরে টিট্‌কারী, টিট্‌কারী ছাড়া কেউ কথাই কয় না। মনে বড় দুঃখ হলো, ভাবলাম, দূর ছাই এ জীবন না

"ওকি কথা? ওতে আমার বড় ভয় করে।"

রাখ্‌লে আর কি হয়? আজ জলে ডুবেই মরবো। নদীর কাছে এসে কিন্তু একটা ভারী চমৎকার কথা মনে হোলো। ভাব্‌লাম, এম্নিভাবে মর্‌তে যাই কেন? তার চেয়ে ভাবি না কেন মরেই গেছি? তা হ'লে তো পৃথিবীতে কোন কাজ কর্‌তেই আর পিছ-পা হব না, কেননা মরণের ভয়ই যদি না থাক্‌লো, তবে আর কোন্ কাজ না কর্‌তে পারি? মরে তো আমি গেছিই, শুধু মরণের কষ্টটা আজ না পেয়ে দুদিন পরে পাওয়া বই তো নয়! এবার এমন সব কাজ কর্‌তে আরম্ভ করবো, যাতে পৃথিবীতে আমার একটা নাম থেকে যায়। সেদিন থেকেই আমি

এ রকম। এমন কাজ এখন নেই যা আমি না কর্‌তে পারি। লোকে বলে আমার মত সাহসী ছেলে নাকি দেশে আর একটীও নেই। এর মধ্যেই চার পাঁচ বার খবরের কাগজে নাম উঠে গেছে।"

মুখ দিয়া আমি আর একটী কথাও বাহির করিতে পারিলাম না।

ঠিক এমনি সময় জঙ্গলের দিক হইতে একটা ভীষণ শব্দ আসিল। আমি কলিকাতায় অনেকবার গিয়াছি, চিড়িয়াখানাও দেখিয়াছি, বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এ বাঘের গলার আওয়াজ। ভয়ে সারা শরীর কাঁপিতে লাগিল। একটা পাকা বাঁশের মোটা লাঠি শ্মশানের কাছে পড়িয়াছিল; বোধহয় কোন হিন্দুস্থানীকে পোড়াইতে আসিয়া তাহার বন্ধুর দল তার সাধের লাঠিখানাও তারই কাছে রাখিয়া গিয়াছিল, বিশু সেখানা উঠাইয়া লইল। আবার বাঘের ডাক শোনা গেল—এবার আওয়াজ আরও কাছে। বিশু বলিল, "আজ ভোরে নিশ্চয়ই কোন ভাল লোকের মুখ দেখে উঠেছিলাম, কেননা আজ আমার জীবনের আশা পূর্ণ হবে। বাঘের সাথে লাঠি হাতে লড়াই করা আমার জীবনের একটা মস্ত বড় সাধ। তুই সাইকেল চড়্‌তে পারিস্?"

কোন মতে জবাব দিলাম "পারি।"

"তবে এই নে চাবি, পোলের গায়ে আমার সাইকেল তালা লাগান আছে, খুলে নিয়ে তাতে চড়ে বাড়ী পালা!" বিশুর কথা শেষ হইতে না হইতে আবার সেই আওয়াজ, এবার খুব কাছে। সন্ধ্যা তখন ঘোর হইয়া আসিয়াছে, বাঁশের লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া বিশু সেই ভীষণ জানোয়ারের উদ্দেশে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

গৌ	ত	ম
ত	ব	লা
ম	লা	ট

(২)

পা	ট	না
ট	গ	র
না	র	দ

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

শ্রীআভারেণু দেবী (রংপুর) হিমাংশুকুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ী) কানাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কাঁচড়াপাড়া) শিশির কুমার রায় (বসির হাট) অশোক কুমার মুস্তফী (গয়া) The members of the Co-operative Society of 3rd Class, Uluberia H. E. School. সলিল চন্দ্র বর্দ্ধন (নেত্রকোণা!) সুনন্দা ভৌমিক (রংপুর) সাধনাপ্রসাদ দাসগুপ্ত (দমদম্) চতুর্থ শ্রেণীর বালক সমিতির সভ্যবৃন্দ (সরিষা এইচ, ই, স্কুল) সুষমা দেবী (ভবানীপুর) গৌরী চাটার্জ্জী (গয়া) মধ্য বাংলা সারস্বত আশ্রম ঋষি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, হিমাংশু কুমার মল্লিক (কলিকাতা) মদন কুমার চট্টোপাধ্যায় (বোয়ালমারী, ফরিদপুর) অমিয় কুমার বরাট (পাটনা) রাজলক্ষ্মী, জয়লক্ষ্মী, সতীলক্ষ্মী ও অনিল দত্ত (আকুই, বাঁকুড়া) উত্তর বাঙ্গালা ঋষি বিদ্যালয়ের সারস্বত আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ (বগুড়া) বিমল, শৈলেন, ননী, নিখিল, রমেন্দ্র ও শান্তি (কলমা) অরুণা দেবী (পাটনা) রেণু, পবিত্র, রাণু, সতী, নন্দিতা, দীপক, মিনা ও খোকন (পাটনা) মনুজেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী (নৈহাটী) শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় (ধূবড়ী), এম্ ডি, তরিবত উল্লা ও ধূম্ররাম (খোয়াই, শ্রীহট্ট) তরু, উষা, প্রভা. হাসি, এনা, বকুল, জ্যোৎস্না, সুবর্ণ, আশা, ভদ্রা, কুটপু, ফুল্ল, তরু (২য়) (ফয়জন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়, কুমিল্লা) আশুতোষ চৌধুরী (পাটনা) বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য (সুরানন্দ, শ্রীহট্ট) বীরেন্দ্রলাল সেন (ছনহরা, চট্টগ্রাম) ব্যোমকেশ মজুমদার (ত্রিবেণী), অজিত, মনোরমা ও অনুপমা (চাঁপাই, নবাবগঞ্জ) জ্যোৎস্না দেবী (কুড়িগ্রাম) হরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (কালীঘাট) ইন্দুভূষণ দে (গাইবান্ধা, রংপুর), অমরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (রাজসাহী), মাষ্টার চক্রবর্ত্তী (পুরী), অনিল, রণজিৎ, কল্যাণী, অজয়, অঞ্জলি, কনক (কলিকাতা), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা), উষা, উমা, কনক ও মণি (কলিকাতা) রিমু, টিরু, জামাইবাবু, দিদি, নিপু, দলু, মনুয়া (রাণাঘাট) বসন্তকুমার ও বিনয়কুমার ঘোষ (লক্ষ্মীপুর, কাছাড়), নিখিল চরণ বসু (ঢাকা), সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, বনবিহারী রায় (গফর গাঁও, ময়মনসিংহ) ধ্রুবজ্যোতি সেন (কলমা), শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরশি, ফরিদপুর), গোকুলানন্দ দাস (রংপুর) পারিজাত-রেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), সুধীন্দ্র, শান্তি, ফণীন্দ্র, সুবর্ণ ও আদরিণী দেবী (গাইবাঁধা), দুর্গাকান্ত বাগচী (শেরপুর) আশা, অশোক, বিমল, সুষমাময়, ক্ষেমময়, চিনি, প্রীতি, তুলি, বাসন্তী, জ্যোৎস্না (কলিকাতা), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী ।

যাঁহারা ১টি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন—

শ্রীশৈলেন্দ্র ও জ্যোৎস্না দত্ত (আড়াই হাজার, ঢাকা) পঞ্চানন দত্ত (আটরা), সুধীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ (দিনাজপুর), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুন গো পাড়া), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী) ।

—o—

নূতন ধাঁধা

১

আর সকলে মাথা ঘুরলে শুয়ে থাকে, অন্য সময় দাঁড়ায়, আমি কিন্তু ঠিক তার উল্টো করি। এমনি শুয়ে থাকি, মাথা ঘুরলেই দাঁড়াই।—বলত—আমি কে ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২

সাগরেতে জন্মে তারা, নগরেতে বাস
মায়ে ছুঁলে পুত্রে মরে, এ কি সর্ব্বনাশ !

শ্রীরামরতি চক্রবর্ত্তী

দার্জ্জিলিং এর পথে

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

১ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ { ১১শ সংখ্যা

পর্য্যটকের পস্তানি

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

ঠিক হোয়েন্থ্-সাঙের মত, হৈয়ঙ্গ্-বীন্ ভট্ট,
কল্‌কাতাতে হঠাৎ হাজির কষ্ট করে বড্ড।
পশ্চিমা দূত লিখে গেছেন ভারত-বাসীর শৌর্য্য,
চৈনিক হায়, পাঠ করেছেন—নাইক সেথা চৌর্য্য ;
মিথ্যা কথা কয়না তারা, প্রাণ যে তাদের ধর্ম্ম ;
আদর্শ সে দেশটা দেখা সবার উচিত কর্ম্ম।*

* তোমরা নিশ্চয়ই ইতিহাসে পড়িয়াছ যে ভারতবাসীরা বহুপূর্ব্বে খুব উন্নতচরিত্রের লোক ছিল।

২

ভক্তি ভরা বক্ষে এলেন দেখ্‌তে সোণার বঙ্গ,
অলক্ষ্যেতে গাঁট-কাটা এক নিলো তাঁহার সঙ্গ।
রিক্‌সা-ওয়ালা চাইলে ভাড়া, কর্‌লে নাক' শঙ্কা,
—কালীঘাটে পৌঁছে দিতে চারটী গোটা টঙ্কা।
সত্যবাদী ভারতবাসীর কথায় করে ভরসা
হাবাৎ হলেন হৈয়ঙ্গ্‌বীন, দেখার দফা ফরসা।

৩

যেতেই সেথা, গোটা দশেক ফড়ে এবং পাণ্ডায়,
হেঁচ্‌কা টানে ওষ্ঠাগত কর্‌লে তাঁহার প্রাণটায়।
দর্শনী চায়, প্রণামী চায়, জুট্‌লো এসে সব ভাট্‌,
বল্লে, 'ইনি ধন-কুবের, জাপান দেশের সম্রাট্‌!
তীর্থ করে যাবেন ফিরে—আস্‌বে নাক' আর ত,
অর্থ দিয়ে যাবেন নিয়ে নিছক পরমার্থ!'

৪

সঙ্গীটী তাঁর সেই সুবিধায় নোট আর টাকা কৌড়ি,
পকেট কেটে হাতিয়ে নিয়ে চম্পট্‌ দেয় দৌড়ি'।
পথের ধারে বুদ্ধু পাঁড়ে, গুণ্ডা শ্রীমান্ কান্তি,
কর্‌লে বাকী বেবাক নিয়ে চৌর্য্য-ভয়ের শান্তি।
সটান ধরে সরাসরি চালান দিলে সন্থ,
সঙ্গে দিয়ে আফিং, কোকেন, এবং চোরাই মন্থ!

৫

উকীল তাঁরে শিখায় কতই, পেয়াদা চাহে প্রাপ্য!
অন্যে যারা, যে সব চাহে, সে সব কথা যাক্‌গো।

হৈয়ঙ্গ্‌-বীন্ হলেন হাবা, বিকল তাঁহার বিদ্যে,
ভাবেন বুঝি ইতিহাসের সকল কথাই মিথ্যে।
ভাবেন একি, কেমন করে বদ্‌লে গেল জাতটা?
মিথ্যা নিয়ে ওড়ন-পারণ, মিথ্যা জোগায় ভাতটা!

৬

চুরি করা বিদ্যা বড়, শাস্ত্র হলো তাই কি,
সত্যি এদের একেবারেই লজ্জা, ঘৃণা, নাই কি?
দুঃখ যেয়ে হচ্ছে আমার অধিক বেশী রাগ গো,
সত্য-সন্ধ-বংশধরের এম্‌নি হত ভাগ্য।
দেখ্‌লে এদের দারুণ দশা জল যে আসে নেত্রে!
কুকুর শুঁঞা রোপ্‌লে কে হায়, তাজা আকের ক্ষেত্রে?

৭

তপোবনের কই সে শোভা, কর্‌লে ভেঙ্গে চূর কি?
কোথায় শিখী? চরছে শুধু বাস্তু ঘুঘু, মুরগী!
কোথায় বিপুল বোধিদ্রুম, অক্ষয় বট মরলো?
এরণ্ড আর আলকুশীতে শালের সে বন ভর্‌লো!
ধর্ম্ম ছেড়ে প্রমোশন্‌টা দেখ্‌ছি পেলে অর্থে,
মোক্ষ পাবার আগেই যাবে জাহান্নমের গর্ত্তে!

এ যুগের দধীচি

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

বীর বলিতে আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই—লোকটির গায়ে যেমন জোর, তেম্নি তার সাহস, আর তেম্নি বড় যোদ্ধা সে। কিন্তু আর এক রকম বীর আছেন,

যাঁহারা জ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য, নূতন নূতন আবিষ্কারের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করেন। তাঁহারাও যুদ্ধ করেন বটে—কিন্তু সে যুদ্ধ মানুষের সাথে নয়, আরও ভয়ঙ্কর শত্রুর সাথে। কে যে সে শত্রু তাহাও সব সময়ে জানা থাকে না। ইঁহাদের আমি আরও বড় বীর বলিয়া মনে করি।

সেদিন কাগজে পড়িলাম ডাক্তার সিড্‌নি উইল্‌সন্ মারা গিয়াছেন। পরীক্ষাগারে ঢুকিয়া তিনি কতকগুলি বিষাক্ত গ্যাস লইয়া কাজ করিতেছিলেন; অনেকক্ষণ তাঁহার সাড়া-শব্দ না পাইয়া তাঁহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া দেখেন, এক বিরাট্ যন্ত্রের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক পাথরের মত অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। মুখে একটা ঢাকনী—দেহে প্রাণ নাই।

ডাক্তার উইল্‌সন্ কে ছিলেন জাননা নিশ্চয়ই। তিনি ছিলেন এক মস্ত বৈজ্ঞানিক। মানুষের যন্ত্রণা কমাইবেন এই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এইখানে একটা গোড়ার কথা জানা দরকার। অনেকদিন আগে যখন লোকে বিজ্ঞানের বিশেষ ধার ধারিত না, তখন শরীরের কোন জায়গায় অস্ত্র করিতে হইলে রোগীর পক্ষে ব্যাপারটা ছিল প্রাণান্তকর। ওঃ, সে কি দারুণ যন্ত্রণা! তারপর আস্তে আস্তে যখন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল তখন অস্ত্র করিবার আগে রোগীকে গ্যাস শুঁকাইয়া অজ্ঞান করিয়া, তার পর অস্ত্রোপচার করা হইত। তাহাতে অস্ত্র করিবার সময় রোগীর কোনও কষ্ট হইত না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ব্যাপারও হইত যে রোগী বেচারীর আর জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না। উইল্‌সন্ চেষ্টা করিতেছিলেন কয়েকটা গ্যাস মিশাইয়া এমন একটা জিনিষ তৈরী করিবেন, যাহা ব্যবহার করিলে রোগী অজ্ঞানও হইবে না, অথচ কোনও কষ্ট বুঝিবার ক্ষমতাও তার থাকিবে না। শেষ পরীক্ষাটা তিনি নিজের উপর দিয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাই এত বড় একটা প্রাণ চলিয়া গেল—এমন মাথা-ওয়ালা লোকটাকে আমরা হারাইলাম। অথচ এত বড় যে আত্মত্যাগ কয়জন তাহার খোঁজ রাখে বল!

বিজ্ঞান-জগতের ইতিহাস ঘাঁটিলে কিন্তু এ রকম আরও অনেক ঘটনার কথা জানা যায়। এই যে দিনের পর দিন, অসংখ্য নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে এর

কতকগুলির জন্য যে আবিষ্কারকের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল কে বলিতে পারে? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন—ফল যে কি হইবে তাহা তিনি কিছুই জানেন না; কিংবা হয় ত' তিনি জানিয়া শুনিয়াই কাজে হাত দেন যে ব্যাপারটা মারাত্মক হইয়া পড়িবার খুবই সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা পিছ-পা হন না। এই ত' বীর! ফলে কখনও হয় ত' তিনি জয় লাভ করেন, পৃথিবীর সম্মুখে নূতন নূতন সত্য তুলিয়া ধরেন, আবার কখনও বা পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়া যান।

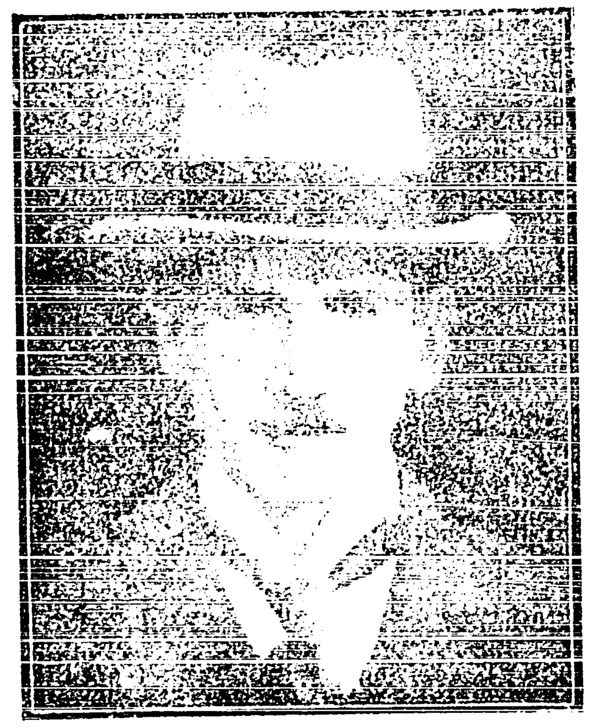

ইঁহার নাম সিম্প্‌সন্

উইল্‌সনের নাম করিতে আজ ঠিক এই ধরণের আর একটি লোকের কথা মনে পড়িল। ইনি রোগীকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র করিবার পথ দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার নাম সিম্প্‌সন্। সে আজ প্রায় আশী বছর আগেকার কথা। আগেই বলিয়াছি, তখনকার দিনে ঘা, ফোঁড়া, অস্ত্র করিবার সময় রোগীরা কি রকম যন্ত্রণা পাইত, কত শিশু যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় মারা যাইত। সে সব দেখিয়া সিম্প্‌সনের বড় কষ্ট হইল; তিনি ভাবিলেন এর যদি একটা প্রতিকার করিতেই না পারিলাম তবে এতদিন ছাই কি বিজ্ঞান শিখিয়াছি? তিনি ঠিক করিলেন এমন একটা কিছু বাহির করিবেন যাহা দিয়া রোগীকে খানিকক্ষণের জন্য অজ্ঞান করিয়া রাখা যায়। তোমরা ক্লোরোফর্ম্মের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। ডাক্তারদের বাড়ীতে শিশিতে ভরা ক্লোরোফর্ম্ম প্রায় সব সময় মজুত থাকে। কলেজে বিজ্ঞান শিখিতে গেলে রাতদিন ক্লোরোফর্ম্ম লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়। সিম্প্‌সন্ দেখিলেন এই ক্লোরোফর্ম্ম লইয়া কাজ চলিতে পারে। কিন্তু কাজ চালাইবার আগে ত' ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই! কিন্তু কাহার উপর পরীক্ষা

করা যায় ? সে জিনিষ হয় ত' এমন দাঁড়াইবে যে একবার অজ্ঞান হইয়া আর জ্ঞানই হইল না ! তাহা হইলেই ত' সব চুকিয়া গেল ! তিনি ভাবিলেন "নাঃ অন্যকে বিপদে ফেলব না, নিজের উপরেই পরীক্ষা চালাইব।" নিজের উপর তিনি অনেক-বার পরীক্ষা করিলেন ; তারপর ক্রমে ক্রমে আত্মীয়-স্বজনের উপরেও পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাপারটা নেহাৎ সাধারণ বলিয়া মনে করিও না ; অনেকবার এমনও হইয়াছে, সিম্পসন কিংবা তাঁহার কোন আত্মীয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন—সকলে জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে—তারপর হঠাৎ দেখা গেল মূর্চ্ছিত লোকটি উঠিয়া বসিয়াছেন।

শিলি।

সেকালের আর একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন শিলি। তাঁহার মত এত নূতন নূতন আবিষ্কার বোধ হয় খুব কম লোকেই করিয়াছেন। শিলি একটা এসিড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার নাম হাইড্রোসায়নিক এসিড। এই এসিডের সাহায্যে বিজ্ঞানের আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে—কিন্তু এমন বিষাক্ত এসিডও বোধ হয় আর নাই। ইহার সামান্য এক কণাও নাকে কিংবা মুখে গেলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য্য। শিলি একদিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছিলেন ; কেমন করিয়া জানিনা, এই বিষাক্ত জিনিষটার একটুখানি বোধহয় তাঁহার টেবিলের উপর পড়িয়াছিল, আর শিলি তাহার উপর হাত রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ হাতটা

তাঁহার মুখে লাগিল। শিলি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন কি হইল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে গেলেন "ও ইট্ ইজ্ হাইড্রোসায়নিক এসিড!" (ও এটা হাইড্রোসায়নিক এসিড) কিন্তু সেটুকু দেরীও সহিল না—"ও ইট্ ইজ্ হাইড্রো—" পর্য্যন্ত বলিয়াই বিজ্ঞান বীর চিরদিনের জন্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

তোমরা ইয়োলো ফিবারের নাম শুনিয়াছ কি ? এ এক রকম মারাত্মক ব্যারাম। বিজ্ঞানের জন্য আত্মত্যাগের যত কাহিনী আছে তাহার মধ্যে এই ইয়োলো ফিবারের রহস্য বাহির করিবার চেষ্টাই বোধ হয় আমাকে বেশী স্তম্ভিত করিয়া দেয়। সে গল্প শুনিলে তোমরাও চমকিয়া উঠিবে।

বছর ত্রিশেক আগেকার কথা। আমেরিকানরা কিউবা অধিকার করিয়াছে। কিন্তু সেখানে তখন ইয়োলো ফিভারের মড়কে দেশ লণ্ড-ভণ্ড হইবার যোগাড়। এই একজন লোক দিব্যি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, একটু পরেই দেখা গেল সে বিছানায় পড়িয়া—মারাত্মক রোগের সমস্ত লক্ষণ তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে ; তারপর দুইদিন যাইতে না যাইতেই সব শেষ। কি করিয়া যে রোগ হইল কেহ বলিতে পারে না, অথচ মড়ক বাড়িয়াই চলিয়াছে।

তখন ডাক পড়িল বৈজ্ঞানিকদের, রোগের কারণ বাহির করিতে হইবে। এই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছিলেন চারজন ডাক্তার। রীড্, ক্যারোল, লেজিয়ার, ও আগ্রামণ্ট। কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা ঠিক করিলেন, একরকম মশা এই ব্যারামের বীজ ছড়াইয়া বেড়ায়। এইবার হাতে হাতে পরীক্ষার পালা। কিন্তু পরীক্ষার আগে কয়েকজন সুস্থ লোক চাই, যাহাদের জীবন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে।—মরণের ভয় নাই এমন কে আছে ?

ডাক্তার চারিজন বলিলেন—অন্য লোক লাগিবে না—আমরা নিজেদের উপরেই প্রথম পরীক্ষা চালাইব। প্রথম বুক পাতিয়া দিলেন লেজিয়ার। কতকগুলি মশা ধরিয়া আনা হইল। সেগুলিকে প্রথমে ছাড়িয়া দেওয়া হইল চারিজন ইয়োলো ফিভারে আক্রান্ত রোগীর উপর। মশা তাহাদের কামড়াইল। তারপর

সেই মশা গুলিই আসিয়া লেজিয়ারকে কামড়াইল। কিন্তু কেন জানিনা লেজিয়ারের কিছুই হইল না। তারপর ক্যারোলের পালা। ক্যারোলকেও ঐ রকম কতগুলি মশা আসিয়া কামড়াইল। তিনি কিন্তু পরদিনই সেই ভয়ঙ্কর রোগে পড়িলেন। জীবন-মরণের মাঝপথে কয়েকদিন কাটাইয়া ক্যারোল সে যাত্রা বাঁচিয়া উঠিলেন। লেজিয়ার আবার বুক পাতিয়া দিলেন। কিন্তু এবার আর রক্ষা ছিল না। লেজিয়ার বুঝিতে পারিলেন, তাই ক্যারোলকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের গবেষণার সমস্ত ফলাফল লিখিয়া লইতে বলিলেন। তারপর চারদিন কাটিয়া গেল। লেজিয়ার আর উঠিলেন না; মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে অমর বীর জ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রাণ দিয়া গেলেন।

পরীক্ষা কিন্তু তখনও শেষ হয় নাই। রোগ সংক্রামক কিনা জানিবার জন্য কয়েকজন লোক নিজে হইতে রুগ্ন ব্যক্তির পোষাক ও বিছানা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের কিছু হইল না। তারপর কতকগুলি মশাকে ইয়োলো ফিভারের রোগীর রক্ত খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া বাড়িতে দেওয়া হইল। এইবার প্রশ্ন উঠিল কে ইহাদের কামড় খাইবে? কিসিংগার ও মরান্ নামে দু'জন সৈন্য বলিল "আমরা রাজী আছি।"—সকলে ত' অবাক্; সাধারণ শ্রেণীর ২টি লোক বিজ্ঞানের জন্য প্রাণ দিতে চায়! কিসিংগার মশার কামড় খাইলেন। রোগের যাতনায় মাসের পর মাস ছট্ ফট্ করিয়া শেষে কোনও ক্রমে বাঁচিলেন! কিসিংগার এখনও বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পান নাই। তাঁহাকে নাকি ডাক্তারেরা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিসিংগার তাহা লন নাই। জবাব দিয়াছিলেন—"আমি যা করেছি তা বিজ্ঞানের খাতিরে, টাকার লোভে নয়।"

এখনও আফ্রিকায় ইয়োলো ফিভারের উচ্ছেদের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা খাটিতেছেন। এই সেদিন—মাস দুই আগে—জাপানী বৈজ্ঞানিক নেগুচি এই রোগের গবেষণা করিতে গিয়া শেষে নিজে সেই ভয়ঙ্কর রোগে পড়িলেন আর উঠিলেন না। কি অদ্ভুত বল দেখি! রোগের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন কিন্তু তখনও অপরের জন্য খাটিতে দ্বিধা নাই। নেগুচি রুগ্ন শরীরে বিছানায় বসিয়া নিজের গায়ের

প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল

রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিতেন। মরিবার আগে সে পরীক্ষার ফলাফল জানাইয়া যাইতে ভুলেন নাই।

এবার আর কয়েকজন আধুনিক বিজ্ঞানবীরের নাম করিব। প্রফেসর হ্যারল্ড্ ম্যাক্সওয়েলের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শোন নাই। বিষধর পোকা-মাকড় ধ্বংস করিবার জন্য ইনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। নানা রকম গ্যাস লইয়া ইনি সারাদিন পরীক্ষা করিতেন। একদিন তিনি একটা ঘরে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত বসিয়া আছেন; দেওয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা বোতল দেখাইয়া তিনি বলিলেন "এই যে বোতলটা দেখ্‌ছ, ওটা যদি ওখান থেকে পড়ে যায় তবে কি হয় বল ত?" বন্ধুরা জিজ্ঞাসুভাবে চাহিলেন।

পাঁচ দিন চার রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া……

ম্যাক্সওয়েল হাসিয়া বলিলেন "এক সেকেণ্ডের ভিতরই এ ঘরের মধ্যে যারা যারা আছি, সব শেষ হয়ে যাই।" তারপর বলিলেন "অথচ এ জিনিষটা

নিয়ে আমাকে রাতদিন নাড়াচাড়া করতে হয়।" ইহার কিছু পরেই দেখা গেল ম্যাক্সওয়েল তাঁহার পরীক্ষাগারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। সে মূর্চ্ছা আর এ জীবনে ভাঙ্গে নাই।

পঞ্চাশ জন ছাত্র একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"আমি আমি"।

আর একখানা ছবি দেখ, একজন লোক ঘুমাইতেছেন। ইনি কে জান? ইঁহার নাম ডাক্তার ফিশার। অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিলে শরীরের ভিতরকার কলকব্জাগুলির অবস্থা কেমন হয় জানিবার জন্য ইনি ৫ দিন ৪ রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিলেন—তারপর এই ঘুমাইয়াছেন। তাঁহার সহকারী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন।

এতক্ষণ বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কথাই বলিলাম। বিলাতের ছাত্রেরা বিজ্ঞানের জন্য কি করিতে পারে তাহারই একটা গল্প বলিয়া এবার শেষ করিব। মানুষ পোকামাকড়ের বিষ শরীরের মধ্যে কতটা সহ্য করিতে পারে তাহা জানিবার জন্য নিউ ইয়র্ক্ হোমিওপ্যাথিক কলেজের এক অধ্যাপক, ডাঃ লিন্ বয়েড, একবার তাঁহার ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে শরীরের মধ্যে বিষ নিতে রাজী আছ

বল।" পঞ্চাশ জন ছাত্র একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "আমি, আমি।" ছয়মাস ধরিয়া এই পঞ্চাশজন অসম-সাহসিক যুবক প্রত্যেক দিন নানা রকম বিষাক্ত কীট পতঙ্গের বিষ শরীরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। আর তাহার ফলে বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন তথ্যের পথ খুলিয়া গিয়াছে। ভগবানের দয়ায় এই বীরদের কাহারও তেমন কিছু হয় নাই।

চিন্‌তে পার?

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

ও বাবাজি! একটা কথা, চিন্‌তে পার' আমারে?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায়—নয়তো কি আর বল্‌ছি রামা-শ্যামারে!
আচ্ছা, অমন হাবার মত চাইছ যে তার মানে কি—
নতুন কিছু দেখ্‌তে পেলে আমার কোনও খানে কি?
সেইতো গণেশ গণেশ আছি, শুঁড় ওঠেনি গজায়ে,
অবাক্ বটে! তাইতো দেখি, কলিকালের মজা এ!
চিন্‌তে আদৌ পার্‌লে নাকো?—আচ্ছা দাঁড়াও বুঝিয়ে—
এক মিনিটে সন্দেহটা দিচ্ছি তোমার ঘুচিয়ে।
কেষ্টহরির বোন্‌পো থাকে—তোমাদের ঐ পাড়াতে,
বিষ্টু চরণ ঘোষ আছে ঐ তাদের বাড়ী ভাড়াতে,
সেই যে সেদিন দু'পুর রোদে একটা ধেড়ে কাকেতে—
সুযোগ বুঝে মনের সুখে ঠোক্‌রালো যার টাকেতে,
সেই লোকেরি বল্‌ছি কথা—ঢুক্‌লো এখন মাথাতে?
—এ'ধার এস, বিষ্টি কি আর মান্‌বে ফুটো ছাতাতে?
এই ম'রেছে এ সব কথা কাণেও কি ছাই ঢোকেনি—
আচ্ছা দাঁড়াও, আমার কথাও একেবারে ঢোকেনি;

বিষ্টু বাবুর মাসীর ছেলে ডান্‌পিটে সেই হারুকে—
জেল হ'তে যে ছাড়িয়েছিলাম জান্‌তে দিইনি কারুকে,—
তার পিসিমার পিস্‌তুতো ভাই, ন'দের চাঁদের সাথেতে—
তোমার বাবার বিয়ের রাতে খেয়েছি এক পাতেতে।
ঠিক্ বাবাজি, এবার তুমি আমার কাছে হেরেছ—
চুপ্ ক'রে যে, সঠিক বলো—চিন্‌তে আমায় পেরেছ ?

বুদ্ধির বাহাদুরী

(শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল।)

দুটি মুসলমান এক গাঁয়ে বাস করতো। তা'দের নাম বড়ো কেউ জান্‌তো না। লোকে ডাক্‌তো তাদের বড়ো মিঞা আর ছোটো মিঞা বলে'। বড়োর ছিল চারটে বলদ ; ছোটোর ছিল একটা। তা'রা দুজনেই ছিল চাষা। ছোটো মিঞা ফি সপ্তায় ছ'দিন করে' বড়ো মিঞাকে নিজের বলদটি দিতো, আর তা'র হ'য়ে জমি চাষ কর্‌তো। বড়ো মিঞা ফি রবিবার তা'র চারটে বলদ নিয়ে ছোটো মিঞার জমিতে আস্‌তো, আর সেদিন পাঁচটা বলদে ছোটো মিঞার জমিতে লাঙল টান্‌তো। সেদিন ছোট মিঞার কী আমোদ! পথ দিয়ে লোক চলাচল করতো,—দুনিয়ার লোক ফি রবিবার ভালো পোষাক পরে' দিব্যি সেজেগুজে গান গাইতে গাইতে হাটে যেতো—আর ছোটো মিঞা পাঁচটা বলদের পিঠে সপাসপ্ চাবুক মারতো, আর পথের লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তো,—"হট্, হট্, আমার পাঁচ মাণিক!"

বড়ো মিঞা তা'তে রেগে উঠ্‌তো। সে বল্‌তো,—"ও কথা তুই বল্‌বার কে? তোর তো মোট একটা বলদ।" ছোটো মিঞা বল্‌তো,—"আচ্ছা, ভাই, চুপ কর্ল্লুম।"

কিন্তু লোকজন দেখ্‌লেই সে চুপ করে' থাক্‌তে পারতো না। ফের বল্‌তো,—আগেকার চেয়ে চেঁচিয়ে,—"হট্, হট্, আমার পাঁচ মাণিক।"

বড়ো মিঞা চটে' লাল হয়ে উঠ্‌তো ; বল্‌তো,—"ফের যদি তোর মুখে ওকথা শুনি, তো তোর বলদটার মাথায় এমন লাথি মারবো, যে, এক ঘায়ে সে কুপোকাৎ হ'য়ে পড়বে।"

ছোটো মিঞা ভয়ে আর কথা কইতো না।

আবার যখন রাস্তা থেকে কেউ চেনা লোক সেলাম করে' বল্‌তো,—"কি, ছোট মিঞা, কেমন আছো ?"—সে আর নিজেকে সামলাতে পারতো না। পাঁচটা বলদের পিঠে বেদম চাবুক মারতে মারতে বলতো,—"হট্, হট্, আমার পাঁচ মাণিক!"

একদিন ব্যাপারটা বড়ো মিঞা আর বরদাস্ত করতে পারলে না। তার হাতে ছিল একটা শাবল। তাই দিয়ে ছোটো মিঞার বলদের মাথায় এমন এক ঘা মারলে যে, বলদটা পড়ে গিয়েই মরে' গেল।

ছোটো মিঞা কাঁদ্‌তে সুরু করে দিলে। বলে,—"আমার অমন জোয়ান বলদ!"—আর অঝোর ধারে কাঁদে।

কি করে! বলদটাকে টেনে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে বাড়ী এনে ফেল্লে। তারপর চামড়াটা ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়ে, একটা থলিতে পূরে কাঁধে করে সহরে নিয়ে গেল, বেচবার জন্যে।

গাঁ থেকে সহর অনেক দূরে। ছোটো মিঞা চল্লো একটা অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে। পথে বেজায় ঝড়বৃষ্টি নাম্‌লো। ছোটো মিঞা পথ ঠিক রাখ্‌তে পারলে না। ঘুরে' ঘুরে' সে সবে ঠিক পথ ধরেছে, এমন সময় সন্ধ্যা হোল। সর্ব্বনাশ! রাত্তিরের আগে বাড়ীও ফেরা দায়, সহরেও পৌঁছানো যেতে পারে না।

কী উপায় করে? পথের ধারে ছিল একটা গোলাবাড়ী। ভেতরে মিট্‌মিট্ করে' আলো জ্বল্‌ছিল। সে ভাব্‌লে,—"রাত্তিরের মতো এইখানেই থাকা যাক্।" এই ভেবে সে এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলে।

একটি মেয়েমানুষ দরজা খুলে দিলে। ছোটো মিঞা তা'কে বল্লে,—"এই ঝড়বৃষ্টি, তা'য় রাত্তির হ'য়ে পড়েছে। আমায় একটু থাক্‌তে দিতে হ'বে।" "না, বাপু, হ'বে না। বাড়ীতে কেউ পুরুষমানুষ নেই,"—এই বলে' মেয়েটি ঝপাং করে' দরজা বন্ধ করে' দিলে।

বাইরেই একটা চালা ছিল, খড়ের গাদার পাশে। ছোটো মিঞা তারি ভেতর খড়ের বিছানা পেতে দিব্যি শুয়ে রইলো। সামনেই ছিল রান্নাঘর, তার জানলাটি ছিল খোলা,—তার ফাঁক দিয়ে ছোটো মিঞা দেখ্‌লে, দিব্যি মাছের মুড়ো, পোলাও, পায়েস, পিঠে, সব মজুত আছে। তার মনে হোল' যদি ওর কিছু সে পায়, তাহ'লে বড়ো আরামেই রাতটা কাটে।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, সেদিন গিন্নীর এক মামাতো ভাই এসেছিল দেশ থেকে। কর্ত্তা তা'কে দেখ্‌তে পারতো না। কর্ত্তা বাড়ী নেই,—তাই গিন্নী তা'র জন্যে দিব্যি চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় জোগাড় করে রেখেছিল আর ব'সে ব'সে তাই খাওয়াচ্ছিল।

হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হোল। কর্ত্তা এসে হাজির। গিন্নী তাড়াতাড়ি খাবার দাবার লুকিয়ে ফেল্লে,—কর্ত্তা যদি দেখে তো,কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবে। শোবার ঘরে একটা খালি সিন্দুক ছিল; গিন্নীর মামাতো ভাই তা'র ভেতর সেঁধুলো। কর্ত্তার নজরে পড়লে তো আর রক্ষা নাই! এ বাড়ীতে আসাই তার মানা ছিল। আজ কর্ত্তা নেই শুনে' সে এসে পড়েছিল—কিছু টাকার দরকার।

ছোটো মিঞা চালায় শুয়ে সব দেখ্‌লে।

কড়া নাড়তে নাড়তে কর্ত্তার নজরে পড়্‌লো, কে একজন চালায় শুয়ে আছে। ভাবলে, কোনো গরীব ঝড়বৃষ্টিতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। কর্ত্তার মনটা এদিকে ভালো ছিল। বল্লে,—"কে তুমি? ওখানে কেন? আমার সঙ্গে ঘরের ভেতর এসো।"—ছোটো মিঞার নাড়ী চোঁ চোঁ কর্‌ছে, তার ওপর অত খাবারের আয়োজন চোখের সামনে দেখেছে। কাজেই সে তার থলিটা নিয়ে কর্ত্তার পেছন পেছন বাড়ীর ভেতর গেল।

গিন্নী তুজনকেই বেশ হাসিমুখে অপ্যায়িত করলে। কর্ত্তা বল্লে,—"বড়ো ক্ষিদে পেয়েছে। তুটো ঠাঁই করে' দাও।" গিন্নী পিঁড়ি পেতে তু'থালা ভাত, তু'বাটী ডাল, আর সামান্য কিছু তরকারী ধরে' দিলে। কর্ত্তা হাঁসহাঁস করে খেতে লাগ্‌লো। কিন্তু ছোটো মিঞার তা'তে মন উঠলো না। থলিটা তার পাশেই ছিল। তার ওপর হাত পড়তেই সেটা খড় খড় করে উঠলো। কর্ত্তা বল্লে,—"ওতে কি আছে?" ছোটো মিঞা জবাব দিলে,—"ওর ভেতর আছে আমার মুরুব্বি। তার যা' ক্ষমতা, কি বলবো? কেমন ভেল্‌কি জানে! আমায় এই মাত্তর বল্‌ছিল, যে, 'ডাল ভাত খাচ্ছ কেন? তোমাদের জন্যে পোলাও, পায়েস, পিঠে, সব তৈরী করে' রেখেছি।"

কর্ত্তা অবাক্ হ'য়ে বলে' উঠলো,—"তাই নাকি? সত্যি?" এই বলে' নিজে গিয়ে রান্নাঘরে তদারক করে' দেখতে পেলে, নানান্ জিনিষ তৈরী আছে। গিন্নী কিছুই বল্‌তে পারলে না; চুপ করে' রইলো। কর্ত্তা আর ছোটো মিঞা তুজনে দিব্যি আরামে খেতে সুরু করে' দিলে।

আবার ছোটো মিঞা থলিতে হাত দিলে, আর শুক্‌নো চামড়ার আওয়াজ হোল। কর্ত্তা বল্লে,—"আবার কি বলে?" ছোটো মিঞা জবাব দিলে,—"বল্‌ছে, তু'হাঁড়ি ক্ষীর মজুত আছে, পশ্চিমের তাক্‌টার ওপর।" এবার গিন্নী নিজে গিয়ে ক্ষীরের হাঁড়ি তুটো এনে দিলে।

খাওয়া শেষ হ'লে তামাক খেতে খেতে কর্ত্তা বল্লে,—"আচ্ছা, তোমার মুরুব্বি ভূত দেখাতে পার?"

ছোটো মিঞা বল্লে,—"নিশ্চয়ই। আমি যা বলবো, তাই সে করবে। তাইতো?" এই বলে' সে চামড়াটায় হাত দিতেই সেটা খড় খড় করে' উঠ্‌লো। ছোট মিঞা বল্লে,—"ও বলে, হাঁ পারি। কিন্তু ভূতের চেহারা বড়ো বিশ্রী; না দেখাই ভালো।"

কর্ত্তা বল্লে,—"আমি কিছুতেই ভয় পাই না। আচ্ছা, ভূত কি রকম দেখতে তবু!"

ছোটো মিঞা জবাব দিলে,—"আমার মুরুব্বি বলে যে, ভূত দেখতে ঠিক, কর্ত্তার মামাতো শালার মতো।"

কথাটা কর্ত্তার মনে লাগ্‌লো। সে বল্লে, "তাহ'লে তো সত্যিই বড় বিশ্রী! তুমি জানো না, আমার মামাতো শালাটাকে আমি মোটেই দেখতে পারি না। কিন্তু এতো সে নয়, এ ভূত। একে দেখতে পারবো। তবে একটা কথা। আমার বেশি কাছে আসতে বারণ করে' দিও।"

ছোটো মিঞা টিপ্‌তেই ভেতরের চামড়া খড় খড় করে' উঠলো, আর সে কাণতুটো কাছে নিয়ে গিয়ে কি যেন শুনলে, তারপর বল্লে, "মুরুব্বি বল্লে, 'ঐ যে সিন্দুকটা, ওর ভেতর ভূত গুঁড়ি মেরে বসে' আছে।' তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো। কিন্তু, খবর্দ্দার, ডালাটা এমন ভাবে ধরো যা'তে না বেরিয়ে যায়।"

কর্ত্তা সিন্দুকটার কাছে ডালা তুল্‌তেই দেখলে তা'র মামাতো শালার মতো কে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। সত্যিই সে ভূত নয়, কর্ত্তার মামাতো শালা,—গিন্নী তাকে সিন্দুকের ভেতর পুরে দিয়েছিল।

দেখেই ডালাটা ফেলে দিয়ে কর্ত্তা সাত হাত দূরে লাফিয়ে পড়লো। বল্লে,—"হাঁ, দেখেছি। ঠিক আমার মামাতো শালার মতো দেখতে। কী ভয়ঙ্কর!"

সব দেখে শুনে কর্ত্তা অবাক্ হয়ে গেল। খানিক পরে বল্লে, "তোমার মুরুব্বিটিকে আমার চাই! কত টাকায় বিক্রি কর্‌বে?"

ছোটো মিঞা বল্লে, "ও আমার অনেক কাজ করে। বিক্রি করতে আমি পারবো না।"

কর্ত্তার রোখ চড়ে' গেল। সে বল্লে,—"আমার চাই-ই ওকে। পালি মেপে পাঁচ পালি মোহর দেবো।"

অনেক কাকুতি-মিনতির পর ছোটো মিঞা বল্লে, "আচ্ছা, তুমি আমায় রাত্তিরে আশ্রয় দিয়েছ, তোমার কথা কি ঠেল্‌তে পারি? পালি মেপে যদি পাঁচ পালি মোহর দাও, তো তোমাকে বিক্রি করতে আমার আপত্তি নেই।"

কর্ত্তা বল্লে, "তা' এখুনি দিচ্ছি। কিন্তু সিন্দুকশুদ্ধ ঐ ভূতটাকে নিয়ে যেতে হবে। ওটাকে ঘরে রাখ্‌তে আমার সাহস হয় না।"

ছোটো মিঞা পালি মেপে পাঁচ পালি মোহর নিয়ে চামড়া-শুদ্ধ থলিটা কর্ত্তাকে দিলে। কর্ত্তা একটা হাতটানা গাড়ী সঙ্গে দিলে; নইলে অত মোহর আর অত বড়ো সিন্দুক নিয়ে যাবে কি ক'রে?

ভোর হ'তেই ছোটো মিঞা গাঁয়ের দিকে চল্‌লো। বন পেরিয়েই একটা নদী। বর্ষা হ'য়ে গেছে; খুব স্রোত বইছে। সাঁৎরে পার হওয়া অসম্ভব। তার ওপর একটা পোল। সেই পোলের মাঝখানে এসে' ছোটো মিঞা খুব জোরে বল্লে, "এ সিন্দুকটা নিয়ে কি কর্‌বো? এটা বেজায় ভারী; মনে হয়, পাথর পোরা। এটা টেনে নিয়ে যেতে মিছামিছি হাত ব্যথা হবে। নদীতে ফেলে দিলেই আপদ্ চুকে যায়। যদি নদীতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছোয় তো ভালো; আর তা' না হলেও বা ক্ষতি কি? অমন সিন্দুক ঢের মিল্‌বে।"

এই বলে' সে সিন্দুকটা যেম্‌নি তুলে ধর্‌লে, অমনি গিন্নীর মামাতো ভাই চেঁচিয়ে বলে' উঠলো, "রোসো, আমি আগে বেরুই।"

ছোটা মিঞা যেন ভয় পেয়ে বলে' উঠলো,—"বাবা, ভূতটা এখনো রয়েছে? ওটাকে ডুবিয়ে মারাই ভালো। কি জানি, কখন ঘাড় মট্‌কে দেবে।"

গিন্নীর মামাতো ভাই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে,—"আমায় বাবা ছেড়ে দাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি। আমি তোমায় পালি মেপে মোহর দেবো।"

ছোটো মিঞা বল্লে, "এতো বেশ কথা!" বলে' সে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেল্লে, আর অম্‌নি তার ভেতর থেকে গিন্নীর মামাতো ভাই লাফিয়ে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসেই সে সিন্দুকটা দুহাতে নদীর জলে ঠেলে ফেলে দিলে, তারপর দুজনে মিলে তার বাড়ীতে গেল। সেখানে ছোটো মিঞা এক পালি মোহর পেল। বুদ্ধির জোরে ছ' পালি মোহর নিয়ে গাড়ীটা বোঝাই করে' সে গাঁয়ে এসে হাজির হোল।

বাড়ী ফিরে ছোটো মিঞা আপন মনে বল্লে, "বলদের চামড়ার এতো দাম!" বলে' সে মেঝেতে মোহরগুলো ঢেলে ফেল্লে।

ছোটো মিঞা ভাব্‌লে,—"আমার এতো টাকা হয়েছে শুন্‌লে বড়ো মিঞা নিশ্চয়ই হিংসেয় জ্বলে' মর্‌বে।" এই ভেবে সে একটা পালি চেয়ে আনবার জন্যে বড়ো মিঞার কাছে তা'র ছোটো ভাইপোটিকে পাঠিয়ে দিলে।

ছোটো মিঞা পালি চাচ্ছে, শুনে' বড়ো মিঞা অবাক্ হ'য়ে গেল। সে ভাব্‌লে, দেখা যাক্,

কি মাপে! এই ভেবে সে পালির তলায় একটু আটা লাগিয়ে দিল। মোহর মেপে ছোটো মিঞা যখন পালিটা ফেরৎ পাঠালে, বড়ো মিঞা দেখ্‌লে, দুটো মোহর তলায় আটুকে আছে।

সে এক দৌড়ে ছোটো মিঞার বাড়ী গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—"হাঁরে ছোট মিঞা, এতো টাকা তুই পেলি কোথা থেকে?"

ছোটো মিঞা বল্‌লে, "ও, কাল রাত্তিরে বলদের চামড়াটা বেচে পেয়েছি।"

"বরাত ভালো," বলে' বড়ো মিঞা বাড়ী ফিরে এলো। এসেই একটা কুড়ুল দিয়ে সে তা'র চারটে বলদ কেটে ফেল্লে, আর তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে সহরে গেল বিক্রি করবার জন্যে।

মাথায় চামড়ার বোঝা। বড়ো মিঞা রাস্তা দিয়ে হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে চল্লে,—"চামড়া নেবে গো? চামড়া নেবে?"

মুচিরা সব যে যা'র দোকান থেকে ছুটে এলো। তারা জিজ্ঞাসা করলে, "দাম কতো?" বড় মিঞা বল্লে, "পাঁচ পালি মোহর এক একটার দাম।" তারা বল্লে, "পাগল নাকি? পাঁচ পালি মোহর আমাদের সবাইকে বিক্রি করলেও যে মিলবে না।"

বড়ো মিঞা মাথায় বোঝা তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে চল্‌লো,—"চামড়া নেবে গো,' চামড়া নেবে?" দাম জিজ্ঞাসা করলেই তার মুখে সেই এক বুলি,—"পাঁচ পালি মোহর।"

মুচিরা বল্লে, বেটা "আমাদের ঠাট্টা করতে এসেছে! দেখাচ্ছি মজা খানা!" এই বলে' নিজেদের সেলাই করবার যন্ত্রপাতি ছুড়ে তাকে দমাদম্ মারতে আরম্ভ করে দিলে। বড়ো মিঞা জীবনে এমন মার খায়নি। সে মরি-বাঁচি করে ছুটতে সুরু কর্‌লে, আর তার পেছন পেছন মুচিরা ছুটলো চেঁচাতে চেঁচাতে,—"চামড়া নেবে গো, চামড়া নেবে! আয় না বেটা, তোর চামড়া খুলে' নিয়ে সহরের বের করে দি।"

তাদের হাত থেকে কোনো মতে প্রাণ নিয়ে বড়ো মিঞা বাড়ী পৌঁছুল। তার রাগ পড়লো কিন্তু ছোটো মিঞার ওপর। কাউকে কিছু না বলে' মৎলব পাকালে, রাত্তিরে গিয়ে ছোট মিঞাকে মেরে রেখে আস্‌বে।

ছোট মিঞার বুড়ী ঠাকুরমা সেদিন বিকেলে মারা গিয়েছিল। বুড়ীকে ছোটো মিঞা বড়ো ভালবাস্‌তো। সে যে মরেছে, এটা বিশ্বাস করতেই সে চাইলে না। সে ভাবলে, সারা রাতের মধ্যে বুড়ী বেঁচে উঠ্‌তে পারে। তাই সে তাকে নিজের বিছানায় শুইয়ে নিজে একটি চাটাই পেতে ঘরের এক কোণে মেঝেতে শুয়ে রইলো। দুপুর রাতে বড়ো মিঞা

কুড়ুল নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে অন্ধকারে বুড়ীর ওপর সজোরে এক কোপ মেরে সরে পড়লো। ভাবলে যে, তার কুড়ুলের এক ঘায়ে ছোটো মিঞা নিশ্চয়ই সাবাড় হয়েছে।

ছোটো মিঞা আগাগোড়া সব দেখ্‌লে; কিন্তু কিছুই বল্লে না। ঘরের কোণে মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলো। বড়ো মিঞা চলে' যেতে সে বল্লে,—"লোকটা কি পাজী! আমাকে মেরে ফেলার মৎলব ছিল তার'। ভাগ্যিস, নানী বুড়ী আগেই বেহেস্তে গেছে, নইলে আজ তাকে বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে হোত।"

ভোরের বেলা ছোটো মিঞা পাড়ার একজনের কাছ থেকে একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে নিজের সেই হাতটানা গাড়ীতে তাকে জুড়্‌লে। গাড়ীর পেছনে একটা তক্তা মেরে, বুড়ীকে সাজিয়ে গুজিয়ে তক্তা ঠেসান দিয়ে বসিয়ে, নিজে গাড়ী চালিয়ে চল্লো—কোথায় কে জানে?

বন পেরিয়ে সকাল হোল। সেখানে একটা সরাই দেখে, ছোটো মিঞা গাড়ী থামিয়ে তার ভেতর ঢুকে' পড়লো কিছু জলযোগের চেষ্টায়।

সরাইয়ের মালিকটি বেশ ভালো লোক—তার অনেক টাকা। কিন্তু তার একটা দোষ ছিল—সে বড়ো বদ্‌মেজাজী। লোকে বল্‌তো, বেটা যেন ধানি লঙ্কার ঝাড়।

ছোটো মিঞা তাকে বল্লে,—"দেখ, বাইরে গাড়ীতে আমার বুড়ী নানী বসে' আছেন। তিনি নাম্‌তে পারবেন না। তাঁকে এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে এসো। কিন্তু একটু জোরে কথা কইতে হবে—কালা কিনা!" এই বলে' সে নিজে চায়ের বাটীতে চুমুক দিলে।

সরাইয়ের মালিক নিজে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে বুড়ীর কাছে গিয়ে বল্লে,—"শুন্‌ছো। তোমার নাতী এই সরবৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। নাও।" জবাব দেবে কে? মরা বুড়ী ঠেসান দিয়ে বসেই রইলো। সে তখন চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে' বল্লে,—"শুন্‌তে পাচ্ছো না? তোমার নাতী সরবৎ পাঠিয়েছে।" তবু জবাব নেই। বার বার তিনবার। এবারও কোনো জবাব না পেয়ে সরাইয়ের মালিক আর রাগ সাম্‌লাতে পারলে না। সে তখন বুড়ীর মুখে গেলাসটা ছুড়ে মারলে, আর বুড়ী গাড়ীর ভেতর ধুপ্‌ করে' পড়ে গেল। তার দেহটা সোজা ক'রে বসানো ছিল; ছোটো মিঞা দড়ি দিয়ে সেটা বেঁধে দেয় নি; তাই এই ব্যাপার!

ছোটো মিঞা হন্ হন্ করে সরাইয়ের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে সরাইয়ের মালিকের হাত দুটো সজোরে চেপে ধরে' বল্লে,—"তুই আমার নানীকে মেরে ফেলেছিস্! পাষণ্ড! এই দেখ্, কপালে কতো বড়ো গর্ত্ত হয়ে গেছে!"

সরাইয়ের মালিকের ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লে,—"হায়, হায়, কি কর্লুম! কি কর্লুম! সবই আমার মেজাজের দোষ। ভাই ছোটো মিঞা,

তোকে আমি এক পালি মোহর দেবো; চেঁচামেচি ক'রে লোক জড়ো করিস্ নি। আর তোর নানীর গোর দেবার যা' খরচ লাগে, সব দেবো। তুই যদি গোল করিস, তাহ'লে এখুনি কোতোয়াল আমায় গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবে আর আমার মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে ফেলবে। সে যে বড়ো বিশ্রী হবে।"

ছোটো মিঞার বরাত ভালো। মরা নানীর বদলে এক পালি মোহর পেলে, আর সরাইয়ের মালিক দিব্যি ধুমধাম করে তা'র গোর দিয়ে দিলে।

মোহর নিয়ে ছোটো মিঞা বাড়ী ফিরেই ভাইপোকে পাঠালো বড়ো মিঞার কাছে পালি চেয়ে আন্‌তে।

বড়ো মিঞা বল্লে,—"ব্যাপার কি? আমি যে কাল রাতে তাকে বিছানায় মেরে রেখে এসেছিলুম। দানা পেলে নাকি? আমার নিজে গিয়ে দেখে আস্‌তে হবে।" সে নিজে পালি নিয়ে গেল ছোটো মিঞার বাড়ীতে।

ঘরের মতো মোহরের স্তুপ দেখে' বড়ো মিঞার চোখ কপালে উঠলো। সে বল্লে,—"আবার মোহর কোথা থেকে পেলি?"

ছোটো মিঞা হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিলে,—"তুমি, ভাই, কাল রাত্তিরে আমাকে মার্‌তে এসে' আমার বুড়ী নানীকে মেরেছো। আমি আজ সকালে তা'কে বিক্রী ক'রে এক পালি মোহর আন্‌লুম।"

"জবোর দাম মিলেছে",—বলে' বড়ো মিঞা চলে' গেল। বাড়ী গিয়ে কুড়ুল দিয়ে নিজের নানীকে দু'টুক্‌রো করে' কেটে ফেল্লে। তারপর তা'কে একটা গাড়ীর ভেতর বসিয়ে সহরে গিয়ে সোজাসুজি এক হাকিমের দাওয়াইখানায় গিয়ে উঠ্‌লো। হাকিমকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"মরা মানুষ কিন্‌বে?" হাকিম বল্লে,—"কে এ? কোত্থেকে পেলে?" বড়ো মিঞার বুদ্ধি শুদ্ধি কম। সে বলে' ফেল্লে,—"এ আমার নানী। আমি এক পালি মোহর পাবার আশায় একে মেরে ফেলেছি।" হাকিম বল্লে,—"তুমি কি পাগল হয়েছ? ওকথা বলো না, বলো না। যদি কেউ শুন্‌তে পায় তো ধড় থেকে মাথাটা খসিয়ে দেবে।" হাকিম তাকে বুঝিয়ে দিলে, সে কি অন্যায় কাজ করেছে, তার জন্যে তার ভীষণ শাস্তি হ'বে। বড়ো মিঞার মুখ ভয়ে পাঙাস্ হ'য়ে গেল। সে এক লাফে গাড়ীতে উঠে ভীষণ বেগে সেটা চালিয়ে দিলে। হাকিম আর তার দোকানের লোকজন ভাবলে, লোকটা উন্মাদ, তাই তারা কিছু বল্লে না।

বড়ো রাস্তায় এসে' তবে বড়ো মিঞার হুঁশ হোল। সে আঙল মট্‌কাতে মট্‌কাতে

বল্লে,—"এর জন্যে তোকে শাস্তি পেতে হ'বে, ছোটো মিঞা। আমি অমনি ছাড়বো না। বার বার চালাকি ?" বাড়ী পৌঁছেই একটা মস্ত থলি নিয়ে সে ছুটলো ছোটো মিঞার কাছে। তাকে দেখ্‌তে পেয়েই বল্লে,—"আবার আমার সঙ্গে কারসাজি করেছিস্‌? তোর পাল্লায় পড়ে' চার চারটে বলদ মেরেছি, আজ আবার নানীকে হত্যা কর্লু্ম। সব তোর দোষ। আর কিন্তু তোর চালাকী খাট্‌বে না।" এই বলে' সে ছোট মিঞাকে ঝাপ্টে ধ'রে তা'কে থলেয় পূরে ফেল্লে। ছোটো মিঞা থলের ভেতর আল্লা নাম জপ কর্‌তে লাগলো। বড়ো মিঞা থলে শুদ্ধ তাকে পিঠের ওপর ঝুলিয়ে বল্লে,—"এইবার তোকে ডুবিয়ে মারবো।"

সেখান থেকে নদী অনেক দূর। আর ছোটো মিঞাকে অতো দূর বয়ে নিয়ে যাওয়াও কম ব্যাপার নয়। পথের ধারেই এক জায়গায় নাচগান হচ্ছিল। বড়ো মিঞা ভাবলে, গান দু'একটা শুনে গেলে ক্ষতি কি ? এই না ভেবে' একটা গাছের তলায় থলিটা রেখে সে ভীড়ের মধ্যে গান শুন্‌তে বসে' গেল। ছোটো মিঞা তো আর বেরুতে পারবে না ; কাজেই সে নিশ্চিন্তি।

ছোটো মিঞা এদিকে থলির ভেতর ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। সে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই থলির মুখ খুল্‌তে পারলে না। সেই সময়ে এক থুড়থুড়ে বুড়ো এক পাল গরু বাছুর নিয়ে লাঠি ধরে যাচ্ছিল। কতকগুলো গরু থলিটাকে উল্টে ফেল্লে। তখন ছোট মিঞা বলে' উঠলো,—"কি আপশোষ! এতো কম বয়সে স্বর্গে যেতে হচ্ছে!" বুড়ো বল্লে,—"আর আমার কি দশা! সব চুল পেকে গেছে, অথচ এখনো ভগবান্‌ মুখ তুলে চাইলেন না।" ছোটো মিঞা চেঁচিয়ে উঠলো,—"স্বর্গে যেতে চাও ? বেশ, থলেটা খুলে ফেলে এর ভেতর ঢুকে' পড় ; এখুনি স্বর্গে চলে যাবে।" "বেশ কথা," বলে' বুড়ো লাঠি রেখে' সেখানে বসলো ; তার হাতে ছিল একটা কাস্তে ; তাই দিয়ে থলির দড়ি কেটে ফেল্লে। ছোট মিঞা খোলা পেয়ে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এলো। বুড়ো বল্লে,—"থলির ভেতর তো যাবো। তোমায় কিন্তু আমার এই গরু বাছুরগুলো পাল্‌তে হবে।" ছোটো মিঞা এক চায়, না আর এক পায়। সে বুড়োকে থলের ভেতর পূরে, দড়ি দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে' "সেলাম" জানিয়ে গরুর পাল হাঁকিয়ে ফূর্ত্তিতে চলে গেল।

বড়ো মিঞা গান শুনে সেখানে এসে থলিটা ঘাড়ে নিলে। বুড়ো ছোটো মিঞার মতো ভারী নয় ; কাজেই তার মনে হোল, থলিটা যেন হাল্কা হয়ে গেছে। সে ভাবলে—"গান শুনে' মনটা বেশ ফূর্ত্তিতে আছে, তাই আর ভার লাগছে না।"

নদীর ধারে গিয়ে বড়ো মিঞা থলিটাকে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে বল্লে,—"থাক্‌ ওখানে পড়ে। আর আমার সঙ্গে লাগতে হবে না। ওইখানে তোর গোর হোক, পাজী, শূয়োর, হারামজাদ।"

তারপর সে বাড়ী ফিরলো। পথে আস্‌তে আস্‌তে দেখে—অদ্ভুত ব্যাপার—ছোটো মিঞা এক পাল গরু নিয়ে চলেছে। সে চীৎকার করে' উঠলো,—"একি ? তোকে যে নদীতে ফেলে এলুম!" ছোটো মিঞা বল্লে,—"তা'তো ফেলেছিলে, দাদা, এই আধঘণ্টাটাক্‌ আগে।" বড়ো মিঞা জিজ্ঞাসা করলে,—"তবে তুই উঠে এলি কি করে ? আর এ গরু বাছুরও পেলি কোথায় ? অবাক্‌ করে দিলে যে! হ্যাঁরে, তুই কি ভেল্কি জানিস্‌ ?" ছোটো মিঞা বল্লে,—"শোন, বলি। এগুলো হচ্ছে সাগরের গাই। তুমি যে আমায় ডুবিয়ে দিয়ে কি উপকারই করেছো, দাদা, তা' আর তোমায় কি বলবো ? এখন অগাধ টাকা। থলিশুদ্ধ আমায় যখন নদীর ভেতর ফেলে দিয়েছিলে, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। তক্ষুনি আমি একেবারে তলায় গিয়ে পড়লুম। সেখানে কি সুন্দর সব ঘাস জন্মায়! আমার এতটুকু লাগলো না। আপনা আপনি থলির মুখটি খুলে গেল। আর একটী মেয়ে, সাগর বালা, অমন সুন্দরী দেখি নি ভাই,—দুধের মতো সাদা কাপড় পরা। ভিজে চুলে সবুজ লতার মালা জড়ানো, আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। হাত ধরে' বল্লে,—'ছোটো মিঞা, এসেছ ? আমার যা আছে, সব তোমার। আগে এই সব গরুবাছুর নাও। এই পথ ধরে গেলে আধক্রোশটাক্‌ দূরে আর একপাল গরুবাছুর আছে,—তা'ও তোমায় আমি দেবো।" চোখ চেয়ে দেখি, নদীটা হচ্ছে, সাগরে যাঁরা বাস করেন তাদের বড়ো রাস্তা। তাঁরা সব নদীর তলায় হাওয়া খেয়ে বেড়ান আর একেবারে নদীটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই পর্য্যন্ত আনাগোনা করেন। দেখলুম, কত ফুল, কত গাছ ; মাছগুলো সব কাণের পাশ দিয়ে চোঁ করে' চলে যায়,—আমাদের এখানে যেমন পাখী ওড়ে, ঠিক তেমনি। আর সাগরে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা কি সুন্দর লোক—যেমন চেহারা, তেমনি গুণ! তুলনা নেই! তুলনা নেই!"

বড়ো মিঞা জিজ্ঞাসা করলে,—"আচ্ছা, তাহ'লে তুই আবার ফিরে এলি যে ? কি বোকা! আমি হ'লে তা' কখনোই কর্ত্তুম না।"

ছোটো মিঞা জবাব দিলে,—"মৎলব আছে, দাদা, মৎলব আছে। তোমার ছোটো ভাইটিকে তো তুমি চেন। সাগর-বালা কি বলেছিল, মনে আছে ? 'এই পথ ধরে' গেলে আধক্রোশটাক্‌ দূরে এক পাল গরু বাছুর আছে।' সেখানে 'পথ' মানে 'নদী' ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তো জানি নদীটার কতো বাঁক, এঁকে বেঁকে চলেছে, কিম্ভুত কিমাকার। নদী

ধরে' যেতে অনেক ঘুর হ'বে। তার চেয়ে ডাঙ্গায় উঠে এসে মাঠ কটা পেরিয়ে আবার নদীতে পড়লে বেশ সোজা হ'য়ে যায়। এই রকম করে আমি প্রায় অর্দ্ধেক পথ বাঁচিয়ে আমার এই গাইগুঁলোর কাছে পৌঁছেছি। এখন তাদের বাড়ীতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

বড়ো মিঞা বল্লে,—"বরাত জোর বটে! আচ্ছা দেখ্, আমি যদি নদীর তলায় চলে যাই তো তোর মতো একপাল গরু আমারও মিল্‌তে পারে, কেমন?"

ছোটো মিঞা জবাব দিলে,—"মনে তো হয় তাই। কিন্তু রক্ষে করো, দাদা, তুমি যেমন ভারী, তোমায় থলেয় পূরে নদী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে গেলে আমার হাড়গোড় ভেঙে 'দ' হয়ে যেতে হবে। তার চেয়ে, তুমি পায়ে হেঁটে নদীর ধারে যাও,— একটা থলি সঙ্গে নিও,—আমি তোমায় থলিতে পূরে দিব্যি জলে ফেলে দেবো।"

"বেশ! বেশ!" এই বলে' বড়ো মিঞা ছুটে' একটা মস্ত বড়ো থলি নিয়ে এল। এনে বল্লে,—"কিন্তু যদি গরুর পাল না মেলে তো তোকে আধমরা করে' ছাড়বো, বলে' রাখ্‌ছি।"

ছোটো মিঞা বল্লে,—"না, দাদা, অতোটা করো না।"

তারা দুজনে নদীর ধারে গেল। গরুগুলোর বেজায় তেষ্টা পেয়েছিলো। সামনে নদী দেখেই তারা উর্দ্ধশ্বাসে জল খেতে ছুটলো। ছোট মিঞা তাদের দেখিয়ে বল্লে,—"দেখছো দাদা, এরা তাড়াতাড়ি নদীর তলায় যেতে চায়,—বাড়ী পৌঁছুতে পার্লে বাঁচে। তাই দৌড় দিচ্ছে।"

বড়ো মিঞা বলে উঠলো,—"বাঃ রে, আমাকে ফেলে যাওয়া চলবে না। আমায় আগে ডুবিয়ে দিতে হবে। নইলে তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।" এই বলে সে সুরসুর করে থলির ভেতর ঢুকে পড়ে বল্লে,—"ওরে, একটা বড়ো পাথর পূরে দে। কি জানি, যদি না ডুবি!"

ছোটো মিঞা বল্লে,—"ঠিক বলেছো, দাদা।" সামনেই একটা বড়ো পাথর পড়েছিলো। সেইটেকে পাঁজাকোলা করে' এনে সে থলেয় পূরে দিয়ে তার মুখটা দড়ি দিয়ে খুব এঁটে বেঁধে দিলে। তারপর থলিটাকে দু'হাতে ঠেলে গড়িয়ে দিলে। ঝপাং করে' থলিটা নদীর মধ্যে পড়লো, আর তক্ষুনি তলায় গিয়ে ঠেক্‌লো।

ছোটো মিঞা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে,—"বেচারী হয় তো গরুর পাল পাবে না।" তারপর সুর ভাজতে ভাজতে, তার সেই এক পাল গরু বাছুর তাড়িয়ে সটান বাড়ী গিয়ে উঠলো।

বুদ্ধির জোরে সে আজ রাজা কি নবাব বল্লেও ভুল হয় না।

ফুল-কুঁড়ি

(শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত)

আমরা অফুট্ ফুল-কুঁড়ি—
দখিণ হাওয়ার দোদুল দোলে
আমরা জাগি পাতার কোলে,
চমকে উঠি
হঠাৎ পেলে, ভোরাই হাওয়ার সুড়্‌সুড়ি।
আমরা অফুট্ ফুলকুঁড়ি—
ভোরের আলোর পরশ-সুখে
তাথৈ নাচি তরুর বুকে,
থমকে-থামা
ভোম্‌রা-বধূ দেখ্‌লে করি খুনসুড়ি।
আমরা অফুট্ ফুল-কুঁড়ি—
মৌমাছিদের গুন্‌গুনি
কানের কাছে দিন শুনি,
তাইত' মোদের
ফুটে উঠার তৃষ্ণা জাগে বুক-ফুঁড়ি।
আমরা অফুট্ ফুল-কুঁড়ি—
মোদের গায়ে উছট্ খেয়ে,
বৈশাখী-বায় চকিত চেয়ে,
হঠাৎ আজি
ছড়িয়ে দিলে জাগার স্বপন মনজুড়ি।
আমরা অফুট্ ফুলকুঁড়ি—
কান্ত মধুর আজকে ভোরে
ঘা' দিয়ে কে হৃদয়-দোরে,

ওরে মোদের
বন্ধ কপাট্ খুল্‌ল দিয়ে জোর তুড়ি।
(আমরা) নহিত' আর ফুল-কুঁড়ি—
ছড়িয়ে দিলাম রূপের ডালা
পাঁপ্‌ড়ি মেলে ভুবন আলা,
মিষ্ট মধুর
গন্ধ দিলাম বিশ্বে বেঁটে বুক খুঁড়ি।

অদ্ভুত বেজী

(মহাভারত হইতে)

মহারাজ যুধিষ্ঠির খুব ধূমধাম করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সারিয়াছেন। কত ব্রাহ্মণ, কত জ্ঞাতি-কুটুম্ব, কত গরীব-দুঃখী, কত অন্ধ-আতুর সেখানে পেট ভরিয়া ভাল ভাল জিনিষ খাইয়া রাজাকে ধন্য ধন্য করিতেছে! চারিদিকে রাজার জয় জয়কার পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় সেখানে আসিয়া হাজির হইল এক বেজী। বেজীর চক্ষু দুটী নীলবর্ণ, আর মাথাটা ও শরীরের অর্দ্ধেকটা সোণার। আর তার দেমাক্ দেখে কে? সে যজ্ঞের জায়গায় আসিয়াই এমন ভয়ানক চীৎকার যুড়িয়া দিল যে, পশুপক্ষী যে যেখানে ছিল তাহারা ত ভয়েই অস্থির, যে এ আবার কে?

চেঁচামেচির পর বেজী কথা আরম্ভ করিয়া দিল মানুষের মত। কত রাজা-রাজ্‌ড়ারা সে যজ্ঞের জায়গায় ছিলেন, বেজী তাঁহাদিগকে বলিল, "কুরুক্ষেত্রে এক দাতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি মাঠ হইতে শস্যের শীষ্ কুড়াইয়া খাইতেন; তিনি যে এক প্রস্থ ছাতু দান করিয়াছিলেন, এ অশ্বমেধ যজ্ঞ সে দানের সমানও নয়।"

সেখানে যে সব ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ছিলেন, বেজীর কথায় তাঁহাদের তাক্ লাগিয়া গেল। তাঁহারা বলিলেন—"বেজী, তুমি কে হে? এখানে এত ভাল ভাল

লোক আছেন, আর তুমি কোথা হইতে আসিয়া এই যজ্ঞের নিন্দা আরম্ভ করিলে? তোমার কেমন তেজ, তুমি শাস্ত্র কেমন জান, এ সব তো আমাদের জানা নাই!

এমন সময় সেখানে আসিয়া হাজির হইল, এক বেজী

তবে আমরা শাস্ত্রমত, নিয়মমত, এই যজ্ঞের কাজ সব করিয়াছি। ভাল ভাল মহৎ লোকের সম্মান করা হইয়াছে, মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত ঢালা হইয়াছে, মহারাজ সরল মনে নানা শ্রেণীর লোককে, আত্মীয়-স্বজনকে খুব ভাল করিয়া খাওয়াইয়াছেন,—এমন যজ্ঞের দোষটা কি হইল? তোমার চেহারাটী বেশ, আবার তোমার জানাশুনা আছে বলিয়াও মনে হয়; আচ্ছা, তুমি কি দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ আমাদের কাছে ভাল করিয়া বল ত?"

বেজী ব্রাহ্মণদের কথা শুনিয়া একটু হাসিল, শেষে বলিল, "ঠাকুর মহাশয়রা, আমি দেমাক করিয়া মিথ্যা কথা কহি নাই; আপনাদের এই যজ্ঞ যে কুরুক্ষেত্রের

সেই ব্রাহ্মণের ছাতু দেওয়ার সমান নয়, সেটা খাঁটি কথা। কেমন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন, আর কেমন করিয়া আমার মাথাটা আর অর্দ্ধেক শরীরটা সোণার হইয়া গেল, সেই আশ্চর্য্য কথা একবার মন দিয়া শোনই না ?

কুরুক্ষেত্রে ধার্ম্মিক লোকের অভাব নাই। সেইখানে এই ব্রাহ্মণটী বাস করিতেন আর জমিতে পড়া শস্যের শীষ্ কুড়াইয়া আনিয়া কোনমতে খাওয়া-দাওয়ার কাজটা সারিতেন—যেমন পায়রারা করে। তাঁহার থাকিবার মধ্যে ছিল এক স্ত্রী, এক ছেলে আর ঐ ছেলের একটী স্ত্রী ; দিনের শেষবেলা কোনমতে সবাই মিলিয়া কিছু খাইতেন। তাহাও সব দিন জুটিত না। যে দিন না জুটিত, সে দিন আর খাওয়াই হইত না। আবার পরদিন সেই শেষ বেলা।

কিছুদিন ত এই ভাবে গেল। তারপর সেখানে দেখা দিল ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। ব্রাহ্মণের ত আর কিছু জমান ছিল না ! মাঠেও বেশী কিছু মিলিত না। ঠাকুরের তখন ভারী কষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষুধা ত ভাল দিনের জন্য বসিয়া থাকে না ! অনেক দিনই ইঁহার কপালে জুটিতে লাগিল উপবাস।

একদিন শেষ বেলায় অতি কষ্টে ব্রাহ্মণের খানিকটা যব যুটিল। তাঁহার বাড়ীর লোকজন ঐ যব পাইয়া ভারী খুসী, তাহারা সব দিয়া ছাতু প্রস্তুত করিল।

ব্রাহ্মণ ও তাঁহার বাড়ীর লোক জপতপ সারিয়া ঐ ছাতু ভাগ করিয়া খাওয়ার চেষ্টায় আছেন এমন সময় সেখানে এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত—ক্ষুধায় অতিথিটীর ছট্‌ফটানি লাগিয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের দেশ ত ! ব্রাহ্মণ ঠাকুর কিন্তু সে অবস্থায়ও অতিথিকে পাইয়া খুসী হইলেন, নিজের পরিচয় দিয়া অতিথিকে নিজের কুঁড়ে ঘরের মধ্যে নিয়া গেলেন, পা ধোয়ার জল দিলেন, বসিবার আসন দিলেন ; তারপর বলিলেন, "ঠাকুর, আমি নিয়ম মত এই ছাতু যোগাড় করিয়াছি। আপনি খান।"

অতিথির ত ব্রাহ্মণের নিজের ভাগের ছাতু পাইয়া আর কথা নাই। পট্ করিয়া ফেলিলেন তা' পেটে পূরিয়া, কিন্তু ক্ষুধা তাহাতেও মিটিল না।

বাড়ীওয়ালা ব্রাহ্মণের অবস্থা বুঝিয়া মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন—কেমন করিয়া অতিথির সেবা ঠিকমত হয় ? তাঁহার স্ত্রী তখন বলিলেন—"ঠাকুর, আমার ভাগটা উঁহাকে দিন না ? এটা পাইলেই উঁহার হইবে।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর উপবাসে উপবাসে হাড়ের সঙ্গে চামড়া মিশিয়া গিয়াছে, বয়সও হইয়াছে যথেষ্ট। তিনি বলিলেন,—"দেখ নিজের স্ত্রীকে খাওয়ান,—এ ত পোকা-মাকড়েরও উচিত, কেমন করিয়া আমি তোমার ভাগ নি ? স্ত্রীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা পায় ; আর, সব রকম সুখ বল, শান্তি বল, ধর্ম্ম বল, এ সব হয়। স্ত্রীকে রক্ষা করিতে না পারিলে একালে বদ্‌নাম, আবার পরকালে নরক।" ব্রাহ্মণের স্ত্রী বলিলেন—"ধর্ম্ম বলুন, অর্থ বলুন, আমাদের দুজনার একই। আমার যা কিছু সবই তো আপনার বশে ! স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আপনি এই ছাতু নিয়া অতিথিকে দিলে আমার উপর দয়া করাই হইবে। আপনি নিজে বৃদ্ধ, শরীরে জোর নাই, ক্ষুধায় অস্থির, তবু আপনার ভাগ অতিথিকে দিয়াছেন ; আর, আমার ভাগ দিবেন না ?" ব্রাহ্মণী এই রকম পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার ভাগের ছাতু অতিথিকে খাইতে দিলেন। অতিথি তাহা পাইয়াই আর কোন কথা না বলিয়া সবটা খাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পেট ভরিল না।

ব্রাহ্মণ আবার ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার ছেলে বলিল, "আপনি আমার ভাগের ছাতু ব্রাহ্মণকে দিন। ছেলের কর্ত্তব্য বৃদ্ধ পিতাকে পালন করা। আপনি এই ছাতু ব্রাহ্মণকে দিলে আপনার মনটা ভাল লাগিবে। তাহা হইলে আপনি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া আরও তপস্যা করিতে পারিবেন।" ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলিলেন, "আরে, তোমার বয়স হাজার বৎসর হইলেও আমার তোমাকে ছেলে-মানুষ বলিয়াই মনে হইবে ! আমি বুড়া হইয়াছি, তপস্যায়ও অনেক কাল কাটাইয়া দিয়াছি, ক্ষুধা হঠাৎ আমার কিছু করিতে পারিবে না, তুমি ছেলে-মানুষ, তোমার ছাতু তোমার নিজের খাওয়াই আবশ্যক।"

ছেলে কিন্তু বাপকে ছাড়িল না। তখন তাহার ছাতুগুলি লইয়া অতিথিকে

দিলেন। অতিথি তাহাও খাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পেট ভরিল না।

এইবার আসিল ব্রাহ্মণের পুত্রবধূর পালা। পুত্রবধূ শ্বশুরকে বলিল, "ঠাকুর, আপনি আমার ভাগের ছাতুও দিন ঐ অতিথিকে।" ব্রাহ্মণ অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূ নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল—"আপনি আমার গুরুর গুরু, দেবতার দেবতা, আপনি খুসী থাকিলেই আমার সকল রকমে মঙ্গল, আপনি এই ছাতু নিন।"

ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। অতিথি তখন খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর, আমি তোমার ব্যবহারে ভারী খুসী হইলাম। ঐ দেখ দেবতারাও তোমার উপর কত খুসী হইয়াছেন! তুমি স্ত্রীপুত্রের স্নেহের অপেক্ষা ধর্ম্মকে বড় মনে করিয়াছ। ক্ষুধার সময় লোকের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, তুমি সে সময়ও শুদ্ধমনে আমাকে ছাতু দিয়াছ। রথ আসিতেছে, তোমরা স্বর্গে যাও। দানে শ্রদ্ধা থাকিলেই ধর্ম্ম হয়, লোভ থাকিলে স্বর্গে যাওয়া যায় না। বড়লোক হইলেই যে দান করিতে পারে এমন কথা নাই। যাহার কিছু নাই সে যদি উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দেয়, তাহাতেও মহা পুণ্য হয়। দানের জিনিষটা নিজের হওয়া চাই, অন্যায় করিয়া কাহারও জিনিষ নিয়া দান করিলে পাপই হয়। রাজারা যাগ-যজ্ঞ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের চেয়েও বেশী ফল পায় সৎপাত্রে দান করিয়া সাধু লোকেরা। আমি ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ সাজিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, খুব খুসী হইয়াছি।"

ধর্ম্ম এই কথা বলিবার পর ব্রাহ্মণ নিজের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া রথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

আমি থাকিতাম সেই ব্রাহ্মণের ঘরে। ব্রাহ্মণ স্বর্গে গেলে আমি আমার গর্ত্ত হইতে বাহির হইলাম। ধর্ম্ম ঠাকুর যে জলে ভেজান ছাতু খাইয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু ত সেখানে পড়িয়া ছিল। সেই ছাতুর উপর আমি লুটোপুটি খাইতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণের তপস্যার জোর, সেই ছাতুর গন্ধ, আকাশ হইতে সেখানে

যে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার গন্ধ—এই সমস্ত মিলিয়া আমার মাথাটাকে ও অর্দ্ধেকটা শরীরকে সোণার করিয়া দিল। তখন আমার ভাবনা হইল, বাকি অর্দ্ধেকটা শরীর সোণার করা যায় কেমন করিয়া। কত যজ্ঞের যায়গায় ঘুরিতে লাগিলাম। কত মুনিঋষির তপোবনে গেলাম, কিন্তু সে রকম পুণ্যের জায়গা হইলে তবু ফল পাইব! কোথাও কিছু হইল না, মহারাজ যুধিষ্ঠির ভারী এক যজ্ঞ করিয়াছেন শুনিয়া বড় আশায় এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানেও কিছু হইল না। তাই বলিয়াছিলাম, এত বড় যজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণের চারিটী ছাতু দানের সমানও নয়"।

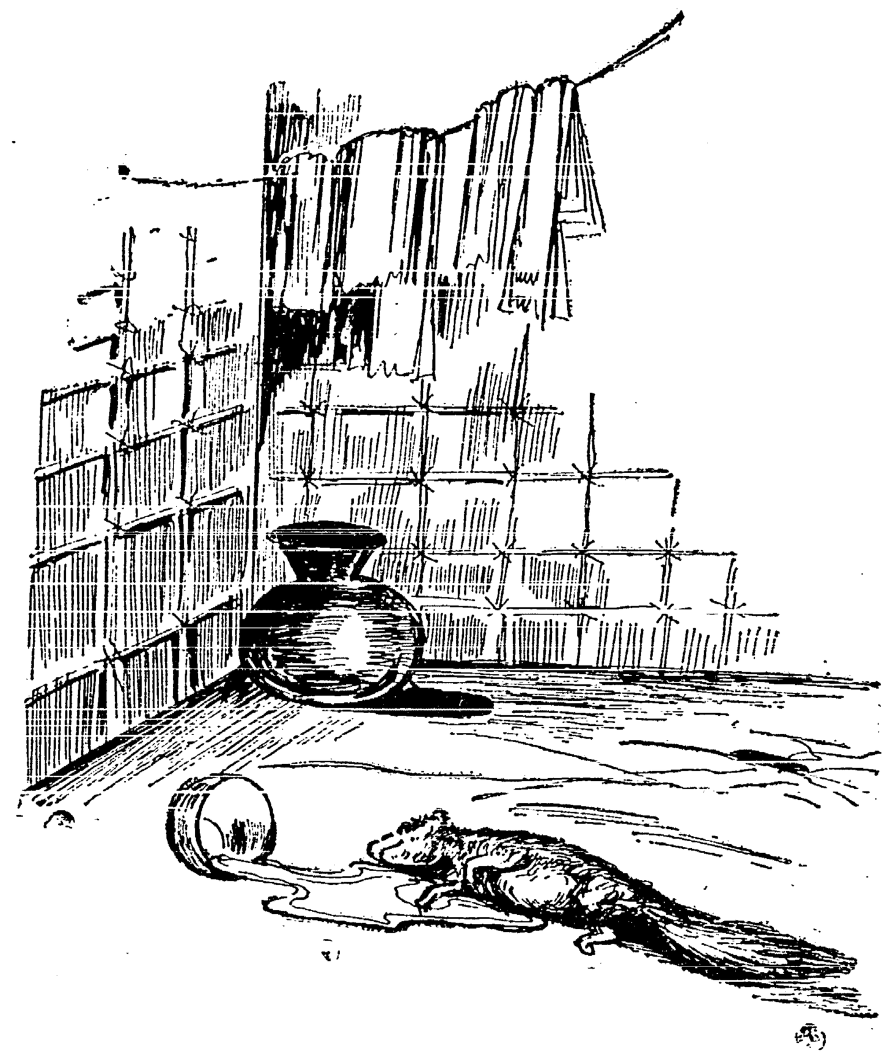

সেই ছাতুর উপর আমি লুটোপুটি খাইতে লাগিলাম

বেজী ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কেন ?

তোমাদের মধ্যে যাহাদের ছোট ভাই বোন আছে, তাহারাই জান ছোট ছেলেরা অনেক সময় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—প্রশ্নটা হয়ত খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার লইয়া—কিন্তু তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে বড়দেরও বেশ একটু

ঘাবড়াইয়া যাইতে হয়। নীচে এই ধরণের কয়েকটা প্রশ্ন তুলিয়া দিলাম তোমরা চেষ্টা করিয়া দেখত' উত্তর দিতে পার কিনা।

(১) একটু কাজ করিলে আমরা কেন শ্রান্ত হইয়া পড়ি ?

(২) কুকুর কেমন করিয়া লোক চিনিতে পারে ?

(৩) গাছকে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখিলে তাহা কয়েক দিন পরে সাদা হইয়া যায় কেন ?

(৪) সাধারণতঃ দিনের বেলা হইতে রাত্রে সহজে ঘুম পায় কেন ?

"কেন"র উত্তর

(১) মানুষ শ্রান্ত হইয়া পড়ে দুটি কারণে। আসল কারণটা শুনিতে ভারি অদ্ভুত। আমরা যখন কোন একটা কাজ করি তখন ধীরে ধীরে আমাদের শরীরের মধ্যে একটা বিষাক্ত জিনিষ তৈরী হইতে থাকে। কাজ যত বেশী করা যায় শরীরে এই বিষাক্ত জিনিষটা ততই বাড়ীতে থাকে। আর তাহাতে শরীরটা অবসন্ন হইয়া পড়ে। শারীরিক বা মানসিক যে কোন কাজেই সকলের আগে মগজের ভিতরে এই বিষাক্ত জিনিষটা জমিতে থাকে। ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একটা পরিশ্রান্ত কুকুরের শরীর হইতে খানিকটা রক্ত লইয়া অন্য কোন কুকুরের শরীরে ঢুকাইয়া দিলে সে কুকুরটা কোনও কাজ না করিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। কারণটা আর কিছুই না। রক্তের সঙ্গে শ্রান্তির বিষটা তাহার মগজে জমিতে থাকে—কাজেই পরিশ্রমের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তাই বলিয়া যেন কেহ বিষের ভয়ে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিওনা। কেন না বিষাক্ত বলিতেই সাংঘাতিক কিছু মনে করিবার কারণ নাই। এ বিষ একটু বিশ্রাম করিলেই চলিয়া যায়।

(২) কুকুরের লোক চিনিবার প্রধান সহায় তাহার চোখ নয়, ঘ্রাণ শক্তি। মানুষের মধ্যে এই ঘ্রাণশক্তি জিনিষটা সব সময় কাজে আসে না—আমরা লোক ঠিক করি চোখে দেখিয়া। কুকুর বেচারারা কিন্তু চোখে

দেখিলেও সব সময় চোখের সাহায্যে লোক চিনিতে পারে না। কুকুর প্রত্যেক জিনিষের গন্ধ টের পায়। একেক জন লোকের গায় একেক রকম গন্ধ থাকে। শুনিলে হয়ত তোমরা হাসিবে, কিন্তু কুকুররা এই গন্ধ শুঁকিয়াই চেনা অচেনা লোক ঠিক করে। এমনও দেখা গিয়াছে—কেহ কুকুরের মালিকের পোষাক পড়িয়া কুকুরের কাছে গেলে কুকুর তাহার জামার গন্ধ শুঁকিয়া তাহাকেই প্রভু বলিয়া মনে করিয়া বসে আর ঠিক তেম্নি ব্যবহার করে। অচেনা লোকের গন্ধ কুকুরের কাছে নুতন, তাই সে অচেনা লোকের গন্ধ পাইলেই চীৎকার করিতে থাকে।

(৩) গাছের পাতার মধ্যে সবুজ রংএর একটা জিনিষ আছে, তাই গাছের পাতাকে সবুজ দেখায়। এই জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন ক্লোরোফিল। এই ক্লোরোফিলের কাজ হইতেছে সূর্য্যের আলোর কতক অংশ টানিয়া লওয়া আর তাহার সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈরী করা। এই সবুজ রংএর ক্লোরোফিল আবার সূর্য্যের আলো না থাকিলে তৈরীও হইতে পারে না। কাজেই অন্ধকারে গাছ রাখিলে তাহাতে ক্লোরোফিল তৈরী হয় না আর তাই তাহা সাদা হইয়া যায়।

(৪) সব পাৎলা জিনিষের ভিতর দিয়াই আলো জিনিষটা কিছু না কিছু প্রবেশ করে। আমাদের চোখের পাতাও পাৎলা। (চোখের পাতা যদি ভারী হইত তবে চোখ চাহিতে কষ্ট হইত, কেননা চোখ খোলা মানেই ভারী পাতাটা তুলিয়া ধরা।) কাজেই চোখের পাতা বন্ধ থাকিলে ও তাহার ভিতর দিয়া কিছু না কিছু আলো প্রবেশ করে। রোদের সময় জানলার ধারে দাঁড়াইয়া আস্তে চোখ বুজিলে অন্ধকার দেখায় না, লাল মত দেখায়! ইহার কারণ, তখন সহজেই চোখের মধ্যে আলো প্রবেশ করে। আর এই আলো মগজ কে জাগাইয়া রাখিতে সাহায্য করে। রাত্রে চোখে আলো ঢুকিতে পায় না। মস্তিষ্কও তাই সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

[এই শ্রেণীর 'কেন ?' ও 'কি ?' যদি তোমাদের ভাল লাগে, তবে আমাদের জানাইবে, আমরা মাঝে মাঝে তাহা বাহির করিব]

তুরুষ্ক ও মুস্তাফা কেমাল পাশা

সকল মুসলমানের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছে নব্য তুরুষ্ক। মুসলমানের পারস্য দেশ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, কাবুলীদের দেশ মাথা তুলিতেছে, কিন্তু তুরুষ্ক বড় হইয়া না উঠিলে এ সব কিছুই হইত না। তুরুষ্ককে এই ভাবে বড় করিবার জন্য যিনি সব চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছেন, তাঁহার নাম গাজী মুস্তাফা কেমাল পাশা।

তরুষ্কের এক সময় ভারী প্রতাপ ছিল। তুর্কী জাতি বড় হইয়া এসিয়ার পশ্চিম দিক্‌টা সমস্ত, এবং ইউরোপের পূব দিকের অনেকটা, দখল করিয়া নিয়াছিল। তাহাদের রাজা বা 'সুলতান' সকল সুন্নী মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্মের মাথা হইয়া 'খলিফা' উপাধি পাইয়াছিলেন। রোমান জাতির হাত হইতে স্তাম্বুল নগর অধিকার করিয়া নেওয়ার পর হইতে লোকে তাঁহাকে "রুমের বাদ্‌শা" বলিত, স্তাম্বুলেই তাঁহার রাজধানী হইয়াছিল। স্তাম্বুল ইউরোপের মধ্যে একেবারে পূবে—খুব ভাল জায়গা। ছোট বড় অনেক খৃষ্টানদের দেশ, সুলতানের রাজ্যের সামিল হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টান রাজাদের তাহা সহ্য হইত না। তাঁহারা অনেকদিন হইতেই তুরুষ্কের পেছনে লাগিয়াছিলেন।

তুর্কীরা খৃষ্টানদের উপর জোরজুলুম করে, এই কথা বলিয়া যখন তখন নিকটবর্ত্তী খৃষ্টানদের দেশগুলি তুরুষ্কের সঙ্গে লড়িতে আসিত। অন্য দেশগুলি হঠাৎ বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু রুষিয়া প্রবল হাওয়ার পর তুরষ্ককে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। ঘরের কাছে বড় প্রতিবেশী বিপক্ষ থাকিলে মুস্কিলেরই কথা। অনেক ছোট ছোট দেশ তুরষ্কের অধীন থাকিয়া সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিত, আর কেমন করিয়া তুরষ্ককে হটাইয়া দিয়া নিজেরা স্বাধীন হইবে; সেই চিন্তা করিত। রুষিয়া ছিল তাহাদের সহায়। কাজেই একটু মুস্কিলের কথা নয় কি? দেশগুলি ছোট হইলেও আবার লোকগুলি ভীতু ছিল না। পাহাড়ে দেশ, পাহাড়ে লোক, বীরত্ব ছিল। তাইতেই ছট্‌ফটানিও একটু

বেশী হইত। অন্য খৃষ্টান দেশের সাহায্যে এই সমস্ত দেশ ক্রমে ক্রমে তুরুষ্কের অধীনতা ছাড়াইয়া নিজেরা স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পরও বিবাদ থামিল না।

গাজী মুস্তাফা কেমাল পাশা

এদিকে আবার নিজ তুরুষ্কের লোকও সুলতানের শাসনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। একটা লোকের হাতে অনেক ক্ষমতা থাকিলে অনেক সময়েই গোল বাধে। তুরুষ্কের লেখা-পড়া-জানা নব্যদলের লোক শাসনের নিয়মগুলি বদ্‌লাইয়া দিয়া যাহাতে দেশের লোকের হাতে অনেকটা ক্ষমতা আসে চুপে চুপে তাহার চেষ্টায় থাকিল। ইহাদের সর্দ্দার ছিলেন এন্‌ভার বে। রাজার হুকুমে জোর-জুলুম, ফাঁসি সবই হইতে লাগিল, কিন্তু নব্যদলও বেশ জমিয়া উঠিল। শেষে সুলতানকে বলা হইল তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিলে চলিবে না, ইহাতে অন্য জাতির কাছে লজ্জা পাইতে হয়, দেশের লোককে শাসন-কার্য্যে কতকটা ক্ষমতা দিতেই হইবে, আইন তৈরির সভা বসাইতে হইবেই। সুলতান বেগতিক দেখিয়া স্বীকার করিলেন। ইহা হইল ২০ বৎসর আগেকার কথা।

গোলমাল কিন্তু ইহাতেও মিটিল না। এই সময়ে যিনি সুলতান ছিলেন তাঁহার নাম আবতুল হামিদ। তিনি বাজে লোকদিগের নিকট হইতে আলাদা জায়গায়-এক রকম কেল্লার মধ্যে থাকিতেন। বেগমদিগকে পর্দ্দার আড়ালে রাখিয়া আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইতেন, আর চর লাগাইয়া যখন তখন সত্য মিথ্যা খবর যোগাড় করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেন। নূতন নিয়ম তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি সৈন্য পাঠাইয়া আইনের সভার সভ্যদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। নব্য তুর্কীর দল কিন্তু তাহাতে দমিল না। তাহারা গিয়া নগরটাই দখল করিয়া ফেলিল, আর অবতুল হামিদকে ধরিয়া জেলে পূরিল। আবতুল হামিদ যে তাঁহার ভাই মহাম্মদকে জেলে পূরিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা সেই মহাম্মদকে খালাস করিয়া রাজার আসনে বসাইয়া দিল। ইহাঁর নাম হইল ৫ম মহাম্মদ। ইনি গোবেচারী গোছের লোক ছিলেন। নব্য দল ইচ্ছামত কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু নব্য দলেও আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ ছিল। আবার তুরুস্কের অধীন ইউরোপে যে সকল জাতি বাকী ছিল, তাহারাও তুরুস্কের শাসন ভালবাসিত না। বরং তাহাদের কাছাকাছি যে সকল জাতি তুরুস্ক হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকেই পছন্দ করিত।

নব্য দলের ইচ্ছা ইহারা সকলে তুরুস্কের সহিত এক যোগে একভাবে কাজ করে, কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা অন্য রকমের। গোলমাল বাধিয়া গেলে আবার যুদ্ধ লাগিল। আবার গ্রীস্, বলগেরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী জাতি গুলি তুরুস্কের সঙ্গে লড়াই করিতে লাগিল। একে নিজেদের মধ্যে মিল নাই, তাহার উপর এই যুদ্ধ, তুরুস্ক কাবু হইয়া পড়িল, অনেক জায়গা হইতে বে-দখল হইয়া গেল। তখন কথা উঠিল সন্ধির। "কালনেমির লঙ্কা বাঁট" করিতে গিয়া যাহারা তুরুস্ককে খাইয়া ফেলার চেষ্টায় ছিল তাহারা নিজেরাই কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। সন্ধি হইতে না হইতেই লাগিয়া গেল তাহাদের আপনা-আপনির মধ্যে যুদ্ধ। তুরুস্ক এই সুযোগে কিছু কিছু খোয়ান জায়গা খালাস করিয়া লইল।

ইহার পর বাধিয়া গেল ইউরোপের মহা যুদ্ধ। প্রথম প্রথম ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া প্রভৃতি একদিকে, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, তুরুস্ক প্রভৃতি অন্যদিকে। শেষে রুষিয়া নিজের দেশের গোলমালে জড়াইয়া পড়িয়া নিজের রাজার দফা শেষ করিয়া দিল, আর ইংলণ্ড প্রভৃতি হইতে আলাদা হইয়া তুরুস্কের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এই যুদ্ধে প্রথম দলের জয় হইবার পর তুরুস্কের স্বাধীনতা যায় যায় এমন হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীস্ তুরুস্কের অনেকটা দখল করিয়া লইল। ইউরোপে ত' তুরুস্কের রাজ্যের প্রায় সবটাই আগে চলিয়া গিয়াছিল, এখন এসিয়াতেও যায় যায়! সুলতান ইউরোপের হোমড়া-চোমড়া জাতি গুলির হাতের পুতুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাধ্য রহিল না যে, তাহাদের বিরুদ্ধে হাত তোলেন কিম্বা গ্রীক্ দিগের হাত হইতে এসিয়ার অংশটা খালাস করেন। কিন্তু তুরুস্কে এমন কতক লোক ছিল যাহারা এ অবস্থা মোটেই পছন্দ করিল না, তাহারা ছিল শিক্ষিত, দেশের জন্য তাহাদের প্রাণ কাঁদিত, দেশটা পরে বড় হইবেই এ বিশ্বাস তাহাদের ছিল। এই দলের সর্দ্দার হইলেন মুস্তাফা কেমাল পাশা। এখন তাঁহার কথাই কিছু বলা যাক্।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সালোনিকা নগরে মুস্তাফা কেমালের জন্ম। সালোনিকা তুরুস্কের সামিল ছিল, এখন গ্রীসের সামিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পিতা প্রথমে রাজ-সরকারে চাকরী করিতেন, শেষে কাঠের ব্যবসা ধরেন। কেমাল প্রথম বয়সে লেখাপড়ায় ভালই ছিলেন—বিশেষতঃ গণিত-বিদ্যায়। বিদ্যায় মনোযোগ দেখিয়া তাঁহার শিক্ষক তাঁহাকে "কেমাল" অর্থাৎ "সম্পূর্ণ" বলিয়া ডাকিতেন। এই নামই তাঁহার টিকিয়া গিয়াছে। তিনি বড় হইয়া যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে পড়িতে গেলেন। সেখানে পড়া শেষ করিয়া সৈন্য-বিভাগে কাজে ঢুকিয়া পড়িলেন—অবশ্য তখন সুলতানের অধীনে। নব্য তুর্কীদলের মধ্যে তিনিও ছিলেন—অত্যাচারী সুলতানকে তিনি মোটেই ভালবাসিতেন না। তাঁহার উপরও সরকারের নেক্-নজর ছিল না। সুলতানের সরকার কিছুদিন পরে তাঁহাকে জেলখানায় পূরিলেন। কিন্তু তুরুস্কের তখন যে গোলমালের অবস্থা! কিছুই ঠিক ছিল না, আজ যে প্রিয় কাল সে অপ্রিয়, আজ

যে হাতে হাতে স্বর্গ পাইতেছে, কাল তাহার অদৃষ্ট জেলখানা—এই ছিল তখনকার দেশের অবস্থা! কেমালও অল্পদিন পরে জেলখানা হইতে খালাস পাইলেন এবং আবার সৈন্য-বিভাগে সরকারের কাজেই থাকিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাকে পাঠান হইল রাজধানী হইতে বহুদূরে—একেবারে সিরিয়ায়। এখানে গিয়াও তিনি দল পাকাইতে লাগিলেন। শেষে চুপি চুপি গ্রীসের পথে একদিন একেবারে সালোনিকায় হাজির। তারপর অন্য লোকজনের সঙ্গে একটা ভাল দলই গড়িয়া তুলিলেন। সুলতান আব্‌দুল হামিদকে এই দলই রাজ-সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া কয়েদ করিয়া ফেলিল। আবার কেমালের উপর সরকারের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে ধরিবার হুকুম বাহির হইল। কিন্তু তাঁহার মত লোককে ধরাটা কি অতই সহজ? তাঁহার দিকেও তো লোকজন ছিল! তিনি তাহাদের সাহায্যে দিলেন চম্পট্। আবার সিরিয়ায় গিয়া নিজের কার্য্যে যোগদান করিলেন,—গোলমালটা তখন এমনি!

যখন আফ্রিকায় ইটালীর সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল তখন কেমাল চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; একেবারে সেখানে গিয়া ইটালীর বিপক্ষে যুদ্ধে মাতিয়া গেলেন। যাওয়া কি খুব সহজ ছিল? ইজিপ্ত হইয়া যাইতে হইয়াছিল। সেখানে কর্ত্তারা জানিতে পারিলেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতেন। কেমালকে তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া বেশ চালাকি করিয়াই যাইতে হইয়াছিল। ইহার পর গ্রীস্ বল্‌গেরিয়া প্রভৃতির সঙ্গে তুরুস্কের যুদ্ধ বাধিয়া গেলে কেমালকে সেই যুদ্ধে যোগ দিতে হইল। তিনি বল্‌গেরিয়ার লোকের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইলেন এবং শেষে সন্ধির পর দূতের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ইহার পর ইউরোপের সেই বড় লড়াইয়ের সময় তিনি বীরত্ব দেখাইতে ক্রুটী করেন নাই। গ্যালিপলিতে তিনি যুদ্ধে দাঁড়াইলেন ইংরাজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে। সেখানে পাহাড় ও সমুদ্র—ইংরাজ পক্ষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তুরুস্ক ক্রমে কাবু হইয়া পড়ায় আর যুদ্ধ চালাইতে পারিল না। কেমাল যুদ্ধ থামাইবার দিকে ছিলেন না। তাঁহার দেশ সকলের কাছে মাথা হেঁট করিবে ইহা

তাঁহার সহ্য হইল না। তুরুস্ক যুদ্ধ বন্ধ করিলে তিনিও চাকরী ছাড়িয়া দিলেন। সকলে আশা ছাড়িয়া দিল কিন্তু তিনি ছাড়িলেন না। কেমন করিয়া আবার তুর্কী জাতির মান-সম্ভ্রম জাগাইয়া তুলিতে পারেন, এই হইল তাঁহার চিন্তা।

গ্রীকেরা এসিয়া-খণ্ডে গিয়া অনেক জায়গা দখল করিলে পর কেমালকে আবার স্তাম্বুল হইতে সরকারী সৈন্য দেখা-শুনা করিবার জন্য পাঠান হইল সেই দিকে। কিন্তু তাঁহার মন থাকিল দল পাকাইয়া দেশটাকে উদ্ধার করার দিকে। তিনি সেখানে গিয়া এই মতলবে লোকজন যোটাইতে লাগিলেন। স্তাম্বুলের কর্ত্তাদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ায় তাঁহারা কেমালকে ফিরিয়া আসার জন্য হুকুম পাঠাইলেন, কারণ এই কর্ত্তাদের তখন যুদ্ধ করার মত অবস্থা ছিল না। কেমাল কিন্তু সে হুকুম মানিলেন না। কার্য্যে ইস্তফা দিয়া দল পাকাইবার কার্য্যেই ব্যস্ত রহিলেন। সভার পর সভা বসিতে লাগিল, স্থায়ী সভার তিনি সভাপতি হইলেন। লোক-জন যোটাইয়া গ্রীক্‌দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে ইংরাজেরা স্তাম্বুল দখল করিয়া ফেলিলে সুলতান থাকিলেন তাহাদের হাতের মুঠায়। সুলতান কেমাল ও তাঁহার দলের মাথাল মাথাল লোকদের মৃত্যু-দণ্ডের হুকুম দিলেন। কিন্তু দণ্ড দেয় কে? কেমালের দল তখন সুলতানের এলেকার বাহিরে। তাহারা স্তাম্বুল হইতে দূরে, সমুদ্র হইতে দূরে, আঙ্গোরা নামক এক ছোট জায়গায় আড্ডা গাড়িল। সেখানে দলবল যুটিতে লাগিল। এদিকে গ্রীকেরা অনেক লোক-জন লইয়া এসিয়ার ভিতরের দিকে ঢুকিতে লাগিল। দেশের লোক কতক হইল কেমালের দিকে, কতক হইল তাঁহার বিপক্ষে। সুলতানের সৈন্য সাজিয়া গুজিয়া কেমালের বিরুদ্ধে আসিল, সুলতানের পক্ষের লোক দেশের লোককে কেমালের বিরুদ্ধে নাচাইয়া উঠাইতে লাগিল। কিন্তু সুলতানের সৈন্য কেমালের সৈন্যের কাছে দাঁড়াইতে পারিল না, দেশের লোক যাহারা বিপক্ষে ছিল তাহারাও হঠিতে লাগিল। মুস্কিল হইল গ্রীক্‌দিগকে লইয়া। তাহাদের সৈন্য অনেক বেশী—কামান, বন্দুক, উড়োজাহাজ আসবাব-পত্র—সব বেশী। তাহাদের সৈন্য একলক্ষ, কেমালের সৈন্য ২৫ হাজার, তাহাদের উড়োজাহাজ অনেক,

কেমালের মোটে একখানা। কিন্তু কেমালের সাহস টুটিলনা তিনি হঠিলেন না—স্বয়ং যুদ্ধ চালাইতে লাগিয়া গেলেন। বিশ্রাম নাই, রাত্রে ঘুম নাই, কেবল চিন্তা, পরামর্শ, কাজ। নেপোলিয়নের মত তিনি ম্যাপের উপর কে কোথায় আছে, কি ভাবে কোথায় সৈন্য চালাইতে হইবে—সমস্ত ঠিক করিয়া কাজ করিতেন, সমস্ত সৈন্য তখন তাঁহার চোখের সাম্‌নে ভাসিত। কেমাল স্বয়ং যুদ্ধ চালাইবার অল্পদিন পরেই গ্রীক-সৈন্য ল্যাজ গুটাইতে লাগিল, কেমাল তাহাদিগকে সমুদ্র-পার করিয়া দিয়া তবে ছাড়িলেন। দুই বৎসরেরও বেশী দিন গ্রীকেরা তুর্কীদিগের দেশে এসিয়া-খণ্ডে আড্ডা গাড়িয়াছিল। তুরুষ্ক তখন দুইভাগ হইয়া রাজ্যের কাজ চালাইতেছিল। স্তাম্বুলে ছিলেন স্থলতান, ইউরোপের বড় বড় জাতির হাতের মুঠার মধ্যে, আর কেমালের দল ছিল আঙ্গোরায়। মহাযুদ্ধের শেষে যখন লসন নগরে সন্ধির কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল তখন কেমালের দল স্থলতানকে সেখানে লোক পাঠাইতে দিল না, নিজেরাই তাহাতে যোগ দিল। ইহার পর ইংরাজেরা স্তাম্বুল ছাড়িয়া দিলে তাহারাই উহা দখল করিয়া ফেলিল। যিনি তখন স্থলতান ছিলেন তিনি আর কি করিবেন? বেগতিক দেখিয়া ইংরাজের জাহাজে চড়িয়া একেবারে সমুদ্র পাড়ি দিলেন। কেমালের দল তখন ঠিক করিলেন, তুরুষ্কে আর কাহাকেও স্থলতান করা হইবে না, দেশের লোক যে সভা ঠিক করিয়া দিবে সেই সভা হইতেই দেশের সমস্ত রাজ-কার্য্য চলিবে। কেমাল এই সভা চালাইতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে গণ-তন্ত্র। কেমাল তুরুষ্কে গণ-তন্ত্র বসাইলেন, রাজধানী আর স্তাম্বুলে আসিল না, উহা থাকিয়া গেল আঙ্গোরায়।

তুরুষ্কের স্থলতান স্থন্নী মুসলমানদিগের খলিফা বা ধর্ম্ম বিষয়ে মাথা ছিলেন। স্থলতান পলাইবার পর সেই বংশের অন্য একজনকে কিছুদিন খলিফা করিয়া রাখা হইয়াছিল। শেষে কেমাল দেখিলেন, অন্য দেশের সহিত জড়াজড়িতে কোন সময়ে ইহাতে একটা গোলমাল আসিয়া পড়িতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি নিজে ত খলিফা হইলেনই না, নিয়ম করিয়া দিলেন তুরুষ্কে আর খলিফা থাকিবে না। মুসলমান ধর্ম্মের নিয়মে দেশের অনেক আইন-কানুন ছিল। কেমাল

দেখিলেন ইহাতেও অনেক অস্থবিধা; তিনি তাহা তুলিয়া দিয়া ধর্ম্ম হইতে আলাদা সব আইন-কানুন করিলেন! যাহাতে তুরুষ্কের লোকের সকল রকম উন্নতি হইতে পারে, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ের সভ্য জাতিগুলির সঙ্গে তুর্কীরা এক সঙ্গে বসিতে পারে, প্রত্যেক বিষয়ে কেমাল সেই রকম নিয়ম করিতে থাকিলেন।

ফলে তুরুষ্ক দিন দিনই উন্নতির পথে মাথা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মের ধূয়া ধরিয়া এখন কেহ বড় চাকরী পায় না, যোগ্যতা থাকিলেই পায়। লোকের মত লইয়াই কেমাল রাজকার্য্য চালান, তিনি সভাপতি মাত্র। স্ত্রীলোকের ঘোমটা উঠিয়া গিয়াছে, পুরুষের বেশী বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, লোকের পোষাক ইউরোপের লোকের মত হইয়াছে—মাথার টুপি পর্য্যন্ত। দেশের ভাষার অক্ষর ইংরাজদের মত করা হইয়াছে, ধর্ম্ম বিষয়ে দেশের লোককে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলের মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতেছে, দেশে শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে। স্তাম্বুল এখন তুরুষ্কের রাজধানী নয় বটে, কিন্তু রাজধানী থাকার সময় যেমন ছিল তাহার চেয়ে এখন জাঁক-জমক অনেক বেশী। তখন ছিল ঘোড়ার গাড়ী, এখন স্থন্দর স্থন্দর মোটর গাড়ী। পুলিশ এখন দেশের কাজ করে, স্থলতানের চর-গিরি করিয়া বেড়ায় না। আঙ্গোরায় এখনও তেমন জাঁক-জমক হয় নাই, কিন্তু খাঁটি মানুষ হইয়াছে অনেক।

তোমরা মনে করিবে কেমাল যখন এত বড় লোক, তখন হয়ত দেখিতে কত বড়ই একটা! মোটেই নয়। তিনি পাতলা গোছের লোক; তুর্কী যোদ্ধাদের চওড়া হাত কিন্তু তাঁহার হাতও ছোট। নেপোলিয়ানের চেহারাও জোরদার লোকের মত ছিল না। চেহারা কি করিবে? আসল কথা মনের আগুন! কেমালের কাজ করার ক্ষমতা কত! অন্য লোক বেশী খাটিতে হইলে এলাইয়া পড়ে, কিন্তু তিনি খাটিতেইছেন!! খাটিতেইছেন কত রাত্রি যে না ঘুমাইয়া কেবল খাটিয়া খাটিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন তাহা কে বলিবে?

"এরাই মোদের আশার খনি,
সবার আগে এদের গণি,
এরাই মোদের অমর-প্রদীপ এরাই মোদের আশার স্থল।"
— —সত্যেন্দ্রনাথ

—*—

রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকারা—

আমাদের বিজয়ার সম্ভাষণ নিও। এবার তোমাদের জন্য আমরা একটা নূতন বিভাগ খুলিলাম। এতে **প্রতিমাসে** শুধু তোমাদের রচনাই বাহির হইবে। তোমরাই ত' এক সময়ে বাংলা সাহিত্যের আসর দখল করিবে, তাই এই বিভাগটার নাম দিলাম "ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক।" তোমাদের নিজেদের রচিত ছোট ছোট কবিতা, গল্প, আরও অন্যান্য খবরাখবর আমাদের কাছে লিখিয়া পাঠাইও, ভাল হইলেই আমরা ইহার মধ্যে ছাপিব। তাহা ছাড়া তোমাদের মধ্যে যাহারা ছবি প্রভৃতি আঁকিতে পার, কিংবা ফটো তুলিতে জান, তাহারা সে সব পাঠাইলে, এবং ছাপিবার উপযুক্ত হইলে, তাহাও ইহার মধ্যে ছাপিব। লেখা যেন বেশী বড় না হয়—রামধনুর দু'তিন পৃষ্ঠার মধ্যেই রাখিতে চেষ্টা করিবে।

আর একটা কথা, রচনাগুলি যেন সম্পূর্ণ তোমাদের স্বরচিত হয়। আর কাহারও লেখা কিন্তু পাঠাইও না। তাহাতে তোমাদেরও বদ্‌নাম, আমাদেরও বদ্‌নাম। আমরা মাঝে মাঝে সে রকম লেখা পাই কিনা, তাই লিখিলাম। কিছু মনে করিও না।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** ঃ—বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক-গ্রাহিকা ছাড়া আর কাহারও লেখা এই বিভাগে ছাপা হইবে না। প্রত্যেক রচনার সহিত গ্রাহক-নম্বর থাকা চাই-ই।]

(পরের পৃষ্ঠায় গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা ছাপা হইল—আমাদের হাতে তোমাদের আরও কিছু কিছু লেখা আছে, আস্তে আস্তে ছাপিব।)

—o—

আশ্রমে

গগনে উদিছে রবি, বহে সমীরণ,
পাখীরা প্রভাতী গায়, জুড়ায় শ্রবণ।
শয্যা ছাড়ি' মুনিশিশু করি সন্ধ্যা, স্নান,
সমকণ্ঠে মুক্তপ্রাণে গায় সামগান।
আলবালে মুনিকন্যা করিছে সিঞ্চন,
কতশত ফুল ফোটে, হাসে তপোবন।
সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধমুনি কুটীর-প্রাঙ্গনে,
ব্যাখ্যানিছে সাংখ্য-সূত্র নিজ শিষ্যগণে।
মুনিপত্নী মাতৃসমা পালিছে সবায়,
ভেদাভেদ কিছু নাই সে শান্তি-ছায়ায়।
অতিথি আসিলে পরে ফল-ফুল দানে,
পূজা করে সবে তারে মিলি একপ্রাণে।
পূত হোমানল শিখা জ্বলে অনুক্ষণ,
ওঁকার-সঙ্গীতে পূর্ণ ঋষির ভবন।
সীমাশূন্য অন্ধকারে ডুবিছে তপন,
পূরবে হাসিছে চাঁদ, হাসে তপোবন।
বন হতে হোমধেনু ফিরি আসে ঘরে,
জ্যোছনা ছড়ায়ে গেছে নীল গিরি-শিরে।
সান্ধ্যগীতি গায় সবে হোমানল ঘিরি,
তার মাঝে ঋষিবালা—অনিন্দ্য সুন্দরী।

শ্রীশান্তিলতা সেনগুপ্তা।
(গ্রাহিকা)

I (আই) মানে কি ?

একদিন সন্ধ্যায় রামবাবু যখন বাড়ীতে এলেন তখন শুন্‌লেন তার ছোট ছেলে জয়কৃষ্ণ খুব গা দুলিয়ে ইংরেজী পড়া মুখস্থ ক'রছে—"আই" মানে মাষ্টার মহাশয়, আই মানে "মাষ্টার মহাশয়"।

কি, কি, ফের্ বল দিকিন।

কেন ? "আই" মানে "মাষ্টার মহাশয়।

দূর হতভাগা, "আই" মানে "আমি"।

বাঃ মাষ্টার মহাশয় বল্লেন "আমি।" আর তুমিও ব'লছ "আমি"! তা'হলে ঠিক্ কি সে বিষয়ে ত সন্দেহ র'য়ে গেল!

আফিসের ঘ্যান ঘ্যানানিতে রামবাবু একে তিতি-বিরক্ত হ'য়ে এলেন আবার ঘরেও সেই ; ভাল লাগলো না, তাই তিনি ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন।

এদিকে জয়কৃষ্ণ পড়'লো ফাঁপরে।

এখন বলে কি—"আই" মানে "বাবা" বলবে কি, "আই" মানে "মাষ্টার মহাশয়" ব'লবে ? বাবাও হ'লেন এম-এ পাশ আর মাষ্টার মহাশয়ও হ'লেন এম-এ পাশ! ভুল ত আর হবে না ; এই রকম সাত পাঁচ ভেবে জয়কৃষ্ণ ঠিক্ ক'রলে, ঘরেতে "আই" মানে "বাবা" আর স্কুলে "আই" মানে মাষ্টার মহাশয়! বেশ ক'রে পড়াটী মুখস্থ ক'রে সেদিনকার মত দক্ষিণ হস্তের কার্য্য সমাপন করে বিছানায় শুয়ে পড়্‌লো।

পর দিন সময় মত গিয়ে স্কুলে উপস্থিত। প্রথম ঘণ্টায় হ'ল ইংরাজী পড়া। হেড্ মাষ্টার মহাশয় পড়ান।

তিনি হ'লেন খেয়ালের লোক, একটী কথা নিয়ে সমস্ত ক্লাশ্‌কে জিজ্ঞাসা করা তাঁর একটী রোগ। সকলকেই "আই" মানে জিজ্ঞাসা ক'রছেন, আর সকলেই ব'লছে "আমি।" সকলেরই ঠিক্ হ'চ্ছে। জয়কৃষ্ণ ভাব্‌লে আমার যখন পালা প'ড়বে তখন আমি ব'লব "সকলে"। তাহ'লে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের সুখ্যাতিটী লাভ করা যাবে। তার যখন পালা এ'ল সে ব'ল্লে —স্যার্ (মহাশয়) "আই" মানে "সকলে"। সমস্ত ক্লাস্ হেসে উঠ্‌ল।

জয়কৃষ্ণ ভাব্‌লে ওটী ঠিক্ হয় নি বোধ হয়, ঐ জন্যে হাসছে। তা ঘরে যেটী মুখস্থ ক'রেছিলুম সেইটে বলি ; এই না ভেবে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লো, ওটা স্যার জিভ্‌টা উল্টে

গেছ্‌লো ; আই মানে হ'ল ঘরেতে "বাবা" আর স্কুলে "মাষ্টার মহাশয়।" ফের্ সমস্ত ক্লাশ্ হেসে উঠ্‌লো। এত হাসির ধূম শুনে অন্য ক্লাশ হ'তে মাষ্টারেরা ছুটে এলেন দেখতে। সব কথা শুনে হেসেও অস্থির হ'লেন সবাই। এমন বোকা ছেলে আর কখনও দেখি নাই বাবা। হেসে হেসে পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে গেল। আর কখন জয়কৃষ্ণ ওরকম কাণ্ড ক'রেছে কিনা জানিনে, তবে খবর পেলে জানাব।

শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী

নাকে খৎ

(শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ, এম্-এ)

ঘরে চোর ঢুকিয়াছে। বুড়া গিন্নি টের পাইয়াছেন। কিন্তু কি করিবেন ? বাড়ীতে পুরুষ নাই ; সঙ্গে শোয়া শুধু বউ। অগত্যা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বউ মা, বাপের বাড়ী থেকে এখানে আস্‌বার কালে তুমি কাঁদ নি ?"

বউ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা ?"

গিন্নি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে বল না, কেঁদেছিলে কি না ?"

বিছানার নীচে বসিয়া চোর ভাবিল, আচ্ছা শাশুড়ী রে! বউয়ের সঙ্গে বেড়ে রস কচ্চে!" সে উৎফুল্ল হইয়া রস জোগাড় করিতে লাগিল। চোরা জানিত না যে এ রসে কোন্ মিঠাই তৈরী হইবে!

বউ শাশুড়ীর ইঙ্গিত বুঝিল না, চুপ করিয়া রহিল। তখন শাশুড়ী কহিলেন, "বল্লে না ? আমি কিন্তু ভারী কেঁদেছিলাম। সে কি চীৎকার! শুন্‌বে ?"

বউ জবাব দিবে কি! সে অবাক্ হইয়া গেছে। চোরের কিন্তু ভারী ইচ্ছা হইতেছিল, সে একটু শোনে। বউটা হাবা নাকি! কেন একটু বলে না, হাঁ শুন্‌ব! বাস্তবিক, সে অনেক বাড়ীতে চুরি করিয়াছে—কিন্তু এমন রসের সাগর আর দেখে নাই।

"তবে কিন্তু তোমারও শোনাতে হবে কেমন কেঁদেছিলে তুমি।" এই বলিয়া

গিন্নি-বুড়ী হাঁক্‌ডাক ছাড়িয়া চীৎকার সুরু করিলেন, "ওরে! কে আছিস্‌ রে! আমায় নিয়ে গেল রে!" ইত্যাদি।

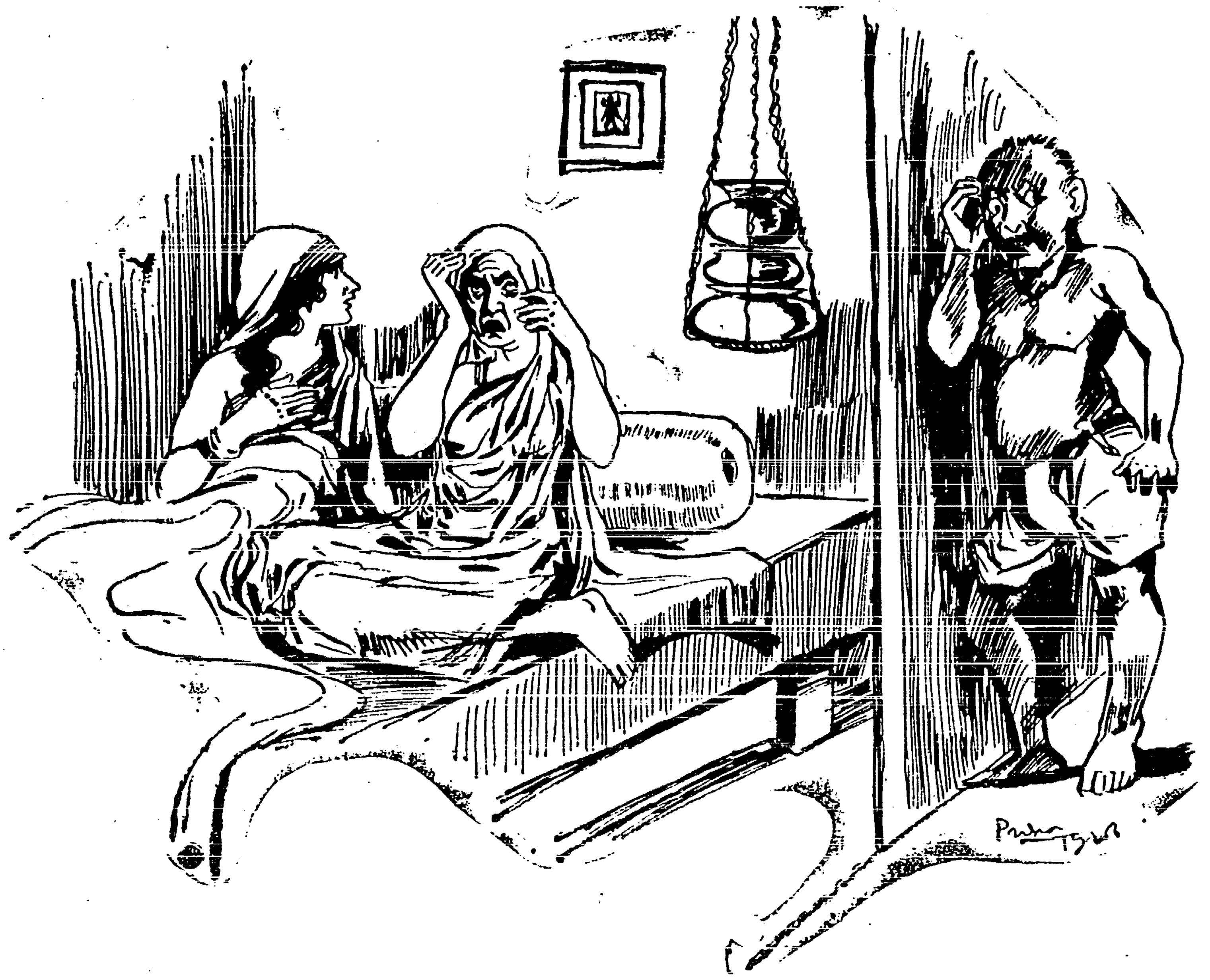

"ওরে! কে আছিস্‌ রে! আমায় নিয়ে গেল রে!"

চোরার বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, আবার হাসিও পাইল।

এদিকে "কি হয়েচে, কি হয়েচে" বলিতে বলিতে লাঠি-ঠেঙ্গা হাতে করিয়া পড়্‌শিরা সব বাড়ীর আঙ্গিনায় হাজির। গিন্নি চেঁচাইয়া বলিলেন "ঘরটা ঘেরাও ক'রে ফেল। ঘরে চোর।"

রামবাবু চোরার হাতটাতে ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, "কিরে বেটা!"

চোরা কাঁদিয়া বলিল, "বাবু, নাকে খৎ! আর এ বাড়ীতে আস্‌ব না!"

চুম্বকের শক্তি

পাশের ছবিখানা দেখ। ৭জন লোক একটা প্রকাণ্ড রোলারের নীচে লাগান একটা লোহার ডাণ্ডা ধরিয়া ঝুলিতেছে। রোলারটা কিন্তু আসলে একটা চুম্বক! চুম্বক কি জান নিশ্চয়ই; চুম্বকের এক অদ্ভুত শক্তি আছে—ইহার কাছে লোহা লইলে ইহা আপনা হইতে সে লোহা টানিয়া ধরে। যে লোহার ডাণ্ডা ধরিয়া লোক গুলি ঝুলিতেছে তাহা কিন্তু ঐ লোহার সহিত বাঁধা নাই। চুম্বকই উহাকে এত জোরে টানিয়া রাখিয়াছে। যে লোকটীর মাথা নীচের দিকে তাহার পায়ে লোহার জুতা। চুম্বক সেই লোহার জুতাকে শুদ্ধ টানিয়া ধরিয়াছে। তাই লোকটি পড়িতেছে না।

চুম্বকের শক্তি

ছেলেমেয়েদের ব্যাঙ্ক

জার্ম্মাণীর অনেক স্কুলে প্রত্যেক ক্লাসে ছেলেমেয়েদের টাকা রাখিবার জন্য এক একটি ব্যাঙ্ক আছে। ছাত্র ছাত্রীরা যখন যাহা পারে এই ব্যাঙ্কে জমা দিয়া রাখে। আর কত দিল তাহাও সঙ্গে সঙ্গে স্কুল হইতে দেওয়া কার্ডে লিখিয়া রাখে। সে দেশের ছেলেমেয়েদের মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী করিতে শিখাইবার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। আমেরিকারও অনেক জায়গায় স্কুলে স্কুলে এই নিয়ম আছে। গত বছর আমেরিকার সমস্ত ছাত্র ছাত্রী মিলিয়া এই ভাবে ৬ কোটি টাকা জমাইয়াছিল।

পিছল পথের গাড়ী

বৃষ্টির পরে রাস্তা ঘাট পিছল থাকিলে মোটর গাড়ী চালাইতে ভয়ানক অসুবিধা হয়। চাকাগুলি অনেক সময় এমন পিছলাইয়া যায় যে অনেক সময় গাড়ী উল্টানও আশ্চর্য্য নয়। আর গাড়ী জোরে চালাইতেও বেশ কষ্ট পাইতে হয়। তাই আমেরিকায় কোন কোন মোটর গাড়ীর সম্মুখে এক অদ্ভুত যন্ত্র বসান হইয়াছে। পিছল পথে গাড়ী চলিবার সময় এই যন্ত্রের সাহায্যে চাকার সম্মুখে বালি ছড়াইয়া পড়ে। ফলে গাড়ী চলে বালির উপর দিয়া। কাজেই চাকাও পিছলাইতে পারে না।

কাগজের নানা নাম

কাগজের মত সব জায়গায়, সব সময়ে লোকে ব্যবহার করে, এমন জিনিষ বোধ হয় খুব কমই আছে। জিনিষটাকে আমরা বলি কাগজ, পারস্যেও ঐ নামই বলে। আরবে বলে

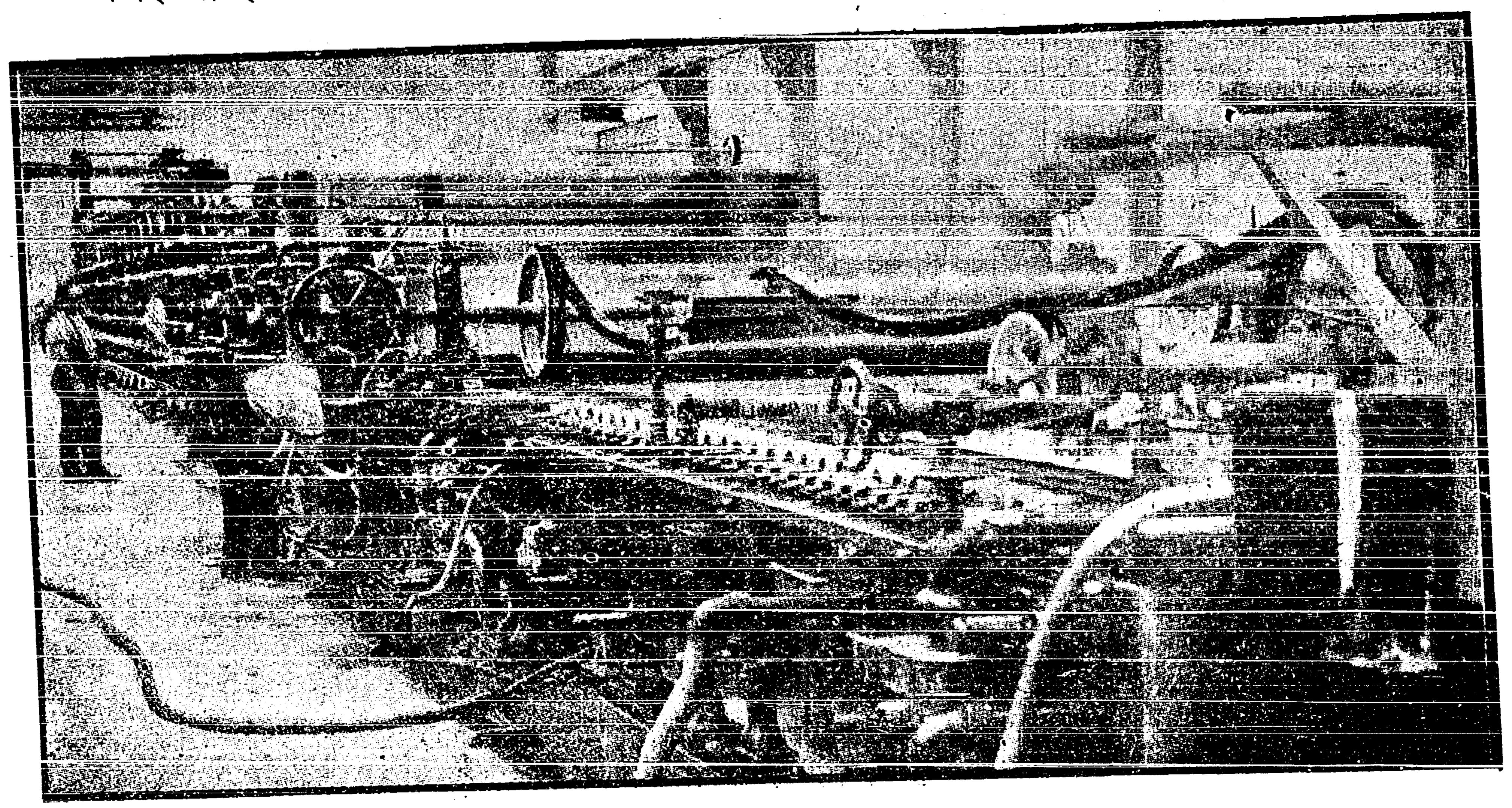

আজকালকার কাগজের কল

কর্ত্তাস, ডেন্মার্কে পেপির, ফ্রান্স ও জার্ম্মানিতে পেপিয়ার, ইংল্যাণ্ডে পেপার, পর্ত্তুগাল ও স্পেনে পেপেল, ইটালীতে কার্টা বা চার্টা, রুষিয়ায়, বুমাগ্‌না, তামিল ভাষায় বরক।

কাগজ প্রথম তৈরি করে চীনা ভায়ারা; আমাদের দেশের হাতে তৈরি তুলট কাগজও খুব প্রাচীন। আজকালকার কাগজ তৈরি করার কলের একটা ছবি উপরে দেওয়া হইল—কী ভীষণ কাণ্ডকারখানা দেখ!

পদ্মরাগ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ)

৪

হুকা-কাশির মুখ গম্ভীর হইল।

রণজিৎ বলিল "তার চাইতে শ্রীমন্তকেই কেন ডাকা যাক্ না এখানে!" শ্রীমন্ত রাজাবাহাদুরের চাকরের নাম!

জিব ও তালু দিয়া আক্ষেপ-সূচক একটা শব্দ করিয়া রাজাবাহাদুর বলিলেন "কে আস্‌বে এখানে? শ্রীমন্ত কি আর শ্রীমন্ততে আছে যে আস্‌বে?"

"কেন? কি হোলো তার?"

হুকা-কাশি উত্তর দিলেন, "সাবাড় করে দিয়েছে—ভূতে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে!"

রণজিৎ কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

হুকা-কাশি একটু ভাবিয়া বলিল, "চলুন নীচেই যাওয়া যাক্। হাত-পা-ভাঙ্গা 'দ' হয়ে শ্রীমন্ত সেখানে পড়ে রয়েছে। আমারও তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেসা করা হয়নি; কেবলমাত্র সে বলেছে যে এ সব ভুতুড়ে কাণ্ড! না না—থাক্, রাজাবাহাদুরকে টানা হেঁচ্‌ড়া করে আর কাজ নেই। অসুস্থ শরীর ওঁর, উনি এখানেই থাকুন!"

নীচের তালায় একটা ঘরে, লোহার খাটের উপর শ্রীমন্ত পড়িয়া আছে। মাথায় হাতে,পায়,—এক রকম সর্ব্বাঙ্গে বলিলেই চলে—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রাজাবাহাদুর যে চিকিৎসার তার কোন ত্রুটীই করিতেছেন না, এবং ওষুধ-পথ্য লইয়া ডাক্তারের দলও যে নিয়ম মতই আসা যাওয়া করিতেছে, তা' কিন্তু তাকের উপরকার শিশি বোতলগুলির দিকে তাকাইলেই বেশ বুঝা যায়।

হুকা-কাশি ঘরে ঢুকিয়াই দরজায় খিল লাগাইয়া দিলেন। শ্রীমন্ত উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হুকা-কাশি বারণ করায় থামিল। রণজিতের বিস্ময়ের

হুকাকাশি ঘরে ঢুকিয়াই দরজায় খিল লাগাইয়া দিলেন

ঘোরটা তখনও কাটে নাই, তাহার দিকে শ্রীমন্ত করুণভাবে তাকাইল।

হুকা-কাশি বলিলেন, "আবার তোমার সে ঘটনাটা আগাগোড়া বল তো শ্রীমন্ত। রণজিৎ বাবু শুন্তে চাচ্ছেন।"

রোগীর মত চিঁ চিঁ গলায় শ্রীমন্ত জবাব দিল "আচ্ছা!... রাজাবাহাদুরের অসুখ হওয়া থেকে সুরু করে, রোজ রাত্রে তাঁর শোবার ঘরে আমি শুচ্ছিলাম। রোগা মানুষ তিনি, কখন কিসের দরকার হয়, তা তো জানা নেই। মাটীতেই একটা কম্বলের বিছানা পেতে শুতাম আমি। বারান্দার দিক্‌কার কাঁচের দরজাটা বরাবরই বন্ধ থাকতো। আর সব দরজাও বন্ধ থাক্‌তো, খোলা

থাক্‌তো শুধু দুদিকের লোহার শিক্ দেওয়া জানলা দুটো।—বাতাস যাওয়া আসা করবার জন্য। একদিন রাত প্রায় দুটো আড়াইটের সময় একটা শব্দ শুনে জেগে উঠ্‌লাম। মানুষে যেমন শিস্ দেয়, অবিকল সে রকম শব্দ, তবে খুব জোরে। মনে হোল শব্দটা এল আমাদের শোবার ঘরেরই হাত দশের দূর থেকে। কোন কথাবার্ত্তা না বলে, চুপ-চাপ শুয়ে রইলাম। মিনিট্ কয়েক পরে আবার সেই আওয়াজ, এবার যেন আরও জোরে, আরও কাছে। মিনিট্ খানেক ফের চুপ, তারপর আবার সেই শিস্! এবারে ঠিক খোলা জানলাটার গোড়াতে। এর পর সেদিন আর কিছুই শুন্‌তে পেলাম না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সেই থেকে একটা রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। রোজই দুপুর রাতে তিনটে করে শিসের আওয়াজ! আওয়াজটা যেন দূর থেকে এসে ঘরের কাছ দিয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই আওয়াজ ভিন্ন আর কোন ঘটনাই ঘটে না। রোজকার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল দেখে একদিন ভাব্‌লাম, যা থাকে কপালে, আজ জানলার পাশে লুকিয়ে থেকে কাণ্ডটা কি দেখবোই দেখবো। রাত দুটো বাজবার আগেই গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম গিয়ে জানলার পাশে। খানিক বাদে যা' দেখ্‌লাম তাতে আমার মাথা তো ঘুরে গেল! দেখলাম, একটা জীব, থেমে থেমে, শিস দিতে দিতে, বারান্দাটা পার হয়ে চলে গেল। কিন্তু সে যে মানুষ নয়, এ আমি জোর গলায় বলতে পারি—মানুষের ওরকম চেহারা হ'তেই পারে না—উঃ, সে কি ভীষণ মুখ! ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

একটু দম লইয়া শ্রীমন্ত আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "শিস্ দিয়ে বারান্দা পার হওয়া কিন্তু ঠিক আগের মতই চল্‌তে লাগলো। ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি, রাজা বাহাদুর একদিনও টের না পেয়ে রইলেন কি করে? ভাবলাম, নিশ্চয় এ কোন অপদেবতার খেয়াল। কাজ কি আমার বাবু তাকে নিয়ে খামখা ঘাঁটাঘাঁটি করবার? শিস্ দেওয়া ছাড়া আর কোন উৎপাৎ তো সে কচ্ছেনা, তা' শিস্ সে দিক না। পাঁচ জনকে বল্‌তে গেলে শেষটায় হয়তো রেগে মেগে আমারই ঘাড়টা মট্‌কে দেবে,! ওরা সব অন্তর্য্যামী কিনা!

"দিন পঁচিশেক তো এম্নি গেল। তারপর সেই রাত্রি! বোধ করি রাত তখন তিন্‌টে। ঘরের ভেতর লোকের পায়ে-চলার শব্দ শুনে, চোখ মেলে বিছানার ওপর বসে দেখি কিনা – উঃ হু-হু, এখনো আমার গা শিউরে উঠছে—সেই ভীষণ মুখ! তারপর যে কি হোল, সে আমার আর জানা নেই; জ্ঞান হওয়া অবধি দেখ্‌ছি, এই লোহার খাটে শোয়া আছি—সমস্ত শরীরে ন্যাকড়ার ফালি বাঁধা—আর হাত পা গুলো ব্যথায় যেন খসে পড়ছে। শুনলাম নাকি একটা আলমারী চাপা পড়ে অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিলাম। রাজা বাহাদুরের মুখে পরে জানতে পারলাম, সে দিন ভোর-বেলাতেই তাঁর লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেছে,—'পদ্মরাগ' তাতে নেই!

"আমার বাবা এ বাড়ীর নিমক খেয়ে মানুষ, আমিও আছি আজ চল্লিশ বছর রাজাবাহাদুরেরই কাছে। আমার ওপর রাজার যেম্নি দয়া, তেম্নি বিশ্বাস! রাজাবাহাদুরের অনেক আপনার লোক যে কথা জানে না, সেই 'পদ্মরাগে'র কথা পর্য্যন্ত তিনি আমায় ভেঙ্গে বলেছেন। রাজাবাহাদুরের ঘরের ভেতর দিয়ে যে ছোট্ট কুঠুরিটায় যেতে হয়, 'পদ্মরাগ' থাক্‌তো সেই ঘরে। সে ঘরে ঢোকার শুধু একটী মাত্র দরজা—আমাদের শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে। ধর্‌তে গেলে আমিই ছিলাম সে ঘরের দরোয়ান। এই সবে মাস দেড়েক হবে কলকাতা গিয়েছিলাম রাজার জন্যে ওষুধ আন্‌তে। তখন সায়েব-বাড়ী থেকে আচ্ছা মজবুৎ এক তালা এনেছিলাম, ভেতরের ঐ দরজায় লাগাবার জন্যে। সে তালায় শুন্‌ছি আঁচড়টীও কেউ দেয় নি, অথচ 'পদ্মরাগ' গেল উধাও হ'য়ে! রাজাবাহাদুর বরাবর আজকাল শার্টের ওপরে সোয়েটার গায়ে দিয়ে শোন; ও ঘরের চাবি থাকে তাঁর শার্টের বুক-পকেটে। শুন্‌ছি, সে চাবিও ছিল ঠিক সেই ভাবেই। তবে 'পদ্মরাগ' কি করে খোয়া গেল? এ সব ভুতুড়ে কাণ্ড নয় তো কি বাবু মশায়?"

হুকা-কাশি বলিলেন, "এমনও তো হতে পারে, যে কেউ গোপনে গোপনে আর একটা চাবি তৈরি করিয়ে নিয়েছে!"

তা' হতেই পারে না। দিনের বেলা রাজাবাহাদুর সারাক্ষণ ও ঘরে থাকেন।

তা ছাড়া, এত লোক সেখানে আনাগোনা করে যে, এমন বুকের পাটাই কারো নেই যে ওখানে বসে চাবি তৈরি কর্‌বে। আর রাত্রে তো সারাক্ষণ আমিই থাকি—দরজা ভাল করে বন্ধ করে, তবে শুই।"

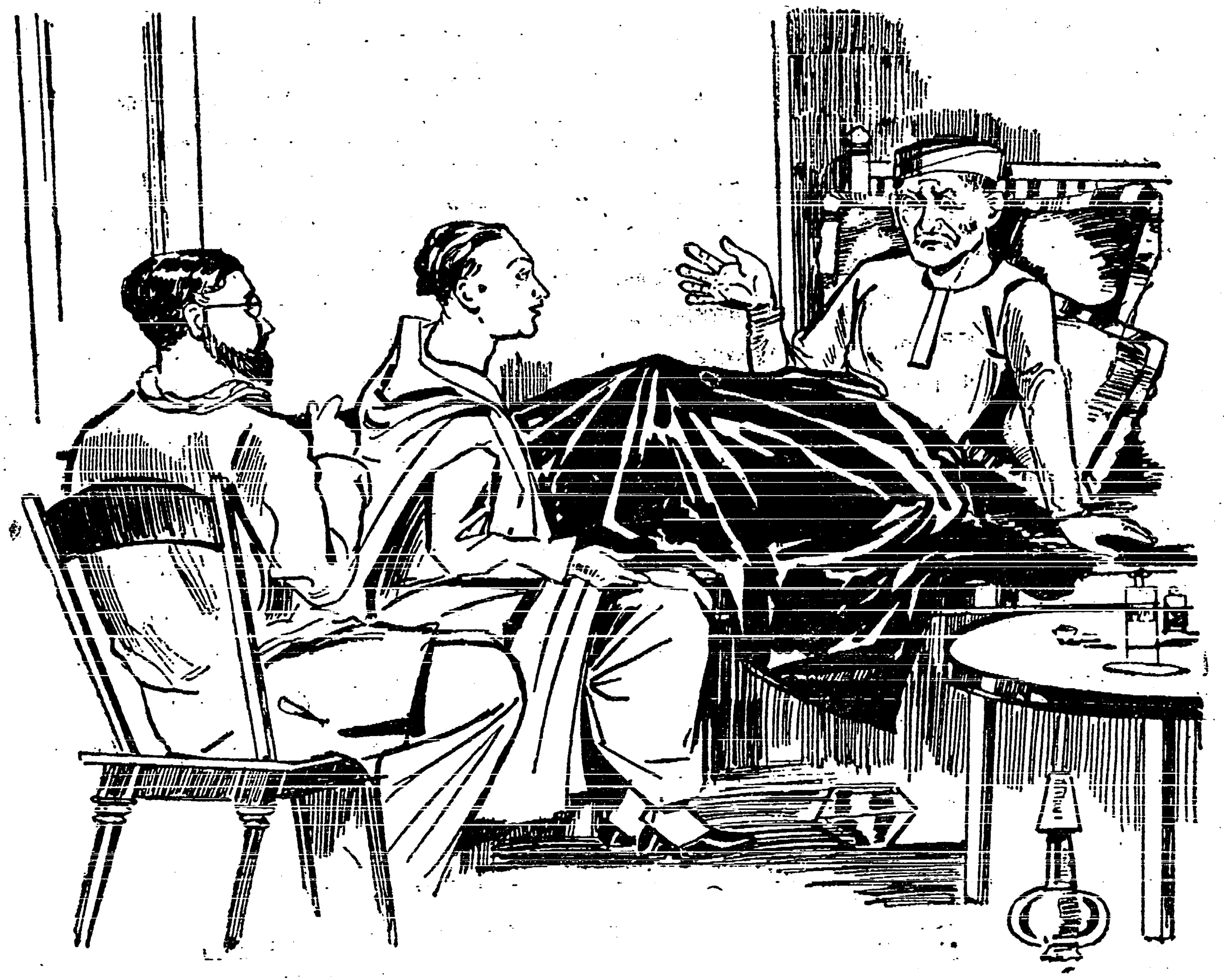

তা' হতেই পারে না

হুকা-কাশির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, মিনিট কুড়ি তিনি চেয়ারে ধ্যানস্থের মত বসিয়াই রহিলেন। শেষে চিন্তিত-মুখে উঠিয়া সারা ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন; শুধু শ্রীমন্তকে মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হইতে লাগিল। আর এতটা সময় রণজিৎ রহিল ঠায় সেখানে বসিয়া।

(ক্রমশঃ)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) লাটিম (২) লবণ

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) সলিলচন্দ্র বর্দ্ধন (নেত্রকোণা) কনক ঊষা, উমা ও মণি (কলিকাতা), লক্ষ্মী দেবী (সাওগাঁ) অমিয় কুমার বরাট (পাটনা), ব্যোমকেশ মজুমদার (ত্রিবেণী) আশারাণী, অশোক, ক্ষেমময়, সুষমাময়, বিমল, অনিমা শোভা, জ্যোৎস্না, চনু. তুলু, প্রীতু, বাসু, হিরন্ময়, জ্যোতির্ম্ময়, সুধীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ (দিনাজপুর), মোকামাঘাট I. W. H. E. School-এর ছাত্রবৃন্দ, আভারেণু দেবী (রংপুর) শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় (ধুবড়ী), সাধনা প্রসাদ দাসগুপ্ত (দম্ দম্), মিলন মালা ঘোষ (ভবানীপুর), অজিত, নির্ম্মল, শিবু, রবি, স্নেহ, মায়া, প্রভাত, সুধা, অশ্রু, সমু, ভুলু, অমু, থামু, তুলু, মণ্টু, গৌরী, মঞ্জু ও ঝুণ্টু (ভবানীপুর), উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণী কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভ্যগণ, অনিল, রণজিৎ, কল্যাণ, অজয়, অঞ্জলি ও কনক (কলিকাতা), মাখন লাল অধিকারী (কিশোরগঞ্জ), ক্ষিতীশ, যামিনী, তারক, গৌরী, অমূল্য, নন্দ, অজিত, নিতাই, ভূপেন, হীরেন (ঋষি বিদ্যালয়, মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম), মহম্মদ হোসেন (নোয়াখালি), ঊষারাণী মিত্র (হবিগঞ্জ), প্রিয়দাস বড়ুয়া (আকিয়াব), সুধীন্দ্র, শান্তি, ফণীন্দ্র, সুবর্ণপ্রভা, আদরিণী, (গাইবান্ধা) পারিজাত রেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), অনিল বরণ মজুমদার (চাঁইবাসা) প্রভাত কুমার বসু (পাটনা), রাজলক্ষ্মী দাসী, বোকন, হাবুলী, মণ্টু, গুগু, নলটু, ঝুণ্টু (আকুই), সতীশ, গোপাল, তারা ও বাণী মন্দিরের বালকবৃন্দ (ডায়মণ্ডহারবার), বিনয় ও বিজয় ভট্টাচার্য্য (রংপুর), শান্তিলতা সেনগুপ্তা (এলাহাবাদ), অমরেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায় (রাজসাহী), লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজসাহী), গৌরী চট্টোপাধ্যায় (গয়া), পঞ্চানন দত্ত (আটরা) আশুতোষ বসু (মেখলীগঞ্জ), উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ঋষি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, রমু, বীরু, দলাই, নিপু, মনাই, জামাইবাবু, দিদি (রাণাঘাট) পতিতপাবন দাশগুপ্ত (মুর্শিদাবাদ), ধামরাই যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যগণ, অখিল কুমার গুপ্ত (পাণিহাটী), সুধীর, দুর্য্যোধন, প্রহ্লাদ, সুরেন্দ্র (কলাগাছিয়া), সুধাংশু-কুমার দত্ত, প্রশান্ত কুমার রায় (কলিকাতা), সুনন্দা ভৌমিক (রংপুর)।

যাঁহারা ১টির উত্তর ঠিক দিয়াছেন :—

বিনু (কলিকাতা) মনুজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (নলহাটী) সুধামাধব ঘোষ (জামালপুর), খুকী, মিনু, চীনু, ময়না, বুলি, টুলি, বুচি, নারু, অঘোর, শৈলজানন্দ, বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুন গো পাড়া) শরৎ, সুধীর, জ্যোতিরিন্দ্র, জিতু, রণগোপাল (আরকন্দি), চণ্ডীচরণ দাস (আলিপুর) অমরেশ চন্দ্র বসু (হাওড়া) গোকুলানন্দ দাস (রংপুর) কানাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কাঁচড়া পাড়া), হরিধন দাশ (জমিয়ার থানা)।

নূতন ধাঁধা

আছে ফল, আছে জল, মাটী পাতা রস,
অনিল, অনল, জল, তিনের পরশ।
মুখে মুখে কহে কথা, এক বোল বলে।
না ডাকিলে রহে চুপ, হাতে হাতে চলে॥

শ্রীঅখিলকুমার গুপ্ত

রামধনু

"ঝরিতেছে জল, তবুও অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বর-তল।"

রবীন্দ্রনাথ

C. H. ARAN & CO.

INTENTIONAL

১ম বর্ষ } পৌষ, ১৩৩৫ { ১২শ সংখ্যা

শান্তি-বুড়ী

(শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার)

এক যে আছে ঘুম-পাড়ানী শান্তি-বুড়ী মাই,
তা'র ত জুড়ী নাই।

রাত্তিরে সে, ধাত্রী সেজে   বসে এসে শিশুর শেজে ;
মাসীর পিসীর পানের বাটা খোঁজে না সে মোটে ;
নিজ গরজে জোটে।

কোমল পরশ বুলায় মাথায়,   আঠা লাগে চোখের পাতায়,
তুলতুলে তা'র মাথার বালিস দেয় সে মাথার তলায়।
আলাই বালাই পলায়।

ঘুম ভেঙ্গে যায় পাখীর ডাকে, হাত্ড়ে তখন খুঁজি তাকে ;
ভোরে উঠেই তাই ত আমি তাকেই অনুরাগে
প্রণাম করি আগে।

কামারের ছেলে দেশের কর্ত্তা

বল ত কোন্ দেশে ? যে-সে দেশে নয়,—আমেরিকায়, অর্থাৎ আমেরিকার "যুক্তরাজ্যে"। তোমরা শুনিয়াছ, এসিয়া যেমন একটা মহাদেশ আমেরিকাও তেমনি। এই আমেরিকার মধ্যে ধনে, মানে, গৌরবে যে দেশটা সব চাইতে বড় সেটা হইল এই "যুক্তরাজ্য"। শুধু "আমেরিকা" বলিলে অনেক সময়ে কেবল এই যুক্তরাজ্যই বুঝিতে হয়। যুক্তরাজ্য সোজা দেশ নয়, আমাদের ভারতবর্ষের চেয়ে ঢের ঢের বড়। ভারতবর্ষের মধ্যে যেমন বাঙ্গলা, বোম্বে, মান্দ্রাজ, আসাম, পাঞ্জাব ইত্যাদি অনেক প্রদেশ বা ছোট ছোট দেশ আছে, এই যুক্তরাজ্যের মধ্যেও সেই রকম ছোট ছোট দেশ অনেক। এই ছোট ছোট দেশের ছোট ছোট কাজ করার জন্য প্রত্যেক দেশে নিজেরা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। বড় বড় রাজকার্য্য করে সবাই মিলিয়া একযোগে ;—তাই সমস্ত দেশটাকে বলা হয় "যুক্তরাজ্য।"

কামারের ছেলে হার্বার্ট্ হুভার

আমরা চিরকাল কোন না কোন রাজার অধীনে আছি কিনা, তাই "রাজ্য"

কথাটাই বুঝি, আর তাই এই মস্ত বড় দেশটাকে বলি "যুক্তরাজ্য"। বাস্তবিক কিন্তু এখানে কোন রাজাই নাই। এখানকার লোক কোন রাজার শাসন মানে না। দেশের লোক দেশের বাছা বাছা লোকের হাতে শাসন কাজের ভার দেয়। এই বাছা বাছা লোক সভা করিয়া দেশের সব কাজ চালান আর তাঁহাদের সকলের উপরে থাকেন এক সভাপতি। অন্য দেশে রাজা যাহা করেন, এখানে তাহা করেন এই সভাপতি। এই রকমের দেশ-শাসনকে বলে "গণতন্ত্র"।*

সভাপতি বা কোন সভার সভ্য একই ব্যক্তি বরাবরের জন্য থাকিলে ক্রমে খামখেয়ালী আসিতে পারে ; তাই দেশের লোক কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর বাছাই করিয়া সভ্য বা সভাপতি ঠিক করে। এবার যুক্তরাজ্যে বাছাই হইয়া যিনি নূতন সভাপতি হইলেন তিনি এক কামারের পুত্র, নাম হার্বাট হুভার। আমেরিকার লোক বংশ দেখে না, দেখে গুণ। ইহার আগেও কত গরীবের ছেলে গুণে বড় হইয়া সভাপতির পদ পাইয়াছে! সে দেশে আজ যে জুতা মেরামত করিতেছে, সেও এক সময়ে বড় হইয়া দেশের কর্ত্তা হওয়ার আশা মনে আনিতে পারে। যুক্তরাজ্যে ধনী লোক অনেক—অত বড় ধনী এদেশে কল্পনায়ও আসে না। কিন্তু কর্ত্তা হয় গুণ দেখিয়া, ধন দেখিয়া নয়।

হুভার সাহেবের বয়স এখন ৫৪ বৎসর। তাঁহার পিতা তো ছিলেন কামার ; আর মাতা ছিলেন বেশ বুদ্ধিমতী, ধর্ম্ম প্রচারের কাজে নামও করিয়াছিলেন। কিন্তু বাপ মার আদর তাঁহার কপালে বেশী দিন যোটে নাই। দশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা ও মাতা দুই-ই মারা যান। ছোট্ট হুভার তখন বিষম বিপদে পড়েন। পনর বৎসর বয়সে কোন রকমে এক চাকরী জোটাইয়া খরচপত্র চালাইতে থাকেন। ইহার পর তিনি লাগিয়া যান খনির কাজে। কিন্তু কেবল হাত দিয়া কাজ করিলে তো আর বড় হওয়া যায় না ; তিনি সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া

---

* অগ্রহায়ণ মাসের 'রামধনু'তে তুরুস্কের গণতন্ত্র ও তাহার সভাপতি মুস্তাফা কেমাল পাশার কথা বলা হইয়াছে।

শিখিতে থাকেন। খনিতে কাজ করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া বিদ্যালয়ে বেতন দিতেন আর লেখাপড়া শিখিতেন। এইরূপে কিছুকাল শিক্ষার পর তিনি চলিয়া যান অষ্ট্রেলিয়া দেশে এক চাকুরী লইয়া। সেখানে কিছুকাল চাকুরী করার পর চীন দেশে এক বড় চাকুরী পাইয়া চলিয়া যান। এখানে তাঁহার চাকুরীটা ছিল খনি সম্পর্কে—ঐ কাজটাই ত' অল্প বয়সে ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন।

যখন ইউরোপ মহাদেশে বড় লড়াই বাধিয়া গেল তখন হুভার বিলাতে স্বদেশী লোকের কষ্ট দূর করার কাজে লাগিয়া গেলেন। আমেরিকাও এই যুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়াছিল। অনেক আমেরিকার লোক ইউরোপে আসিয়া খাওয়া দাওয়ার কষ্টে পড়িয়া হা-হুতাশ করিতেছিল। হুভার তাহাদের উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার কিছু টাকাকড়ি ও নামগাম দুইই হইয়াছিল। এই সময় বেল্‌জিয়াম দেশে লোকে না খাইয়া মারা যায়, এমন অবস্থা দাঁড়াইল। বেলজিয়াম্‌ই জার্ম্মাণদের কামানের আগুন সকলের আগে বুক পাতিয়া লইয়াছিল; তাহার কষ্ট হইবে না কেন? সেখানকার দরিদ্রের সেবার জন্য হুভারের ডাক পড়িল। হুভার তখন বড় একটা কারবারে বেশ দু'পয়সা পাইবার উদ্যোগে ছিলেন। কিন্তু এদিকে দরিদ্রের কান্না—টাকাকড়ির লোভ তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। এই কাজের পর তিনি দেশে বিদেশে অন্যান্য কার্য্য করিয়া, শেষে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য-মন্ত্রী হইয়াছিলেন। আর এবার হইলেন একেবারে দেশের সভাপতি।

এই কামারের পুত্র এবার যে কাজটা পাইলেন, সম্মানে ও ক্ষমতায় তাহা অপেক্ষা বড় কাজ পৃথিবীতে আর কাহারও নাই! সভাপতির কাজ অনেক। তিনি তো গোটা দেশটার কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে তাহা মোটামুটি দেখেনই, তাহা ছাড়া অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ, সন্ধি, নূতন আইন ইত্যাদি তাঁহার উপরই অনেকটা নির্ভর করে। স্থল-সৈন্য ও জল-সৈন্য দুইয়েরই তিনি বড় সেনাপতি। আর দেশের বড় বড় সরকারী চাকুরী সমস্তই তাঁহার হাতে।

হুভার সাহেবের গৃহলক্ষ্মী যেমন সুশ্রী, তেমনিই গুণবতী। জীবনে সকল সময়ে সকল বড় বড় কাজেই হুভার তাঁহার সাহায্য পাইয়া থাকেন। এই যে সভাপতির বাছাই হইয়া গেল ইহাতেই কি তাঁহার স্ত্রী কম পরিশ্রম করিয়াছেন? আমাদের দেশের মেয়েদের এ সব ধারণাতে আসে কি?

চোর ধরা

(শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান। আফগানিস্তান আর ভারতের সীমান্তের লোকেরা ভারী দুর্দ্দান্ত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সেই সামান্য লোককটাকে দমিয়ে রাখ্‌তে অজস্র সৈন্য পুষে বহু অর্থ ব্যয় কর্‌তে হয়। তারা লুট-তরাজে বেজায় ওস্তাদ, সৈন্যের আড্ডা থেকে গোলা-বারুদ-বন্দুক চুরী করে নিতেও কম নয়। মেজদা' সেখান থেকে এসে যে গল্পটা ব'লেছিলেন তাই এখন বল্‌ব।

সেদিন ২১৭ নং দলের তাঁবুতে সবাই খাওয়ার পর বিশ্রাম কর্‌ছিল। পাঞ্জাবী সৈন্যেরা তো তাদের দাড়ি নিয়েই ব্যস্ত, কেউ বা আবার গুন্‌ গুন্‌ করে গান গাইছে। রিসলদার-মেজর গোলাম হোসেন ক্যাম্প খাটে শুয়ে ভুঁড়ির উপর হাত বোলাচ্ছিল। এমনি সময় সাহেবের ঘরে ঘণ্টার শব্দ হ'ল; বেতার-বার্ত্তায় খবর এসেছে এবং খবর অনুযায়ী সাহেবের হুকুম হবে। অমনি সকলকে বিশ্রাম-সুখ ত্যাগ করে তৈরী হ'বার যোগাড় করতে হ'ল, কারণ প্রায়ই বেতার-বার্ত্তায় খবর পেয়ে বন্দুক ঘাড়ে ছুট্‌তে হয়। গোলাম হোসেন সাহেবের ঘরে চলে গেল খবর আন্‌তে।

সবাই কৌতূহলী হ'য়ে আছে—কি-ই বা খবর এল, দু'মিনিট যেতে না যেতেই গোলাম হোসেন এসে বল্ল, "রিজা আলী আবার ডজন খানেক রাইফেল্‌ বন্দুক চুরি করে পালিয়েছে। পোষাকপত্র নিয়ে তৈরী থাক। এক কোয়ার্টার বাদে অর্ডার পাবে।" পোষাক পরার ধূম প'রে গেল। দশ মিনিটের মধ্যেই সকলে

পায়ে পট্টি বেঁধে, কোমরবন্ধে সঙীন নিয়ে হাতে রাইফল্ ধরে দাঁড়িয়ে গেল—দুই লাইনে।

গোলাম হোসেন মেজর সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে এসেই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্ল, "সাম্নের পাহাড়ের ধারে যে পথ সেই পথ দিয়ে রিজা আলী আজ যাবে—এই আমাদের খবর। তবে এদের সম্বন্ধে কিছুই সঠিক বলা যায় না। যাই হোক্, তোমাদের এক দল আমার সঙ্গে তাঁবুতে রসদ আর বারুদের তদারকে থাক্‌বে। বাকি সব মেজর সাহেবের সাথে যাবে; দু'দলে ভাগ হয়ে রাস্তার দুই মুখ আগ্‌লে থাক্‌বে।" সামনের লাইনের সকলকে নিয়ে মেজর সাহেব বেরিয়ে পড়্‌লেন। সাহেবের মন তখন আশা-আনন্দের দোলায় দুল্‌ছিল। রিজা আলী দাগী চোর, ধরতে পার্‌লে সাহেবের কপাল ফিরে যাবে। তাদের পথের কাছে যেতে যেতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল—প্রায় তিন মাইল তাদের যেতে হয়েছিল।

* * * *

দুই পাহাড়ের মাঝের রাস্তায় মেজর সাহেব তাঁর দল নিয়ে বসে আছেন। রাত্রি এগারটা হ'য়ে গেছে। খুব হিম পর্‌ছিল; তবে তাদের ওসব সহ্য হ'য়ে গেছিল।

হঠাৎ সৈন্যদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল; একদল লোক আস্‌ছিল, তাদের সঙ্গের বাতির আলোতে তাদের দেখে বোঝা গেল যে তারা ঐ দেশী লোক। রিজা আলীর দল নয় তো!

তারা সামান্য অগ্রসর হ'বার পরেই একজন হাবিলদার, মেজর সাহেবের নির্দ্দেশ মত, বেলুচি ভাষায় (পস্তু) চিৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও'; "কে তোমরা?" তারা তা কাণেও তুল্‌লে না, হল্লা কর্‌তে কর্‌তে পাহাড়ের মাঝে এসে সৈন্যদের দেখে বল্ল, 'আমরা সরকারী মজুর'। মেজর সাহেব তাদের ব্যবহার থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে তারা রিজা আলীর লোক নয়, তাই পথ ছেড়ে দিতে বল্লেন।

সৈন্যদের একদল পথের অন্য দিক আটক ক'রেছিল—বন্দী যেন না পালায়।

কিন্তু মজুরদের সঙ্গে একজন সৈন্য এসে বল্ল যে এরা রিজা আলীর দল নয়; কাজে-কাজেই আগের মত যার যার জায়গায় দাঁড়াতে হবে। সকলেরই আশা ছিল মাছ বুঝি জালে আট্‌কেছে, এই হিমভোগ থেকে বুঝি রক্ষা পেল! কিন্তু হায় আমরা ছাড়াতে চাইলেও কপালের দুর্ভোগ তো আমাদের ছাড়্‌তে চায় না!

দেশলাইয়ের আলোতে মেজর সাহেব দেখ্‌লেন তাঁর হাত-ঘড়িতে দুটো বেজে গেছে। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল; বেশীর ভাগ সৈন্যই যার যার বন্দুকে ভর দিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছিল, এমন সময় দ্বিতীয় দল থেকে হাবিলদার খবর পাঠালো, 'দূরে লোক দেখা যাচ্ছে'। অমনি সবাই সার হ'য়ে সেদিকে রওনা হ'ল।

বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে তারা আস্‌ছিল—সাদা সাদা লম্বা কুর্ত্তি পরা জন

বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে তারা আস্‌ছিল—

দশ-বার লোক। তারাও যেন সাম্‌নে লোক দেখেই লা-আল্লা ইল্ল-ল-লা বলে

চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো। হাবিলদার, চিৎকার করে উঠ্‌লো "হুকমদার" (who come there)। তাদের একজন এগিয়ে এসে ব'ল্ল, 'একজন স্ত্রীলোক মারা গেছেন, তাঁকে কবর দিতে আন্‌ছি বাধা দিলে ভাল হবে না। ওহে, চ'লে এস না। এই কন্‌কনে শীতে আর কত দেরী করা যায়?' পিছনের সবাই এগিয়ে এল। তাদের মাথায় সাদা ধবধবে কাপড়ে ঢাকা বাঁশের মাচার ওপরে কি যেন ছিল।

মেজর-সাহেবের—তাদের রকম-সকম ও মুখের চেহারা দেখে কেমন একটু সন্দেহ হ'ল। তিনি তাদের থাম্‌তে বল্লেন। এদিকে সব সৈন্যই মুসলমান, তারা ফিস্‌-ফিস্‌ করতে লাগল, "সাহেব কিনা মরার কবর দিতেও বাধা দিচ্ছেন।··· "নাঃ, এরা চোর নয়, এই শীতে আল্লার নাম ক'রে এরা মরা কাঁধে চলেছে,··· আর তা ছাড়া দেখনা কি বিট্‌কেল গন্ধ বার হচ্ছে!"

সেই লোকটা আবার বল্ল,···'এ কলেরায় মারা গেছে, আমাদের নিয়ম যেখানে এ জন্মেছে তার কাছে এর কবর দিতে হ'বে। তাই এমনি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।···সাহেব সত্যি বল্‌ছি এ আমার শালা-বৌ! মেজর সাহেব মাচার দিকে তাকালেন, মরাটা দেখ্‌তে পারলে হ'ত। কিন্তু সৈন্যেরা যদি ক্ষেপে যায়··· ভিন্ন জাত হয়ে মুসলমান স্ত্রীলোকের মৃতদেহ নিয়ে টানা-হেঁচড়া কর্‌বে! মেজর সাহেব পকেট থেকে ছোট একটা ফটো বার কর্‌লেন,—মশালের আলোতে চট্‌ ক'রে একবার চোখ বুলিয়েই সেই লোকটীর পানে তাকালেন।···তাইতো! 'মরা নামাও' সাহেব হুকুম করলেন।

সমস্ত সৈন্য তাদের ঘেরাও ক'রে ফেলেছিল, তারা ব্যাপার দেখে মরা নামালো। সৈন্যদের মধ্যে যেমন একটা উত্তেজনা টের পাওয়া গেল তেমনি একটা ভয়ের আভাস পাওয়া গেল এই মৃতবাহীদিগের মধ্যে।

দেরী না ক'রে সাহেব মরা-ঢাকা সাদা কাপড় খুল্‌লেন। একি সব যে খড়! নিরুপায় বুঝে বন্দীদলের সর্দ্দার ব'লে উঠলো, "সাহেব আল্লা এর শাস্তি দিবেন, জানো এমনি আমাদের ধর্ম্মের উপর অত্যাচার আমরা সইব না, সৈন্যেরা তোমরা

সইবে কি···? কাল শেষ রাত্রে বেচারী মারা গেছে, আজও কবর দিতে পার্‌লাম না, আরও তিন ক্রোশ যেতে হবে।—গন্ধ হ'য়ে উঠেছে, তাই খড় দিয়ে এনেছি। —খবর্দ্দার সাহেব, খড় নেড়ো না বল্‌ছি।"

সাহেব হুকুম দিলেন, "পাক্‌ড়ো"। ততক্ষণে খড় সরান হ'য়ে গেছে। খড়ের নীচে এক মরা ছাগল—দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে···আর ছাগলের পাশে দশ বারটা রাইফ্‌ল্‌। সাহেব ছাগলটীকে দেখিয়ে, রাইফ্‌ল্‌ হাতে নিয়ে বল্লেন, "তাহ'লে খাঁ সাহেব, তোমার শালা এই ছাগলটাকেই খুঁজে পেতে বে করেছিলেন?··· রাইফ্‌ল্‌ বুঝি তোমার শালা-বউয়ের বড় প্রিয় ছিল—তাই কবরেও নিয়ে যাচ্ছ?" একটা হাসির ঢেউ সমস্ত সৈন্যদের মধ্য দিয়ে চলে গেল। মেজর তাঁর পকেট থেকে ফটোটা নিয়ে বল্লেন, (মশালের সামনে) "এই খাঁ সাহেব, যিনি তাঁর শালা-বৌয়ের কবর দিতে যাচ্ছিলেন,—ইনি এই বন্দী বীর 'রিজা আলী' যাঁর পেটে এত বুদ্ধি! খাঁ সাহেবকে তাঁবুতে নিয়ে চল। আমি 'তার' পাঠাই যে খাঁ সাহেবের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আছে।"

ছল্‌মে চাচা

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

"প্রাণটা বাঁচা,
ছল্‌মে চাচা, সাম্‌নে ভীষণ জঙ্গল।
যাস্‌নে আগে,
ধর্‌বে বাঘে," হাঁক্‌লো ছেলের দঙ্গল।
চাচার মনে
জাল যে বোনে তিনশো রকম চিন্তা!
তাইতো তেড়ে
নাচ্‌ছে যেরে তাইরে নারে ধিন্‌তা!

ভাব্‌ছে বোসে,
গাইছে ক'সে, ধর্‌ছে কভু কান্না—
আপ্‌নাকে সে
বল্‌ছে হেসে— "আর কেঁদনা, আর না !"
ব্যাঙ্‌কে ধ'রে
সাত পা ঘুরে বল্‌ছে জোরে, "এই য়ো ;

হস্তী লুফি, দেখরে গুপি

হস্তী লুফি,
দেখ্‌রে গুপি, হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো !

হস্তী লোফা
বড্ড তোফা, নেইক' কোন কষ্ট,
চশ্‌মা খুলে
মুণ্ডু তুলে, দেখ্‌না চেয়ে পষ্ট !
কায়দা ক'রে
ধ'র্‌লে প'রে, নাড়্‌বে নাকো মুণ্ড,
দেখিস মিতে,
হোঁৎকামিতে ধরিস নেকো শুণ্ড !
সুযোগ বুঝে
চক্ষু বুজে, ধর্‌বি সেঁটে কাণটা,
রইবে ডাহা
বুঝ্‌লি—হা হা, এক্কেবারে ঠাণ্ডা !"
ছল্‌মে মিয়া,
সবার পিয়া, দেখায় তুড়ে ভেল্কি,
হেইয়ো দাদা
বল্‌না সাদা আজগুবি এ খেল্ কি ?

ইন্দুরের বুদ্ধি

(মহাভারত হইতে)

ঘোর বন—তাহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বট গাছ। কত লতা পাতা সেই গাছ জড়াইয়া উঠিয়াছে, কত পাখী সেই গাছে বাসা করিয়া আছে ! গাছের তলায় এক প্রকাণ্ড ইন্দুরের গর্ত্ত, গর্ত্তের মধ্যে থাকে এক বুদ্ধিমান্ ইন্দুর—নাম পলিত ; গাছের উপর থাকে এক বিড়াল—নাম লোমশ। বিড়াল মহাশয় গাছের পাখী-গুলিকে ধরেন আর তাদের দফা শেষ করিয়া দেন।

কিছুদিন এই ভাবে কাটিয়া যাওয়ার পরে এক চণ্ডাল সেই বনে আসিয়া বাসা বান্ধিল। চণ্ডালের কাজ ছিল, সন্ধ্যাবেলা ঐ গাছের কাছে আসিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখা, আর রাত্রে যে সকল হরিণ-টরিণ আসিয়া ঐ ফাঁদে পড়ে, সকাল বেলা তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া। একদিন তো আমাদের বিড়াল মহাশয় হঠাৎ ঐ ফাঁদে আট্‌কাইয়া গেলেন। ইন্দুর, বিড়ালের ভয়ে তফাৎ তফাৎ থাকিত; যখন দেখিল, বিড়াল ফাঁদে পড়িয়াছে, তখন তাহার আহ্লাদ দেখে কে? সে ঐ ফাঁদের উপর নিজের খাবার জিনিষ দেখিতে পাইয়া একেবারে বিড়ালের ঘাড়ের উপর গিয়া চড়িল এবং সেখানে থাকিয়াই মনে মনে হাসিতে হাসিতে জিহ্বার সাধটা মিটাইতে লাগিল। ইন্দুর নিজের খোরাক লইয়া ব্যস্ত, এমন সময় দেখিতে পাইল কিছু দূরে এক বেজী মাটীর তলা হইতে মাথা তুলিতেছে। বেজীটার নাম ছিল হরিত—তাহার চক্ষু ছিল তামার মত আর মেজাজটী ছিল অস্থির। ইন্দুরকে দেখিয়া বেজীর মুখ দিয়া লাল ঝরিতে লাগিল, সে নিজের জিব চাটিতে লাগিল। আবার, ঐ বটগাছে এক

গর্ত্তের মধ্যে থাকে এক ইন্দুর—গাছের উপর থাকে এক বিড়াল

খোঁড়লের মধ্যে চন্দ্রক নামে এক পেঁচা থাকিত—তাহার দাঁতও ছিল বেশ ধারাল গোছের। সে নিজের খোঁড়ল হইতে বাহির হইয়া গাছের ডালে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। একদিকে বেজী, অন্যদিকে পেঁচা, ইন্দুরের তো প্রাণ উড়িয়া গেল, যে পাইবে সেই তো ইন্দুরকে ধরিয়া পেটে পূরিবে!

ইন্দুর ভয়ে ভাবিতে লাগিল—এখন কি করা? মাটীতে নামিলেই বেজী আমার জীবন শেষ করিয়া দিবে; আবার এখানে বসিয়া থাকিলেও পেঁচা আমাকে আস্ত রাখিবে না, এদিকে এই বিড়াল যদি ফাঁদ কাটাইয়া বাহির হইতে পারে, তবে আমি কিছুতেই প্রাণে বাঁচিব না। তবে, বিড়াল এখন বিপদে পড়িয়াছে, উহার সঙ্গে ভাব করিলে যদি কোন মতে প্রাণটা বাঁচে!

ভাবিয়া চিন্তিয়া ইন্দুর বলিল, "ভাই বিড়াল, তুমি বেঁচে আছ ত? আমাদের দুজনাই যাতে বাঁচি তাই করা যা'ক্‌। ঐ দেখ, কাছেই দুষ্ট বেজী আর পেঁচা; ওরা যাতে আমাকে তাড়া করতে না পারে তুমি, ভাই, সেটা কর। তুমি ত' আমার মস্ত বন্ধু, আবার পণ্ডিত লোক। আমিও বন্ধুর কাজই করব, তোমাকে এই ফাঁদ থেকে আমি বাঁচাব। তুমি থাক গাছের ওপরে আর আমি থাকি গাছের নীচে—তুমি আমার উপকার কর, আমি তোমার উপকার করি, এই ত ঠিক। তুমি যদি আমার কিছু খারাপ না কর, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে খালাস করে দেব। আমি ঐ জাল কেটে না দিলে তোমাকে বাঁচায় কে? কিন্তু আগে তুমি আমার উপকারটা কর। একটা মানুষ যদি কোন কাঠ ধ'রে নদী পার হয়, তাহ'লে ঐ মানুষে যেমন কাঠের গতিকে পার হয়, কাঠও তেমনি মানুষেরই গতিকে পার হয়।"

বিড়াল তখন মহাবিপদে পড়িয়াছে, ইন্দুরের কথায় সায় না দিয়া করে কি? সে বলিল—"তোমার আত্মাটা দেখ্‌ছি খুব বড়, আমি তোমার উপর খুব খুসী হ'লাম। দুজনারই মস্ত বিপদ, আমার উপকার কর্‌লে তোমার কোন বিপদ হবে না। আমাকে তোমার চাকরের মত মনে কর।"

ইন্দুর তখন বলিল—"বন্ধু হে, তোমার স্বভাব ও কথাগুলি বড়ই ভাল।

আমি তোমার কোলের মধ্যে লুকোই, তুমি আমাকে মেরে ফেলো না, আমি তোমার জাল কেটে দেব।”

বিড়াল তাহাই স্বীকার করিল। ইন্দুর তখন বিড়ালের কোলের মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল—যেমন বাপ মার কোলে ছেলে শোয়। পেঁচা আর বেজী এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল, এ আবার কি? তাহারা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

এইবার আসিল ইন্দুরের জাল কাটার পালা। ইন্দুরের বিপদ্ চলিয়া গেলে সে জাল কাটিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু আস্তে আস্তে। বিড়াল ফাঁদে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, “ভাই এত দেরী কর কেন? সেই চণ্ডাল যে এক্ষুণি আস্‌বে; তাড়াতাড়ি জালটা কেটে ফেল না?”

ইন্দুর বলিল—“বন্ধু হে, একটু সবুরই কর না? আমি ঠিক সময়েই তোমার জাল কেটে দেব। আগে কাট্‌লে তোমাদ্বারাও ত কিছু আমার ভালমন্দ ঘট্‌তে পারে। যখন সেই চণ্ডাল আস্‌বে তখন তোমারও ভয় হবে, আমারও ভয় হবে। আমি ফস্ ক’রে জালটা কেটে ফেল্‌ব, আর অম্‌নি তুমি চড়্‌বে গাছে, আমি ঢুক্‌ব গর্ত্তে; ব্যস্।”

বিড়ালের কিন্তু আর সবুর সয় না। সে কাকুতি-মিনতি করিয়া ইন্দুরকে খুব তাড়াতাড়ি জাল কাটিতে বলিল। কিন্তু ইন্দুর তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহাদের বন্ধুত্বটা হইয়াছে কেবল দুয়ের স্বার্থের জন্য—তাহার সময়মত জাল কাটিতে ত্রুটী হইবে না, তবে আগেই কাটিয়া ফেলিলে তাহার পক্ষে নেহাৎ আহাম্মকি হইবে।

বিড়াল আর ইন্দুর কথাবার্ত্তা কহিতেছে এমন সময় সেখানে ব্যাধ (সেই চণ্ডাল) আসিয়া উপস্থিত। তাহার রং কাল, কাণ দুটা গাধার মত, মুখ ভয়ানক আর কাপড়চোপড় বেজায় ময়লা। তাহাকে দেখিয়াই বিড়ালের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে ইন্দুরকে বলিল, “বন্ধু হে, এখন কি কর্‌বে?” ইন্দুর কিন্তু তখন আর দেরী করিল না, জালটা কাটিয়া দিল। অমনি বিড়াল গাছের ডালে আর ইন্দুর সেই গর্ত্তে। চণ্ডাল তাহার জালের কাছে আসিয়া দেখিল, জীবজন্তু

কিছুই নাই আর জাল কাটা। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সে বেগতিক দেখিয়া জাল গুটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

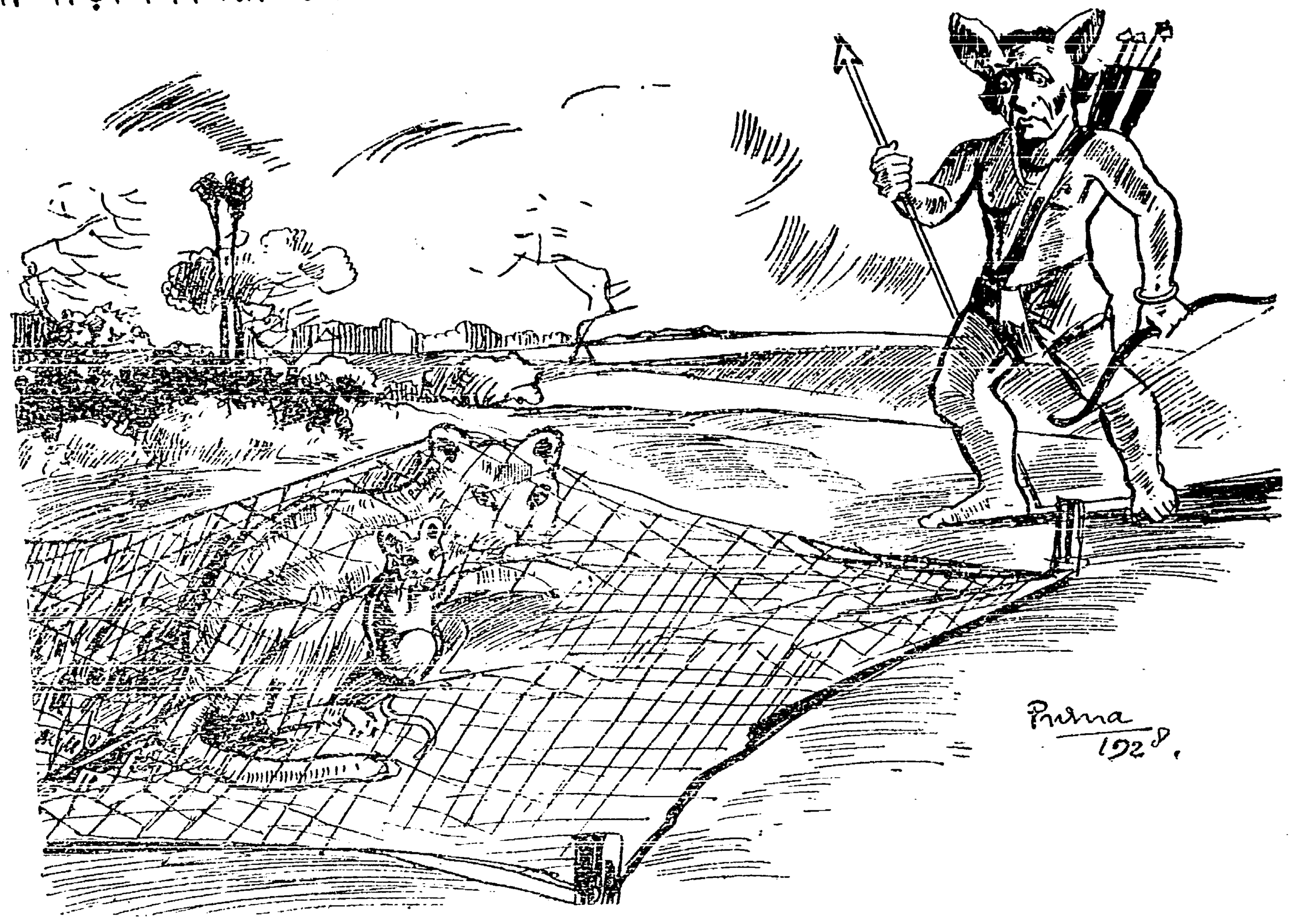

জালটা কাটিয়া দিল

চণ্ডাল চলিয়া গেলে বিড়াল ইন্দুরকে ডাকিয়া বলিল,—“বন্ধু হে, তুমি তাড়াতাড়ি চ’লে গেলে, তোমার সঙ্গে কোন কথাই হ’ল না। আমার স্বভাব ত’ খারাপ নয়। বিপদের সময় তুমি এতটা কর্‌লে, আর সুখের সময় আমার কাছে আস্‌বে না? তোমাকে আমি মন্ত্রী কর্‌ব, গুরুর মত মান্‌ব, তোমার কোন ভয় নেই, কাছেই এস না!”

ইন্দুর বলিল,—“বন্ধু লোমশ হে, আমি কি এতই কাঁচা? খাঁটী বন্ধু মেলে কোথায়? স্বার্থ নিয়েই লোকে ব্যস্ত। আমাদের বন্ধু হবার একটা কারণ ছিল, এখন ত আর সেটা নেই! এখন তুমি আমাকে ডাক্‌ছ, আমার বোধ হয় তোমার কিছু খোরাকের দরকার, তাই। আর তোমার নিজের মতলবটা যদিও বা ভালই থাকে তোমার ত স্ত্রী-পুত্র আছে? তারা কি আমাকে সাম্‌নে পেয়ে ছেড়ে দেবে?

তুমি এইটুকু দয়া কোরো যে, যখন আমি অসাবধান থাক্‌ব তখন যেন আমাকে খাবার জন্য তাড়া কোরো না।"

বিড়াল তখনও ছাড়ে না। ইন্দুর তখন তাহাকে স্পষ্টই বলিল,—"লোমশ, বিশ্বাসের একটা সীমা আছে। নিজেকে সর্ব্বদা রক্ষা করা আবশ্যক, কাউকে একেবারে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, দরকার মত বিশ্বাস কর্‌বে।"

কথা কহিতে কহিতে বিড়ালের আবার সেই চণ্ডালের কথা মনে পড়িল। পাছে সে আসিয়া ধরে, এই ভয়ে বিড়াল সেই গাছ ছাড়িয়া একেবারে চম্পট দিল। আর ইন্দুর? সে কিছুতেই ধরা দিল না, সে আবার ঢুকিয়া পড়িল তাহার গর্ত্তের মধ্যে।

"শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!"

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেকার কথা, ইউরোপে তখন ক্রিমিয়ার সেই ভীষণ লড়াই বাধিয়াছে। সে এক দারুণ ব্যাপার! একদিকে ইংরাজ, ফরাসী আর তুরস্ক, অন্য দিকে রুষিয়া। মারামারি, কাটাকাটি আর রক্তারক্তির এমনই সব খবর প্রতিদিন আসিতে লাগিল যে বিলাতে রীতিমত হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ইংরাজ হাঁসপাতাল গুলির যা দৃশ্য, দেখিলে চোখে জল আসে। কারোও হয়তো গোলা লাগিয়া গোটা হাতখানাই উড়িয়া গিয়াছে, এক কোণে পড়িয়া সে কাৎরাইতেছে। কারোও মাথা একদম্ চৌচির—রক্তাক্ত খাটিয়ায় লুটাইতেছে! এখানে গোঙানি, ওখানে আর্ত্তনাদ, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! হতভাগ্য সৈনিক! বড় আশা করিয়া সে স্বদেশের মান বাড়াইবার জন্য লড়িতে আসিয়াছিল! আর আজ সে আত্মীয়-স্বজন হইতে শত শত মাইল দূরে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়িয়া, কে-ই বা তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায়!

সহসা একটী প্রদীপ হাতে করিয়া, ধীরে, অতি ধীরে, কে যেন তাহার শিয়রে

আসিয়া দাঁড়াইল। চোখ খুলিয়া সৈনিক দেখিল এক অপূর্ব্ব দেবিমূর্ত্তি! দেবী আরও একটু আগাইয়া আসিলেন, আহত সৈনিকের কপালে স্নেহের হাতখানা বুলাইয়া দিলেন। যে লোক কামানের মুখে নিতান্ত তাচ্ছীল্যভাবে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনবরত গুলিবৃষ্টি হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া যাইতে যার এতটুকু বাধে নাই, সে কিন্তু স্নেহের এ স্পর্শটুকু সহ্য করিতে পারিল না —সেই জননীরূপা নারীর হাতখানা বুকের উপর টানিয়া লইয়া অসহায় শিশুটীর মত একেবারে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এই দেবি-মূর্ত্তির নাম ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। আজ তাঁহার সম্বন্ধেই গুটী দুই কথা বলিব। রামধনুর পাঠিকারা, তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিও তো এ রকমটী হইতে কাহারও সাধ যায় কি না!

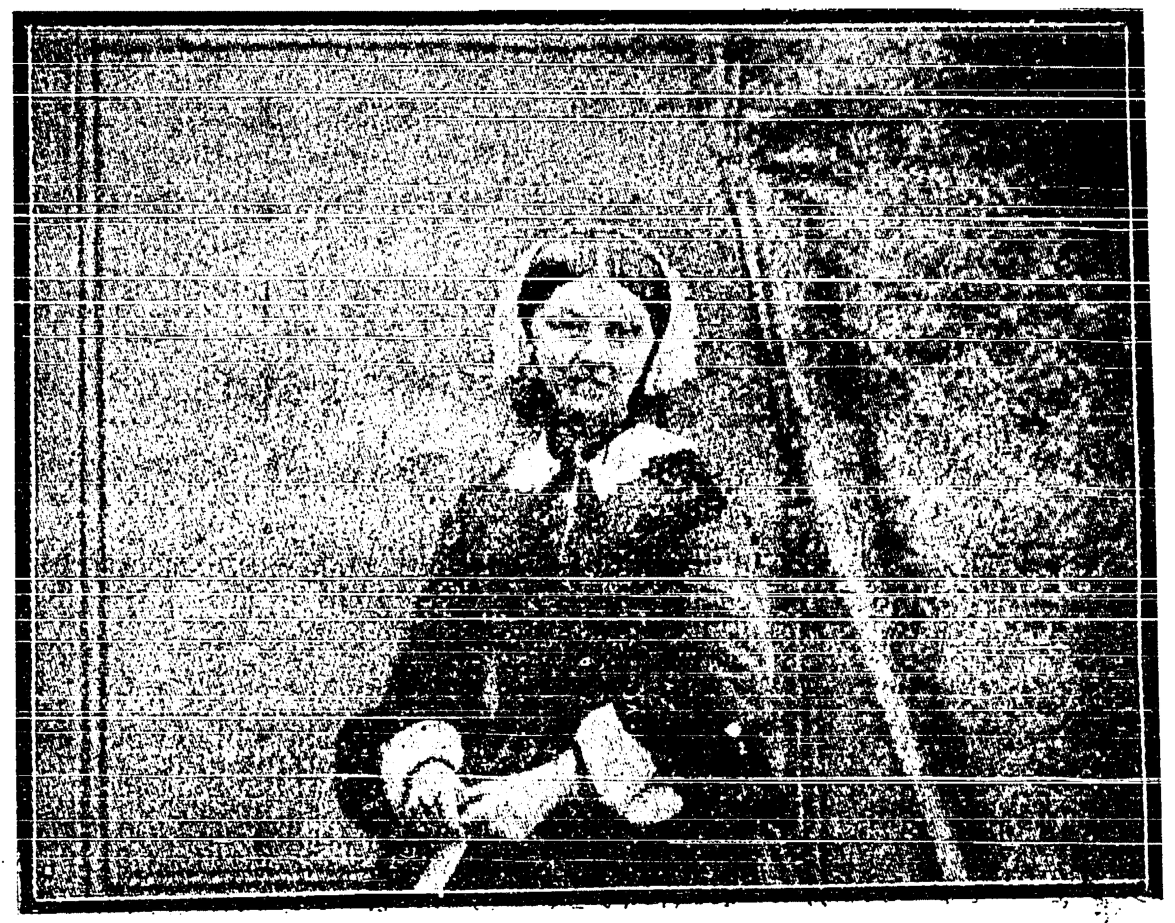

এই দেবি-মূর্ত্তির নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্

ফ্লোরেন্স্ ছিলেন, বড় ঘরেরই মেয়ে। প্রকৃতিটা কিন্তু তাঁর ছিল অন্য রকমের, বড়লোকের মেয়েদের সচরাচর যেমনটী হয়, ঠিক তেমনটী নয়। তাঁর পুতুল-খেলার রকমটাই একবার শোন না কেন। অবশ্য পুতুল তিনি ছোট বেলায় খুবই খেলিতেন, কিন্তু সে খেলাটাও ছিল অন্য ধরণের। মনে মনে ভাবিতেন, তাঁর পুতুলটার যেন ঠ্যাং ভাঙ্গিয়াছে! আহা বেচারার এত কষ্ট! একটু ভাল করিয়া পা টা ব্যাণ্ডেজ না করিয়া দিলে কি হয়? পরদিন হয়তো আবার ভাবিলেন,

"আজ ঠ্যাং ঠিক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গা'টা যেন কেমন গরম গরম ঠেকিতেছে না ?" গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "হুঁ—ঠিক্ তাই, দিই,ভাল করিয়া মোজা জোড়া পরাইয়া, গায়ে কম্বলটা চাপাইয়া দিই—মাথাটাও ধরিয়াছে বোধ হয়—একটু টিপিয়া দেওয়া যাক্।" খেলা ছিল তাঁর এই ধরণের। একটু বয়স হইতেই পুতুল-রোগী তাঁর আর পছন্দ হইল না। "ওর কি আর ছাই সত্যিকার কষ্ট আছে ? সত্যিকার কষ্ট দূর না করিলে আর কি করিলাম ?"—ভাবনা হইল তাঁর এই রকম। এক দিন তাঁদের বাড়ীর একটী কুকুর কোথা হইতে যেন একটা ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আর ফ্লোরেন্স্‌কে পায় কে ? খাসা করিয়া কুকুরের পায়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। কুকুরই হইল তাঁর প্রথম রোগী।

ক্রমে বয়সটা একটু বাড়িল, তিনিও কুকুর-রোগী ছাড়িয়া মানুষ-রোগী ধরিলেন। সাহেবের মেয়ে, ঐ বয়সে কোথায় স্কিপিং করিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইবেন, তা না দিনরাত খালি খোঁজ লওয়া কোথায় কোন্ বাড়ীতে কার অসুখ হইয়াছে। টমাস্ বুড়োর নাকে বিড়ালে হেঁচ্‌ড়াইয়াছে, চলিলেন তিনি মলম ঘষিতে। ডিক্ সাহেবের ছোট মেয়েটা জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য, ফ্লোরেন্স্ ও-ডি-কলোনের শিশি লইয়া তার শিয়রে গিয়া বসিলেন। ভবিষ্যতে যিনি শত-সহস্র লোকের রোগ-শয্যার কষ্ট ঘুচাইবেন, এমনি করিয়াই ভগবান্ তাঁর হাতে খড়ি দিলেন।

ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ বড় হইলেন। তখন তাঁর ঝোঁক উঠিল, কি করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়, সেইটা শিখিতে হইবে। শিখিবেন তো, কিন্তু শেখায় কে ? ইংল্যাণ্ডের হাসপাতালগুলি ? রামচন্দ্রঃ—নিজেদের পেটেই তাদের বিদ্যা একেবারে গজ্ গজ্ করিতেছে, তারা যাইবে আবার অপরকে শিখাইতে ! বরং ফ্রান্স-জার্ম্মেণী এ বিষয়ে বিলাতের চাইতে ভাল ছিল। কাজেই এই দুই দেশে গিয়া শুশ্রূষা-বিদ্যাটা তিনি বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়া আসিলেন। তখন তাঁর বয়স বছর ত্রিশ-বত্রিশ।

এর কয়েক বছর পরেই ক্রিমিয়ায় রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। যে সব

ভয়াবহ খবর রোজ সেখান হইতে বিলাতে আসিতে লাগিল, তা' তো আগেই কিছু কিছু বলিয়াছি। সারা ইংল্যাণ্ড্ তোলপাড় হইয়া উঠিল। না ই বা হইবে কেন ? প্রায় বাড়ী হইতেই কেউ-না-কেউ তো লড়াইয়ে গিয়াছে ! তাদের বাপ-মারা যখন শুনিলেন যে ছেলেরা তাদের হাসপাতালের স্যাঁৎসেঁতে কোণে পচিয়া মরিতেছে, রোগীর শুশ্রূষার বে-বন্দোবস্ত যতদূর হইবার, হইতেছে। তখন কোন্ প্রাণে তাঁরা ঠিক থাকিবেন বল ? ঘরে ঘরে তাই কান্নার রোল উঠিল।

এ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া নাইটিঙ্গেলের ভিতরকার কোমল মাতৃ-হৃদয়টা ব্যথায় একেবারে ভরিয়া উঠিল। কী, ভা'য়েরা তাঁর বন্দুকের গুলি খাইয়া শুশ্রূষার অভাবে প্রাণ দিবে, আর তিনি ঘরে বসিয়া চা-কেক্ খাইয়া ফূর্ত্তি করিবেন ? এ অসম্ভব। তিনিও সেই রণভূমিতেই যাইবেন—তাদের সেবার জন্য—মা-বোনের অভাব যেন সেখানে তারা না বুঝিতে পারে।

তুরস্কের তখনকার রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌লের ঠিক সাম্‌নে স্কুটারি। সেখানে আহত ইংরাজ সৈনিকদের হাসপাতাল। চৌত্রিশজন মাত্র সঙ্গিনী সাথে করিয়া একদিন নাইটিঙ্গেল্ সেই স্কুটারিতে আসিয়া জাহাজ হইতে নামিলেন। সেই দিনই হাসপাতালের সৈন্যেরা বুঝিতে পারিল, কোথায় যেন কি একটা হইয়াছে। ওষুধ-পথ্য ঠিক সময়মত আসিতে সুরু করিল দেখি ! গায়ের কম্বলখানা পড়িয়া গেলে এ দেখি কে আবার সেখানা তুলিয়া সযত্নে সমস্ত শরীরটা ঢাকিয়া দেয়, পাছে ঠাণ্ডা লাগে ! ব্যাপারখানা কি ? ডাক্তার সাহেবদের দরদটা হঠাৎ বাড়িয়া গেল যে ! কিন্তু খানিক পরেই সকলে বুঝিতে পারিল ভিতরের ব্যাপারটা কি !

সৈন্যেরা ক্রমে ভুলিয়া গেল যে তাহারা রণক্ষেত্রে। মনে মনে ভাবিল যেন তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেখানে তাহারা নিজেদেরই বাড়ীতে বিছানায় শুইয়া, পাশে মা-বোন তাদের সেবায় ব্যস্ত। ওষুধ দিতেছে, পথ্য দিতেছে, গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দিতেছে, আবার অবসর মত বসিয়া বসিয়া গল্পের বইও পড়িয়া শুনাইতেছে। ইহাতে ফল হইতে লাগিল আশ্চর্য্য রকমের। যেখানে হাসপাতালে ঢুকিলেই একশো জনের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন মারা পড়িতেছিল, এই

সেবা-যত্নের ফলে সেখানে মারা যাইতে লাগিল মাত্র শতকরা ২জন, বাকী ৯৮ জনই বাঁচিয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবীময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। আর ইংল্যাণ্ডে? সেখানকার লোকে তো ভাবিতে লাগিল, ফ্লোরেন্স্ একবার দেশের মাটীতে পা দিলে হয়, চৌদোলায় চড়াইয়া—তাঁকে কাঁধে করিয়া দেশময় তারা ঘুরিয়া বেড়াইবে। স্কুটারির হাস্পাতালে তখন দশ হাজার সৈন্য!

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ফিরিবার এখনও দেরী আছে, এই ভাবিয়া বিলাতের লোকেরা কিন্তু মোটেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। সে পাত্রই তারা নয়! চাঁদার খাতা তৈরী করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল তাঁহার নামে চাঁদা আদায় করিতে। দেশের জন্য যিনি এতটা করিলেন, তাঁহাকে কিছু উপহার না দিলে কি চলে? বড়লোকের দেশ, কাজেই চাঁদার অঙ্ক রোজই হু হু করিয়া উপরে উঠিয়া চলিল—প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিল।

এদিকে যুদ্ধ থামার লক্ষণ দেখা দিল, নাইটিঙ্গেলেরও দেশে ফিরিবার সময় কাছাইয়া আসিল। গোটা ইংল্যাণ্ডে গেল তখন বিরাট্ সাড়া পড়িয়া—দেশের এই দরদী মেয়েটী বিলাতের মাটীতে পা' দিলে কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, শুধু সেই কল্পনা-জল্পনাই চলিতে লাগিল। কিন্তু ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ নামের বড় একটা ধার ধারিতেন না। তিনি তো আর নাম কিনিতে যান নাই, গিয়াছিলেন প্রাণের টানে। তাই একদিন কোন্ ফাঁকে যে লুকাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, লোকে তার কিছু টেরই পাইল না। একেই তো বলে মহত্ব! তার উপর যে সাড়ে সাত লাখ টাকা তাঁকে উপহার দেওয়া হইল, নিজে তিনি তার একটী পয়সাও রাখিলেন না, সমস্তই দান করিয়া দিলেন, গরীব-দুঃখীদের যাহাতে ভাল রকম শুশ্রূষা হয়, সেইজন্য। কেমন, একথা শুনিলেও পুণ্য হয় না?

ঘুম-ভাঙ্গান ছড়া

ওঠ খোকন্, জাগ, জাগ,
ডাক্‌ছে তোমার সখা,
রাত পোহাল, ফর্‌সা হল,
দেও না তুমি দেখা!
গাছের উপর থেকে কোকিল,
গাইছে মধুর তানে,
বল্‌ছে কোকিল, ওঠ খোকন,
তাকাও রবির পানে।
লোহিত বরণ, দেখ কেমন,
সোণার রবির ছটা,
হীরের মত ঘাসের উপর,
জ্বল্‌ছে শিশির-ফোঁটা।
গাছের উপর, থেকে তোমায়,
ডাক্‌ছে তোমার সখা,
বল্‌ছে কোকিল, ওঠ খোকন,
জাগ মায়ের খোকা!
হীরু, ক্ষীরু, এক বয়সী,
দাঁড়িয়ে দরজায়,

'ডাক্‌ছে তারা, রোদ উঠেছে
খেল্‌বি খোকা আয়।
সব আঙ্গিনা ভর্‌ল রোদে
ঘুমিয়ে কি আর রবে?
ওঠ খোকন, নইলে তোমায়
আল্‌সে কবে সবে।

শ্রীজ্যোৎস্না দেবী।
(কুড়িগ্রাম)

হাসির গল্প

কেরাণীর দুঃখ

একজন কেরাণী, সকাল বেলা কাগজ খুলেই তাতে লেখা দেখতে পেল, "একজন বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ, বি-এ পাশ লোক দরকার, মাহিনা ৭০৲ টাকা। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।" কাগজ-পত্র ঘেঁটে, বি-এ পাশের সার্টিফিকেটটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়্‌ল। মনিব অনেকগুলি লোককে দেখে শেষে একজন এম্‌-এ ফেল লোক নিযুক্ত করলেন, কেননা এম্‌.এ ফেল্‌ সে, কাজেই আর সবার চাইতে লেখাপড়া নিশ্চয়ই বেশী শিখেছে। কেরাণী দুঃখ কর্‌তে কর্‌তে বল্ল, "এম-এ পরীক্ষাটা দিলে অন্ততঃ ফেল্‌টাও কি কর্‌তে পারতুম না?"

শ্রীঅমলেন্দু সরকার।
(আদমপুর)

চানাচুর

প্রশ্ন। খোকা, তুমি পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ জায়গা দেখেছ?

খোকা। সব জায়গা দেখেছি।

প্র। কার সঙ্গে গিয়েছিলে দেখ্‌তে?

খো। আমাদের ভূগোলের মাষ্টার মশায় আমায় মানচিত্র খুলে সব পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী দেশ, মহাদেশ, গ্রাম ইত্যাদি যা ছিল সব দেখিয়েছেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী।
(বাঁকুড়া)

ওস্তাদ বাজিয়ে

(শ্রীসুধাংশুকুমার বসু)

হরিহর নন্দী—বাড়ী তা'র কাশীতে,
ওস্তাদ ভারী সে তব্‌লা ও বাঁশীতে,
'এস্‌রাজ', পাখোয়াজ', 'তানপূরা' অথবা
'সারেঙ্গী' 'একতারা'—বলি আর কত বা?
যত আছে যন্ত্র বাজাবার জন্য,
কিছুতেই ওস্তাদ্‌ নাই কেউ অন্য!
বাজ্‌না শুনে তার, রাজা-রাণী যত্‌না,
খুসী হোয়ে দেছে তারে উপহার কত না!
পুঁটিয়ায় একদিন হরিহর চন্দ্র
খুঁটিয়ে হে বাজালো যত আছে যন্ত্র।
হোলো সবে মুগ্ধ, শুনে তার বাদ্যি।
তার সাথে পাল্লা দেয় কার সাধ্যি?
সবে বলে—"দুনিয়ায় নেই এর তুল্য।"
শুনে তা'র বুকখানা দশ হাত ফুল্‌ল।
হেন কালে মিশ্‌ কালো এক উড়ে বেহারা—
ঝুঁটি বাঁধা মস্তকে, লিক্‌লিকে চেহারা—
তাড়াতাড়ি উঠে বলে সভামাঝে দাঁড়িয়ে—
জিরাফের মতো গলা এতখানি বাড়িয়ে—
"বাজ্‌নাতে তুমি নাকি ওস্তাদ্‌ মস্ত'?
বাদ্যি বাজাতে নাকি হাত তব দোস্ত?
এসো তবে ওস্তাদ্‌, চট্‌পট্‌ ওঠো হে—
দেখেনিক্‌ সবে আজ, কে বা বড়, ছোটো কে?

বাজালে তো বাজ্‌না এখ্‌খুণি শতটা ;
বগল বাজাও দেখি, ওস্তাদি কতটা !”

বিদ্যুৎ-রাজ

(মাইকেল-ফ্যারাডে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য)

এবারকার ‘রামধনু’তে তোমরা আমেরিকার নতুন প্রেসিডেণ্ট হুভারের কথা পড়িয়াছ। কামারের ছেলে—সেই কিনা হইয়াছে দেশের কর্ত্তা! তোমরা খুব আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছ, না ? কিন্তু মানুষের বিদ্যাবুদ্ধিটা সব সময় জাতের উপর নির্ভর করে না। আজ তোমাদের ঠিক এই ধরণের আরও বড় একজন লোকের বিষয় বলিব। ইনিও ছিলেন কামারের ছেলে। কিন্তু গোটা পৃথিবীটার মধ্যে তাঁহার মত মাথাওয়ালা লোক খুব কমই জন্মিয়াছে। কাহার কথা বলিতেছি বল ত ? মাইকেল ফ্যারাডের।

ফ্যারাডের নাম তোমরা অনেকেই হয় ত জান। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কয়েকজনের নাম করিতে হইলে গোড়ার দিকেই নাম করিতে হয় ফ্যারাডের। যে বিদ্যুতের শক্তি (ইলেক্‌ট্রিসিটি) আজ সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জিনিষকেই উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিতে বসিয়াছে, তাহার অনেকটাই সম্ভব হইয়াছে এই মানুষটির জন্য।

ফ্যারাডের বাপ ছিলেন গরীব কামার। রাতদিন হাতুড়ী পিটাইতে পিটাইতে বেচারা বোধ হয় অস্থির হইয়া গিয়াছিলেন। তাই তিনি ভাবিলেন,—নাঃ ছেলেটাকে একটু উঁচু কাজ করিতে দিতে হইবে। কি কাজ ? না, দপ্তরীর দোকানে। তোমরা হাসিতেছ ? হাস। কিন্তু ভগবানের দয়া ফ্যারাডে লোহা পিটাইবার কাজে না গিয়া বই বাঁধাই করিবার কাজে লাগিয়াছিলেন। তা না হইলে হয়ত’ আজ পৃথিবীর অবস্থাটা অনেকটা অন্য রকম হইত।

বইএর দোকানে নানা রকম বই বাঁধিতে আসে, আমাদের দেশের দপ্তরীরা ক’জন আর তাহা লইয়া মাথা ঘামায় বল ? আর ক’জনই বা তা পড়িতে পারে ? কিন্তু ফ্যারাডে করিতেন কি, অবসর পাইলেই সেগুলি খুলিয়া খুলিয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার বয়স কিন্তু মাত্র তের বছর। এম্নিভাবে কয়েক বছরেই তিনি অনেকটা শিখিয়া ফেলিলেন। ফ্যারাডের সবচেয়ে ভাল লাগিত বিজ্ঞানের বইগুলি। বিদ্যুৎ জিনিষটা তখন সবে বৈজ্ঞানিক মহলে দেখা দিয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা লইয়া দন্তস্ফুট করা বড় সহজ ছিল না। ফ্যারাডের কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগিয়া গেল এই জিনিষটাই।

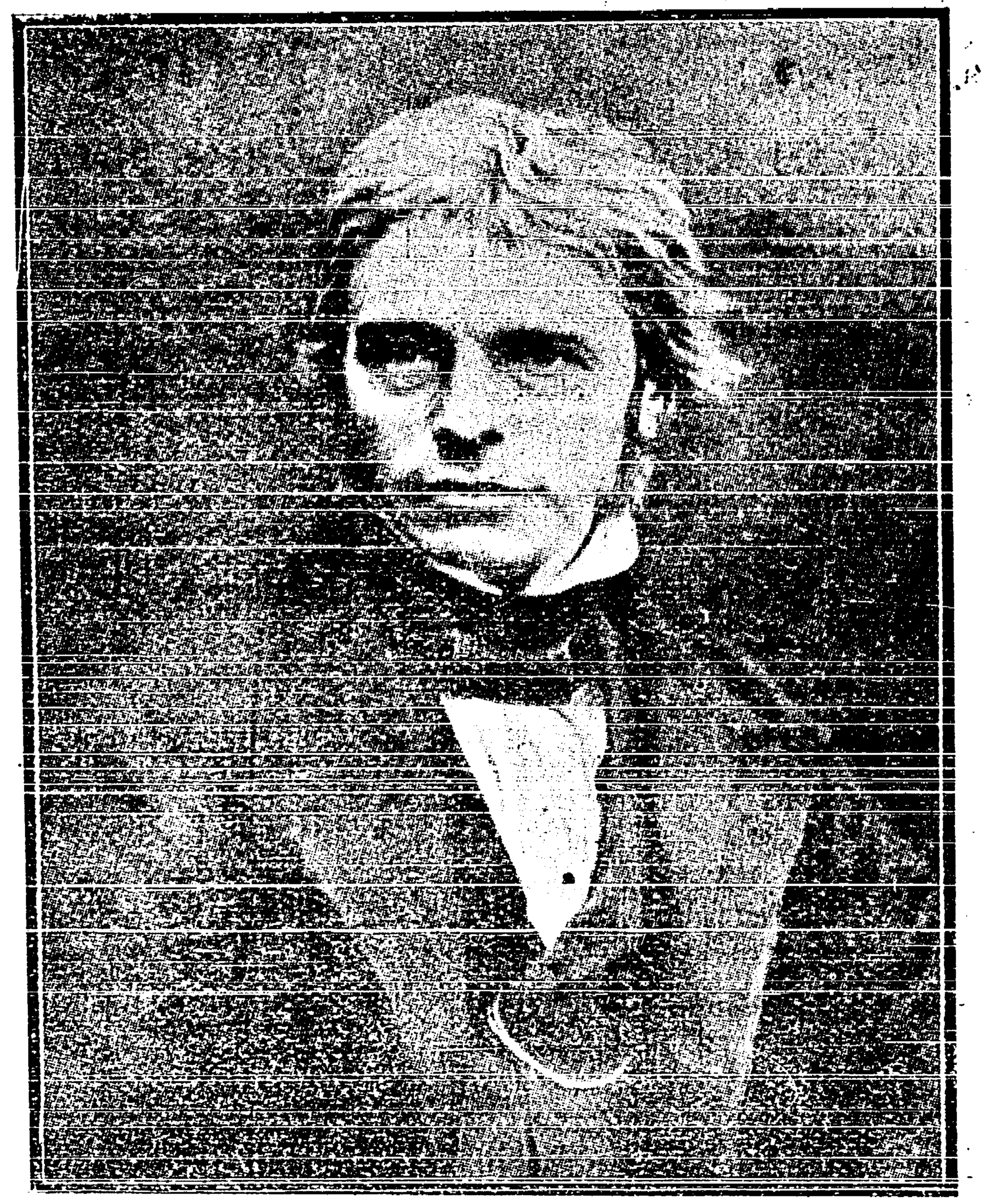

মাইকেল ফ্যারাডে

ফ্যারাডের বয়স যখন বছর কুড়ি একুশ, তখন একদিন এক ভদ্রলোক সেই দোকানে আসিয়া হাজির। ভদ্রলোক বইএর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, হঠাৎ দেখেন এক কোণে বসিয়া এক ছোক্‌রা দিব্যি একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া বিদ্যুৎ সম্বন্ধে লেখাটুকু যেন গিলিতেছে। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া কি তোমরা অনেকেই হয় ত জান। প্রকাণ্ড একখানা ২০।২৫ খণ্ডের অভিধান, যাহার মধ্যে থাকে না এমন জিনিষ নাই। ভদ্রলোকটি যে সে লোক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক

বৈজ্ঞানিক, আর বিলাতে যে পণ্ডিতদের সব চেয়ে বড় সমিতি—রয়াল সোসাইটি—তিনি ছিলেন তারই এক পাণ্ডা। ফ্যারাডের কাণ্ড দেখিয়া ভদ্রলোক খুবই অবাক্ হইয়া গেলেন। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু, তোমার বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এত আগ্রহ, তুমি রয়াল সোসাইটির সভায় গেলেই পার। সেখানে যে আজকাল ডেভি এ বিষয়ে নানা রকম বক্তৃতা দেন!" ডেভি কে, তোমাদের কিছুদিন আগেই বলিয়াছি। সেই যে যিনি খনির লোকদের বাঁচাইবার জন্য এক অদ্ভুত লণ্ঠন বাহির করিয়াছিলেন।* এই সময় তিনি ছিলেন কিনা বিলাতের প্রায় সেরা বৈজ্ঞানিক।

ফ্যারাডে জবাব দিলেন "যাইতে ত ইচ্ছা খুবই, কিন্তু সেখানে ত আর যাকে তাকে ঢুকিতে দিবে না, পাশ পাই কোথায়? আর যে ষণ্ডা দ্বারোয়ান থাকে গেটের সাম্‌নে। পাশ না দেখাইতে পারিলে লাঠি উচাইয়া তাড়া করিবে।" ভদ্রলোক বলিলেন "ওঃ, এই কথা! আচ্ছা, আমি তোমাকে পাশ দিতেছি।"

ফ্যারাডে আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এতটা আনন্দ হইয়াছিল যে, এই 'পাশে'র বদলে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দিলেও বোধ হয় তিনি তাহা লইতেন না।

পাশ পাইয়া ফ্যারাডে ত বক্তৃতা আরম্ভ হইবার কয়েক ঘণ্টা আগে গিয়াই হাজির! সময়টা যেন আর কাটিতেই চায় না। তার পর ডেভি আসিলেন, বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ফ্যারাডে তখন একমনে প্রত্যেকটি কথা শুনিয়া লইলেন, আর শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সারাংশটুকুও লিখিয়া লইলেন।

বাড়ী আসিয়া ফ্যারাডে লেখাটুকু বেশ করিয়া গুছাইয়া খাতায় লিখিয়া ফেলিলেন। এই ভাবে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার খাতা বেশ বোঝাই হইয়া উঠিল। ফ্যারাডের আর তখন বইএর দোকানের কাজ ভাল লাগে না। লাগিবে কেন? অত বড় একটা মাথা লইয়া যে জন্মাইয়াছে, সে কি সামান্য একটা কাজ লইয়া দিন কাটাইতে পারে? ভাবিয়া চিন্তিয়া ফ্যারাডে এক কাজ করিয়া বসিলেন। তিনি

* শ্রাবণ মাসের 'রামধনু'তে "খনির আলো" প্রবন্ধ দেখ।

তাঁহার খাতা খানা স্বয়ং ডেভির কাছে পাঠাইয়া দিলেন। আরও লিখিলেন, "আমার বড় সাধ, আপনার কাছে আমি বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিব।"

খাতা পাইয়া ডেভি ত অবাক্! তিনি এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক হইয়া যে সব জিনিষ লইয়া এত বেগ পাইয়াছেন—এ ছোকরা কিনা সে সব একবার শুনিয়া, বুঝিয়া, দিব্যি গুছাইয়া লিখিয়া রাখিয়াছে! বলা বাহুল্য, তার পরেই ফ্যারাডে ডেভির কাছে বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, আর কিছুদিন পরেই হইয়া গেলেন—তাঁহার প্রধান সহকারী।

ফ্যারাডের গুরুভক্তিটা ছিল আমাদের দেশের সেকালের গুরুদের শিষ্যের মতই! ডেভির জামা-কাপড় বুরুষ করিয়া দেওয়া, জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখা—এমন কি, ছোট খাট অনেক চাকরের কাজ করিতেও তিনি কিছুমাত্র লজ্জা পাইতেন না। একবার ত' এক ভারী মজার কাণ্ড-ই হইয়াছিল। ফ্যারাডে তখন ডেভির প্রধান সহকারী। কিন্তু তাঁহার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া এক ভদ্রলোক ঠিক করিয়া লইলেন—ফ্যারাডে বুঝি ডেভির চাকর! একদিন তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ফ্যারাডের জায়গা হইয়াছে চাকরদের সাথে! ফ্যারাডে কিন্তু ও সব তুচ্ছ বিষয় লইয়া কিছু মাথা ঘামান নাই। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে চাকরদের সাথে খাইতে হয় নাই।

ক্রমে ফ্যারাডে নিজে নিজেই নানারকম পরীক্ষা আর গবেষণা জুড়িয়া দিলেন। দু'চার বছরের মধ্যে দিগ্বিদিকে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে তাঁহাকে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল। যে রয়াল সোসাইটিতে ঢুকিতে গেলে এক সময় দ্বারোয়ান লাঠি লইয়া তাড়া করিত, সেই রয়াল সোসাইটিরই তিনি হইলেন এক রকম কর্ত্তা। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, হাজার হাজার লোক সেখানে জড় হইত!

ফ্যারাডে বহু নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার সবগুলি তোমরা বড় না হইলে বুঝিতে পারিবে না। একটা আবিষ্কার হইতেছে—চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুতের শক্তি তৈরী।—ব্যাপারটা যখন ফ্যারাডে প্রথম আবিষ্কার করেন তখন

জিনিষটার ক্ষমতা সম্বন্ধে কেহই কিছু ভাবিতে পারে নাই। ফ্যারাডে যেদিন রয়াল সোসাইটির সভায় একটা চুম্বক-লোহার সম্মুখে একটা তার রাখিয়া দেখাইলেন তারের ভিতরে বিদ্যুৎ আসিতেছে, সেদিন সভার পরে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা জিনিষটা, ত' খুবই আশ্চর্য্য মানিলাম, কিন্তু এতে জগতে উপকারটা কি হইল?" ফ্যারাডে বলিলেন, "আজ না হয়, হয় ত একদিন হইবে।" বাস্তবিকই হইয়াছেও তাই। আজ যে ইলেক্‌ট্রিক আলো, পাখা, মোটরকার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সমস্ত সভ্য-জগৎটাকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছে, গোড়া খুঁজিতে গেলে এর সবগুলিই হইয়াছে ফ্যারাডের সেই ছোট্ট আবিষ্কার টুকুরই উপর রং ফলাইয়া।

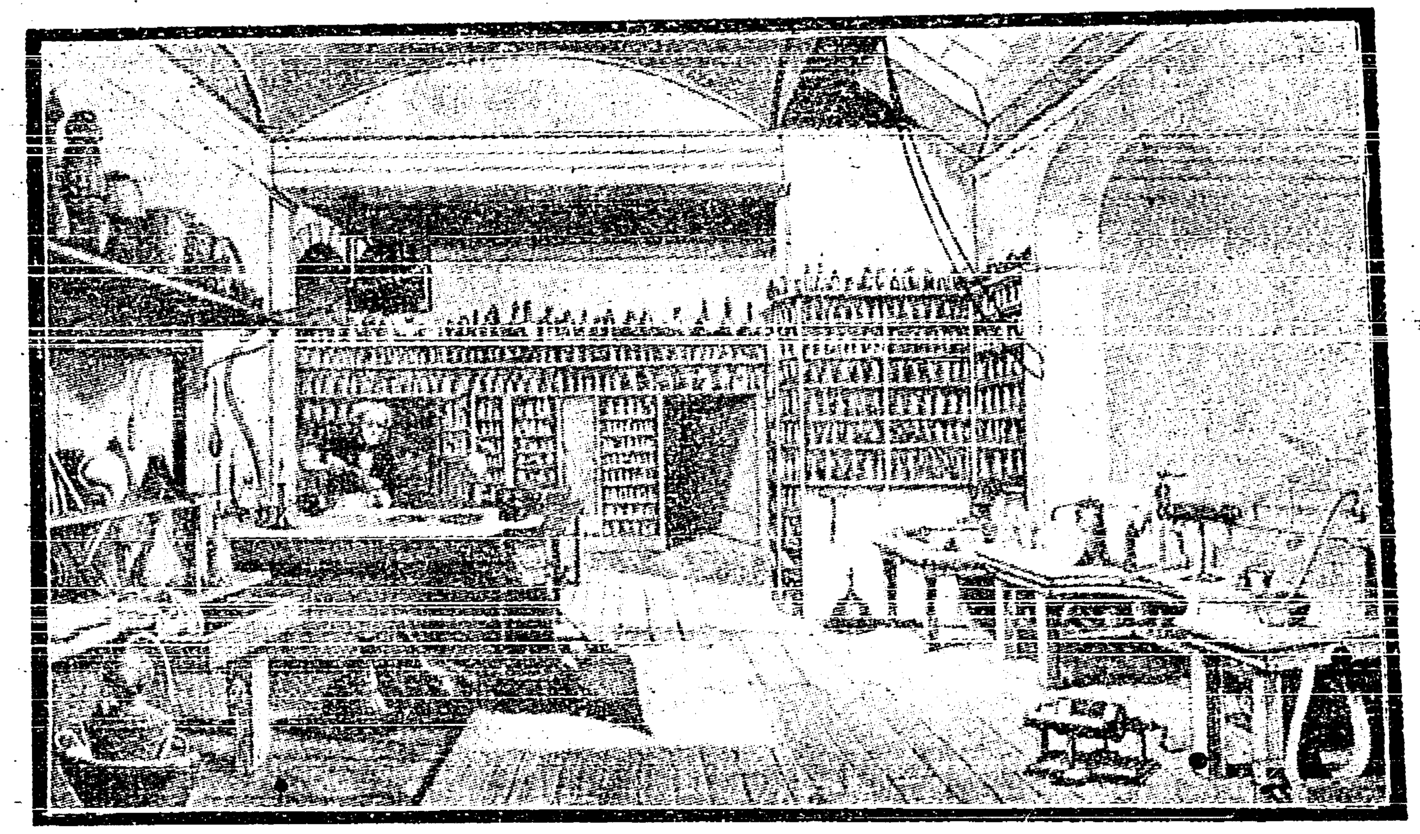

রয়াল সোসাইটিতে ফ্যারাডের ঘর

ফ্যারাডের গুরু ডেভিও অনেক বড় বড় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কারের মধ্যে কোন্‌টা সবচেয়ে বড়, তাহা লইয়া নানা লোকে নানা মত প্রকাশ করে। কেউ একটাকে বড় বলে, কেউ আর একটাকে। ডেভি নিজে কিন্তু বরাবরই একটার কথাই বলিতেন। তিনি বলিতেন কি জান? "আমার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার, মাইকেল ফ্যারাডে।" বাস্তবিক কথাটা খুবই সত্য। কারণ ডেভি

যদি ফ্যারাডেকে সহকারী করিয়া না নিতেন, তবে হয়ত পৃথিবীর চেহারা আমরা দেখিতাম অন্যরকম।

সেপাই রাজা

(অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম্‌-এ, বি-এল)

রাজার সেপাই। যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধ জয় কোরে বাড়ী ফির্‌ছে। সঙ্গীরা আগে চলে' গিয়েছে। সে অনেকদূর পিছিয়ে পড়েছে। তার কিন্তু ভয় নেই মোটেই। চলেছে সে গট্‌মট্‌ কোরে' শিস্‌ দিতে দিতে। কোমরে ঝুল্‌ছে তার তলোয়ার—লাল খাপে ভরা। চল্‌তে চল্‌তে পথে সন্ধ্যা হোয়ে গেল। সে একটা আস্তানার জন্যে এদিক্‌ ওদিক্‌ কর্‌ছে,—এমন সময় দেখ্‌লে, একটা জটা-ওলা বটগাছের তলায় ডাইনী বুড়ী ব'সে রয়েছে। অতি কদাকার চেহারা—নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

বুড়ী বল্লে,—"রাজার সেপাই, রাজার সেপাই! যাচ্ছ কোথা? বেশ তরোয়ালটি তো তোমার? আর কী সুন্দর খাপ! সেপাই বটে তুমি!"

সেপাই বল্লে,—"ঢের হয়েছে, ডাইনী বুড়ী! অতো খোসামোদ কেন? আমার ওপর নজর দিবি? তেমন কাঁচা ছেলে নই! বেশী চালাকী করিস্‌ যদি, দেবো এক কোপ!"

বুড়ী ভয় পেয়ে বল্লে,—"দোহাই বাবা! অতো চটিস্‌ নি! আমি কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তোমাকে দেখে আমার বড় ভালো লেগেছে! আহা সোণার কার্ত্তিকের মতো চেহারা!"

সেপাই চোখ রাঙা কোরে বল্লে,—"আঃ গেল যা। আবার বক্‌ছিস্‌! কি বল্‌তে চাস্‌ বল্‌ না!"

বুড়ী বল্লে,—"বলি, বাবা, বলি।...টাকা চাও? যতো খুসী টাকা?"

টাকা আর চায় না কে?...তাই সেপাই বুড়ীর কাছে এসে হাসিমুখ কোরে বল্লে,—"চাই বই কি? তুই দিবি?"

বুড়ী বটগাছটা দেখিয়ে বল্লে,—"এই গাছ দেখ্‌ছো। এর ভেতরটা সব ফাঁপা। এর ওপরে উঠে যাও—একদম সব ওপরে। সেখানে একটা গর্ত্ত দেখ্‌বে। সেই গর্ত্তের ভিতর

লাফিয়ে পড়লেই—ব্যস্—একেবারে মাটীর নীচে। আমি তোমাকে একটা দড়ি দিয়ে বেশ কোরে বাঁধ্বো। টেনে তুল্তে হবে তো!"

রাজার সেপাই। তবুও তার গা ছম্ ছম্ কর্তে লাগলো। বুড়ী বলে কি? মাটীর নীচে ফেলে দেবে? পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে হারাতে হবে দেখছি। মুখে সাহস দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে,—"আরে, বুড়ী, মাটির নীচে করবো কি?"

বুড়ী দাঁত বের কোরে বল্লে,—"টাকা নেবে—অনেক টাকা। এও বুঝ্লে না? বলি, শোন, মাটীর নীচে গিয়ে একটা মস্ত দালান পাবে। আলোয় আলো—তিনশো ঝাড় জ্বল্ছে। তার তিনটে দরোজা—চাবী ঝুলানো আছে—তিনটেই খুল্তে পারবে। প্রথম দরজাটা খুল্লেই একটা ঘর। তার ঠিক মধ্যিখানে কাঠের সিন্দুক! তার ওপর বসে আছে একটা বড়ো কুকুর—ভাঁটার মতো দুটো চোখ। সেই সিন্দুকটার ভেতর আছে কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা। ভয় পাবার নেই কিছু। আমার কালো চাদরটা নাও। এইটে মেঝেতে পেতে খপ্ কোরে কুকুরটাকে ধরে' এর ওপর বসিয়ে দেবে। তাহ'লে সে কিছু বল্বে না। তারপর তুমি সিন্দুক খুলে যতো ইচ্ছে পয়সা বের কোরে নাও। পয়সায় যদি মন না ওঠে, তো আর একটা দরোজা খুলে পাশের ঘরটাতে যাবে। সেখানেও সিন্দুক—তার ওপরও কুকুর বসে'—চাকার মতো চোখ। এই সিন্দুকে আছে শুধু টাকা। কুকুটাকে ধরে' কালো চাদরটাতে বসিয়ে দিয়ে সিন্দুক উজোড় কোরে নিয়ে এসো। টাকাতেও বুঝি তোমার মন উঠ্বে না? তবে কি মোহর চাই—মোহর? বেশ! আর একটা দরোজা খুলে ঘরে সেঁধিয়ে দেখ্বে একটা সিন্দুক—তার ভেতর মোহর ঠাসা। সেখানেও কুকুর ব'সে—জালার মতো চোখ। সাবধান! সে বড়ো সর্ব্বনেশে কুকুর! কিন্তু ভয় নেই। তাকে যদি আমার কালো চাদরে বসাতে পারো, সে কিছুই বল্বে না। তারপর সিন্দুক খুলে মুঠো মুঠো মোহর তুলে নাও। কেমন?"

সেপাই বল্লে,—"এতো মন্দ কথা নয়। কিন্তু, তুই কি চাস্? তুই কি অম্নি লোকের ভালো করিস্?"

ডাইনী কাণে হাত দিয়ে বল্লে,—"আরে, কি বল তার ঠিক নেই। আমি একটা পয়সাও চাই না। সেখানে একটা চক্মকির বাক্স আছে। আমার ঠান্দি সেটা সেখানে ফেলে এসেছিল। সেটে শুধু আমাকে এনে দেবে।"

সেপাই এক লাফে গাছে উঠ্লো। ডাইনী বুড়ী তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধ্লে। সে ওপর থেকে একেবারে ঝপাং কোরে দেখতে দেখতে মাটীর নীচে নেমে গেল। সত্যিই তো—এক

মস্ত দালান,—তিনশো ঝাড় জ্বল্ছে! প্রথম দরজা খুলে সে ঘরে গেল। সেখানে সিন্দুক আর তার ওপর ব'সে আছে এক কুকুর—ভাঁটার মতো চোখ। চট্ কোরে সে কুকুরটাকে কালো চাদরের ওপর বসিয়ে দিলে। তারপর সিন্দুক খুলে আঁচলা আঁচলা পয়সা তুলে যেখানে পারলে, রাখ্লে। সিন্দুকের ডালা বন্ধ কোরে দিয়ে কুকুরটাকে তার ওপর বসিয়ে সে আর একটা ঘরে ছুট্লো। 'সেখানেও সিন্দুক—ডালার ওপর কুকুর ব'সে—চাকার মতো চোখ। সে বল্লে,—"অমন কোরে তাকাস্ নি বাপু, চোখের দফারফা হবে।" বলেই সে টক্ কোরে কুকুরটাকে কালো চাদরে বসিয়ে ডালাটা খুলে ফেল্লে। কতো টাকা—কি মজা! পয়সাগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে মুঠো মুঠো টাকা তুলে কাপড়চোপড়ে নিলে। তার পর ডালা বন্ধ কোরে কুকুরটাকে বসিয়ে ছুটলো আর এক ঘরে। সে ঘরে ঢুকেই সে পিছিয়ে গেলো। সিন্দুকের ওপর কুকুর বসে'—সে এক ভীষণ জানোয়ার—চোখ দুটো জালার মতো বড়ো—অনবরত ঘুর্ছে। ভয় পেলে কি চলে? সেপাই কুকুরটা জাপ্টে ধ'রে চাদরের উপর বসিয়ে দিলে। তারপর ডালাটা খুলে ফেল্লে। ভেতরে মোহর—খালি মোহর—জ্বল্ জ্বল্ কোরে জ্বল্ছে। তার চোখ ঝলসে গেলো। সে ভাবলে, এই বারেই কিস্তি মাৎ। আর চাক্রী কোরে খেতে হবে না, এই মোহর নিয়ে গিয়ে রাজার হালে থাক্বো। কতো বড়ো জমিদারী হবে—কতো বাড়ী ঘর—লোক-লস্কর দাস-দাসী—আরো কতো কি। খানিকটা নেবে গিয়ে সেপাই টাকাগুলো দূর কোরে' ছুড়ে ফেল্লে। আঁচলা আঁচলা কোরে মোহর নিয়ে কাপড় চোপড় বোঝাই কোরে' কুকুরটা বসিয়ে একেবারে সড়াসড় গাছের তলায় এসে চেঁচিয়ে বল্লে "ডাইনী বুড়ী, টেনে তোল্।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা কর্লে,—"আমার চক্মকির বাক্স এনেছো?"

সেপাইয়ের হুঁশ হোল। সে মনে মনে বল্লে,—"কি সর্ব্বনাশ! সাফ ভুলে গিয়েছিলাম। যাই আনি গে।" বাক্সটা নিয়ে এসে সে আবার বল্লে,—"ডাইনী বুড়ী, এইবার তোল্।"

বুড়ী তাকে টেনে তুল্লে। রাজার সেপাই আবার রাজপথে এসে দাঁড়ালো। সে জিজ্ঞাসা কর্লে,—"বুড়ী, চকমকির বাক্স নিয়ে কি কর্বি?"

বুড়ী বল্লে,—"তাতে তোমার কি? তুমি তো তোমার টাকা পেয়েছো। আমার বাক্স আমায় দাও।"

সেপাইয়ের এখন টাকার গরম। সে রেগে উঠে বল্লে,—"কি করবি যদি না বলিস তো এখুনি তোকে কেটে ফেলবো।"

বুড়ী বল্লে,—"বলবো না।"

"তবে রে," বলেই তলোয়ালের এক কোপে সেপাই বুড়ীকে কেটে ফেল্লে। বুড়ী সেখানেই পড়ে রইলো। সেপাই মোহরগুলো থলিতে ভরে বেশ কোরে' বেঁধে, বাক্সটা নিয়ে সহরের দিকে চল্‌লো।

মস্ত সহর! বড়ো বড়ো বাড়ী—ফিটফাট সাজানো—চারদিকে ঝক্‌ঝক্ করছে। বাজারে সোরগোল। সব সময়ে উৎসব লেগে আছে। সেপাই ঘুরে ঘুরে একটা বড়ো বাড়ী ভাড়া করলে। দশটা চাকর রাখ্‌লে, আর দুহাতে টাকা খরচ করতে লাগ্‌লো। সহরের সবাই জানলে, একটা মস্ত লোক সেখানে এসেছে। দলে দলে তারা সেপাইয়ের বাড়ীতে আস্‌তে লাগলো, কতো গল্প কর্লে—সহরের রাজার কথা, রাজার মেয়ের কথা, আরো কতো কি।

সেপাই শুনলো, রাজার মেয়ে নাকি খুব সুন্দরী। যারা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলে,—"তাঁকে কোথায় গেলে দেখতে পাবো?" তারা সবাই বল্লে,—"তাঁর দেখা কেউই পায় না। তিনি থাকেন সোণার ঘরে—তাঁর চারদিকে উঁচু পাঁচিল, রাজা ছাড়া আর কেউ সেখানে যেতে পারেন না। গণৎকার না কি গুণে বলেছে, রাজকন্যার বিয়ে হবে এক সেপাইয়ের সঙ্গে, তাই এতো কড়াকড়ি ব্যবস্থা।"

সেপাই ভাবলে, রাজকন্যাকে দেখতে হবে। কিন্তু কেমন কোরে' যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে, ভেবে পেলে না।

মাসের পর মাস গেল। বছর ঘুরলো। সেপাইএর দিন রাজার হালে কেটে যেতে লাগলো। খাওয়া দাওয়া, আমোদ ফুর্ত্তি, দান ধ্যান, এই সবে তার মোহরগুলো যেন ডানা হয়ে উড়ে গেল। শেষে একদিন সে দেখ্‌লে যে, তার হাতে আছে গোটা দুই তিন টাকা। বড়ো বাড়ীতে থাকা আর চলে না। সহরের বাইরের দিকে একটা কুঁড়েতে গিয়ে সে উঠ্‌লো অতি কষ্টে তার দিন গুজরান হোতে লাগলো।

একদিন সন্ধ্যে হোয়ে এসেছে। তার হাতে প্রদীপের তেল কিনবারও পয়সা নেই। কি করে? অন্ধকারেই বসে থাকতে হবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে, চকমকির বাক্সে একটা বাতির টুকরো পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেটা বার কোরে চকমকি ঠুকে যেমনি আগুন জ্বেলেছে, অমনি ঘরের দরজাটা ঝপাৎ কোরো খুলে গেল, আর সেই ভাঁটা চোখ কুকুরটা ঘরের ভেতর ঢুকে বল্লে,—"প্রভুর কি আদেশ?"

সেপাই হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। খানিক পরে সে ভাবলে,—"এতো বেশ মজা! চকমকির বাক্সটা দেখি ভেল্কি জানে। যা' চাই তাই পাবো—এর চেয়ে আর সুবিধে কি আছে?" কুকুরটাকে বল্লে,—"যা, কিছু টাকা এনে দে।" কুকুরটা বেরিয়ে গেল; আর তখনি সে পয়সা ভরা একটা থলি মুখে কোরে নিয়ে এল।

এইবার সেপাই বুঝলে চকমকির বাক্স কি ভেল্কি জানে। চকমকি একবার জাল্‌লে পয়সার সিন্দুকের সেই কুকুরটা আসে; দু'বার জ্বাল্‌লে আসে টাকার সিন্দুকের কুকুর; তিনবার জ্বাল্‌লে আসে মোহরের সিন্দুকের সেই জালার মতো চোখওয়ালা কুকুর।

সেপাই ভাব্‌লে, বাঁচা গেল! সে আবার সেই বড়ো বাড়ীটা ভাড়া নিলে। আবার তার নতুন নতুন পোষাক হ'তে লাগলো। লোকে তার কাছে আনাগোনা করতে সুরু করলে। সে আবার বলে গেল নবাব খাঞ্জা খাঁ।

একদিন তার মনে হঠাৎ একটা খেয়াল এল। সে ভাব্‌লে,—"লোকে বলে, রাজকন্যা পরমাসুন্দরী। অথচ কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। আচ্ছা, আমিও কি পাবো না? দেখি। কোথায় গেল আমার চকমকির বাক্স।" এই বলে সে যেমনি চকমকি ঘস্‌লে অমনি সেই ভাঁটাচোখ কুকুরটা এসে হাজির হোল।

সেপাই বল্লে,—"দেখ, বাবা! রাত হয়ে গেছে বটে। তোর কষ্ট হবে। কিন্তু আমার একবার রাজকন্যাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করছে! একটুখানি দেখ্‌বো। আনতে পারবি?"

চোখের নিমেষ না ফেল্‌তে ফেলতে, কুকুরটা রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে ফিরে এল। রাজকন্যা ঘুমন্ত। সেপাই দেখলো, হাঁ, রাজকন্যাই বটে। কুঁচের মতো রঙ্—মেঘের মতো চুল। রাজকন্যা নষ্ট হ'য়ে যায় না। সেপাইয়ের দেখা শেষ হতেই কুকুরটা রাজকন্যাকে নিয়ে রাখ্‌তে গেল।

সকালে রাজকন্যা রাজা-রাণীকে বল্লে যে, সে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছে। সে ঘুমুচ্ছিল, একটা কুকুর এসে তাকে পিঠে কোরে' নিয়ে গেল প্রকাণ্ড বাড়ীতে,—সেখানে সেপাই থাকে,—এই সব।

রাণী বল্লেন,—"মজার স্বপ্ন তো!" কিন্তু পরের রাত্তিরে রাজকন্যাকে আর একলা শুতে দেওয়া হোল না। রাজকন্যার দাসী রইলো তার ঘরে শুয়ে,—সে দেখবে, ব্যাপারটা স্বপ্ন না কি?

রাত্তিরে সেপাইয়ের আবার সখ গেল, রাজকন্যাকে দেখবে। রাজকন্যা ঘুমিয়ে

আছে,—অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কুকুরটা এসে তাকে পিঠে তুলে ছুট দিতে সুরু কর্‌লে। দাসী জেগে ছিল! সে সব টের পেলে। তারপর কুকুরটার পিছনে প্রাণপণে দৌড়ল। সে দেখলে কুকুরটা একটা মস্ত বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌ছে। তখন সে ভাবলে,—জায়গাটা তো চেনা গেল। কাল সকালে যা হোক করা যাবে। সামনে পড়েছিল এক টুক্‌রো খড়ি। তাই দিয়ে সে বাড়ীটার দরজায় একটা চিকে মেরে ঘরে ফিরে এল। খানিক পরে কুকুরটা রাজকন্যাকে দিয়ে গেল। ফিরে যাওয়ার সময়ে তার নজরে পড়ল, সেপাইয়ের বাড়ীর দরজায় চিকে দেওয়া আছে। সে তখন বুদ্ধি কোরে সারা রাত ধরে' সহরের সব কটা বাড়ীর দরজায় খড়ির চিকে দিলে।

পরের দিন খুব ভোরে দাসীকে নিয়ে রাজা রাণী সহরে গেলেন। সহরে ঢুকেই যে বাড়ীটা রাজা দেখলেন, তার দরজায় চিকে। তিনি বলে উঠলেন,—"এই যে!" রাণী তার পাশের বাড়ী দেখে বল্লেন,—"তুমি ভুল করছো। এই বাড়ী!" ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা দেখলেন, সব বাড়ীর দরজায় একই রকম চিকে। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে ফিরে এলেন।

রাণী ছিলেন বড়ো বুদ্ধিমতী। তিনি রাজবাড়ীতে ফিরেই নিজের হাতে একটা রেশমের থলি সেলাই করলেন আর তাতে ময়দা পূরে সেইটী রাজকন্যার পিঠে ঝুলিয়ে দিলেন। থলিতে রাখলেন একটা ছোটো ফুটো। রাজকন্যা যে পথে যাবে, ঝুরঝুর কোরে ময়দা পড়তে থাকবে। বাড়ী খোঁজা সহজ হোয়ে যাবে।

সেই রাত্তিরে কুকুরটা আবার এল। সে রাজকন্যাকে পিঠে কোরে ছুটে চল্‌লো,—বুঝতেই পারলে না, সারা পথে ময়দা ঝুর ঝুর কোরে ঝর্‌ছে।

সকালে রাজা রাণী সেপাইয়ের বাড়ীটা খুঁজে বের করলেন। সান্ত্রী এসে সেপাইকে ধরে নিয়ে গেল। রাজা তাকে কারাগারে পূরে দিলেন।

অন্ধকার ঘর! চারদিক্ বন্ধ। সেপাইয়ের বড়ো কষ্ট হোল। কি করে? তার ওপর সবাই বলতে লাগলো,—কাল ও শূলে চড়বে। সেপাইয়ের এ সব শুনতে বড়ো ভালো লাগলো না। তার আরো কষ্ট হোল—আসবার সময় চকমকির বাক্সটা ফেলে এসেছে। যেদিন তার শূলে যাবার কথা, সেদিন সকালে সে জানলার গরাদ দিয়ে দেখলে,—সবাই সহরের দিকে ছুটে চলেছে,—সেপাইয়ের শূলে চড়া দেখবে বলে'। ঢাক্ ঢোল সব বাজতে লাগলো—সেপাইয়ের দল গটমট কোরে রাস্তা দিয়ে কুচ-কাওয়াজ করতে লাগলো। ভিড়ের

ভেতর একটা ছোট লোকের ছেলে ছুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তা'র পায়ের একটা পাটি চটি খুলে কয়েদী সেপাইয়ের ঘরের জানলার কাছে এসে পড়লো। সে সেটা কুড়ুতে এলো। সেপাই বল্লে,—"অতো তাড়াতাড়ি যাচ্চ কেন ছোকরা? আমি না গেলে তো তামাসা আরম্ভ হবে না। ততক্ষণ কিছু রোজগার করা ভালো নয়? যাও দেখি ছুটে আমার বাড়ীতে—বড়ো রাস্তার মোড়ে নতুন লাল বাড়ী। সেখানে আমার একটা চকমকির বাক্স আছে। সেইটে নিয়ে এলেই একটা টাকা বক্সিস মিলবে।

ছোকরা টাকার লোভ সামলাতে না পেরে ছুটে গিয়ে চোখের নিমেষে বাক্সটা নিয়ে এলো।

সহরের বাইরে শূল পোতা হয়েছে। হাজার হাজার লোক সেটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রাজা রাণী সিংহাসনে বসে আছেন। সেপাইকে শূলে দেবার সব আয়োজন ঠিকঠাক। তাকে শূলে চড়ানো হবে, এমন সময় সে জোড়হাত কোরে বল্লে,—"রাজা মহাশয়, আমার একটা নিবেদন আছে।" রাজা বল্লে,—"কি?" সেপাই বল্লে,—"শূলে যাবার আগে আমি এক ছিলিম তামাক সেজে খেতে চাই।" রাজা 'না' বলতে পারলেন না। সেপাই চকমকি জ্বাল্‌লে—একবার, দুবার, তিনবার। অমনি দেখতে দেখতে তিনটি কুকুর এসে হাজির—ভাঁটা চোখ, বাকা চোখ, জালা চোখ।

সেপাই বল্লে,—"যাতে আমি শূল থেকে রক্ষা পাই তার উপায় করো।"

তখুনি কুকুর তিনটে সবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সকলকে ছিঁড়ে কুটে খেতে লাগলো। শেষে তারা রাজার উপর পড়ে তাঁকে সিংহাসন থেকে ফেলে দিলে।

সবাই ভয় পেলে। তারা বল্লে,—"সেপাই দাদা, সেপাই দাদা। তোমার কুকুরগুলোকে ডেকে নাও। আমরা তোমায় রাজা করবো! রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বে' দেব।"

তারা সেপাইকে রাজার সিংহাসনে বসিয়ে দিলে। কুকুর তিনটে সিংহাসনের সামনে বসে আনন্দে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। ছেলেরা শিষ দিয়ে গান করতে লাগলো। সেপাইয়েরা সব নতুন রাজাকে সেলাম দিলে। সোণার ঘর থেকে রাজকন্যাকে নিয়ে আসা হোল। সেপাই রাজা তাকে বিয়ে করলে। বিয়েতে যা আমোদ হয়েছিল, তা আর কি বলবো? এক মাস ধরে হল্লা চল্‌লো। সবাই খুসী—সব্বার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

জীব-জন্তুর অদ্ভুত ক্ষমতা

একবার এক শিকারী খবর পাইলেন, অমুক জঙ্গলটা জানোয়ারে একেবারে বোঝাই—বাঘ, ভালুক আরও কতকি ? এ রকম খবর আসিলে কোন শিকারীই স্থির থাকিতে পারে না, কাজেই আমাদের শিকারীটীও সঙ্গীদল জোটাইয়া বন্দুক-হাতিয়ার লইয়া চলিলেন শিকার করিতে। কিন্তু দলের মধ্যে ছিল কয়েকজন আনাড়ি, তারা সব মাটী করিয়া দিল। জঙ্গলে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা এমন এক জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল, যে বাতাস তাদের গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া জঙ্গলের ভিতরে যেখানে জানোয়ারদের বাস, সেখানে ঢুকিল। ব্যাপারটা শিকারী যেমনি লক্ষ্য করিলেন, অমনি তিনি হতাশভাবে বন্দুক-টন্দুক মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শিকারের দফা আজ ঠাণ্ডা! ওদের সবাইকার গায়ের গন্ধ জানোয়ারেরা টের পেয়ে গেছে, আর তাদের কোন পাত্তাই পাওয়া যাবে না।" বাস্তবিকই সেদিন একটীও শিকার জুটিল না।

কথাটা শুনিয়া তোমরা হয়তো খুবই অবাক্ হইয়া গিয়াছ, না ? লোকের গায়ের গন্ধ নাকি বাতাসে আবার ভাসিয়া আসে, আর তাই নাকি কেউ টের পায়। এতো ভালই, কুকুরের ঘ্রাণ-শক্তির কথা শুনিলে তোমরা হয়তো মিনিট্ খানেক একেবারে হাঁ করিয়া থাকিবে। ইয়োরোপের অনেক দেশে 'ব্লাড্-হাউণ্ড্' কুকুর দিয়া পুলিশে ডিটেক্টিভের কাজ করাইয়া লয়। কি রকম শুনিবে ? তোমার বাড়ীতে হয়তো চুরি হইয়া গেল। বেশ বুঝিলে কাল রাত্রে চোর আসিয়া জিনিষ-পত্র সব ওলোট্-পালট্ করিয়া দিয়াছে। তুমি পুলিশে খবর দিতেই পুলিশ তার 'ব্লাড্-হাউণ্ড্' কুকুর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়াই ব্লাড্-হাউণ্ড্ জিনিষ-পত্রগুলি সব শুঁকিতে আরম্ভ করিল। কেন বল তো ? গত মাসে তোমরা শুনিয়াছ যে, প্রত্যেক মানুষের গায়েই এক একটা আলাদা রকমের গন্ধ আছে। চোরতো জিনিষপত্র ধরিয়াছে, কাজেই জিনিষ-পত্রগুলায় তাহার গায়ের গন্ধও লাগিয়া গিয়াছে।

যেই চোরের গায়ের গন্ধ একবার টের পাওয়া গেল ব্যস্, অমনি কুকুর আরম্ভ করিল মাটী শুঁকিতে। ঐ রকম গায়ের গন্ধ যার সে কোন্ পথে হাঁটিয়াছে ? যেখানে যেখানে সে পা ফেলিয়াছে, নিশ্চয়ই সেই সব জায়গায় তার গায়ের গন্ধটাও মাখা আছে। আর যায় কোথা ? কুকুর মাটী শুঁকিতে শুঁকিতে চোরের সন্ধানে চলিল।

ডিটেক্টিভ্ কুকুর চোরের সন্ধানে বাহির হইয়াছে

অলি-গলি ঘুরিয়া, কখনো বড় রাস্তায়, কখনো মাঠের ভিতর দিয়া, চোর মানুষের চোখে ধূলা দিয়া পালাইয়াছে, কিন্তু কুকুরের চোখে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয়—সে ঠিক সেই সমস্ত পথ ধরিয়াই চলিল। চোর মশাই এদিকে হয়তো মাইল পঞ্চাশেক হাঁটিয়া গিয়া গাছ তলায় একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, আর অমনি পেছন হইতে হঠাৎ তার ঘাড়ের উপর ঘ্যাঁক করিয়া এক কামড়। পিছন ফিরিয়া চোর দেখিল, ভীষণ ব্লাড্-হাউণ্ড্ কুকুর,—বাঘ বলিলেই চলে। তোমরা হয়তো ভাবিতেছ এ সব আজগুবি খবর, কিন্তু এর একটী কথাও বানানো নয়, বর্ণে বর্ণে সত্য।

কিন্তু হাজার হৌক্ মানুষের বুদ্ধি তো চিরকালই কুকুরের বুদ্ধির চাইতে বেশী, কাজেই পাকা ঝানু চোর যারা, তারা ব্লাড্-হাউণ্ড্ কুকুরকেও দিব্যি ফাঁকি দেয়। কেমন করিয়া জান? গন্ধ ধরিয়া ধরিয়া কুকুর তো চোরের সন্ধান করিবে—গন্ধটা নষ্ট করিয়া ফেলিলেই হইল! জলে নামিয়া খানিকটা গিয়া আবার ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলেই গন্ধটা নষ্ট হইয়া গেল, আর কুকুরেরও চোর ধরার কোন যো-ই রহিল না।

চিড়িয়াখানায় জেব্রা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ঐ যে ঘোড়ার মত জীব-গুলা, গায়ে সাদা সাদা ডোরা কাটা। জেব্রার বাড়ী হইল জঙ্গলের রাজা খোদ্ আফ্রিকায়। আফ্রিকার জঙ্গলে জল জিনিষটা বড়ই দুর্ঘট। পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকাইয়া আসিতেছে, সারাদিন গরু-খোঁজা খুঁজিয়া সন্ধ্যাবেলা হয়তো বা জলের সন্ধান পাইলে। তোমরা বলিবে, কেনরে বাপু, একবার জলের জায়গাটা খুঁজিয়া লইয়া, তাহার ধারে পাশে চিরকালের জন্য আস্তানা গাড়িলেই তো হইল! জেব্রার কিন্তু সে সুবিধাটী নাই। আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ মামারা দলে দলে বাস করেন। মামাদের আবার জেব্রার মাংসটা একটু অতিরিক্ত রকমের প্রিয়, কাজেই তাঁরা রোজই জেব্রার খোঁজে গোটা জঙ্গলটা ওলট্-পালট্ করিয়া বেড়ান। এ অবস্থায় জেব্রাদের সর্ব্বদাই একটু তফাতে তফাতে থাকিতে হয়, বেশ স্থানে-স্থিতিতে ঘর বাঁধিয়া থাকা তাদের পোষায় না। এখন নূতন নূতন জায়গায় গিয়া রোজ রোজ জল খুঁজিতে হইলেই তো হইয়াছে! তবে জেব্রারা করে কি? আফ্রিকার জঙ্গলে অনেক জায়গাতেই মাটীর সামান্য নীচে জল পাওয়া যায়—একটু মাটী খুঁড়িয়া লইলেই হইল। কোথায় জল আছে না আছে, জেব্রারা কিন্তু গন্ধ শুঁকিয়াই টের পায়! তারপর ক্ষুর দিয়া মাটী সামান্য একটু খুঁড়িয়া লইলেই হইল!

এতক্ষণ ঘ্রাণ-শক্তির কথাই বলিলাম। শ্রবণ-শক্তিও ইতর প্রাণীর বড় কম নয়। প্রায় পাখীরই কাণ দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা ভাবি, ওদের আর ছাই কতই শ্রবণ-শক্তি থাকিবে? কথাটা কিন্তু প্রকাণ্ড ভুল। একটা বিলাতী মাসিক পত্রিকায় যে ঘটনাটা বাহির হইয়াছিল শোন। 'ফেজাণ্ট' নামে এক রকম

গৃহপালিত পাখী আছে। একদিন হঠাৎ তারা যে যেখানে ছিল, সকলে উত্তেজিত হইয়া বিষম চীৎকার জুড়িয়া দিল। সে দিন তো কেউ-ই কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না! কারণ বোঝা গেল পরের দিন। দূরে, অনেক দূরে, সমুদ্রে এক-খানা যুদ্ধ-জাহাজ হইতে গোলা ছোড়া হইয়া-ছিল। মানুষের কাণে তা শোনা অসম্ভব। অথচ, কাণ না থাকা সত্বেও পাখীরা সমস্ত শুনিয়া ফেলিল, ও ভয়ে চীৎকার জুড়িয়া দিল!

পাখীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে

বানরের মস্ত বড় শত্রু হইতেছে সাপ—গাছে থাকে, ফস্ করিয়া কামড়াইয়া দিলেই দফা ঠাণ্ডা! কাজেই তাকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়, ঐ বুঝি মাটীতে পাতাটা একটু নড়িল, ঐ বুঝি সাপ আসিল! এই ভাবে আস্তে আস্তে এ বিষয়ে তার একটা ক্ষমতা জন্মিয়া যায়। একবার একটা বানরকে ঘরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। হঠাৎ সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, কিছুতেই ঘরে ঢুকিবে না। ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। খানিকটা পরেই কারণ বোঝা গেল—ভূমিকম্প হইতে আরম্ভ হইল।

ভূমিকম্প হইবার আগে মাটীতে যে সামান্য একটু কাঁপুনি লাগিয়াছিল, বানর তখনই টের পাইয়াছে, ব্যাপার খানা কি ! অথচ বুদ্ধিমান্ জীব মানুষ কিছুই বুঝিতে পারে নাই, দিব্যি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

গাছ চাপা না পড়িলে হয়

অনেক জানোয়ার আছে, ঝড় বৃষ্টি কিম্বা কোন দৈব দুর্ঘটনা হইবার পূর্ব্বেই তারা সমস্ত টের পায়। ছবিতে দেখ, কতগুলি হরিণ ঝড়ের হাত হইতে পার পাইবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া কী ভাবে দৌড়াইতেছে ! বেচারারা ঝড় আসিবার পূর্ব্বেই তা টের পাইয়াছিল, কিন্তু অত বড় জঙ্গল, দৌড়াইয়া সারিয়া উঠিতে পারে নাই। এখন গাছ চাপা পড়িয়া না মরিলেই মঙ্গল !

দর্পচূর্ণ

(শ্রীহেমলতা দেবী)

(১)

মন্দারনগরের রাজকন্যা অমিতার মত সুন্দরী সে সময় প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সুন্দরী হইলে কি হয়, অমিতার দেমাকটা ছিল বড় বেশী। বিবাহের বয়স কবে পার হইয়া গিয়াছে, অমিতার কিন্তু বরই পছন্দ হয় না। দেশ বিদেশ হইতে কত বড় বড় লোক, কত রাজা, রাজপুত্র অমিতাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল,—তা রাজকন্যা সে সব আমলেই আনিতে চায় না। রাজা দেবসিংহের মেয়ে-অন্ত প্রাণ। কাজেই অমিতার কথাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যায়।

বিবাহপ্রার্থীদের মধ্যে সব চেয়ে যে ছিল নাছোড়বান্দা, সে কিন্তু রাজাও নয়, রাজপুত্রও নয়,—তাহার নাম বসুমিত্র। বসুমিত্রের বাড়ী ছিল বিদিশায়। সে যখন প্রথম মন্দারনগরে আসে তখন তাহার অবস্থা এক রকম নিঃসম্বল বলিলেই চলে। সম্বলের মধ্যে ছিল মাত্র একখানা তলোয়ার, আর মনের মধ্যে অসীম সাহস। এই দুইটা জিনিষের সাহয্যেই সে রাজার সৈনিক বিভাগে ঢুকিয়াছিল।

সাধারণ সেনা-নায়ক হইয়াও বসুমিত্র যে রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল—তাহার কারণ তাহার সাহসের দৌলত। মহারাজ দেবসিংহও তাহাকে ভালর চক্ষেই দেখিতেন,—কিন্তু তাই বলিয়া সে যে ফস্ করিয়া রাজকন্যা অমিতাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া বসিবে, এ কথা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। অমিতা ত' প্রথমে কথাটা শুনিয়া হাসিয়াই আকুল। সে দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী,—কত রাজা মহারাজ তাহার দয়ার জন্য পথ চাহিয়া আছে,—আর এই সামান্য সেনা-নায়ক কিনা দিব্যি বলিয়া বসিল সে রাজকন্যাকে বিবাহ করিবে। অদ্ভুত সখটা যা হোক !

বসুমিত্র কিন্তু তবু দমিত না, বলিত—টাকা না থাকুক আমার শক্তি ত আছে ! আর আমার মত রাজকন্যাকে সুখীও কেউ করিতে পারিবে না। অমিতা শুনিয়া ঠোঁট উল্টাইত।

(২)

রাজা দেবসিংহের একটা অদ্ভুত সখ ছিল। তিনি ভীষণ ভীষণ জানোয়ারের লড়াই

দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বছরে একবার করিয়া তাঁহার রাজ্যে এক বিরাট্ উৎসব হইত; আর সেই সময় সব চেয়ে বড় খেলা হইত হিংস্র জন্তুদের লড়াই।

সে বছরও দেখিতে দেখিতে উৎসবের দিন আসিয়া হাজির হইল। খেলার জায়গাটাই একটা দেখিবার জিনিষ। মাঝ খানে একটা প্রকাণ্ড গোল, বাঁধান আঙ্গিনা। তাহার চারি-কোণে চারটি জানোয়ারের খাঁচা। আর সেই আঙ্গিনা ঘিরিয়া অনেক উঁচুতে সারি সারি অসংখ্য বসিবার জায়গা। রাজ্যের প্রায় সমস্ত লোকই এই দিন খেলা দেখিতে এইখানে জড় হয়। কাজেই ব্যাপারটা কি রকম বুঝিতেই পারিতেছ।

খেলা আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছে। চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য। মহারাজ দেবসিংহ মাঝখানে সিংহাসনে বসিয়া আছেন। রাজকন্যা অমিতাও সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া বসিয়াছে। আর বেচারা বসুমিত্র,—সে শুধু রাজকন্যার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হঠাৎ রাজা ইঙ্গিত করিলেন। একটা খাঁচার দরজা খুলিয়া গেল। প্রকাণ্ড একটা সিংহ খাঁচা হইতে একলাফে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর সে কি গর্জ্জন! পারে ত, সেই হাজার হাজার লোককে একাই গিলিয়া ফেলে। তারপরেই আরেকটা খাঁচা খুলিয়া গেল। ইহার ভিতর হইতে বাহির হইলেন স্বয়ং ব্যাঘ্র মামা। সিংহকে দেখিয়াই বাঘের রাগটা যেন আরো একটু বাড়িয়া গেল। কয়েক বার গর্জ্জন করিয়া সে ওৎ পাতিয়া বসিল, সুবিধা পাইলেই সিংহের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে; সিংহও তাই। তারপর আর একদিক্ হইতে বাহির হইল কতকগুলি নেকড়ে, আর একদিক্ হইতে কতকগুলি বুনো হাতী। ওঃ, তখন যা দৃশ্য—গর্জ্জনে একেবারে ইন্দ্রের বজ্রকেও হার মানাইয়া দেয়।

রাজকুমারী অমিতা এতক্ষণ চুপচাপ খেলা দেখিতেছিল। হঠাৎ সে বসুমিত্রকে কাছে ডাকিল। তারপর হাত হইতে একখানা হীরার কাঁকন খুলিয়া সেই জানোয়ারের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। তারপর বসুমিত্রকে বলিল, "তুমি ত বল, আমার জন্য না করতে পার এমন কাজই নেই। আচ্ছা বীর, যাও দেখি, ঐ কাঁকনটা তুলে আন। তখন বুঝব তোমার কথা আর কাজ এক। আমাকে বিয়ে করার মত যোগ্যতা তোমার আছে।" বলিয়া সে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। চক্ষের নিমেষে সকলে দেখিল, বসুমিত্র সেই ভীষণ জানোয়ারের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িয়াছে। হাতে তার সেই হীরার কাঁকন। আহা রে হতভাগা; রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার লোভে বে-ঘোরে প্রাণটা হারাইল রে! এখনই ত' ঐ জানোয়ারগুলি ওকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে! কিন্তু না না, ওকি, বসুমিত্র ত বাস্তবিকই উঠিয়া আসিয়াছে। জানোয়ারগুলি একসঙ্গে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু একটুকের জন্য কিছু করিতে

পারে নাই। বাঘ মশাই ত একটা ঠ্যাং ধরিয়া আর একটু হইলেই এক টান দিয়াছিলেন আর কি!

বসুমিত্র অক্ষত শরীরে কাঁকন লইয়া ফিরিয়া আসিল। ওঃ, তখন সে কি আনন্দধ্বনি! অমিতার হাতে কাঁকন দেওয়া হইল। সকলে ভাবিল—যাক্, এতদিনে রাজকন্যার আইবুড়ো নাম ঘুচিল। এর পরে ত আর রাজকন্যা বসুমিত্রকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিতে পারে না!

রাজা দেবসিংহ উঠিয়া আসিলেন। তারপর বলিলেন, "অমিতা, তুমি বসুমিত্রকে বিয়ে করতে রাজী?" তখন কি আর 'না' বলা যায়? মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে অমিতা বলিল, "হ্যাঁ রাজী।" সকলে এক সঙ্গে বসুমিত্রের ভাগ্যের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিল। সামান্য সেনা-নায়ক! কি জোর বরাত!

হঠাৎ বসুমিত্র উঠিয়া দাঁড়াইল, রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মহারাজ, আজ আমাকে আপনি চরম সম্মান দেখালেন। রাজকন্যা বিয়েতে রাজী হয়েছেন, সেটা আমার পক্ষে মস্ত গৌরবের কথা। কিন্তু মহারাজ, আমি বিয়েতে রাজী নই! আমার প্রতি যাঁর এতটা দরদ, আমার প্রাণের উপর যাঁর এতটা মায়া যে, অনায়াসে তিনি তাঁর একটা খেয়াল মেটাবার জন্য বাঘের মুখে আমায় পাঠিয়ে দিলেন, কোন্ প্রাণে তাঁকে আমি বিয়ে করি? আমায় মাপ কর্‌বেন মহারাজ!"

রাজকুমারীর দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া বসুমিত্র বাহির হইয়া গেল। সকলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

—•—*—•—

পদ্মরাগ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ)

লোকটা কি অন্তর্য্যামী?

ঘণ্টাখানেক পরে শ্রীমন্তের ঘর হইতে দুইজন যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন দুইজনের মুখই রীতিমত গম্ভীর। কিন্তু কেউ যদি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিত, তবে বুঝিতে পারিত, দুইয়ের গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও বেশ যেন একটু তফাৎ আছে। রণজিতের মুখে যেন একটা অস্বস্তির ভাব, মনের কোথায় যেন তার একটা খোঁচা লাগিয়াছে। কিন্তু হুকা-কাশি একেবারে নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ! সে যেন আমাদের এই পৃথিবীতেই আর নাই, অন্য কোন স্বপ্ন-রাজ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

রাজাবাহাদুরের ঘরে ঢুকিয়াও হুকা-কাশির মুখের ভাব এতটুকু বদ্‌লাইল না, কিন্তু

একটু যেন তিনি চঞ্চল হইয়া, ঘরের মধ্যে কি একটা জিনিষ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আলমারীর আশপাশ, সোফার পিছন, টিপয়ের তলা, কোন জায়গাই বাদ রাখিলেন না, সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর আগেও হুকা-কাশির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, কাজেই, তাঁর কাজ-কর্ম্মের ধারাটা যে কি রকম, তাহাও তাঁর অজানা ছিল না। দেখিয়া শুনিয়া তাঁর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তবে তে হুকা-কাশি নিশ্চয়ই একটা কি কিনারা করিয়া ফেলিয়াছেন, তা' না হইলে তো হঠাৎ এরকম গম্ভীর হইবার লোক তিনি মোটেই নন! যদি সত্যিই তাই হয়, তবে আর কোন চিন্তারই প্রয়োজন নাই, কেননা যত বড় ধড়িবাজই হউক না কেন, কোন লোকই যে এই অদ্ভুত জাপানা টীর চোখে ধূলা দিয়া পালাইতে পারে, রাজা বাহাদুর সেকথা বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু রণজিতের তো আর অত শত জানা নাই, তাই সে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি, ব্যাপার কি মিষ্টার হুকা-কাশি, আপনি খুঁজছেন কি অমন পাঁতি পাঁতি করে?"

দুইজনের মুখই রীতিমত গম্ভীর

কথাটা কিন্তু হুকা-কাশির কাণেই ঢুকিল না, আপনার মনেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "সে কি আর এতক্ষণও পড়ে রয়েছে এখানে?"

রণজিৎ দেখিল, হুকা-কাশির ব্যবহারও যেন আর একটা হেঁয়ালি হইতে চলিল,—প্রায় পদ্মরাগ-চুরির মতই জটিল হেঁয়ালি! কি বলিবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাও সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, শুধু আবার উচ্চারণ করিল "ব্যাপার কি?"

এতক্ষণে হুকা-কাশির চমক ভাঙ্গিল, রণজিতের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়! একটু আগে রাজা বাহাদুরকে কি বল্‌ছিলেন না আপনি?"

জবাব দিলেন রাজা বাহাদুর। বলিলেন, "কেন বল্‌তে পারিনে, রণজিতের একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, শ্রীমন্ত বাইরে যতটা সাধুপনা দেখাচ্ছে, আসলে অতটা সাধু সে নয়! সেই কথাই আমায় বল্‌ছিল। কিন্তু আমি জানি মিষ্টার হুকা-কাশি, শ্রীমন্ত একেবারে খাঁটি! দেখুন, পদ্মরাগখানা চুরি গেছে বটে, কিন্তু এখনও আমার হাতে আরো দুটো মাণিক র'য়েছে—একটি এই শ্রীমন্ত আর দ্বিতীয়টি আমার বামুন ঠাকুর গণেশ। একদিনে আমি এদের চিনি নি মিষ্টার হুকা-কাশি! আজ চল্লিশ বছর ধরে নানা রকম পরীক্ষা দিয়ে তবে এরা পাশ করেছে! আমি জানি যে, পৃথিবীর সমস্ত হীরে-জহরৎ একত্র জড় করে এনে দিলেও, যা নোংরা, যা নীচ সে কাজ এরা কক্ষণো করবেনা!

হুকা-কাশি চোখ বুজিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, এরা খাঁটি হীরাই বটে! কিন্তু তবু দেখুন রাজাবাহাদুর, আপনার ওই দুনম্বর হীরাটীর যেন মনে হয় সামান্য একটু দোষ আছে। এই মাত্র আপনি বল্‌ছিলেন যে বামুন ঠাকুরের আপনার বয়েস হয়েছে। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে এই বুড়ো বয়সেও ঠাকুরের বিয়ের সখটা বড় বেশী—একটু অতিরিক্ত রকমের বিয়ে পাগ্‌লা—নয় কি?"

বিস্ময়ের স্পষ্ট ছাপ রাজা বাহাদুরের মুখে পড়িল; তিনি বলিলেন, "কি রকম, গণেশ ঠাকুরকে আপনি চেনেন নাকি? তাতো জান্‌তাম না!"

"চেনা তো দূরের কথা, এই আপনার মুখেই তার নাম ধাম আজ প্রথম শুন্‌লাম।"

"তবে কি ক'রে জান্‌লেন যে সে বিয়ে পাগ্‌লা? এ যে একেবারে সত্যি কথা! এ নিয়ে যে বাড়ীশুদ্ধ লোক তাকে নাচিয়ে নাচিয়ে অস্থির ক'রে তোলে! এ খবরটা নিশ্চয়ই আপনি আগে থেকে শুনেছিলেন?"

"না।"

"না? তবে?" রাজা বাহাদুরের বিস্ময় আর বাঁধ মানিল না।

"এ আমার অনুমান। পদ্মরাগ চুরির একটা কিনারা মনে মনে আমি ক'রে এনেছি। তা' যদি সত্যি হয়, তবে আপনার রসুঁয়ে বামুন যে, তাকে বিয়ে-পাগ্‌লা হ'তেই হবে, তা সে যেই হোক না কেন।—নইলে সমস্তই ভেস্তে যাবে। এখনো সবটা ঠিক করে উঠ্‌তে পারি নি আমি, আমায় আরো একটু নিশ্চিন্ত হ'তে দিন। তারপর আমি অপরাধীরও নাম ব'লে

দেব, আর বামুন ঠাকুরের ভেতরকার রসের কি ক'রে সন্ধান পেলাম সে খবরও দেবো। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, রাজা বাহাদুর, ঠাকুর আপনার বাস্তবিকই খাঁটী রত্ন—ভেতরে কোথাও এতটুকু গলদ নেই।"

রণজিৎ ও রাজা বাহাদুরের মনে হইল, তাঁহারা স্বপ্ন দেখিতেছেন। বিস্ময়ে 'হাঁ' করিয়া শুধু তাঁহারা এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

পূরা দুই মিনিটকাল এইভাবে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে রাজা বাহাদুর বলিলেন, "আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত! এ রকম অপূর্ব্ব, ক্ষুরধার যার বুদ্ধি, তার সাথে যদি রণজিতের শক্তি সামর্থ্যের যোগ হয়, তো গোটা পৃথিবী একত্র হলেও তাদের সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। 'পদ্মরাগ' আমি ফিরে পাবোই পাবো!"

ঢং ঢং করিয়া বাহিরের ঘড়িটায় বারটা বাজিয়া উঠিল। সেই ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত রণজিৎ যে জলটুকুও মুখে দেয় নাই, সে কথাটি পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুরের এতক্ষণ খেয়ালে আসে নাই। এইবার আসিল। ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "ওঃ, কি ভোলা-মন আমার। রণজিৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠায় উপোস করে আছে, আর আমি দিব্যি সে সব ভুলে ব'সে আছি!—বেয়ারা! বেয়ারা!"

মুহূর্ত্ত মধ্যেই উর্দ্দিপরা বেহারামূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। রাজা বাহাদুর হুকুম দিলেন, "বাথ্‌রুমে রণজিৎ বাবুর স্নানের জল দাও, আর ভেতরে লীলাকে খবর দাও, নিজে তার খাবার বন্দোবস্ত করতে।"

পরদিনকার বেলা আটটার ঘটনা। রণজিৎ তার নিজের বাড়ীর দোতালায়, জানালার পাশে একটা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে। রাস্তা দিয়া কত লোক যাইতেছে, একটা খোঁড়া লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়াছে, কিন্তু সে সব দেখিবার রণজিতের সময়ই নাই। ভাবনার আজ আর তাহার অন্ত নাই। কী অদ্ভুত এই জাপানীটি! কোন দিন ঘুণাক্ষরে রাজা বাহাদুরের ঠাকুরের নামও শোনে নাই, অথচ তার সম্বন্ধে কত খুঁটিনাটি ব্যাপারই না বলিয়া দিল। লোকটা কি অন্তর্য্যামী নাকি? হঠাৎ রণজিতের চিন্তাস্রোত বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। জানালা দিয়া সে দেখিল, একি কাণ্ড! বাড়ীর সামনের সেই রাস্তার যত লোক, সবাই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে যে যেদিকে পারিতেছে, ছুটিয়া পালাইতেছে। ছেলে বুড়ো সব! আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চীৎকার!

কি হইয়াছে জানিবার জন্য রণজিৎ নীচে ছুটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তার আর দরকার হইল না, চাকর শিবনন্দন হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া সে খবরটা দিয়া গেল। সংবাদটা হইতেছে এই। রাজা বাহাদুরের বাড়ীর হাতায় ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানার মত ছিল। জানোয়ার বড় বিশেষ তাতে একটা ছিল না—থাকার মধ্যে ছিল শুধু গোটা দুই বাঘ, কয়েকটা ভালুক, একটা চিতা, এই সব! হঠাৎ নাকি একটা বাঘ কি করিয়া খাঁচা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক দিনের পুরানো বন্ধু দ্বারোয়ানটীকে একটী চড়ে ঘাল করিয়াছে! কথাটা

শুনিয়া রণজিতের পক্ষে স্থির থাকা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এতগুলি লোক বাঘের মুখে! চাহিয়া দেখে, বন্দুকের ঘরে তালা দেওয়া, তার দাদা চাবি লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। বারান্দার এক কোণে ছিল শিবনন্দনেরই একটা পুরানো মোটা বাঁশের লাঠি, তাই হাতে করিয়াই সে সোজা গিয়া একেবারে রাস্তায় হাজির! সবাই তখনও দৌড়াইতেছে। যে লোকটীকে রণজিৎ উপর হইতে খোঁড়াইতে দেখিয়াছিল, বাঘের নাম শুনিয়া খোঁড়ামি তার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সে দৌড়াইতেছে সব্বার আগে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে, প্রাণপণে যে যেদিকে পারিতেছে, ছুটিয়া পালাইতেছে

কিন্তু একটু পরেই আসল ব্যাপারটা অদ্ভুতরূপে প্রকাশ পাইল। শোনা গেল, আসলে বাঘ মোটেই খাঁচা ভাঙিয়া বাহির হয় নাই। দুই জন লোক নাকি পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে বাঘটা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িলে কি রকম হয়! এই কথাটাই আস্তে আস্তে বড় হইতে হইতে একটা দস্তুর মত গুজবে গিয়া দাঁড়াইয়াছে—যে বাঘ শুধু বাহিরই হয় নাই, বুড়া দ্বারোয়ানটীকে পর্য্যন্ত শেষ করিয়া দিয়াছে!

তখন যে যার আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িল। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হইতেছে এই যে, ততক্ষণে সেই খোঁড়া-পানা লোকটী আবার খোঁড়াইতে সুরু করিয়াছে। দেখিয়া রণজিতের বড় হাসি পাইল, কিন্তু হাসির চেয়ে দুঃখই হইল বেশী। বেচারা! পরনের কাপড়টা তার ময়লাই বেশী, কি ছেঁড়াই বেশী, বলা খুবই বাহাদুরির কাজ। গায়ের গেঞ্জিটা কোন্ কোন্ জায়গায় ছেঁড়া বলার চাইতে কোন্ কোন্ জায়গায় আস্ত বলা ঢের বেশী সোজা! রণজিতের বুঝিতে বাকী রহিল না যে লোকটা আসলে খোঁড়া নয়, যদি কেউ এর অবস্থা দেখিয়া দয়া করিয়া দু'চারটা পয়সা ভিক্ষা দেয়, সেই ভরসাতেই খোঁড়া সাজিয়াছে। কাছে গিয়া তাই বলিল, "বাপু হে, খুব তো একচোট্ দৌড়লে, পরিশ্রমও হ'য়েছে, ক্ষিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই;—নাও কিছু কিনে টিনে খেও।" বলিয়াই তার হাতে একটা সিকি গুঁজিয়া দিয়া, সেই লাঠি হাতেই হন্ হন্ করিয়া রাজবাড়ীর দিকে সে চলিয়া গেল।

রাজবাড়ী হইতে অনেকটা উত্তরে একটা পড়ো জায়গা ছিল। কোন্ মান্ধাতার যুগে নাকি সেখানে একটা বাগান না, কি ছিল, এখনও তার দু'চারখানা বেঞ্চি টেঞ্চি

পড়িয়া আছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আশে পাশে জঙ্গল জন্মিয়াছে, ত্রিসীমানার ধারে পাশেও লোকজনের সাড়া-শব্দ নাই। রণজিতের একটা খেয়াল ছিল, মাঝে মাঝে এই নির্জ্জন জায়গাটাতে বেড়াইতে আসা। রাজবাড়ী হইয়া আজও সে একবার এখানে আসিল। দূর হইতে দেখিল, কে যেন আজ সেখানে বসিয়া আছে। আরও একটু কাছে আসিয়া সে দেখিল, এ যে সেই খোঁড়া! এ আবার কি করিতে আসিয়াছে?

পা টিপিয়া টিপিয়া রণজিৎ তার পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল। খোঁড়ার কিন্তু হুঁস্ই নাই! রণজিৎ অবাক্ হইয়া দেখিল, সে বেশ দামী একটা চুরুট ফুকিতেছে আর সোণা-বাঁধান একটা ফাউণ্টেন পেন দিয়া একখানা কাগজে খস্ খস্ করিয়া ইংরাজীতে কি যেন লিখিয়া চলিয়াছে। রণজিৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে যা' ভাবিতেছিল, খোঁড়া তো সে লোক তবে নয়! নিশ্চয় ইহার ভিতর প্রকাণ্ড একটা রহস্য আছে। এর চাল-চলন একটু লক্ষ্য করিতে হইতেছে তো! সে একটা গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

একটু পরেই লোকটা কাগজ-পত্র গুছাইয়া উঠিয়া পড়িল, ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হাঁটিতে সুরু করিল; রণজিৎও একটু দূরে দূরে থাকিয়া তার পেছন পেছন চলিল। লোকালয়ে আসিবার আগেই লোকটা সুরু করিল আবার খোঁড়াইতে। খানিকটা হাঁটিয়া তাহারা সহরের একটা ধারে আসিয়া পড়িল। সাম্‌নেই একটা ভাঙ্গামত একতালা বাড়ী, রণজিৎ দেখিল লোকটা সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেছে। বেলা তখন ক্রমেই চড়িতেছে। তাই রণজিৎ আর অগ্রসর হইল না, ভাঙ্গা বাড়ীটাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া, নিজের বাড়ীর পথে হাঁটা দিল।

বোধ করি আধ মাইলটেক পথও সে যায় নাই, এমন সময় ঝড়ের মত বোঁ বোঁ শব্দে, বাইসিক্লে চড়িয়া একটা লোক তার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় রণজিতের গায়ে সে একটা ঢিল ফেলিয়া গেল। দারুণ বিস্ময়ের সহিত রণজিৎ দেখিল, সেই ঢিলটা একটা কাগজে জড়ান—সূতা দিয়া দিব্যি বাঁধা! কিন্তু বিস্ময় তার একেবারে চরমে গিয়া পৌঁছিল, যখন সে দেখিল কাগজখানায় লেখা আছে—

"সাবধান, পরের উপকার করিতে গিয়া নিজের প্রাণটী খোয়াইও না!" (ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

অবাক্ জলপান—অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্, প্রণীত। মূল্য—দশ আনা। প্রকাশক—সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৫৪।৮ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিভূতি বাবুর পাকা হাত। রামধনুর পাঠক-পাঠিকা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহার লিখিত গল্প গুলিতে। কিন্তু কবিতায়ও তাঁর কলম কেমন অবাধগতিতে চলে, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইবেন এই "অবাক-জলপানে।" বইখানা পড়িয়া এই বয়সেই হাসিতে হাসিতে আমাদের পেটে খিল্ লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল, ছেলেরা এ বই পড়িয়া কতখানি হাসিবে, তাই শুধু ভাবি। কবিতাগুলি হইতে কোন কোন জায়গা তুলিয়া দিবার দারুণ লোভ হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে সে লোভ ত্যাগ করিতে হইল। পাঠকেরা নিজেরাই তাহা পড়িয়া লইবেন।

যেমন লেখা, ছবিগুলিও তার তেমনি—চমৎকার! এ ধরণের বই স্কুলের প্রাইজে দেওয়া উচিত।

পরলোকে ৺লাজপৎ রায়

আজ—'সন্দেশ' লিখিতে বসিয়া যে খবরটী প্রথমেই তোমাদের দিতে হইতেছে, বুক আমাদের তাহাতে একেবারে ফাটিয়া যাইতেছে! এতদিনে তোমাদের আর অজানা নাই যে, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় আমাদের সকলের মায়া কাটাইয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। কী ভালই না তিনি আমাদের এই দেশটাকে বাসিতেন! তাঁহার জীবনে আর কোন চিন্তাই ছিল না, শুধু ছিল এই কিসে তোমরা, অর্থাৎ দেশের সকলে পৃথিবীর মধ্যে লোকের মত লোক হইয়া উঠিবে। দেশের জন্য তিনি অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন—সে কথা আর একদিন তোমাদিগকে শোনাইব। আজ শুধু তোমাদিগকে এইটুকু বলিতেছি, যে লালাজীর আত্মা যাহাতে শান্তি পায়, তোমরা ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করিও।

পরলোকে ৺লালা লাজপৎ রায়

মাছের আঁশ হইতে মুক্তা

হেরিং মাছ বলিয়া এক ধরণের মাছ আছে। আজকাল এই মাছের আঁশ হইতে এক রকম নকল মুক্তা তৈরী হইতেছে, মুক্তাগুলি দেখিতে এত চমৎকার ও বড় বড় হয় যে অনেক সময় সেগুলিকে আসল মুক্তা বলিয়া ভুল হয়। নকল হইলেও এর এক একটা মুক্তার দাম অনেক সময় ৭৫০ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

কোন্ দেশের লোক কতদিন বাঁচে

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আমেরিকার প্রত্যেক লোক গড়ে বাঁচে ৫৬ বছরেরও কিছু বেশী। ইংলণ্ডের লোকেরা আর একটু কম বাঁচে—গড়ে ৫১ বছরের কিছু বেশী। জাপানীরা—৪৪ বছর। আমাদের দেশের লোকেদের অবস্থা শুনিলে দুঃখ হয়। প্রত্যেক ভারতবাসী নাকি গড়ে বাঁচে মাত্র ২২ বছরের কিছু বেশী।

শীতকালে ভিয়েনার রাস্তা

ইউরোপের ভিয়েনা সহরের নাম তোমরা অনেকেই বোধ হয় ভুগোল পড়িয়াছ। শীতকালে সেখানকার রাস্তা এত ঠাণ্ডা হইয়া যায় যে তাহার উপর দিয়া জুতা পায় দিয়া হাঁটিতেও বেশ কষ্ট হয়। আজকাল তাই সেখানে কি করা হয় জান? বিদ্যুতের সাহায্যে রাস্তার পাথরগুলি গরম করিয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে আর ঠাণ্ডার উপর হাঁটিতে কষ্ট হয় না।

পাখীর ডিম

ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে এক রকম পাখী আছে। তাহার নাম ইপিয়রনিস্। ইহাদের এক একটা ডিম কত বড় হয় জান? লম্বায় তিন ফুটের ও বেশী, চওড়ায় ১ ফুট। ডিমগুলি বালির তলায় ঢাকা থাকে। হঠাৎ দেখিলে বড় বড় ঢিবি বলিয়া ভুল হয়।

জলে স্থলে গাছে এক গাড়ী

এক কারিগর একখানা ভারী অদ্ভুত গাড়ী তৈরী করিয়াছে। গাড়ীখানা দেখিতে অনেকটা সাইকেলের মত। তলায় ক্যানভাস লাগান। সম্মুখে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য একটা যন্ত্র। এই গাড়ীখানাকে সে ডাঙ্গায় সাইকেলের মত চালাইতে পারে। তলায় ক্যানভাস ঠিকমত বসাইয়া জলে নৌকার মত ভাসাইতে পারে। আবার সম্মুখের যন্ত্রের

সাহায্যে ইহাতে চড়িয়া সে তর তর করিয়া নারিকেল, তাল প্রভৃতি গাছের আগায় উঠিতে পারে। লোকটা কাজের বটে।

মজার ছাতি

বর্ষাকালে যখন সারাদিন বৃষ্টি পড়ে তখন ছাতি না লইয়া পথে বাহির হওয়া সম্ভব নয়। অথচ বড় বড় সহরে এমন অনেক রাস্তা আছে সেখানে এত লোকের ভিড় যে ছাতি মুড়িয়া দিয়া সব সময় দেখিয়া শুনিয়া চলা যায় না। ছাতি উঁচু করিয়া ধরিলেই জলের ছাঁট আসিয়া ভিজাইয়া দিবে। তাই আজকাল এক রকম মজার ছাতি বাহির হইয়াছে। ছাতির সম্মুখ দিকের খানিকটা জায়গা কাটিয়া সেখানে অভ্র লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে বেশ ভাল করিয়া ছাতি মুড়ি দিয়াও অভ্রের ভিতর দিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চলা যায়।

ঝরণার সাহায্যে রান্না

গরমের জলের ঝরণার কথা তোমরা অনেকেই জান। কেহ কেহ হয়ত দেখিয়াও থাকিবে। চট্টগ্রাম জেলার, চন্দ্রনাথে, বিহারের রাজগির প্রভৃতি জায়গায় এই রকম কতগুলি গরম জলের ঝরণা আছে। সেখানে মাটীর তলা হইতে রাতদিন গরম জল ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। শীতকালে বেশ আরামে স্নান করা যায়। আইসল্যাণ্ডেও এই রকম অনেক গরম জলের ঝরণা বা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। কিন্তু সেখানকার মজা হইতেছে এই যে জলের উত্তাপ বড় ভয়ানক। সে জল রাতদিনই টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। সে দেশে অনেক গ্রাম আছে সেখানকার লোকেরা রাঁধিবার জন্য আর আলাদা কয়লা বা কাঠের উনান তৈরী করে না। উষ্ণ প্রস্রবণের জল এত গরম যে সেই উত্তাপেই তাহাদের রান্নার কাজ বেশ ভাল ভাবে চলিয়া যায়।

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্রমাসের রামধনুর "সন্দেশের" সমুদ্রে কতখানি লবণ আছে (৪১০ পৃঃ) সম্বন্ধে কয়েক জায়গায় ভুল ক্রমে হাজারের স্থানে লক্ষ ছাপা হইয়াছিল। যে যে জায়গায় 'লক্ষ' আছে সেই সেই জায়গায় 'হাজার' হইবে।

গতমাসের ধাঁধাঁর উত্তর

হুকা কল্কি

উত্তরদাতাগণের নাম

পতিতপাবন দাশগুপ্ত (মুর্শিদাবাদ), আশারাণী, অশোক, ক্ষেমময়, বিমল, সুষমাময়, অনিমা, শোভা, জ্যোৎস্না, বাসন্তী, প্রীতিময়ী, বিজলী, আভা, হীরু ও জ্যোতি (কলিকাতা), সুনন্দা ভৌমিক (রংপুর), সুধামাধব ঘোষ (জামালপুর), কল্যাণী দত্ত (নিউ দিল্লী), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, ঊষা, কনক, মানি, অভয়, শান্তি, অমিয়, অজিত, চিরু, শৈলেন, চন্দ্র, যামিনী, নলিনী (গড়পাড়), সলিল চন্দ্র বর্দ্ধন (নেত্রকোণা), হিমাংশু কুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ী), লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী (স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া), ধীরেন্দ্র লাল সেন (ছনহারা), হিমাংশু কুমার ঘোষ ও সিতাংশু কুমার ঘোষ (ভবানীপুর), সুধীন্দ্রমোহন, শান্তিপ্রসাদ, ফণীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, সুবর্ণপ্রভা ও আদরিণী দেবী (গাইবাঁধা), অনিলকৃষ্ণ মজুমদার (ঝাড়গ্রাম), হরিধন দাশ চৌধুরী (ভুবনখাল স্কুল, গঙ্গানগর, কাছাড়), প্রমোদ-চন্দ্র মুস্তোফী (জামসেদপুর), ব্যোমকেশ মজুমদার (ত্রিবেণী, হুগলী), যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যগণ (ধামরাই), প্রিয়দাস বড়ুয়া (জালিয়াখালি, আকিয়াব), ইন্দুবালা দে (পিয়াপুন, বার্ম্মা), পুলিন বিহারী বিশ্বাস (কলিকাতা), জ্যোৎস্না দেবী (কুড়িগ্রাম), রাজলক্ষ্মী দাসী, অবনী, বিশ্ব, অখিল, গুণ্ড, নন্টু, ঝন্টু (আকুই বাঁকুড়া), খুকী, মিনু, ময়না, চীনু, শ্রীশৈলজানন্দ ভট্টাচার্য্য (ময়মনসিংহ), মাষ্টার সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত (দমদম), পারিজাত রেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), অমিয়কুমার বিরাট (পাটনা), আভারেণু দেবী (রংপুর), হরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (কালীঘাট), কিশোর লাইব্রেরীর পরিচালকগণ (শ্রীরামপুর), বীরেন্দলাল সেন (ছনহরা)।

নূতন ধাঁধাঁ।

নীচের ব্রাকেটগুলির মধ্যে যে কথাগুলি আছে সেইগুলির জায়গায় তাহাদের ঠিক মত এক একটা প্রতিশব্দ বসাইতে পারিলেই লাইনগুলি ঠিক মত পড়া যাইবে। এমনি ভাবে চেষ্টা করত—

(ফুল) (চক্ষু) (সাপ) এর ক (উল্টা) (পোযাক) (কপাল) ই। এই (কুঠার) অত (যুদ্ধের জিনিষ) মো (মহাদেব) (মুদ্রা) য়াছে, আ (সপ্তাহের একদিন) আ (একরকম পোকা) কো (বাসকরা) র এক (মাটী) (স্ত্রী) তা (একরকম গহনা) (একটা ইংরাজী মাস) য়ের স (উপকার) বিবা (দেখ) কথা (সংবাদ) (চিত্রকরের প্রয়োজনীয় জিনিষ) য়াছে, কা (সন্ন্যাসীর চুল) গু (পোড়াইলে যাহা থাকে) তে (শরীরের অংশ) রিলে ত (একটা ইংরাজী অক্ষর) (মনের মিল) নাই থাকে না।